উতল হাওয়া

তসলিমা নাসরিন

উতল হাওয়া

আমার মেয়েবেলা দ্বিতীয় খন্ড

utal hawa taslima nasreen
amar meyebela part 2

সত্ত্ব
তসলিমা নাসরিন

প্রথম প্রকাশ জুন ২০০২

প্রকাশক
শিবানী মুখার্জি
পিপলস বুক সোসাইটি
১২সি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রণ
গুপ্ত প্রেশ
৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু চাকী

মূল্য
১৫০.০০

ISBN81-85383-35-9

চন্দনা চাকমা সজনী
যে আমাকে দিয়েছে অনেক

লেখিকার অন্যান্য বই

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে
আমার কিছু যায় আসে না
অতলে অন্তরীণ
নির্বাচিত কলাম
নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য
বালিকার গোল্লাছুট
যাবো না কেন? যাবো
আয় কষ্ট ঝেঁপে জীবন দেব মেপে
ছোট ছোট দুঃখ কথা
অপরপক্ষ
বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা
নিমন্ত্রণ
শোধ
ভ্রমর কইও গিয়া
লজ্জা
দুঃখবতী মেয়ে
ফেরা
নির্বাসিত নারীর কবিতা
আমার মেয়েবেলা
জলপদ্য
ফরাসি প্রেমিক
খালি খালি লাগে

সূচি

বয়স ৯
উতল হাওয়া ১৫
তা তা থৈ থৈ ২৯
ছোট ছোট দুঃখ কথা ৪৩
অবসর ৬৩
ও আমার ছোট্ট পাখি চন্দনা ৭৮
সেঁজুতি ৯৯
নিঃসঙ্গতার সঙ্গ ১১৩
চিকিৎসাবিদ্যা ১২৭
কনে দেখা ১৫০
কবোষ্ণ জীবন ১৫৯
হৃদয়ের একূল ওকূল ১৭৫
শুভবিবাহ ১৯০
সুরতহাল রিপোর্ট ২০০
কাগজের বউ ২১২
বদলে যাচ্ছে ২২১
ফুলশয্যা ২৩৯
অনুতপ্ত অন্ধকার ২৬২
নিষেধের বেড়া ২৮০
নারী ২৯১
আবার একদিন পীরবাড়ি ২৯৮
উন্মীলন ৩০৫
ডাক্তারি ৩২৬
সংসারধর্ম ৩৪১
দূরত্ব ৩৫৬

মেট্রিক পরীক্ষার ফরম পুরণ করে জমা দেবার পর বাংলার মাস্টার *চারফুট এক ইঞ্চি বেড়ালচোখি দ্য ভিঞ্চি* কল্যাণী পাল বলে দিলেন তোমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। কী কারণ, না তোমার বয়স কম, চৌদ্দ বছরে পরীক্ষায় বসা যায় না, পনেরো লাগে। তা হঠাৎ করে পুরো এক বছর আমি যোগাড় করি কোত্থেকে? মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে সবাইকে জানিয়ে দিলাম এবছর আমার পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। কেন দেওয়া হচ্ছে না? বয়স কম বলে হচ্ছে না। *বয়স বেশি বলে তো শুনি অনেক কিছু হয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া হয় না, চাকরি বাকরি হয় না*--মা ভাবতে বসেন। তা হয়ত হয় না কিন্তু মেট্রিকে উল্টো--বয়স কম তো ভাগো, বাড়িতে বসে বয়স বাড়াও, ষোল হলে পরে এসো পরীক্ষায় বসতে। সন্ধের দিকে মা এশার নামাজ পড়ে দু রাকাত নফল নামাজও পড়লেন, আল্লাহর দরবারে মাথা নুয়ে চোখের জল নাকের জল ফেলতে ফেলতে জানালেন তাঁর কন্যার এবার পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু আল্লাহতায়ালা চাইলে বয়সের এই বিশ্রি বিপদ থেকে কন্যাকে উদ্ধার করতে পারেন এবং ভালয় ভালয় পরীক্ষা দেওয়াতে এবং ভালয় ভালয় পাশ করাতে পারেন।

আল্লাহতায়ালা আমাকে কতটুকু উদ্ধার করেছিলেন জানি না, তবে বাবা করেছিলেন, তিনি পরদিনই আমার ইশকুলে গিয়ে আমার ফরমে বাষট্টি সাল কেটে একষট্টি বসিয়ে দিয়ে আমাকে জানিয়ে দিলেন *এহন থেইকা যেন পড়ার টেবিলের চেয়ারে জিগাইরা আঠা লাগাইয়া বইসা যাই, আড্ডাবাজি আর শয়তানি পুরাপুরি বন্ধ কইরা ঠাইস্যা লেখাপড়া কইরা যেন মেট্রিকে চাইরটা লেটার লইয়া ফার্স্ট ডিভিশন পাই, না পাইলে, সোজা কথা, বাড়ি থেইকা ঘাড় ধইরা বাইর কইরা দিবেন।*

বয়স এক বছর বাড়াতে হয়েছে আমার, কচি খুকি আমি বড়দের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দেব, আমার খুশি আর ধরে না। আমার সেই খুশি মাটি করে দিয়ে দাদা বললেন *কেডা কইছে তর জন্ম বাষট্টিতে?*

বাবা কইছে।

হুদাই। বাবা তর বয়স কমাইয়া দিছিল।

তাইলে একষট্টি সালেই আমার জন্ম?

একষট্টি না, তর জন্ম ষাইট সালে। মনে আছে চৌদ্দই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে সার্কিট হাউজে কুচকাওয়াজ দেখলাম। তার পর পরই তুই হইছস।

ছোটদা লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে কালো মাড়ি প্রসারিত করে বললেন দাদা তুমি যে কি কও, ষাইট সালে ওর জন্ম হইব কেন? ও তো ফিফটি নাইনে হইছে।

আমি চুপসে যাই। মাকে গিয়ে ধরি আমার সত্যিকার জন্মের সালডা কও তো!

মা বললেন *রবিউল আওয়াল মাসের বারো তারিখে হইছস। বছরডা খেয়াল নাই।*

এইসব রবিউল আওয়াল ইশকুলে চলে না। ইংরেজি সালডা কও। তারিখটা কও।

এতবছর পর সাল তারিখ মনে থাকে নাকি! তর বাপেরে জিগা। তার হয়ত মনে আছে।

বাবার এনাটমি বইয়ের প্রথম পাতায় দুটো জন্মতারিখ লেখা আছে, দাদার আর ছোটদার। আমার আর ইয়াসমিনের জন্ম কবে, কোন সালে, তার কোনও চিহ্ন এনাটমি বইয়ের বারোশ পাতার কোনও পাতার কোনও কোণে লেখা নেই, এমন কি বাড়ির আনাচ কানাচের কোনও ছেঁড়া কাগজেও নেই। মার জন্ম হয়েছিল ঈদে, কোনও এক ছোট ঈদে। কোন সালে, না জানা নেই। বাবার জন্মের সাল তারিখ নিয়ে বাবাকে প্রশ্ন করার বুকের পাটা আজ অবদি কারও হয়নি। যখন বয়স নিয়ে বিষম চিন্তিত আমি, যোগ বিয়োগ করে এর ওর বয়স বার করছি সারাদিন, দাদার বয়সের সঙ্গে বারো বছর যোগ দিলে যে বয়স দাঁড়ায়, সে বয়স মার বয়স আর দশ বছর বিয়োগ দিলে বেরোয় আমার বয়স ইত্যাদি মা বললেন *এইসব থইয়া পড়াশুনা কর। বয়স পানির লাহান যায়, মনে হয় এই কয়দিন আগে চুলে কলাবেণী কইরা দৌড়াইয়া ইশকুলে যাইতাম, আর আজকে আমার ছেলে মেয়েরা বি এ এম এ পাশ করতাছে।*

বয়স নিয়ে মার কোনও ভাবনা না হলেও আমার হয়। নানিবাড়ি থেকে মামা খালা যাঁরাই অবকাশে আসেন জিজ্ঞেস করি কেউ আমার জন্মের সাল জানেন কি না। কেউ জানেন না। কারও মনে নেই। নানিবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নানিকে ধরি, এক মুখ পানের পিক চিলমচিতে ফেলে নানি বলেন, *ফেলু জন্মাইল শ্রাবণ মাসে, ওই বছরই তুই হইলি কার্ত্তিক মাসে।*

ওই বছর কোন বছর?

কোন বছর কার জন্ম হইল এত কেডা হিশাব রাখে! পুলাপান বছর বছর জন্মাইছে এই বাড়িত, একটা দুইডা পুলাপান হইলে সাল তারিখের হিশাব থাকত।

জন্মের বছরের মত তুচ্ছ একটি জিনিস নিয়ে আমি পড়ে আছি, ব্যাপারটি অবকাশের সবাইকে যেমন হতাশ করে, নানিবাড়ির লোকদেরও করে। যেদিন আমি জন্মেছি, সেদিন নানিবাড়ির পুকুরে কই মাছের পোনা ছাড়া হয়েছিল নানির মনে আছে, রুনু খালার মনে আছে সেদিন টুটুমামা ঘর থেকে দৌড়ে পেচ্ছাবখানায় যাওয়ার সময় সিঁড়িতে পা পিছলে ধপাশ, কিন্তু কোন সাল ছিল সেটি, তা মনে নেই। হাশেম মামার মনে আছে সেদিন উঠোন থেকে চারটে সোনাব্যাঙ তুলে তিনি কুয়োর ভেতর ফেলেছিলেন, কিন্তু সেদিনের সাল তারিখ কিছু জানেন না।

নিজের জন্মের বছর জানার ইচ্ছে আগে কখনও এমন করে হয়নি। বাবা বাষট্টির জায়গায় একষট্টি বসিয়ে দিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা পাকা করে এসেছেন তা ঠিক, এখন কেউ বয়স কমের অভিযোগ করবে না সুতরাং *নো চিন্তা ডু ফুর্তি,* আদা জল খেয়ে লেখাপড়ায় নেমে যাওয়ার ফুর্তি, কিন্তু মন পড়ে থাকে একটি না -জানা বয়সে, যেন আমার বয়সই আমার চেয়ে মাইল মাইল দূরে, যার সঙ্গে আমার দেখা হয় দেখা হয় করেও দেখা হচ্ছে না, অথচ দেখা হওয়া বিষম জরুরি। যখন বিদ্যাময়ী ইশকুলে মাত্র ভর্তি হয়েছি, মাকে আমার বয়স জিজ্ঞেস করেছিলাম, মা বললেন সাত। নতুন ক্লাসে ওঠার পরও জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি তখনও সাত বললেন, কেন সাত কেন, আট হবে তো! মা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দুপাশে ধীরে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, *আট বেশি হইয়া যায়,*

সাতই! পরের বছর বললেন এগারো। এগারো কেন? দেখতে নাকি আমাকে এগারো লাগে তাই। দিন দিন এমন *কলাগাছের* মত লম্বা হচ্ছি, এগারো না হয়ে যায় না, মার ধারণা। মার কাছে বয়স না পাওয়া গেলেও বাবার কাছে পাওয়া যাবে এরকম বিশ্বাস তখন থেকেই আমার ছিল, ছিল কারণ বাড়ির সবচেয়ে বিজ্ঞ মানুষটি ছিলেন বাবা। তিনি সবার চেয়ে বেশি লেখাপড়া করেছেন, তিনি জ্ঞানের আধার, তিনি এ বাড়ির কর্তা তাই। বাবা যখন আমার বয়স জানিয়ে দিলেন নয়, তার মানে নয়। এই বাবাও আমার বয়সের হিশেব রাখেননি, সে স্পষ্ট বোঝা যায়, রাখলে এনাটমি বইয়ের পাতায় দাদা আর ছোটদার জন্মতারিখের পাশে আমার তারিখটিও থাকত। নেই। নেই। এই নেইটি আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে, এই নেই আমাকে বারান্দায় উদাস বসিয়ে রাখে, এই নেইটি উঠোন ঝাঁট দিতে থাকা জরির মার বয়স জানতে চায়। প্রশ্ন শুনে জরির মা খিল ধরা কোমর টান করে দাঁড়ায়, যে দাঁড়িয়ে থাকাটুকুই তার সারাদিনের বিশ্রাম, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জরির মা আকাশের দিকে তাকায় ভাবতে, যে ভাবনার সময়টুকুই তার কেবল নিজের, ভেবে আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে উবু হতে হতে আবার উঠোন-ঝাঁটে, ঘাড় নেড়ে বলে, *উনিশ।* বিকেলের শেষ আলো আলতো আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে উঠোনের গায়ে, জরির মার কালো শরীরেও।

মা বারান্দায় এসে বসেন, জরির মার উনিশ-উত্তর পছন্দ হয়নি বলে মাকে জিজ্ঞেস করি জরির মার বয়স।

চল্লিশ বিয়াল্লিশ তো হইবই। মা তেরচা করে জরির মার ঝুলে থাকা শরীরের ঝুলে থাকা বুকের দিকে তাকিয়ে বলেন, *পঁয়তাল্লিশও হইতে পারে।*

জরির বয়স কত জরির মা?

জরির বয়স বলতে এবারও জরির মা কোমর টান করে দাঁড়ায়। মা ধমকে বলেন তাড়াতাড়ি কর, *উঠান ঝাঁট দিয়া তাড়াতাড়ি খাইতে যাও। খাইয়া বাসন মাইজা রাইতের ভাত চড়াইয়া দেও।*

দুপুরের খাওয়া আমাদের দুপুরেই শেষ। কেবল জরির মারই বাকি। কেবল জরির মার জন্যই রান্নাবান্না শেষ করে সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে বাসন মেজে ঘর দোর ধুয়ে মুছে উঠোন ঝাঁট দিয়ে তবে খাওয়া।

জরির বয়সের কথা ভাবতেও জরির মাকে আকাশের দিকে তাকাতে হয়। লালচে আকাশ জুড়ে পাখির দল নীড়ের দিকে যাচ্ছে, জরির মার কোনওদিন কোনও নীড়ে ফেরা হয়নি তার জরিকে নিয়ে। জরির জন্মের পর থেকেই এ বাড়ি ও বাড়ি *বাঁধা কাজে* বাঁধা পড়ে আছে।

কত আর, বারো !খালা, বারো হইব না জরির বয়স?

জরির মা অসহায় তাকায় মার দিকে।

বারো কও কি, ওর তো মনে হয় চোদ্দ পনর হইব।

মা জানেন না কবে জরির জন্ম হয়েছে, জরিকে মা জন্মাতে দেখেননি, মাত্র বছর দুই আগে জরিকে নিয়ে জরির মা এ বাড়িতে উঠেছে। জরির মাকে এ বাড়ির জন্য রেখে জরিকে নানিবাড়িতে দিয়ে এসেছেন মা নানির ফুটফরমাশ করতে। বয়স নিয়ে মা যা বলেন, সবই অনুমান। মা শরীর দেখে বয়স অনুমান করেন। মার এই অনুমান জরির মা সানন্দে মেনে নেয়, জরির বয়স এখন থেকে জরির মা জানে যে *চোদ্দ পনর,* আর তার নিজের *চল্লিশ বিয়াল্লিশ,* অথবা *পঁয়তাল্লিশ।*

জরির মা উঠোনে পড়া ঝরা পাতা ঝরা ডাল ঝরা পালক জড়ো করে পুকুর ধারে আবর্জনার স্তূপে ঢেলে দিয়ে রান্নাঘরে কুপি জ্বেলে ভাত আর বেগুনের তরকারি যখন খাচ্ছে, বারান্দায় বসে হাঁস মুরগির খোপে ফেরার দিকে উদাস তাকিয়েছিলেন মা, মার পায়ের কাছে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে মাথার ওপরে চক্রাকারে ঘুর্ণি খেতে থাকা সন্ধ্যোৎসবে নৃত্যরত মশককূলের সঙ্গীত আর ডলি পালের বাড়ি থেকে ভেসে আসা উলু ধ্বনির শব্দ শুনতে শুনতে দেখতে থাকি কি করে বিষণ্ন কিশোরির ভেজা চুল বেয়ে টুপ টুপ করে জল ঝরার মত আকাশ থেকে অন্ধকার ঝরে আমাদের ঝাঁট দেওয়া মেটে উঠোনটিতে।

টিনের ঘরের পেছনের সেগুন গাছটির দিকে তাকিয়ে মাকে মিহি স্বরে জিজ্ঞেস করি, *সেগুন গাছটার বয়স কত মা?*

মা অদ্ভুত চোখে গাছটির দিকে তাকিয়ে বলেন, *মনে হয় তিনশ বছর।*

মা কি করে সব মানুষ আর গাছপালার বয়স অনুমান করেন, আমি বুঝে পাই না।

মানুষ কেন তিনশ বছর বাঁচে না মা?

মা কোনও কথা বলেন না। আমি ফিরি মার দিকে, নৈঃশব্দের জলের ওপর গাঙচিলের মত উড়তে থাকা মার মুখটি তখন আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। বাদুড়ের ডানার মত ঝটিতে এক অন্ধকার উড়ে এসে মুখটি ঢেকে দিয়েছে।

বয়স-ভাবনা সেই থেকে আমাকে ছেড়ে এক পা কোথাও যায়নি। মেট্রিকের ফরমে লেখা তারিখ মত নিজের একটি জন্মদিন করার ইচ্ছে জাগে আমার হঠাৎ, বাবার মন ভাল ছিল বলে রক্ষে, চাইতেই একটি কেক, এক খাঁচা মালাইকারি, এক প্যাকেট চানাচুর, এক পাউন্ড মিষ্টি বিস্কুট, এক ডজন কমলালেবু চলে আসে বাড়িতে। কেকের ওপর মোম জ্বেলে বিকেলে বাড়িতে যারা ছিল তাদের আর একজনই সবেধন নীলমণি অতিথি চন্দনাকে নিয়ে এক ফুঁয়ে মোম নিবিয়ে বাড়িতে ছুরি নেই কি করি রান্নাঘর খুঁজে কোরবানির গরু কাটার লম্বা ছুরি এনে এক পাউন্ড ওজনের কেকটি কাটি। কেকের প্রথম টুকরোটি আমাকে কে মুখে তুলে দেবে গীতা না কি ইয়াসমিন,ইয়াসমিন বলে ইয়াসমিন, গীতা বলে গীতা, গীতা এগিয়ে এলে যেহেতু গীতা এ বাড়ির বউ, বাড়ির বউএর সাধ আহলাদের মূল্য ইয়াসমিনের সাধ আহলাদের চেয়ে বেশি, ইয়াসমিন গাল ফুলিয়ে কেকের সামনে থেকে সরে যায় আর ক্যামেরা আলো জ্বলার আগে গীতা নিজের মুখে মিষ্টি একটি হাসি ঝুলিয়ে আমার মুখে কেকের টুকরো তুলে দেয়, চোখ ক্যামেরায়। কেক কাটা, হাততালি, ক্যামেরার ক্লিক, আর মালাইকারির রসে ভিজিয়ে বিস্কুট আর কেকের ওপরের শাদা ক্রিম জিভে চেটে খেয়ে আমার জন্মদিন পালন হল এবং এ বাড়িতে প্রথম কারও জন্মদিন হল এবং হল সে আমার এবং সে আমার নিজের উদ্যোগেই। চন্দনা তিনটে কবিতার বই উপহার দিয়েছে। *রাজা যায় রাজা আসে, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি* আর *না প্রেমিক না বিপ্লবী।* দাদা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। জীবনে ওই প্রথম কিছু উপহার পাওয়া আমার জন্মদিনে। বই থেকে হাত সরে না, চোখ সরে না, মন সরে না। অনেক রাতে মা শুকনো মুখে বললেন, *মিষ্টির একটা কোণা ভাইঙ্গা জরির মার হাতে দিলে পারতি। কোনওদিন মিষ্টি খায় নাই। দেখত কিরকম লাগে খাইতে।* হঠাৎ খেয়াল হয়, কেবল জরির মা নয়, মার ভাগেও জন্মদিনের খাবার জোটেনি। মা অবশ্য বলেন, এসব না খেলেও মার চলে। কখনও কোনও বিস্কুট বা এক মুঠো চানাচুর মার দিকে বাড়ালে মা বলেন, *আমি ত ভাতই খাই। তরা পুলাপান মানুষ, তরা খা। তরা ত পাখির*

দানার মত ভাত খাস, তগর এইডা ওইডা খাইতে হয়।

আমার জন্মদিন পালন করা দেখে ইয়াসমিনেরও নিজের জন্মদিন পালনের ইচ্ছে হল খুব। কোন মাসে তার জন্ম, কোন তারিখে তা জানতে সে বাবাকে ধরল। বাবা ওকে আজ বলেন তো কাল বলেন, ইয়াসমিনও ঝুলে রইল। মাস দুয়েক ওকে ঝুলিয়ে রাখার পর বাবা একদিন বলে দিলেন নয়ই সেপ্টেম্বর। ব্যস,সেপ্টেম্বরের নয় তারিখ আসার আগেই ইয়াসমিন বাবার কাছে একটা লম্বা লিস্টি পাঠিয়ে দিল, তিনরকম ফল আর দুরকম মিষ্টি, সঙ্গে চানাচুর আর বিস্কুট। ইশকুলের মেয়েদের প্রায় সবাইকে ওর নেমন্তন্ন করা হয়ে গেছে। লিষ্টি পেয়ে বাবা বললেন, *জন্মদিন আবার কি? এইসব জন্মদিন টন্মদিন করতে হইব না। লেখাপড়া কইরা মানুষ হও। আমার বাড়িতে যেন কোনওরকম উৎসবের আয়োজন না হয়।* মা আবদারের ঝুড়ি উপুড় করেন বাবার সামনে, নিভৃতে। *জন্মদিন করতে চাইতাছে, করুক না! মেয়েরা হইল লক্ষ্মী, ওদেরে মাইরের ওপর রাখা ঠিক না। শখ বইলা ওদেরও কিছু আছে। আবদার করছে, আবদারটা রাখেন।* মা অনেকদিন থেকেই বাবাকে আপনি বলতে শুরু করেছেন, তুমি থেকে আপনিতে নামার বা ওঠার এত বেশি কারণ যে মার এই আপনি সম্বোধন শুনে বাবা যেমন চমকে ওঠেন না, আমরাও না। তবে তুমি বা আপনিতে, লঘু বা গুরু স্বরে, কেঁদে বা হেসে যে আবদারই করুন না কেন মা, মার আবদারের মূল্য বাবার কাছে যে একরত্তি নেই, এ বাবা যেমন জানেন, মাও জানেন।

আজাইরা ফুর্তি ফার্তা বাদ দেও। মেয়ে নাচে, সাথে দেখি মাও নাচে। যত্তসব বান্দরের নাচ।

বাবার ভ্রুকুটিতে মা দমে যান না। বাবার সর্দি লাগা শরীরের বুক পিঠ গরম রসুনতেল দিয়ে মালিশ করতে করতে আবদার করে যান। *মেয়েরা ত বিয়া দিলেই পরের বাড়িতে চইলা যাইব। মেয়েদের সাধ আহলাদ যা আছে তা তো বাপের বাড়িতেই পূরণ করতে হয়।* রসুন তেল বাবার ত্বক নরম করলেও মন নরম করে না। ইয়াসমিন মন খারাপ করে বসেছিল, জন্মদিনের কোনও উৎসব শেষ অবদি হচ্ছে না। কিন্তু বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিয়ে সেদিন দুপুরে বাবা খাবার পাঠিয়ে দিলেন ইয়াসমিনের লিস্টি মত। পুলকে নাচে মেয়ে। পিরিচে খাবার সাজিয়ে সেজেগুজে কালো ফটকের দিকে চোখ ফেলে অতিথিদের অপেক্ষায় সারা বিকেল বসে থাকে। কারও দেখা না পেয়ে অগত্যা শেষ বিকেলে গোল্লাছুট খেলার সঙ্গী পাড়ার তিনজন মেয়ে মাঠে খেলতে এলে ওদের ঘরে ডেকে জন্মদিনের খাবার খেতে দেয় ইয়াসমিন।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে রকমারি খাবার দেখে ছোটদা অবাক,*কি রে কিয়ের উৎসব আজকে?*

ইয়াসমিন লাজুক হেসে বলল *আমার জন্মদিন।*

কেডা কইছে এই তারিখে তর জন্ম হইছিল?

বাবা কইছে। বাবা কওয়ার পর আর কারও মুখে টুঁ শব্দ মানায় না। কারণ বাবা যা *কন*, বাড়ির সবাই জানি যে তা খাঁটি,কারণ বাবার চেয়ে বেশি জ্ঞান বুদ্ধি কারও নেই।

হ বুঝছি, একটা জন্মদিনের দরকার, তাই তুই চাইলি একটা জন্মদিন, আর বাবাও বানাইয়া কইয়া দিল।

ছোটদার স্পর্ধা দেখে ইয়াসমিন থ হয়ে গেল।

সেদিনও যার ভাগে ইয়াসমিনের জন্মদিনের কোনও কেকের টুকরো পড়েনি, সে মা। মা সেই যে দুপুরের পর বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, ফিরলেন সন্ধেয়। হাতে বাদামি রঙের একটি কাগজের মোড়ক, ভেতরে ইয়াসমিনের জন্য লাল একটি জামার কাপড়। মা নিজেই এই কাপড় দিয়ে কুচিঅলা একটি ফ্রক বানিয়ে দেবেন ওর জন্য। হাতে টাকা ছিল না বলে হাশেমমামার কাছ থেকে টাকা ধার করে নিজে গৌরহরি বস্ত্রালয়ে গিয়ে তিন গজের এই কাপড়টি কিনেছেন।

আমি হায় হায় করে উঠি, *কিন্তু আজকে ত ওর জন্মদিন না!*

কেডা কইছে জন্মদিন না?

ছোটদা কইছে।

কি হইল তাতে! মা ধমকে ওঠেন। *না হোক জন্মদিন। একটু আমোদ করতে চাইছে মেয়েটা, করুক।*

ঈদ উৎসব ছাড়া কোনও জামা আমাদের জোটে না। বছরে বাবা একবারই আমাদের জামা দেন, সে ছোট ঈদে। পরের বছর ছোট ঈদ আসার আগেই আমাদের জামা হয় ছিঁড়ে যায় নয় ছোট হয়ে যায়। বাবার কাছে নতুন জামার আবদার করলে বাবা দাঁত খিঁচিয়ে বলে দেন, *জামা দুইটা আছে না? একটা পরবি, ময়লা হইলে ধইয়া দিয়া আরেকটা পরবি। দুইটার বেশি জামা থাকার কোনও দরকার নাই।* মা আমাদের ছেঁড়া আর ছোট হয়ে আসা জামা শাড়ির পাড় বা বাড়তি কোনও টুকরো কাপড় লাগিয়ে বড় করে দেন, ছেঁড়া অংশ সেলাই করে দেন। ইশকুলের মেয়েদের ঘরে পরার আর বাইরে পরার দুরকমের জামা থাকে। কোনওদিন কোনও ঈদের জামাকে বাইরে পরার জামা হিসেবে রেখে ঘরে পরার জামা চাইলে বাবা বলেন, *বাইরে তর যাইতে হইব কেন? ঘরের বাইরে যদি কোথাও যাস, সেইডা হইল ইশকুল। ইশকুলের জন্য ইশকুলের ইউনিফর্ম আছে।* ইশকুলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা বনভোজনের আয়োজন হলে মেয়েদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় ইউনিফর্মের বাইরে অন্য জামা পরে যাওয়ার। মেয়েরা নানান রকম জামা পরে সেসব অনুষ্ঠানে যায়, আর আমি প্রতিটি অনুষ্ঠানে একটি জামাই পরে যাই বলে ক্লাসের এক মেয়ে একবার প্রশ্ন করেছিল, *তোমার কি আর জামা নাই?* লজ্জা আমাকে সেদিন এমনই তাড়া করেছিল যে দৌড়ে বড় একটি থামের আড়ালে গিয়ে অনেকক্ষণ লুকিয়ে রেখেছিলাম নিজেকে। ইশকুলের ইউনিফর্ম বানিয়ে দিতে বাবা কোনওদিন না করেননি। নিজে তিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে গৌরহরি বস্ত্রালয় থেকে কাপড় কিনে গাঙ্গিনার পাড়ের দরজির দোকানে যান, দরজি যখন গায়ের মাপ রাখে, দরজিকে বারবার বলে দেন, যেন বড়সড় করে বানায়, যেন অনেকদিন যায়। জুতোর দোকানে গিয়েও বাবা বলেন, *এই মেয়েদের পায়ে জুতা দেন তো। একটু বড় দেইখা দিবেন, যেন অনেক দিন যায়।* মাপের চেয়ে বড় জামা জুতো পরেও দেখতাম, আমাদের জামা জুতো ছোট হয়ে যায় দ্রুত। মা বলেন, *জামা জুতা ছোট হয় না, তরা বড় হস।* আমরা গায়ে বড় হতে থাকি বলে, আমার ভয় হয়, বাবা রাগ করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দাদা মাসোহারার টাকা বাঁচিয়ে আমাকে আর ইয়াসমিনকে দুটো সিল্কের জামা কিনে দিয়েছিলেন। ফুটপাত থেকে কেনা বিদেশি পুরোনো জামা, সস্তার মাল, *লান্ডির মাল।* ও পেয়েই খুশির শেষ ছিল না।

মার কিনে আনা লাল কাপড়টি গায়ে জড়িয়ে ইয়াসমিন মহা আহলাদে বাড়িময় লাফাচ্ছিল যখন, অন্ধকার বারান্দায় চুল খুলে বসে ঘরের উজ্জ্বল আলোয় লাল টুকটুকে ইয়াসমিনকে বড় সুন্দর লাগছে, দেখছিলেন মা।

কুমিল্লা থেকে বদলি হয়ে ময়মনসিংহের নতুন ইশকুলে ভর্তি হয়ে যেদিন প্রথম এল ও ক্লাস করতে, সেদিনই ওর সঙ্গে আমার কথা হল, চোখে চোখে। ওর প্রায় বুজে থাকা চোখ দুটো একই সঙ্গে এত কথা বলল সেই প্রথম দিনই, প্রথম দিন ও অবশ্য ওর মামাতো নাকি কাকাতো নাকি ফুপাতো বোন সীমা দেওয়ানের গা ঘেঁসে ছিল, দ্বিতীয় দিনও তাই, আমার বেঞ্চে বসল তৃতীয় দিন আর ওদিনের পর আমার বেঞ্চ ছাড়া কারও বেঞ্চে ও বসেনি। চন্দনার গায়ের রং না-লেখা কাগজের মত শাদা, নাক যেন ইটে থেতলে দেওয়া হয়েছে এমন, আধেক চোখ আড়াল করা চোখের পাতায়, বাকি আধেকের দ্যুতি আমারই অলক্ষ্যে আমার হৃদয় আলোকিত করে। ওর বিনুনিবিহীন দীঘল ঘন চুল বন্ধন মুক্ত হলেই পিঠে বর্ষার জলের মত উপচে পড়ে আর আশরীর ভিজে গোপনে গোপনে স্নিগ্ধ হতে থাকি আমি। দিলরুবা চলে যাওয়ার পর থেকে আমার পাশের জায়গাটি কারও জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, আমার বুঝে ওঠার আগেই চন্দনা আমার পাশে নির্দিষ্ট হয়ে গেল। প্রতিদিন চন্দনার শব্দ গন্ধ বর্ণ আর প্রতিদিনই দিলরুবার না থাকা দুটোই আমার পাশে বসে থাকে আমারই ছায়ার মত। কেবল চন্দনাই তখন ক্লাসে নতুন ভর্তি হওয়া মেয়ে ছিল না, বিদ্যাময়ী থেকে দলে দলে মেয়ে আসছে, আমার সেই যুদ্ধংদেহি বন্ধুরাই। কিন্তু কেউ আমার কপালের চন্দন-তিলকে একতিল কালি ছোঁয়াতে পারেনি। একটি তরঙ্গও তুলতে পারেনি সেই চন্দন-সুবাসে, যেখানে অহর্নিশি আমার আকণ্ঠ অবগাহন।

শহরের এক কোণে নির্জন এলাকায় আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তন দাঁড়িয়ে আছে বটে, গুটিকয় হাতে গোনা মেয়ে আছে বটে এখানে, কিন্তু মেট্রিকে বিদ্যাময়ীর মেয়েদের চেয়ে ভাল ফল করেছে এই ইশকুলের মেয়েরা, কেবল তাই নয় গড়ে প্রথম বিভাগ বেশি জুটেছে অন্য যে কোনও মেয়েদের ইশকুলের চেয়ে এই ইশকুলে, তাই ঘাড় ধরে আমার বাবা যেমন ঠেলে দিয়েছিলেন যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে সবে পা দিয়েছি, অন্যদের বাবাও সপ্তম অষ্টমে যদি সম্ভব না হয়েছে, নবম দশমে পড়া কন্যাদের একই রকম করে এই ইশকুলে ঠেলেছেন। নির্জনতা এই ইশকুলের অনেকটাই তখন কেটেছে। সবচেয়ে বড় শ্রেণীর ছাত্রী বলে তখন বিষম এক আনন্দ হয়। বই খাতার মলাটের ওপর মোটা কলমে নিজের নাম যত না বড় করে লিখি, তার চেয়ে বড় করে লিখি দশম শ্রেণী।

চন্দনার উতল হাওয়ায় উড়ছি যখন, সামনে বিকট দজ্জালের মত রাম দা হাতে মেট্রিক পরীক্ষা, চৌকাঠ পেরিয়ে প্রায় অন্দরমহলে ঢুকছে এমন, বাড়িতে বাবা মুহুর্মুহু উপদেশ বর্ষণ করছেন যেন মুখস্থ ঠোঁটস্থ এবং অন্তঃস্থ করে ফেলি সবকটি বইএর সবকটি পৃষ্ঠার সবকটি অক্ষর। কালো কালো অক্ষর ছাড়া আমার জগত জুড়ে আর কিছু যেন না

থাকে। বাবার উপদেশ পালন করার ইচ্ছে বাবা বাড়ি থেকে বেরোলে বা তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনলেই উবে যায় আমার। ইশকুলে যাবার পথে এক ক্লাস ওপরে পড়া এডওয়ার্ড ইশকুলের ছেলেগুলো ইস্ত্রি করা জামা গায়ে, চোখের কোণে ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসি নিয়ে ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে সারাদিন আমার মনে লাল নীল সবুজ হলুদ যত রকম রং আছে জগতে, লেগে থাকে। ইশকুলে পৌঁছে পড়ালেখার চেয়ে বেশি সেঁটে থাকি নাটকঘর লেন থেকে হেঁটে আসা মাহবুবার কাছে খবর নিতে ছেলেগুলোর নাম, কে কোন পাড়ায় থাকে, কার মনে কী খেলে এসব। মাহবুবা তার ভাইদের কাছ থেকে যে তথ্য পায় তাই পাচার করে, যে তথ্য পায়নি তাও অনুমান করে বলে। চন্দনা মুঠো খুলতেই আষাঢ়ে বৃষ্টির মত ঝরে প্রেমের চিঠি, দিনে ও চার পাঁচটে করে চিঠি পেতে শুরু করেছে। পাবে না কেন! পন্ডিতপাড়ার আঠারো থেকে আঠাশ বছর বয়সের ছেলেরা অনিদ্রা রোগে ভুগছে ওকে দেখে অবদি। ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে মমতা বানুকে নিয়ে প্রতিদিন গুঞ্জন, বাঘমারা মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের ইমতিয়াজ তরফদার নাকি মমতার প্রেমের জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে বসেছিল। কারও সাতে নেই পাঁচে নেই নাক উঁচু বুক উঁচু ভাল ছাত্রী আসমা আহমেদেরও জিলা ইশকুলের কোনও এক ভাল ছাত্রর সঙ্গে নাকি কোথায় দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। সারার দিকে ইশকুল ঘেঁসা বাড়ির ছেলে জাহাঙ্গীর হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, সারার নাকি ছেলেটিকে মন্দ লাগে না। পপির সঙ্গে নাদিরা ক্লাসের ফাঁকে ফিসফিস কথা বলে, আশরাফুনন্নেসা নামের ঠোঁটকাটা মেয়ে তাই দেখে অনুমান করে পপির ভাই বাকির প্রেমে পড়েছে নাদিরা। শিক্ষক শিক্ষিকা কে কার ঘরে উঁকি দিলেন, কার কথায় কে হেসে গড়িয়ে পড়লেন, কার চোখের তারায় কার জন্য কী ছিল--টুকরো টুকরো গল্প বাতাসের পাখা মেলে আমাদের কানেও পৌঁছোয়। চন্দনা এসব উড়ো খবর নিয়ে মাতে, আমিও। ও আবার নিজের দু-একটি খুচরো প্রেম নিয়েও থাকে মেতে। ক্লাসে বসেই পাতার পর পাতা প্রেমের পদ্য লিখে ফেলে হয়ত কারও উদাস দুচোখের কথা মনে করে, সেদিন সকালেই দেখা কারও চোখ। রাস্তায় দেখা লুৎফর নামের চশমা চোখের ছেলেটির জন্য আমারও কেমন কেমন যেন লাগে। ইশকুলে যেতে আসতে ছুঁড়ে দেয়া ওর দুটো তিনটে চিরকুট পেয়ে রাতের ঘুম উবে যায়। *চোখ যে মনের কথা বলে ইতি লুৎফর* লেখা একটি চিরকুট আমার পদার্থবিজ্ঞান বইএর ভেতর থেকে *পড়বি পড় মালির ঘাড়ে* না হয়ে বাবার পায়ের কাছে উড়ে গিয়ে যেদিন পড়ল, বাবা পরদিন থেকে আমার ইশকুল যাতায়াতে পাহারা বসালেন, বড়দাদার দায়িত্ব পড়ল আমাকে সকাল বেলায় ইশকুলে দিয়ে যাওয়ার আর ছুটির পর বাড়ি ফেরত নিয়ে যাওয়ার। ছুটি হলে ইশকুলের গেটের কাছ থেকে মেয়েরা রিক্সা নিয়ে বাড়ি চলে যায়, কেউ যায় হেঁটে, দুএকজনকে নেবার জন্য পিঠকুঁজো ফক্সওয়াগন গাড়ি আসে, সব চলে গেলে এমনকি মমতা বানুও(ওকে দিতে এবং নিতে চিরকালই ওর রণরঙ্গিণী মা আসেন), আমার দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যতক্ষণ না লম্বা শাদা দাড়ি মুখে সবুজ লুঙ্গি পরে কালো রাবারের জুতো পায়ে বুড়ো দাদা উদয় হচ্ছেন। ইশকুল ছুটির পর গেটের কাছে ওভাবে একা দাঁড়িয়ে থাকাও অশান্তির, আর যদি বড়দাদা আগেভাগেই উপস্থিত হন তবে সবার চোখের সামনে তাঁর সঙ্গে রিক্সায় উঠতে গিয়েও আমার অস্বস্তির শেষ থাকে না কারণ তখন আমি নিশ্চিত বড়দাদার মাথার টুপি মুখের দাড়ি রাবারের জুতো পরনের লুঙ্গির দিকে তাকিয়ে সকলেই ঠোঁট টিপে হাসছে আর মনে মনে অনুমান করছে কত বড় গেঁয়ো ভুতের বংশের মেয়ে আমি। আমার সাধ্য বা সাহস কোনওটাই নেই মিথ্যেচার করার যে দাড়িঅলা লোকটি আদপেই আমার কেউ হয় না। তিনি যে বড়ই নিকটাত্মীয়, সে কথাও মুখ ফুটে কাউকে বলা হয় না। অনেকদিন

চিরকুটের গন্ধ না পেয়ে পাহারা তুলে দেন বাবা। পাহারা তুলতে হয় বড়দাদার শস্যভরা ক্ষেত গোয়াল ভরা গরু আর গোলা ভরা ধানের টানে, আপন কুঁড়েঘরে, মাদারিনগর গ্রামে ফেরার সময় হয় বলেও। গ্রাম ছেড়ে শহরে দীর্ঘদিন কাটালে বড়দাদার মাথায় গোলমাল শুরু হয়। প্রতিদিনই তাঁর জায়নামাজ হাতে নিয়ে কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করতেই হয় পশ্চিম কোন দিকে। আমাকে যতবারই তিনি জিজ্ঞেস করেছেন আমি উত্তর দক্ষিণ পূর্ব সব দিককেই পশ্চিম বলে দেখিয়ে দিয়েছি কেবল পশ্চিম দিক ছাড়া আর তিনি দিব্যি জায়নামাজ পেতে সেদিকে ফিরেই দু হাতের দু বুড়ো আঙুলে দু কানের দ ুলতি ছুঁয়ে আল্লাহু আকবর বলে নামাজ শুরু করেছেন।

বড়দাদা সঙ্গে থাকলে তাঁর আপাদমস্তকের লজ্জায় আমাকে ঘাড় নুয়ে বসে থাকতে হত, সেই ঘাড় সোজা করার সুযোগ হল, রিক্সায় বসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের দিকেও লুকিয়ে তাকানোর। লুৎফরের সঙ্গে নীল প্যান্ট শাদা শার্ট পরা নতুন একটি নাদুসনুদুস ছেলেকে দেখে ছেলেটির জন্যও হঠাৎ একদিন মন কেমন করতে লাগল। এক পলকের দেখাতেই মন কেমন করে, প্রেমের অতল জলে ডুবে মরছি বলে মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে বাড়ি ফিরে নাদুসনুদুস আমার কথা ভাবছে, পরদিন সকাল দশটায় ইশকুলে যাবার পথে আমাকে এক পলক দেখবে বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে সে। রাস্তায় দাঁড়ায় সে পরদিন, দেখে মনে হয় পৃথিবীতে এই নাদুসনুদুসের চেয়ে সুদর্শন আর কেউ নেই, মনে হয় কি আশ্চর্য ভাবে আমার পুরোটা জীবনই নাদুসনুদুসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল, মনে হতে থাকে ওর ঠোঁটের হাসি চোখের হাসি প্রতিদিন না দেখতে পেলে আমার এই জীবনটিই ব্যর্থ। এসব এক পলকের প্রেম থেকে, যেগুলোকে মনে হত না হলে নির্ঘাত মারা পড়ব, একদিন হঠাৎই মন অন্যদিকে ফেরে, সে লাইব্রেরির বইয়ে। যত বই আছে তাকে, নিমেষে পড়ে ফেলার আকুলতা হাঁমুখো হাঙরের মত এগোয়। নাগালের বইগুলো পড়া হয়ে গেলে নাগালের বাইরের বই পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে বা মই বেয়ে উঠে ওপরের তাক থেকে পেড়ে এনে আমি আর চন্দনা গোগ্রাসে পড়ি; বাড়িতে পাঠ্য বইয়ের তলে, বালিশের তলে, তোশকের তলে সেসব বই অথচ পরীক্ষা সামনে। গৃহশিক্ষক শামসুল হুদা পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান অঙ্কবিজ্ঞান ইত্যাদি সাত রকম বিজ্ঞান যখন পড়ান, প্রায় বিকেলেই তাঁর চড় থাপড় খাওয়া আমার নৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। তা হোক, শামসুল হুদা আমাকে বিজ্ঞান-জ্ঞান বিতরণ করে চা বিস্কুট খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোতেই আবার সেই তোশকের বালিশের তলের অপাঠ্যে ঝুঁকে পড়ি। আমার চেয়ে চার কাঠি এগিয়ে থাকে চন্দনা। বই আমি দুটি শেষ করলে ও করে সাতটি। ওর সঙ্গে বইপড়া-দৌড়ে আমি বরাবরই পেছনে। বইপোকা মমতাও চন্দনার সঙ্গে পেড়ে উঠত না, আমার বিশ্বাস। লাইব্রেরির বইগুলোকে ইশকুলের মেয়েরা বলে আউটবই। *আউটবই* শব্দটির মানে কি, একবার জানতে চেয়েছিলাম, উত্তর ছিল *সিলেবাসের বাইরে যে বই, সে বই আউটবই।* আউটবই পড়া মেয়েদের *শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট ভাল ছাত্রীরা* খুব ভাল চোখে দেখে না। *আউটবই* যারা পড়ে, তারা ক্লাসের পড়ায় মন দেয় না, মন তাদের থাকে উড়ু উড়ু, মোদ্দা কথা তারা মেয়ে ভাল নয়, পরীক্ষায় গোল্লা জাতীয় জিনিস পায়, এরকম একটি ধারণাই চালু ইশকুলে। এই ধারণাটি কেন, তা আমার বোঝা হয় না। আমি *আউটবই* পড়েও পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারি, তা প্রমাণ করার পরও ধারণাটি ঘোচে না। ওই পড়ার নেশাতে অন্যরকম একটি জগত তৈরি হয় আমার আর চন্দনার। শিক্ষক শিক্ষিকার বা ক্লাসের মেয়েদের ব্যক্তিগত কোনও প্রেম বিরহের খবর বাতাসের সঙ্গে বা বাতাসের আগে আমাদের কানে আসে না, মাঝপথে কোথাও থমকে থাকে। আমাদের

বাতাস তখন ভারি পার্বতীর কান্নায়, রাজলক্ষ্মীর নগ্ন পদধ্বনিতে, চারুলতার নিঃসঙ্গতায়, বিমলার দ্বিধায়।

বাতাস যে সবসময় ভারি হয়েই থাকে তা নয়, মাঝে মধ্যে অমল হাসিতে আবার অমলিন হয়ে ওঠে, আবার ফুরফুরে। আমাদের লাইব্রেরিয়ান সাইদুজ্জামানের ঠোঁটে তেমন একটি অমল হাসি খেলে প্রায়ই। মাঝে মাঝে আমাদের ইসলামিয়াত পড়ান তিনি, এই একটি বিষয়ের জন্য ইশকুলে কোনও শিক্ষক নেই, যে শিক্ষকের যখনই অবসর থাকে, ইসলামিয়াত পড়াতে ক্লাসে আসেন। ইসলামিয়াত ক্লাসে সাইদুজ্জামানের হাসি নিখাদ আকর্ণবিস্তৃত। তাঁর হাসির মূল্য আছে, কারণ এ ক্লাসটি অন্য যে কোনও ক্লাসের চেয়ে অগুরুত্বপূর্ণ। কল্যাণী পাল বাংলা পড়াতে এসে ঠোঁটে মোনালিসার হাসি ঝুলিয়ে রাখেন, সাহিত্যের রস আস্বাদনের সময় ওরকম একটি হাসির প্রয়োজন আছে। সুরাইয়া বেগমও তাঁর উঁচু উঁচু দাঁতের হাসিতে রজনীগন্ধার সুগন্ধ ছড়ান। হাসিতে কি সুগন্ধ ছড়ায়? চন্দনা বলে, ছড়ায়। অংকের শিক্ষক বাংলার পাঁচের মত মুখ করে ক্লাসে আসেন, ক্লাস থেকে বেরোন, সে মানায়। সাইদুজ্জামানের হাসির প্রশ্রয়ে ইসলামিয়াত ক্লাসে বসে আকাশের দিকে অন্যমন তাকিয়ে থাকলেও বা খাতা ভরে পদ্য লিখলেও বা পেচ্ছাব পায়খানা করতে গিয়ে বা জল খেতে গিয়ে পাঁচ মিনিটের জায়গায় আধঘন্টা কাটিয়ে দিলেও কিছু যায় আসে না। সাইদুজ্জামান ইসলামিয়াত পড়ানো রেখে গল্প করে সময় কাটান বেশি,তাঁর গল্পগুলো নেহাত নিরস নয়, তবে বারবারই তিনি বলেন বিষয় হিসেবে ইসলামিয়াত একেবারে ফেলনা নয়, ফেলনা নয় কারণ এটিতে নম্বর ওঠে, সূরা ফাতিহা ঠিকঠাক লিখে দিতে পারলে বা আসমানি কিতাবের চারটে নাম বলতে পারলেই দশে দশ। পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়নে নম্বর যদি কম পাওয়া যায়, প্রথম বিভাগে পাশ করার ভরসা হল ইসলামিয়াত, খাটাখাটনি ছাড়াই নম্বর। ক্লাসের মুসলমান মেয়েদের জন্য ইসলামিয়াত পাঠ্য, হিন্দুদের জন্য সনাতন ধর্ম শিক্ষা, সারা ইশকুলে হিন্দু ধর্ম পড়াবারও কোনও শিক্ষক নেই, কল্যাণী পাল হিন্দু বলে তাঁকে প্রায়ই ওই ক্লাসে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হয়, ছাত্রীদের তিনি বলেন, খামোকা ধর্মের পেছনে সময় নষ্ট না করে অঙ্ক বিজ্ঞান নিয়ে থাকো, ওতে কাজ হবে। হিন্দু মেয়েরা ধর্ম ক্লাসে বিরাট এক ছুটি পেয়ে যায়, অঙ্ক বিজ্ঞানের পেছনেও সময় নষ্ট না করে মাঠে খেলতে চলে যায়, নয়ত আড্ডা পেটায় খালি ক্লাস-ঘরে। চন্দনা যেহেতু বৌদ্ধ, ওরও বেরিয়ে যাওয়ার কথা ক্লাস থেকে, হিন্দু ধর্মের শিক্ষকই নেই, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষক থাকার তো কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু ও ঠায় বসেই থাকে ইসলামিয়াত ক্লাসে, গল্পের বইয়ে ডুবে, নয়ত কবিতায়। আমি ওর পাশে বসে না দিতে পারি মন ইসলামিয়াতে, না পারি সাইদুজ্জামানের নাকের ডগায় নীহাররঞ্জন গুপ্ত খুলতে। অতঃপর আঁকিবুকি কর, ছড়া লেখ।

সাইদুজ্জামান কামান দাগান,
ধর্মের ঘোড়া স্কন্ধে চাপান
হাবিজাবি কন যেখানে যা পান
কাশি তো আছেই, আবার হাঁপান
মাথায় একটি টুপিও লাগান
কোরান হাদিস মানেন নাকি মানার ভান?

সাইদুজ্জামানকে তুলোধুনো করে আমারই পরে দুঃখ লেগেছে, রীতিমত শার্টপ্যান্ট পরা ভদ্রলোক, কোনও টুপি তার চাঁদি স্পর্শ করেনি, তাঁকে কেন এই হেনস্থা! আসলে এ সাইদুজ্জামান বলে কথা নয়, যে কাউকে নিয়েই এমন হতে পারে, টেংরা মাছের মত

দেখতে কাউকে বিশাল হাঁমুখ বোয়ালও নির্বিঘ্নে বানানো চলে। বিশেষ করে চন্দনার আশকারা পেলে। বাংলার শিক্ষক সুরাইয়া বেগম হেলে দুলে হেঁটে যাচ্ছেন, পেছনে চন্দনা আর আমি দুটো পিঁপড়ের মত, চন্দনা ফিসফিসিয়ে বলছে--*ওলো সুরাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, মুখ ঘুরাইয়া*

আমি যোগ করছি--*আর কত হাঁটো, বেলা তো গেল*

কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দনা শেষ করে, *যেতে যেতে গেল ফুরাইয়া।*

আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তনের শিক্ষকমণ্ডলী যে ছোটখাট ব্যাপার নয় তা জেনেও আমাদের ছড়া কাটা, যদিও প্রকাশ্যে কিছুই নয় সবই নিভৃতে-নির্জনে-নিরালায়, থেমে থাকে না। অন্য ইশকুলে বি এ পাশ নেবে, আবাসিকে ঢুকতে হলে হতে হবে এম এ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে যা হতে হয়। এই বিদ্যায়তনের শিক্ষক শিক্ষিকা কেউ এ শহরের নয়, দূর দূর শহর থেকে আসা, বেশির ভাগই ঢাকা থেকে। শিক্ষককুলের বাড়িঘর সবই ইশকুলের ভেতর। এক একজন শিক্ষকের জন্য এক একটি বাড়ি, বাড়ির সামনে মাঠ, পেছনে বাগান। যখন এ ইশকুলটি বানানো হয়, তখন কেবল শিক্ষককুলের জন্যই আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না, ছাত্রীকুলের জন্যও ছিল। বাধ্যতামূলক আবাসিকতা। প্রায় ক্যাডেট কলেজের মত করে এই ইশকুলটির আগপাস্তলা গড়ার স্বপ্ন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহে, তাই এই শহরেই তাঁর মৃত স্ত্রীর স্মরণে রাবেয়া মেমোরিয়াল নামে এই আবাসিক ইশকুলটি তিনি বানাতে শুরু করেছিলেন প্রায় একশ একর জমির ওপর, হাওড় বিল সব ভরে। তারপর তো পাকিস্তান গেল, গভর্নর গেল, একাত্তরে বোমারু বিমান শহরে চক্কর খেয়ে রাবেয়া মেমোরিয়ালের একাকি দাঁড়িয়ে থাকা আধখেঁচড়া ইশকুল-দালানে বোমা ফেলে অনেকখানি ধসিয়ে ফেলল। যুদ্ধের পর ধস সরিয়ে অবশিষ্ট দালানটুকু সারাই করে চুনকাম করে রাবেয়া মেমোরিয়াল নাম তুলে দিয়ে আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তন বসিয়ে এটি চালু করা হল,ওই একই নকশায় বলা যায়, আবাসিকের নকশা, কিন্তু শিক্ষককুল দ্বারা আবাসিক ব্যবস্থা সম্ভব হলেও ছাত্রীকুল দ্বারা হল না। একটি নতুন দেশের পক্ষে অত বিশাল আয়োজনে সবকিছু করা সম্ভব হয়নি, তবু যা হয়েছে তাই বা কম কিসে! ছাত্রীদের ইশকুলের সীমানায় বাধ্যতামূলক করা হল না, ছাত্রীনিবাস পড়ে রইল মাঠের এক কোণে ভুতুড়ে নির্জনতায়। কেবল প্রধান শিক্ষিকা ওবায়দা সাদের বাড়ির নিচতলায় খুলনা রাজশাহি থেকে আসা কিছু মেয়ের থাকার ব্যবস্থা হল। তবু এই ইশকুল শহরের নামি ইশকুল, দামি ইশকুল। বাছাই করে ভাল শিক্ষক শিক্ষিকাদেরই কেবল চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাছাই করে ভাল ছাত্রীদেরই কেবল ভর্তি করা হয়েছে। অন্য ইশকুলগুলোর চেয়ে এই ইশকুলের ঢংঢাং তাই অনেকটাই আলাদা। এই ইশকুলে ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হয়, অন্য ইশকুলে এমন ব্যবস্থা নেই। বৃত্তির জন্য অন্য ইশকুলে বোর্ডের পরীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। এই ইশকুলের অডিটোরিয়াম যেমন দেখার মত, অনুষ্ঠানও হয় দেখার মত। এ তো আর অন্য ইশকুল-অডিটোরিয়ামের মত মুরগির খোপ জাতীয় কিছু নয়, বড় কোনও সিনেমাহল বলা চলে। বোতাম টিপলেই ভারি মখমলের পর্দা মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশে সরে যায়। মঞ্চও চক্রাকারে ঘোরে। দর্শকের আসন নিচ থেকে ওপরে চলে গেছে। নাটক, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীতানুষ্ঠান যা হয় এই মঞ্চে তা অন্য ইশকুলের সাধ্য নেই হওয়ানোর। প্রতি মাসে না হলেও দুমাস অন্তর অন্তর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, বারোই দিবস তেরই দিবস পালন তো আছেই। এমনিতেও চাপাচাপি করলে

ডাকসাইটে শিক্ষক শিক্ষিকারা খোলস থেকে বেরিয়ে গান গেয়ে ওঠেন অদ্ভুত সুরেলা কণ্ঠে। বোমা ফেলার দরকার হয় না, পরিমাণ মত সুড়সুড়ি ফেললেই কবিতা বেরিয়ে আসে অনেকের পেট থেকে, এমন কি অংকের শিক্ষকের পেট থেকেও। অনুষ্ঠানাদি ছাড়া যে একেবারে নীরস সময় কাটে তা নয়, সুরাইয়া বেগম বাংলা পদ্য পড়াতে এসে প্রায়ই নিজের লেখা পদ্য শোনান। সুরাইয়া বেগমের মন কাদার মত নরম হলেও জিন্নাতুন নাহার শক্ত পাথর-মত। তিনি পড়ান ইংরেজি। ইংরেজির শিক্ষকদের কোনওকালেও আসলে আমার ভাল লাগেনি। বিষয়টি যেমন কঠিন, বিষয়ের শিক্ষকগুলোও তেমন। আমার ভাল লাগে বাংলা, চন্দনারও বাংলা। ওই সময় একদিন অন্যদিনের মতই ইশকুলে পৌঁছে সকাল বেলা মাঠে ক্লাস অনুযায়ী লাইনে দাঁড়িয়ে উঠবস করে আর ডানে বামে পেছনে সামনে মাথা থেকে পা অবদি নেড়ে চেড়ে অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যায়াম সেরে সোজা হও আরামে দাঁড়াও পর্বে আদেশ অনুযায়ী আরামে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকার সামনে সমস্বরে *আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি* গেয়ে লাইন করে ক্লাসঘরে ঢোকার পর যে সংবাদটি প্রধান শিক্ষিকা নিজে এসে আমাদের দিয়ে যান, সে হল লেখক কাজী মোতাহার হোসেন এখন আমাদের ইশকুলে, তাঁর সঙ্গে ইচ্ছে করলে আমরা দেখা করতে পারি। উত্তেজনায় বুক কাঁপে। কাজী মোতাহার হোসেন আমাদের প্রধান শিক্ষিকার বাবা। তিনি লেখেন ভাল, খেলেনও ভাল, মাথা ভালদের যা হয়--সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী। অনেকগুলো গুণী সন্তান জন্ম দিয়েছেন তিনি, এই ওবায়দা সাদ ছাড়া বাকি সবাই স্বনামধন্য, ছেলে কাজী আনোয়ার হোসেন নামি লেখক, মেয়ে সানজিদা খাতুন-ফাহমিদা খাতুন দুজনই বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী। আমি আর চন্দনা বিখ্যাত সন্তানদের বিখ্যাত বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অবশ্য বিষম এক ফাঁপরে পড়ি। প্রথম কিছুক্ষণ উঁকি দিয়ে দরজায়, আলতো করে দরজা সরিয়ে পঁচাশিভাগ ভয়ে পনেরোভাগ নির্ভয়ে তাঁর ঘরখানায় উপস্থিত হতেই তিনি শাদা দাড়ি দুলিয়ে হাসলেন, কৌতূহলে চোখদুটো উজ্জ্বল, তাঁর কৌতূহল নিবৃত্ত করি *আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি* বাক্যটি বড় ব্রীড়িত বিনম্রস্বরে বলে। শুনে তিনি মধুর হাসলেন, হেসে টেবিলে একটি রেডিও ছিল সেটি বেজায় শব্দ করে চালিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ রেডিও চলল, আমি আর চন্দনা নিজেদের মধ্যে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করছি, তিনি শুভ্রকেশশুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রহাস্য অধরে, রেডিওতে কান পেতে আছেন। আমরা আবারও জানালাম কেন এসেছি, তিনি এবার মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ তখন না হলেও এখন বুঝতে পেরেছেন আমরা কেন এসেছি। মাথা নেড়েই তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে, কেবল ঘর থেকে নয়, বাড়ি থেকে, হন হন করে হেঁটে সোজা ইশকুলের দিকে। পেছন পেছন গিয়ে দেখি ওমা তিনি তাঁর কন্যার কাছে গিয়ে বলছেন, *তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে যে!* ওবায়দা সাদ তাজ্জব, তিনি মোটেও ডেকে পাঠাননি পিতৃদেবকে। ঘটনা কি? পিতৃদেব কানে খাটো। কানে খাটোর সঙ্গে আমরা কি করে কথোপকথন চালাবো তবে! ওবায়দা সাদ এর কোনও মীমাংসা করতে পারলেন না। অতঃপর মান্যগণ্য প্রণম্য নমস্য সৌম্যদর্শনের আপাদমস্তকের দিকে নীরবে শ্রদ্ধা ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর রইল না। বুদ্ধি হওয়ার পর কোনও জলজ্যান্ত লেখককে চোখের সামনে এই আমার প্রথম দেখা। মার কাছে শুনেছি, যখন ছ মাস বয়স আমার, রাহাত খান, বাবার এক লেখকবন্ধু আমাদের বাড়ি আসতেন, আমাকে কোলে নিয়ে দোলাতেন, দোলাতে দোলাতে নিজের বানানো গান গাইতেন। মার ইশকুলের বান্ধবী ফরিদা আখতারের উদ্দেশে ছিল সে সব গান, *আমার স্বপ্নে দেখা ফকিরকন্যা থাকে সে এক পচা ডোবার ধারে, কিস্তি নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে আমি দেখে এলেম তারে ..।* রাহাত

খান নাসিরাবাদ কলেজের মাস্টার ছিলেন। *ডাক্তারে আর মাস্টারে খাতির হইল কেমনে?* জিজ্ঞেস করলে মা উত্তর দিয়েছেন, *দুইজনে এক মুক্তারনির প্রেমে পড়ছিল, সেই মুক্তারনি, মুক্তারের সুন্দরী বউ, যার বাড়িতে জায়গির থাইকা লেখাপড়া করছিল তর বাপ!* ফরিদা আখতারের প্রেমেও নাকি বাবা পড়েছেন। মুখে বসন্তের দাগঅলা ফর্সা *উঁচালম্বা* ফরিদা আবার আমার শিক্ষিকা ছিলেন ছোটবেলার সেই রাজবাড়ি ইশকুলে। *ফরিদা লাস্ট বেঞ্চের ছাত্রী ছিল, আমি ছিলাম ফার্স্ট বেঞ্চের, আমার চেয়ে কত খারাপ ছাত্রী ছিল ফরিদা, সেই ফরিদা এখন ইশকুলে পড়ায় আর আমি চুলায় খড়ি ঠেলি। এই হইল আমার কপাল!* মার কপাল নিয়ে আর যে কেউ ভাবুক, বাবা ভাবেন না। মা ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করবেন, রেঁধেবেড়ে খাওয়াবেন, চোর ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব থেকে বাড়ি সামলাবেন, এই মহান দায়িত্ব যাঁর হাতে, তাঁর আবার কপালের কথা ভাবার অবকাশ আছে নাকি!

রাহাত খানের গল্প শুনতে আমি যত আগ্রহী, মা তত নন। বই পড়া মেয়ের কাছে লেখক মানে বিশাল কিছু। না ছুঁতে পারা আকাশ। যাঁরা বই লেখেন, তাঁরা যে আর সবার মত মানুষ, তাঁরা যে আর মানুষের মত পেচ্ছাব পায়খানা করেন, তাঁদের নাকেও যে মাঝে মধ্যে সর্দি জমে, ছিৎ করলে থিকথিকে মোটা হলদে সর্দিও যে তাঁদের নাকের ফুটো দিয়ে কখনও বেরোতে পারে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। সিনেমার লোকদের বেলাতেও আমার একই বিশ্বাস। তাঁরা সুন্দর-শোভন জীবন যাপন করেন, ঝলমলে জগতে বাস করেন, ঝকঝকে গাড়িতে চড়েন, চোখ ঝলসানো জামা কাপড় পরেন, রাজা বাদশাহর মত তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আপেল আঙুর খান, তুলো-নরম বিছানায় ঘুমোন, গা থেকে ঘামের গন্ধ তো দূরের কথা, গায়ের গন্ধও নয়, বেরোয় গোলাপের সুঘ্রাণ, কখনও কোনও কাজে একবিন্দু ভুল করেন না, মিথ্যে বলেন না, কাউকে কষ্ট দেন না। অতিমানব যাকে বলে। বইয়ের যেমন পোকা আমি, সিনেমারও। চন্দনারও একই হাল। দাদাকে অনুরোধ আবদার করে সিনেমায় যেতে রাজি করিয়ে যাওয়ার পথে চন্দনাকেও উঠিয়ে নিই। হুজ্জত হাঙ্গামা করে মাঝে সাঝে সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা দাদা করেন বটে, কিন্তু ঘরে বসে সিনেমা পত্রিকার দেখা পাওয়া ছোটদার কারণেই আমার প্রথম হয়। ছোটদা পড়াশোনায় মন না বসা টই টই করে শহর ঘুরে বেড়ানো সাত কাজের কাজি অকাল-বিবাহিত তরুণ, প্রতি সপ্তাহে দুপুরের পর হাতে করে চিত্রালী নিয়ে আসেন বাড়িতে অবসরে তাঁর চিত্ত বিনোদনের তাগিদে। ছোটদার বিত্ত নেই কিন্তু চিত্ত আছে। ছোটদার চিত্তের বিনোদন সাঙ্গ হলেই আমার ঔৎসুক্য লম্ফ দিয়ে ওঠে। কি আছে লেখা ওই ছবিঅলা কাগজে? কোথাও কোনও মুদ্রিত অমুদ্রিত শব্দ দেখামাত্র পড়ে ফেলা মেয়ে আমি। ইশকুলে যাওয়ার পথে ছেলেছোকড়া না থাকলে সহস্রবার পড়া সাইনবোর্ড আবারও নতুন করে পড়তে পড়তে যাই। বাদাম কিনে বাদাম খেতে খেতে বাদামের ঠোঙার লেখা পড়ে ফেলি। তেঁতুলের আচার কিনলেও সে আচার চেটে খেয়ে আচারের তেলের তলে আবছা লেখাও উদ্ধার করে ছাড়ি। এমন যে পড়ুয়া, সে কেন চিত্রালী বলে চিত্ত বিনোদনের কাগজটি ফেলে রাখবে!ছোটদার সেই চিত্রালীতে চোখ বুলোতে বুলোতে অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যায় চোখ বুলোনো। অভ্যেস গড়াতে গড়াতে নেশায় গিয়ে নামে। অথবা ওঠে কে জানে! ছোটদা যদি চিত্রালী কেনায় অনিয়ম করেন, তবে আর কী!ইশকুলের রিক্সাভাড়া বাঁচিয়ে চিত্রালী কেনো, প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অবদি পড়ে ফেলো যা লেখা, নায়ক নায়িকার বাড়ির গাড়ির হাঁড়ির, প্রেমপ্রণয়বিরহের খবর সব নখদর্পণে নিয়ে রাতে ঘুমোতে যাও, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখো কোনও এক নায়কের সঙ্গে ঝিকমিক জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করা ঝিলের

ধারে ঝিরঝিরে হাওয়ায় তোমার দেখা হচ্ছে, সেই নায়ক তোমার উদ্দেশে নেচে নেচে গান গাইছে, গাছপালাআকাশবাতাসঝিলেরজলচাঁদেরআলো সবকিছুকে সাক্ষী রেখে বলছে যে তোমাকে ছাড়া সে বাঁচবে না। শুক্রবার চিত্রালী হাতে না পেলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না, মা অন্তত তাই বলেন। হজম নিয়ে আমি মোটেও উদ্বিগ্ন নই, তবে ভাত খাচ্ছি, চিত্রালী এল বাড়িতে, ব্যস ভাতের থালা *ঠেলে* উঠে গেলাম নয়ত এক হাত চিত্রালীতে, আরেক হাত ভাতে, ভাতের হাত অচল হতে থাকে, চিত্রালীর হাত সচল। চিত্রালী আমার ক্ষিধে কেন বাপ মা ভুলিয়ে দেওয়ার মত শক্তি রাখে। এমন শুরু হয়েছে চিত্রালীর পাঠকের পাতায় আমার একটি লেখা ছাপা হওয়ার পর। এমনি একটি লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্নরকণ্ঠী সাবিনা কেন অবহেলিত, সাবিনার কণ্ঠে মাধুর্য, রুনার কণ্ঠ কর্কশ ইত্যাদি। ওই আমার প্রথম কিছু ছাপা হওয়া কোনও পত্রিকায়। লেখা পাঠানোর আগে ছোটদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যদি চিত্রালীতে লেখা পাঠাই, তবে কি ছাপবে ওরা!ছোটদা *দুব্বোকা* বলে আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলেছেন যে চিত্রালীতে দিনে পাঁচ হাজার চিঠি পৌঁছয়, পাঁচ হাজারের মধ্যে চার হাজার বিরানব্বইটি চিঠি ওরা পড়া তো দূরের কথা, খোলেই না, ছুঁড়ে দেয় ময়লা ফেলার বাক্সে, আমি যদি কোনও চিঠি পাঠাই তা সোজা ওই ময়লার বাক্সেই যাবে। ছোটদা যদিও ঝাড়বাতি এক ফুৎকারে নিবিয়ে আমার আশার ঘরে হতাশার বস্তা বস্তা বালু ঢেলে দিয়েছেন, তবু আমি গোপনে লেখাটি পাঠিয়েছিলাম চিত্রালীর ঠিকানায়, ভাগ্য পরীক্ষা করা অনেকটা। দিব্যি পরের সপ্তাহে ছাপা হয়ে গেল, লেখাটির পাশে সাবিনা ইয়াসমিন আর রুনা লায়লার ছবি বসিয়ে। বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে গেল, হিপ হিপ হুররের তোড়ে ভাসতে থাকি। আমার নামখানি পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে, অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে। ছোটদা কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে থেকে তোতলালেন, *বাহ ত-তর লে-লেখা ছাপা হইয়া গে-গেল!* যেন আমি সাংঘাতিক অসম্ভব কিছু সম্ভব করে ফেলেছি! আমার ঠোঁটে সারাক্ষণই রাজ্য জয় করার হাসি মিছরির গায়ের লাল পিঁপড়ের মত লেগে থাকে। বাবাকে বাদ দিয়ে পত্রিকাটি সবার চোখের সামনে একাধিকবার উঁচু করি, এমনকি জরির মার চোখের সামনেও। জরির মা অবাক হয়ে পত্রিকাটির দিকে তাকিয়ে বলে, *এইডারে ত ঠোঙ্গার কাগজের মতই দেহা যায়।* অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর আরও একটি ঘটনা ঘটে, এটিও অবিশ্বাস্য। পরের সপ্তাহে দেখি আমার লেখার প্রশংসা করে এবং আপত্তি জানিয়ে বেশ কয়েকটি লেখা চিত্রালীতে ছাপা হয়েছে। আমার উৎসাহ তখন ভাত ফোটার মত টগবগ করে ফোটে। এরপর পাঠকের পাতায় তো বটেই চিঠিপত্র বিভাগেও লেখা পাঠানো শুরু করি। চিত্রালীর ধাঁচে শরীর সাজিয়ে পূর্বাণী নামের নতুন একটি পত্রিকা উঁকি দিচ্ছে শিল্প-সাহিত্য-বিনোদনের জগতে। পূর্বাণীকে হেলা করব, এমন হৃদয়হীন আমি নই। চিত্রালী পূর্বাণী, এ দুটো পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে আমার না হলেই নয়। চিত্রালী বা পূর্বাণীতে আমার লেখা থাকলে ঠোঁটে চিকন হাসি ঝুলিয়ে ছোটদা প্রতি সপ্তাহে বলেন *হ হইছে ছাপা,* আর না থাকলে *কি রে তর লেখা ত ছাপল না!* চন্দনাকে এই জগতটিতে টেনে নামাতে হয় না, আড়ম্বর দেখে ও নিজেই নামে। আমি যত না লিখি, আমাকে নিয়ে লোকে তার চেয়ে বেশি লেখে। রীতিমত আসরের অন্যতম একজন হয়ে উঠি। চিত্রালীতে চিঠির উত্তর যিনি দেন, যাঁকে সবাই উত্তরদা বলে ডাকে, রসের কলসে চুবিয়ে তাঁর উত্তর তোলেন। লিখতে লিখতে সেই কোনওদিন দেখা না হওয়া উত্তরদাকে আমার আপন দাদার মত মনে হতে থাকে। ইয়াসমিনের সঙ্গে পেনসিল নিয়ে ছোটখাট একটি চুলোচুলির যুদ্ধ হয়ে গেল, সবার আগে উত্তরদাকে চিঠি লিখে জানাই আজ আমার মন ভাল নেই। মনে ফুর্তি হলেও তাঁকে জানানো চাই সবার আগে। গোলপুকুর পাড়ের

আড্ডা থেকে ছোটদা একটি বাক্য তুলে একদিন অবকাশে বিতরণ করলেন *কুড়িটা বসন্ত পার হয়ে গেল, কোনও কোকিল তো দূরের কথা, একটা কাকও ডাকল না।* বাক্যটি লুফে নিয়ে উত্তরদাকে জানিয়ে দিই, ঘটনা এই। তিনি এমনই মর্মাহত শুনে যে ঢাকা শহরের সবগুলো কাককে ময়মনসিংহের দিকে ধাওয়া করলেন, যেন কা কা রব তুলে আমার বসন্তকে সার্থক করে এবং তিনি এবং তাঁর শহরবাসি কাকের যন্ত্রণা থেকে এই জনমের মত মুক্তি পান। ধুত্তোরি, আমি কি এমনই বুড়ি যে কুড়ি হব! ও তো মজা করতে! কেবলই মজা করার জন্য সে আসর নয়, যথেষ্ট গুরুগম্ভীর কথাবার্তাও হয়। লোকের সত্যিকার মান অভিমান, দুঃখ শোক, প্রেম বিরহ, কূটকচাল এমনকি সংসারের ঝুটঝামেলারও মীমাংসা হয় পত্রিকার পাতায়। পাঠকসংখ্যা এত ব্যাপক যে তখন দেশের প্রতিটি শহরে চিপাচস নামে চিত্রালী পাঠকপাঠিকা সমিতি খোলা শুরু হল। ময়মনসিংহে চিপাচসের কর্ণধার বনে বসলেন স্বয়ং ছোটদা। হতেই হবে, লেখক না হলেও পাঠক তো তিনি। পড়াশোনা লাটে উঠেছে, কাজ নেই কম্ম নেই, তাঁর পক্ষেই সম্ভব চিপাচস নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা পড়ে থাকা। চিপাচসের একটি সভাও একদিন হয়ে গেল টাউন হলের মাঠে। ঘন সবুজ মাঠের বটবৃক্ষ ছায়ায় বিকেলের সভাসমিতি জমে ওঠে বেশ। এক বটতলায় চিপাচস গড়ে তোলা হচ্ছে, অন্য বটতলায় ধাড়ি ধাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে বসেছে পুরোনো কচি কাঁচার মেলা। কাঁচারা এদ্দিনে পেকে লাল, কিন্তু কাঁচা নামটি খোয়াতে নারাজ। ইত্তেফাক পত্রিকার রোকনুজ্জামান খান যাঁকে কচি কাঁচারা দাদাভাই বলে ডাকে, পত্রিকায় কচিকাঁচার আসরও যেমন খুলেছেন, কচিকাঁচাদের সংগঠনও গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন শহরে। সংস্থা সমিতি সংগঠন পরিষদ এসবের কমতি নেই ময়মনসিংহ শহরটিতে। ছোটদার কাছেই খবর জোটে শহরের এখানে ওখানে নানা রকম আলোচনা অনুষ্ঠান হচ্ছে, সাহিত্য সভা হচ্ছে, নাচ গান নাটক হচ্ছে। শুনে ইচ্ছের জিভে লোল জমে। চিপাচসের সভা থেকে ফিরলে ছোটদাকে পই পই করে জিজ্ঞেস করি, *কে কে এসেছিল, দেখতে কেমন? কেউ কি কিছু বলল, কি বলল?* ছোটদা এক এক করে নাম বলেন, এক এক করে পরিচয়। এর ওর বলা দুএকটি শব্দ বা বাক্য উপরোধে ঢেঁকি গিলতে গিলতে শোনান। ময়মনসিংহের পদ্মরাগ মণি, চিত্রালীর আসরে নজর কাড়া মেয়ে, সগৌরবে চিপাচসের সভায় উপস্থিত থাকলেও আমার আর চন্দনার পক্ষে সম্ভব হয়নি পুরুষমানুষের ভিড়ভাট্টায় ছায়া সুনিবিড় শান্তির মাঠটির শীতল ঘাসে পা ফেলার অনুমতি পাওয়া। পুরুষ-আত্মীয় আর পুরুষ-শিক্ষক ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের আড্ডায় বা সভায় আমাদের অবাধ যাতায়াতের কোনও সুযোগ নেই, যতই আমরা যাওয়ার জন্য গোঁ ধরি না কেন।

চিত্রালীতে লেখা ছাপা হওয়ার পর থেকে আমার নামে অবকাশের ঠিকানায় বেশ কয়েকটি চিঠি আসে, পত্রমিতালির আবেদন দেশের বিভিন্ন শহর থেকে। এমন কখনও ঘটেনি, ডাকে কোনও চিঠি আমার জন্য আসেনি আত্মীয় স্বজনের বাইরের কারও, কোনও অচেনা কারও। চিঠি পেয়ে রীতিমত উত্তেজিত আমি। পত্রমিতালি ব্যাপারটি অভিনব একটি ব্যাপার, কেবল চিঠিতে দূরের মানুষদের চেনা, চিনতে চিনতে বন্ধু-মত আত্মীয়-মত হয়ে যাওয়া। ঢাকা থেকে জুয়েল, সিলেট থেকে সাব্বির, চট্টগ্রাম থেকে শান্তনু--পত্রমিতা হওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিই। মেয়েরা ছেলেরা চমৎকার বন্ধু হতে পারে এই বিশ্বাসটি আমার মনে একটু একটু করে বাসা বাঁধতে থাকে। আত্মীয়তার বাইরে সম্পর্কের যে ব্যাপারটি আমি দেখেছি, তা প্রেম, ছোটদা আর দাদার জীবনে হয়েছে, ঝুনুখালা রুনুখালার জীবনেও। প্রেমের উদ্দেশ্য একটিই, বিয়ে। দাদার পক্ষে শীলাকে সম্ভব হয়নি, ছোটদা সম্ভব করে ছেড়েছেন। এর বাইরে ছেলে মেয়েতে কোনও

রকম সম্পর্ক আমি আমার চেনা কারও মধ্যে দেখিনি। নাটক উপন্যাসে থাকে, সিনেমার গল্পে থাকে। আমি যে জগতে বাস করি, সে জগতে এর কোনও স্থান নেই। কিন্তু আমার কাছে আসা চিঠিগুলোই এই প্রথম অন্যরকম কিছু ঘটিয়ে ফেলে। পর পুরুষের চিঠি কিন্তু কোনও প্রেমের চিঠি নয়, কারও সঙ্গে আমার কোনও বিয়ের কথা হচ্ছে না, কিন্তু চিঠি। ডাকে আসা পত্রমিতাদের চিঠি বাড়িতে অনেকটা দল বেঁধে পড়া হয়। ডাকপিয়ন যার হাতে চিঠি দিয়ে যায়, সে ই পড়ে প্রথম। তারপর যার চিঠি তাকে দিতে গিয়ে চিঠির কথাগুলোও বলে দেয়, যে দেয়। জুয়েলের একটি চিঠি এল, ইয়াসমিন খামখোলা চিঠিটি আমার হাতে দিতে দিতে বলল, *জুয়েল জানতে চাইছে তোমার কার গান পছন্দ, হেমন্তর না কি মান্না দের।* সাব্বির পাতার পর পাতা ধর্মের কথা লেখে, ছোট ছোট ধর্মপুস্তিকাও উপহার পাঠায়, তার চিঠি এল তো ছোটদা আমার পড়ার আগে সে চিঠি পড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেন, *যা পড়, মুন্সি বেডার চিডি পড়।* চিঠি ব্যাপারটি যে ব্যক্তিগত, তা আমার তখনও বোঝা হয়নি। পত্রমিতালির ব্যাপারটি চন্দনাকে সংক্রামিত করেছে পরে, দাদাকেও। দাদা ঢাকার এক মেয়ে সুলতানার সঙ্গে পত্রমিতালি শুরু করলেন হঠাৎ। অদ্ভুত সুন্দর হাতের লেখা সুলতানার। চিঠি এলে দাদা আমাদের সবাইকে ডেকে সুলতানার হাতের লেখা দেখান। কেবল দেখান না, আমাদের সামনে বসিয়ে চিঠি পড়ে শোনান। পড়ে চিঠির উপর হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, *মেয়েডা নিশ্চয়ই দেখতে খুব সুন্দরী।* দাদার বিশ্বাস যার হাতের লেখা এত সুন্দর, যার চিঠির ভাষা এমন কাব্যময়, সে *প্যারাগন অব বিউটি* না হয়েই যায় না।

চন্দনা চিত্রালী আর পূর্বাণীর বাইরে আরও একটি পত্রিকা পড়তে শুরু করেছে, বিচিত্রা। বিচিত্রার পাঠকের পাতায় ওর একটি লেখাও ছাপা হয়েছে। পুলিশবাহিনীতে মহিলা নেওয়ার খবর শুনে চন্দনা মহিলা পুলিশের পোশাকের একটি প্রস্তাব দিয়েছে, বোরখা, বোরখার তলে থাকলে ধর্মও থাকল আর চোর ছ্যাঁচড়ের কাজ কর্ম চোখের ফুটো দিয়ে দেখাও গেল, পথচারি কারও পুলিশ বলে সন্দেহও হবে না। বিচিত্রা আবার ওর লেখাটির সঙ্গে এক বোরখাওয়ালির কার্টুন এঁকে দিয়েছে। ইশকুলে যাওয়ার রিক্সাভাড়া থেকে চার আনা ছ আনা বাঁচিয়ে চিত্রালী পূর্বাণী কিনি, বিচিত্রা কেনার পয়সা জোটানো সবসময় সম্ভব হয় না। দাদার কাছে হাত পেতে রাখি। পাতা হাত দেখতে দাদার আনন্দ হয়, কদাচিৎ ফেলেন ওতে কিছু। ও দিয়েই নেশাখোরের মত বিচিত্রা কিনে নিই। কিনে নেওয়া মানে ইয়াসমিনকে নয়ত জরির মাকে কালো ফটকের কাছে দাঁড় করিয়ে অথবা নিজেই দাঁড়িয়ে হকার দেখলেই ডেকে কেনা। হকার না এলে ইয়াসমিনকে গাঙ্গিনারপাড় মোড়ে পাঠিয়ে কিনে আনি। ডাঙ্গর হয়েছি বলে রাস্তায় একা হাঁটা আমার বারণ। ইয়াসমিনের জন্য নিষেধাজ্ঞা এখনও জারি হয়নি, তাই দুঃসময়ে ওরই ওপর ভরসা করতে হয় আমার। পত্রিকা কেনার খরচই তো শুধু নয়, পত্রিকার জন্য লেখা আর পত্রমিতাদের চিঠির উত্তর পাঠাতেও খরচা আছে। ছোটদার হাতে চিঠি দিলে ডাকটিকিটের পয়সাও গুনে গুনে দিতে হয়। দাদার মেজাজ বিগড়ে থাকলে অগত্যা *শিশিবোতলকাগজ।* অবকাশের গা ঘেঁসে তিনটি রাস্তা চলে গেছে তিন দিকে, একটি গোলপুকুরপাড়ের দিকে, আরেকটি দুর্গাবাড়ির দিকে, আরেকটি গেছে সেরপুকুর পাড়ের দিকে। এই তিন রাস্তায় সকাল থেকে শুরু করে সারাদিনই সুর করে ফেরিঅলা হেঁকে যায়। শাড়িকাপড়অলা, বাদামঅলা, চানাচুরঅলা, আচারঅলা, চুরিফিতাঅলা, আইসক্রিমঅলা, হাওয়াই মিঠাইঅলা, শাকসবজিঅলা, ঘিঅলা, মুরগিঅলা, কবুতরঅলা, হাঁসঅলা, কটকটিঅলা, মুড়িঅলা, শিশিবোতলকাগজঅলা। শিশি-বোতল-কাগজ ডাকটি শুনলেই হাতের কাছে যে

ই থাকে পাঠাই দৌড়ে ধরতে ব্যাটাকে। ব্যাটার মাথায় থাকে বড় ঝাঁকা। মাথা থেকে ঝাঁকা নামানোর আগে দরাদরি চলে, *কত? পত্রিকা তিন টাকা সের, বইখাতা দুইটাকা। কি কন তিন টাকা! চাইর টাকা কইরা নিলে কন। চাইর টাকা বেশি হইয়া যায়, সাড়ে তিন টাকাই দিয়েন। পাল্লা পাত্থর ঠিক আছে? দেইখা লইয়েন।* ঝাঁকা নামিয়ে শিশিবোতলকাগজঅলা বারান্দায় বসলে শোবার ঘরের খাটের তলে রাখা পুরোনো পত্রিকা মায়া কাটিয়ে নিয়ে এসে সামনে দিই। খুঁজে খুঁজে পুরোনো বইখাতাও নিয়ে আসি। বিক্রি করে দশ পনেরো টাকা হয়। দশপনেরোটাকাই নিজেকে রাজা বাদশাহ মনে করার শক্তি যোগায়। ছোটদাও বিক্রি করেন পত্রিকা, মাও করেন পুরোনো শিশিবোতল জমিয়ে রেখে, উঠোন ঝাঁট দিতে গিয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরোও ধুলো ঝেড়ে জমা করে রেখে। ভাঙা শিশি আর ছেঁড়া কাগজ থেকে যে দুপয়সা আয় করেন মা, তা তোশকের তলে রাখেন, অথবা আঁচলের কোণায় বেঁধে যা আমার ছোটদার আর ইয়াসমিনের বিষম হাহাকার থামাতে কোনও এক সময় কাজে লাগে। চন্দনাকে দারিদ্র এমন কষাঘাত করে না, পণ্ডিতপাড়ার একটি সবুজ টিনের ভাড়া বাড়িতে থেকেও চন্দনা দিব্যি পত্রিকার টাকা জুটিয়ে নেয় প্রতি সপ্তাহে। চন্দনা পুরুষভরা টাউনহল প্রাঙ্গনে না যেতে পারুক, কিন্তু বিস্ময়কর কাণ্ডও হঠাৎ হঠাৎ ঘটিয়ে ফেলতে পারে, খুব ভোরবেলা কাকপক্ষী জাগার আগে ও একদিন চলে এল অবকাশে ছোট ভাই সাজুর সাইকেল চালিয়ে। চন্দনাকে দেখে আমার হৃদয়ে খুশি উথলে ওঠে। বাড়ির সবাই হুড়মুড় করে বিছানা ছেড়ে হাঁ হয়ে চন্দনার দিকে তাকিয়ে রইল। কত বড় দুঃসাহসী হলে মেয়ে হয়ে সাইকেল নিয়ে শহরের রাস্তায় বের হতে পারে, সে ভোর হোক কি শুনশান মধ্যরাত হোক--তা অনুমান করে সবাই বিমূঢ় বিস্মিত। চন্দনাকে ভেতরঘরে বসিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে চালের রুটি আর মাংস গরম করে এনে মা ওকে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন। নাকে মুখে গুঁজে চন্দনাকে অবশ্য দৌড়োতে হল, রাস্তায় লোক বের হওয়ার আগেই বাড়ি পোঁছতে হবে ওকে। চন্দনা যখন সাইকেলে চড়ে ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়ায় চুল উড়িয়ে চলে যাচ্ছিল, কালো ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়ার দিকে আমি মুগ্ধ তাকিয়ে ছিলাম। পৃথিবীতে ওই দৃশ্যের চেয়ে চমৎকার আর কোনও দৃশ্য আমার দেখা হয়নি। যেন সাইকেলে চুল উড়িয়ে চলে যাওয়া মেয়েটি চন্দনা নয়, আমি। আমার ইচ্ছে করে চন্দনার মত সাহসে ভর করে সারা শহর ঘুরে বেড়াতে সাইকেলে।

এমন যখন মন, তখন *প্রায় বিকেলের* পাট চুকিয়ে *প্রতি বিকেলে* শামসুল হুদা আসেন আমাকে পড়াতে। হুদার মুখটি কালো ফটকের ধারে কাছে দেখলেই আমার হৃদকম্প শুরু হয়। চমৎকার বিকেল জুড়ে এখন অঙ্ক কর, পদার্থ বিদ্যা ঘাঁটো, রসায়নের পুকুরে হাবুডুবু খাও। ইয়াসমিনকে পড়াতে যখন রবীন্দ্রনাথ দাস আসেন, আমার একরকম আনন্দই হয়। রবীন্দ্রনাথ ইয়াসমিনকে পড়ান পনেরো মিনিট, গল্প করেন পঁয়তাল্লিশ মিনিট। গল্প একা ইয়াসমিনের সঙ্গে করেন না, আমার সঙ্গেও। টাঙ্গাইলের কালিগঞ্জ গ্রামে তাঁর কন্যা কৃষ্ণা বড় হচ্ছে, পুত্র গৌতম বড় হচ্ছে। তিনি ময়মনসিংহ শহরের ছোট বাজারে থাকা খাওয়ার বিনিময়ে নির্মল বসাকের ছেলে গোবিন্দ বসাককে পড়ান। নিজে তিনি শহরতলির এক প্রাইমারি ইশকুলের প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষকের চাকরি করে শহরে টিউশনি করে কালে ভদ্রে তিনি সময় পান দেশের বাড়ি যেতে। ওই কালে ভদ্রেই তিনি খরচার টাকা দিয়ে আসেন বাড়িতে, পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন থেকেও আসেন। যতদিন শহরে থাকেন, স্ত্রী পুত্র কন্যার কথাই নিরবধি ভাবেন। আমাদের পাশে বসিয়ে প্রতিদিনই পুত্র কন্যার গল্প করেন, শুনতে শুনতে আমাদের জানা হয়ে যায় কৃষ্ণা

দেখতে কেমন, কৃষ্ণা কি খেতে, কি করতে, কি পরতে পছন্দ করে। গৌতম ফুটবল পছন্দ করে নাকি ক্রিকেট, পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছে, সব। অবশ্য হঠাৎ বাবা বাড়ি ঢুকলে আমি সরে আসি, রবীন্দ্রনাথ দাসও সচকিত হয়ে বইয়ে মাথা গোঁজেন। ইয়াসমিনের মাথার ঘিলুর পরিমাণ বাবা যখন জানতে চান, দাস মশাই সহাস্য বদনে যা বলেন তা হল, ঘিলু সাধারণের চেয়ে অধিক, তবে পড়াশোনায় মনোযোগটিই সাধারণের চেয়ে স্বল্প। বাবা বলেন, *মারবেন। না মারলে ঠিক হবে না।* বাবা নিজের হাতে তোশকের তল থেকে এনে দাসমশাইএর হাতে সন্ধি বেত দিয়ে যান। আমার গৃহশিক্ষককেও হাতের কাছে পেলে বলেন, আমাকে যেন পিটিয়ে লম্বা করেন। বাবার এই মত, না পেটালে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না। বাবার উপর্যুপরি অনুরোধের কারণে সম্ভবত শামসুল হুদা আমার পিঠে শক্ত শক্ত চড় কষাতে দ্বিধা করেন না। শামসুল হুদা শিক্ষক হিসেবে ভাল, বিদ্যাময়ী ইশকুলের অংকের শিক্ষক তিনি। বাড়িতে আমাকে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো পড়ান। বাকি বিষয়গুলোর জন্য বিদ্যাময়ীর দুই শিক্ষক জ্ঞানেন্দ্রমোহন বিশ্বাস আর প্রদীপ কুমার পালকে রাখা হয়েছে। প্রদীপ কুমার পালের বাঁ হাতে পাঁচটির জায়গায় ছ টি আঙুল। তাঁর সামনে বসে পড়তে গেলে বইখাতা থেকে বারবারই আমার চোখ চলে যায় ওই বাড়তি আঙুলটিতে। তিনি আবার কবিতা লেখেন, প্রতিদিনই পড়া শেষে *আমার একটি কবিতা শোনো* বলে শার্টের বুক পকেট থেকে কবিতা লেখা কাগজ বের করে পড়ে কবিতা কেমন লাগল না লাগল জিজ্ঞেস না করে হঠাৎ উঠে চলে যান। গৃহশিক্ষক হিসেবে জ্ঞানেন্দ্রমোহন অবকাশে টিকে গেলেও প্রদীপ কুমার টেকেন না। যে শিক্ষক আমাকে যথেষ্ট কিল চড় ঘুসি লাগাচ্ছেন না, সেই শিক্ষক, বাবার ধারণা, শিক্ষক হিসেবে ভাল নন। শিক্ষক নিয়োগ করতে বাবার যেমন অল্প সময় লাগে, শিক্ষক বিদেয় করতেও। পঞ্চম শ্রেণীতে তিন বিষয়ে লাল দাগ পাওয়ার পর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠা যখন সম্ভব হয়নি ইয়াসমিনের, বাবা নিজে ওকে পড়াতে শুরু করেন। ইয়াসমিন ইশকুল থেকে ফিরে আরোগ্য বিতানে চলে যায় বই খাতা নিয়ে। ওখানে বসেই ও দেখে বেতন আনতে বাবার কাছে গৃহশিক্ষকদের ধর্না দেওয়া। বাবা ওঁদের দুতিনঘন্টা খামোকা বসিয়ে রেখে কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা হাতে দেন। মাসের বেতন পঞ্চাশ টাকা, সেটি বাবার কাছ থেকে কোনও গৃহশিক্ষকের পক্ষেই একবারে পাওয়া সম্ভব হয় না। সবসময় তিন চার মাসের টাকা বাকি রাখতে পছন্দ করেন বাবা। শুনে আমার লজ্জা হয় খুব, আমি আমার লজ্জা নিয়ে নুয়ে থাকি। বাবার বরাবরই বড় উন্নত শির, তিলার্ধ লজ্জারও তাকত নেই তাঁর তকতকে তল্লাট তিলমাত্র তছনছ করে। তিনি প্রায়ই আমাকে জানিয়ে দিচ্ছেন, পরীক্ষায় পাঁচটি *লেটার* নিয়ে তারকাখচিত নম্বর না পেয়ে পাশ না করলে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। সারা জীবন আমাকে রাস্তায় রাস্তায় ফুটো থালা হাতে নিয়ে ভিক্ষে করতে হবে।

মেট্রিক পরীক্ষা হাতের নাগালে তো বটেই, একেবারে নাকের ডগায় যখন এসে বসে, আমার আর উপায় থাকে না স্থির হওয়া ছাড়া। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আঠারো ঘন্টা আমি পড়ার টেবিলে। হঠাৎই আমি বাড়ির বহুমূল্যবান মানুষ হয়ে উঠি। হাঁটতে গেলে সবাই সরে দাঁড়িয়ে জায়গা দেয়, পেচ্ছাব পায়খানায় গেলে মা নিজে বদনি ভরে পানি রেখে আসেন। গোসল করার আগেও বালতিতে পানি তোলার কথা বলতে হয় না, তোলাই থাকে। রাত জেগে পড়া তৈরি করতে হচ্ছে, ভাল ভাল খাবার রান্না হচ্ছে আমার জন্য। মা মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছেন। ফল মূল নিয়ে একটু পর পর বাড়ি আসছেন বাবা, পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে পিন পতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করে দিন রাত।

বাড়ির লোকেরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলে, যেন কোনও শব্দ আমার মগ্নতা নষ্ট না করে। পাড়ায় পুজোর গান শুরু হলে বাবা নিজে গিয়ে পুজো কমিটির চেয়ারম্যানকে বলে আসেন, গান যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে, মেয়ের মেট্রিক পরীক্ষা। মেট্রিক পরীক্ষার মূল্য বুঝে দিলীপ ভৌমিকও পুজোর গান বন্ধ করে দেন। নিতান্তই বাজাতে হলে উল্টোদিকে মাইক ঘুরিয়ে বাজান। আমার টেবিলে খোলা বই খোলা খাতার পাশে খোলা বিস্কুটের কৌটো, পড়তে পড়তে ক্ষিধে লাগলেই যেন খাই। মা গরম দুধ দিয়ে যান দুবেলা, বলেন, *দুধ খেলে ব্রেন ভাল থাকে, পড়া মনে থাকে।* এ বাড়ির একটি মেয়ে মেট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় খবর, এর চেয়ে জরুরি খবর কিছু নেই আর। দিন যত কাছে আসে তত মনে হয় আজরাইল আসছে জান কবচ করতে। আমার বুক কাঁপে। গা হাত পা কাঁপে। রাত দুটো তিনটেয় আমাকে ঘুম থেকে তুলে বাবা বলেন, *চোক্ষে পানি দিয়া পড়তে বস।* আমি চোখে পানি ছিটিয়ে বসি। বাবা বলেন, *পানিতে কাম না হইলে সরিষার তেল দেও।*

প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা, বাংলার জন্য আমার কোনওরকম ভয় হয়নি কখনও আগে, কিন্তু পরীক্ষার দিন মনে হতে থাকে আমার পাশ হবে না। মা প্রতিদিন সকালে ডিম ভাজা খেতে দেন, বলেন ডিম খাওয়া ভাল। কিন্তু পরীক্ষার দিন ডিম খাওয়া চলবে না, ডিম খেলে ডিম জোটে পরীক্ষায়, সুতরাং সাবধান। কলাও চলবে না। কচুও না। পরীক্ষায় কলা পাওয়া কচু পাওয়া রসগোল্লা পাওয়ার মতই। যদিও কলা কচু রসগোল্লা আমার প্রিয় খাবার, কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন এগুলো আমাকে পরিত্যাগ করতেই হয়। আমার পরীক্ষা, অথচ বাবা ছটফট করেন আমার চেয়ে বেশি, আগের রাতে ঘুমোননি একফোঁটা। দেখে মনে হয়, বাবারই আজ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। বারবার জানতে চাইছেন বইএর আগাগোড়া আমি মুখস্ত করেছি কি না। বাড়ি থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে রাধাসুন্দরী ইশকুল। আমি পথ চিনি, কিন্তু আমাকে একা যেতে দেওয়া হবে না। বাবা আমাকে রাধাসুন্দরীতে নিজে নিয়ে যাবেন রিক্সা দিয়ে, পরীক্ষা শেষ হলে নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন। সকালে মা যখন চুল বেঁধে দিচ্ছিলেন আমার, বাবাই তখন সেটি দিলেন মার হাতে,কাগজটি। কাগজটি ভাঁজ করে সুতো দিয়ে বেঁধে আমার চুলে লাগিয়ে দিতে হবে। কাগজে আরবিতে কিছু লেখা, লেখাটি মাথার ওপর থাকলে বাবাকে কে একজন বলেছেন পড়া মনে থাকে। আমি যেন কিছু ভুলে না যাই পরীক্ষার খাতায় লিখতে গিয়ে, তাই এই কাগজ, কাগজে পড়া মনে থাকার দোয়া। আমি ছিটকে সরে যাই, পড়া ভুলে যাওয়ার কোনও রোগ আমার নেই যে চুলে দোয়া দরুদ লাগিয়ে আমাকে পরীক্ষায় বসতে হবে! মা প্রতিদিনই আমার মাথায় ঠাণ্ডা নারকেল তেল দিচ্ছেন মাথা ঠাণ্ডা থাকার জন্য। সেই তেলে-মাথার তেলে-চুলে দুটো কলাবেণী করে দেন মা, এখন সুতো বাঁধা কাগজটি কেবল চুলের সঙ্গে গিঁট দিয়ে দিলেই হয়। লজ্জায় চোখ ফেটে জল বেরোচ্ছে আমার, তবু বাবা আমাকে ধরে বেঁধে কাগজের পুঁটলিটি আমার চুলে লাগিয়ে দিলেন। দেখে ছোটদা হেসেই বাঁচেন না, ফিকফিক ফিকফিক। ইয়াসমিনও ফিকফিক। ছোটদা বললেন, *তর তো মেট্রিক পাশ করা হইব না, তাবিজের গুণে যদি পাশ করস।*

হাতে একটি দুটি নয়, চারটে নতুন ঝরনা কলম দিলেন বাবা, আর নতুন একটি পেলিকেন কালির বোতল। লিখতে লিখতে কলমের কালি শেষ হয়ে গেলে কালি ভরে যেন লিখি। পরীক্ষার্থীর মন মেজাজ বুঝে সবাই চলছিল, পরীক্ষার্থী হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না, কিন্তু তাবিজের ব্যাপারে আমার কোনও না খাটেনি। সেই তাবিজ তেলে মাথায় খলসে মাছের মত ভেসে ওঠে। চন্দনাও রাধাসুন্দরী ইশকুলে পরীক্ষা দিয়েছে। শেষ ঘন্টা

পড়ার পর বারান্দায় বেরোতেই দেখি ও দাঁড়িয়ে আছে, ওর খাতা জমা দেওয়া আগেই হয়ে গেছে। পরীক্ষা কেমন হয়েছে ভাল না মন্দ কিছুই না জিজ্ঞেস করে ও জানায়, বিচিত্রায় ওর একটি লেখা ছাপা হয়েছে। এরপরই চক্ষু চড়কগাছ, *কি রে মাথায় এইডা কি বানছস?*

ধরণী দ্বিধা হও, এ উচ্চারণ জীবনে দ্বিতীয়বারের মত করেছি, ধরণী দ্বিধা হয়নি।

পাশ করলে এমনি পাশ করাম, তাবিজের কারণে পাশ করতাম না। বাড়ি ফিরে চুলের তাবিজ একটানে খুলে ফেলে দিয়ে বলি।

মা বললেন, *পড়াডা মনে থাকব।*

পড়া আমার এমনি মনে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বলি। ভেতরে ফোঁপানো কান্না।

বাবা ধমকে বলেন, *এইডা মাথায় আছে বইলা মনে থাকে, নাইলে থাকত না।*

আমি অবাক তাকাই, দোয়া দরুদ তাবিজ কবজে বিশ্বাস করা লোকটিকে আমার বিশ্বাস হয় না যে আমার বাবা।

প্রতিটি পরীক্ষার দিন আমার মাথায় ওই তাবিজ লাগিয়ে দেওয়া হয়, আমার কোনও বাধাই টেকে না। মাথা ভরা লজ্জা নিয়ে আমাকে মাথা নত করে প্রতিদিনই যেতে হয় রাধাসুন্দরী ইশকুলে। প্রতিদিনই আমাকে সতর্ক থাকতে হয়, মাথার লজ্জাটি আবার দাঁত কপাটি মেলে প্রকাশিত না হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই বারবার মাথায় হাত দিয়ে লজ্জাটি চুলের আড়ালে ঢাকতে হয়। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে তো বটেই উত্তরপত্র থেকেও বারবার মন মাথায় গিয়ে ওঠে। মাথা আমার জন্য বিশাল একটি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মাথার লজ্জায় আমি মাথা নত করে পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরি। ইচ্ছে করলে খুলে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু আবার ভয়ও হয়, যদি সত্যিই স্মৃতিশক্তি লোপ পায় আমার! যদি পাঁচ আর সাত যোগ করলে যে বারো হয়, এই সহজ জিনিসটি ভুলে যাই অঙ্ক পরীক্ষার দিন! যদি ইংরেজি পরীক্ষার দিন গরুর রচনা লিখতে গিয়ে প্রথম বাক্যটিই আর মনে না করতে পারি, *দ্যা কাউ ইজ এ ডমেস্টিক অ্যানিম্যাল !*

অবকাশে ছোটদার সস্ত্রীক প্রবেশ আমার পরীক্ষার আগেই ঘটেছে। ঘটেছে মার কারণে। পুত্রশোকে যখন তিনি *যারপরনাই* কাতর,বাবার কাছে আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে অতঃপর নিজেই হাশেমমামাকে পাঠিয়ে ছোটদা আর তাঁর বউকে ইসলামপুরের কোন এক গ্রামের কোনও এক কুড়েঘর থেকে শহরে আনলেন। কিন্তু শহরে এসে পৌঁছোনোর মানে এই নয় যে ওরা অবকাশে ঢোকার কোনওরকম অনুমতি পাবে। বাবা সোজা বলে দিলেন, কস্মিনকালেও যেন অবকাশমুখো না হয় ওরা। নানিকে বলে কয়ে নানির উঠোনে কুয়োতলার পাশে একটি ঘর, যে ঘরটি এককালে আমাদের খাবার ঘর ছিল, পয়পরিষ্কার করে একটি চৌকি পেতে দেওয়া হল ওদের থাকার জন্য। ছোটদা বউ নিয়ে ওখানে থাকতে শুরু করার পর বাবার আদেশে নানির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া অন্তত আমার আর ইয়াসমিনের জন্য বন্ধ হয়। মা কিন্তু নিয়মিত ছোটদার সংসারে যেতে লাগলেন। মা তো আর খালি হাতে যান না, পুত্রধনের জন্য চাল ডাল আনাজপাতি অবকাশ থেকে যা যোগাড় করতে পারেন নিয়ে যান। বাবা যখন বাড়ি থাকেন না, ছোটদা ঢুঁ মারেন অবকাশে। ঢুঁ অবশ্য অহেতুক মারেন না, প্রয়োজন হলেই। বাবার নিষ্ঠুরতার কথা মা ভাবেন আর বলেন, *এই মানুষটা মানুষ নাকি পাথর?* মার অক্লান্ত সাধ্য সাধনার পর বাবাকে খানিক নরম করে মা একদিন অন্তত এইটুকু রাজি করালেন যে ছোটদা বউ নিয়ে অবকাশে ঢুকবেন কিন্তু কোণের একটি ছোট ঘরে ওরা বাস করবেন,সারা বাড়িতে অবাধ পদচারণার কোনও অধিকার ওদের থাকবে না। বিয়ে যখন করেইছো, বউ যখন আর ছাড়বেই না মনস্থ করেছো, যদিও এ বয়সে বিয়ে করার কোনও যুক্তি নেই, পেটালে গাধাও মানুষ হয়, তুমি হওনি--এখন দেখ লেখাপড়া শেষ করে ভবিষ্যতে ডাল ভাতের যোগাড় করার ব্যবস্থা করতে পারো কি না, এরকম ভেবেই বাবার রাজি হওয়া। মা ওঁদের জন্য দাদার ঘরের পেছনে একটি ছোট ঘর যে ঘরে মা নিজে থাকতেন গুছিয়ে দিলেন, কাপড় চোপড় রাখার একটি আলনা দাদার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া দরজাটি বন্ধ করে দরজার সামনে রাখলেন। ছোটদার পুরোনো খাটটি দাদার ঘর থেকে এনে ছোটঘরে পাতা হল। ছোটদা বললেন আয়নার টেবিলটি তাঁর ঘরে যে করেই হোক নিতে হবে। মার বিয়ের সময় খাট পালঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে নানা এই টেবিলটি মাকে উপহার দিয়েছিলেন। কাঠের ফুল পাতার নকশাঅলা বহিরাবরণ, অন্তস্তলের আয়নাটি সামনে পেছনে দোল খায় নাড়লে, দুপাশে ছোট দুটো তাক, দুটো ড্রয়ার--সিংহি সিংহি এই চারপেয়ে টেবিলটি বাবার ঘর থেকে নিজে টেনে ছোটঘরে দিয়ে এলেন মা। আঁচলে মুছে দিলেন আয়নায় জমা ধুলো। গীতা টেবিলের সামনে বসে ঘন্টা খরচ করে সেজে ছোটদার সঙ্গে প্রায় বিকেলে বাইরে যান। ওঁদের বাইরে যাওয়ার দিকে আমি তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে থাকি। এরকম আমিও যদি যেতে পারতাম!

যদিও বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ছোটদা আর তাঁর বউএর মুখদর্শন তিনি করবেন না, কিন্তু ওরা অবকাশে পাকাপাকি বসত শুরু করার ঠিক দুদিন পর সকালে গোসল সেরে সার্টপ্যান্টজুতোটাই পরে, সর্ষের তেলে চোবানো মাথাভর্তি কোঁকড়া চুলগুলো আঁচড়ে বৈঠকঘরে পায়ের ওপর পা তুলে বসলেন, বসে ডাকলেন আমাকে। বাবা ডাকছেন, এর অর্থ বাড়ির যেখানেই থাকো না তুমি, যে কাজই কর না, পড়ি কি মরি ছুটে আসতেই হবে। বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, *ওই দুইটারে ডাক।* ওই দুইটা কোন দুইটা? এই প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল আমার, করিনি। বাবা যেহেতু আদেশ দিয়েছেন, আমাকে বুঝে নিতে হবে *ওই দুইটা* বাড়ির কোন *দুইটা।* কারণ এ আমার, কেবল আমার কেন, বাড়ির সবারই জানতে হবে বাড়ির *কোন দুইটা* কে এ সময় বাবা ডাকতে পারেন। ছোটদার ঘরে ঢুকে চাপা স্বরে বললাম, *যাও, ডাক পড়ছে, একজনের না কিন্তু, দুইজনের।* ছোটদার মুখ মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে উঠল, ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে

গীতাকে ,গীতা বিমূঢ় বসা বিছানায়, সঙ্গে আসার অনুরোধ করতে করতে একবার দরজার কাছে, আবার ফিরে বিছানার ধারে, হাঁটছিলেন। *'নাসরিন'*--বিকট শব্দে দ্বিতীয় ডাকটি এল বৈঠক ঘর থেকে, এর অর্থ হল *ওই দুইটার* এত দেরি হচ্ছে কেন!অবশেষে, দুজন যখন বড় হিম্মতের সঙ্গে নিজেদের হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সাক্ষাৎ হুতাশনের সামনে দাঁড় করালো, দরজার ফাঁকে চোখ কান নাক সব পেতে থাকলাম। গীতা উবু হয়ে বাবার পা ছুঁয়ে *কদমবুসি* করল। হিন্দু মেয়ের কদমবুসি, প্রণামের মতই, গীতার জন্য নতুন কিছু নয়। বাবা কেশে গলা পরিষ্কার করে, যদিও পরিষ্কারই ছিল গলা, এমন কোনও জমা কফ ছিল না গলায়, বললেন ছোটদার দিকে যতটা সম্ভব চোখ রঙিন করা সম্ভব,করে, *জীবন কিরম বুঝতাছ? বিয়া করছ,লেখাপড়া চাঙ্গে উঠছে, গঞ্জে গিয়া সংসার করছ, একশ টাকা মাস চাকরি করছ, কী চাকরিডা করছ শুনি? কুলিগিরি। ঠিক না? কুলিগিরি ছাড়া তুমার ওই বিদ্যায় আর কি পাইবা! নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারছ। তাতে কার কি ক্ষতি হইছে? আমার কিছু হইছে? আমার কিচ্ছু হয় নাই। হইছে তুমার। পাগলেও নিজের বুঝ বুঝে, তুমি বুঝ নাই। পাগলের কাছে গিয়া দেখ তার টাকা যদি নিতে চাস, দিবে? দিবে না। তার খাবার যদি নিতে চাস, দিবে? দিবে না।*

বাবা খানিক থেমে, বুঝি না অপেক্ষা করে কি না মূর্তিমান *দুইটার* মুখ থেকে নিদেনপক্ষে কোনও শব্দের, বলেন, *আনন্দমোহনে ভর্তি হইয়া আয়, ইন্টারমিডিয়েটে তো থার্ড ডিভিশন পাইছস, চান্স তো পাইবি না কিছুতেই, তবু দেখ চেষ্টা কইরা। যাওয়ার সময় আমার চেম্বার থেইকা টাকা লইয়া যা।* বাবা এবার গীতার দিকে চোখ নাক দাঁত সব কুঞ্চিত করে বলেন, *কি ভাইবা এই কাজটা করছ? নিজের ভবিষ্যতের কথা তুমিও ভাব নাই?* গীতার চোখদুটো দেখা যাচ্ছে না যেহেতু মেঝের দিকে চোখ, চুলের ডালি দৃশ্যমান নয় যেহেতু আঁচলে আবৃত মাথা, ঠোঁট এমনিতেই গীতার ছোট, ছোট মুখের ছোট ঠোঁট আরও ছোট হয়ে আছে। এবারও খানিক থেমে, কফ নেই তবু ঝেড়ে,বাবা বলেন *গীতা, আমার মেয়ে দুইটার লেখাপড়া আছে, ওদের সাথে আড্ডা দিতে যেন না দেখি। কথা বুঝছ?* গীতা মাথা নাড়ে, বুঝেছে সে। বাবা সশব্দে উঠে আমার ঘরের লাগোয়া ওদের দরজাটি সশব্দে বন্ধ করে ভেতর বারান্দার দিকের দরজা সশব্দে খুলে যাওয়া আসা এ দরজা দিয়েই করার আদেশ দিয়ে সশব্দেই বেরিয়ে গেলেন। আদেশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই ছোটদার। তিনি বাংলা অনার্সে আনন্দমোহনে ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাবা তাঁর বাংলায় ভর্তি হওয়ার ঘটনাটি শুনে ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝুলিয়ে সাতদিন কাটালেন আর বলে

বেড়ালেন *বাংলায় পইড়া কয়ডা বেডা মানুষ হইছে? বাংলা বিশারদেরা বড়জোর বুদ্ধি কইরা গরুর গাড়ি চালাইতে পারে, আর কিছু না।* ওই বলাটুকুই, অনেকটা হাল ছেড়ে দেওয়া বাবা ছোটদাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বিজ্ঞানের কোনও বিষয়ে ভর্তি করিয়ে আনেন না। ছোটদা নিরাপদে তাঁর বিবাহিত জীবন কাটাতে থাকেন অবকাশে। মাঝে মাঝে হাতে একটি খাতা আর পকেটে একটি ঝরনা কলম ঢুকিয়ে কলেজে যান, বিমর্ষ মুখে বাড়ি ফেরেন।

বাবার কড়া নিষেধের পরও গীতার সঙ্গে আমার আর ইয়াসমিনের সখ্য বেড়ে ওঠে। বড়রা বাড়িতে কেউ না থাকলে সাধারণত আমিই হতাম *দুষ্টের শিরোমণি লংকার রাজা।* মাঠে খেলতে নামা, ছাদে উঠে বিশ্ব দেখা, বিশ্ব বলতে রাস্তার বারো রকম লোক আর প্রতিবেশিদের ঘরবাড়িউঠোন, তুলসীতলা, সন্ধেধূপ, মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন গাওয়া, ভাড়া করা ব্যান্ড পার্টির সামনে এক প্যাঁচে রঙিন শাড়ি পরে কাঁসার লোটা হাতে মিছিল করে ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাওয়া, গঙ্গার জল মনে করে ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা জল দিয়ে বাড়ির পবিত্র উৎসব সারা দেখা, নয়ত *অপাঠ্য* পড়া। গীতা আমার *রাজত্ব* এক তুড়িতে দখল করে আমাকে ছাড়িয়ে মাড়িয়ে তরতর করে উঠে যায় কাঁঠাল গাছে, ডালে বসে কাঁঠালের মুচি খায়, আমি নিচ থেকে বাঁশের কঞ্চির আগায় কাপড়ের পুঁটলিতে নুন আর লংকাগুঁড়ো বেঁধে ওর নাগালে দিই। আতা গাছে লাফিয়ে ওঠে। বেল গাছেও। *সবরি গাছে উঠতে পারবা? পারমু না মানে?* শাড়ি পরেই সবরি গাছ বেয়ে একেবারে মগডালে গিয়ে বসে, নাগালের পেয়ারাগুলো মগডালে বসেই খায়। পাড়ার লোক রাস্তা থেকে গাছে ওঠা বাড়ির নতুন বউকে দেখে। গীতার দস্যিপনা আমাদের হাঁ করা মুগ্ধতা দেয়। আমরা ওর পেছনে লেজের মত লেগে থাকি। গাছে চড়ার কোনও বিদ্যে আমার ছিল না, গীতার কাছে হাতেখড়ি হয়। গীতার কাছে হাতেখড়ি হয় আরও অনেক কিছুর। হাতেখড়ি, পায়েখড়ি, বুকেখড়ি, পেটেখড়ি, পিঠেখড়ি--খড়ির শেষ নেই। উঠোনের খড়িগুলো গীতার প্রেরণায় ছুঁড়ে আর ছিঁড়েই ফুরোতে লাগল। বৃষ্টি হলে আমাদের পুরোনো অভ্যেস, উঠোনে মাঠে দৌড়ে দৌড়ে বৃষ্টিতে ভেজা, সিঁড়ি বেয়ে ছাদে গিয়ে ভিজে ভিজে রাজ্যির নাচ নাচা। গীতা বৃষ্টিতে দৌড়ে আর নেচে তুষ্ট হয় না, কাকভেজা হয়ে চৌচালা টিনের ঘরের মাথায় উঠে বসে থাকে। আমি বারান্দায় বসে দেখছিলাম যেদিন পড়ল ও, কালো ফটকের শব্দ শুনে তড়িঘড়ি নামতে গিয়ে পড়ল তো পড়ল একেবারে ভাঙা ইট ফেলা উঠোনে, ভেজা চাল থেকে পা পিছলে, বোঁটা ছিঁড়ে যাওয়া পাকা চাল কুমড়োর মত গড়িয়ে। ইয়াসমিন চালের মাথায়,গীতার পড়ে যাওয়া দেখে হাসব না কাঁদব বুঝে উঠতে না পারা আমি বড় ঘরের বারান্দায়, ফ্যাকাসে মুখে ভিজে চুপসে থাকা শাড়ি গায়ে উঠোনে বসে থাকা গীতা আর এর মধ্যে মা এসে ভিজে বোরখা খুলে বারান্দার দড়িতে ঝুলিয়ে খোয়ার ওপর বসে থাকা বাড়ির বউকে দেখে অবাক, *আফরোজা তুমি ওইখানে কি কর!* গীতা বলল, *না মা কিছু করি না, ইয়াসমিন চালে উঠছে তো, এইখানে বইসা বইসা ওরে দেখতাছি।*

ইয়াসমিন চালে উঠছে?

হ ওইযে দেখেন বইসা রইছে। কত কইলাম উইঠ না, পইড়া যাইবা, শুনল না।

ইয়াসমিন মার ধমক খেয়ে নেমে আসে চালের চুড়ো থেকে আর ভাজা মাছটি উল্টে খেতে না জানা, অত উঁচু চাল থেকে পড়ে হাড় না ভাঙা, সামান্য আঁচড় না লাগা গীতা গোসলখানায় যায় শাড়ি পাল্টাতে। মা খিচুড়ি রেঁধে গীতার পাতে ঢেলে দুপুরবেলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, *মেয়ে দুইটারে তুমি দেইখা রাখতাছ বইলা আমি নিশ্চিন্তে একটু নওমহল গিয়া কোরান হাদিস শুনতে পারি।* গীতা বলল, *মা আপনে কোনও চিন্তা কইরেন*

না, আমি এদেরে ঠিক দেইখা রাখতাছি, খেয়াল রাখি কোনও দুষ্টামি যেন না করে। গীতার পাতে দুটোর জায়গায় তিনটে মাংসের টুকরো দিলেন মা, পাতের কিনারে আমের আচার। গীতা খেতে খেতে বলল, *মাংসটা দারুন রানছেন মা। আর আচার যে কেমনে এত ভাল বানান আপনে!* মা আরও মাংস, আরও আচার ওর পাতে ঢেলে বিষম উৎসাহে বলে যান, *তুমারে আচার বানানোটা শিখাইয়া দিব। একেবারে সোজা, আমটা ফালি ফালি কইরা কাইটা বয়মের মধ্যে সরিষার তেল, কিছু রসুনের কোয়া, আর কিছু শুকনা মরিচ দিয়া ডুবাইয়া রাখবা। মাঝে মাঝে রোদ্রে দিবা বয়াম।* গীতা বিস্ফারিত চোখ করে বলে *তাই নাকি!* যে কোনও কিছুতেই গীতা আকাশ থেকে পড়ে। ছোটদার *বাচুপানকা দোস্ত* খোকন এলেন ঢাকা থেকে, বৈঠক ঘরে বসে আছেন, খবরটি দিলে চোখ কপালে তুলে বলল সে, *খোকনভাই আইছে? কখন? কেমনে? হায় হায় কামাল তো নাই।* খোকন এমন আচমকা এসে উপস্থিত হয়েছে যে গীতার বিস্ময়ের সীমা নেই, অথচ বৈঠকঘরে গিয়ে মিষ্টি হেসে খোকনকে বলল *আরে আপনের জন্যই তো অপেক্ষা করতেছিলাম, কামাল বলে গেছে আপনেরে বসতে, এই তো কাছেই গেছে,এখনি ফিরবে।* গীতাকে দুধের বাচ্চার মত দেখতেও লাগে, শুনতেও লাগে। কালো মুখটিতে বড় বড় চোখ, এই চোখকে কেউ কেউ বলবে পটল চেরা চোখ, মাথায় অতিঘন চুলের বোঝা, টিয়ার ঠোঁটের মত ধারালো নাক, আফ্রোদিতির ঠোঁটের মত ঠোঁট, অত দূর না গিয়ে লংকা চেরা ঠোঁটই বা নয় কেন, ইঁদুরের দাঁতের মত দাঁত, সারসের গলার মত সরু গলা। ছোট ছোট হাত, ছোট ছোট পা, ছোট শরীর। কালো মেয়েকে লোকে সুন্দরী বলে না, কিন্তু গীতাকে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী বলে আমাদের মনে হতে থাকে।

পাড়ায় পুজোর ঢাকের বাজনা শুরু হয়ে গেলে *দুধের বাচ্চাকে* ফিসফিস করে বলি,*আজকে দূর্গা পুজা।* আকাশ থেকে পড়ে গীতা, *তাই নাকি? জানি না তো!* জিভে চুকচুক শব্দ করে ওর জন্য দুঃখ করি, মুসলমানের ঘরে বিয়ে হওয়াতে ওর আর পুজোর আনন্দ করা হচ্ছে না। আমরা যেমন বারো মাসের তেরো পুজোতেই পাড়ার মণ্ডপ দেখে বেড়াতে পারি, অষ্টমি আর রথের মেলায় চিনির খেলনা আর বিন্নি ধানের খই কিনতে পারি--হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়াতে গীতার পক্ষে এসব আর সম্ভব হবে না জেনে দুঃখ আমাদের শেষ হয় না, ছোটদা ছুটে আসেন বলতে বলতে *দেরি হয়ে গেল গীতা, তাড়াতাড়ি শাড়িটা পইরা ফালাও।*

কোন শাড়িটা? গীতা অবাক হয়ে বলে।

কালকে যে কিইন্যা আনলাম, সেইটা।

কালকে কিইন্যা আনলা? কোনটা?

আরে তোমার পূজার শাড়ি!

পূজার শাড়ি মানে? এইসব কি বল!

আমার উপস্থিতি আড়চোখে লক্ষ্য করে ছোটদা অপ্রস্তুত হেসে বলেন, *ওই যে একটা নীল শাড়ি আছে না, তুমার মা যে দিছিল, সেইটা পর।*

সেইটা বল। সেইটা না বইলা কেন বল যে তুমি কিন্যা আনছ? তোমার কি টাকা পয়সা আছে নাকি যে কিনবা! এক পয়সার মুরদ নাই আবার বড় বড় কথা!

তাড়াতাড়ি কর। দেরি হইয়া গেল।

কিসের দেরি? কই যাইবা?

বাবুয়ার বাসায় আমাদের দাওয়াত আছে, ভুইলা গেছ?

গীতাকে নীলাম্বরি পরী সাজিয়ে নিয়ে ছোটদা বেরোন। এরকম প্রায়ই বেরোন।

পুরোনো বন্ধুর বাড়ি, চিপাচস-সদস্যদের বাড়ি, গোলপুকুর পাড়ে আড্ডা দিতে গিয়ে নতুন গজিয়ে ওঠা বন্ধুদের বাড়ি,কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরেই সময় কাটান তা নয়, নানান অনুষ্ঠানেও আনন্দ করে আসেন, গানের অনুষ্ঠান, নাচের অনুষ্ঠান, নাটক, সিনেমা, পারলে যাত্রাও বাদ দেন না। দেখে আমার চোখজিভ সব সচল সজল। ছোটদা নিজের গিটারখানা বিক্রি করে দিয়েছেন, শহরের ভাল গিটারবাজিয়ে হিসেবে যে নাম ছিল, সে নাম যে তুলোর মত হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে, সে দিকে তিনি বড় একটা ফিরে তাকান না। বউ নিয়ে তিনি বাপের হোটেলে থাকছেন খাচ্ছেন, কিন্তু থাকা খাওয়ার বাইরে আরও একটি জীবন আছে, সেই জীবনের জন্য হন্যে হয়ে একটি চাকরির খোঁজ করেন তিনি।

পুজোর পর ইশকুল থেকে ফিরে আমাকে গোপনে একটি খবর দেয় ইয়াসমিন, তার ইস্কুলের এক বান্ধবী দেখেছে পুজোর দিন পিওনপাড়ায় গীতার বাড়িতে সন্ধেবেলা ঢুকছে গীতা, পেছনে ছোটদা। ছোটদাকে ঘটনা জানালে তিনি আমাকে সাবধান করে দেন যেন কাক পক্ষী না জানে এই খবর। কাক পক্ষী জানে নি। কাক পক্ষী এও জানে না যে বাবা গোসলখানায় ঢুকলে প্রায়ই সকালে বেড়াল-পায়ে বাবার ঘরে ঢুকে যেন ও ঘরে কিছু একটা ফেলে এসেছেন ফেরত আনতে যাচ্ছেন অথবা বাবার সঙ্গে এক্ষুণি তাঁর জরুরি বৈঠক আছে এমন ত্রস্ত অথচ শান্ত ভাব মুখে, আলনায় ঝুলে থাকা প্যান্টের পকেট থেকে আলগোছে তুলে নিয়ে আসেন দশ টাকা হলে দশ টাকা, কুড়ি টাকা হলে কুড়ি টাকা, পঞ্চাশে হাত দিতেও হাত কাঁপে না ছোটদার। মা দেখেন এসব, দেখেও না দেখার ভান করেন। ছোটদার বুকের পাটা দেখে ভয়ে বুক কাঁপে আমার। ধরা পড়লে ঘটনা কি দাঁড়াবে তা অনুমান করতে যে সাহস প্রয়োজন হয়, তা আমার বা ইয়াসমিনের কারওরই নেই।

গেছো গীতা কেবল গাছেই নয়, গাছের তলেও লাফায়। নাচ শেখাবে বলে পড়ার টেবিল থেকে আমাকে আর ইয়াসমিনকে উঠিয়ে নিয়ে সারা বাড়িতে তা তা থৈ থৈ করে বেড়ায়। আমি আর ইয়াসমিন খুব অচিরে বড় নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠছি এই বিশ্বাস আমার বা ইয়াসমিনের না থাকলেও গীতার আছে। বাবার বাড়ি আসার শব্দ পেলে নাচ রেখে দৌড়ে পড়ি কি মরি পড়ার টেবিলে গিয়ে বসি, বাবার গায়ে হাওয়া লাগে ছুটোছুটির। প্রায় রাতেই ঘুমোতে যাবার আগে আমাকে ডাকেন, ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করেন, *খাওয়া দাওয়া হইছে?*

দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে উত্তর দিই, *হইছে।*

পড়ালেখা হইছে?

হইছে।

খেলাধুলা হইছে?

প্রায় ঠোঁটের কাছে *হইছে* শব্দটি এসে যাচ্ছিল, গিলে অন্য এক শব্দজোড়া ব্যবহার করি, *হয় নাই।*

আড্ডা মারা হইছে?

হয় নাই।

বাবা বিস্ময় চোখে তাকিয়ে বলেন, *কেন হয় নাই?*

শব্দজোড়া দূরে থাক, কোনও শব্দই তখন আমার মুখে নেই।

কেন হয় নাই আড্ডা মারা? বাড়িতে তো এখন সঙ্গী সাথীর অভাব নাই।

আমি দরজার পর্দা আঙুলে পেঁচাতে থাকি।

বাবা বলেন *আড্ডা মারা তো ভাল, পড়ালেখা করতে হয় না, পরীক্ষায় পাশ করতে হয় না। দেখ না তোমার ছোটদা, কত সুন্দর জীবন তার! লেখাপড়ার মত বাজে কাজ তার আর করতে হয় না।*

আঙুল থেকে দরজার পর্দা ছাড়াতে থাকি।

কাল সকালে যখন আমি বাইরে যাব, তখন তুমি গপ্প মারতে বসবা, বুঝলা! আমি বাড়ি ফিরা পর্যন্ত গপ্প মারতেই থাকবা, বুঝলা কি কইলাম?

সাধারণত বাবা যখন কিছু বোঝান, মাথা নেড়ে বলতে হয় *বুঝলাম।* কিন্তু এখন *বুঝলাম* বলাটা যে বিপজ্জনক সে বেশ বুঝি।

বাবার ভয় গীতার সঙ্গে সখ্য পেতে এই বুঝি আমাদের লেখাপড়ার বারোটা বাজল। আমার ঘরের লাগায়ো ছোটদার ঘরের দরজায় তিনি তালা লাগিয়ে দিয়েছেন, যাওয়া আসা *ওরা* বারান্দার দরজা দিয়ে করছে কিন্তু ছোটদার দোস্ত খোকন যে রাতে থেকে গেলেন বাড়িতে, শুলেন ছোটদার বিছানায়, অগত্যা গীতাকে শুতে হল আমার বিছানায়, এক রাতের ব্যাপার এ আর এমন কি, *এমন কি* আমাদের কাছে হলেও বাবার কাছে নয়, তিনি গভীর রাতে পানি খেতে উঠে এ ঘর ও ঘর পায়চারি করতে গিয়ে গীতাকে আমার বিছানায় আবিষ্কার করে চিবিয়ে চেঁচিয়ে হুংকারে গর্জনে নিঝুম রাতকে গনগনে দুপুর বানিয়ে ছাড়লেন। ছোটদা আর খোকনের সঙ্গে এক বিছানায় বাকি রাত কাটাতে হল গীতার। বাবা গীতাকে আমাদের আশপাশ থেকে দূর দূর করে তাড়ালেও তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ দূর হয় না, বরং বাড়ে। তার মুখে হাসি ফোটাতে পড়াশোনা মাচায় তুলে তার সেবায় সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকি। জুতো চাইলে জুতো এগিয়ে দিই, চিরুনি চাইলে চিরুনি,পানি চাইলে পানি, গীতা পানির গেলাস ভেঙে ফেললে মাকে বলি আমার হাত লেগে গেলাস ভেঙেছে। গীতাকে আরও দোষ থেকে মুক্ত করি, বিকেলবেলা আমাদের ছাদে ডেকে নিয়ে বিজয়দিবসের মোমবাতি জ্বেলে রেলিংএ, রেলিংএর ওপর দিব্যি সার্কাসের মেয়ের মত হেঁটে যায়, একটু হেলে পড়লেই পড়ে গিয়ে মাথা নিশ্চিত থেতলে যাবে জেনেও সে হাঁটে, আমাদেরও উসকানি দেয় হাঁটতে। রেলিংএ লম্বা হয়ে শুয়ে ব্লাউজের ভেতর হাত দিয়ে এক শলা সিগারেট আর একটি ম্যাচবাক্স বের করে আমাদের অবাক করে দিয়ে সিগারেটে আগুন জ্বেলে টান দেয়, রাস্তার মানুষেরা হাঁ হয়ে দেখে এসব। গীতা বলে, *দেখুক, আমার কী! আমার ইচ্ছা আমি সিগারেট খাইয়াম। কার কী কওয়ার আছে!* এ বাড়িতে কেউ সিগারেট ফোঁকে না, কোনও পুরুষ আত্মীয়কেই আমি সিগারেট ফুঁকতে দেখিনি, সেখানে মেয়ে হয়ে রাস্তার আর পাড়ার লোককে দেখিয়ে বাড়ির নতুন বউ ছাদের রেলিংএ শুয়ে সিগারেট ফুঁকবে, বাবার কানে গেলে সর্বনাশ তো হবেই, সর্বনাশের সীমাছাড়া রূপটির কথা ভেবে আমার হিম হয়ে আসে শরীর। গীতা বলে, *আরে কিচ্ছু হইব না, টান দেও ত!* আমার কাঁপা কণ্ঠ, *বাবা জানলে মাইরা ফেলব!* গীতা পরোয়া করে না বাবা জানলে কী হবে না হবে সেসবকে। কি করে সিগারেটে টান দিতে হয় শিখিয়ে দেয়। মুখগহ্বরে ধোঁয়া ঢুকিয়েই ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিই নীলাকাশ ঢেকে দেওয়া ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘের দিকে। হিম শরীরে অল্প অল্প করে পুলকি উষ্ণতা। অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করি নিষিদ্ধ জিনিসে। *সিগারেট কোত্থেকা পাইছ?* গীতা বলে, *পাইছি। পাইছি,* এর বেশি কিছু সে বলে না,ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে রাখে শুধু। সিগারেটের আর রহস্যের ধোঁয়ায় গীতাকে দেবী দুর্গার মত মনে হয়। ছাদ থেকে নেমে কুলকুচা করে ধোঁয়ার গন্ধ দূর করে ধোয়া মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকি। সংসারের এসব ছোট ছোট ঘটনাদুর্ঘটনায় গীতাকেই যে শুধু বাঁচিয়ে দিই, তা নয়, ছোটদাকেও বাঁচাই। ছোটদা

অভাবের তাড়নায় আনন্দমোহন কলেজের দিকে যাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দুশ টাকা বেতনে সাপ্তাহিক বাংলার দর্পণ পত্রিকায় সাংবাদিকের কাজ নিয়েছেন, এতেও তাঁর অভাব ঘোচে না। প্রতিদিনই নাকি সুরে খাকি স্বরে বলতে থাকেন *দে না পাঁচটা টাকা দে না, পাঁচ টাকা নাই, তাইলে চারটাকা দে, চারটাকা তো নাই, ঠিক আছে তিন টাকাই দে।* তিন টাকা না হলে দুটাকাই। দুটাকা না হলে একটাকা। তাও না হলে আটআনা, চারআনাও ছোটদা ছাড়েন না। চিলের ছোঁ দিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। দাদার ওষুধের বাক্স থেকেও গোপনে ওষুধ সরিয়ে নিয়ে যান ছোটদা। আমরা তা জেনেও, পেটের ভেতর গুঁড়োক্রিমির মত লালন করি ঘটনা। দাদা সকালে গোসলখানায় যান, দাদার গোসলখানায় যাওয়া মানে পেচ্ছাব পায়খানা দাড়িকামানো গোসল সব সেরে আসতে ঘন্টা পার হওয়া, নিশ্চিন্তে দাদার পকেট থেকে তখন আলগোছে টাকা তুলে নেন ছোটদা। বাবার পকেট থেকে টাকা নিতে গেলে বড় একটি ঝুঁকি নেওয়া হয়, কারণ বাবা এত দ্রুত গোসল সারেন যে হুট করে কখন বেরিয়ে আসবেন ঠিক নেই, আর গোসলখানার দরজার মুখেই বাবার ঘর। সে তুলনায় দাদার ঘর অনেকটাই দূরে, বারান্দা পেরোও, দুটো ঘর পেরোও তারপর। ছোটদার প্রয়োজন কিছুতে ফুরোয় না। বেলগাছের তল দিয়ে বেলের গাছপাতা মাটিপাতাও যেন না জানতে পারে এমন নিঃশব্দে হেঁটে পাঞ্জাবি বা ঢিলে শার্টের তলে নয়ত বড় ঠোঙায় নয়ত বাজারের থলেয় ওষুধ নিয়ে সন্তর্পণে কালো ফটক খুলে বেরিয়ে যান ছোটদা। প্রথম প্রথম বলতেন ওষুধ তাঁর নিজের দরকার, তাঁর শরীরে অসুখের সীমা নেই। কিন্তু বাড়ির বাইরে ওষুধ নেওয়া দেখে যখন প্রশ্ন করি, *কই নিয়া যাও ওষুধ?* ছোটদার উদাসীন উত্তর *বন্ধু বান্ধবরা চায়। ভিটামিন চায়।*

ভিটামিনে বেশিদিন পড়ে থাকেন না ছোটদা। কাশির ওষুধ, জ্বরের ওষুধ, এমনকি কঠিন কঠিন রোগের কঠিন কঠিন ওষুধ সরাতে শুরু করলেন। কেন? বন্ধুরা চাইছে। কেন? বন্ধুরা ওষুধ চাইছে, কারও কাশি কারও জ্বর কারও পেটের ব্যারাম, কারও আলসার। কিন্তু বন্ধুদের কি অসুখ লেগেই থাকে বছরভর!

আমার কি একটা দুইটা বন্ধু নাকি!

তা ঠিক, ছোটদার বন্ধুর সীমা নেই। বাড়িতে ছোটদার খোঁজে সাংবাদিক বন্ধু,কবি বন্ধু, নাট্যকার বন্ধু, চিপাচস বন্ধু,ছাত্র, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, বেকার--নানা রকম বন্ধু আসেন। গোঁড়ালি থেকে মাথা, মাথা থেকেও চার পাঁচ হাত উঁচু বয়সের বন্ধু। ওঁদের পর্দার আড়াল থেকে দেখি, দেখি আর ইচ্ছে করে ছোটদার মত আমিও ওঁদের সঙ্গে আডড া দিই। আমার সে সাহস শক্তি সুযোগ কোনওটাই যে নেই, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই অবশ্য।

তোমার বন্ধুদের এত অসুখ হয়। দেখলে ত মনে হয় দিব্যি সুস্থ।

খালি কি বন্ধুদেরই। বন্ধুর বাবার অসুখ, মার অসুখ। ওদের কি কম আত্মীয় স্বজন !

কি কর ছোটদা ওষুধ নিয়া, সত্যি কইরা কও তো! একদিন বলি।

ছোটদা রহস্যের রসে ঠোঁট ডুবিয়ে হাসেন।

কেন, কি হইছে?

কিছু হয় নাই। কিন্তু আগে কি কর কও, নাইলে দাদার কাছে কিন্তু কইয়া দিয়াম।

আমার হুমকিতে কাজ হয়। ছোটদা বলেন *বেচি রে বেচি।*

ছোটদার কথায় কাজ হয়, আমি গলে যাই মায়ায়। নিজেই দাদার বাক্স থেকে দামি ওষুধ দুএকটি সরিয়ে ছোটদার হাতে দিই, ইয়াসমিনও দেয়। দাদা বাড়ি থেকে যেই না বেরোন, ছোটদা সঙ্গে সঙ্গে ও ঘরে ঢুকে ওষুধ তো আছেই, টাকা পয়সা দাদা কোথাও

ভুলে রেখে গেলেন কি না খোঁজেন, শেষে আলনা থেকে একটি শার্ট গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরোন। দাদার অগুনতি শার্ট, টের পান না। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেলে কালো ফটকের মুখে বা রাস্তায়, দাদা মুখ কালো করে বলেন *কী রে কামাল আমার শার্ট পরছস কেন?*

ছোটদা বলেন, *পরছিলাম, খুইলা থইয়ামনে, চিন্তা কইর না।*

একদিন, *আইচ্ছা আমার টেট্রনের নীল শার্টটা কইরে?* প্যান্টের ওপর গেঞ্জি গায়ে মোজা পায়ে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে বোকা বোকা চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে বলতে থাকেন দাদা।

কী জানি, মা ধুইতে নিছে বোধহয়!

আরে না, ওইটা ধোয়া ইস্ত্রি করা ছিল।

তাইলে জানিনা।

শাদা শার্টটাই বা কই! পকেটে যে শীলা ফুলের কাজ কইরা দিছিল!

সেইটা না তুমি কালকে পরলা!

আরে না, কালকে ত আমি লাল শার্ট পরছি।

মারে জিগাস কর, আমি জানি না।

দাদা মাকে জিজ্ঞেস করেন, মাও জানেন না।

ক্যাটকেঁটে লাল *কুচরিমুচরি* একটি শার্ট পরে মন খারাপ করে বাইরে চলে যান দাদা। তাঁর ব্যস্ততা অনেক, ফাইসন্স কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভ তিনি, আজ টাঙ্গাইল যাচ্ছেন, পরশু নেত্রকোণা, নেত্রকোণা থেকে ফিরেই আবার জামালপুর। দাদার ফর্সা মুখ রোদে ঘুরে ঘুরে কালো হয়ে যেতে থাকে। দাদার জন্যও আমার মায়া হয়।

ছোটদাকে বলি, *ওষুধ বেইচা অনেক টাকা পাও, তাইলে আমার থেইকা আর দুই তিন টাকা নেও কেন!*

কি যে কস! বেশি টাকা পাই না তো! এইগুলা তো স্যাম্পল, ডাক্তারদেরে দেওয়ার জন্য, দেখস না লেখা আছে বিক্রয়ের জন্য নহে! যা দাম, তার অর্ধেকের চেয়ে কম দাম দেয় দোকানদাররা। ছোটদা বুঝিয়ে বলেন।

ওষুধের থলে হাতে করে প্রায়ই বেলগাছের তল দিয়ে ছোটদার অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাও লক্ষ্য করেন, বাবাকে কোমল কণ্ঠে বলেন, *কামালরে একটা ভাল চাকরি টাকরির ব্যবস্থা কইরা দেওয়া যায় না!*

বাবারও কোমল কণ্ঠ, *হ, দিতে পারি। কুলিগিরি করার একটা ব্যবস্থা কইরা দিতে পারি।*

এইসব কি কন!

কেন? কুলিগিরি তো ভাল চাকরি। কুলিগিরি কইরা মাইনষে থাকতাছে না? ও করুক। কুলিদের তো লেখাপড়া না করলেও চলে। বস্তাডা মাথায় উঠাইয়া হাঁটলেই হয়, ফিজিক্স জানতে হয় না, কেমেস্ট্রি জানতে হয় না।

কোমল থেকে দৌড়ে কণ্ঠ রোষের দিকে যাচ্ছে, লক্ষ করে সরে যান মা।

গীতা নতুন নতুন শাড়ি পরে বাইরে যাচ্ছে ছোটদার সঙ্গে, নতুন নতুন সাজার জিনিস ওর। মা আড়ে আড়ে এসব দেখে ছোটদাকে বলেন *তা কামাল, তর ত একটা ভাল প্যান্ট নাই, শার্টও নাই, নোমানের শার্টগুলা পরস, তুই নিজের লাইগা শার্ট প্যান্ট কিনতেও ত পারস! ঘরের মধ্যে ছিঁড়া লুঙ্গি পইরা থাকস। নিজেরে শাতাস ক্যা?*

টাকা আছে নাকি কিনব? ছোটদা মলিন মুখ করে বলেন।

টাকা নাই কেন? চাকরি করস না?

যে টাকা পাই চাকরি কইরা, রিক্সাভাড়াও হয় না।

বউএর লাইগা ত ঠিকই কিন্যা আনস।

গীতার লাইগা? গীতারে ত আমি কিচ্ছু দিতে পারি না। ওর যা আছে, ওর নিজের। ওর মা দিছে।

শুন বাবা কামাল। তোমার কাছে আমরা কিছু চাই না। তুমি তোমার বউরে কিন্যা দিবা তা ত ভাল কথা। বউরে তুমি দিবা না তো কে দিব! আমার কথা হইল, নিজেরেও তুমি কিছু দিও। তোমার একজোড়া ভাল সেন্ডেল নাই। সেন্ডেল কিনো।

পইসা দেন, কিনি। ছোটদা বলেন।

অনেকক্ষণ নৈঃশব্দের পুকুরে একা একা সাঁতার কেটে পাড়ে ওঠেন মা।

আমার টাকা থাকলে তো তোমারে দিতামই। আমারে টাকা পয়সা কে দেয়! মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বলতে বলতে,*লেখাপড়া যদি করতে পারতাম, তাইলে তো একটা চাকরি করতে পারতাম। আমার কি কারও ওপর নির্ভর করতে হইত!*

এরপর দু সপ্তাহ ধরে বাবার কাছে হাত পেতে পেতে টাকা নিয়ে মা ছোটদার জন্য একটি লুঙ্গি, দুটি শার্ট আর একজোড়া বাটার সেন্ডেল কিনে আনলেন। ছোটদার অভাব তবু শেষ হয় না। তিনি সকাল বিকাল ওষুধ সরাতে থাকেন।

আচ্ছা শরাফ আইছিল এর মধ্যে? দাদা দুই ভুরুর মাঝখানে ঢেউ তুলে জিজ্ঞেস করেন।

কি জানি জানি না।

নিশ্চয় আইছিল।

কেমনে বুঝলা আইছিল?

আমার ওষুধ আমি গুইনা কম পাইতাছি।

শরাফ মামা নিছে নাকি?

ও একটা আস্তা চোর। ও নিছে নিশ্চয়।

শুনে চৌচির কণ্ঠে মা বলেন,*দেখ নোমান, না জাইনা না শুইনা মাইনষেরে হুদাই দোষ দিস না। শরাফ এই বাড়িতে আজকে তিনমাস ধইরা আসেনা। আর ওরে যে চোর কস, ও কি চুরি করছে তর?*

আরে জানেন না মা, ও আমার কাছ থেইকা পঞ্চাশ টাকা কর্জ নিছিল, কইল পরদিনই নাকি দিয়া দিব। পাঁচমাস হইয়া গেল, দেওনের নামগন্ধ নাই।

মা অন্য ঘরে চলে যান। অন্য ঘরে একা বসে থাকেন। অন্য ঘরের জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসে, মা সেই হু হু হাওয়ার সঙ্গে মনে মনে কী কথা বলেন কে জানে। মার কষ্টের কথা আমরা কেউ বুঝি না, দাদার সঙ্গে তাল দিয়ে বলি *শরাফমামা আসলেই একটা চোর, সেইদিন সে আইল, আমি তারে ঘরে রাইখা একটু বাইরে গেলাম, ফিব্যা আইসা দেখি আমার স্বর্ণের দুলটা নাই, রাখছিলাম টেবিলের উপরে।*

তাইলে তর ওই দুল শরাফই নিছে। দাদা নিশ্চিন্ত।

দাদা অবশ্য তাঁর ওষুধ থেকে থেকে নেই হয়ে যাওয়ার রহস্য উদ্ধার করেন পরে। ছোটদার ঘরে কখনও কোনও কারণে গেলে আলনাতেও চোখ পড়ে তাঁর। নিজের ছ সাতটা শার্ট ছোটদার আলনা থেকে তুলে নিয়ে বেরোন ঘর থেকে, বারান্দায় বেরিয়ে মাকে দেখিয়ে বলেন *কামালের ঘর সিজ কইরা এইগুলা পাইলাম।*

এসব দেখে গীতা ছোটদাকে বলে, *মইরা যাইতে পারো না? এই জীবন নিয়া বাঁইচা থাকার তোমার কি দরকার! নিজের মুরাদ থাকলে শার্ট কিন্যা লও। না পারলে ল্যাংটা থাকো।* শুনে ছোটদা কালো মাড়ি বের করে হাসেন। গীতা চাপা স্বরে বলে, *হাসো? লজ্জা শরম কিছু কি তোমার আছে? বাড়ির সবাই তোমারে অপমান করতাছে, তাতেও তোমার শিক্ষা হয় না! আমারে কেন এই নরকের মধ্যে আইন্যা ফেলছ?*

গীতার মেজাজমর্জি বাড়ির কারও সাধ্য নেই বোঝে। এই নেচে বেড়াচ্ছে, হেসে বেড়াচ্ছে, এই আবার মুখ গোমড়া করে বসে আছে। কখনও কখনও দরজার ছিটকিনি এঁটে সারাদিন ঘরে শুয়ে থাকে। খাবার সময় হলে মা বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকেন *ও আফরোজা, আফরোজা ! উঠ। খাইবা না? না খাইলে শরীর খারাপ হইব। উঠ আফরোজা, খাইয়া লও।* গীতা মিত্র ওরফে আফরোজা কামাল মুখ বিষ করে অনেক ডাকার পর উঠে খেয়ে দেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। অনেকদিন পর মা তাঁর দেরিতে দুধ ছাড়া, দেরিতে কথা বলা, প্রায়-তোতলা প্রায়-কোলের ছেলেকে কাছে পেয়েছেন, ছেলে আর ছেলে-বউএর খাবার নিজে হাতে রেঁধে বেড়ে ঘরে আনেন, ঘরেই ওদের, প্রায়-মুখে তুলে খাওয়ান। আধেক হিন্দু আধেক মুসলমান বউটির মন ভাল করার জন্য মা আদাজল খেয়ে লাগেন যেহেতু বউটির মন ভাল থাকলেই ছোটদার মন ভাল থাকে। অথবা গীতার মন পেতেই মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যেহেতু বাড়ির আর কারও মন পাওয়া দুরূহ ব্যাপার, অথবা বাবার হম্বিতম্বিতে অনভ্যস্ত গীতাকে মা আদরে আহলাদে সহনীয় করাতে চান এ বাড়ি। বাড়ি ফিরে ছোটদা, কোনওদিকে না ফিরে, সোজা ছোট ঘরটিতে ঢুকে যান। ভেজানো দরজা ঠেলে হঠাৎ ঢুকলেই দেখি গীতা দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, ছোটদা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর ধ্যানমগ্ন ঋষির মত জপ করছেন, *গীতা গীতা গীতা ও গীতা।*

ছোটদার হাতে লিস্টি পড়তে থাকে, গীতার ব্লাউজ লাগবে, শাড়ি লাগবে, লিপস্টিক লাগবে, রুজ পাউডার লাগবে। শুকনো মুখ ছোটদার আরও শুকনো লাগে, শুকিয়ে ঠোঁটের চামড়া ফেটে যেতে থাকে। বাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে কথা কোনও প্রয়োজন ছাড়া বলেন না। অন্যমন।

ছোটদার চাকরি করার খবর পেয়ে বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন--*নিজের কপাল নিজে খাইলে কার কী বলার থাকে।* না,কারও কিছু বলার থাকে না। ছোটদা নিজের কপাল রীতিমত চিবিয়ে খাবার ব্যবস্থা করলেন। সাংবাদিক হয়ে গেছেন, হাতে একটি ডায়রি নিয়ে সকালে বেরিয়ে যান, দুপুরে ফিরে খেয়ে দেয়ে আবার বেরোন, সন্ধেয় ফেরেন বউ এর জন্য কোনওদিন শাড়ি, কোনওদিন ব্লাউজ, কোনওদিন রুজপাউডারলিপস্টিক নিয়ে। ছোটদা বাড়ি এলেই মা রান্নাঘরে চলে যান খাবার আনতে। যেদিন ফিরতে ছোটদার বিকেল হল, টেবিলে খাবার সাজিয়ে বসে আছেন মা, ছোটদা ঘর থেকে শুকনো মুখে বেরিয়ে খেতে আসেন,না একলা নয়, গীতার কোমর জড়িয়ে টেনে আনছেন সঙ্গে খেতে। গীতা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলছে, *আমার আবার খাওয়া কি! আমার না খাইলেও চলবে।* অথচ গীতা আমাদের সঙ্গে খেয়ে লম্বা ঘুম দিয়েছিল, কিন্তু মুখ এমন শুকনো যে ছোটদা ধারণা করেন তাঁর সুন্দরী বউখানা না খেয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছে। গীতা খাবে না বলে ছোটদাও খাবেন না। মা বললেন *ও যখন কইতাছে, ওর সাথে আরেকবার খাও আফরোজা।*

না। না। আমি খাব না।

ছোটদা গীতাকে টেনে এনে কাছে বসিয়ে ভাত তরকারি মেখে গীতার মুখে তুলে দেন। গীতা মুখে ভাত নিয়ে নাক কপাল কুঁচকে রাখে, যেন বিষ দেওয়া হয়েছে মুখে। মুখের বিষ মুখেই রেখে দেয় সে, চিবোয় না, গেলে না। ছোটদা গীতার মাথায় পিঠে

হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন *সোনা আমার, মানিক আমার, অল্প একটু খাও। তুমি না খাইলে আমি খাব না।*

গীতা বিষ গিলল না, ছোটদাও খেলেন না। উঠে গেলেন। মা রান্নাঘর থেকে প্রায় দৌড়ে এসে উঠলেন খাবার ঘরে, হাতে বাটি, বাটিতে মাংস, *কী রে আমি আরও তরকারি লইয়া আইলাম তুই উঠলি কেন? খাইয়া ল। সারাদিন খাস নাই, কামাল!*

ছোটদা মুখ ছোট করে বললেন *না মা, আমি খাইছি বাইরে।*

মা উদাস বসে থাকেন খাবার টেবিলে সামনে ছোটদার না খাওয়া ভাত তরকারি নিয়ে।

মার চোখের পুকুরে ছোট ছোট ঢেউ।

ছোটদাকে উঠোনের রোদে পিঁড়ি পেতে বসিয়ে গা মেজে এই সেদিন গোসল করিয়ে দিতেন মা। এখন ছোটদা নিজেই নিজের গোসল সারেন। মা প্রায়ই বলেন *কি রে তর গোড়ালিতে এত ময়লা জমছে কেন, মাজস না নাকি?* ছোটদার চুল সরিয়ে কানের পেছন, ঘাড়ে, গলায় আঙুল ডলে মা বলেন, *কড় পইড়া গেছে।* মা নাক কুঁচকে উঠোনে থুতু ফেলেন। ছোটদা না গোড়ালির দিকে, না মার দিকে ফিরে তাকান। তিনি তাকিয়ে থাকেন গীতার দিকে। গীতার মুখটি বিষণ্ন লাগছে কেন! গীতার মুখটি কিছুক্ষণ আগে বিষণ্ন ছিল না, গীতা ইয়াসমিনের সঙ্গে লুডু খেলছিল আর ডিমের পুডিং খাচ্ছিল। অনেকদিন নাকি পুডিং খায়নি ও, অনুযোগ করাতে মা সাততাড়াতাড়ি বানিয়ে দিয়েছেন। পুডিংএর পর চেয়েছিল খেঁজুরের গুড় দিয়ে বানানো পায়েশ খেতে, মা তাও দিয়েছেন। দিয়ে মা ফুঁকনি ফুঁকে খড়ি নেই শুকনো পাতায় রান্না করেছেন, খেতে দিয়েছেন টেবিলে, ছোটদা গীতাকে কোলের ওপর বসিয়ে ঠোঁটে চুমু খাচ্ছেন, চুমু খাচ্ছেন আর বলছেন *মনডা বেজার কেন, কি হইছে?* গীতা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কোনও উত্তর দেয় না। ছোটদা বাড়ি এলেই গীতার হাসি মুখটি হঠাৎ কান্না কান্না হয়ে থাকে। মুখটি এমন যেন সারাদিন খায়নি, জল অবদি পান করেনি, যেন বাড়ির মানুষগুলো গীতাকে সারাদিন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন ছোটদা, গীতার শুকনো মুখ ভেজা করতে, কান্না কান্না মুখে হাসি ফোটাতে দিন রাত উপুড় হয়ে পড়ে থাকেন গীতায়। মা লক্ষ করেন। আমরাও। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গোপনে। গল্প উপন্যাস বা সিনেমা থিয়েটারের প্রেম কাহিনীর চেয়ে আমাদের বাড়িতে ঘটতে থাকা প্রেম কাহিনীতে আমরা বিভোর হয়ে থাকি। চোখের সামনে কাউকে কি এ যাবৎ দেখেছি এক বাড়ি মানুষের সামনে জড়িয়ে ধরতে, ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে! না।

আমি আর ইয়াসমিন গীতাকে বিস্ময় চোখে দেখি। গীতা ইস্ত্রি করা শাড়ি ভাঁজ খুলে খুলে পরে, উঁচু জুতো পরে, লিপস্টিক লাগায় ঠোঁটে, কপালে টিপ পরে, সুগন্ধি লাক্স সাবান নিয়ে গোসলখানায় যায়। ওর সব কিছুই অন্যরকম। আমাদের চুল প্রথম বাংলা সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে গোসলের সাবান দিয়ে ধুই। ছোটবেলা থেকেই মা এভাবে ধুতে শিখিয়েছেন। চুলের ময়লা দূর করতে গোসলের সাবান খরচ করলে সাবান ফুরিয়ে যাবে বলেই এই কৃপণতা। কারণ বাবা বাংলা সাবানই বেশি বাড়িতে পাঠান, গোসলের সুগন্ধি সাবান কদাচিৎ। মাকে চারদিকে কার্পণ্য করতেই হয়। বাবার ধন তো, মা বলেন, এক সংসারের জন্য নয়, গ্রামে তাঁর বাবা মা ভাই বোনের সংসার আছে, শহরে তাঁর দ্বিতীয় বউ এর সংসার। মাকে দু রকম খাবারও রাঁধতে হয়। বাড়ির সবার জন্য এক রকম, মা

আর কাজের মানুষগুলোর জন্য *আরেকরকম। সেই আরেকরকমে* বাসি ডাল, শুটকির তরকারি আর নিরামিষ ছাড়া অন্য কিছু যদি জোটে সে কাঁচকি মাছ নয়ত টেংরা-পুঁটির ঝোল। মাছ মাংস রান্না হলে সে আমাদের জন্যই থাকে। আমাদের মানে বাবা, ভাই বোন আর নতুন আসা গীতা। গীতাকে আগে থেকেই চিনি, এ নতুন গীতা নয় কিন্তু কামালের বউরূপে আসা গীতাকে অবকাশে অন্যরকম দেখতে লাগে। বাবার সামনে মাথায় কাপড় দেওয়া, মার সামনে মাথার কাপড় ফেলে দেওয়া, আমাদের সামনে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ানো, ছোটদার সামনে গাল ফুলোনো গীতার সব ব্যাপারে আমার আর ইয়াসমিনের বেড়ালি কৌতুহল। স্বামী স্ত্রীর জীবন চোখের সামনে যা সবচেয়ে বেশি দেখা আমাদের,তা বাবা মার। বাবা মার সম্পর্ক তেল নুন চাল ডালের হিশেবের মধ্যে বাঁধা, এক সঙ্গে দুজনকে আমি কোনওদিনই ঘনিষ্ঠ দেখিনি,মধুর কোনও বাক্যালাপও ঘটতে দেখিনি, একসঙ্গে কোথাও দুজন বেড়াতে যান নি, এক ঘরেও এখন ঘুমোন না, এক বিছানায় তো নয়ই। মার ছোট ঘরটি ছোটদা আর গীতার জন্য গুছিয়ে দেওয়ার পর মা উদ্বাস্তুর মত থাকেন, কোনওদিন আমার ঘরে, কোনওদিন বৈঠকঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে। বাবা হচ্ছেন বাড়ির কর্তা, বাবা যেভাবে আদেশ করবেন, সংসার সেভাবে চালাতে হবে মাকে, এরকমই নিয়ম। এই নিয়মে অভ্যস্ত আমাদের সামনে এক দম্পতিকে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি, স্ত্রী সেবায় সদা সর্বদা সজাগ স্বামী। অন্যরকম বৈকি। মার নজরে পড়ে ঘটনা, আমাদেরও পড়ে। আমাদের কৌতূহল বাড়ে, আমার আর ইয়াসমিনের। মার কমে। মা অচিরে টের পান মার কোলের ছেলে মার তোতলা ছেলে মার কোল ছাড়া হাত ছাড়া হয়ে গেছে। ছোটদার জগত জুড়ে জীবন জুড়ে এখন গীতা। গীতাকে সুখী করতে যা কিছু করতে হয় করবেন। মা বাবা ভাই বোনের মূল্য তাঁর কাছে আর নেই। মা উদাস বসে থাকেন একা বারান্দায়, থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, *কামাল যে কহন বাসাত আসে, কহন যায়, কিছুই টের পাই না। আমারে আর মা মা কইরা ডাকে না, ডাইকা কয় না মা যাই,মা আইছি।*

গীতা হঠাৎ একদিন ঢাকা চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গীতার সিদ্ধান্ত পাল্টানোর হাত আমাদের তো নেই-ই, ছোটদারও নেই। বাক্স পেটরা নিয়ে সে যেদিন অবকাশ ছেড়ে যাচ্ছে, কালো ফটক ধরে আমরা করুণ চোখে তাকিয়ে ছিলাম তার চলে যাওয়ার দিকে। ঢাকায় আমানুল্লাহ চৌধুরির বাড়িতে যাচ্ছে গীতা। আমানুল্লাহ চৌধুরির বাপের বাড়ি ময়মনসিংহে, গীতার বাড়ির কাছেই, সেই সূত্রে চেনা। চৌধুরির বউ রাহিজা খানম নাচের ইশকুল খুলেছে, সেই ইশকুলে নাচ শিখবে গীতা। রাহিজা সুযোগ দিলে গীতা বড় নৃত্যশিল্পী হতে পারবে। নাচের অনেক মেয়েই চৌধুরির বাড়িতে থাকে, চৌধুরির বাচ্চা কাচ্চাদের দেখে রাখে। গীতাও তাই করবে। বউকে ঢাকায় রেখে ময়মনসিংহে ফিরে আসেন ছোটদা। পরের সপ্তাহে বাবা ছোটদার হাতে টাকা দিয়ে ঢাকা পাঠালেন আবার, গীতাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর আদেশ। গীতাকে পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি করিয়ে দিয়ে ছোটদা ফেরেন। নিজের বাংলায় অনার্স পড়া গোল্লায় গেলেও গীতাকে বিদূষী বানাবেন, এই স্বপ্ন ছোটদার। ছোটদার কাজ এখানে নিজের ভবিষ্যত তৈরি করা, ভাল চাকরি জোটানো টাকা পয়সা যতটা পারেন কামিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া। বাড়িতে যতক্ষণ তিনি থাকেন, বেশির ভাগ সময় নিজের ঘরে বসে লম্বা লম্বা চিঠি লেখেন, বিয়ের আগে যেমন লিখতেন, সেই সব বত্রিশ পৃষ্ঠা চিঠির মত চিঠি। ওদিক থেকে চিঠি আসে, ছোট চিঠি, চিঠির সঙ্গে লিষ্টি আসে। লিস্টি পকেটে নিয়ে ছোটদা বেরিয়ে যান, জিনিসপত্র কিনে কাগজে মুড়ে বাড়ি নিয়ে এসে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ

করে বড় বড় প্যাকেট করেন ঢাকা পাঠাতে। মা দেখেন, আড়ালে চোখের জল মোছেন। *এই যে কামাল টাকা কামাইতাছে, বউরে কত কিছু জিনিস কিন্যা দিতাছে, কোনোদিন তো কইল না মার হাতে কিছু টাকা দিই। পাঁচটা টাকাও ত সাধে নাই কোনওদিন।* মার এই হাহাকার কাউকে স্পর্শ করে না। মা একাই ছিলেন, আরও একা হতে থাকেন। অন্ধকারে বারান্দায় বসে থাকা মার হাতের তসবিহর গোটা স্থির হয়ে থাকে।

গোটা শহরে ছোটদার বন্ধু। বাড়িতে ছোটদার খোঁজে এলে ছোটদা সাধারণত ওদের নিয়ে বাইরে চলে যান। কখনও সখনও ছোটদা বাইরের বারান্দা-ঘরে বন্ধু নিয়ে বসেন। মাকে বলেন চা দিতে। মা চা বানিয়ে জরির মার হাতে পাঠিয়ে দেন। ঘরে সবসময় চায়ের সরঞ্জাম থাকে না। চিনি বা দুধ না থাকলে এম এ কাহহারের বাড়ি পাঠিয়ে এক কাপ চিনি বা দুধ ধার করে আনা হয়। এম এ কাহহারের মত ধনীর বাড়ি থেকেও লোক আসে মাঝে মাঝেই চিনি বা দুধ ধার করতে। এক কাপ চিনি বা দুধ ধারের ব্যাপারটি আমাদের কাছে ডালভাত। চায়ের সংগে দুটো টোস্ট বিস্কুট নয়ত নাবিস্কো বিস্কুট দিতে হয়, বাড়িতে বিস্কুট সবসময় থাকে না, তখন শুধু চা তেই আপ্যায়ন সারতে হয়। এক রাতে, বলা যায় গভীর রাতে, প্রায় সাড়ে বারোটায় ছোটদার এক বন্ধু যখন দরজার কড়া নাড়ল, ছোটদা তখন কেবল শুতে যাচ্ছেন। বাবা নেই বাড়িতে,বাড়ির আর সবাই ঘুমিয়ে। আমার ঘুম ভেঙে যায় দরজার শব্দে। বৈঠকঘরের পর্দা সরিয়ে দেখি হরিণ হরিণ চোখের মিষ্টি মিষ্টি হাসির এক ছেলের নিভাঁজ নিটোল মুখে চাঁদের আলো চুমু খাচ্ছে। আমার ওই উঁকি দেওয়া মুখের অর্ধেকখানি দেখেই ছেলেটি বলল, *নাসরিন না! কত বড় হয়ে গেছ তুমি!* ছেলেটির দীপ্ত চোখ আমার মুখ থেকে সরে না। আমি সংকোচে নত করি চোখ।

আমাকে মনে নাই তোমার? আমি জুবায়ের।

আমি কোনও উত্তর দিই না। জুবায়ের জিজ্ঞেস করে, *তুমি গান পছন্দ কর?* মৃদু কণ্ঠে বলি *হ্যাঁ করি।* দাঁড়িয়েই ছিলাম, ছোটদা বললেন, *যা ভেতরে যা, মারে চা দিতে ক ত দুই কাপ।* মা ঘুমিয়ে ছিলেন, ঠেলে উঠিয়ে বলি, *ছোটদার বন্ধু আইছে, দুই কাপ চা দেও।* মা পাশ ফিরে বলেন, *জরির মারে ক।* জরির মা মেঝেতে কুকুর কুণ্ডুলি, জাগিয়ে বলি, *দুই কাপ চা কর।* জরির মা ঘুমচোখে রান্নাঘরে গিয়ে শুকনো কাঁঠাল পাতা চুলোয় গুঁজে আগুন ধরিয়ে চায়ের পানি বসিয়ে দেয়। পানি গরম হল বটে, কিন্তু চা পাতা কই, চিনি কই, দুধই বা কই! মা জানেন কই। মাকে আবার ডাকি, *উইঠ্যা চা বানাইয়া দেও। পানি গরম হইয়া গেছে।*

মা আবারও পাশ ফিরে শুলেন, *এত রাইতে আমারে জ্বালাইস না। আমার শইলডা বালা না।*

মা উঠলেন না। জিজ্ঞেস করলেন বাবা ফিরেছেন কি না। ফেরেনি বলাতে বললেন *ওই মাগীর বাড়িত রাইত কাডাইতাছে।* আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে অসহায় তাকিয়ে থাকি। চমৎকার গলায় গান গাইছে জুবায়ের। নৈঃশব্দের সুতোয় ভর করে গানের সুর ভেসে আসছে ঘরে, সে সুর ঘুমন্ত কাউকে জাগায় না, আর জেগে থাকা আমাকে ঘুমোতে দেয় না। ইচ্ছে করে পুরো রাত গান শুনি, জুবায়েরের পাশে ঘন হয়ে বসে পূর্ণিমায় ভিজে ভিজে তন্ময় হয়ে শুনি, জগত সংসার ভুলে শুনি। রাত দুটোর দিকে *আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে* গানটি গেয়ে জুবায়ের চলে গেল।

পরদিন ছোটদা বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে রইলেন চুপচাপ।

কি এই অসময়ে শুইছ কেন?
ভাল্লাগতাছে না।
কি হইছে?
কালকে যে জুবায়ের আইছিল, আমার বন্ধু, অনেক বছর পরে তার সাথে দেখা।
ছেলেডা খুব সুন্দর দেখতে। গানও ত সুন্দর গায়।
আজকে ভোরে জুবায়ের আত্মহত্যা করছে।

বুকের ভেতর থেকে ঠাণ্ডা কি জানি কি সারা গায়ে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। জুবায়েরের সঙ্গে যে মেয়েটির প্রেম ছিল, সে মেয়েকে মেয়ের বাবা ধরে বেঁধে অন্য এক ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, ছোটদা খুব ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন। কাল রাতে জুবায়ের ওই মেয়ে সম্পর্কে একটি কথাও বলেনি। বলেছে, এত চমৎকার পূর্ণিমায় তার ইচ্ছে করেনি একা একা ঘরে বসে থাকতে, তাই বেরিয়েছে সে, তার খুব গান গাইতে ইচ্ছে করছে। জুবায়ের যখন গান গাইছিল, ছোটদা পাশে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। জুবায়ের আরও গান গাইতে চাইছিল, কিন্তু ছোটদাই জুবায়েরকে বলেছেন চলে যেতে, কারণ বিছানায় তাঁর তখন না গেলেই নয়। প্রেমের সঙ্গে আত্মহত্যার সম্পর্ক বড় নিবিড়। ছোটদাও তাঁর বিয়ের আগে বিষ খেয়েছিলেন। চটজলদি হাসপাতালে নিয়ে পেটে নল ঢুকিয়ে বিষ বের করে নেওয়া হয়েছিল বলে বেঁচেছেন।

এরপর বেশ কয়েকটি রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। কেবলই মনে হয়েছে রাত ফুঁড়ে একটি গান ভেসে আসছে, *আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে।*

মার কোনও কিছু বাবার পছন্দ না হলেও মার বলা একটি ছড়া বাবার খুব পছন্দ। মন ভাল থাকলে মাকে তিনি ছড়াটি বলতে বলেন। মা হেসে দুলে দুলে বলেন,

এক পয়সার তৈল,
কিসে খরচ হৈল,
তোমার দাড়ি আমার পায়,
আরও দিলাম ছেলের গায়,
ছেলেমেয়ের বিয়ে হল,
সাতরাত গান হল,
কোনও অভাগী ঘরে গেল,
বাকি তেলটুক নিয়ে গেল।

মার উড়োখুড়ো চুল, তেল সাবান পড়ে না চুলে। ফিনফিনে চুলগুলো পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন, ফিতে জোটে না সবসময়। আমাদের, আমার আর ইয়াসমিনের চুলের ফিতে পুরোনো হয়ে গেলে তা দিয়ে বাঁধেন, তাও না থাকলে দড়ি। গোসল করে ভেজা চুলও পেছনে বেঁধে রাখেন, চুল ঝরে পড়ে আরও। মার ঘন দীর্ঘ কেশ ছিল এককালে, এখন নেই। নেই বলে আফসোস করেন, কিন্তু যা আছে তা হেলাফেলায় ঝরে, তিনি ফিরে তাকান না। মা যখন আমাকে আমার চুলের যত্ন নিতে বলেন, আমি বলি, *আর যত্ন কইরা কি হইব, চুল ত তোমার চুলের মত হইছে, পাতলা।* নিজের ছোট চোখ নিয়েও দুঃখ করে বলি, *ইয়াসমিনের চোখ কত সুন্দর, বাবার চোখ পাইছে। আমার গুলা হইছে তোমার চোখের মত।* নাক নিয়েও কথা, *নাকটা খাড়া হইল না। হইব কেমনে, তোমার নাক পাইছি ত!* যেটুকু ফর্সা হয়েছি তা বাবার কারণে, যেটুকু কালো তা মার কারণে। শরীরের যা কিছু খুঁত, তা সব মার কাছ থেকে পাওয়া, এরকমই এক বিশ্বাস আমার গভীরে ক্রমশ প্রবেশ করতে থাকে। *ভাগ্য ভাল যে বাবার থুতনি পাইছি। থুতনির মধ্যে একটা ভাঁজ আছে, মেয়েরা কয় এইডা আছে বইলা আমারে সুন্দর লাগে দেখতে। বাবার কিছু পাইছি বইলা মাইনষের মত দেখতে লাগে।* একদিন মার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলি, *মা তোমার গলা কই?*

গলা কই মানে?

তোমার ত গলা নাই। তোমার থুতনি সোজা নাইমা গেছে বুকে। আর তোমার কাঁধও ত নাই, ব্লাউজও তাই পিছলাইয়া পইরা যায়।

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে মন্তব্য সংসারে নতুন নয়। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে দেখে আসছি শরীরের কোন অঙ্গ দেখতে কেমন, চোখ নাক কান ঠোঁট, শরীরের দৈর্ঘ্য

প্রস্থ, ত্বকের রং ইত্যাদি নিয়ে আত্মীয়দের গভীর আলোচনা এবং তুলনা। বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেও তাই হয়, অনেকদিন পর হয়ত আমাকে কেউ দেখলেন, দেখেই বলেন *বাহ মেয়ে তো বেশ লম্বা হইতাছে। বাপের মত গড়ন পাইছে।* অথবা *কি ব্যাপার এত কালা হইতাছে কেন ও!* চোখ নাক কানের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে মন্তব্য করেন কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, বাবার মত নাকি মার মত, নাকি মার বংশের বা বাবার বংশের কারও মত। মাও বলেন, *ইয়াসমিনের হাত পাগুলা ওর ফুপুদের মত হইছে।* ঝুনুখালা ঢাকা থেকে বেড়াতে এসে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন *ইস চোখগুলা এক্কেবারে বড়বু। চুলগুলা তো বড়বুই।* মা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শরীরের খুঁত নিয়ে আমাদের খুঁতখুঁতুনি আর অভিযোগ শুনে বলেন, *হ আমি ত পচা। আমি কালা। দেখতে খারাপ। তরা ত সুন্দর। তরা সুন্দর হইয়া থাক।*

বাড়িতে গোসলের সাবান এলে মা তা ছেলেমেয়েদের জন্য রাখেন, নিজের জন্য জোটে না। গা থেকে গন্ধ বেরোলে কাপড় ধোয়ার সাবান দিয়ে গোসল সারেন। মাস চলে যায়, বাবা নারকেল তেল পাঠান না। খড়ি নেই, মা চুলো ধরান নারকেলের পাতা আর ডাল শুকিয়ে। এগুলোতে আগুন ভাল ধরে না কিন্তু বাবা সাফ সাফ বলে দিয়েছেন, *নারকেলের ডাউগ্যা আর পাতা পুতা দিয়াই রানতে হবে। খড়ির দাম অনেক।* খড়ির দাম অনেক বলে মাকে গাছ থেকে পড়া পাতা জড়ো করে রাখতে হয়। ডাবঅলা রশিদ এসে তাড়া খাওয়া কাঠবেড়ালির মত দ্রুত উঠে যায় নারকেল গাছে, দড়ি বেঁধে ডাব নারকেল মাটিতে ফেলার পর গাছগুলো সাফ করে দেয় বিনে পয়সায়। বাড়ির ডাব কিনে নিয়ে বাজারে লাভে বিক্রি করার কাজ রশিদের। রশিদ তিন চার মাস পর পর আসে এ বাড়িতে ডাব কিনতে। উঠোনে মাঠে নারকেল পাতার স্তূপ হয়ে থাকে রশিদ গাছ পরিষ্কার করে যাওয়ার পর। সেইসব বিশাল বিশাল নারকেলের ডাউগ্যার কিনারে বটি নিয়ে বসে মা একটি একটি করে শলা বের করে উঠোন ঝাঁট দেবার, পায়খানা পরিষ্কার করবার, বিছানার ময়লা তাড়াবার ঝাঁটা বানিয়ে শলাহীন পাতা আর *ডাউগ্যা* কেটে জড়ো করে রাখেন। বৃষ্টি এলে উঠোনে শুকোতে দেওয়া নারকেলের ডাল পাতা, কাঁঠাল পাতা,আমপাতা, জামপাতা সব দৌড়ে দৌড়ে রান্নাঘরের বারান্দায় তোলেন। মার ছেঁড়া শাড়ি আরও ছিঁড়তে থাকে। মার বিছানার পুরোনো তোশক ছিঁড়ে শক্ত শক্ত জমা তুলো বেরিয়ে গেছে, তোশকের একদিকে ভারি, আরেক দিকে হালকা, শুলে মনে হয় রেললাইনের পাথরের ওপর শুয়েছি। একটি নতুন তোশকের কথা অনেকদিন ধরে বলছেন মা, কিন্তু মার বলায় কার কি আসে যায়! মার মশারির ছিদ্রগুলো বড়, আমাদের মশারিতে ছিদ্র নেই বললে ঠিক হবে না, আছে, তবে ছোট। আমাদের মশারির ছিদ্রগুলো বুজে দিয়েছেন মা। বড় ছিদ্র বোজা সম্ভব হয় না, মার গায়ে মশার কামড়ের দাগ ফুটে থাকে প্রতিদিন। মা একটি নতুন মশারির কথা কয়েক বছর ধরে বলেন, বাবা রা করেন না। মশারি যখন আসে শেষ অবদি, সেটি আমাদের খাটে টাঙিয়ে নিজে তিনি পুরোনো ছিদ্রঅলা মশারি টাঙান নিজের খাটে।

বাড়িতে রান্না হচ্ছে, একদিন নুন আছে তো আরেকদিন পেঁয়াজ নেই, পেঁয়াজ আছে হলুদ নেই, হলুদ আছে তো তেল নেই। *নেই* শুনলেই বাবা ধমকে ওঠেন, *পরশুদিন না তেল কিইন্যা দিলাম, তেল গেছে কই?*

রান্ধায় লাগছে।

দুইদিনের রান্ধায় এক বোতল তেল শেষ হইয়া যাইব?

দুইদিন না, দুই সপ্তাহ আগে তেল কিনা হইছিল।

দুই সপ্তাহেই বা এক বোতল শেষ হইল কেমনে?

কম রান্ধা?

রান্ধা বন্ধ কইরা দেও। দরকার নাই রান্ধার আর।

আমার লাইগা চিন্তা করি না। পুলাপান কি খাইব?

পুলাপানের খাওন লাগব না। পুলাপান আমারে সুখ দিয়া উল্ডাইয়া দিতাছে। এমন পুলাপান থাকার চেয়ে না থাকা ভাল।

মার জীবন আমাকে কোনও রকম আকর্ষণ করে না, করে বাবার জীবন। বাবার ক্ষমতা অনেক, বাবা ইচ্ছে করলে আমাদের সবকটাকে উপোস রাখতে পারেন, ইচ্ছে করলে সবকটাকে ভরপেট সুখ দিতে পারেন। ইচ্ছে করলে সারা বাড়িকে ভয়ে তটস্থ করে রাখতে পারেন, ইচ্ছে করলে হেসে কথা বলে সবাইকে অমল আনন্দ দিতে পারেন। মার ইচ্ছেতে সংসারের কিছুই হয় না। মার জগতটি খুব ছোট। ছেঁড়া শাড়ি ছেঁড়া মশারি ছেঁড়া লেপ ছেঁড়া তোশক আর মাটির চুলোয় ফুঁকনি ফোঁকা তেল হীন সাবানহীন জীবন মার। এই জীবন নিয়ে তিনি দৌড়োন পীর বাড়ি, কখনও কখনও নানির বাড়ি। এ দুটো বাড়ি ছাড়া মার আর কোনও বাড়ি নেই যাওয়ার। বাড়িতে মার নিয়মিত অতিথি বলতে এক নানা। নানা যখন দুপুরবেলার দিকে আসেন, মা নানাকে গা মেজে গোসল করিয়ে ভাত খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দেন। বাবা বাড়ি আসার আশংকা না থাকলেই নানাকে খেতে বসান মা। আমরাও যদি দেখে ফেলি নানা খাচ্ছেন, মা অপ্রস্তুত হন, কিছু বলার আগেই তিনি বলেন, *আমার ভাগেরটা বাজানরে খাওয়াইতাছি।* বাড়িতে তো পীরবাড়ির কেউ আসেই না আর, ওরা আর যে বাড়িতেই যাক, কোনও কাফেরের বাড়িতে যাবে না। বাড়িতে কোনও মামা খালা এলে বাবা কটমট করে তাকান। বাবা যে ওদের কারও আসা পছন্দ করেন না, সে মা কেন, আমরা সবাই বুঝি। মার আত্মীয় কেউ বাড়ি এলে বাবা কাজের মানুষকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জানতে চান, মা কিছু দিয়েছেন কি না ওদের হাতে। কিছু খাইয়েছেন কি না, খাওয়ালে কি খাইয়েছেন, এসব। কাজের মানুষও বোঝে, এ বাড়িতে মার আত্মীয়রা অনাকাঙ্খিত ছটকু পীর বাড়িতে ঢুকে নতুন মুন্সি হয়েছে। ইয়া লম্বা পাঞ্জাবি আর টুপি পরে একদিন এসেছিল অবকাশে, বাবা ঘাড় ধাককা দিয়ে বের করে দিয়েছেন। মার জগতের মানুষেরা যখন এ বাড়িতে নিগৃহীত হতে থাকে, মা একা হয়ে যান। তিনি তাঁর জগত বাড়াতে থাকেন পশুপাখিতে। মার শখ হয় মুরগি পালার। বাবার কাছে মার আবদার প্রতিদিনই চলতে থাকে, বাবার হাত পা পিঠ সর্ষের তেল মেখে টিপে দিতে দিতে। বাবা অবশ্য একে আবদার বলেন না, বলেন ঘ্যানর ঘ্যানর। *কেন, মুরগি দিয়া কি হইব? মুরগি ডিম পাড়ব, সেই ডিম পুলাপান খাইতে পারব, ডিম ফুইটা বাচ্চা হইব, সেই বাচ্চা বড় হইব।* মার স্বপ্ন শেষ অবদি সফল হয়, এক মুরগি থেকে দশ মুরগি হলে যে বাবারই লাভ, তা যখন তিনি বুঝলেন, চারটে মুরগি কিনে দিলেন মাকে। মা সেই মুরগিগুলোর জন্য নিজে হাতে খোঁয়াড় বানালেন। সকালে উঠে খোঁয়াড় খুলে মুরগিদের খুদ কুঁড়ো খেতে দেন। উঠোন জুড়ে মুরগি হেঁটে বেড়ায়, হেগে বেড়ায়। মা অপেক্ষা করেন, মুরগি একদিন ডিম দিতে বসবে। বাবার খাটের তলায় চটের ওপর বিছানো পেঁয়াজ থাকে, আলু থাকে। সেই পেঁয়াজ আলুর পাশে মা একটি ডালা পেতে দিলেন, খড় বিছানো সেই ডালায় লাল একটি মুরগি সারাদিন বসে থাকে। একদিন দেখি ঘর বারান্দা উঠোন জুড়ে একটি মা মুরগির পেছনে অনেকগুলো বাচ্চা মুরগি হাঁটছে। বাচ্চাগুলো দেখতে এত সুন্দর, হাতে নিতে ইচ্ছে করে। হাতে নিলে মা বলেন বাচ্চা বড় হবে না। মার খুশি উপচে পড়ে মুরগির বাচ্চাগুলো দেখে। কিন্তু বারোটা

বাচ্চা মা গুনে গুনে খোঁয়াড়ে তোলেন, দেখা যায় পরদিন দুটো বাচ্চা নেই। উঠোনে মা মুরগির পেছনে যখন হাঁটছিল, এক ফাঁকে চতুর বেজি ধরে নিয়ে খেয়েছে। টিনের ঘরের পেছনে কোনও এক গর্তে বেজি থাকে, হঠাৎ হঠাৎ ওদের দৌড়োতে দেখি। মার ইচ্ছে হয় হাঁস পালতে। বাবা হাঁসের বেলাতেও দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, *আবার হাঁস কেন?* হাঁস যে কেন, মাকে তাও বোঝাতে হয় অনেক সময় নিয়ে। বাবা নাকচ করে দিলেন মার প্রস্তাব। মা নানার কাছে পাড়লেন। নানা দুটো হাঁস কিনে নিয়ে এলেন। শাদা হাঁস, বাদামি হাঁসি। বাড়িতে যখন হাঁস এল, বারোটি মুরগির বাচ্চার মধ্যে দুটি কেবল বেঁচে আছে। বাকিগুলো অসুখে, কুকুরে আর বেজিতে ফুরিয়েছে। হাঁসি ডিম দিল। সে ডিমের ওপর মা লাল মুরগিটিকে বসিয়ে দিলেন। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলো হাঁসের। হাঁস যায় বিলে সাঁতার কাটতে। রান্নাঘরের পেছন দিকে বাড়িঘেরা দেয়ালে মেথর আসার ছোট্ট কাঠের দরজাটি পেরোলেই বাঁদিকে প্রফুল্লর বাড়ির পায়খানা, ডানে কচুরিপানায় ঠাসা ঘোলা জলাশয়, একে পুকুর বললেও অতিরিক্ত হয়, বিল বললেও আসলে ঠিক মানায় না কিন্তু এটি বিলই, একধরণের বিল, মাছহীন ময়লা কাদা সাপ জোঁকের বিল। হাঁসের বাচ্চাগুলো মুরগির বাচ্চার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে, একরকম দেখতে, রংও একই রকম হলুদ। কোনটি হাঁসের, কোনটি মুরগির ঠিক ঠাহর করা যায় না। হাঁস মুরগি বেশি দিন টেকেনি মার।ডিম ভেজে দিতে হয় বাড়ির মানুষকে। মুরগির বাচ্চা খানিকটা বড় হলেই দাদা বলেন, *বেজিই তো খাইয়া ফেলব, তার চেয়ে বেশি কইরা পিঁয়াজ দিয়া আমার লাইগা একটা মুরগি ভুনা কইরা দেন মা।* মা মুরগি রাঁধেন আর আড়ালে চোখের জল মোছেন। বাড়িতে অতিথি এল, *কি খাওয়ানো যায়? কিছুই তো নাই, ঠিক আছে, মুরগি জবো করা হোক।* মা উঠোনে খেলতে থাকা মুরগিরগুলোর দিকে স্বপ্ন-চোখে তাকিয়ে বলেন, *পালা মুরগি আবার জবো করে কেমনে?* দাদা বলেন, *গলাডার মধ্যে আল্লাহু আকবর কইয়া বটির পুচ মাইরা জবো করে মা। এক্কেবারে সোজা।* শেষ অবদি মার পালা মুরগি দাদার রসনা তৃপ্ত করতে, আমাদের পেট ভরাতে আর অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহার হতে থাকে। মা পালা মুরগি বা হাঁসের একটি টুকরোও মুখে দেন না, আলু ভর্তা করে খেয়ে ওঠেন। হাঁস মুরগির খোঁয়াড় খাঁ খাঁ করে মাস না যেতেই। কেবল হাঁস মুরগি নয়, মার গাছের লাউ, সীম, কুমড়ো, ফুলকপি বাঁধাকপি, টমেটো, পুঁইশাক খেতে থাকি আমরা। চাল ডাল তেল নুন ছাড়া বাজার থেকে মাস যায় বছর যায় তেমন কিছু আনার প্রয়োজন হয় না। বাবার খরচ বাঁচান মা। ছেঁড়া শাড়ি, উড়ো চুল, রুখো ত্বকের মা সংসারে আয়ের পথ খোলা রেখেছেন। বাবা বাড়িতে যে ফলই নিয়ে আসেন, মা সে ফলের বিচি মাটিতে পুঁতে রাখেন। পোঁতা বিচি থেকে ডালিম গাছ, ফজলি আমের গাছ, জামরুল গাছ, লাল পেয়ারার গাছ, লিচু গাছ সবই গজাতে থাকে। হাঁস মুরগির শোক থেকে একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দুটো ছাগলের বাচ্চা আনলেন মা, মানুষের বাচ্চার মত ছাগলের বাচ্চাদুটোকে বোতলে দুধ খাইয়ে বড় করে তুললেন। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাগলদুটো মার ফলের গাছ গুঁড়িসুদ্ধ খেয়ে ফেলতে লাগল, মা বেড়া দেন, বেড়া ডিঙিয়ে ছাগল তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মা মরিয়া হয়ে ওঠেন গাছ বাঁচাতে, আবার ছাগলদেরও সুখী রাখতে। ছাগলদুটোর নাম রাখা হল, লতা আর পাতা। লতা আর পাতা লতা-পাতা খেয়ে চমৎকার জীবন যাপন করছে। এমন আদর মার লতা আর পাতার জন্য, রাতে উঠোনে বা বারান্দায় ঘুমোলে কে আবার কামড় দেয় ওদের, নিজের ঘরে এনে রাখেন। ছাগলের ভ্যা ভ্যা গু মুতে মার ঘর ভেসে থাকে। কাঁঠাল গাছে উঠে লতা পাতার জন্য কাঁঠাল পাতা পেড়ে দেওয়ার কাজ আমি নিজে চেয়ে নিই। কাঁঠাল পাতা লতা খায় তো

পাতা খায় না। ওর মুখটি বড় উদাসীন দেখতে লাগে। ওর পাতা নাম ঘুচে যায় আমি যখন ওকে বৈরাগি বলে ডাকতে শুরু করি। বৈরাগি একদিন হারিয়ে যায়। মাঠে ঘাস খাচ্ছিল, ফটক খুলে বাড়িতে কেউ এসে খোলাই রেখেছে ফটক, ফাঁক পেয়ে বৈরাগি সত্যিকার বৈরাগি হয়ে ঘর সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে। পাড়াসুদ্ধ খোঁজা হয়। নেই। আকুয়ার গরুর খোঁয়াড়ে, যেখানে ছাড়া-গরু ছাড়া-ছাগল রাস্তাঘাটে পেলে জমিয়ে রাখা হয়, খুঁজে এলেন মা, নেই। মা চোখের জলে নাকের জলে ডুবে নদীর পাড়ে বুড়া পীরের মাজারে গিয়ে টাকা পয়সা ঢেলে মোমবাতি জ্বেলে পীরের দোয়া চেয়ে এসেছেন যেন বৈরাগি বৈরাগ্য ভুলে ঘরে ফিরে আসে। এই বুড়া পীরের মাজারটি অদ্ভুত এক মাজার। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে একটি খোলা ঘরের প্রায় সবটা জুড়ে লাল কাপড়ে মোড়া বিশাল একটি বাঁধানো কবর, সকাল সন্ধ্যা মানতকারীদের ভিড়। বুড়া পীর কে ছিলেন, কি করতেন, কবে মরেছেন, কেন তার কবরে লোকে মোম আর আগরবাতি জ্বেলে নিজের ইচ্ছের কথা শুনিয়ে আসে, মাকে জিজ্ঞেস করি। বুড়া পীর লোকটি কি মৃত্যুর ওপার থেকে কারও সাধ আহলাদ মেটাতে পারেন, যদি পারেন কি করে পারেন? আমার এই কঠিন প্রশ্নটির খুব সরল একটি উত্তর দেন মা, *নিশ্চয়ই পারেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই উনারে ক্ষমতা দিছেন পারার, না পারলে এত লোক যায় কেন মাজারে!* হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই যায়। পীর মুসলমান ছিলেন, কিন্তু হিন্দুর ভিড় ওখানে মুসলমানের চেয়ে কম নয়।মার বিশ্বাস যত গভীরই হোক, বুড়া পীরে কাজ হয় না, বৈরাগি আর ফেরে না। লতা তার সঙ্গী হারিয়ে নিজেও উদাস হতে থাকে দিন দিন। বারান্দায় লতার গু মুত দেখে বাড়ির সবাই বিরক্ত কিন্তু মার কিছুতে বিরক্তি নেই। নিজে হাতে তিনি গু মুত সাফ করেন, লতাকে উঠোনে বেঁধে রাখেন, মাঠে বাঁধলে আবার যদি খোলা ফটক পেয়ে বৈরাগির মত সেও বৈরাগ্য বরণ করে! হরিণের রঙের মত রঙ লতার, শিং আরও পেঁচিয়ে ওপরে উঠলে হরিণ বলেই মনে হত, মা বলেন। মাকে বলি, *আবার হরিণ পালার শখ কইর না যেন!* মা বড় শ্বাস ছেড়ে বলেন, *হরিণ কি আর পোষ মানার প্রাণী!* মার এত আদরের লতা, পুত্রবৎ স্নেহে যে বাচ্চাকে ছাগল করে তুলেছিলেন, সেও বৈরাগির মত একদিন নেই হয়ে গেল। মা লতার দুধের বোতল, লতার দড়ি, খুঁটি, আধখাওয়া কাঁঠাল পাতা সামনে নিয়ে চোখের পানি ফেলতে লাগলেন। মার শোক তখনও সম্পূর্ণ ফুরোয়নি, বাড়িতে দেখি একটি লাল রঙের গরু। মা এনেছেন। গরু কোত্থেকে এল, গরু কেন এল বাবা এসব কোনও প্রশ্নে গেলেন না। সম্ভবত গরুর প্রতি মায়া বাবার সেই ছোটবেলা থেকেই ছিল বলে গরুর এ বাড়ি থাকা চলবে না এরকম কোনও আইন জারি করলেন না। এই গরু কোনও একদিন বাছুর বিয়োবে, সের সের দুধ দেবে, অথবা বড় হলে এটিকে ভাল দামে বিক্রি করা যাবে বাবা সম্ভবত এরকমও ভেবেছিলেন। মা মহা উৎসাহে গরুকে গোসল করানো, খাওয়ানো, গরুর গা থেকে মাছি তাড়ানো, এমনকি গরুর যেন ঠাণ্ডা না লাগে পিঠে পুরোনো একটি কম্বল বিছানো--সবই করতে লাগলেন। দুধওয়ালি ভাগীরথীর মাকে ডেকে প্রতিদিন এক খাঁচা করে ঘাস আনার ব্যবস্থা করলেন। গরুর জন্য ভাল একটি খুঁটি নিজেই বানিয়ে নিলেন। গরুর নাম মা রাখলেন ঝুমুরি। ঝুমুরিকে তিনি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেবেন না। কিন্তু দিন যায়, ভাগীরথীর মার খাঁচায় ঘাস কমতে থাকে। ঝুমুরির খাদ্য যোগাতে মা অস্থির হয়ে পড়েন। মাঠে যা ঘাস ছিল, সবজির বাগান করে ফেলার পর ঘাস বলতে কিছু নেই। ঝুমুরিকে শেষ অবদি ঘাগডহরে আবদুস সালামের বাড়িতে লালন পালনের জন্য দিলেন মা। গ্রামের মাঠে অঢেল ঘাস আছে, সালামের বাড়ির অন্য গরুর সঙ্গে ঝুমুরিও মনের

আনন্দে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে খাবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে। ঝুমুরিকে রাখার জন্য মা সালামের হাতে কিছু টাকা পয়সাও মাসে মাসে দিতে থাকেন, নিজেও ঘাগডহরে প্রায়ই তাঁর আদরিণীকে দেখে আসেন, গায়ে হাত বুলিয়ে আসেন। দিন যায়, সালাম একদিন মুখ মলিন করে বলে, *গরু চুরি হইয়া গেছে।* মার কিছুই থাকে না, সব চলে যায়। গরু চুরির পর মা কবুতর নিয়ে পড়লেন। প্রথম শাদামাটা বাজারের কবুতর নিয়ে এলেন। মা তো আর ইচ্ছে করলেই কিছু নিয়ে আসতে পারেন না। মাসের পর মাস স্বপ্ন দেখেন, বাবার কাছে আবদার করেন, বাবা আবদার ফিরিয়ে দিলে তিনি তাঁর নিজের আত্মীয়দের কাছে আবদার করেন, তাতেও ব্যর্থ হলে শেষ অবদি ধারই করেন। ধার শোধ করাও মার পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়। নিজের গাছে যে কটি ডাব হয় তা রশিদের কাছে বিক্রি করে মার টাকা শোধ করতে হয়। মা যে ডাবগাছগুলো লাগিয়েছিলেন এ বাড়িতে আসার পর, সেসব গাছ বড় হয়ে ডাব ধরার পর বাবাই অন্য গাছগুলোর ডাবের মত মার লাগানো গাছের ডাব বিক্রি করে নিজের পকেটে পয়সা ঢোকাতেন। মা মুরগি পালার পর থেকে নিজের লাগানো গাছগুলোর ডাব তিনি নিজে বিক্রি করতে পারবেন, এই অধিকারটি দিনরাত লেগে থেকে নেন। শাদামাটা কবুতরদুটো পরদিনই উড়ে চলে গেল, মা উন্মুক্ত আকাশটির দিকে সারাদিন উন্মুখ তাকিয়ে ছিলেন হাতে খাবার নিয়ে, বাকবাকুম বাকবাকুম বলে ওদের ডেকেছেন অনেক, কেবল তাই নয়, অনেক রাত অবদি বারান্দায় বসে ছিলেন, পাখিরা রাত হলে নীড়ে ফেরে, যদি ফেরে এই আশায়। যদি বাড়ির পথ চিনতে ওদের ভুল হয়ে থাকে, রাত বিরেতে চিনে আবার ফিরতেও তো পারে, মা আশা ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন। ওরা ফেরেনি। বাইরের বারান্দার ওপর ঢেউ খেলানো খোপে জালালি কবুতরের বাসা। কবুতরের গুয়ে শাদা হয়ে থাকে বারান্দা। অনেকদিন কবুতরগুলোকে তাড়াতে চেয়েছি, মা বলেছেন, *জালালি কবুতর থাকলে সংসারে শান্তি থাকে, ওদেরে তাড়াইবি না।* হাতের নাগালে ওদের একটিকে পেয়ে খপ করে ধরে দাদা মাকে ডেকে একদিন বললেন, *জালালি কবুতরেরা বড় জালাইতাছে মা,এইটা রোস্ট কইরা দেন, খাই।* মা দাদার হাত থেকে কবুতর কেড়ে নিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বলে দিলেন, *জালালি কবুতর খাইতে হয় না। তর লাইগা অন্য কবুতর রাইন্ধা দিব নে, এদেরে খাইস না কোনওদিন। জালালি কবুতরের মনে কষ্ট দিলে সংসারের শান্তি জন্মের মত চইলা যায়।* শাদামাটা কবুতরগুলো চলে যাওয়ার পর মোজাপরা টোপর পরা চমৎকার এক জোড়া কবুতর নিয়ে এলেন মা। এ জাতের কবুতর পাওয়া যায় না, মা মুল্লুক ঘুরে এদের এনেছেন। কবুতরের জন্য রান্নাঘরের চালের তলে কাঠের একটি ঘর বানিয়ে দিলেন মা, ঘরে ছোট্ট একটি দরজা, দরজা খুলে বেরোলে এক চিলতে বারান্দা। বারান্দায় ছোট একটি বাটিতে খাবার থাকে, কবুতরদুটো বাক বাকুম বলে ঘর থেকে বেরিয়ে খাবার খায়। এবারেরগুলোয় মা পাখনা বেঁধে দিয়েছেন যেন খুব বেশিদূর উড়তে না পারে। কবুতরগুলোকে ওড়া থেকে বঞ্চিত করার কোনও ইচ্ছে মার নেই, মা চান ওরা মার হাত থেকে খাবার খাক, উঠোনের গাছ গাছালিতে বসুক, উঠোন শাদা করে হাঁটুক, উড়ুক, উড়ুক কিন্তু বেশিদূর না যাক, বেশিদূর গেলেও বাড়ির পথ চিনে সন্ধের আগে আগে কাঠের ঘরটিতে ফিরে আসুক। কবুতরদুটো ডিম পাড়ল, বাচ্চাও ফোটালো, বাচ্চাগুলোকে বেজি নিয়ে গেল, কাকে খেলো, তারপর মোজা পরা টোপর পরা ভাল জাতের দুটো কবুতর মনের দুঃখে বসে থেকে থেকে অসুখ বাঁধালো শরীরে। মা অসুখ সারাতে পারেননি। কবুতর মরে যাবার পর বাবা বললেন, *এই অলক্ষ্মণ্যা মাগির কাছে কিছুই থাকে না। সব যায় গা।* তা ঠিক, মার কাছে কিছু থাকে না, সব মাকে ছেড়ে চলে

যায়। বারান্দার খোপে জালালি কবুতর তখনও বাকুম বাকুম দিন কাটায়। ওদের দেখলে দাদার মত আমারও খেতে ইচ্ছে করে। বাবা বাড়িতে মাস যায় কোনও মাছ মাংস পাঠান না। শাক সবজি আর শুটকি খেতে খেতে রীতিমত বিরক্ত আমি, মাকে জানাই এখন জালালি কবুতর রাঁধা ছাড়া আর উপায় নেই। ছেলেমেয়ের কিছু খেতে ইচ্ছে হলে মা যে করেই হোক সে জিনিস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। একদিন পেয়ারা খেতে ইচ্ছে করছিল, পেয়ারার দিন নয় তখন অথচ মা শহর ছাড়িয়ে কোন এক গ্রামে এক সামান্য চেনা মহিলার বাড়ি গিয়ে, শুনেছিলেন সে মহিলার বাড়ির গাছে অসময়ের পেয়ারা জন্মায়, কিছু পেয়ারা নিয়ে এসেছিলেন আমার জন্য। কিন্তু আমার কবুতর খাওয়ার ইচ্ছের গোড়ায় মা মোটেও জল ঢালেন না। আমার ইচ্ছের পাশ কাটিয়ে তিনি চলে যান। *সংসারের শান্তি* তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না।

মাকে ছেড়ে সবাই চলে যায়। মা একা বসে থাকেন ছেঁড়া শাড়ি, উড়ো চুল রুখো ত্বক নিয়ে। ছেঁড়া তোশকের ওপর ছেঁড়া মশারির তলে সারারাত এপাশ ওপাশ করেন। মার ফুসফুস জুড়ে কফ জমে, মা কফ থুতু ঘরের মেঝেতেই ফেলেন, দেখে আমার ঘেন্না লাগে। মা নিজের জন্য কাউকে চেয়েছিলেন, মানুষ নয়ত পশু পাখি। মানুষ তো থাকেই নি, পশু পাখিও থাকেনি। ভোর বেলা থেকে রাত অবদি মা আমাদের জন্য রান্না করবেন, আমাদের খাওয়াবেন, বাড়ি ঘর গোছাবেন, কাপড় চোপড় ধোবেন, আমরা খাব দাব, হৈ হুল্লোড় করব, আমরা আমাদের লেখাপড়া খেলাধুলা গান বাজনা ইত্যাদি নিয়ে থাকব। মার জন্য কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। এরকমই নিয়ম। মার কর্তব্য মা পালন করবেন। মা করেনও। সংসারের কাজ কর্ম সেরে মা একা বসে দরুদ পড়েন, আল্লাহর কালামে মন ঢালতে চেষ্টা করেন। আর থেকে থেকে বাবা যে রাজিয়া বেগমকে বিয়ে করেছেন, এ যে মিথ্যে কথা নয় তা বলেন। পীর বাড়ি যেতে আসতে মা নাকি প্রায়ই বাবাকে দেখেন নওমহলের রাস্তায়। আমি ধারণা করি বাবার বিরুদ্ধে মা কথা যা বলেন, বানিয়ে বলেন। বাবা যত দূরের মানুষই হন, বাবার প্রতাপ আর প্রভাবে আমি যতই নুয়ে থাকি, যতই কিল ঘুসি চড় চাপড় খাই, যতই সন্ধিবেতের আর চাবুকের মার পিঠে এসে পড়ে, বাবার প্রতি এক ধরণের শ্রদ্ধা আমার থেকে যায়, সেটি ঘোর দুর্যোগের সময়ও মরে না। মার অভিযোগ শুনেও আমরা রা করি না। যা চোখের সামনে ঘটে না, তা বিশ্বাস করার অভ্যেস অন্তত আমার নেই। মাকে ছিঁচকাঁদুনে অবুঝ একটি মেয়েমানুষ ছাড়া আমার কিছু মনে হয়না। মার বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু আছে বলেও মনে হয় না, থাকলে তিনি কেন আল্লাহ রসুলে বিশ্বাস করেন! থাকলে তিনি কেন আমান কাকার সঙ্গে ওরকম একলা ঘরে নসিহতের নাম করে বসে ফিসফিস কথা বলতেন! এবাড়িতে আমান কাকার আসা বন্ধ করে দিয়েছেন বাবা। আমান কাকার বউ এসে একদিন মাকে জানিয়ে যান, তাঁর স্বামী গফরগাঁও এ চাকরি করছিলেন, ওখানে এক মহিলাকে সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। মা শুনে নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছেন, *বেডার জাত তো, করবই!* কোনও *বেডার জাতের* প্রতি মার কোনও রকম শ্রদ্ধা নেই সম্ভবত। কিন্তু বাবা তু তু করলেই মা যে কেমন মুরগির মত দৌড়ে যান বাবার কাছে!মার বসে থাকা, শুয়ে থাকা, হাঁটা চলা, দৌড়ে যাওয়া সবই বড় বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।

বাড়িতে সবাই ব্যস্ত। বাবা ব্যস্ত রোগী নিয়ে, গ্রামের জমিজমা নিয়ে। দাদা ব্যস্ত চাকরি নিয়ে। ছোটদা ব্যস্ত গীতা নিয়ে, গীতা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে পদার্থবিদ হওয়ার স্বপ্ন বিদেয় করে নৃত্যকলায় মন শরীর সব ঢেলে দিয়েছে। নাচের

দলের সঙ্গে বার্মা যাচ্ছে। আমি ব্যস্ত লেখাপড়া নিয়ে। ইয়াসমিনও। মা পড়ে থাকেন একা। কালো কুচ্ছিত হতদরিদ্র মা। কিছু না থাকা মাকে একরকম মানিয়ে যায়। মার যে সায়া থাকলে শাড়ি নেই, শাড়ি থাকলে ব্লাউজ নেই এসব দেখে আমরা অভ্যস্ত। মার ফিনফিনে তেলহীন চুল বাতাসে উড়বে, ফিতে না পেয়ে মা পাজামার দড়ি খুলে বা চটের দড়িতে চুল বাঁধবেন, দেখে আমরা মুখ টিপে হাসব, আমাদের ওই হাসিতেও অনেকটা অভ্যস্ত আমরা। মা বাড়িতে অনেকটা হাস্যকর পদার্থ। মাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি হাসেন বাবা। চাকরি পাওয়ার পর দাদা মাকে শাড়ি সায়া কিনে দিয়েছেন, কিন্তু বিয়ের কথা ভেবে ভেবে নিজের সংসারের আসবাবপত্র বানাতে বানাতে আর নিজের জামা কাপড় সুটবুট কেনায় দাদাও এমন ব্যস্ত যে মাঝে মাঝেই ভুলে যান যে মার গত ঈদের শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে। মা তাঁর ছেঁড়া শাড়িগুলো নিয়ে গিয়ে নানিবাড়ির পেছনের বস্তি থেকে কাঁথা বানিয়ে এনেছেন। একটু শীত নামলেই মা কাঁথা বের করে প্রত্যেকের বিছানায় দিয়ে আসেন। মার কাঁথার উষ্ণতায় আমাদের এত আরাম হয় যে আমরা সময়ের চেয়ে বেশি ঘুমোই, আর মা তুলো বেরিয়ে আসা ছেঁড়া লেপের তলায়, গা অর্ধেক ঢাকে তো অর্ধেক বেরিয়ে আসে, এপাশ থেকে ওপাশ ফিরলে খাট নড়বড় করে, শুয়ে থাকেন। মা স্বপ্ন দেখতে থাকেন একটি নকশি কাঁথার, কাঁথাটি বানিয়ে যদি কোনও এক রাতে বাবার শীত শীত লাগা গায়ের ওপর আলগোছে বিছিয়ে বাবাকে চমকে দিতে পারতেন! বাবা অবশ্য মার কোনও কিছুতে চমকান না। মা খুব চমৎকার খিচুড়ি রাঁধলেও না, মাথায় তেল দিয়ে ভাল একটি শাড়ি পরে, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে মিষ্টি হেসে সামনে এলেও না। চাঁদনি রাতে জানালায় বসে *ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত, আসে নি তো বুঝি আর জীবনে আমার!* গাইলেও না। বাবার মন মায়ে নেই। মা বোঝেন তা। আমরাও বুঝি। সংসারের হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝখানে কখনও কখনও ক্লান্ত শুয়ে থাকেন তিনি। মার শুয়ে থাকা দেখলে বাবা চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করেন। এভাবে শুয়ে থাকলে সংসার উচ্ছন্নে যাবে বাবার ধারণা। বাড়িতে চোর ঢুকে সব নিয়ে যাবে। কাজের মানুষগুলো কাজে ফাঁকি দেবে, চুরি করে মাছ মাংস খেয়ে ফেলবে। মেয়েরা পড়াশোনা রেখে আড্ডা পেটাবে। বাবার অমন বাড়ি মাথায় করা চিৎকারের দিনে মা একদিন শুয়ে থাকা থেকে নিজের শরীরটি টেনে তুলে বলেন, *পাইলসের রক্ত গেছে অনেক। শইল কাহিল হইয়া গেছে।*

বাবা শুনে বলেন, *ঢং দেইখা বাচি না।*

মা অনেকদিন বাবাকে খুব নরম স্বরে জিজ্ঞেস করেছেন, *পাইলসের কি কোনও চিকিৎসা নাই?*

বাবা বলেছেন, *না।*

এই যে এত্ত এত্ত রক্ত যায়। পায়খানা ভইরা রক্ত যায়। এইভাবে রক্ত যাওয়া খারাপ না?

গম্ভীর কণ্ঠে বাবা উত্তর দেন, *না।*

মার চটি ছিঁড়ে পড়ে আছে অনেকদিন, বাবাকে চটি কেনার কথা বলা হয়, বাবা শুনেও শুনলেন না। আমার বা ইয়াসমিনের চটি পরে কোথাও যাবার হলে মা যান, আর ঘরে বারান্দায় উঠোনে তো খালি পায়েই। বাড়ির লোকের খুব একটা চোখে পড়ে না আজকাল মার কি নেই, মার কি প্রয়োজন। নানার মত বেহিসেবি বাউণ্ডুলে মানুষের নজরে পড়ে মার পাদুকাহীন জীবন। তিনি একদিন মার জন্য একজোড়া শাদা কাপড়ের জুতো কিনে নিয়ে এলেন। এরকম জুতো যে মেয়েরা কখনও পরে না সে ধারণা নানার নেই। কিন্তু মা জুতো জোড়া পেয়েই খুশিতে আটখানা, বাড়ির সবাইকে দেখালেন যে তাঁর

বাজান তাঁর জন্য জুতো এনেছেন। সেদিন মা নানার জন্য বেশি মিষ্টি দিয়ে,নানার চিনি খাওয়া বারণ জেনেও,পায়েশ রাঁধেন। নানা খেয়ে দেয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে মেয়ের জন্য দোয়া করেন, মেয়ের যেন বেহেসত নসীব হয়। বেহেসতের খাবার দাবারের বর্ণনা করেন নানা, *বেহেসতে এমন খানা একবার খাইব তো চল্লিশ হাজার বছর খাইতেই থাকব, ঢেকুর একটা আইব তো মেসকাম্বর।* নানার বর্ণনা শুনে আমার ধারণা হয় বেহেসতের ভাল ভাল খানা খাওয়ার লোভেই নানা বুঝি নামাজ রোজা করেন।

নওমহলে পীরের প্রতাপ এমনই বেড়েছে যে, এখন আর রিক্সাঅলাকে বলতে হয় না, *নওমহল চান্দুর দোকানের পিছনে যাইবা?* নওমহলের পীর বাড়ি বললে রিক্সাঅলা চেনে। আগে মা চারআনা করে যেতেন, দাম বেড়ে পরে আট আনা হল, আট আনা থেকেও লাফিয়ে এক টাকা। মার হাতে অত পয়সা নেই যে ঘন ঘন তিনি বাপের বাড়ি বা পীর বাড়ি ছুটবেন। অনেক সময় যেতে ইচ্ছে করলেও মাকে ইচ্ছের লাগাম টেনে ধরতে হয়। সেদিন সকালে আমি ইশকুলে যাব, এক প্যাঁচে শাড়ি পরে, তার ওপর রংচটা বোরখাটি পরে, পায়ে নানার দেওয়া কাপড়ের জুতো, বললেন *আমারে নামাইয়া দিবা রেললাইনের মোড়টায়?* মার আপাদমস্তক দেখে আমি নাক কুঁচকে বলি, *তুমি আরেকটা রিক্সা নিয়া গেলেই তো পারো!*

রিক্সাভাড়া নাই যে।

নাই তো কারও কাছ থেইকা নেও।

কেউ ত দিল না।

আজকে যাইও না তাইলে,বাদ দেও। অন্যদিন যাও।

মা আমার উপদেশ মানেন না। মার কাছে আজ এবং অন্যদিনে কোনও পার্থক্য নেই। অগত্যা সঙ্গে নিতে হয় মাকে। মনে মনে প্রার্থণা করতে হয় যেন রাস্তায় চেনা কেউ না পড়ে, রংচটা বোরখা আর মোজাহীন কাপড়ের জুতো পরা কারও সঙ্গে আমাকে যেন কেউ না দেখে। সি কে ঘোষ রোড পার হয়ে রেললাইনের সামনে মা নেমে যান। বেশির ভাগ রাস্তাই সামনে পড়ে আছে, পীর বাড়ি যেতে আরও দুমাইল পথ, তিনি হেঁটে পার হবেন। ইশকুলে পৌঁছলে আশরাফুন্নেসা সগৌরবে জানায় ,*তরে দেখলাম রিক্সা কইরা আইতাছস। আমি হাত নাড়লাম, তর খবর নাই।*

আমি ত তরে দেখলাম না।

দেখবি কেমনে। মাটির দিকে তাকাইয়া ছিলি ত। মনে হইতাছিল লজ্জাশীলা কুলবধূ।

যাহ!

মহাকালির মোড়ে আমার রিক্সা তর রিক্সারে ক্রস করল। তর সাথে তোদের কাজের বেটি ছিল।

নিজের বুকের ধ্বক শব্দটি নিজেই শুনি। জিভের কাছে চলে আসা বাক্যটি যে *না কোনও কাজের বেটি না, আমার সঙ্গে আমার মা ছিলেন* নিঃশব্দে গিলে ফেলি। জানি না কে আমার ঠোঁট জোড়া শক্ত সুতোয় সেলাই করে রাখে। সারাদিন আশরাফুন্নেসার ভুলটি শুধরে দিতে চেয়েও আমি পারিনি।

ইশকুল থেকে ফিরে আমার কানে কানে একটি গোপন খবর বলে ইয়াসমিন, কোন এক মেয়ে নাকি তাকে বলেছে *তোমার বাবা ত দুইটা বিয়া করছে।*

কি কইলি তারপর?

ইয়াসমিন বলে, *কইলাম দুইটা বিয়া আমার বাবা করে নাই, মিছা কথা।*

আমিও ফিসফিস করে বলি, *আমারেও সেদিন ক্লাসের এক মেয়ে কইল এই কথা।*

মা একদিন মন খারাপ করে বসেছিলেন বারান্দায়। আমাকে কাছে পেয়ে বলেন, *তর বাবা ত চাকলাদারের বউরে বিয়া কইরা ফেলছে।*

আমি বললাম *কি যে কও মা!*

হ। নওমহলের সবাই কইল।

সবাই কারা? তারা জানে কি কইরা?

দেখছে।

কি দেখছে?

দেখছে যে বেডি নওমহলেই এক বাসায় থাকে। আর তর বাবা সবসময়ই ওই বাসায় যায়।

এইটা ত নতুন না। এই সন্দেহ ত তুমি বহুদিন ধইরা করতাছ।

নিজের চোখে ত ঢুকতে দেখছে তর বাপেরে। বেডির সাথে কথাও কইছে। বেডি নিজে কইছে যে বিয়া হইছে।

হুদাই।

হুদাই হইলে তর বাপে ওই বাড়িত যায় কেন?

যাইতেই পারে। তার মানে কি বিয়া করা?

কারও বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া মানে যে বিয়ে করা নয়, তা আমি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি। কেন করি, মা যেন মন খারাপ না করেন, নাকি বাবার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস যে এমন মন্দ কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারেন না, নাকি বাবা দুটো বিয়ে করেছেন এ আমার জন্যও এত লজ্জার যে আমি প্রাণপণে এই লজ্জার বোঝা বইতে অস্বীকার করি, বুঝি না।

সেইদিন আকুয়া গেছিলাম, সোহেলির মার সাথে দেখা, কইল তর বাবারে আর চাকলাদারের বউরে নাকি দেখছে সিনেমায় যাইতে। আমারে নিয়া তো কোনওদিন সিনেমায় যায় না তর বাপ!

সিনেমায় কি তুমি যাইবা নাকি! তুমি না আল্লার পথে গেছ ! বলে আমি মার সামনে থেকে সরে যাই।

রাজিয়া বেগম নিয়ে মার *ঘ্যানর ঘ্যানরের* পরও মা মন দিয়ে রান্নাবাড়া করেন, স্বামী ছেলেমেয়েদের খাওয়ান, তেল পেঁয়াজ না থাকলে, বিরস মুখে ওসব ছাড়াই রাঁধেন আর খেতে বসিয়ে বলেন *তেল ছাড়া পিঁয়াজ ছাড়া কি আর রান্ধা ভাল হয়! কোনওমতে খাইয়া নে আজকে। দেখি কালকে যদি ...*

কাল তেল আসে তো পেঁয়াজ আসে না। পেঁয়াজের সঙ্গে বাজারের পচা কই মাছ থলে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা। থলে খুলেই মা দেখেন পচা মাছের গন্ধ বেরোচ্ছে। তাই বলে কি ছেলেমেয়ে উপোস থাকবে। লেবুগাছ থেকে মুঠো ভরে লেবুপাতা ছিঁড়ে এনে মাছের ঝোলে দেন। লেবুপাতার গন্ধের তলে যেন মাছের গন্ধ চাপা পড়ে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, লেবুপাতার গন্ধ দিয়ে মাছের পচা গন্ধ হয়ত ঢাকা যায় কিন্তু লেবুপাতার উপস্থিতিই আমাকে সন্দিহান করে, খেতে বসেই নাক সিটকোই, *লেবুপাতা দিছ কেন মা? মাছ নিশ্চয়ই পচা ছিল?* এক চিলতে হাসি মার ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে যায়। মা আমার পাতে একটি না-ভাঙা মাছ তুলে দিয়ে বলেন, *মাছগুলা জেতা ছিল।*

আল্লাহর কসম কইরা কও তো জেতা ছিল!

কথায় কথায় আল্লার কসম কাটতে হয় না। মা নরম ধমক লাগান।

দাদা একটি খেয়ে আরেকটি মাছ নেন। আমি থাল সরিয়ে বলি *মাছ পচা, খাইতাম না।*

মাছ আবার পচা কোত্থেকা হইল! মা রান্নাঘর থেকে জরির মাকে ডেকে আনেন, *এই কও,কাটার সময় মাছ লাফাইতাছিল না?*

জরির মা মাথা নেড়ে বলে, *হ লাফাইতাছিল।*

লাফাক। আমি মাছ খাইতাম না। অন্য কিছু থাকলে দেও।

দাদা মাকে বুদ্ধি দেন, *মাছটা একটু নরম হইয়া গেলে ভাইজা ফেলবেন, ভাজলে আর গন্ধ থাকে না।*

নাসরিনের ত শকুনের নাক। মা বলেন।

বাবা রাতে ফিরে যখন প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরতে থাকেন, মা বলেন *পয়সা যে জমাইতাছুইন, কার লাইগা জমাইতাছুইন?*

কার লাইগা জমাইতাছি মানে? এতগুলা মানুষ খাওয়াইতাছি, পরাইতাছি। চোক্ষে দেহ না?

আমি আমার কথা কই না। আমি ত ডাইল দিয়া খাইয়া উঠতে পারি। কইতাছি ছেলেমেয়েদের কথা!পচা মাছ পাঠান কেন? ইশকুল থেইকা ক্ষিদা পেটে আসে, ভাত খাইতে পারে না।

মাছ পচা ছিল নাকি?

পচা ছিল না মানে? গন্ধে তো বাড়ি উজাড় হইয়া যাইতাছিল।

হুম।

আর পিঁয়াজ যে নাই এক মাস হইয়া গেল। পিঁয়াজ কিননেরও কি পয়সা নাই?

পিঁয়াজ না পাঠাইলাম কয়দিন আগে। শেষ হইয়া গেল?

কয়দিন আগে? মা খানিকটা সময় নিয়ে হাতের কড়া গুনে বলেন, *আজকে হইল রোববার, গত রোববারের আগের রোববারও পিঁয়াজ ছাড়া রান্ধা হইছে। তার আগের মঙ্গলবারে না পিঁয়াজ পাঠাইছেন!*

এত তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায় কেন? হিশাব কইরা খর্চা কর না কেন? বাজারে পিঁয়াজের দাম কত খবর রাখো? কামাই ত কর না, কামাই করলে বুঝতা।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কামাই কি তিনি শখে করেন না!

বাবার ওষুধের দোকানের কর্মচারি আবদুস সালাম বাজার-সদাই নিয়ে বাড়ি এলে মা তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কথা বলেন। এক বিকেলে দেখি সালামকে মাছ ভাত খাওয়াচ্ছেন রান্নাঘরে বসিয়ে। *সালাম ভাল কইরা খাইয়া লও, সেই সকাল বেলা কি মুখে দিয়া যে আসো, তারপর ত সারাদিন খাওয়া নাই!*

মার এমন একে ওকে খাওয়ানো নতুন কিছু নয়। বাড়িতে শুকনো মুখের কোনও ভিখিরি এলে মা ওদের বসিয়ে খাওয়ান। বাসি তরকারি পান্তা ভাত শুকনো মরিচ। ওসবই ওরা পরম সুখে খেয়ে নেয়। কারও জমিজিরেত ছিল, হঠাৎ অভাবে পড়ে ভিক্ষে করছে শুনলে পাতিল থেকে দুটুকরো নতুন রান্না করা মাংসও তুলে দেন। মার দয়ার শরীর। সালাম খেয়ে দেয়ে হাসিমুখে বিদেয় নেওয়ার পর মা আমাকে ডাকলেন, দাদাকে ডাকলেন,বললেন *এই যে তর বাপ পচা মাছ কেন পাঠায়, জানস? কেন বাড়িত তেল আনেনা, পিঁয়াজ আনেনা?*

কেন মা? দাদা জিজ্ঞেস করেন।

কিরীটি রায়ের মত বহুকালের রোমহর্ষক রহস্য উদঘাটন করার ভঙ্গিতে মা বলেন, *কারণ দুই জায়গায় বাজার পাঠাইতে হয় ত! এত কুলাইব কেমনে! ওই বেড়ি তার কাজের লোক পাঠাইয়া দেয় ফার্মেসিতে আর তর বাপে নিজে বাজারে হাইটা যাইয়া বাজার কইরা পাঠায় বেড়ির বাড়িত। ওই বেডিরে ত বিয়া করছে। বেডির ছোট ছেলেডাও ফার্মেসিতে আইসা বইসা থাকে। ওরে লেখাপড়ার খরচ দেয়। ও ত আসলে তর বাপের ছেলে, চাকলাদারের না।*

আমার অস্বস্তি হয় মার অভিযোগ শুনতে। দাদারও হয়। দাদা বলেন *কী যে কন না কন, কার কাছে কি শোনেন আর চিল্লাচিল্লি করেন।*

কার কাছে শুনি? আচ্ছা যা না, নওমহলেই ত থাকে বেডি, বেডির বাড়িত যাইয়া দেইখা আয়, জাইনা আয় তর বাপ বিয়া করছে কিনা, প্রত্যেকদিন বাজার-সদাই পাঠায় কি না।

হ! আমার আর কাম নাই বেডির বাড়িত যাইয়াম! দাদা সরে যান মার সামনে থেকে। আমিও যাই। মার অভিযোগ অনুযোগ সবই আমাদের চেনা। মার বিলাপ প্রলাপ সব চেনা। মার চিল্লাচিল্লিতে কোনও করুণার উদ্রেক আমাদের হয় না, যদি হয় কিছু, সে বিবমিষা।

মা একা বসে থাকেন। তাঁর দুঃখ শোনার বাড়িতে আর কেউ নেই। তিনি জরির মাকে ডাকেন, বলেন, *দেখ জরির মা, এই সংসারে আমার শান্তি নাই। আমার ত কপাল পুড়ছে, লেখাপড়াডা যেদিন বন্ধ করল, সেইদিনই। আইজ যদি লেখাপড়া জানতাম, তাইলে কি আর নিজের সংসারে নিজে বান্দিগিরি করি! ছেলেমেয়েগুলাও হইছে বাপের ভক্ত। আমারে মা বইলা গ্রাহ্যই করে না।*

জরির মা মার দুঃখ বোঝে না। তার নিজের দুঃখের সঙ্গে তুলনা করলে মার দুঃখ তার কাছে কিছুই মনে হয় না। তার বিয়ে হয়েছিল তিন সতিনের সংসারে, সতিনের জ্বালায় সে জ্বলেছে অনেক। স্বামীও তাকে কম জ্বালায়নি। জরি জন্ম নেওয়ার পর জরির মাকে ভাত দেওয়া বন্ধ করে দিল। শেষে তো *লাত্থি গুঁতা* দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিল। আর এ সংসারে মা তো অন্তত ভাত পাচ্ছেন। সতিন? সে তো অন্য বাড়িতে থাকে, এক বাড়িতে নয়। জরির মার কাছে মার সংসারকে সোনার সংসার বলে মনে হয়।

জরির মা মার কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমি নিশ্চিত, দীর্ঘশ্বাসটি নকল।

এত দুঃখ নিয়েও মা বাড়িঘর সাজান, খাট আলমারি টেবিল চেয়ার আলনা সরিয়ে নতুন জায়গায় ফেলেন। দেয়ালের কাছে খাট ছিল, সেটি একেবারে উল্টোদিকে জানালার কাছে নিয়ে যান, আলমারি ডানদিক থেকে সরে বাম দিকে আসে। মার এ কাজটি আমার খুব পছন্দ হয়। ঘর একেবারে নতুন নতুন লাগে। মনে হয় নতুন জীবন শুরু হল। কেবল ঘর সাজানোই নয়, মা উঠোন মাঠ ফলগাছে ফুলগাছে শাকে সবজিতে সাজিয়ে রাখেন। এক এক ঋতুতে এক একরকম। হেলে পড়া গাছগুলোর কিনার দিয়ে বাঁশের কঞ্চির বেড়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, মাটি কাটা মাটি ফেলা নিজেই করেন। শাক সবজি মা খুব ভালবাসেন। ছড়া বলে বলে হলেও তিনি আমাদের তাজা ফল, টাটকা শাক সবজি খাওয়াতে চেষ্টা করেন। মার ধারণা ছড়া শুনলে খুশিতে নাচতে নাচতে শাক খাব আমরা। মার আরও ধারণা মার হাতে লাগানো শাক সবজির প্রতি মার মত আমাদেরও আলাদা দরদ আছে। সারাবছরই পাতে সবজি তুলে দিয়ে বলেন, *গাছের লাউ, গাছের সিম, গাছের টমেটো, গাছের এটা, গাছের সেটা।*

একদিন খেতে গিয়ে মার মুখে *গাছের লাউ* উচ্চারিত হতেই আমি খপ করে ধরি।

গাছের লাউ মানে? লাউ তো গাছেই ধরে। গাছ ছাড়া লাউ হয় নাকি!

মা বলেন, *এইডা গাছের, এইডা কিনা লাউ না।*

কিনা লাউ কি মাটির নিচে হয়?

ধুর, লাউ মাটির নিচে হইব কেন?

তার মানে লাউ গাছেই ধরে।

গাছেই ত ধরে!

তাইলে কও কেন যে এইডা গাছের লাউ! বাজার থেইকা কিন্যা আনা লাউও তো গাছের লাউ।

আরে এইডা বাড়ির গাছের।

সেইটা কও, বাড়ির গাছের। কথাও ঠিকমত কইতে পারো না।

আমি মূর্খ মানুষ,লেখাপড়া শিখি নাই। তোমরা শিক্ষিত, তোমরা গুছাইয়া কথা কইবা। মা থেমে থেমে বলেন।

লেখাপড়া নিয়ে মার আক্ষেপ সারা জীবনের। আমার মেট্রিক পরীক্ষার আগে আগে, আমি যখন টেবিল ভরা বইখাতার ওপর উবু হয়ে আছি, মা মিনমিন করেন, *প্রাইভেটে মেট্রিকটা যদি দিয়া দিতে পারতাম।*

আমি হেসে উঠি, *এই বয়সে তুমি মেট্রিক দিবা?*

কত মানুষে তো দেয়। গণ্ডগোলের সময় আমার চেয়েও কত বয়স্ক মানুষেরা মেট্রিক দিয়া দিল, তখন তো সবাইরে পাশ করাইয়া দিছে সরকার। ওই চাকলাদারের বউতো গণ্ডগোলের সময়ই নকল কইরা মেট্রিকটা পাশ করল। তোমার বাপেই তারে প্রাইভেটে মেট্রিক দেওয়াইছে।

তা ঠিক, একাত্তরের ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম যে মেট্রিকের আয়োজন হয়েছিল, যে যেমন ইচ্ছে বয়সে যত বড়ই হোক, অ আ ক খ হয়ত লিখতে জানে কেবল, বসে গেছে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে। গণহারে নকল। গণহারে পাশ। সেই গণহারে রাজিয়া বেগম পার হয়ে গেছেন।

এহন তো নকল চলে না, তুমি কেমনে পাশ করবা?

নকল করতাম কেন?

তাইলে পাশ করবা কেমনে?

আমি পইড়া পাশ করবাম।

এক পেট হাসিকে বুক-চাপা দিয়ে বলি, *তোমার কি মনে থাকবে পড়া?*

কেন মনে থাকবে না? থাকবে।

তুমি তো হাতের মধ্যে চাবি লইয়া সারা বাড়ি চাবি খুঁইজ্যা বেড়াও। মনে থাকবে কেমনে?

তুমি আমারে অঙ্কডা একটু দেখাইয়া দিলেই দেখবা আমি পাশ কইরা যাব। বাংলা ইংরেজি তো কোনও ব্যাপার না। ইতিহাস ভূগোল ঝাড়া মুখস্ত কইরা ফেলব।

মার দুচোখ চিকচিক করে স্বপ্নে। স্বপ্ন থাকে চোখে, স্বপ্ন চোখে রেখেই বলেন, *পরীক্ষা দিলে ঠিকই পাশ করবাম। ক্লাসে আমি ফার্স্ট গার্ল ছিলাম, প্রত্যেক পরীক্ষায় ফার্স্ট হইতাম। বিয়া হইয়া যাওয়ার পরও ইস্কুলের মাস্টাররা কইছিল পড়াডা ছাড়িস না রে ঈদুন।* মাকে নিঃসংশয়ে নিঃসংকোচে বলে দিই তুমি এই সব কঠিন জিনিস বুঝে উঠতে পারবে না। বলে দিই, তোমার ওই গণ্ডগোলের সময় এখন আর নেই, এখন আর যা

ইচ্ছে তাই করা যায় না। বলে দিই তোমার বয়স অনেক, এত বেশি বয়সে মেট্রিক দিতে গেলে মানুষ হাসবে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কোনও এক কালে ইশকুলের সেরা ছাত্রী থাকার গৌরব বয়সের লজ্জার আড়ালে ঢেকে যায়। মা অন্য ঘরে গিয়ে একা বসে থাকেন। অন্য ঘরে হু হু হাওয়ার সঙ্গে মা একা বসে কথা বলেন।

বাবার কানে খবরটি যায় যে মা মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। বাবা হা হা করে হাসলেন, সঙ্গে আমরাও। অবকাশ জুড়ে তখন হা হা হো হো হি হি। মা চুপসে যেতে থাকেন, মার স্বপ্নগুলো গেলাস পড়ার মত, এবাড়ির মেঝে যেহেতু শক্ত ইটের, পড়ে ভেঙে যায়। মা শেষ অবদি লেখাপড়ার শখ মেটান অন্যভাবে। পীরবাড়িতে মেয়েরা আরবি শেখে, বয়সের কোনও ঝামেলা নেই, যে কোনও বয়সের মেয়েই শুরু করতে পারে। পীরবাড়ি থেকে আরবি ভাষাশিক্ষা বই খান তিনেক নিয়ে এলেন মা আর নানির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিনে আনলেন বড় বড় লম্বা খাতা। ওসব খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে আরবি ব্যাকরণের বিধিবিধান অনুশীলন শুরু করলেন ঠিক যেভাবে আমরা ইংরেজি ভাষা শিখেছি--সে খেলা করে, সে খেলা করিতেছে, সে খেলা করিয়াছে, সে খেলা করিল, সে খেলা করিতেছিল, সে খেলা করিয়াছিল,সে খেলা করিবে। মার বাংলা হাতের লেখা যেমন সুন্দর, আরবিও তেমন।

আরবি পইড়া কি হইব মা? আমি জিজ্ঞেস করি।

মা মধুর হেসে বলেন, *আল্লাহর কালাম পড়া যাবে। কোরান হাদিস বুইঝা পড়া যাবে।*

আমাদের সামনে পরীক্ষা, আমরা যত না পড়ি, মা তার চেয়ে বেশি পড়েন, রাত জেগে পড়েন। মার চিঠি লেখা নেই। গপ্প মারা নেই। মার লেখাপড়া বাবার নজরে পড়ে। তিনি বাড়ি ফিরেই ডাকেন, *ছাত্রীসকল এদিকে আসো।*

আমি আর ইয়াসমিন বাবার সামনে দাঁড়াই। বাবা ধমক দিয়ে ওঠেন, *বাড়ির বড় ছাত্রী কই?*

আমি হতবাক, আমিই তো বাড়ির বড় ছাত্রী, বাবা কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না! দরজার পর্দা আঙুলে পেঁচানো বাদ দিয়ে বাবার চোখের সামনে দাঁড়াই যেন স্পষ্ট দেখেন, এমনিতেও একেবারে চোখের সামনে না দাঁড়ালে তিনি কোনও দাঁড়ানোকেই ঠিক দাঁড়ানো মনে করেন না।

আমার দিকে চোখ রেখেই বলেন, *বড় ছাত্রীরে ডাকো।*

আমি তো এইখানে। আমি বলি।

বাবা বলেন, *তুমি কি পি এইচ ডি দিতাছ?*

না।

একজন যে পি এইচ ডি দিতাছে, তারে ডাইকা লইয়া আস।

আমার তখনও মাথায় খেলে না বাবা কার কথা বলছেন। ইয়াসমিন বুদ্ধিতে আমার চেয়ে পাকা। ও চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকল, *মা, তাড়াতাড়ি আসো। বাবা ডাকতাছে।* মা খাতা কলম বন্ধ করে বাবার সামনে এলেন। মা যে বাজারের লিস্টি দিয়েছিলেন, সেই লিস্টিটি হাতে নিয়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, *লবণ শেষ হইল কেমনে?*

মা শান্ত গলায় বললেন, *রাইন্ধা।*

কি এত রাজভোগ রান্ধো যে আড়াই সের লবণ দুই দিনে শেষ হইয়া যায়?

এত জানার ইচ্ছা থাকলে পাকঘরে বইয়া থাইকা দেইখেন কেমনে শেষ হয়।

লবণের দাম সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?

মা কোনও উত্তর দেন না।

বাবা দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, *আমি পরের মাসে লবণ কিনবাম, এই মাস লবণ ছাড়া খাইতে হইব সবার।*

আমি লবণ ছাড়াই খাইতে পারি, আপনের ছেলেমেয়েরা পারে না, সবার পাতে আলদা লবণ লাগে। বলে মা অন্য ঘরে চলে যান। বারান্দার টেবিলে মার বইখাতাগুলো পড়ে থাকে, হাওয়ায় উড়তে থাকে খাতার পাতা।

বাবা রাতে ফিরে জরির মাকে ডেকে গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করেন, *আইচ্ছা নোমানের মা কি পিঁয়াজ রসুন চাইল ডাইল তেল এইগুলা সরায়?*

কি জানি আমি জানি না।

দেখ নাই কিছু নিয়া যাইতে?

কত কিছুই তো নেয়।

কি নেয়?

ব্যাগের মধ্যে ভইরা কি নেয়, তা কি আমি দেহি! আমি কামের মানুষ, কাম করি।

ব্যাগ লইয়া বাইর হয় নাকি?

তা কি আর বাইর হয় না! কুনুহানো গেলে তো হাতে ব্যাগ একটা থাহেই।

কত বড় ব্যাগ?

ব্যাগ কি আর ছোড হয়, ব্যাগ ত বড়ই।

জরির মা বাবার ঘর থেকে ফিরলে মা জিজ্ঞেস করেন, *তোমারে ডাইকা কি জিগাইল?*

জিগাইল আপনে চাইল তেল এইগুলা লইয়া বাপের বাড়ি যান কি না।

কি কইছ তুমি?

কইছি আমি এইতা জানি না।

মা ফুঁসে ওঠেন, *তুমি জান না? আমার বাপের কি চাইল ডাইল নাই নাকি? আমার বাপ কি পথের ফকির হইয়া গেছে? বাপের বাড়িতে এহনও বিরাট বিরাট পাতিলে রান্ধাবাড়া হয়, খাওনের অভাব নাই ওইহানে। আমগোর বাজান দালান তুলে নাই, কিন্তু খাওয়া দাওয়ায় কাপড় চোপড়ে অভাব রাখে নাই কোনওদিন। বড় বড় রুইমাছ, বড় বড় পাঙ্গাস মাছ,কাতল মাছ কিইনা আনে, পচা মাছ বাড়িত পাডায় না। আমিই উল্ডা মার কাছ থেইকা টাকা পয়সা আনি। আমারে এত মিথ্যা অপবাদ দিতাছে, আল্লার গজব পড়ব, ধ্বংস হইয়া যাইব এই দুষ্ট লোকের দেমাগ।*

মা অর্ধেক রাত অবদি বিড়বিড় করেন। জরির মা মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে বিড়বিড় শোনে।

পরদিন রান্নাঘরে গিয়ে আলমারি খুলে আনাজপাতি কি কি আছে, কবে কি কিনেছেন, কবে কি শেষ হল তার পই পই হিশেব নিলেন বাবা। হিসেবে গরমিল হচ্ছে বলে তিনি বড় একটি তালা কিনে এনে রান্নাঘরের আলমারিতে লাগিয়ে দিয়ে বললেন এখন থেকে চাল ডাল, পেঁয়াজ রসুন যা লাগবে, তিনি তালা খুলে বের করে দেবেন। চাবি প্যান্টের পকেটে নিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। পরদিন বাড়ি থেকে বেরোবার আগে আলমারির তালা খুলে মাকে ডেকে, *আজকে দুপুরে মাগুর মাছ রান্না হবে, এই ধর একটা পিঁয়াজ। আর মসুরির ডাল এক কাপ রানলেই চলবে, ডালের জন্য এই নেও দুইটা কাঁচা মরিচ, একটা রসুন* বলতে বলতে হাতে দেন আনাজপাতি, এক ছটাক তেলও দিয়ে যান মেপে।

বিকেলে ফিরে রাতের রান্নার আগে হিশেব করে বের করেন, কি লাগবে এবং কতটুকু। চাল লাগলে চাল, ডাল লাগলে ডাল, আর চামচে করে লবণ। এভাবেই চলে।

মা মার মত বেঁচে থাকেন। মাকে খুব নজরে পড়ে না। পড়ার টেবিলে বসে যখন মুখ গুঁজে রাখি বইয়ে, মা টেবিলে গরম দুধ রেখে যান এক গ্লাস, দুপুরবেলায় রেখে যান শরবত, শরবতের বা দুধের গেলাসেই নজর পড়ে, মাকে নয়। মা যখন পায়খানা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে বসে পড়েন, মাথা বনবন করে ঘুরছে বলে উঠে দাঁড়াতে পারেন না, *কি হয়েছে* জিজ্ঞেস করলে ভাঙা কণ্ঠে বলেন, *পাইলসের রক্ত যাইতাছে খুব বেশি, শরীরটা দুর্বল লাগতাছে,* মার শরীর বা শরীরের দুর্বলতার দিকে নজর পড়ে না, পড়ে *পাইলস* শব্দটির দিকে।

পাইলস কি মা?

পায়খানার রাস্তায় একটা গুটি মত হয়, তারপর পায়খানা কষা হইলে রক্ত যায়।

পাইলসের চিকিৎসা কি?

তর বাপরে কত কইলাম, পাইলসটার একটা চিকিৎসা করাইতে। কই কিছু তো করে না।

হুঁ।

তাই ত কই, বেলের শরবত খাও, শাক সবজি বেশি কইরা খাও। শাক সবজি তো মুখেই তুলতে চাও না। শাক না খাইলে পায়খানা নরম হইব কেমনে! তোমারও ত কষা পায়খানা। পায়খানা নরম থাকলে অর্শ রোগ হয় না।

অর্শ রোগ কি?

ওই পাইলসের আরেক নাম অর্শ।

তাইলে যে রাস্তার কিনারে গাছে টাঙানো সাইনবোর্ড থাকে, এইখানে অর্শ রোগের চিকিৎসা হয়, সেইটা কি এই রোগ?

হ।

মা ধীরে সিঁড়ির কাছ থেকে শরীরটি তুলে ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকেন। শরীর দুর্বল তাঁর। আমি পাশের ঘরে *অর্শ* শব্দটি নিয়ে ভাবতে থাকি, এত নোংরা একটি রোগের এত চমৎকার নাম কি করে হল!

মার এমনই জীবন। এই জীবন আমরা দেখে যেমন অভ্যস্ত, যাপন করেও অভ্যস্ত মা। একদিন কালো ফটকের শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি, এক অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলে মা ফটক বন্ধ করলেন।

জিজেস করি কে এসেছিল।

কামালরে খুঁজতে আইছিল।

কে? কি নাম?

চিনি না, নাম কয় নাই।

কি কইল?

জিগাইল, আপনে কে? আমি কইলাম আমি কেউ না, এই বাসায় কাজ করি।

এইটা কইলা কেন?

কামালের মা পরিচয় দিলে এই ছেলেই হয়ত অবাক হইত। ছিঁড়া ময়লা শাড়ি পিন্দা রইছি।

আমি চুপ হয়ে যাই। মা হয়ত ঠিকই করেছেন মিথ্যে বলে, মনে হয়। ছোটদার ইজ্জত বাঁচিয়েছেন মা। মা যদি বলতেন তিনি কামালের মা, তবে আমার আশংকা হয় যে ছোটদার সঙ্গে দেখা হলে ওই ছেলে বলত, *তোমার বাসায় দেখলাম একটা কাজের বেটি, বলল সে নাকি তোমার মা লাগে! কাজের বেটিদের আজকাল স্পর্ধা বাড়ছে অনেক।*

মাকে রাখতেও পারি না, ফেলতেও পারি না। মা আমাদের জন্য রান্না করবেন, ক্ষিধে না লাগার আগে খেতে দেবেন, বাবা মারমুখি হলে বাবাকে সরিয়ে নেবেন বলে বলে যে, *মেয়েরা হইল ঘরের লক্ষ্মী,ওদের গায়ে হাত তোলা ঠিক না, ওরা আর কয়দিন আছে, পরের ঘরে ত চইলা যাইব।* মার হস্তক্ষেপে বাঁচি বটে, কিন্তু *পরের ঘরে চইলা যাইব,* বাক্যটি আমার গায়ে এত বেশি জ্বালা ধরায় যে হিংস্র বাবার চেয়ে দরদী মায়ের ওপরই আমার রাগ হয় বেশি।

পরের ঘরে চইলা যাইব মানেটা কি?

পরের ঘরে তো যাইতেই হইব! বিয়া শাদি হইলে যাইতে হইব না!

না যাইতে হইব না।

তা কি হয় নাকি?

হয়। অবশ্যই হয়।

সারাজীবন কেউ কি বাপের বাড়িতে থাকে?

থাকে। আমি থাকি। আমি থাকব।

বিয়ে শব্দটি শুনলে আমার গা রি রি করে ওঠে।

বিয়া হইয়া গেলেই তো মেয়েরা পর হইয়া যায় মা। মেয়েরা হইল বাপের বাড়িতে একরকম অতিথি, যত পারো তাদেরে আদর যত্ন কর, পরে কপালে কি আছে সুখ না দুঃখ,কে জানে!

নরম সুরে বলা হলেও মার শব্দগুলো বিষলাগানো তীরের মত বেঁধে আমার গায়ে। জন্মানো হল, শেকড় ছড়ানো হল, এতটা বছর গায়ে গায়ে লেগে থেকেও আমি কি না পর, আর বাইরে বাইরে থাকা, বিয়ে করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, বা বিয়ে করার স্বপ্নে বিভোর ছেলেরা আমার চেয়ে আপন মার! আমি তো বাবা সে যত পাষণ্ডই হোক, মা সে যত অসুন্দরী আর অশিক্ষিত হোক, ভাই সে যত হাড়কিপ্টে আর কুচুটে হোক, বোন সে যত বেয়াদপ আর বাচাল হোক, কাউকে পর ভাবতে পারি না। এরাই আমার সবথেকে আপন। অন্য এক অচেনা লোক আলটপকা এসে এদের চেয়ে বেশি আপন হয়ে উঠবে আমার! অসম্ভব! মাকে ইচ্ছে করে ঠেলে সরিয়ে দিই। ইচ্ছে করে মার মুখের ওপর ঠকাস করে দরজা বন্ধ করে দিই। *মা খাবার দাও, মা আমার জামাটা কই, গোসলের সাবানটা আবার কই গেল মা,* রিক্সাভাড়া হাতে না থাকার পরও মার ভরসায় রিক্সা চেপে বাড়ি এসে, *মা তিনটা টাকা দাও তো* অথবা *মা গো, আমার জ্বর আসতাছে* বললে মা কপাল ছোঁবেন, শুইয়ে দেবেন, শীতে হি হি করা শরীর ঢেকে দেবেন গরম লেপে,বাবাকে খবর পাঠাবেন জ্বর দেখে যেতে, ওষুধ দিয়ে যেতে--এররকম ছোটখাট ব্যাপার ছাড়া মাকে জীবনের অন্য কিছুতে আমার মনে হয় না, কিছুমাত্র প্রয়োজন।

কালো ফটকের শব্দ হলে, বাবার ফটক খোলার শব্দ বাড়ির যে কোনও জায়গা থেকেই টের পাই যদিও, সামান্য সন্দেহ হলে আগে জানলা থেকে দেখি এল কে, সে যদি বাবা হয়, দৌড়, দৌড়ে যে যার নিজের জায়গায়।মুশকিল হল, দুপুর দুটো আড়াইটায় বই সামনে বসে আছি দেখতে পেলে ঠিক ধরে ফেলেন, তাঁর আসার শব্দ শুনে বসেছি, তখন উল্টোটা হয়,মনীষীদের বাণী ঝাড়ার আগে খিস্তি ঝেড়ে নেন। অবশ্য পরীক্ষার আগে আগে হলে দুপুর দুটো কী রাত দুটো হোক, ওখানেই বসে থাকা চাই। বাবা বলেন, *চেয়ারে জিগাইরা আঠা লাগাইয়া বইয়া লেখাপড়া কর।* আড়াইটায় বাবা এলেন। বাবা এলে কেবল নিজে সতর্ক হব তা নয়, বাড়ির সবাইকেই সতর্ক করতে হয়। কারণ আমি না হয়,

যে সময়ে যেখানে থাকা দরকার সেখানে আছি, পড়ার ঘর থেকে সাদাসিধে ভালমানুষের মত বেরিয়ে কাঁধে গামছা নিয়ে গোসলখানায় যাচ্ছি, দুপুরে নাওয়া বা খাওয়া ব্যাপারগুলো যেহেতু *চলে* বলে বাবা মনে করেন, কিন্তু ইয়াসমিন হয়ত আমগাছের মগডালে বসে আছে অথবা রান্নাঘরে অথবা ছাদে, যেসব, বাবা কিছুতেই মানেন না যে *চলে*, এবং যা চলে না তার কিছু কোথাও হতে দেখলে যেহেতু বাড়িতে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেবেন--ইয়াসমিনের পিঠে তো পড়বেই কিছু, আমার পিঠও বাদ যাবে না, তাই বাবাকে দেখে, আমি জানিয়ে দিই, আসলে যেই দেখে, তারই একরকম অলিখিত দায়িত্ব চেঁচিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বাবার আগমন বার্তা ঘোষণা করে দেওয়া, সাধারণত ঘর থেকে বারান্দা অবদি দৌড়ে *বাবা আইছে*, বললেই বাড়ির প্রাণীগুলো যে যেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, উর্ধশ্বাসে ছুটে যাকে যেখানে বাবা ভাবেন যে মানায়, যায়, যেমন, বাড়ির কাজের মেয়েটি যদি বারান্দায় জিরোতে থাকে, সে ছুটে রান্নাঘরে সেঁধোয় বাসনপত্র মাজতে, নয়ত জল ভরতে কলপারে যায় কিছু একটা করতে, বাবা যেহেতু কারও বসে থাকা বা শুয়ে থাকা সইতে পারেন না। জানিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াসমিন উঠোনে স্তূপ করে রাখা নারকেল পাতা ছিঁড়ে মাথার মুকুট বানাচ্ছিল, ফেলে দৌড়ে ঘরে ঢোকে, ঘোষণা কে শুনেছে না শুনেছে কে কোথায় অবস্থান নিল না নিল জানার আগে দ্রুত নিজের অবস্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, নিজের চরকায় তেল তো দিতে হবে না কি! ঘোষণা সেরে, গামছা কাঁধে যখন আমি গোসলখানার দিকে হাঁটছি, দেখি, মা খাচ্ছিলেন, বন্ধ করে ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে আধখাওয়া থালা রেখে হাত ধুয়ে নিলেন। আমি গোসলখানায় ঢুকে গেলাম, ইয়াসমিন অঙ্ক করতে বসল, আর মা হাত ধুয়ে কুলোয় চাল নিলেন বাছতে, রাতের রান্নার প্রস্তুতি। গোসলখানা থেকে বেরিয়ে মাকে গলা চেপে জিজ্ঞেস করলাম, *বাবা গেছে গা?*

যায় নাই, শুইছে।

তুমি না খাইতাছিলা, খাওয়া থেইকা উইঠা পড়লা যে!

মা চাল থেকে কাঠপোকা সরাতে সরাতে বললেন *তর বাবা কোনওদিনই আমার খাওয়া সহ্য করতে পারে না।*

তুমি ত আর না খাইয়া বাঁইচা রইছ না! এইডা কি বাবা জানে না?

জানে। তবু চোখের সামনে দেখলে চিড়বিড় করে।

বাবার ভয়ে আমরা খেলা ছেড়ে যেমন উঠে যাই, মা তেমন খাওয়া ছেড়ে উঠে যান।

বাড়ির সবাইকে খাইয়ে মা রান্নাঘরে অবেলায় খেতে বসেছেন, কাজের বেটি বা মেয়ে যেই থাকে বসেছে সঙ্গে, এররকম দৃশ্য দেখেই আমি অভ্যস্ত। এর বাইরে, উৎসব পরবের দিন হলেও বাবা বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মা খেতে বসেন না। কেন, এই প্রশ্ন কেউ কখনও করেনি, কারও মনে এই প্রশ্নটি নেই বলেই করেনি। আমরা যখন খাব, মা পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের পাতে বেড়ে দেবেন খাবার, মা তাই করেন, এবং মাকে তাই করলে মানায় বলে বাবা যেমন জানেন, আমরাও জানি। মা চমৎকার রাঁধেন এবং বাড়েন বলে বাড়ির সবার বিশ্বাস।

ইশকুল থেকে বিকেলে ফিরে বেশ কদিন এমন হয়েছে যে ক্ষিধে পেটে খাচ্ছি, ওদিকে মা সারাদিন পর তখন দুপুরের খাবার খেতে বসেছেন, ভাত মাখছেন, মার মুখে চোখ পড়তেই দেখি ঠোঁটের কোণে অপ্রতিভ একটি হাসি, ভাতের থালা নিয়ে শেষ অবদি আমার আড়ালে চলে যান অথবা পরে খাবেন বলে হাত ধুয়ে ফেলেন।

হেসে বলি, *কি উইঠা গেলা যে!তুমি শরম পাও নাকি!*

মা কোনও উত্তর দেন না। মার হয় না, আড়াল ছাড়া খাওয়া ব্যাপারটি মার একেবারেই হয় না। মা আসলেই শরম পান কারও সামনে খেতে। বাবা বাড়ি এলে অবশ্য মা আড়ালেও খান না, বাবার যে আবার আনাচ কানাচের খবর নেওয়ার অভ্যেস আছে, আড়াল বলে কিছুই এ বাড়িতে তখন থাকে না। বাড়িতে, ধরা যাক বাবা শুয়ে রইলেন, শুয়ে রইলেন বলে যে আমরা খেলতে নামব বা গল্পের বইয়ে হাত দেব তা অসম্ভব কারণ শোয়া থেকে উঠে যে কোনও মুহূর্তে তিনি বেড়ালের মত পা ফেলে ফেলে সারা বাড়ি বিচরণ করতে পারেন, সুতরাং তিনি বাড়িতে, সে যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন, এমনকি ঘুমিয়ে, কেউ এমন কিছু করার উদ্যোগ নেয় না, যা বাবা মনে করেন, উচিত নয়।

হঠাৎ হঠাৎ বিকেলে বাড়িতে ঢুঁ মারেন বাবা। এমনই একদিন ঢুঁ মারতে গিয়ে, কালো ফটকের শব্দও কেউ সেদিন পায় নি, কোনও ঘোষণাও কেউ দেয়নি সতর্ক হবার, বাবা রান্নাঘরে ঢুকে পেলেন মাকে, খাচ্ছেন।

এত খাও কি? সারাদিন খালি খাওয়া আর খাওয়া। শইলে তেল বাইড়া যাইতাছে খাইতে খাইতে।

শুনে, মা থালা সরিয়ে হাত ধুয়ে নিলেন।

আমি শুনলাম, বাড়ির সবাই শুনল। আমাদের কাছে, এ অনেকটা, রাতে পড়ার টেবিলে বসে ঝিমোতে থাকলে বাবা যেমন বলেন, *এত ঘুম আসে কেন! দিন রাইত খালি ঘুম আর ঘুম, শইলে এত আরাম কোত্থে আইল? পিঠে মাইর পড়লেই আরাম ছুইটা যাইব* র মত।

ছোটদার সঙ্গে শিল্পসাহিত্য নিয়ে যেমন, রাজনীতি নিয়েও আলোচনা জমে ওঠে।

আচ্ছা ছোটদা ক্যুর পর কেন মেজর ডালিম, রশিদ, ফারুকরে দেশ ছাইড়া যাইতে হইল?

আরে তলে তলে ত একটা সেকেন্ড ক্যু হইয়া গেছে। তখন তো আর ডালিমদের পাওয়ার নাই।

আর সফিউল্লাহ? সে তো সেনাবাহিনী প্রধান ছিল। তারে কেন মাইরা ফেলল না? সে তো মুজিবের পক্ষের ছিল।

মুজিব ত তারে ফোনও করছিল রাতে, বত্রিশনম্বরে আর্মি পাঠাইতে। সফিউল্লাহ জিয়ারে ডাকল, ভোরবেলা জিয়া আইসা কইল দরকার নাই বত্রিশ নম্বরে যাওয়ার। সফিউল্লাহরও করার কিছু ছিল না।

তখন সফিউল্লাহ বুইঝা ফেলছে যে জিয়া তার অর্ডার মানতাছে না!

বুঝব না মানে! সফিউল্লাহ তহন একরকম হাউজ এরেস্ট। আর্মি চিফের অর্ডার কেউ মানতাছে না।

জিয়ারে কে সেনাবাহিনীর প্রধান বানাইল? মোশতাক, নাকি জিয়া নিজেই নিজেরে বানাইল!

কনসপিরেসিতে এরা সবাই ছিল।

খালেদ মোশাররফ যে জিয়ারে বন্দি কইরা ক্ষমতা নিয়া নিল, সেই খালেদ মোশাররফরে তো তিনদিন পরই কর্ণেল তাহের মাইরা ফেলল। তাইলে জিয়া কেন মারল কর্ণেল তাহেররে? জিয়ার ভালর জন্যই তো কর্ণেল তাহের বিদ্রোহডা করছিল।

তাহের তো খালেদ মোশাররফরে সরাইয়া দিয়া জাতীয় সরকার গঠন করতে চাইছিল। জিয়ারে চায় নাই।

কর্ণেল তাহের তো মুক্তিযোদ্ধা ছিল। আবার তো যুদ্ধে পা-ও হারাইছিল। যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধারে কি ফাঁসি দেওয়া যায়? আইচ্ছা, কোনও রাজাকাররে কি ফাঁসি দেওয়া হইছে আজ পর্যন্ত?

না। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম ফাঁসি একটা মুক্তিযোদ্ধার হইল।

জিয়ার সাথে মেজর ডালিমের বিরোধটা আমি ঠিক বুঝতে পারতাছি না।

তখন আর্মির ল এন্ড অর্ডার নষ্ট হইয়া গেছে। জিয়া সফিউল্লাহরে বঙ্গভবনে বাইন্ধা রাইখা নিজেরে জেনারেল ঘোষণা করল, কিছু লোক তার পক্ষে আইল, কিছু বিপক্ষে গেল।

ডালিম কি বিপক্ষে গেছিল?

না। ডালিমরে বিদেশ পাঠাইয়া দেওয়ার মূল কারণডা হইল, জিয়া চায় নাই, একবার যারা ক্যু এ সরাসরি জড়িত ছিল, তারা তার আশেপাশে থাক। ক্যু কইরা একবার অভ্যাস হইলে যে বারবার ক্যু করতে ইচ্ছা করে।

তাইলে রিস্ক সরাইয়া দিল?

হ। কইতে পারস। যাওয়ার আগে জেলহত্যা কইরা গেল। চারনেতারে খুন কইরা গেল। ওদেরে দিলও তো ভাল ভাল চাকরি দিয়া পাঠাইয়া, এমবাসাডার কইরা দিল ডালিমরে। ডালিমও খুশি রইল, জিয়াও যা পাইতে চাইছিল,পাইল।

মা আমাদের আলোচনার মধ্যে আচমকা ঢুকে বলে বসলেন *ডালিম? ডালিম তো পাকছে গাছে, একটা খাইয়া ল না!*

আমি ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠি।

আরে রাজনীতির কথা হইতাছে, গাছের ডালিমের কথা না।

রাজনীতির কি কথা?

বুঝবা না।

বুঝাইয়া কইলেই ত বুঝি।

ক্যু বুঝ? ক্যু?

ক্যু? রাইতের অন্ধকারে দেশের সরকাররে মাইরা ফেলারে তো ক্যু কয়, না?

মার কথায় এত বিরক্ত লাগে যে বলি, *যাও তো মা! এইসব আলোচনা বুঝার ক্ষমতা তোমার নাই।*

মা বেরিয়ে যান। বারান্দায় ভিখিরি বসা, ওদের সঙ্গে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে ওদের চালচুলোহীন জীবনের কথা শোনেন, মা ওদের কথা বোঝেন, ওরাও মার কথা। বন্যায় ভেসে গেছে কারও ঘর, কারও বাবা চলে গেছে আর ফেরেনি, কারও স্বামী মরে গেছে, কেউ অন্ধ, কেউ খোঁড়া, কারও জরায়ু বেরিয়ে এসেছে বাইরে। জরায়ু বেরিয়ে আসা দুলুর মাকে মা আলাদা খাতির করেন। এক মুঠির বদলে এক পোয়া চাল ঢেলে দেন দুলুর মার টোনায়, আর শুকনো মুখ দেখলে আগ বাড়িয়ে বলেন, *দুলুর মা দুইডা খাইয়া যাও।* সেদিনও, ছোটদার ঘরে বসে রাজনীতি নিয়ে যখন গভীর চিন্তাভাবনা করছি, মা দুলুর মাকে খেতে দিয়েছেন। দুলুর মা বারান্দায় বসে মার দেওয়া ভাত তরকারি খেয়ে, হাত তুলে মার জন্য দোয়া করে *আমার মাথায় যতগুলা চুল, ততগুলা বছর তারে তুমি পরমায়ু দিও আল্লাহ। আমারে যে খাওয়াইল, তারে তুমি সুখে রাইখ। আমার আত্মাডারে যে শান্তি দিল, তারে তুমি শান্তি দিও আল্লাহ। ঝি পুত লইয়া সে য্যান সারাজীবন সুখে শান্তিতে থাকতে পারে।*

মা দুলুর মার দোয়া শোনেন ভাবলেশহীন মুখে।

পরীক্ষার পর আমার আনন্দ আর ধরে না। অখণ্ড অবসর জুড়ে এখন আমি যা মন চায় করে বেড়াব, সিনেমা দেখে, গল্পের বই পড়ে, কবিতা আবৃত্তি করে, পদ্য লিখে। কিন্তু বাবা হুকুম জারি করলেন কোনও সিনেমা পত্রিকা পড়া চলবে না, সিনেমার নায়ক নায়িকাদের ছবিঅলা বাজে সব পত্রিকা এ বাড়িতে নিষিদ্ধ। পড়তে যদি হয়ই তবে ভাল পত্রিকা পড়তে হবে। যে পত্রিকা পড়লে জ্ঞান বাড়ে। তো কি নাম সেই জ্ঞানদায়িনী ভাল পত্রিকাটির? আমি উৎসুক জানতে, আমার তখন কোনও কিছুতে নাক সিঁটকোনো নেই। পড়তে দিলে গোটা বিশ্ব পড়ে ফেলতে পারি। বাবার পছন্দের পত্রিকাটির নাম বেগম। বেগম আসতে লাগল বাড়িতে নিয়মিত। পত্রিকাটির আগাগোড়া পড়ে ফেলি একদিন, কি করে কি রান্না করতে হয়, কি করে চুল বাঁধতে হয়, কি করে সবজি-বাগান অথবা ফুলের বাগান করতে হয়, কি করে ঘর গোছাতে হয়, শিশুর যত্ন, স্বামীর যত্ন ইত্যাদিই বা কি করে,এসব। দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রায় একই জিনিস বেগমে, অর্ধেকের বেশি পড়া হল না। তৃতীয় সপ্তাহে অর্ধেকের চেয়েও কম। বেগম যে একেবারে না ছোঁয়া রয়ে গেল এরপর তা নয়, বরং বেগমের ওপর ঝুঁকে থাকা আগের চেয়ে বেশি বাড়ল, হাতে হাতে যেতে যেতে বেগমের কাগজ ছিঁড়ে যেতে লাগল। বেগমকে জনপ্রিয় করার কারণটি দাদা, হকারের হাতে বেগম দেখলে দাদাই প্রথম ছোঁ মেরে তুলে নেন। এরপরই ঝুঁকে থাকা, নিজে ঝুঁকবেন, বাড়ির সবাইকে ঝোঁকাবেন। পাঁচ ছটি কালো মাথা বেগমের ওপর ঝুঁকে রইল পুরো দুপুর এমনও হয়েছে, এরপর বাকি মাথাগুলো সরে গেলেও দাদার মাথাটি থেকে যায়, অলস বিকেলে, এমনকি রাতেও, সবাই ঘুমিয়ে গেলে। দাদা ঝুঁকে থাকেন এক ঝাঁক মেয়ের ছবিতে। বেগমে যারাই লেখে, গল্প কবিতা অথবা প্রাণী ও উদ্ভিদের যত্ন পদ্ধতি, তাদের ছবি ছাপা হয় এক পাতায়। এক সঙ্গে কুড়ি পঁচিশটি মেয়ের ছবি দেখতে পাওয়া যা তা কথা নয়, বেগম দাদাকে যত আনন্দ দেয়, তত আর কাউকে দেয় না। তিনি প্রতি সপ্তাহে বেগম থেকে মেয়ে পছন্দ করেন, আবার পরের সপ্তাহে সে মেয়ে বাতিল করে অন্য মেয়ে পছন্দ করেন। আসলে পরের সপ্তাহে বেগম এলে আবার নতুন কাউকে আগে যাকে পছন্দ করেছিলেন তার চেয়ে বেশি পছন্দ হয়ে গিয়ে গোল বাঁধায়। কোনটিকে যে তিনি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন নিশ্চিত না হয়ে আবার পরের সপ্তাহের বেগমের জন্য অপেক্ষা করেন, আরও ভাল যদি জোটে। দিলশাদ নুর নামের এক সুন্দরী মেয়েকে তিনি একবার পছন্দ করলেন কিন্তু তার কবিতায় *সেই যে গেছে সে আর ফিরছে না, ফিরে এলে আমি তার বুকে মাথা রেখে ঘুমোবো..* লাইনটি পড়ে দাদা ঠোঁট উল্টে বললেন *নাহ এরে বিয়া করা যাবে না।*

কেন যাবে না? আমি জিজ্ঞেস করি।

দেখলি না কোন বেড়ার লাইগা ও অপেক্ষা করতাছে!

আরে এইটা তো কবিতা।

কবিতা হোক তাতে কি হইছে!

কবিতায় যদি তুমি লেখ যে আকাশে উড়তাছ, তাইলে কি সত্যিই আকাশে উড়তাছ?

আকাশে সত্যিকার না উড়ি, মনে মনে তো উড়ি। কবিতায় তো মনের কথা লেখা হয়।

দাদা বাতিল করে দিলেন পছন্দ হওয়া দিলশাদকেও। দাদা যখন কাউকে বাতিল করেন, দাদাকে খুব বিমর্ষ দেখতে লাগে। যেন এইমাত্র হাতের মুঠো থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ পাখিটি উড়ে গেল। অবশ্য সুলতানার বেলায় দাদার তেমন মনে হয়নি। দাদার পত্রমিতা সুলতানা দাদাকে একটি শাড়ি পরা মোড়ায় বসা ছবি পাঠিয়েছিল, সেই ছবি নিয়ে দাদা অনেকগুলো রাত নির্ঘুম কাটাবার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই মেয়েকেই তিনি বিয়ে করবেন। নতুন কাপড় চোপড় বানালেন, নতুন সুগন্ধী কিনলেন, জুতোও কিনলেন একজোড়া। সকালে আড়াই ঘন্টা সময় খর্চা করে গোসল করে নতুন জামা কাপড় পরে, শিশির অর্ধেক সুগন্ধী গায়ে ঢেলে তিনি ঢাকায় রওনা হয়ে গেলেন। রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দেখি জিভে কামড় দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন দাদা। সকলে ঘিরে ধরি, কি হয়েছে, হয়েছেটা কি? দাদা তখনও জিভ থেকে দাঁত সরাননি, যখন সরিয়েছেন, একটি কথাই হাঁফ ছেড়ে বলেছেন, *বড় বাঁচাড়া বাঁচলাম।*

কেন?

পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনও কুৎসিত কিছু থাইকা থাকে, তাইলে ওই বেডি।

কও কি? ছবিতে ত সুন্দরই লাগতাছিল।

উফ। তরা যদি দেখতি বেডিরে। কাইল্যা পচা। পুইট্যা। বুইড়া। হাসলে উচা উচা দাঁতগুলা রাক্ষসের লাহান বাইর হইয়া পড়ে। পাতিলের তলার লাহান কালা মাড়ি। জীবনে কোনওদিন পেত্নী দেখি নাই, আজকে দেইখা আইলাম।

কেন, চুল ত দেখলাম কত লম্বা। পাছা ছাড়াইয়া যায়!

চুল। চুল দিয়া আমি কি করাম। চুল ধইয়া পানি খাইয়াম?

একটু থেমে বললেন, *মনে হয় নকল চুল লাগাইয়া ফটো তুলছে। সামনের উঁচা একটা দাঁতও নকল।*

দাদা সুলতানার জন্য রঙিন কাগজে মুড়ে কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো সেভাবেই ফেরত এনেছেন। সারাদিনের না খাওয়া দাদা হাপুস হুপুস করে খেয়ে পথের ধুলো কালি ধুয়ে দীর্ঘ ঘুম ঘুমোলেন।

সুলতানার স্বপ্ন দূর করে দিয়ে দাদা পরদিন থেকে বেগমে মন দিলেন। বেগম দিতে আসা হকারকে বলে দিই চিত্রালী পূর্বাণী আর বিচিত্রা দিতে। বলি বটে, কিন্তু এখন আর ইশকুল নেই যে রিক্সাভাড়া থেকে দুআনা চারআনা জমিয়ে রাখব, কাগজও বাড়তি নেই যে শিশিবোতলকাগজঅলার কাছে বিক্রি করে বেশ কটি আধুলি উপার্জন করব। পত্রিকা পড়ার জন্য মন আকুলিবিকুলি করে কিন্তু পত্রিকা কেনার টাকা যোগাড় করব কোত্থেকে! লোকে যেমন আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আমি করি দাদার ওপর। দাদার করুণার উদ্রেক সবসময় হয় না, দাদা আল্লাহতায়ালার মত দয়াশীল দানশীল হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না বরং হাড়কিপ্টে বলে তাঁর নাম আছে। রিক্সাভাড়া যেখানে দুটাকা, তিনি আজও সেখানে হাতে আট আনা দিয়ে রিক্সাঅলাকে ধমকে বিদেয় করেন। রিক্সাঅলার সঙ্গে তারস্বরে দাদার চিৎকার বাড়ির লোক তো বটেই, পাড়ার লোকও শোনে। এতে কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ দাদা করেন না, তাঁর ভাষ্য *এই তো কয়দিন আগেই আট আনা দিয়া আইছি।*

কয়দিন আগে মানে? মা বলেন, *সে ত পাঁচ বছর আগে।*

পাঁচ বছরকে দাদার *কয়দিন আগেই* মনে হয়।

হাতে পয়সা থাকলে রিক্সাঅলাকে দুটাকার জায়গায় চারটাকা দেন মা, রিক্সাঅলা যদি অভাবের কথা কোনওদিন বর্ণনা করে পথে, তবে কেবল টাকাই নয়, বাড়ি পৌঁছে খাটের তলে ডাঁই করে রাখা ঝুনা নারকেলের একটি বেছে রিক্সাঅলার হাতে দিয়ে বলেন, *পুলাপান নিয়া খাইও।* মার এসব আচরণ দেখে দাদা বলেন, *মা হইল নানার ডুপ্লিকেট। হাতে যা থাকে সব মাইনষেরে দিয়া দেয়।*

দাদা মোটেও মার চরিত্র পাননি। দাদার মন সবসময় বলে পৃথিবীর সবাই তাঁকে ঠকাচ্ছে, তাই তিনি ছলে বলে কৌশলে সবাইকে ঠকাতে চেষ্টা করেন। দোকানে গিয়ে দর কষাকষি করার অভ্যেস দাদার। সকলেই দামাদামি করে, কিন্তু দাদার তুলনা হয় না। দাদার সঙ্গে দোকানে গেলে আমাকে কম লজ্জায় পড়তে হয় না। দোকানি যদি চায় পঞ্চাশ, লোকে *তিরিশ টাকায় দিবেন? বা চল্লিশে হইব?* জিজ্ঞেস করে। পঞ্চাশ টাকা দাম শুনে দাদা বলেন, তিন টাকায় দিবেন? দোকানি হাঁ হয়ে থাকে। কোথায় পঞ্চাশ আর কোথায় তিন! দাদা সেই তিন থেকে সোয়া তিন সাড়ে তিন করে ওপরে ওঠেন। দোকানি শেষ অবদি কুড়ি বা একুশে রাজি হয়। রাজি হয় বটে, তবে বলে দেয় *কাস্টমার অনেক দেখছি ভাই, আপনের মত দেহি নাই। ঠগাইয়া গেলেন। লাভ ত হইলই না, আসল দামডাই উঠল না।*

দাদার ওপর ভরসা করি বটে, কিন্তু দাদার কৃপণতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ছোটদার পথ অনুসরণ করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকে না। দাদা একবার গোসলখানায় ঢুকলে যেহেতু ছোট বড় মাঝারি সব সেরে আসতে ঘন্টাখানিক সময় নেন, ঘরের আলনায় ঝুলে থাকা তাঁর প্যান্টের পকেটে কাঁপা একটি হাত ঢোকে আমার। দাদার পকেটে হাত ঢুকিয়েই হাতেখড়ি হয় এ বিদ্যের, তখন বাবার পকেটেও হাত যায়। কেবল হাত নয়, বুকও কাঁপে, হাতে পাঁচ টাকা দশ টাকার বেশি ওঠে না যদিও, কিন্তু শরমে মাথা নত করতে হয়, স্বস্তি জোটে না। এ বিদ্যে পরে ইয়াসমিনকেও আক্রান্ত করে।

ছোটদার ওপর দাদার রাগ দিন দিন বাড়ে। বাইরে যাওয়ার আগে দাদা তাঁর ঘরে ওষুধের বাক্স ঢুকিয়ে তালা দিতে শুরু করেছেন। কিন্তু ঘরে তালা তো আর দিবানিশি দেওয়া চলে না। দাদা বাড়ি থাকলে ঘরের দরজা খোলাই থাকে। দাদা বাড়িতে আছেন, কিন্তু নিজের ঘরে নেই, এরকম কোনও সময় দেখলেই ছোটদা আমাদের পাঠান ওঘর থেকে ওষুধ তুলে নিয়ে আসতে। ওষুধ হাতে করে নিয়ে আসতে গেলে বিপদ হতে পারে বলে দরজার তল দিয়ে পাচার করার উপদেশ দেন। দাদার আর ছোটদার ঘরে যে সবুজ কাঠের দরজা, তার তলে ওষুধের বোতল না হলেও ট্যাবলেট ক্যাপসুল পার হওয়ার মত ফাঁক আছে। ছোটদার একনিষ্ঠ বাহিনী আমি আর ইয়াসমিন প্রচণ্ড দুঃসাহস নিয়ে এই অপকর্ম করে যাই। এই খবরটি দাদার জানা হয়ে যায় একদিন। তিনি কাঠের দোকান থেকে মাপ মত একটি কাঠ এনে দরজার ফাঁক বন্ধ করে দেন। এরপরও যে ওষুধ পাচারে কিছু ভাটা পড়ে, তা নয়। ঢিলে জামার আড়ালে করে ক্যাপসুল ট্যাবলেট তো বটেই, ওষুধের বোতল আনার কাজেও আমরা ব্যবহৃত হতে থাকি। বিত্তবানের বিরুদ্ধে বিত্তহীনের লড়াই, সভ্য ভাষায় বলা যায়। এত কিছুর পরও ছোটদার সঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক গড়ে তোলা দাদার পক্ষে সম্ভব হয় না, হয় না দাদার হাড় ফোটানো ব্যারামের কারণে। দাদার এই হাড় ফোটানো ব্যারামটি দাদাকে অদ্ভুত আনন্দ দান করে। হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণ লেগে যে শব্দ হয়, সেটি তাঁর কর্ণকুহরে সংগীত মূর্ছনার সৃষ্টি করে। দাদা

প্রতিদিনই তাঁর শরীরের যত হাড় আছে, তা ফোটান। আঙুলের হাড়ের প্রতিটি সন্ধিস্থল তিনি উর্ধ্বে নিম্নে ডানে বামে যত দিকে সম্ভব টেনে শব্দ তোলেন। পায়ের সবগুলো আঙুল নিয়েও একই কাণ্ড করেন। এরপর মেরুদণ্ডের সবগুলো হাড় তার ফোটানো চাই। এক হাত থুতনিতে আরেক হাত মাথায়, এবার হেঁচকা টান মেরে মাথাটা ডানে ঘুরিয়ে নাও, এরপর বামে, ঘাড়ের হাড়গুলো ফুটে গেল। দাদা নিজে একাই পারেন এ কাজটি করতে, কিন্তু ছোটদার সহযোগিতায় জিনিসটি ভাল হয়। ছোটদাকে হাতের কাছে পেলে দাদা বিছানায় বা মেঝেয় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। শুয়েই কাতরকণ্ঠে *দে না কামাল দে, একটু টাইন্যা দে* বলে ছোটদাকে ডাকতে থাকেন, ছোটদার পা ধরতে বলা হলে পা-ও ধরবেন এমন। ছোটদা দাদার মেরুদণ্ডের ওপরের চামড়া শক্ত করে ধরে ওপরের দিকে হেঁচকা টানেন, ফোটে। ঘাড়ের নিচ থেকে শুরু করে ফোটাতে ফোটাতে একেবারে নিতম্বের কাছের শেষ হাড়টি অবদি ফোটান। দাদার মেরুদণ্ড ফোটানো শেষ করে ছোটদা একইরকম উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন, দাদা একইভাবে ছোটদার পিঠের সবগুলো হাড় ফুটিয়ে দেন। ছোটদাকে বর্জন করার সংকল্পে অটল থাকার অভিপ্রায়ে দাদা একদিন আমাকে বলেছিলেন পিঠের হাড় ফোটাতে। আমার হাতে সেই জাদু নেই, গায়ে যত শক্তি আছে, সবটুকু খাটিয়ে দাদার চামড়া উর্ধমুখি টেনেও একটি হাড়কেও নড়াতে পারি না।*যাহ ছেড়ি, তুই পারস না, কামালরে ডাক দে।* অগত্যা কামাল এসে দাদার হাড় ফোটানোর ব্যারামে ওষুধ ঢালেন। কেবল নিজের নয়, অন্যদের হাড়ের ওপরও দাদা ঝাঁপিয়ে পড়েন। হাড় না ফুটিয়ে অন্যরা কি করে জীবন যাপন করছে তিনি ভেবে পান না। দাদা একবার অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে আমার হাত পায়ের কুড়ি আঙুল ফুটিয়ে দেওয়ার পর আমার ঘাড় খামচে ধরেন, ঘাড়ের হাড় ফোটাবেন। ডান দিকে ঘাড়টিকে যখন হেঁচকা টান দিলেন, আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে দাদার হাত থেকে দৌড়ে পালালাম। তিনি আমার পেছনে দৌড়োচ্ছিলেন বলতে বলতে যে ঘাড়ের আরেকদিকটা না ফোটালে আমার ব্যথা বাড়বে। আরেক দিকটায় দাদাকে আর কিছুতেই হাত দিতে দিই নি। হাড় ফোটানো ছাড়াও দাদার আরও একটি রোগ আছে, রোগটির নাম বায়ুরোগ। *পায়ুদেশ হইতে বায়ু নিষ্কাষণ।* সেটি এমনই ভয়াবহ যে অন্যদের হাসির খোরাক না হয়ে বরং বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মা বলেন, *নোমানের পেটটা আইজও ভাল হইল না,জন্মের পর থেইকাই ওর পেটের গণ্ডগোল।* দাদার ঘরে ঢুকতে হলে পা বাড়ানোর আগে আমার নাক বাড়াতে হয়, ভেতরে ঢোকা উচিত হবে কি হবে না তা বুঝতে। বায়ুর বিড়ম্বনা কম নয়। বাড়িতে যদি আড্ডা হচ্ছে কোনও, যেই জমছে আড্ডা তখনই দুর্গন্ধ জনিত কারণে দাদা ছাড়া বাকি সবাইকে নাক মুখ চেপে উঠে আসতে হয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ থেকে দাদা পড়ছেন, মন দিয়ে শুনছি, তখনই এই একটি কারণে আমার প্রস্থান ঘটে, দাদা বই হাতে একা বসে থাকেন। দাদার চেয়ে বড়দাদা কম যান না। বড়দাদা একবার দাদার এই বায়ু নিষ্কাষণ দেখে বলেছিলেন, *চল লাগি।* দাদা ঘর ফাটান তো বড়দাদা বাড়ি ফাটান। শব্দে গন্ধে আমরা সাত হাত দূরে ছিটকে পড়েছি। একসময় দাদার পেটে বায়ুর অভাব, জোর খাটিয়েও তাঁর পক্ষে কোনও শব্দ তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। বড়দাদা দিব্যি শব্দের রাজা হয়ে বসে আছেন। জেতার জন্য দাদা এমনই মরিয়া হয়ে উঠলেন যে সারা শরীর সঙ্কুচিত করে মৃদু হলেও একটি শব্দ তৈরি করতে চাইছেন, বড়দাদা বললেন, *বেশি কুত দিস না, হাইগ্যা দিবি।* কিছু একটা অশোভন ঘটেছিল নিশ্চয়ই তা না হলে দাদা রণে ভঙ্গ দিয়ে সেদিন গোসলখানার দিকে দৌড়োবেন কেন!

দাদার বদঅভ্যেসগুলো বাদ দিলে মানুষ হিসেবে দাদা মন্দ নন, আমার তাই মনে হয়। তাঁর কৃপণতার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে হঠাৎ কিছু কিছু খসে পড়ে। তাও তো পড়ে। কিন্তু বাবার কৃপণতায় কোনও ফাঁক নেই, কিছু খসে পড়ার উপায় নেই। দাদা এবার *লান্ডির মাল* নয়, আমার আর ইয়াসমিনের জন্য ঈদের জামা বানাতে শার্টিনের কাপড় কিনে আনেন। ওগুলো দিয়ে মা যখন আমাদের জন্য জামা বানাতে থাকেন, দাদার একটিই অনুরোধ, *শীলা যেই ডিজাইনে জামা বানাইয়া দিছিল, ঠিক ওই ডিজাইনে জামা বানাইয়া দেন।* মা তাই করেন। শীলার বানানো জামার মত গলায় ঢেউ খেলানো ডিজাইন দিয়ে দেন মা। একেবারে ঠিক শীলার ডিজাইন মত বানিয়ে দিলেও দাদার মনে হয় না ঠিক হয়েছে, তাঁর ধারণা শীলার বানানো আরও ভাল। দাদা জিভে চুক চুক শব্দ করে বলেন, *হইছে কিন্তু ঠিক শীলার মত হয় নাই।* শার্টিনের কাপড় আরও বেঁচে যাওয়ার পর দাদাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমি চন্দনাকে বাকি কাপড়টি দিয়ে আসি, ও যেন ওটি দিয়ে জামা বানায়। চন্দনার বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় দাদা বলেন, *তর কি গারো চাকমা মগ মুড়ং হাজং ছাড়া নরমাল কোনও বান্ধবী নাই?*

নরমাল মানে? চন্দনা কি এবনারমাল নাকি?

এবনরমালই ত।

চন্দনার চেয়ে নরমাল আর কেউ নাই।

চন্দনাডা বালাই ছিল। নাকটা খাড়া হইলেই বিয়া কইরা ফালা যাইত। কিন্তু..

কিন্তু কি?

চাকমা ত!

চাকমা হইছে তাই কি হইছে?

আরে দূর ! শেষ পর্যন্ত চাকমা বিয়া করাম নাকি? মাইনষে কি কইব!

মাইনষের কথা ত পরে, তুমি কি কইরা মনে করলা তুমি চাইলেই চন্দনা তোমারে বিয়া করব?

দাদা হো হো করে হেসে উঠলেন, যেন আমি মজার কোনও কৌতুক বলেছি।

আমার মত যোগ্য ছেলে ও কি সারাজীবনে পাইব নাকি?

হা!চন্দনার ঠেকা পড়ছে তোমারে বিয়া করবার!

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দাদা বলেন, *তর বান্ধবী দিলরুবাডা সুন্দর ছিল। সুন্দরী মেয়েরা থাকে না। ইস্কুলে পড়ার সময়ই ওদের বিয়া হইয়া যায়। আইএ বিএ এমএ পড়ে যে মেয়েরা, সব হইল বিয়া না হওয়া অসুন্দরীগুলা।*

মন ভাল থাকলে দাদা কেবল ঈদেই নয়, ঈদ ছাড়াও জিনিসপত্র কিনে দেন আমাকে আর ইয়াসমিনকে। একবার দুবোনের জন্য গলায় পরার পাথরের হার কিনে আনলেন। সেই হার পরিয়ে চিত্ররূপা ছবিঘরে নিয়ে দুবোনকে দুপাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তুললেন ঠোঁট ভিজিয়ে হেসে। দুর্গাবাড়ি রোডে চিত্ররূপা ছবিঘর, দাদা বেলা নেই অবেলা নেই ওই ছবিঘরে গিয়েই চিত্তরঞ্জন দাসকে বলেন, *দাদা, বাঁধানো যায়, এমন ছবি তুইলা দেন তো।* চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দাদার বন্ধুত্ব ভাল। বহু বছর ধরে নানা ঢংএর ছবি তুলছেন তিনি দাদার। নকল টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে; পিরিচ থেকে কাঁটা চামচে নকল মিষ্টি তুলে কারো দিকে বাড়িয়ে আছেন মিষ্টি মিষ্টি হাসি মুখে; পায়ের ওপর পা তুলে সোফায় বসে ম্যাগাজিন পড়ছেন, পাশে বড় ফুলদানি; কখনও আবার বাঘ সিংহের মূর্তির মাথায় হাত দিয়ে, পেছনের পর্দায় নকল সমুদ্র বা পাহাড়ের ছবি। দাদাকে পাঞ্জাবি

পাজামা পরিয়ে, শাল পরিয়ে, চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা পরিয়ে, হাতে রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা ধরিয়ে বেতের চেয়ারে বসিয়ে আঁতেল বানিয়েও তুলেছেন ছবি। চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর পছন্দ মত আমাদের দাঁড় করিয়ে দেন, দাদার ডানপাশে আমাকে রেখে আমার কাঁধে দাদার একটি হাত রাখেন, ইয়াসমিনের কাঁধে দাদার আরেকটি হাত, আমার আর ইয়াসমিনের হাতগুলো কোথায় রাখতে হবে, মুখ কোনদিকে ফেরাতে হবে, মুখে কতটুকু হাসি আনতে হবে, হাসিটি কেমন হবে দাঁত বের করে নাকি মুচকি--সব বলে দেন। আমাদের মুখের ওপর কড়া আলো জ্বলে ওঠে। তিনি লম্বা পা লাগানো ক্যামেরায় চোখ রেখে দেখেন কেমন দেখাচ্ছে, কোথাও কোনও ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করে এগিয়ে এসে দু আঙুলে আমাদের চিবুক ধরে সরিয়ে দেন ডানে বা বামে সামান্য, কপালে বাড়তি চুল পড়ে থাকলে তাও আলতো করে সরিয়ে দেন। কড়া আলোর তলে তখন ঘেমে নেয়ে মুখে একটি নকল হাসি ধরে রাখতে রাখতে *ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি* জাতীয় একটি আকুলতা আমার চোখে। হাসিটি ধরে রাখতেই হবে, চিত্তরঞ্জন দাস পই পই করে বলে দিয়েছেন। ক্যামেরায় চোখ রেখে আবার জামার হাতাটা বা ঝুলটা টেনে দিতে বা গলার কাছে বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে থাকলে সেই ভাঁজ সরিয়ে দিতে তিনি ক্যামেরা ছেড়ে আসেন। এই করে একটি ছবি তুলতে আধঘন্টার চেয়েও বেশি খরচা হয়, কিন্তু খরচা করেও ছবি যা ওঠে, তা অন্য সব ছবিঘরের চেয়েও দাদা বলেন *বেস্ট।* দাদা তাঁর ভাল ছবিগুলো বাঁধাই করে ঘরে সাজিয়ে রাখেন। নিজের ছবিগুলোকে কাছ থেকে দূর থেকে ডান বাম সব কোণ থেকে দেখেন আর বলেন, *ক, মেয়েরা পাগল হইব না কেন! চেহারাটা দেখছস!* দাদার রূপ আছে সে আমরা সবাই স্বীকার করি, কিন্তু প্যান্ট শার্ট খুলে লুঙ্গি পরলেই তাঁর বেজায় কুৎসিত স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। দাদার ডান বাহুতে বড় একটি কালো দাগ আছে, তিনি অবশ্য বলেন ছোটবেলায় তাঁর বাহুর ওপর দিয়ে একটি অজগর সাপ হেঁটে গিয়েছিল, চিহ্ন রেখে গেছে। অনেকদিন ওই জন্মদাগটিকে অজগরের দাগ ভেবে ভয়ে সিঁটিয়ে থেকেছি। জন্মদাগ বড় ব্যাপার নয়, এরকম সবারই কিছু না কিছু থাকে। কিন্তু লুঙ্গি পরেই তিনি যখন চুলকোনো শুরু করেন পা ফাঁক করে দুউরুর মধ্যিখানে, তখন দেখে মনে হয় না দাদা আদৌ কোনও সুদর্শন পুরুষ। এরপরও যে কান্ড করেন, সেটি দেখলে কেবল বমির উদ্রেক নয়, রীতিমত পেটে যা কিছু আছে সত্যিকার বেরিয়ে আসে। গায়ের ময়লা হাতে ডলে তুলে কালো গুলি বানিয়ে ফেলে দেওয়ার আগে তিনি শুঁকে দেখেন। দাঁতের ফাঁকে বাঁধা মাংস এনেও গুলি বানিয়ে শোঁকেন।

মা বলেন, *নোমান তুই এইগুলা শুংগস কেন?*

আমরাও অনুযোগ করি। মাঝে মাঝে আবার আমাদের তিনি গুলি বানানো ময়লাগুলো শুঁকতে বলেন। একবার তো আমি হজমের ওষুধ চাওয়াতে বেশ গম্ভীর মুখে তিনটে গুলি আমাকে দিলেন খেতে। বড়ির মত দেখতে, আমি দিব্যি গুলি খেতে যাচ্ছিলাম, ইয়াসমিন হা হা করে ছুটে এসে বলল *ওইগুলা দাদার ছাতা।* আমাকে দৌড়োতে হয়েছে গোসলখানায় বমি করতে।

দাদা চাকরি করেন, মাস গেলে ভাল টাকা বেতন পান। সুটেড বুটেড হয়ে কোম্পানীর সভায় যান। কোম্পানীর সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে আবার পুরস্কারও অর্জন করেন। দাদা যত বড়ই হন, বদঅভ্যেসগুলো থেকেই যায়। আঙুল ফুলে কলাগাছটির দিকে আমরা অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকি। আমাদের কিছু ছোটখাট আশা তিনি *চাহিবামাত্র না* হলেও একদিন না একদিন পুরণ করেন। ছাদ থেকে দেখা প্রায় বিকেলে একটি শাদা শার্ট খয়েরি প্যান্ট পরা ছেলের জন্য যখন মন কেমন কেমন করতে শুরু

করল, মনে হল ঠিক ওরকম শাদা শার্ট আর খয়েরি প্যান্ট আমিও পরি না কেন! শখ মেটাতে বাবা তো কখনও এগিয়ে আসেন না, আসেন দাদা। দাদাকে ধরে শাদা টেট্রনের কাপড় কেনা হল, প্যান্ট বানানোর খয়েরি রংএর কাপড়ও। আমার ইচ্ছে শুনে দাদা বললেন, *প্যান্ট না, এই কাপড় দিয়া পায়জামা বানা।* দাদা যখন আমাকে নিয়ে গাঙ্গিনার পাড়ের মোড়ে দরজির দোকানে গেলেন, আমি বললাম *প্যান্ট,* দাদা বললেন *পায়জামা।*

মেয়েরা প্যান্ট পরে নাকি? প্যান্ট পরে ছেলেরা।

মেয়েরা পরলে অসুবিধা কি?

অসুবিধা আছে। মাইনষে চাক্কাইব।

চাক্কাইব কেন? এইডা কি দোষের কিছু!

হ, দোষের।

দোষের হলেও দাদা আমার শখের ওপর দয়াপরবশ হয়ে দরজিকে জিজ্ঞেস করেন, *আচ্ছা প্যান্টের মত কিছু কি বানাইয়া দেওয়া যায়?*

দরজি সহাস্যে বললেন, *মেয়েদের প্যান্ট বানাইয়া দেওয়া যাবে।*

মেয়েদের প্যান্ট আবার কি রকম?

পকেট থাকবে না, তলপেটের ওপর ফাড়া থাকবে না, ফাড়া থাকবে বাঁ দিকে, বাঁদিকে চেইন,বেল্ট লাগানোর জন্য যে হুক থাকে তা থাকবে না, এ হচ্ছে মেয়েদের প্যান্ট। *নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল* বলে সেটিই আমাকে লুফে নিতে হয়। জামার কাপড়টি দিয়ে যেহেতু শার্ট বানানোর প্রস্তাব করা অসম্ভব, তাই জামাই বানাতে হয়,কিন্তু একটি ছোট্ট আবদার জানাই, জামার হাতা যেন অন্তত শার্টের হাতার মত হয়, ভেতর দিকে নয়, বাইরের দিকে ভাঁজ। দরজি মাপ নিলেন লম্বা দাগকাটা ফিতেয়, জামার মাপ নেওয়ার সময় দরজির হাত বারবার আমার বুক ছুঁয়ে গেল। অস্বস্তি আমাকে সঙ্কুচিত করে রাখে। কিন্তু আমাকে ভেবে নিতে হয়, মাপ নেওয়ার সময় এ না হলে সম্ভবত হয় না। *মেয়েদের প্যান্ট* আর জামা যেদিন তৈরি হয়ে এল, আমি খুশিতে আটখানা নই, আট দ্বিগুণে ষোলখানা। কিন্তু পরার পরেই হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটল। বাবা আমাকে দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, গা খিঁচিয়ে বললেন,*এইডা কি পরছস?*

আমি বললাম, *প্যান্ট।*

প্যান্ট পরছস কেন তুই?

কোনও উত্তর নেই।

বেডাইনের পোশাক পরছস কেন? লজ্জা নাই? এক্ষুণি খোল। আরেকদিন যদি দেখি এইসব পরতে, শরীলের কোনও চামড়া বাদ থাকবে না এমন পিটাবো।

আমাকে প্যান্ট খুলে পায়জামা পরতে হল। এরপর ওই প্যান্ট যে পরিনি তা নয়, পরেছি তবে বাবা মাইল খানিক দূরত্বের মধ্যে নেই জেনেই তবে পরেছি।

দাদার উপহার বই আর জামা কাপড় আর গয়নাগাটির সীমা ছাড়িয়ে এরপর রংএ যায়। ছবি আঁকার রং নয়, মুখে মাখার রং। আমার জন্য একটি *মেক আপ বাক্স* কিনে আনলেন তিনি, এটির জন্য কোনও অনুরোধ আমার ছিল না, দাদা নিজের ইচ্ছেতেই কিনেছেন। এই বাক্স সম্পর্কে আমার কোনওরকম অভিজ্ঞতাই নেই, কি করে কি মাখতে হয় তা আমি জানি না। তখন ছোটদা হলেন সহায়। চেয়ারে আমাকে মূর্তির মত বসিয়ে আমার মুখে চোখে, চোখের পাতায়, গালে, চিবুকে, ঠোঁটে রং মাখিয়ে দিলেন। ইয়াসমিনকেও দিলেন। রংএর বাক্সটিকে ম্যাজিক বাক্সের মত মনে হতে লাগল আমার, কি চমৎকার মুখের চেহারা পাল্টে দিচ্ছে, নিজেকে মনে হচ্ছে কবরী, ববিতা, শাবানার

মত সিনেমার নায়িকা। বাড়িতে চন্দনা বেড়াতে এল, ওকেও বসিয়ে মুখে রং মাখানো হল। চন্দনার গালে বাক্সের গোলাপি পাউডার তুলিতে করে ছোটদা যখন বুলোচ্ছিলেন, মা বললেন, *চন্দনা তো শাদাই, ওর কি আর পাউডার লাগে?*

দাদা আমাকে আর ইয়াসমিনকেই যে কেবল দেন তা নয়, মাকেও দেন। মা মলিন শাড়ির ছেঁড়া ছিদ্র আড়াল করে পরেন যেন কারও চোখে না পড়ে, চোখে যদি পড়েও কারওর, চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে কেউ চমকে ওঠে না বরং মা একটি নতুন শাড়ি পরলেই সবার চোখে পড়ে। একটি ভাল শাড়ি পরলেই, *বাহ শাড়িডা ত সুন্দর, কই পাইছ, কে দিল!* এসব মন্তব্যের ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ আমার বা ইয়াসমিনের চোখে পড়ে, যদিও চোখ ব্লাউজহীন সায়াহীন শাড়িতেও মাকে দেখেছে, ছেঁড়া শাড়ি এমন কোনও দুর্ঘটনা নয় মার জন্য, তবু *দাদার কাছে শাড়ি চাও* যদি বলি, মা বলেন, *নোমান আর কত দিব? তোদেরে দিতাছে। যেই মানুষটার দেওয়ার কথা, সে ত আরামে আছে। নিজের দায়িত্বের কথা ভুইলা গেছে। কারও জন্য কিছু কিনার চিন্তা নাই।* মা চান দাদা নয়, বাবা যেন মাকে কিছু দেন। মাকে ভাবছেন, মার জন্য করছেন বাবা, সামান্য কিছু হলেও, তিল পরিমাণ হলেও, দেখতে মা চাতক পাখির মত অপেক্ষা করেন। বাবা কারও অপেক্ষার দিকে ফিরে তাকান না, বিশেষ করে মার। আমাদের বরাদ্দ যে ঈদের জামা, সেটি দিতেও আজকাল বাবা খুব একটা আগ্রহী নন। দাদার কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি, তা অবশ্য তিনি জানেন। নিজে তো দেবেন না, দাদা যেন আমাদের আশকারা কম দেন, আবার বেশি পেলে আমরা যে উচ্ছন্নে যাব, সে কথাটি দাদাকে ডেকে ধমকে স্মরণ করিয়ে দেন।

একথা দাদার খুব স্মরণে আছে বলে মনে হয় না। কারণ ধমক খাওয়ার পরদিনই দাদা আমাকে বলেন, *কি রে পিকনিকে যাইবি?* ঘর থেকে বেরোনোর সুযোগের জন্য ওত পেতে থাকা আমি লাফিয়ে উঠি। এরকম একটি প্রস্তাব পেয়ে আমার দুপুরের ঘুম রাতের ঘুম সব উবে গেল।

এই পিকনিক ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলে নয়, রাজধানী ঢাকায়। দাদার সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ এবার। ঢাকার সাভারে পিকনিক করতে যাচ্ছে ফাইসন্স কোম্পানীর লোকেরা। আত্মীয় স্বজন নিয়ে যেতে পারে। দাদার বউ নেই। দুটো বোন আছে, এক ভাই আছে। বাবা মা আছেন। বাবা মাকে নেওয়া চলে না, তাঁরা পিকনিকের জন্য বেমানান। ছোটদা পিকনিকের জন্য বড় হয়ে যায়। ইয়াসমিন ছোট হয়ে যায়। একেবারে খাপে খাপে মিলে যাই আমি। সুতরাং জামা কাপড় বাছাই কর। বাছাই করার কিছু অবশ্য ছিল না আমার, ইশকুলের ইউনিফর্মের বাইরে হাতে গোনা যা আছে তাই ধুয়ে ইস্ত্রি করে তৈরি নিই। ইস্ত্রি বলতে লোহার একটি হাতলঅলা পাত, চুলোর ওপর ওটি রেখে পাতের তলা গরম হলে পুরু করে গামছা ভাঁজ করে হাতল ধরে উঠিয়ে নিয়ে কাপড়ে ঘসে নিই। জামা কাপড় নিই, আর নিই দাদার দেওয়া সেই রঙের বাক্স। ট্রেনে চড়ে ঢাকা যাওয়া, এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে জীবনে! সমস্ত পথ জানালায় মুখ রেখে গরম হাওয়া আর ধুলো খেতে খেতে গাছপালা নদীনালা ধানক্ষেত পাটক্ষেত দালানকোঠা বাজার হাট দেখতে দেখতে ঢাকা পৌঁছি। ঢাকায় উঠতে হয় বড়মামার বাড়িতে, বড় মামার বাড়ি আর লালমাটিয়ায় নয়, বাড়ি ধানমন্ডিতে। নিজে জায়গা কিনে ছোট ছোট ঘর তুলেছেন। ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা। বড় মামার বাড়িতে জায়গার অভাবে দাদা রাত কাটাতে গেলেন আপিসের এক বড়কর্তার বাড়ি। আমাকে শুতে হয়েছে ঝুনু খালা আর বড় মামার ছেলে মেয়ের সঙ্গে এক চৌকিতে আড়াআড়ি চাপাচাপি গাদাগাদি করে। সকালে দাদা এলেন

নিতে আমাকে। ইস্ত্রি করা জামা পরে মুখে রং মাখছি যখন শুভ্রা আর শিপ্রা বড় মামার মেয়েদুটি ভূত দেখার মত দেখছিল আমাকে। কাউকে ওরা মুখে রং মাখতে এর আগে দেখেনি। ঝুনু খালা আমাকে আড়াল করছিলেন বার বার ওদের থেকে, বলছিলেন, *বড়দের সাজতে হয়, তোমাদের এখনও বয়স হয় নাই সাজার, সর।* ঝুনু খালা বড় মামী থেকেও যথাসম্ভব আমাকে আড়াল করলেন। তাঁর ভয়, মুখের এসব রং দেখলে বড় মামী বড় মামাকে জ্বালিয়ে খাবেন এমন একটি রংএর বাক্স কিনে দেওয়ার জন্য। বাসে চড়ে সাভারে গিয়ে বড় এক মাঠের মধ্যে পিকনিকের বড় বড় হাঁড়িকুঁড়ি থাল বাসন সব নামানো হল। রান্না হল, খাওয়া হল, খেলা হল, নিয়াজ মোহাম্মদ নামের এক গায়ককে ভাড়া করে এনে গান গাওয়ানো হল। বাইরের লোকের সঙ্গে দাদা তাঁর চিরাচরিত স্বরচিত শুদ্ধ বাংলা চালিয়ে গেলেন র কে ড় বলে বলে। দাদার এই হয়, ঢাকার কারও সঙ্গে, যাঁরা শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন, কথা বলতে গিয়ে ময়মনসিংহের আঞ্চলিকতা বিসর্জন দেওয়ার জন্য এমনই সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যে র-র উচ্চারণ হয়ে যায় ড়, *আমাড় ফাদাড় তো ডাক্তাড়, চেম্বাড়ে ড়োগি দেখছিলেন,তখনই তাড়া গেল, তাড়পড় যাড়া যাড়া আসছিল, তাদেড় সাথে আমাড় সড়াসড়ি কথা হয়েছে।* পিকনিকে দাদা তাঁর কোম্পানীর বড় বড় লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, *আমাড় ছোট বোন নাসড়িন, এইবার মেটড়িক দিল* বলে। আর পরিচয়ের পর কথা না বলে গুড়ি মেরে বসে থাকা আমাকে দেখে দাদা হেসে বলেন, *কি ড়ে শড়ম পাওয়াড় কি আছে! এদিকে আয়। আমাড় স্যাড়, স্যাড়ড়ে সালাম দে।* সাভার থেকে শহরে ফিরে এসে দাদা নাক কুঁচকে কেবল একটিই মন্তব্য করলেন, *রংড়া বেশি মাখাইয়া ফেলছস মুখে।* আমাকে নাকি সংএর মত লাগছিল।

ঝুনু খালা ইডেন কলেজ থেকে পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন বাংলায়। আমাকে তিনি পিকনিকএর পরদিন নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। যতক্ষণ ছিলাম ওখানে, হাঁ হয়ে দেখেছি সব। ঝুনুখালার একটি ক্লাস ছিল, ওতেও নিয়ে গেলেন। ক্লাসে ছাত্ররা বসেছে ডান সারিতে, ছাত্রীরা বাঁ দিকে। আমি মেয়েদের ইশকুলে পড়া মেয়ে, আমার জন্য এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। ক্লাসে পড়াতে এলেন নীলিমা ইব্রাহিম। আমি নাম শুনেছি তাঁর, লেখাও পড়েছি। নীলিমা ইব্রাহিম লক্ষ করেননি ক্লাসে অল্প বয়সের একটি মেয়ে বসে আছে জড়সড়। কি পড়িয়েছেন তিনি তার ক-ও বুঝতে না পেরে ক্লাস থেকে বেরিয়ে ঝুনু খালার কানে কানে আমার ইচ্ছের কথা *বড় হয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়ব* বলি। বলি কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার পরিবেশটি দেখে *স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে এখানেই* এরকম একটি ধারণা জন্মায় আমার। কোনও একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে দাদার সঙ্গে ট্রেনে চড়ে ময়মনসিংহ ফিরে আসি। ফিরে চন্দনার কাছে নিখুঁত বর্ণনা করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েরা পাশাপাশি হাঁটছে, হাসছে,কথা বলছে,গান গাইছে কেউ তাদের দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে না, চোখ টিপছে না, মন্দ কথা বলছে না, ঢিল ছুঁড়ছে না। মাঠের ঘাসে বসে আছে ছেলে মেয়ে গোল হয়ে, আড্ডা দিচ্ছে। কোনওরকম নির্দিষ্ট পোশাক নেই কারও জন্য। যার যা খুশি পরে এসেছে, লাল জামা সবুজ জামা, কেউ আবার শাড়ি। এ যেন স্বপ্নের জগত।স্বপ্ন চন্দনার চোখের পুকুরেও সাঁতার কাটে। নিজের ভাই ছাড়া, বাবা ছাড়া, আর কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কারও সঙ্গে আমাদের মেশা হয়নি। বাইরের জগতটি আমাদের জন্য বিশাল এক জগত। বাইরের পুরুষ আমাদের কাছে একই সঙ্গে বিস্ময় এবং একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর। গল্প উপন্যাস পড়া সিনেমা দেখা আমার আর চন্দনার মনে যদি কোনও পুরুষের স্বপ্ন থাকে, সে সুদর্শন সুপুরুষের স্বপ্ন। গল্প উপন্যাস পড়ার খেসারতও দিতে হয় আমাকে

কম নয়। বাড়িতে চিত্রালী দিতে আসা হকারকে দাদা যেদিন এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে চিত্রালী পূর্বাণী ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলেন জানালা দিয়ে, যেদিন বললেন, এখন থেকে এইসব *আজাইরা পত্রিকা* পড়া বন্ধ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আমি। বেরোই, কোথায় যাব তা না জেনেই বেরোই। হাতে কোনও টাকা নেই যে রিক্সা নিয়ে নানিবাড়ি চলে যেতে পারব। কপর্দকহীন কত গল্প উপন্যাসের সিনেমার নায়িকারা তো বেরোয়, রাস্তায় খানিকটা হাঁটলেই কোনও নির্জন সমুদ্র তীর বা গভীর অরণ্য বা উদাস নিরিবিলি পাহাড় জুটে যায়। কোনও অঘটন ঘটে না,বরং চমৎকার চমৎকার ঘটনা ঘটে। নায়িকা হয়ত নায়কের দেখা পেল, অথবা বিশাল ধনী এক উদার লোক নায়িকাকে পালিতা-কন্যা বানিয়ে ফেলল। অথবা নায়িকা একা একা নদী বা সমুদ্রের ধারে হাঁটল, ফুলে ছেয়ে থাকা বাগানে হাঁটতে হাঁটতে ফুলগুলোর সঙ্গে মনে মনে কথা বলল, উড়ে আসা কোনও পাখির সঙ্গেও বলল, রঙিন প্রজাপতির পেছনে দৌড়োলো, একসময় গাছে হেলান দিয়ে সুখের অথবা দুঃখের একটি গান গাইল। অথবা অঘটন ঘটলেও অঘটন থেকে নায়িকাকে উদ্ধার করে সাহসী কোনও মানুষ সারাজীবনের ভাই বা বন্ধু হয়ে গেল। গল্প উপন্যাস পড়া সিনেমা দেখা মেয়ে বুকের ভেতর ভয় এবং নির্ভয় দুটো জিনিস পুষে হাঁটতে থাকে। নদীর ধারে পুরুষের থাবা আছে জেনেও সে নদীর ধারের দিকেই হাঁটে, পার্কের দিকে। বাগান অলা একটি জায়গার দিকে, লোকে যার নাম দিয়েছে *লেডিস পার্ক*, সেদিকে। বিকেলে নারী পুরুষ শিশু যেহেতু বেশি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই শহরে এখানেই আসে, বেঞ্চে বসে বাদাম চানাচুর খায়, খেয়ে হাওয়ায় হাঁটাহাঁটি করে বাড়ি ফিরে যায়। আমি যখন নির্জনতার স্বপ্ন নিয়ে ভরদুপুরে পার্কে পৌঁছে গাছের ছায়ায় একটি একাকি বেঞ্চে বসে সামনে ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের জলের শরীরে ছোট ছোট ঢেউ দেখি, গাছের টুপটাপ পতন দেখি জলে, ইচ্ছে করে বসে থাকি এভাবে, চেয়ে থাকি নিসর্গের এই সৌন্দর্যের দিকে, যতক্ষণ ইচ্ছে। কিন্তু গল্প উপন্যাসের চরিত্ররা যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকতে পারে, আমি পারি না। একটি দুটি করে লুঙ্গি পরা ছেলে জমতে থাকে আমার চারপাশে। আমার চোখ নদীর দিকে। দুটো নৌকো যাচ্ছে, বালুর নৌকো, নৌকোর দিকে। নৌকোর মাঝি ভাটিয়ালি গান গেয়ে গেয়ে বৈঠা বাইছে, বৈঠার ছন্দময় গতির দিকে। মাঝির দিকে। চোখ যায় নদীর ওই পারে, কি চমৎকার কাশফুলে ছেয়ে আছে! এসবে মগ্ন হওয়ার কোনও সুযোগ ছেলের দল আমাকে দেয় না। আমার চারপাশের নৈঃশব্দ আর নির্জনতার বুক ছুরিতে চিরে ছিঁড়ে একজন আরেকজনকে বলে, *ছেড়ির বুনি উঠছে নাহি?*

আরেকজন সামনে এসে খিলখিল হেসে বলে, *হ উঠছে।*

কেমনে জানস উঠছে? ধইরা দেখছস?

ছেলের দল সজোরে হেসে ওঠে।

বওয়াইব নি?

চায় কত?

কতা ত কয় না।

কতা কয় না কেন? বোবা নাকি?

ভয়ে আমার গা হাতপা কাঁপে। গলা শুকিয়ে যেতে থাকে। এরা যদি এখন বুকে থাপ্পড় দেয়, সেই একবার এক ছেলে এই ব্রহ্মপুত্রের পারেই যেরকম দিয়েছিল। অন্য এক বেঞ্চে সরে গিয়ে বসি। দেখে ছেলের দলে উচ্ছ্বাস বাড়ে। হৈ হৈ করে সেই বেঞ্চের কাছে ভিড় জমায়।

এই তর নাম কি? বাড়ি কই?

এই ছেড়ি তর বাপ আছে?

কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিই না। একটি লুঙ্গি পরা আমার দিকে ঢিল ছোঁড়ে, ঢিলটি পিঠে এসে লাগে। আরেকটি ছেলে কাছে এসে তার পা দিয়ে আমার পায়ে খোঁচা দেয়। পেছন থেকে আরেকজন দেয় খোঁচা, পিঠে। আমি যেন আকাশ থেকে পড়া উদ্ভট কোনও জীব, সবাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে কি রকম আচরণ করি আমি। ঢিলের আর খোঁচার কোনও উত্তর না দিয়ে আমি আবার ব্রহ্মপুত্রের ছলাৎ ছলাৎ জলে। মনের দড়িতে একটি আশাকে বেঁধে রাখি শক্ত করে, কোনও উত্তর না দিলে কিংবা পাল্টা কোনও ঢিল না ছুঁড়লে এরা ধীরে ধীরে চলে যাবে। আশা ক্রমশ দড়ি থেকে মুক্ত হতে থাকে। আশা তার হাত পা খুলে আকাশে উড়াল দিতে থাকে। আমার ব্যাকুল চোখ খুঁজে ফেরে কোনও ভদ্র দেখতে লোককে, যে আমাকে উদ্ধার করতে পারে এই হিংস্র ছেলের দল থেকে। না কেউ ঢুকছে না পার্কে। ভদ্রলোকেরা সব ওই পারে বেড়াতে গেছে। এই পারে কেউ নেই।নেই কেউ। একা আমি আর এরা। দূরের মাঝিও দেখছে না কি করে আমাকে শকুনের মত ঘিরে ধরেছে কটি বর্বর ছেলে। এরা বয়সে আমার ছোট, অনুমান করি। বড়দের সঙ্গে বেয়াদবি করতে নেই, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, আর এরা নির্ভাবনায় বেয়াদবি করে যাচ্ছে! বেয়াদবি এবার আর খোঁচায় নয়,পিঠে একটি ধাক্কা এসে পড়ে। ধাক্কাটি আমাকে চকিতে পেছন ফিরিয়ে চিৎকার করে বলায়, *আমি এইখানে বইসা রইছি, তোদের কি হইছে তাতে? ভাগ।*

হা হা হি হি শুরু হয় ছেলের পালে।

কতা ফুটছে মুহে। কতা জানে রে কতা জানে ..

একজন লুঙ্গি তুলে নাচতে শুরু করে আমার সামনে। দেখে আরেকজন আসে নাচে যোগ দিতে। বাকিরা হাসছে, হাততালি দিচ্ছে। একজন আসে আমার বুকের দিকে দুটো কিলবিলে থাবা বাড়িয়ে। দুহাতে সেই থাবা সরিয়ে দিই। থাবা আবার এগোয়। ফোঁপাতে থাকি। ফোঁপানো থেকে গোঙানো। আমার জামা ধরে টানছে দুটি ছেলে। চোখ বড় করছে, দাঁত দেখাচ্ছে, জিভ দেখাচ্ছে। খেলছে আমাকে নিয়ে। মজা করছে। এখন জামাটি আমার টেনে খুলে নিতে পারলেই হয়। জামাই বা শুধু কেন, এখন পাজামাটিও টেনে খুলতে পারলে হয়! এই শুনশান পার্কে কেউ দেখবে না কি হচ্ছে এদিকে। হঠাৎ দুজন লোককে পার্কের ভেতরে ঢুকতে দেখে প্রাণ ফিরে পাই। জটলার দিকে প্যান্ট শার্ট পরা লোকদুটো এগোচ্ছে, ভদ্রলোক দুটো এগোচ্ছে। দেখে পিছু হটে ছেলেগুলো। লুঙ্গি তোলা নাচও থামে। লোকদুটো আমাকে এই নৃশংস দৃশ্য থেকে উদ্ধার করবে আশায় আমি এগোতে থাকি ওদের দিকে। কিন্তু লোকদুটোর একজন আমাকে নয়, ছেলেগুলোকে জিজ্ঞেস করে, *কি হইছে কি?*

ছেড়ি একলা বইয়া রইছে পার্কে।

একলা?

লোকদুটোর আরেকজন গম্ভীর মুখে বলে, *একলা কি করতে আইছে?*

তা ই তো জিগাইতাছি। কয় না।

কয় না কেন, কয় না কেন?

লোকদুটো সামনে দাঁড়ায় আমার। মুখে নয়, বুকে তাকায়। খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে, এরা আমাকে উদ্ধারের জন্য নয়। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে, পালাও। কোথাও কোন দিকে পালাবো বুঝে উঠতে পারি না। বুঝে উঠতে না পারা আমার

দিকে একজন দাঁত মেলে হাত মেলে এগিয়ে আসে, দেখে আরেকজন পাখি উড়িয়ে হাসে। নদীর জল কাঁপিয়ে হাসে। আমার মনে হতে থাকে এরা আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। খেয়ে ফেলবে। খুবলে খাবে। চিবিয়ে খাবে। বিকেলের আলো নিভে আসছে। ডিমের কুসুমের মত সূর্য ব্রহ্মপুত্রের জলে রং ছড়াতে ছড়াতে ডুবে যাচ্ছে। হা হা হাসির লোকটি তার প্যান্টের চেইন একবার নিচের দিকে একবার ওপরের দিকে নামায় ওঠায়। ওঠায় নামায়। আমি চোখ বুজে দুহাতে বুক ঢেকে হাঁটু ভেঙে দু হাঁটুতে মাথা চেপে বসে পড়ি। কুণ্ডুলি পাকাতে পাকাতে ছোট্ট একটি পুঁটলির মত হয়ে থাকি। ঢিল পড়তে থাকে সারা শরীরে। আমার শরীর দিয়ে আমি আড়াল করে রাখি আমাকে। টের পাই লোকদুটো ছেলের দলের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে চলে গেছে। এরা এখন যা খুশি করার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। কুণ্ডুলির মধ্য থেকে আমি হঠাৎ চিৎকার করে উঠি ভয়ে। আমার চিৎকারে ছেলের দল গলা ফাটিয়ে হাসে। হঠাৎ কুণ্ডুলি থেকে উঠে ঊর্ধশ্বাসে দৌড়োতে থাকি সার্কিট হাউজের মাঠের দিকে। পেছন পেছন হাসতে হাসতে ছেলেগুলো। আমি কথা বলতে পারি, চিৎকার করতে পারি, দৌড়োতে পারি সবই এদের কাছে মজার বিষয়। চিড়িয়াখানায় বানরকে নিজে হাতে কলা খেতে দেখলে লোকে হাসে, মজা পায়। বানরের লাফানো দৌড়োনো ঝুলে থাকা সব কিছু দেখতেই মজা। নিজেকে আমার কোনও মানুষ মনে হয় না, মনে হয় কোনও লোক হাসবার জন্তু। ছেলেরা লুঙ্গি তুলে নুনু দেখিয়ে দিব্যি আমার সামনে নেচে গেছে, আমাকে ঢিল ছুঁড়েছে, খুঁচিয়েছে, হাত বাড়িয়েছে, একটুও ভাবেনি আমি এদের মন্দ বলব, কি শায়েস্তা করব কোনও একদিন মওকা মত পেলে। না কোনওকিছুকে এরা মোটেও পরোয়া করছে না। আমি আমার গন্তব্য না জেনে দৌড়োই। পার্কের আশেপাশে কিছু লোককে দেখি হাঁটছে, কিন্তু কারও দিকে আমার যেতে ইচ্ছে করে না, কাউকে বিশ্বাস হয় না আমার। এই উদভ্রান্ত দিকভ্রান্ত আমার দিকে, ঊর্ধশ্বাসের দিকে, এই উদ্ভট দৃশ্যটির দিকে হেঁটে আসতে থাকে শাদা শার্ট খয়েরি প্যান্ট। অথৈ জলে সাঁতার না জানা মেয়ের হাতে খড়কুটো। এই সেই শাদা শার্ট খয়েরি প্যান্ট, যাকে ছাদ থেকে বিকেলে দেখি, যাকে দেখার জন্য প্রায়ই ছাদে উঠি। শাদা শার্ট আমাকে থামিয়ে হুস হুস করে ছেলের পাল বিদেয় করে কাছে এসে মধুর হেসে বলে, *এইখানে কখন আসছিলা?*

আমি কোনও কথা বলি না। শাদা শার্ট শব্দে শব্দে হাঁটে, পেছন পেছন নিঃশব্দে আমি। হাঁপাতে হাঁপাতে আমি।

দৌড়াইতাছিলা কেন? ছেলেগুলা কিছু করছে তোমারে?

কোনও কথা নেই।

কিছু বলছে তোমারে?

এবারও কথা নেই।

ছেলেরা যা করেছে, যা বলেছে জানাতে আমার লজ্জা হয়। যেন ছেলেদের কীর্তিকাণ্ডের সমস্ত দায় আমার, লজ্জা আমার। ছেলেরা অন্যায় করেছে, যেন আমারই দোষে করেছে।

ঈশান চক্রবর্তী রোডের কাছে এসে শাদা শার্ট বলে *বাসায় যাইবা তো?*

আমি দুপাশে মাথা নাড়ি।

তাইলে কই যাইবা?

আবারও দুপাশে মাথাটি নড়ে। *কোথাও না* অথবা *জানি না* জাতীয় উত্তর।

শাদা শার্টের পেছন পেছন দিব্যি আমি তাদের বাড়িতে গেলাম, ঠিক তাদের বাড়িতে

নয়, তাদের বাড়িঅলার বাড়িতে, ঠিক বাড়িতেও নয়, বাড়ির ছাদে। ছাদে বসে হাওয়া খাচ্ছিল শাদা শার্টের বড় ভাই আর তার বন্ধু। আমরা ছাদে পৌঁছোলে ভাই বন্ধু দ্রুত ছাদ থেকে নেমে যায়।

কি খাইবা?

আমি মাথা নাড়ি, কিছু খাব না।

মাথা নাড়া ছাড়া শাদা শার্টের কোনও প্রশ্নের উত্তরে কোনও শব্দ উচ্চারণ করা হয় না আমার। শাদা শার্ট তার ছোট ভাইকে ছাদ থেকে গলা ছেড়ে ডেকে নিচে পয়সা ফেলে *একটা সেভেন আপ* নিয়ে আসার আদেশ দেয়। ছোট ভাই সেভেন আপ আনতে গেল দৌড়ে, এদিকে ছাদের অন্ধকারে শাদা শার্ট আমাকে সিনেমায় রাজ্জাক যেমন কবরীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তেমন করে জড়িয়ে ধরতে চায়। এরকম আলিঙ্গনের আহ্বান এলে আমারও আবেশে বুকে মিশে যাওয়ার কথা। কিন্তু লক্ষ করি গা কাঠের মত শক্ত হয়ে আছে আমার। কাঠ ছিটকে সরে দাঁড়ায়। সেভেন আপ আসে, একলা বসে থাকে, আমার ছোঁয়া হয় না। অবকাশের ছাদ থেকে গোলপুকুর পাড় থেকে হেঁটে এসে সের পুকুর পাড়ের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া শাদা শার্টকে দেখে মনে হত বোধহয় এর প্রেমে পড়ে গেছি। বুক যে ধুকপুক করেনি তা নয়। কিন্তু রাজ্জাকের মত ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরার ব্যাপারটি এত কৃত্রিম লেগেছে যে অস্থি মজ্জায় বুঝেছি আমি চাইলেই কবরী হতে পারি না, চাইলেই ববিতা হতে পারি না, গল্প উপন্যাস আর সিনেমার মত জীবনের সবকিছু নয়। হলে ওই আলিঙ্গনটি আমার ভাল লাগত। হলে আমি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ওই ছেলের পালকে আর ওই প্যান্ট শার্ট পরা অসভ্য লোকদুটোর চাপার দাঁত তুলে নিতে পারতাম। পারিনি।

সেই দুপুরে বেরিয়েছি, এখন অন্ধকার হয়ে গেছে, বাড়িতে কি শাস্তি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তা কল্পনা করার শক্তি আমার নেই। সেই বাড়িতে, শাদা শার্ট বলে, *চল দিয়া আসি তোমারে।* কোথাও যাবার নেই বলে ছাদ থেকে নেমে মরিয়ম ইশকুল ডানে, সুধীর দাসের মূর্তির দোকান বাঁয়ে রেখে গোলপুকুর পাড়ের চৌরাস্তা পেরিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে নিস্তেজ হাঁটতে হয়। হতাশা আর আতঙ্ক সম্বল করে শাদা শার্টের পেছন পেছন অবকাশের কালো ফটক অবদি আসি। এরপর প্রাণহীন একটি জড়বস্তুর মত ভেতরে ঢুকি। বাড়ির লোকেরা আমার দিকে এমন চোখে তাকায় যেন কেউ চেনে না আমাকে। আমার নাম ধাম পরিচয় কেউ জানে না। আমি কেন এসেছি, কোত্থেকে এসেছি, কারও জানা নেই। এরপর চোখ খানিকটা ধাতস্থ করে *কই ছিলি এতক্ষণ, কার কাছে গেছিলি, তর মনে কি আছে ক, অত সাহস কই পাইলি* ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের সামনে আমি নির্বাক নিস্পন্দ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি। আমি আমার জীবন যৌবন কোথাও বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফিরেছি অনুমান করেই সম্ভবত দাদা আর মা দাঁড়িয়ে থাকা নির্বাক নিস্পন্দ আমার ওপর কিল ঘুসি লাথি, নিশ্চল আমার ওপর চড় থাপড় নির্বিকারে নির্বিচারে চালিয়ে যান। অবসন্ন শরীর পেতে সব বরণ করি। আপাতত ওই ছেলেছোকড়াদের আক্রমণ, শাদা শার্টের অস্বাভাবিক আলিঙ্গন থেকে বাঁচা গেল বটে, কিন্তু দাদা আর মার অনাচার থেকে বাঁচা সম্ভব হয় না। আমার বিবমিষা বাড়তে থাকে সব কিছুর কারণে।

ছাদে দাঁড়ালে আমার চেয়ে বয়সে ছোট এক ছেলে তাদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে লুঙ্গি উঁচু করে তার নুনু দেখায়। আমাকে চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। ছাদের রেলিং থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। অন্য কিছু দেখতে চায় এই চোখ, সুন্দর কিছু শোভন কিছু। বিকেলের এই ছাদে ওঠা, স্যাতসেঁতে ঘর থেকে বেরিয়ে আলো হাওয়া খাওয়া, আপন মনে জগত

দেখা, এ বড় আনন্দের সময় আমার। খোলা জগত আমার কাছে তো ওটুকুই। স্বাধীনতা আমার ওখানেই। দুপুরের গা পোড়া গরমকে বিকেলের শীতল শান্ত হাওয়া যখন বিদেয় দিতে থাকে, তখনই সময় খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে হাওয়ার সেই স্নিগ্ধতা গা ভরে নেওয়ার। কেবল গা ভরে নয়, আমি প্রাণ ভরেও নিই। এই ছাদেও আমি নিরাপদ নই ভেবে কুঁকড়ে যেতে থাকি, যেন আমিই দোষী, যেন আমারই দোষে ভাল মানুষ ছেলেটি লুঙ্গি তুলেছে। তন্ন তন্ন করে নিজের দোষ খুঁজতে থাকি।নিজের এই অস্তিত্ব আমাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে। আমি নিজের জন্যই নিজের কাছে লজ্জিত হই। লজ্জিত হই যখন কালো ফটকের উল্টোদিকে স্বপনদের বাড়ির ডান পাশের মুসলমানের বাড়ির বারান্দায় লুঙ্গি গেঞ্জি পরে দাঁড়িয়ে থাকা কুৎসিত দেখতে ছেলে জগলু পাড়ার আবদুল বারীর বউকে দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় আমাদের বাড়িতে। মৃত্যুঞ্জয় ইশকুলের মাস্টার কৃকলাশ আবদুল বারীর বেলুন-বেলুন মেচেতা-গালি বউ আমাদের বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসেন, মার সঙ্গে শাদামাটা ঘরসংসার রান্নাবান্নার গাল গল্প করে চলে যান। তাঁর মুখে বিয়ের প্রস্তাবের কথা শুনে আমার গা কাঁপে ভয়ে, গা জ্বলে রাগে। মা অবশ্য গা জ্বলা কথা কিছু বলেন না তাঁকে। অপ্রসন্ন মুখে মুখ মলিন করে বলেন, *মেয়ের বাবা মেয়েরে আরও লেখাপড়া করাইব। এহনই বিয়ার কথা শুনলে খুব রাগ হইব।* আবদুল বারীর বউ মার ওই কথা শোনার পরও আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ব্লাউজের ভেতর থেকে একটি দলামোচা চিঠি আমার হাতটি টেনে হাতের ভেতর গুঁজে দিয়ে আথিবিথি বেরিয়ে যান। চিঠিটি গোসলখানায় নিয়ে খুলে পড়ি। তোমাকে ভালবাসি জাতীয় কথায় দুপাতা ঠাসা। চিঠিটি, আমাকে লেখা কোনও চিঠি এই প্রথম, কুটি কুটি করে ছিঁড়ে পায়খানার গু মুতের মধ্যে ফেলে দিই। ফেলে দিয়ে, কাউকে না জানিয়ে চিঠির কথা, বসে থাকি একা, সবার আড়ালে।

বাবা আমার বেড়ে উঠতে থাকা শরীর দেখে মার কাছ থেকে একটি ওড়না সংগ্রহ করে আমার দুকাঁধে ফেলে বললেন, *এইভাবে পইরা থাকবা, তাইলে সুন্দর লাগবে।* বাবার এই কথায় এত তীব্র অপমান আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে যে বেড়ে ওঠা বুকের লজ্জায় সারারাত আমি বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি। বুক ঢেকে রাখার এই বাড়তি কাপড়টি পরতে আমার লজ্জা হয়, কারণ এটিই আমার মনে হয় প্রমাণ করে যে এটির আড়ালে কিছু আছে, কিছু নরম কিছু, শরম কিছু, না বলতে পারা কিছু। তাই ঢাকতে হয়, কারণ যা আছে তা বড় অশ্লীল, বড় লাগামছাড়া বেড়ে ওঠা, ওসব যেন দৃশ্যমান না হয়। ওড়না যেন না পরতে হয়, শরীরের কোনও অশ্লীলতা যেন প্রকাশিত না হয় আমি কুঁজো হয়ে হাঁটি। কুঁজো হওয়াই অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে। মা পিঠে কিল দিয়ে বলেন *সোজা হইয়া হাঁট, ওড়না পইরা ল। ওড়না পরলে সোজা হইয়া হাঁটবি, এমন যে গুঁজা হইয়া হাঁটস, পিঠের হাড্ডি পরে আর সোজা হইব না।* তারপরও ইচ্ছে করে না সোজা হতে, বুক ঢাকতে ওড়নায়। জিনিসটিকে বেঢপ একটি জিনিস বলে মনে হতে থাকে। ওড়না পরি বা না পরি, মানুষ জানে যে আমি বড় হয়ে গেছি। মেট্রিক দেওয়া মেয়েদের, বিয়ে কি, বাচ্চা কাচ্চাও হয়ে যায়, মা বলেন। শুনে একটি ধারালো কাঁটা বিঁধে থাকে বুকে। বুক ধড়ফড় করে। আমার বড় হতে ইচ্ছে করে না। বিয়ে ব্যাপারটি আমার কাছে কেবল ভয়ের আর যন্ত্রণার নয়, বড় অশ্লীলও মনে হয়। সে অন্য কারও বেলায় হলে হোক, আমার বেলায় যেন কখনও না হয়। ছুঁড়ে ফেলে দিই বাবার পরিয়ে দেওয়া ওড়না। আমি বড় হয়ে গেছি, এ ব্যাপারটি কাউকে বোঝাতে আমার ভয় হয়।

পরীক্ষার পর ইশকুলের বই থেকে নিস্তার পাবো,এরকম একটি স্বপ্ন ছিল। ঢাকার পিকনিক থেকে ফিরে এলে বাবা আমার স্বপ্ন গুড়িসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে বলেছেন পুরোনো বইগুলোই আবার আগাগোড়া পড়তে, প্রতিটি কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হবে, খুব কঠিন সেই পরীক্ষা, না পাশ করলে আমার কপাল থেকে পড়াশোনার পাট জন্মের মত চুকে যাবে, সারাজীবন *অশিক্ষিত* খেতাব নিয়ে আমাকে দুঃসহ জীবন পার করতে হবে। অতঃপর সেই একই বই সামনে নিয়ে আমাকে বসে থাকতে হয়। পড়া থেকে উঠে কি করতে হবে তাও বাবা জানেন, অবসর বিনোদনের জন্য তো তিনি দিয়েই রেখেছেন *বেগম।*

মেট্রিকের ফল যেদিন বেরিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ দাস দুপুরের দিকে অবকাশে ছুটে এসে উল্লাসে জয়ধ্বনি করলেন। আমি প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। খবরটি শুনে যখন আমি বাড়িময় খুশিতে লাফাচ্ছি, বাবা এলেন, হাতে পরীক্ষার ফলের কাগজ। তিনি আমাকে কাছে ডেকে *মা মা* বলে জড়িয়ে ধরবেন, খাঁচা ভরে রসগোল্লা, মালাইকারি,কালোজাম, চমচম এনে বাড়ির সবাইকে খাওয়াবেন,এ ব্যাপারে আমি অনেকটাই নিশ্চিত। যখন আমাকে ডাকলেন, খুশিতে উপচে ওঠা মুখটি নিয়ে কাছে গেলাম। বাবার আলিঙ্গনের অপেক্ষায় যখন আমার শরীর প্রস্তুত, বাবার হর্ষোচ্ছাস উপলব্ধি করতে যখন আমার মন প্রস্তুত, গালে শক্ত এক চড় কষিয়ে বললেন, *থার্ড ডিভিশন পাইছস, লজ্জা করে না?*

থার্ড ডিভিশন? স্তম্ভিত মুখ বাবাকে শুধরে দেয়, *আমি তো ফার্স্ট ডিভিশন পাইছি।*

বাবা এবার আমার মুখে মাথায় ক্রমাগত চড়ের বন্যা বইয়ে দিতে দিতে বলেন, *স্টার পাইছস? পাস নাই। কয়ডা লেটার পাইছস? লেটার না পাইয়া ফার্ষ্ট ডিভিশন পাওয়া মানে হইল টাইন্যা টুইন্যা পাশ করা,টাইন্যা টুইন্যা পাশ করা মানে থার্ড ডিভিশন পাওয়া।* আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তন থেকে মোট তিনজন প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, কেউই তারকাখচিত নয়। কারও লেটার জোটেনি। তা না হোক, *বিদ্যাময়ী ইশকুল থেইকা তো পাইছে, জিলা ইশকুল থেইকা তো পাইছে!* বাবা আমাকে কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে পড়ার টেবিলের কাছে ধাক্কা দিয়ে ফেললেন। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, *যারা স্টার পাইছে, তারা ভাত খাইছে,তুই খাস নাই? মাস্টার রাইখা তরে আমি পড়াইছি, থার্ড ডিভিশন পাওয়ার লাইগা নাকি, হারামজাদি।* সামনে একটি বই খুলে আমি স্থির বসে থাকি, বইয়ের অক্ষরে টপটপ পড়তে থাকে নোনা জল।

অনেক রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে আমি বেড়ালের মত শব্দহীন হেঁটে হেঁটে ইঁদুরের বিষ খুঁজতে থাকি। আমার এই বেড়ে ওঠা শরীর, আমার এই উদ্ভট অস্তিত্ব, আমার এই অপদার্থ মস্তিষ্ক সব কিছুই আমাকে এমন একরত্তি করে তোলে যে ক্ষুদ্র হতে হতে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ইচ্ছে করে অদৃশ্য হয়ে যেতে। ইঁদুরের কোনও বিষ জোটে না, যা জোটে তা ঘরের কোণে ধুলো পড়া একটি ইঁদুর ধরার ফাঁদ।

আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তনে সপ্তম শ্রেনী থেকে প্রতিটি শ্রেণীতেই বৃত্তি পেয়েছি আমি, সে বৃত্তির একটি টাকাও কোনওদিন নিজের জন্য রাখতে দেননি বাবা, গুনে গুনে তুলে নিয়ে গেছেন। মা বলেছেন, *তর বাবা তর ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখতাছে টাকা। তুই বড় হইলে দিব।* মার কথা বিশ্বাস হত আমার। বাবার হাতে চলে যাওয়া টাকাকে নিজের টাকা ভেবে একধরণের স্বস্তি হত। বড় হয়ে ওই টাকায় ঘর বোঝাই বই কেনার স্বপ্ন দেখতাম। ইয়াসমিন পঞ্চম শ্রেণীতে দুবার থেকে একটি কাণ্ড ঘটিয়েছে, ওকে ইশকুল বোর্ডের বৃত্তি পরীক্ষায় বসিয়েছিলেন বাবা, পরীক্ষায় ভাল করে ও দিব্যি বৃত্তি পেয়ে গেছে। এখন ইয়াসমিনকে ডাকতে হলে বাবা বলেন, *কই বৃত্তিধারী ছাত্রী কই!* পঞ্চম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষা আমার দেওয়া হয় নি, অষ্টম শ্রেণীরটি দেওয়া হলেও কপালে কিছু জোটেনি। কপালে কিছু জোটেনি বলেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইয়াসমিনকে *বৃত্তিধারী ছাত্রী* বলে ডাকেন বাবা। কেবল তাই নয়, বাবা আমাকে নর্দমার কীটের সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেক। শুনে নিজেকে অনেকবারই সত্যিই *নর্দমার কীট* বলে মনে হয়েছে। তারকাখচিত প্রথম বিভাগ জোটেনি বলেও আবার নিজেকে নর্দমার কীট বলে মনে হতে থাকে। চন্দনা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। এ নিয়ে তার কোনও দুশ্চিন্তা নেই। দ্বিতীয় বিভাগেই পাশ করেছে বেশির ভাগ ছাত্র ছাত্রী। দ্বিতীয় বিভাগ যদি আমার জুটত, তবে বাবা চাবকে আমাকে রক্তাক্ত করে বাড়ি থেকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দিতেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সে দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে স্বস্তি জোটে, প্রথম বিভাগ পাওয়ার ফলে কলেজে বৃত্তি পাব, বিনে পয়সায় কলেজে পড়ব, বাবা বৃত্তি জিনিসটি খুব পছন্দ করেন, খানিকটা হলেও ভারমুক্ত হই। অন্তত এ ব্যাপারটি না ঘটলে উঠতে বসতে বাবার দাঁত খিঁচোনো দেখতে হত। এখনও যে হয় না তা নয়। আমি নিশ্চিত, বৃত্তি না জুটলে আরও হত।

কলেজে ভর্তি হতে কোনও পরীক্ষার দরকার হয়নি। মেট্রিকের ফল দেখেই ভর্তি করে নিয়েছে কলেজে। খামোকা আমাকে মেট্রিক পরীক্ষার পরও সেই ইশকুলের বইগুলো পড়তে হয়েছে, ভেবে আফসোস হয়। সময়গুলো অযথা উড়ে গেছে, হাওয়ায় উড়েছে। আর কি কখনও ফিরে আসবে অমন অবসর! সময় হয়ত অনেক আসবে, মেট্রিকের পরের সময় আর আসবে না।

আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছে ছিল, ও কলেজে আবার ছেলেরাও পড়ে, ছেলেদের সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে বসে ক্লাস করতে দিতে আর যিনিই দিন না কেন, বাবা দেবেন না। ঘাড় ধরে, আনন্দমোহনের ভাল কলেজ হিসেবে নাম থাকলেও, মুমিনুন্নিসার কোনও নাম না থাক, যেহেতু এটি মেয়েদের কলেজ, এটিতে আমাকে ঢুকিয়ে, অনেকটা হাঁসের খোঁয়াড়ে যাবার বায়না নাকচ করে দিয়ে মুরগিকে আর দশটা মুরগির সঙ্গে এক

খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার মত, স্বস্তি পেলেন তিনি। যতটা অখুশি হওয়ার দরকার ছিল এ কলেজে এসে, ততটা হইনা, এর কারণ চন্দনা। ওর বাবাও ওকে ধরে বেঁধে মুমিনুন্নিসা কলেজে ভর্তি করিয়েছেন। চন্দনাকে পেয়ে প্রতিদিন একশ ছেলের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দুর্ভাগ্যের জন্য কপাল চাপড়ানো তো দূরের কথা, মন কালো করে যে দুদণ্ড একলা বসে থাকব, তা হয়না। আনন্দমোহন আমাদের কাছে আকাশপারের কোনও রহস্যময় সপ্তম স্বর্গ হয়ে রইল, ওটিকে আপাতত মাচায় তুলে রেখে আরও আরও স্বপ্ন তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমি আর চন্দনা। মুমিনুন্নিসা কলেজটি শহরের পশ্চিম কোণে বিশাল এক মাঠের ওপর। ক্লাস হয় একটি লম্বা টিনের ঘরে, গঞ্জের ইশকুলঘরের মত ঘরটি। আরেকদিকে নতুন ওঠা দালানঘর। এই দালানঘরে বিজ্ঞানের ছাত্রীদের বেশির ভাগ ক্লাস হয়। ইশকুলের মত এক ঘরেই সমস্ত ক্লাস নয়। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে দৌড়ে যেতে হয় বিভিন্ন ক্লাসে। এই নিয়মটি আমার পছন্দ হয়। ইশকুলে সেই সকালে একটি ঘরের একটি বেঞ্চে বসা হল তো সারাদিন ওখানেই বসে থাকতে হয়। কলেজের আরও একটি নিয়ম আমার ভাল লাগে। তুমি যদি কোনও ক্লাসে না যাও, মাঠে বসে থাকো বা পুকুরের পানিতে পা ডুবিয়ে বান্ধবীর সঙ্গে গপ্প কর, কেউ তোমার চুলের মুঠি ধরে নিয়ে বসিয়ে দেবে না ক্লাসে, এক ক্লাস মেয়ের সামনে কান ধরে এক ঠ্যাংএ দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে না। ক্লাসে ক্লাসে নাম ডাকা হচ্ছে। ইশকুলের মত এক ক্লাসে নাম ডাকা হল তো সে নিয়ে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবদি থাকা নয়। কলেজের নতুন নিয়মে চমৎকৃত হই, কিন্তু কলেজ থেকে যখন ইচ্ছে তখন বেরোতে পারব না, এ নিয়মটি আমার মোটেও ভাল লাগে না। চন্দনার তো লাগেই না। কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ও অনেকবার বলেছে, *কলেজে পড়ার মজা কি জানস? ইচ্ছা হইলে ক্লাস করবি, ইচ্ছা না হইলে করবি না। যখন ইচ্ছা কলেজ থেইকা বাইর হইয়া পড়া যাইব। ঠিক কলেজ ছুটির টাইমে বাড়িতে আইয়া পড়লেই হইল।* এই স্বপ্ন আমাকে বিভোর কম করেনি। কিন্তু কলেজে যেতে শুরু করে ছফুট লম্বা সাপের মত কালো মিশমিশে শরীরের চুলহীন দাঁতহীন গগনকে দেখে আমার পিলে চমকে ওঠে। *কি রে বাবা, দারোয়ান কেন?* ইশকুলের গেটে দারোয়ান থাকে। ইশকুলের বাচ্চাদের জন্য। কলেজে পড়া বড় মেয়েদের জন্য, যারা নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারে, তাদের জন্য পাহারা বসানোর তো কোনও যুক্তি নেই! চন্দনা একমত। সকাল দশটায় কলেজে এসেছি। দুটো ঘন্টা কোনও ক্লাস নেই। চন্দনা বলে চল বাইরে যাই। বাইরে কোথায় তার কোনও সিদ্ধান্ত নিই না। বাইরে। এই সীমানার বাইরে। বাড়ির সীমানার বাইরে যেতে যেমন উতলা হই, এই কলেজ সীমানার বাইরে যেতেও। কিন্তু চল বললেই কি যাওয়া হয়, গেটের দিকে যেতে নিলেই গগন আমাদের খপ করে ধরে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, দুঘন্টা আমাদের করার কিছু নেই। না থাক। তবু গেটের বাইরে এক পা ও ফেলা যাবে না। যাবে না তো যাবেই না। গগনকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি, আমরা আর ছোট নেই, বড় হয়েছি. আমরা হারিয়ে যাব না, বা কোনও ছেলেধরা আমাদের বস্তায় পুরে কোথাও নিয়েও যাবে না। গগনে তবু গনগনে আগুন, কোনও মেঘবৃষ্টির ছিটেফোঁটা নেই। গগন আমাদের স্বপ্নের লেজ ধরে ছুঁড়ে দেয় দূরের নর্দমায়। মেয়েদের কলেজের নিয়ম হচ্ছে, একবার ঢুকে গেলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই বিকেলে ছুটির ঘন্টা পড়বে তো বেরোতে পারবে। ইশকুলের দশটা পাঁচটা নিয়মের মধ্যে এত বছর বন্দি থাকার পর কলেজে এসে যদি পাখা না মেলতে পারি, তবে আর কলেজে আসা কেন! আনন্দমোহন কলেজে ছেলেমেয়েরা যখন খুশি ঢোকে, যখন খুশি বেরোয়। আর মুমিনুন্নিসার মেয়েরা, যেহেতু এরা মেয়ে, এরা বড় হয়ে গেলেও এদের বড় বলে জ্ঞান করা হয়না, তাই আবারও দশটা পাঁচটার হিশেব, আবারও

ইউনিফর্ম, শাদা পাজামা, শাদা জামা, লাল ওড়না। ইশকুল ছেড়ে কলেজে নাম লিখিয়েছি, দালান পালটেছে, মাস্টার পালটেছে, বইপত্র পালটেছে কিন্তু নিয়ম ওই একই আছে। কলেজ চত্বরেই বিমর্ষ ঘোরাঘুরি করে আমাদের সময় পার করতে হয়।

ওড়না বস্তুটি আমার যেমন অপছন্দ, চন্দনারও। ও বস্তুটি ধারণ না করেই আমরা মাঝে মধ্যে উদয় হই কলেজে। কলেজের ছাত্রী শিক্ষকদের ছানাবড়া চোখের সামনে বুঝি যে এমন অবশ্য-জরুরি বস্তুটিকে নির্বাসন দিয়েছি বলে সকলেই মর্মাহত। কারও মর্মের প্রতি উদার হওয়া আমাদের চর্মে তত নেই। কলেজ শুরু হওয়ার পর শিক্ষক শিক্ষিকা সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাতে অন্তত এইটুকু বুঝি যে অংকের শিক্ষক দেবনাথ চক্রবর্তীর ক্লাস জগত উল্টে গেলেও ফাঁকি দেওয়া চলবে না। বাকি শিক্ষক শিক্ষিকাদের ক্লাস খুব প্রয়োজন না হলে বাদ। বাংলার শিক্ষক আবদুল হাকিম যিনি মোর বলতে গিয়ে মুর বলেন, একই রকম চোরকে চুর, তোরাকে তুরা, জোড়াকে জুড়া--তাঁর ক্লাসে গিয়ে চিরকুট চালাচালি কর, হাকিমবাবুর ছবি আঁকো, চঞ্চুনাশা, কদমছাঁট চুল, নাকে ঝোলা চশমা; পুস্তকি পদ্যে মন বসানোর কোনও কারণ নেই যেহেতু মন আমাদের অনেক আগেই পদ্যাক্রান্ত। শ্রীমতী সুমিতা নাহাও বাংলা পড়ান, তিনি যখন বাংলা গদ্য পদ্যের বর্ণনা করেন, প্রথম সারির মেয়ে ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই তাঁর কণ্ঠস্বর শোনে, কণ্ঠস্বরটিকে মাটির কাছাকাছি রেখে একরকম বাঁচিয়ে চলেন তিনি, যথেষ্ট উঁচুতে উঠলে সে স্বরের ভূপাতিত হওয়ার আশংকা আছে বলেই হয়ত। তিনি নামী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী,তাঁর স্বামী আলোকময় নাহাও শিল্পী। শিল্পী আবার রাজনীতিবিদও। একবার ভোটে দাঁড়ালেন তো পাশ করে গেলেন। ভাল রাজনীতিবিদ তিনি, সে কারণে নয়। ভাল গায়ক তিনি, সে কারণেই। রসায়নবিজ্ঞানের শিক্ষিকা নাক সবসময় কুঁচকে রাখেন, যেন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। নাকি সুরে রসায়ন পড়ান। কি পড়াচ্ছেন ক্লাসের মেয়েরা কেউ বুঝুক না বুঝুক, তিনি পড়িয়ে যান। ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্চিত নাক নিয়েই বেরিয়ে যান। হঠাৎ একদিন রসায়ন ক্লাসে হাসির দমক থামাতে না পেরে আমি আর চন্দনা শাস্তি হিসেবে ক্লাসঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আহলাদে বাঁচি না। পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ঠোঁটে যে বঙ্কিম হাসি ঝুলিয়ে ক্লাসে ঢোকেন, তাতে কোন কোন মেয়ের হৃদয়ে উষ্ণ হাওয়া বয় তা অনুমান করতে চেষ্টা করি আমি আর চন্দনা দুজনই। জীববিজ্ঞান ক্লাসে খানিকটা ঢেউ ওঠে, ব্যাঙ ধরে মোমের ট্রেতে ব্যাঙকে চিৎ করে শুইয়ে বুকপেট কেটে দেখাতে হবে পাকতন্ত্র। মোটা শাদা কাগজে আঁকতে হবে নানারকম জীবজন্তুর ছবি। ছবি মানেই আমার রাজত্ব। সারাদিনই এইচবি, বি, থ্রিবি ইত্যাদি নানা নামের পেনসিল দিয়ে কারুকাজ করে ছবি আঁকি, যেন ছবি আঁকার ইশকুলে ভর্তি হয়েছি। দেখে বাবা বলেন, *ফালতু কাম রাইখা বইয়ের পড়া মুখস্ত কর।* বাবার কাছে জীববিজ্ঞানের ছবি আঁকাও ফালতু। ব্যাঙ নিয়ে যেতে হবে কলেজে, ব্যাঙএর পেছনে উঠোন জুড়ে দৌড় শুরু হয়। ব্যাঙ দৌড়োয়, পেছনে আমরা দৌড়োই। আমি, ইয়াসমিন, মা। শেষ অবদি ঘরের কোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি সোনাব্যাঙ কাগজের ঠোঙায় ভরে কলেজে নিয়ে ব্যাঙএর হাত পা টেনে পেরেক লাগিয়ে কেটে পাকতন্ত্র দেখাই বটে, কিন্তু ব্যাঙএর মায়ায় আমি এমনই উদাস বসে থাকি যে চন্দনা এসে গা ধাক্কা দিলে চেতন ফেরে, চেতন ফেরা মানে বেরিয়ে যাওয়া। ক্লাসঘরের দমবন্ধ আবহাওয়ায় যত কম থাকা যায়, তত মঙ্গল। বেরিয়ে যাই জীববিজ্ঞানের ল্যাবরটরি থেকে। আমাদের পাখা মেলতে ইচ্ছে করে। বন্ধন ভাঙার জন্য ভেতরে প্রবল তৃষ্ণার জন্ম হয়। সেই তৃষ্ণা নিয়ে, যেহেতু সীমানা ডিঙোনো চলবে না, মাঠের শেষমাথার শিমুলতলায় বসে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে কবিতা পড়ি দুজন দুজনের। পুরো কলেজের ছাত্রীরা আমাদের

পলকহীন চোখে দেখে, আমরা নাকি *অন্যরকম,* ঠিক স্বাভাবিক নই। চন্দনা কলেজে আসার পথে এক ছেলের প্রেমে তখন পড়ছে পড়ছে, ওর *পড়ছে পড়ছের* গল্প শুনে আমারও ইচ্ছে হয় এই শাদামাটা জীবনে তরঙ্গ তুলতে। কিন্তু তরঙ্গ তোলার কেউ তো নেই হাতের কাছে। আমার কোনও *পড়ছিপড়ছির* গল্প নেই। আমার জীবন জুড়ে কেবল ধু ধু করে ভরদুপুরের নিস্তব্ধতা আর তপ্ত বালুময় লু হাওয়া। বড় নিঃস্ব মনে হয় নিজেকে। একদিন ইয়াসমিনকে দিয়ে শাদা শার্টের কাছে লুকিয়ে একটি চিরকুট পাঠিয়ে, সেই শাদা শার্ট ছাদ থেকে যাকে দেখে বুক ঢিপঢিপ করত একসময়, সাড়ে দশটায় কলেজ গেটে থাকতে বলে, পরদিন কলেজে না ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকা শাদা শার্টকে রিক্সায় তুলে নিয়ে সোজা মুক্তাগাছা চলে যাই। রিক্সা করে এত দূরের পথ মুক্তাগাছা যাওয়ার পদ্ধতি ছোটদার কাছ থেকে শেখা। তিনি গীতাকে নিয়ে তাই করতেন। কিন্তু সারা পথ আমি গ্রাম দেখতে দেখতে কৃষকের হালচাষ দেখতে দেখতে রাস্তার কিনারে বসে থাকা শীর্ণ গরু দেখতে দেখতে মুক্তাগাছা যাই, গিয়ে বিখ্যাত গোপাল মন্ডার দোকান থেকে দুটো মণ্ডা কিনে খেয়ে আবার সেই রিক্সা করেই ফিরে আসি কলেজ গেটে। পথে শাদা শার্টের কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না ছাড়া আমার আর কিছু বলা হয় না। ঘটনাটি ঘটিয়ে আমার পুলক লাগে বটে, সাংঘাতিক একটি কাণ্ড করে চন্দনাকে সেই কাণ্ডের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে সাহসী বনে যাই বটে, কিন্তু শাদা শার্টের জন্য আমি লক্ষ করি, আমার মন কেমন করছে না। ইচ্ছে করছে না আরও একদিন তাকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে হাওয়া খেতে যেতে।

এর মধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। আমাকে বাড়ি এসে পড়িয়ে যাওয়ার জন্য দেবনাথ চক্রবর্তীকে নিয়োগ করেছেন বাবা। দেবনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে ছাত্র ছাত্রীরা দল বেঁধে পড়তে যায় আর আমাকে তাঁর মত পণ্ডিত লোক রাজি হয়েছেন বাড়ি এসে পড়াতে,চাট্টি খানি কথা নয়, সীমা ছাড়ানো সৌভাগ্য! কিন্তু এর একটি বিপদ লক্ষ করি, কলেজের ক্লাসে আমার শ্রীমুখখানা তাঁর দর্শন করা চাই। কেবল দর্শন করা নয়, যত প্রশ্ন তাঁর, সব আমাকেই করা চাই, এবং সঠিক উত্তর আর কারও নয়, আমার কাছ থেকেই তাঁর শোনা চাই। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, এবং তিনি প্রতি ক্লাসে আমার মাথায় চড় ঘুসি ডাস্টার সব কিছুরই বর্ষণ ঘটান। বিকেলে যখন তিনি অবকাশে উদয় হন, শরীর আমার অবশ হয়ে আসে। গোলআলুর মত শরীর, পরনে চিরাচরিত নীল শার্ট কালো প্যান্ট, শার্টের পকেটে একটি মোটা কালো কলম, পকেটের নিচে কালির দাগ, পায়ে রাবারের কালো জুতো, সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো, মুখ ভর্তি পান,হেলে দুলে হাঁটেন, মানুষটি রাস্তায় হেঁটে যাওয়া কলিমুদ্দিন সলিমুদ্দিন যে কেউ হতে পারত, কিন্তু তিনি দেবনাথ চক্রবর্তী, বিশাল মাথা জুড়ে জটিল বিজ্ঞানের জ্ঞান, তাঁর কাছে না পড়ে কোনও ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে সম্ভব নয় ভাল ফল করা পরীক্ষায়। দেবনাথ পণ্ডিতের কারণে আমার প্রতিটি বিকেল ধ্বংস হতে থাকে। আমি অংকে ভুল করলাম কি পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খাতা বই দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলে দেন মেঝেয়। ইয়াসমিন আশে পাশেই থাকে ওগুলো আবার টেবিলে তুলে দেওয়ার জন্য। শক্ত শক্ত কিল ঘুসি থাপ্পড় বিরামহীন চলতে থাকে আমার মাথা লক্ষ করে। বাড়ির মানুষেরা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমার করুণ অবস্থা দর্শন করে। মা দয়াপরবশ হয়ে ইয়াসমিনের হাতে একদিন কাঁঠাল গাছের একটি ডাল ভেঙে পাঠালেন, যেন এটি দিয়ে আমার পিঠে মারা হয়। পিঠে যেন মারা হয়, মাথাটি যেন বাঁচে। *মাথায় যেইভাবে উল্ডা পাল্ডা মারে, কবে না জানি মাথাডাই যায়!* মা আমার মাথার চিন্তায় চিন্তিত। দেবনাথ পণ্ডিতের রাগ যখন ওঠে, তখন আর ডালের দিকে তাঁর চোখ পড়ে না,

ডাল পড়ে থাকে ডালের মত, আগের মত আমার মাথায় কিল ঘুসি মেরেই যেতে থাকেন তিনি, আবারও আগের মত দলামোচা করে ছুঁড়ে ফেলতে থাকেন বইখাতা। আমার বিকেল কেবল নয়, জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন দেবনাথ পণ্ডিত।

অতিষ্ঠ জীবনে তারপরও উত্তেজনা কম নয়। বিচিত্রায় *ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন* নামে একটি বিভাগ শুরু হওয়ার পর আমি আর চন্দনা সিদ্ধান্ত নিই এতে লিখব। একটি শব্দের জন্য আটআনা খর্চা, চারটে শব্দে দুটাকা। দুতিনটাকার বেশি আমার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়, কলেজের রিক্সাভাড়ার পয়সা বাঁচিয়ে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে পোস্টাপিসে নেমে মানিঅর্ডার ফরমে বিজ্ঞাপন লিখে পাঠাই, চন্দনাও। সিনে পত্রিকায় চলচিত্রের চালচিত্র আর বিচিত্রায় দেশ-কাল-সমাজ নিয়ে থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়এর বাইরে *যা ইচ্ছে তাই* লেখার একটি মোক্ষম সুযোগ জোটে আমাদের। আমরা *যা ইচ্ছে তাই* করার জন্য ছটফট করা দুজন মানুষ। কবি রফিক আজাদ ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, *একটি চুমু দিলে একটি কবিতা দেব,* দেখে উৎসাহ ক্যাঙারুর মত লাফায়। চন্দনা আর আমি দুজন মিলে লিখি, *আমরা এক আত্মা এক প্রাণ।* আমি লিখি *আমি দুরন্ত দুর্বার,* চন্দনা লেখে *আই এম দ্যা গ্রেটেস্ট।* আবারও চিত্রালীর পাতার মত কাণ্ড ঘটে, আমি একটি লিখি তো আমাকে নিয়ে কুড়িজন লেখে, কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। মাত্র দুটো তিনটে শব্দ দিয়ে গড়া একটি বাক্য মরা পুকুরে পাথর ছোঁড়ার মত, পুকুর জুড়ে ঢেউ ওঠে। পাড়ে বসে ঢেউ দেখার আনন্দ আমি আর চন্দনা দুজনই উপভোগ করি। আমাদের গণ্ডির জীবন, চারদিকে বেড়াজাল, পায়ে পায়ে নিষেধ, গায়ে গায়ে না, এই না নিষেধ অমান্য করার শক্তি বা সাহস আমরা শব্দ দিয়ে অর্জন করি। আমাদের শব্দগুলো এমন সগর্বে সদম্ভে উচ্চারিত যে পড়লে যে কেউ ভেবে বসে অহংকারি, অবিনীত, উদ্ধতমনা, উন্নাসিক দুটো উগ্র কিশোরী, বাঁধন মানে না, নীতিরীতির থোড়াই তোয়াক্কা করে;যদিও বাস্তব সম্পূর্ণই বিপরীত, বাঁধন না মানা জীবনটি কেবল আমাদের স্বপ্নের জীবন। অনেকে আবার এও ভাবে, এক মানুষের আড়ালে দুটি নাম, চন্দনা আর তসলিমা ভিন্ন কোনও অস্তিত্ব নয়। রিক্সাভাড়া থেকে শীতের পিঁপড়ের মত দুআনা চারআনা সঞ্চয় করে শিশিবোতলকাগজ থেকে আর বাপদাদার পকেট থেকে তাঁদের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারেও যে পয়সা কামাই করি, তা ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের খর-স্রোতে ভেসে যেতে থাকে।

চন্দনা আর আমার কখনও শুদ্ধ বাংলায় কথা হয়নি, সবসময়েই ময়মনসিংহের গ্রামঅঞ্চলের ভাষায়। আমার চেয়ে এ ব্যাপারেও চন্দনা এক কাঠি দু কাঠি নয়, চার কাঠি ওপরে। আমি বলি, *গোসলটা কইরা আসি,* চন্দনা বলে, *গুসুলডা কইরা আহি।* চন্দনার ভাষা শুনে আমার হাসি পেত প্রথম প্রথম, কিন্তু অচিরে নিজেই আমি পতিত হই ওই ভাষার জালে। কে কত বেশি আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় আমাদের মধ্যে। বরাবরই আমি হেরে যাই ওর কাছে। ইশকুল কলেজে যেতে যেতে ছেলে মেয়েরা আঞ্চলিকতা যতদূর সম্ভব কমাতে চেষ্টা করে। চন্দনা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চল থেকে এসেছে, বাড়িতে চাকমা ভাষায় কথা বলে, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোলে ওর মত শুদ্ধ বাংলা যেমন লোকে কম জানে, ওর মত আঞ্চলিক সুরে এবং শব্দে কথা বলা জন্ম থেকে এ শহরে বেড়ে ওঠা লোকও জানে কম। চন্দনা আমাকে মুগ্ধ করে তো বটেই, অবাকও করে। চন্দনার সঙ্গে কথা যেমন বলেছি ময়মনসিংহের অজ পাড়া গাঁর ভাষায়, চিঠি লেখাও সে ভাষাতেই হয়েছে। লোকে, এ জানি, মুখে যে রকম ভাষাতেই কথা বলে, চিঠির বেলায় শুদ্ধ ভাষা চাই। চন্দনা এ জিনিসটি মানেনি কোনওদিন। যার সঙ্গে যে

ভাষায় ও কথা বলেছে সে ভাষাতেই চিঠি লিখেছে। ময়মনসিংহে আসার আগে ও ছিল কুমিল্লায়, কুমিল্লার বান্ধবীকে চিঠি লিখেছে কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায়, কুমিল্লা আসার আগে ছিল চট্টগ্রামে, ওখানকার বান্ধবীকে চট্টগ্রামের ভাষায়। আর আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর সব বান্ধবী বাতিল করে দিয়ে এক আমাকে নিয়েই মেতে থাকল। এদিকে আমার জগতে চন্দনা ছাড়া বাকিরা ধীরে ধীরে ফিকে হতে শুরু করেছে। আমার হাত ছিল না এতে, চন্দনার ব্যক্তিত্ব, অভিনবত্ব, অসাধারণত্ব আমাকে অভিভূত করে রাখে, আচ্ছন্ন করে রাখে সকল সময়। মেট্রিকের পর এবং কলেজ শুরু হওয়ার আগে খুব সঙ্গত কারণেই আমাদের দেখা হওয়ার সুযোগ ছিল কম। ঘরে বসে থাকতে আমাকে যেমন হত, চন্দনাকেও। বান্ধবীর বাড়ি বেড়াতে যেতে পারব যখন তখন, প্রশ্নই ওঠে না। বাইরে বের হওয়া মানে মার সঙ্গে নানিবাড়ি বেড়াতে যাওয়া, পীরবাড়ি যাওয়া তো অনেক আগে বাদই দিয়েছি, মার কাছ থেকে অনুমতি পুরো না নিতে পারলেও অন্তত নিমরাজি করিয়ে ছোটদার সঙ্গে অনুষ্ঠানাদিতে যাওয়া, দাদার সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া। সিনেমায় সবসময় দুপুরের শোএ যেতাম, বাবা যেন টের না পান। শো শেষ হত বিকেলে, তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরে আমি দাদা ইয়াসমিন এমন মুখ করে বসে থাকতাম যেন কস্মিন কালেও *সিনেমা কাহাকে বলে* জানি না। চন্দনাকে নিয়েও কদিন গিয়েছি সিনেমায়, তবে সে দাদারই আয়ত্তাধীন হয়ে। আলমগীর কবীরের *সীমানা পেরিয়ে* ছবিটি দেখে আসার পর দেখে আসার পর ছবিতে বুলবুল আহমেদের সংলাপ আমাদের মুখে মুখে ফিরত। বোকা সোকা তোতলা লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে এক নির্জন দ্বীপে বুলবুল বলেছিলেন জয়শ্রীকে, *ত তর লা লাইগা আমি কি না করছি, ত তরে আমি বুকে রাখছি, পিঠে রাখছি .. !* বুলবুলের এই সংলাপ আমার আর চন্দনার মুখে মুখে ফিরত। মূলত চন্দনাই শুরু করেছিল, ওর ছোটভাই সাজুর সঙ্গে ওর এক দফা যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর। সাজুর হাতে কিলচড় খেয়ে ক্ষুব্ধ চন্দনা আমার সঙ্গে দেখা হতেই ঘটনার বর্ণনা করে বলল, *ও ওর লাইগা আমি কি না করছি, ও ওরে আমি বুকে রাখছি, পে পেটে রাখছি, মা মাথায় রাখছি, কান্ধে রাখছি।* ভাই দুটোর সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে আহত হওয়ার কোনও কষ্ট চন্দনা পুষে রাখত না, কিন্তু একটি কষ্ট ও জীবনভর পুষে রেখেছে। মলিনা চাকমা যখন জন্ম দিয়েছিলেন কন্যা সন্তান, সুব্রত চাকমা বড় একটি দা নিয়ে নিজের কন্যাকে আঁতুর ঘরে হত্যা করতে এসেছিলেন, কন্যা তাঁর পছন্দ নয় বলে। আঁতুরঘরে আত্মীয়দের হস্তক্ষেপে চন্দনা বেঁচে গেছে ঠিকই, মলিনা চাকমা এরপর দুটো পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার পর চন্দনার ওপর ক্রোধটিও সুব্রত চাকমার কমেছে, কিন্তু চন্দনা কখনই ওর বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি, এখনও দুঃস্বপ্নের মত দৃশ্যটি দিবসরজনী ওর মনের ভেতর নাছোড়বান্দার মত বসে থাকে।

ছোটদা খবর আনলেন, চিপাচসের অনুষ্ঠান হচ্ছে, ঢাকা থেকে অভিনেতা বুলবুল আহমেদ আসছেন। সেই বুলবুল আহমেদ, ভাল অভিনেতা হিসেবে যাঁর খ্যাতি, অদ্ভুতুড়ে মারদাঙ্গা ছবিতে আর যে অভিনেতাই থাকুন বুলবুল আহমেদ নেই সেই বুলবুল। সূর্যকন্যা ছবির বুলবুল।সীমানা পেরিয়ের বুলবুল। চন্দনার সুযোগ হয়নি অনুষ্ঠানে যাওয়ার, বাড়ি থেকে ওর অনুমতি মেলেনি। ছোটদার সঙ্গেও বাইরে বেরোনো সহজ কথা নয়, ছোটদা বখে যাওয়া ছেলে, তাঁর সঙ্গে ঘুরে আমাকে নষ্ট হতে দিতে বাড়ির কেউ রাজি নন। কিন্তু তারপরও অনুমতি জোটে, চলচ্চিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্য মার এক ধরনের পক্ষপাত আছে, যতই তিনি ধার্মিক হোন না কেন। চোখের সামনে সিনেমার নায়ককে দেখব, উত্তেজনায় ছটফট করছি। ছোটদা বললেন *অটোগ্রাফ খাতা লইতে ভুলিস না।* অটোগ্রাফ খাতা বলতে কোনও খাতাই আমার নেই। যাবার পথে একটি লাল নীল সবুজ

রঙের কাগজঅলা খাতা কিনে দিলেন ছোটদা। বুলবুল আহমেদ বসেছিলেন বিশাল এক টেবিলের এক কোণে, আর সেই টেবিলের কিনার ঘেঁসে লোক ছিল বসে, দাঁড়িয়ে। সহজ ভঙ্গিতে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন সবার সঙ্গে যেন এরা তাঁর জন্ম জন্ম চেনা। যাঁর যা প্রশ্ন ছিল, হেসে উত্তর দিচ্ছিলেন। যখন অটোগ্রাফ নেবার সময় হল, বুক কাঁপছিল, কি বলব তাঁকে? আপনার অভিনয় খুব ভাল লাগে। অভিনয় নিশ্চয় খুব ভাল লাগে, তা না হলে এখানে আসা কেন, অটোগ্রাফ নেওয়াই বা কেন! অটোগ্রাফ দেওয়ার সময় নাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, আমি মৃদু কণ্ঠে নামটি উচ্চারণ করলাম, তিনি পুরো নাম জানতে চাইলেন!বলার পর প্রাণোচ্ছল হাসিতে আমাকে অভিভূত করে বললেন, *তুমি তসলিমা নাসরিন? তুমি আমার অটোগ্রাফ নেবে কি! আমি তো নেব তোমার অটোগ্রাফ। তুমি তো আমার চেয়ে বিখ্যাত হে!* আমি মুখ লুকোলাম ছোটদার আড়ালে। সিনেমার লোকেরা যে আর সাধারণ মানুষের মতই মানুষ, তারাও যে হাসে কাঁদে গাল দেয় গাল খায়, তারাও যে পেচ্ছাব পায়খানা করে, তাদেরও যে সর্দি হয়, গা ম্যাজম্যাজ করে আগে আমার বিশ্বাস না হলেও বুলবুল আহমেদকে কাছ থেকে দেখার পর হল। রাজ্জাক, কবরী, আজিম, সুজাতা, জাফর, ববিতা, আলমগীর শাবানা সকলে যে আমাদের মত মানুষ, তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না।

চন্দনা পাড়ার এ বাড়ি ও বাড়ির ছেলে ছোকড়াদের ছুঁড়ে দেওয়া চিঠি বা চিরকুটের খুচরো প্রেম ছেড়ে হঠাৎ জাফর ইকবালে নিমজ্জিত হয়। জাফর ইকবাল চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে সুদর্শন নায়ক। নায়ক জাফর ইকবাল আর নায়িকা ববিতার প্রণয় নিয়ে নানা কথা লেখা হয় পত্রিকায়। ওসব আমরা মোটেও পরোয়া করি না। সুদর্শন বলে কথা। চারদিকে সুদর্শনের এমন অভাব যে জাফর ছাড়া আমাদের গতি নেই সে আমরা দুজনই বুঝি। একদিন চিপাচসের হয়ে ছোটদা ঢাকায় গিয়ে জাফর ইকবালের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এলেন, আমি আর চন্দনা দুজনই ছোটদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি আদ্যোপান্ত শুনতে। শুনে আগ্রহের আগুনে আরও সেরখানিক ঘি পড়ে। ছোটদার কাছ থেকে জাফর ইকবালের পাঁচ নয়াপল্টনের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে সে ঠিকানায় একটি চিঠি পাঠাই। দুদিন পরই জাফর ইকবালের উত্তর। *জাফ* লেখা সুন্দর কাগজে ভুল বানানে বন্ধু সম্বোধন করে লেখা ছোট চিঠি। আত্মহারা বিকেল কাটে। পরদিন সকালে চন্দনাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে অন্য দিনের মত কলেজে যাই বটে, তবে আমাদের পুরো দিন জুড়ে জাফর ছাড়া আর কিছু থাকে না। না পড়া,না লেখা,না অন্য কিছু। চিঠির বানান ভুল আপাতত আমরা ক্ষমা করে দিই, সে জাফর ইকবাল বলেই দিই। পত্রমিতা হওয়ার অনুরোধ করে যারাই ভুল বানানে চিঠি পাঠায়, তাদের কিন্তু রীতিমত উপেক্ষা করি। চন্দনাকে জাফরের কাছে লিখতে ইন্ধন যোগাই। কিছুদিন পর ওর কাছেও চিঠি আসে জাফরের। সে চিঠি নিয়ে ও পরদিন কলেজে আমার সঙ্গে দেখা না হওয়ার অপেক্ষা করে প্রায়-উড়ে অবকাশে চলে আসে। জাফরের স্বপ্নে আমাদের দুজনেরই সময় শিমুল তুলোর মত উড়তে থাকে। দাদার সঙ্গে গিয়ে দুজন দুটো ইংরেজি ছবি দেখে আসার পর আমার তেমন প্রতিক্রিয়া না হলেও, চন্দনা উঁচু জুতো কিনে জাফরের ছবি সে জুতোয় সেঁটে ছবির ওপর *আই লাভ ইউ* লিখে দিব্যি কলেজে আসতে লাগল। কেবল তাই নয়, বিদেশি ফ্যাশন ম্যাগাজিনএর ডিজাইন দেখে একটি লম্বা স্কার্ট বানিয়ে, পরে, মাথায় একটি বড় হ্যাট লাগিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াতে লাগল, লোকে চোখ গোল করে চন্দনাকে দেখে, যেন ও এ শহরের তো নয়ই, এ জগতেরও কেউ নয়। আমিও ঠিক একই রঙের একই রকম কাপড় কিনে চন্দনার স্কার্টের মত একটি স্কার্ট বানাই। ফ্যাশনের কোনও বোধ আমার ভেতর আগে ছিল না, বীজটি চন্দনাই বপন করে। এর মধ্যে

আমার প্রাচীনপন্থী বাবা একটি কাণ্ড ঘটান যা আমাদের যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। তিনি বাড়িতে একটি টেলিফোন আনেন। টেলিফোনটি তালা দেওয়া সুতরাং বাড়ি থেকে কোথাও কথা বলার সুবিধে নেই। টেলিফোন আনার মূল উদ্দেশ্য বাবা আরোগ্য বিতান থেকে ফোন করে বাড়ির মানুষ সব যে যার জায়গামত আছে কি না, যে যার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে যাচ্ছে কি না খবর নেবেন। বাড়িতে ফোন আসায় সবচেয়ে খুশি ছোটদা। তিনি তারকাঁটা বাঁকিয়ে ফোনের তালা খুলে ঢাকায় গীতার কাছে প্রতিরাতে ফোন করা শুরু করেছেন। আঁচ পেয়ে বাবা তালাবন্ধ টেলিফোন তাঁর ঘরের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে ড্রয়ারে তালা দিলেন। এই সমস্যাটির সমাধান আর কারও মাথায় না খেলুক ছোটদার মাথায় খেলে। তিনি দিব্যি টেবিলের ঢাকনা সরিয়ে ড্রয়ার থেকে ফোন বের করে আগের মতই বাঁকা তারকাঁটায় ফোনের তালা খুলে কথা বলতে লাগলেন। এদিকে বাড়িতে টেলিফোন আসার আনন্দে আমি দিকে দিকে বিলি করে যাচ্ছি নম্বর। তারপর সেই সন্ধেটি আসে, যে সন্ধেয় স্বয়ং জাফর ইকবাল ফোন করেন আমাকে। ছোটদা ফোন ধরে আমাকে দিলেন। এর আগে টেলিফোনে আমি কারও সঙ্গে কথা বলিনি। হ্যালো বলার পর আমার আর স্বর ফোটে না। এক ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতায় আমি ডুবে যেতে থাকি। মরিয়া হয়ে শব্দ খুঁজি। অন্তত একটি বা দুটি শব্দ। যত খুঁজি, ততই যেন শব্দ সব আমার ত্রিসীমানা থেকে পালায়। ওদিক থেকে জাফর একা কথা বলতে বলতে এপাশে কোনও প্রাণী নেই ভেবে ফোন রেখে দেয়। আবারও ফোন বাজে, আমি দৌড়ে অন্য ঘরে চলে যাই বলতে বলতে *জাফর ইকবাল ফোন করলে আমারে দিও না।* পরদিন রাতেও ওই হয়। ফোন বেজে চলে। ছোটদা ধরেন, আমাকে জানান জাফর ইকবাল আবার ফোন করেছিল। কিন্তু আমার কি করার আছে! চিঠিতে আমি তুমি লিখি জাফর ইকবালকে, তার কণ্ঠস্বরের সামনে পেটে বোমা মারলেও আমার মুখ থেকে তুমি বেরোবে না। শেষে হ্যালো বলা, তুমি বলা, কেমন আছো ভাল আছি ইত্যাদি কথা ঘন্টাখানিক চর্চা করার পর যখন ফোন এলে ধরব বলে প্রস্তুতি নিই, ফোন বাজে, ধরে শুনি বাবার কণ্ঠ, *ফোন কি কইরা ধরলি!ফোন ত তালা দেওয়া ড্রয়ারে।* দেবনাথ পণ্ডিত যেমন *চোখ্যে ভাসাইতে* বলেন কোনও জটিল অংকের সমাধান, এই ফোন ধরার পরিণাম কি হতে পারে তা *চোখ্যে ভাসিয়ে* আমি ভাষা হারিয়ে ফেলি আমার মাতৃভাষা বাংলা। এর পরের ফোনটি সাহস করে ছোটদা ধরেন, ওটি জাফর ইকবালের। আমাকে রিসিভার দিয়ে চাপা স্বরে বলেন, *ক হ্যালো, হ্যালো ক।* আমার হ্যালো বলা হয়, কেমন আছর উত্তরে ভাল আছি বলা হয়, চিঠি পেয়েছোর উত্তর পেয়েছি বলা হয় কিন্তু আমার দিক থেকে কোনও প্রশ্ন করা হয় না যেহেতু প্রশ্ন করতে গেলেই তুমি সম্বোধনটির প্রয়োজন হয়। *কি পড় তুমি?* প্রশ্নটি শোনার পর আমাকে যেন জাফর ইকবাল নিতান্তই বেণী দোলানো কিশোরী না ভাবে, বলি *বিশ্ববিদ্যালয়ে।* বলি ঠিক এ জগতে দাঁড়িয়ে নয়, টেবিলের ঢাকনা সরিয়ে চুরি করে তারকাঁটা দিয়ে তালা খোলা টেলিফোন সেটের পাশে দাঁড়িয়ে নয়, বাইরের ল্যাম্পপোস্ট থেকে জানালার লাল নীল কাচ বেয়ে যে আলো এসে পড়ে আমার গায়ে সেটিকে চাঁদের মনোরম আলো বলে ভুল করতে করতে, জাফর ইকবালের সঙ্গে নির্জন সমুদ্রতীরে হাত ধরে মনে মনে হাঁটতে হাঁটতে।

এর পরেই আমাকে অবাক করে জাফর ইকবাল বলে, *না। তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড় না।* আমি জানি।

ধরায় ফিরে এসে জিজ্ঞেস করি, *কি করে?*

কি করে তা না বলে ভারি গলায় বলে, *বন্ধুর সঙ্গে মিথ্যে কথা বলতে হয় না।*

আমাকে গ্রাস করে রাখে মিথ্যে বলার লজ্জা। ফোন রেখে বিছানায় লেপের তলায় মুখ লুকোই গিয়ে। এরপর চন্দনার সঙ্গে দেখা হতেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মর্মান্তিক ঘটনাটি বলি, *সব্বনাশ করছি, বয়সে বড় হইতে গিয়া একটা মিছা কথা কইয়া ফেলছি।* জাফর ইকবাল জানে যে চন্দনা আমার বান্ধবী। একজন মিথ্যুক হলে আরেকজনও হতে পারে! চন্দনা অনেকক্ষণ দুঃখগ্রস্ত বসে থেকে হঠাৎ দুঃখ ঝেড়ে বলে *ঠিকই তো কইছস তুই, আমরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি না? পড়িই তো। মনে মনে পড়ি।* বাবা পরদিনই ড্রয়ার খুলে টেলিফোনটি বগলতলায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি একরকম। ফোনের ছেঁড়া তার অনেকদিন ঝুলে থাকে। ছোটদা কোত্থেকে যেন একটি পুরোনো টেলিফোন এনে ঝুলে থাকা তারে জোড়া দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন শব্দ টব্দ নেই কোনও। এদিকে লজ্জায় জাফরের চিঠির আর কোনও উত্তর দিই না আমি। চন্দনা চিঠি পেতে থাকে জাফরের। সেসব চিঠিতে বন্ধুত্ব পেরিয়ে প্রেম উঁকি দিচ্ছে দিচ্ছে। চন্দনার চিঠিতেও। আমি দুপক্ষের চিঠিরই শ্রোতা। শ্রোতা হওয়াই আমাকে মানায়। এ ছাড়া আমি টের পাই আমার সাধ্য নেই অন্য কোনও ভূমিকা গ্রহণ করার।

ছোটদা চিপাচসের অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করেন আবার। ঢাকা থেকে আসবেন শাহনাজ রহমুতল্লাহ, বিখ্যাত গায়িকা, আর তাঁরই ভাই আমাদের সবেধন প্রেমিকপ্রবর জাফর ইকবাল। অনুষ্ঠান হবে টাউন হলে,শনিবার সন্ধেবেলা। চন্দনা আর আমি কলেজের শিমুল তলায় দোদুলদোলায় দুলি, যাবো কি যাবো না জাফর ইকবালকে দেখতে। শনিবার সারাদিন দুলি, সন্ধের অনুষ্ঠানে যাওয়া হয় না আমার, ওই মিথ্যেটির কারণেই আমি গুটিয়ে থাকি, চন্দনা যাবে বলেও শেষ অবদি যায় না। অনুষ্ঠান শেষে জাফর ইকবালের আকুল আবদারে ছোটদা তাকে চন্দনার সবুজ টিনের বাড়িতে নিয়ে যান। ওখানে চা বিস্কুট খেতে খেতে চন্দনার সঙ্গে কথা বলে জাফর। চন্দনা ওই মাথা নুয়ে যতক্ষণ জাফর ছিল, ছিল। কিছু হ্যাঁ, না, কিছু অপ্রতিভ হাসিই ছিল ওর সম্বল। ঢাকা ফিরে জাফর কোনওদিন আর ওকে চিঠি লিখবে না এ ব্যাপারে ও একশ ভাগ নিশ্চিত ছিল, কিন্তু জাফরের পরের চিঠিতে থৈ থৈ করে প্রেম। এই থৈ থৈ প্রেম শেষে বিয়ের প্রস্তাবে গড়ায়। চন্দনা প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে নৈব নৈব চ। অন্ধকার উতল সমুদ্র পাড় থেকে দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু ঝাঁপ দেবার মত দুঃসাহস চন্দনার নেই।

চন্দনা এর মধ্যে নাকচ করে দিয়েছে বেশ কটি প্রেমের আবেদন। পাশের বাড়ির ম্যাজিস্ট্রেট আখতার হোসেনকে *বুড়ো ধামড়া* বলে গাল দিয়ে, গান গায় ছেলে অন্টুকে একদিন খালি গায়ে ছাদে হাঁটতে দেখে *ওয়াক থু* বলে, আর সন্দিপন চাকমা নামের যে ছেলেটি পেয়িং গেস্ট ছিল ওদের বাড়িতে ক'মাস, ওকে খেতে দেখে। ছেলেদের খালি গা দেখলে বা খাবার চিবোনো দেখলে চন্দনার বিচ্ছিরি লাগে, রোমান্স বাপ বাপ করে পালায়। চন্দনা মাঝে মাঝে বলেওছে *তুই কি জানিস মানুষকে সবসময় বিশ্রি দেখায় কখন? কখন? তারা যখন খায়। মুখ নামের একখানা ছিদ্র আছে শরীরে, মানুষ ওতে নানা কিছু ঢুকিয়ে কী অশ্লীল ভাবে দুদাঁতের পাটি ঘষতে থাকে.... ছি!! আমি যার সঙ্গে প্রেম করব, আমার সামনে সে যেন না খায়, যেন গায়ের জামা না খোলে, যেন পেশাব পায়খানায় না যায়। ব্যস সোজা হিশেব।* ছুটিতে একবার রাঙামাটি বেড়াতে গেল চন্দনা। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় তখন তার বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে। এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে চন্দনাকে দেখার পর হাঁ হয়ে গেল, এমন যোগ্য পাত্রী আর সে কোথায় পাবে! এরকম সুন্দরী বুদ্ধিমতী রাঙামাটিতে আর আছে কে!চন্দনাকে তার চাই। চাই তো চাইই। চন্দনার এক খুড়তুতো দাদার সঙ্গে

দেবাশীষ রায়ের বন্ধুত্ব ছিল, সেই দাদাকে ধরে চন্দনার সঙ্গে দেখা হওয়া, কথা হওয়ার সুযোগ চাইল দেবাশীষ। সুব্রত চাকমার আনন্দ আর ধরে না, মেয়ে তাঁর রাণী হতে যাচ্ছে। খুড়তুতো দাদার অনুরোধে চন্দনা গেল দেবাশীষের সঙ্গে ঝিলের পাড়ে বেড়াতে। স্বচ্ছ জলে শাদা মসৃণ গ্রীবা উঁচু করে ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস সাঁতার কাটছে, পাশে ঘাসে বসে দেবাশীষ প্রেমিকের মত তার চটচটে ঘামে ভেজা হাতটি চন্দনার দিকে বাড়িয়ে গলা গম্ভীর করে প্রেমের কথা যখনই বলতে শুরু করেছে, চন্দনা ফক করে হেসে ফেলল। বাড়ি ফিরে ও উৎসাহী দাদাকে বলে দিল, রাজা হোক আর যেই হোক দেবাশীষ প্রেম করতেই জানে না, তার সঙ্গে হবে না। সুব্রত চাকমা প্রথম নরম স্বরে, তারপর কড়া স্বরে দেবাশীষের বিয়ের প্রস্তাবে চন্দনাকে রাজি হওয়ার জন্য বলেন, ও রাজি হয়নি। চড় থাপড় লাগিয়েও কাজ হয়নি। বিয়েতে চন্দনার ভীষণ আপত্তি, ওর পক্ষে এ কল্পনা করা অসম্ভব যে একটি লোক খালি গায়ে ওর বিছানায় এসে শোবে, তারপর *কী কী সব* করবে, *কী কী সব* করায় আর যে মেয়েই রাজি হোক, চন্দনা রাজি নয়। দিব্যি রাজার প্রস্তাবে গুল্লি মেরে ছুটি শেষে চলে এল ময়মনসিংহে। ওর এমনিতেও ভাল লাগে না নাক বোঁচা কোনও চাকমা লোক, সে যত বড় রাজাই হোক। চন্দনার এরকম পটাপট প্রেমে পড়া আর হুটহাট ফিরিয়ে দেওয়া সবকিছুই আমাকে মুগ্ধ করে। আমার কাউকে ফিরিয়ে দেওয়ার নেই, কারও সঙ্গে প্রেমও হয় না আমার।

ছোটদার মিনতিতে তাঁর *বাচুপান কা দোস্তকে* চিঠি লেখে চন্দনা। ধীরে ধীরে হাসান মনসুর খোকন চন্দনার এক নম্বর পত্রমিতা হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে। খোকন নামের মধ্যে *খোকন খোকন করে মায় খোকন গেল কাদের নায়* গন্ধ আছে বলে চন্দনা খোকন নাম বাতিল করে সম্বোধনের জন্য হাসান বেছে নিল। *না সজনী না জানি জানি সে আসিবে না* গানটি শুনতে শুনতে সজনী নামটি সবে নিজের নামের লেজে জুড়েছে ও। *চন্দনা* নামটি ওর ভাল লাগে না, *চাকমা* নামটি তো নয়ই। কিন্তু এ দুটোকে ফেলতে পারে না নিজের নাম বলে। ভূতনি যার নাম, তাকে তার ভূতনি নামটিই রাখতে হয় নিজের নাম বলে। হাসানের চমৎকার চমৎকার চিঠি পড়ে চন্দনা *সজনী হাসান* নামটি কাগজে লিখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মন্দ লাগে না দেখতে। জাফর ইকবাল সুদর্শন বটে, কিন্তু তার চিঠির বানান ভুল ভাষার ভুল একদিন দুদিন ক্ষমা করে দেওয়া যায়, প্রতিদিন যায় না। চন্দনা হাসানে মগ্ন হয়। হাসান যেমন কাব্য করে অরণ্য আর সমুদ্রের কথা, কোনও এক অচেনা দ্বীপে কোনও একদিন হারিয়ে যাওয়ার কথা লেখে, চন্দনাও রঙিন আকাশে পালকের মত উদাসীন ভেসে ভেসে লেখে ওর সুচারু সুন্দর স্বপ্নের কথা। চন্দনা হাসানকে কি লিখছে, হাসানই বা চন্দনাকে কি, সব আমাকে পড়ে শোনায়। চন্দনা আর আমার মধ্যে এক বিন্দু গোপন কিছু নেই। চন্দনা, আমার বিশ্বাস হয় না, যাকে ও লেখে, তাকে কখনও বাস্তবে দেখতে চায়। ওর শব্দ নিয়ে স্বপ্ন নিয়ে খেলতে ভাল লাগে, ও খেলে। হাসানের বাঁকা হাসিটি দেখলে বুকের ভেতর কেমন জানি করত, চন্দনাকে সে কথা বলি। বলি যে হাসান দেখতে সুন্দর, বলি যে সেই শৈশবেই আমার মনে হত জগতে বুঝি হাসানের চেয়ে সুদর্শন আর কেউ নেই। চন্দনা আমার কথা মন দিয়ে শোনে,শুনতে শুনতে দূর এক অরণ্যে ও হাসানের হাত ধরে হাঁটে, মনে মনে। সেই হাসান চন্দনার চিঠি পড়েই প্রেমে অর্ধউন্মাদ হয়ে একদিন ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ চলে এল চন্দনাকে দেখবে বলে। কিন্তু দেখা হবে কি করে, হাসান দেখা করতে এসেছে শুনেই তো ও শামুকের মত গুটিয়ে গেল। মেঘলা আকাশ থেকে একটি রঙিন নরম পালক একটি বোধহীন পাথরের সঙ্গে শুকনো মাটিতে এসে সশব্দে পড়ে চন্দনার নিমগ্নতা নষ্ট করে। এই রুখো বাস্তবতা চন্দনাকে বিবর্ণ করে তোলে। ছোটদার

পীড়াপীড়িতে আমি নিরাসক্ত নিস্তেজ *বিবর্ণ*কে যে করেই হোক হাসানের সঙ্গে অন্তত একটিবার দেখা করতে বলি। রাজি হলে ছোটদা আমাদের দুজনকে নিয়ে ময়মনসিংহ প্রদর্শনীতে যান, সঙ্গে গীতা, বার্মা কোরিয়া থেকে ফিরে ময়মনসিংহে থিতু হয়ে বসা গীতা। প্রদর্শনীতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হাসানের সঙ্গে চন্দনার অনানুষ্ঠানিক দেখা হওয়া। হাসান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল প্রদর্শনীতে। প্রদর্শনী মানে যাত্রা সার্কাস, জলহীন কুয়োর ভেতর মোটর সাইকেলের চক্কর, দোকানপাট, ঝলমল আলো, হাউজি নামের জুয়ো। মাঠে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে গীতার হঠাৎ হাউজি খেলার শখ হয়। গীতার শখ মেটাতে ছোটদা পাঁচ পায়ে খাড়া। তিনি দল নিয়ে হাউজিতে ঢোকেন। ওখানে আর কোনও মেয়ে নেই, আমরাই কেবল। হাউজিতে পঁচাত্তর টাকা জিতে গীতা হৈ হৈ রৈ রৈ করে খুশিতে নেচে ওঠে। রেস্তোরাঁয় পরোটা মাংস খেয়ে পঁচাত্তর টাকার অনেকটাই নাশ করা হয়। চন্দনাকে দেখার পর হাসান আর চোখ ফেরাতে পারেনি চন্দনা থেকে। চন্দনা কিন্তু আড়চোখে একবার হাসানকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। হাসানের দুএকটি প্রশ্নের উত্তরে কেবল হ্যাঁ বা না বলেছে। ভাল আছ? হ্যাঁ। শরীর ভাল? হ্যাঁ। মন ভাল? হ্যাঁ। পড়াশোনা ভাল হচ্ছে? না। কিছু কিনবে? না। সাভার গেছ কোনওদিন? না। চন্দনার লাজুক লাজুক হাসি দেখে সবাই অনুমান করে যে হাসানকে চন্দনার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রেমে হাবুডুবু খেলে এমন লাজুকই তো দেখতে লাগে মেয়েদের। চন্দনা সারাক্ষণই আমার হাত ধরে ছিল, হাতে বার বার চাপ অনুভব করছিলাম ওর হাতের। চাপের অনুবাদ করছিলাম, *দেখ দেখ হাসানের চোখ দুইটা কি সুন্দর! হাসিটা দেখ, এমন সুন্দর হাসি কি কেউ হাসতে পারে! পকেটে হাত রেখে হাঁটছে, কী চমৎকার হাঁটার ভঙ্গি! আহ, মরে যাই!* সে রাতে ধুলোয় ভিড়ে চন্দনার উচ্ছ্বাস দেখার সুযোগ হয়নি। পরদিন ঝাঁপিয়ে পড়ি ওর থরথর আবেগের শব্দাবলী শুনতে।

তরে ত আগেই কইছিলাম হাসান খুব সুন্দর,দেখলি তো!

চন্দনা সশব্দে হেসে ওঠে।

ক। তাড়াতাড়ি ক।

কি কইতাম?

হাসানরে কিরম লাগল, ক।

ধুর বেডা পচা! বেডার ভুড়ি আছে।

হাসান বাদ। আমি নিজেও আবার হাসানকে লক্ষ করে দেখি, *বেডার ঠিকই ভুড়ি আছে।* চন্দনা আমার চোখ খুলে দেয়, মন খুলে দেয়। আমি স্পষ্ট বুঝি, আমার আর চন্দনার সবাইকে ভাল লাগে, আবার কাউকেই লাগে না। আমরা প্রেমে পড়তে চাই, আবার চাইও না। প্রেম জিনিসটি ঠিক কি, সে সম্পর্কে আমরা জানি,পড়েছি, দেখেছি, কিন্তু নিজের জীবনে এ জিনিসটির উপস্থিতি আমাদের সয়, আবার সয়ও না। ভাল লাগা আর না লাগায় আমরা দুলি। আমি আর চন্দনা।

ক্লাস ফাঁকি দিয়েও গগন দারোয়ানকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে কলেজ মাঠের শেষ কোণে কাঁটা ঝোঁপ আবিষ্কার করে তার তল দিয়ে গা কাঁটায় ছিঁড়ে হলেও আমি আর চন্দনা একদিন বেরিয়ে পড়ি রাস্তায়। বেরিয়েছি, এবার যাব কোথায়? আগুনে রোদ্দুর হাতে নিয়ে থমকে আছে নির্জন দুপুর। চন্দনা পার্কে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। পার্কের কথায় বুক ঢিপঢিপ করে। আবার যদি পাল পাল ছেলের পাল্লায় পড়ি! হাত ধরে আমাকে সামনে টানে চন্দনা, ওর স্পর্শই যথেষ্ট আমাকে আরও চঞ্চল, চপল, আরও চলমান করার। চন্দনার সাহসের ডানায় বসে আপাতত ছেলের পালের কথা ভুলে সেই লেডিস পার্কে যাই। অশ্বত্থ

গাছের তলে দুজন বসি পা ছড়িয়ে, ব্রহ্মপুত্র তার জল থেকে শীতল স্নিগ্ধতা তুলে আমাদের স্নান করাতে থাকে। একটি ডিঙি নৌকো ডেকে নৌকোওলাকে গলুইয়ে বেকার বসিয়ে রেখে চন্দনা নিজে বৈঠা বাইতে থাকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে, জলের সঙ্গে বৈঠার এই শব্দ যেন আদৌ কোনও শব্দ নয়, যেন এক ধ্রুপদী সঙ্গীত। আমি জলে পা ডুবিয়ে আকাশ জুড়ে মেঘ ও রোদের খেলা দেখতে থাকি, দেখতে দেখতে আর ওভাবে ভাসতে ভাসতে বিকেল হয়ে আসে। বিকেলের সপ্তবর্ণ রং দেখি কেবল আকাশে নয়, আমাদের সর্বাঙ্গে। আমারও চন্দনার মত নৌকো বাইতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয় জলে ভেসে বেড়াই, সঙ্গীতের তালে নৌকো দুলুক সারাজীবন, কোথাও না পৌঁছুক, কোনও পারে, এভাবেই ভেসে যাক জীবন। ইচ্ছে হয় আলটপকা দুটো পাখাও গজিয়ে যাক আমার, পাখির মত উড়ে বেড়াই আকাশ জুড়ে, ওই রংগুলোর খুব কাছে চলে যাই, একটু একটু করে মিশে যাই ওই রঙে। *চন্দনা, তোর কি কখনও পাখি হতে ইচ্ছা করে রে?* ইচ্ছে করে চন্দনাকে প্রশ্নটি করি। ওরও নিশ্চয় পাখি হতে ইচ্ছে করে, ওর ইচ্ছেগুলো আমার ইচ্ছের মত। তবু মনে হয়, চন্দনা যা চায় তার অনেকটাই ও করে ফেলে, অবাক করে দেয় সব্বাইকে। ও হয়ত সত্যিই একদিন আকাশে উড়ে উড়ে সূর্যাস্তের রঙের অনেক কাছে চলে যেতে পারবে। ব্রহ্মপুত্রের জল ছেড়ে আমাদের উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু উঠে আসতেই হয়। তার চেয়ে আমাদের যদি কোথাও দ্বীপান্তর হত, আমি আর চন্দনা দুজনই ভাবি, বুঝি সুখের সমুদ্রে সত্যিকার অবগাহন হত।

কলেজ প্রাঙ্গণে আমাদের অন্যরকম জগত নিয়ে আমরা একা হতে থাকি, আমি আর চন্দনা। কখনও কখনও মেয়েদের আড্ডায় যে নাক গলাতে চাই না, তা নয়। একবার ক্লাস নেই,একদঙ্গল মেয়ের আড্ডায় বসে শুনি কোন মেয়ের কবে বিয়ে হচ্ছে, কবে কাকে দেখতে আসছে কোন ছেলে, ছেলের নাম ধাম, ছেলে কোথায় থাকে, কি করে ইত্যাদি কথা। চন্দনা আর আমার দুজনের ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দেয় ফুলকি ফুলকি হাসি। হাসিটি কোনও মেয়েরই পছন্দ হয় না। হাসছি কেন এই প্রশ্নের উত্তর ওদের একজন জানতে চায়।

হাসছি এই বিচ্ছিরি জিনিসটি নিয়ে তোমরা কথা বলছ বলে।

বিচ্ছিরি জিনিস? মেয়েদের কারও চোখ কপালে, কারও নাকে, কারও চোখ বেরিয়ে এসেছে চোখের কোটর থেকে। যেন আমি আর চন্দনা মোটেই মানুষ নামের পদার্থ নই, অন্য গ্রহ থেকে অন্য কোনও কিম্ভূত জীব এসেছি।

একজন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, *বিচ্ছিরি কেন হবে?*

বিচ্ছিরিই তো। চন্দনা বলে।

ভাবটা এমন যেন তোমাদের কোনওদিন বিয়ে হইব না।

হইবই ত না। বিয়ে করলে তো হইব বিয়ে! করতাছে টা কে! আমি বলি।

চন্দনা বলে, *ফুঁঃ, পাগল হইছি নাকি যে বিয়ে করতাম!পাগল আর বোকা ছাড়া কেউ বিয়ে করে না।*

কোনওদিন বিয়ে করব না--আমাদের এ ঘোষণাটি শুনে মেয়েরা জানতে চেয়েছে, বিয়ে না করার পেছনে আমাদের যুক্তিটি কি।

বিয়ে করার কি কোনও যুক্তি আছে, যদি থাকেই, যুক্তিটা কি?

সংসার হবে। সংসারের তো দরকার আছে।

সংসারের দরকার কি? সংসার না হইলে কি মানুষ বাঁচে না?

বাচ্চাকাচ্চা হবে।

বাচ্চাকাচ্চা না হইলে কি হয়!

খাওয়াবে কে? পয়সা দেবে কে?

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করব। টাকা পাব। একলা থাকব। খাব দাব। ঘুইরা বেড়াবো। আনন্দ করব। যা মন চায় তা করব।

তাই কি হয় নাকি!

হবে না কেন! নিশ্চয় হবে, ইচ্ছে থাকলে সবই হয়।

আমরা সরে আসি, একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ আমাদের দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে, টের পাই। চন্দনা আমার হাতটি হাতের মুঠোয় নিয়ে শিমুল তলার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, *পিছনে তাকাইস না।* আমরা এভাবেই হাঁটি দুজন, হাত ধরে, কোমর জড়িয়ে ধরে, কাঁধে হাত রেখে পরস্পরের, পেছনে না তাকিয়ে। কলেজে এ কোনও নতুন দৃশ্য নয়, বান্ধবীরা এভাবেই কথা বলে অবসর কাটায়। কিন্তু চন্দনা আর আমার গ্রীবায় অদৃশ্য এক অহঙ্কার, মেয়েরা বলে, বসে থাকে।

চন্দনা আর আমার কাছে প্রেমের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে কবিতা। প্রতিদিন কবিতা লিখতে থাকি, প্রতিদিন গল্প। যা কিছুই লিখি না কেন, চন্দনার লেখার কাছে আমার সব লেখাই মলিন ঠেকে, ও যদি একটি কৃষ্ণচূড়া তৈরি করে তো আমি নিতান্তই একটি হেলে পড়া পত্রপুষ্পহীন চারাগাছ। এত মুগ্ধ আমি ওর সৌন্দর্যে, ওর রঙে, রসে, ওর অসম্ভব বৈচিত্র্যে যে এতটুকু যদি ঈর্ষার লেশ জন্মে কখনও মনে, নিমেষে হাওয়া হয়ে যায়। আমার আর চন্দনার চিপাচসের সদস্য হওয়া হয় না, কোনও সভা সমিতিতে যাওয়া হয় না, আমরা ও কাজের জন্য নই, আমাদের জগত আলাদা। নিরবধি নিরুদ্বেগে নিরিবিলি শব্দের নিরঞ্জন খেলায় মাতি, শব্দ নিয়ে মিছিলে নামি না, রাজনীতিও করতে জানি না। ওই ধুমসে কবিতা লেখার সময়ই একদিন শফিকুল ইসলাম নামের এক মোটা কাচের চশমা পরা, শরীরের চেয়ে মাথাটি বড়, তারের মত শক্ত চুল মাথা ভরা, দেখলে মনে হয় দু'বছর গোসল করেনি, জামাও পাল্টায়নি, অনর্গল আঞ্চলিক সুরে এবং স্বরে কথা বলা বাচালকে বাড়ি নিয়ে এলেন ছোটদা, আমাকে দেখেই বলে সে, *কি ব্যাপার তুমি তো বিখ্যাত হইয়া গেছ! আমি একটা লিটল ম্যাগাজিন বাইর করি। একটা কবিতা লিইখা দেও তো।* শফিকুল ইসলামের অনুরোধে এক বিকেলে বসে নতুন একটি কবিতা লিখে ফেলি, নাম *মুক্ত বিহঙ্গ।* অনেকটা এরকম, *জানালাটি খুলে দাও, আমি যাব, আকাশ জুড়ে উড়ব আমি।* সম্ভবত মার হঠাৎ হঠাৎ বাড়ির বারান্দায় বসে গেয়ে ওঠা *আমি মুক্ত বলাকা, মেলে দিই পাখা ওই দূর নীল আকাশে* গানটি শুনতে শুনতে এই হয়। দুসপ্তাহ পর শফিকুলের কবিতা পত্রিকা বেরোল, আমার কবিতা ওতে। পদ্মরাগ মণিও কবিতা লিখেছে। পদ্মরাগ মণি মাঝে মধ্যে ছোটদা আর গীতার সঙ্গে দেখা করতে অবকাশে আসে। চোখকাড়া সুন্দরীটির সঙ্গে আমার দূর থেকে কিছুটা চোখাচোখি, মিটিমিটি হাসাহাসি, দুচারটে কথা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। শফিকুলের কবিতা পত্রিকাটি হাতে আসার পর আরও আরও কবিতা-পত্রিকা আমার কাছে উড়ে, দৌড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে আসতে থাকে। শহরের কবিদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নানা রকম ছোট পত্রিকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন ছোটদা। প্রায়ই আমাকে তাগাদা দেন, *দে তো লেইখা বাংলার দর্পনের জন্য একটা কবিতা।* লিখে দিই, ছাপা হয়ে যায়। *চন্দু মাস্তানরে ক একটা কবিতা দিতে।* চন্দনাও লেখা দিতে থাকে ছোটদার হাতে, ছাপা হতে থাকে। সেই যে এক ভোরবেলা চন্দনা সাইকেল নিয়ে চলে এসেছিল অবকাশে, সেই থেকে ছোটদা ওকে *চন্দু মাস্তান* ডাকে, চন্দনা অখুশি হয় না। দৈনিক জাহান থেকেও ছোটদার কাছে বলা হয় আমি যেন কবিতা পাঠাই, চন্দনাও। কবিতার পার্থিব জগতে সেই আমার হাঁটি হাঁটি পা

পা প্রবেশ। চন্দনারও। আমাদের কবিতার খাতা উপচে পড়তে থাকে শব্দে। ফিকে হয়ে যায় চিত্রালী পূর্বাণী। ওসবে লেখা তো হয়ই না, ওসব কেনাও হয় না। বিচিত্রায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভুলেও মনে পড়ে না। বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ উঠলে চন্দনা বলে, *বিজ্ঞাপনে বিপদ আছে। চব্বিশ বছর বয়স্কা বীরাঙ্গনা ছাপার ভুলে হয়ে যেতে পারে বিয়াল্লিশ বছর বয়স্কা বারাঙ্গনা।* সুতরাং বিজ্ঞাপন বাদ। পাঠাতেই যদি হয় কিছু, কবিতা পাঠাবো, পাঠাবো রোববার অথবা সন্ধানীর সাহিত্যপাতায়।

কলেজে বছর শেষে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার একটি পরীক্ষা হবে। দেবনাথ পন্ডিত বাড়ি এসে পড়তে বসিয়ে কিল ঘুসি চড় আমার মাথায় মুখে পিঠে ইচ্ছেমত ঢেলে মনের সাধ মিটিয়ে চলে যান। চন্দনার দেবনাথ পন্ডিতের ঝামেলা নেই। দিব্যি আছে সে। লেখাপড়া জাতীয় বিষয়ের ওপর চন্দনার বরাবরই বড় অনাসক্তি। আমারও হত, কিন্তু বাবার কারণে হওয়ার উপায় নেই। বাবার ইচ্ছেয় আমাকে ইংরেজি মাধ্যমে পড়তে হচ্ছিল। ছোটদা এই মাধ্যমে পড়েছেন, তাঁর কিছু বই পড়ে ছিল বাড়িতে, ঝেড়ে মুছে সেগুলোই সাজিয়ে রেখেছিলাম টেবিলে। দেবনাথ বাবু পরীক্ষার আগে আগে বাবাকে জানিয়ে দিলেন, *বাংলায় পড়াই ভাল, এর দ্বারা ইংরেজি পোষাবে না।* ইংরেজি বাদ দিয়ে বাংলায় বই কেনা হল। তাড়াহুড়ো করে বই শেষ করতে হবে, পরীক্ষা সামনে। দেবনাথ পন্ডিত, আমি জানি না কি কারণে, পরীক্ষার আগে আগে হঠাৎ অসময়ে এসে--উস্কোখুস্কো চুল, পকেটের কালো কলম থেকে কালি চুইয়ে শার্ট প্রায় অর্ধেক ভিজে গেছে- আমাকে কিছু প্রশ্ন লিখে রাখতে বলেন, বলেন *এইসবের উত্তরগুলা ঠাইস্যা পড়বা।* ব্যস, *ঠাইস্যা* পড়ে গিয়ে দেখি পরীক্ষায় প্রায় ওই প্রশ্নগুলোই এসেছে। পরীক্ষা হল, ফল বেরোল, আমি প্রথম হলাম। কলেজে আমার নাম হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষিকা আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন *তুমি হলে কলেজের গর্ব, ভাল করে পড়াশুনা করতে থাক, ফাইনালে খুব ভাল রেজাল্ট চাই।* খবরটি শুনে বাবা কিন্তু আদৌ তুষ্ট নন আমার ওপর। বাড়ির ঠিকানায় আমার নামে মেলা চিঠি আসে তিনি লক্ষ করেন। দাদাকে জিজ্ঞেস করেন, *নাসরিনের কাছে চিঠি কারা লেখে?*

পেনফ্রেন্ডরা।

পেনফ্রেন্ড মানে কি?

দাদা নিরাসক্ত কণ্ঠে বলেন, *চিঠিতে ফ্রেন্ডশিপ।*

চিঠিতে ফ্রেন্ডশিপ মানে?

দাদা কোনও উত্তর দেন না।

কি লেখে চিঠিতে? বাবার সর্বাঙ্গে বিস্ময়।

কি জানি আমি ত জানি না।

জানি না মানে?

আমারে তো দেখায় না চিঠি।

দেখায় না কেন? কি আছে চিঠিতে?

দাদা চুপ।

কার কাছে চিঠি লেখে?

জানি না।

এই মেয়ে কার কাছে চিঠি লেখে, কি লেখে, কেন লেখে, এইসব জানতে হবে না?

তেমন কিছু না। এই নরমাল ফ্রেন্ডশিপ!

বাবার ক্রমে উত্তপ্ত হতে থাকা মেজাজে দাদা অনুতপ্ত পরশ বুলোতে চেষ্টা করেন, কাজ হয় না। বাবার গলার স্বর ধাই ধাই করে ওপরে ওঠে।

নরমাল ফ্রেন্ডশিপ মানেটা কি?

শাদা দেয়ালের দিকে বোধবুদ্ধিহীন তাকিয়ে থাকেন দাদা।

মেয়ে না পুরুষলোক, কার সাথে?

দুই ধরনেরই আছে।

ও কি পুরুষলোকের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে নাকি?

দাদার কোনও উত্তর না পেয়ে তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, *বিয়া বইতে চায় নাকি ও?*

দাদা বলেন, *না, বিয়া না।*

তাইলে কি?

এমনি।

এমনি মানে? এমনি কি?

এমনি লেখে।

এমনি কেন লেখে? কি দরকারে লেখে?

না, কোনও দরকারে না।

দরকার না থাকলে লেখে কেন?

জানি না।

জানস না কেন?

বাবা রক্তচোখে বিস্ফারিত চোখে গিলে খাবেন-চোখে দাদাকে প্রশ্ন করে যান। প্রশ্নের অত্যাচার থেকে বাঁচতে দাদা পায়খানার বেগের কথা বলে গোসলখানায় গিয়ে বসে রইলেন। বাবা তাঁর চশমা ঘন ঘন খুলে, পরে; ঘন ঘন ঘরের বারান্দার এমাথা ওমাথা হেঁটে আমার টেবিলে এসে বইখাতা ঘাঁটেন। প্রতিটি বই, প্রতিটি খাতা। টেবিলের তলে পড়ে থাকা প্রতিটি টুকরো কাগজ। এমনকি বিছানার চাদরের তল, বালিশের তল, তোশকের তল। তিনি খোঁজেন কিছু।

এই ঘটনার পর বাড়িতে আমার চিঠিপত্তর আসা বন্ধ হয়ে গেল। চিঠি চলে যেতে থাকে নতুন বাজারে আরোগ্যবিতানের ঠিকানায়। ডাকপিয়নকে বাগিয়ে নিয়েছেন বাবা। নিশ্চিত হই ছোটদা যেদিন আরোগ্য বিতানে ঢুকে যেই কি না বাজারের দিকে বাবা পা বাড়িয়েছেন, ড্রয়ার খুলতেই অবকাশের ঠিকানায় আমার নামে আসা অনেকগুলো চিঠি খামখোলা পড়ে আছে দেখে এসে আমাকে খবর দেন। একটি জিনিসই আমার তখন মনে হয়েছে, এ অন্যায়। বাবা না হয় বাবা হওয়ার কারণে কোনও অন্যায়কে অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু ডাকপিয়ন এই অন্যায়টি করবে কেন! সমস্যাটি কারও কাছে জানিয়ে আমি যে উপকার পাবো না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই চিঠিটি লিখি। বিচিত্রার পাঠকের পাতায় লেখাটি আমার ছাপা হয় পরের সপ্তাহে। অবকাশ, আমলাপাড়ার ঠিকানায় আসা চিঠিগুলো ৬৯, রামবাবু রোডের ঠিকানায় যাচ্ছে, ডাকবিভাগের অসততা সীমা ছাড়িয়ে গেছে ইত্যাদি ..। চিঠি ছাপা হওয়ার দুদিন পর আমার খোঁজে ডাকবিভাগের একজন কর্তা আসেন অবকাশে। তিনি একটি বাঁধানো লম্বা খাতায় আমার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে এসেছেন। এসে কিন্তু নিজের অভিযোগের কথাই বর্ণনা করলেন। তাঁর অভিযোগটি আমার অভিযোগ নিয়ে। আমার চিঠি কোনও অচেনা দুর্বৃত্তের কাছে যাচ্ছে না, আমার আপন পিতার কাছেই যাচ্ছে। অবকাশের মালিক এবং আরোগ্য বিতানের মালিক এক ব্যক্তি। সুতরাং মালিকের আদেশে এক ঠিকানার চিঠি আরেক ঠিকানায় যেতেই পারে। এর উত্তরে আমি বলি, *কিন্তু*

চিঠি তো আমার বাবার নামে আসছে না। আসছে আমার নামে। আমি তো পোস্টমাস্টাররে বলি নাই আমার চিঠি অবকাশে না দিয়া আরোগ্য বিতানে দিতে।

যেইখানেই দিক, তিনি তো আপনার বাবা।

মৃদু কণ্ঠে ভুল শুধরে দিই, *হ্যাঁ তিনি আমার বাবা, তিনি আমি নন। আমি এবং আমার বাবা এক এবং অভিন্ন নই।* লোকটি চলে গেলেন। সমস্যার কোনও সমাধান হল না। এই অবস্থা থেকে ছোটদা আমাকে উদ্ধার করেন তাঁর এক বন্ধুর খাতা কলমের দোকানের ঠিকানা আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে। পত্রমিতাদের জানিয়ে দিই আমার নতুন ঠিকানা। ছোটদা নিষ্ঠ ডাকহরকরার মত কর্তব্য পালন করেন। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ ভাব। আমরা ঈদসংখ্যা বিচিত্রার গল্প উপন্যাস একসঙ্গে পড়ি, পড়া মানে আমি সশব্দে পড়ি আর ছোটদা শোনেন। গল্পের বইগুলোও প্রায়ই ওভাবেই পড়া হয়। কিছু কিছু বই আবার ছোটদার পছন্দ হয় না, সেগুলো আমি নিভৃতে পড়ি। ছোটবেলার দস্যু বনহুরের পাট চুকেছে, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়, নিমাই ভট্টাচার্য, বিমল মিত্র, জরাসন্ধকে বিদেয় দিয়েছি অনেক আগে। বঙ্কিম শরৎচন্দ্রের আর কিছু বাকি নেই। রবীন্দ্রনাথ নজরুল অনেক হয়েছে। মাইকেল হয়েছে, জীবনানন্দও হয়ে গেছে। বিভূতিভুষণ, মানিক বন্দোপাধ্যায়ও। শক্তি, সুনীল, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ থেকে শুরু করে হালের নির্মলেন্দু গুণেরও যে বইগুলো এ অবদি বেরিয়েছে পড়া হয়ে গেছে। নতুন রকম বই চাই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজি নতুন কিছু। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাঙ্গিনার পাড় মোড়ের বইয়ের দোকানগুলোয় থেমে বই খুঁজি। গদ্যপদ্যপ্রবন্ধের নানারকম বই আমাকে টানে। কিন্তু বই কেনার পয়সা যথেষ্ট নেই। এ দুরবস্থা থেকেও ছোটদা আমাকে উদ্ধার করেন। এক বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়ে যান। লাইব্রেরির ভেতর ঢুকেই প্রচ্ছন্ন প্রশান্তি আমাকে আলিঙ্গন করে। ঘরের মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু তাকে বই। চারদিকে বই। মাঝখানে পড়ার টেবিল, পিন পতনের শব্দ নেই কোথাও, দুএকজন মন দিয়ে পড়ছে। ইচ্ছে করে সারাদিন মন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন বইএর এই নিরুপদ্রব ঘরটিতে কাটিয়ে দিই। লাইব্রেরির সব বই যদি বাড়ি বয়ে এনে পড়ে ফেলা যেত আজই! সেদিনই সদস্য হয়ে দুহাতে যত বই ধরে, নিয়ে আসি। বইগুলো আমার হাত থেকে যেতে থাকে চন্দনার হাতে, চন্দনার হাত থেকে আবার আমার হাতে। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক শেষ হলে সতীনাথ ভাদুড়ি, নরেন মিত্র, জগদীশ গুপ্তে। ফেরত দিয়ে আরও বই। গোগ্রাসে পড়তে থাকি দুজন। যেন অতি শীঘ্র পাবলিক লাইব্রেরির বইগুলোর ওপর একটি জরুরি পরীক্ষা দিতে বসব।

পরীক্ষা সামনে। সাধুতে যদি হায়ার সেকেন্ডারি, চলতিতে ইন্টারমিডিয়েট, আর পুস্তকি বাংলায় উচ্চ মাধ্যমিক। দেবনাথ পন্ডিত সপ্তাহে তিনদিনের বদলে পাঁচদিন আসতে শুরু করেন। তিনি তো পড়াতে আসেন না, আসেন কিলিয়ে আমাকে মানুষ বানাতে। বাবার মত দেবনাথ পন্ডিতেরও চোখ যায় ছোটখাট কাগজপত্রে। কোনও এক পত্রমিতাকে লেখা শেষ না হওয়া চিঠি অঙ্ক বইয়ের ভেতর থেকে একদিন টুপ করে পড়ে। পড়ে যাওয়া চিঠিটি সরাতে গেলেই দেবনাথ পন্ডিত *খাবলা* মেরে চিঠিটি নিয়ে নেন, আগাগোড়া পড়েন চিঠি, পড়ে শার্টের বুক পকেটে রেখে দেন। এ কি! তিনি ঠিক বাবার মতই আচরণ করছেন, এই চিঠির কারণে কি এখন উঠোনের খড়ি ভাঙবেন আমার পিঠে! খানিক পর পর তিনি নিজের বুক পকেটে হাত দিয়ে অনুভব করছেন আধলেখা চিঠির অস্তিত্ব, চিঠিটি কোথাও উড়ে না গিয়ে যে পকেটেই আছে, তা জেনে একধরণের আনন্দ হচ্ছিল দেবনাথ পন্ডিতের। সেই

আনন্দ জ্বালা ধরানো, পেচ্ছাব পাওয়া কিন্তু ঠিক পাওয়া নয়, লোমকূপ অনেকটা দাঁড়িয়ে যাওয়া, অনেকটা বসে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করেও না করার আনন্দ। দেবনাথ পন্ডিতের পড়ানো হয় না, ডানে বামে নড়েন, সামনে পেছনে নড়েন। মন উতলা। আমাকে যে অঙ্ক করতে দিলেন, তা সারা হল আমার, অঙ্কে কোনও ভুল নেই। হঠাৎ দশ আঙুলে পদার্থবিজ্ঞান বইটি আঁকড়ে ধরে, যেন বইটির পাখা আছে, আঙুল ঢিলে করলেই উড়ে যাবে, পাতা উল্টে কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন, সেসবেরও, কার কৃপায় জানি না, সঠিক উত্তর দিই। রসায়নএও একই ভাগ্য আমার। এরপর অঙ্ক,রসায়ন পদার্থবিজ্ঞান বই তিনটে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ কোনও কারণ ছাড়াই প্রচণ্ড এক ঘুসি মারলেন মাথায়, কপালের ডানে। কেন! না কোনও কারণ নেই। বললেন *কাইল যে অঙ্কগুলা দিয়া গেসিলাম করতে, তা করছ না কেন!*

করছি তো।

করছ তো দেহাও না কেন? মন কই থাহে?

এই মোক্ষম সুযোগ আধচিঠির শাস্তি দেওয়ার। আমি অঙ্কের খাতা সামনে মেলে ধরলাম। মেলে ধরার পরও পিঠে আচমকা একটি কিল। ফুসফুস ক্যাঁৎ করে ওঠে।

মার্জিন রাইখা অঙ্ক করার কথা আর কত কইয়া দিতে হইব?

মার্জিন রেখে অঙ্ক করার কথা এই প্রথম বললেন তিনি। যা হোক। এবার আসল কথা পাড়লেন।

চিঠি কারে লিখছ?

কোন চিঠি?

এবার একটি চড় উড়ে এল গাল বরাবর।

কোন চিঠি যেন জানো না? এই চিঠি।

বুক পকেট থেকে বের করলেন অর্ধেক পাতায় লেখা চিঠিটি।

জুয়েল কেডা? কই থাকে? কী করে?

ঢাকায় থাকে। কী করে জানি না।

জানো না? আমার সাথে ফাতরামি কর?

ফাতরামি আমি দেবনাথ পন্ডিতের সঙ্গে করতে যাব, এমন সাহস আমার নেই। দেবনাথ পন্ডিত তাঁর বিশাল শরীর, বিশাল বপু, কলাগাছের গায়ের মত বাহু, আর শক্ত সাগর কলার মত আঙুল সামনে নিয়ে বসে থাকেন, আর আমি যতটা সম্ভব মৃত তৃণের মত পড়ে থাকি তাঁর পায়ের কাছে। চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো করে আমার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে তিনি বেরিয়ে যান। দেবনাথ পন্ডিতের কিল চড়, বাবার ধমক, মার ঘ্যানঘ্যান, ছোটদার নিরানন্দ, গীতার অভিমান, দাদার দাদাগিরি এসবের মধ্যে আমি একা বসে থাকি। মুখ গুঁজে রাখি বইয়ে। পরীক্ষা সামনে। পরীক্ষা সামনে তা জানি, কিন্তু ছোটদার বন্ধুরা বাড়িতে বেড়াতে আসে, জ্যোতির্ময় দত্তের ছেলে বাবুয়া দত্ত, তকবীর পত্রিকার সম্পাদকের ছেলে পলক ফেলা যায় না এমন সুদর্শন তফসির আহমেদ, *লেডিকিলার* বলে খ্যাত সাহেব কোয়ার্টারে থাকা ডিসির ছেলে সোহান, যাকেই দেখি তার প্রেমে পড়ে যাই মনে মনে, মনে মনে তার মনের কথা শুনি,*কোথায় পাব কলসি কন্যা কোথায় পাব দড়ি, তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইবা মরি।* অথচ আমার দিকে ফিরে তাকায় না কেউ, নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত মেয়ে বলে মনে হতে থাকে।

চিত্রালী পূর্বাণী যেমন বন্ধ হয়, পত্রমিতাদের কাছে চিঠি লেখাও ধীরে ধীরে কমে যেতে

থাকে। কেবল ভাল কিছু, সুন্দর হাতের লেখার, কাব্যময় ভাষার চিঠিগুলোর উত্তর দিই। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র কামরুল হাসান সেলিম চিঠি লেখে আশ্চর্য সুন্দর, যেন আকাশপার থেকে স্বপ্নের কথা বলছে। বাছাইয়ে সেলিমকে রাখি, চিঠি লিখতে থাকি কোনওদিন সমুদ্র না দেখা মেয়ে সমুদ্রপার থেকে। যেন এ জগতের নয়, অন্য কোনও জগতে আমরা আপন দুজন মানুষ মুখোমুখি বসে স্বপ্নের কথা বলছি। ওই স্বপ্নের জগতে কোনও মানুষ নেই, ঘরবাড়ি নেই, কেবল আকাশ আর সমুদ্র, সমুদ্রের ধারে নানার রঙের ফুল, প্রজাপতি, আকাশ জুড়ে কেবল সপ্তবর্ণ রং, তুলোর মত মেঘ আর লেজঅলা পাখি। এভাবেই চলতে পারত, কিন্তু একদিন হঠাৎ, হঠাৎই কলেজ গেটের কাছে এক দীর্ঘাঙ্গ যুবক এসে সামনে দাঁড়ায়, আমার মাথার চুল তেলে চোবানো, শক্ত করে বেণী গাঁথা, নিশ্চিত শাকচুন্নির মত দেখতে লাগছে আমাকে। সামনে দাঁড়ানো দুজন ছেলের মধ্যে একজন সেলিম। কাছে এসে নিজের পরিচয় দেওয়ার পর ছিটকে সরে গিয়ে দ্রুত একটি রিক্সা নিয়ে ধুকপুক বুক নিয়ে বাড়ি ফিরি। সেলিম সেদিন ঢাকা ফিরে গিয়ে চিঠি লেখে ময়মনসিংহে তার এক বন্ধুর কাছে সে এসেছিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা হলে মন্দ হয় না বলেই বন্ধুকে নিয়ে সে কলেজ গেটে দাঁড়িয়েছিল আমার অপেক্ষায়, কথা বলিনি বলে মন খারাপ করে ফিরে গিয়েছে। *দেখা না করার কি আছে,* শব্দের সাহসী মেয়েটি বুক ফুলিয়ে বলে দেয়, *এসো দেখা হবে।* কোথায় দেখা হবে? এ এক সমস্যা বটে। স্টেশন রোডের তাজমহল রেস্তোরাঁয় শহরের কবিকুল আড্ডা দেয়, অবশ্য কোনও মেয়ে ওখানে একা যায় না, প্রশ্ন ওঠে না, ওখানেই সেলিমের সঙ্গে আমার দেখা হবে জানিয়ে দিই। ছোটদা এক বিকেলে গীতা আর আমাকে নিয়ে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলেন। যেহেতু ছোটদার সঙ্গে *মেয়েমানুষ* আছে, আমাদের বসতে দেওয়া হয়েছিল পর্দার আড়ালে। *মেয়েমানুষ* এলে এরকমই নিয়ম, দূরে যাও,আড়ালে যাও। তাজমহলের লোকেরা উঁকি দিয়ে বারবারই দেখেছে আমাদের। সেলিম আমার চিঠি পেয়েই ময়মনসিংহে কবে কখন আসছে জানিয়ে চিঠি লিখল। দেখা হওয়ার দিন আমি সেজেগুজে চন্দনার জন্মদিনে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাই। তাজমহলের দরজায় সেলিম দাঁড়িয়ে আছে। বুকের কাঁপুনি সমস্ত শক্তিবলে থামিয়ে আমি ঢুকি রেস্তোরাঁয়, পর্দার আড়ালে কেবিনে বসতে হয়। সেলিমের মুখোমুখি বসি যদিও, চা খাব বলে দুজনের জন্য দুটো চা চাই যদিও, তার চোখের দিকে আমার তাকানো হয় না, তার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি নীরবতা, হ্যাঁ, হুঁ, না, নেই আর দুএকটি ভাববাচ্যে বাক্য ছাড়া আর কিছু উচ্চারিত হয় না, কেবল মৌনতার সঙ্গেই বাচাল হয়ে উঠি। যদিও চিঠিতে তুমি লিখি, সামনে তুমি বলা, লক্ষ করি, অসম্ভব। ওই চা পর্যন্তই, চা শেষ হলে আমি উসখুশ করি। চা তো শেষ হল, এবার কি, এবার উঠে পড়া ছাড়া আর কি হতে পারে! জিভের ডগায় *যাই* শব্দটি আসে আর যায়। আমার কোনও এক চিঠিতে অহল্যা শব্দটি ছিল। সে কারণেই কি না জানি না, হঠাৎ একটি প্রশ্ন সেলিম করে *অহল্যা শব্দের মানে কি জানো?*

আমি রা করি না।

হেসে বলে, *ন্যাংটো।*

যে *যাই* শব্দটি আমার জিভের ডগায় আসে আর যায় করছিল, সেটি এবার এসে যায়। আমি *যাই* বলে স্বচ্ছন্দে চলে যাই। পেছনে হতভম্ব বসে থাকে সেলিম।

ছোটদা সেদিনই খবর নিয়ে এলেন, *তুই নাকি তাজমহলে গেসিলি?*

কে কইল তুমারে?

কোন বেডার সাথে নাকি বইয়া আলাপ করছস? শহরে রইটা গেছে খবর। সীমা ছাড়াইয়া যাইতাছস।

সীমা ছাড়িয়ে গেছি তা বুঝি। কিন্তু সীমা ছাড়ানো মেয়েটিকে একটি গণ্ডমূর্খ বলে মনে হয়। কেন সেলিমের সঙ্গে কথা বলতে পারেনি সে! রেস্তোরাঁ থেকে হঠাৎ চলে গিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে? সে কি বোঝাতে চেয়েছে যে সে বাজে মেয়ে নয়, সে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয় না!বড় ভদ্র ঘরের মেয়ে, ভাল মেয়ে, তাই ছেলেপিলের সঙ্গ এড়িয়ে চলে! সেলিমের সঙ্গে নিতান্তই বসতে হয়েছে সে ঢাকা থেকে এতদূর এসেছে বলে, নয়ত এতদূর পা বাড়াত না! এই কী! নাকি ওই *ন্যাংটো* শব্দটি শুনে তার গা ঘিনঘিন করেছে! পরদিন দুটো টাকা খামে ভরে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেয় সে সেলিমকে--আমি খুব দুঃখিত, চায়ের পয়সা মিটিয়ে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম, এই নাও পয়সা। বোধহয় এ বোঝাতেই যে সে *পরখাওয়ইয়্যা* নয়! না হলে দুটো টাকা এমন কোনও টাকা নয় যে সেলিমের পকেট থেকে গেলে সেলিম সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে, আর তাকে ডাকে টাকা পাঠাতে হবে ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায়!

দেখা হওয়ার পর সেলিমের চিঠিতে আকস্মিক ভাবে আবেগ বেড়ে ওঠে। সমুদ্রে আরও ঢেউ ওঠে। আমি পিছু হটছি, কারণ তার ঠোঁটকে ঠোঁট বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে আস্ত না হলেও আধখানা তন্দুরের রুটি। সেলিমকে লেখা কমিয়ে দিতে থাকি, একদিন সেলিমও লেখা বন্ধ করে দেয়। কোনও চিঠি নেই, নেই তো নেইই। অনেকদিন পর হঠাৎ সুইৎজারল্যান্ড থেকে লেখা একটি চিঠি পাই সেলিমের, যদি কোনওদিন পারি যেন জুরিখ যাই, পৃথিবীতে নাকি আশ্চর্য সুন্দর এক শহর জুরিখ। জুরিখ নামটি দেশবিদেশ-লুডুর কথা মনে করিয়ে দেয়। *জুরিখ আসিলে জুরিখ হাসপাতাল দর্শনে যাইতে হইবে, পাঁচ না পড়িলে গুটি বাহির হইবে না,* আমার গুটি প্রায়ই জুরিখ গিয়ে পৌছত, আর পাঁচ পড়ার অপেক্ষায় থাকত। চিঠি কেবল সেলিমকে নয়, অনেককেই কমিয়ে দিয়েছিলাম। তবে কমানোর আগে চিঠির ওপারের মানুষটিকে বরাবরই রাজপুত্র মনে হয়েছে, রূপে গুণে এক নম্বর মনে হয়েছে। হাতে গোনা কিছু পত্রমিতা তখনও আছে আমার,কারও সঙ্গে বন্ধুত্বের বাইরে কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কেউ লাফ দিয়ে ময়মনসিংহে আমাকে দেখতে চলে আসার বায়না ধরে না। ওই তাদেরই একজনকে রাতের পড়া সেরে খাওয়া সেরে বাবার বিছানায় বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে,একটি শাদামাটা *কেমন আছ ভাল আছি* জাতীয় কিছু লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় বাবার আসার শব্দ পেয়ে ঘুম- চোখে বাবার বিছানা ছেড়ে নিজের বিছানায় শরীরটিকে ছুঁড়ে দিই। চিঠি বাবার বিছানার ওপর ওভাবেই পড়েছিল। বাবা মধ্যরাতে আমাকে ঘুম থেকে টেনে তুলে মেঝেয় ধাক্কা দিয়ে ফেললেন। ফেলেই তাঁর জুতো খুলে পেটাতে শুরু করলেন, কেন পেটাচ্ছেন কী অন্যায় আমি করেছি তার কিছু আমাকে না জানিয়ে। আমার বোঝার ক্ষমতা নেই কী কারণে বাবা এমন উন্মাদ হয়েছেন। আমার অস্ফুট বাক্য *কী করছি আমি, কী হইছে?* হারিয়ে যায় বাবার তর্জনের তলে। আস্ত একটি দৈত্য হয়ে উঠলেন তিনি। চুলের মুঠি ধরে শূন্যে ছুঁড়ে মারলেন, উড়ে গিয়ে আবার বাটার শক্ত জুতো পিঠে, ঘাড়ে, মাথায়, বুকে, মুখে। বাবা পেটান আমাদের, ঘুমের মেয়েকে তুলে এভাবে মধ্যরাতে আগে কখনও পেটাননি। বাবাকে ফেরাতে গিয়েছিলেন মা, মাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আমাকে খামচে ধরেছেন আবার। হাতে পায়ে শক্তি ফুরোলে তিনি থেমেছেন। আমাকে মেঝে থেকে তুলে *মানুষটার আন্দাজ বরাদ্দ কিচ্ছু যদি থাকত! মাথায় মারলে মাথা যে নষ্ট হইয়া যাইব তা জানে না। এইভাবে মারার চেয়ে একেকবারে মাইরা ফেলায় না কেন। মাইরা ফেললেই তো ঝামেলা যায়* বলতে

বলতে বিছানায় শুইয়ে দিলেন মা। সারারাত পাশে বসে ইস্ত্রির তলে কাপড় রেখে গরম করে করে আমার শরীরের নানা জায়গায় স্যাঁকা দেন। ঘুম চোখে ছিল না আমার, এক ফোঁটা জলও কিন্তু ছিল না। বিছানায় পড়ে থাকা আমার চিঠিটিই এসবের কারণ, ঠিক বুঝি। বাবা মেরে আমার চামড়া তুলে ফেলুন, আমার হাড়গোড় সব ভেঙে ফেলুন, তবু এতে আমার এই ধারণা মরে যায়না যে ছেলে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয়, ছেলেদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা প্রেমের সম্পর্ক ছাড়াও কেবল বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে, মেয়েতে মেয়েতে অথবা ছেলেতে ছেলেতে যেমন হতে পারে।

আমার ঠিকানা এখন আর ছোটদার বন্ধুর কাগজকলমের দোকান নয়, পোস্ট বক্স নম্বর ছয়। তাঁর নিজের চিঠি কাগজকলমের দোকান থেকে মার যাচ্ছে আশংকা করে ছোটদা পোস্টাপিসে একটি বাক্স নিয়েছেন, ওটিই আমি আর ছোটদা ব্যবহার করতে শুরু করেছি। বিচিত্রা থেকে আমার কাছে ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বিভাগীয় সম্পাদকের চিঠি আসে। অনুরোধটি পুলকিত করে আমাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনের পথ মাড়ানোর কোনওরকম ইচ্ছে আমার জাগে না। যদিও ভুলে থাকি বিজ্ঞাপনের জগত, জগতের আর লোকেরা আমাকে ভোলে না। আমি *নেই,* তবু আমাকে *আছে* করে রাখে বিজ্ঞাপনের পাতায়। নববর্ষের নামকরণের সময় হারিয়ে যাওয়া আমার জন্যও একটি নাম বরাদ্দ থাকে। কেউ নাম দেয় *সুগন্ধী গোলাপ,* কেউ দেয় *গোলাপ তো নয়, গোলাপের কাঁটা।* ঘৃণা এবং ভালবাসা দুটোতেই ওরা দোলায় আমাকে, যদিও ওদের কারও সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার উল্লেখ না হলে অনেকের চলে না। বিস্তর চিঠি আসে আমার ঠিকানায়। বেশির ভাগই চিঠিতেই বন্ধুত্বের আহবান। কিছু অন্ধ অনুরাগীরও আবির্ভাব ঘটেছে। কলেজে আমার এক ক্লাস নিচে পড়া শাহিন প্রতিদিন ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আমার অপেক্ষায়। ফুলের সঙ্গে চিঠি, আমাকে সে দেবী বলে মানে। মেয়েটি বড় লাজুক, নতমুখে নতচোখে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, এক হৃদয় উষ্ণতা আর এক শরীর শৈত্য নিয়ে আমি নিশ্চুপ, মেয়েটি কি জানে তার চেয়েও বেশি লজ্জাবতী তার দেবী! চট্টগ্রাম থেকে পাহাড়ি কুমার নামে এক ধনকুবের চিঠি লেখে সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে, সুগন্ধে ডোবানো নীলাভ কাগজে। চন্দনা সেদিন অবকাশে, পাহাড়ি কুমারের উপহারের প্যাকেটটি যেদিন দিয়ে যায় ডাকপিয়ন। আমরা দুজন মাঠে বসে গল্প করছিলাম, প্যাকেট আমাদের গল্প থামিয়ে দেয়। যেহেতু এটি প্যাকেট, যেহেতু এটি আমার হাতে দিয়ে আমার সই নিতে হবে, তাই ডাকপিয়ন আরোগ্য বিতানে না নিয়ে প্যাকেট বাড়িতে এনেছে। বড় প্যাকেটের ভেতরে ছোট প্যাকেট, ছোট প্যাকেটের ভেতর আরও ছোট প্যাকেট, সেই প্যাকেটের ভেতর আরেক, শেষ প্যাকেটের ভেতর থেকে প্রাণভ্রমরাটি বেরিয়ে আসতেই চন্দনা লাফিয়ে উঠে এক হাত দূরে ঝটিতি সরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, *ফালা এইটা।*

ফালাইতাম কেন? কি হইছে?

ফালা। ফালা। এক্ষুনি ফালা।

কি এইটা?

হারামজাদা কুত্তা বেডা পচা জিনিস পাডাইছে, ফালা।

কি ফেলব তা না বুঝে আমি বিমূঢ় বসে থাকি। কৌতূহল আমাকে এমন গিলে খায় যে জিনিসটির দিকে আমি না চাইলেও আমার হাত চায় যেতে। চন্দনা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত সরিয়ে নেয় জিনিসটি থেকে। জিনিস আমার হাত থেকে কোলে, কোল থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে।

কি এইটা?

বোকা চোখদুটো একবার মাটির জিনিসে, আরেকবার চন্দনায়, চন্দনার বিবমিষায়।

বুঝস না কি এইটা?

না তো!কি এইটা?

এইটা প্যান্টি। শিগরি ফালাইয়া দিয়া আয়।

দৌড়ে গিয়ে আবর্জনার স্তূপে প্যাকেটসহ উপহারটি ফেলে দিই। বিবমিষা আমার দিকেও হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসতে থাকে। চন্দনা মাঠের কিনারে বসে সত্যি সত্যি উগলে আসা বমন ত্যাগ করে।

চন্দনার এমন হয়। *কামনা বাসনা শ্রীমতী* নামের পর্নো ম্যাগাজিনগুলো সম্পর্কে ও বলে, *আরে শালা একদিন পড়ছিলাম, ঘেন্নায় বমি করলাম। তারপর বাংলা সাবান দিয়া হাত ধুইয়া আবার লাক্স সাবান দিয়া হাত ধুইলাম। খাওয়ার সময় মনে হইতাছিল পেটে না আবার ঢুইক্যা যায়।* সেই হাতে আর কোনওদিন ওসব নোংরা জিনিস ওঠেনি। আমরা যে জীবনের স্বপ্ন দেখি, সে জীবনে ন্যাংটো হওয়া নেই। পুরুষের শরীর চন্দনার কাছে বড় কদাকার একটি জিনিস। তবে ভালবাসায় ভীষণ রকম বিশ্বাসী সে।

চন্দনা *প্লেটোনিক লাভ* এর কথা বলতে শুরু করেছে। জিজ্ঞেস করেছি, *এইটা আবার কি?*

এইটা হইল লাভ, ভালবাসা, যেই ভালবাসায় শয়তানি নাই, নোংরামি নাই।

চন্দনার উজ্জ্বল দুটি চোখে আমার মুগ্ধ দুটি চোখ।

আমাকে হঠাৎ একা করে দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর চন্দনা চলে গেল। চন্দনা তো আর গেল না, ওকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেলেন ওর বাবা ডাক্তার সুব্রত চাকমা, পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি, চন্দনাকে জন্ম দেবার পর দু দুটো ছেলে-বাচ্চার জন্ম দিয়ে স্বামীর আশা পূরণ করেছিলেন যে মলিনা সেই মলিনার মলিন স্বামী; কুমিল্লায়। কুমিল্লা যাওয়ার আগে দাদা আমাকে আর চন্দনাকে নিয়ে ঢাকা বোর্ড থেকে সার্টিফিকেট তুলতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সকালে যাওয়া বিকেলে ফেরা। মতিঝিলে টাই টুং চিনে রেস্তোরাঁয় দুপুরে আমাদের খাওয়াতে নিয়ে দাদা বললেন, *কি চন্দনা, তোমরা চোখ কান খোলা রাখো না কেন?*

কেন,কি দেখি নাই কি শুনি নাই?

একটা সুন্দরী মেয়ে দেখবা না আমার জন্য? কলেজে দুইটা বছর পড়লা!

আমরা ছেলেদের দিকে তাকাইয়াই সময় পাই না। মেয়েদের দিকে কখন তাকাবো! চন্দনা হেসে ফেলে। অনাত্মীয় পুরুষদের মধ্যে চন্দনা আমার দাদাদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ। চাকমা রাজা দেবাশীষের কথা মনে করে চুক চুক দুঃখ করে দাদা বলেন, *যে ভুলটা তুমি করছ, পরে কিন্তু এর জন্য পস্তাইবা। একটা রাজারে পাত্তা দিলা না!*

চন্দনা জোরে হেসে ওঠে।

দাদার দুঃখ শেষ হয় না। *আমরা রাঙামাটিতে গেলে রাজার বাড়ির অতিথি হইয়া থাকতে পারতাম! এই সুযোগটা নষ্ট কইরা দিলা।*

চন্দনা আবারও হাসে।

না জানি তোমার কপালে কোন ফকির আছে!

রাঙামাটির গল্প বলতে গিয়ে দেবাশীষের চেয়ে ও বেশি বলে চেরাগ আলীর কথা। রাঙামাটিতে এক দারোগা আছে, দারোগার নাম চেরাগ আলী, চেরাগ আলী বলেন, তিনি দিনেও জ্বলেন রাতেও জ্বলেন। চন্দনা খানিকপর গম্ভীর হয়ে বলে, তবে চেরাগ আলী ইদানিং কিছু কম জ্বলেন, কারণ তাঁর চাকরিটি চলে গেছে। যদিও অল্প সময় ঢাকায়, তবুও চন্দনা আর আমি ময়মনসিংহের চেনা পরিবেশ থেকে দূরে যেতে পেরে সুখের দোলনায় দুলি। কুমিল্লা যাওয়ার আগে বলেছিলাম চন্দনাকে, *যাইস না, তুই গেলে বাঁচবাম কেমনে?* চন্দনারও একই প্রশ্ন ছিল, আমাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই কারও কাছে। সুব্রত চাকমাকে চন্দনা এমনও বলেছে সে ময়মনসিংহ ছেড়ে যাবে না, এখানে আমার সঙ্গে অবকাশে থেকে লেখাপড়া করবে।তিনি রাজি হননি। চন্দনার আধবোজা চোখ লাল হয়ে ছিল যাবার দিন। আমার কানে কানে বলেছে, *দেখিস আমি পলাইয়া*

একদিন চইলা আইয়াম তর কাছে। আমরা দুইজন সারাজীবন একসাথে থাকবাম। কুমিল্লা থেকে দিনে দুটি তিনটি করে চিঠি লিখছে চন্দনা। লম্বা লম্বা চিঠি। প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনা, দুর্ঘটনা। প্রতিদিনের মন কেমন করা। প্রতিদিনের নিঃসঙ্গতা। প্রতিদিনের হাহাকার। বাড়ির কাছে কৃষ্ণচুড়া ফুটে লাল হয়ে আছে, গাছটির দিকে যখনই তাকায় ও, আমাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে ফেলে যাওয়া জীবনের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি কুঁড়ি, প্রতিটি ফুল। জীবনটি ওর আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে করে। চন্দনার এই যাওয়াকে আমার যাওয়া বলে মনে হয় না। মনে হয় আবার ফিরে আসার জন্য গেছে সে। এ যাওয়া সারাজীবনের মত চলে যাওয়া নয়। আমাদের আবার দেখা হবে, আমরা আবার দুলব আনন্দ দোলনায়। আবার সেই নৌকোর গলুইয়ে বসে আমি আকাশের রং দেখব, আর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ তুলে চন্দনা বৈঠা বেয়ে চলে যাবে বহু দূরে, সীমানা পেরিয়ে। এমন একটি জগতে যেখানে কোনও পাপ নেই, পঙ্কিলতা নেই, হিংসা নেই, ঘৃণা নেই, নিষ্ঠুরতা নির্মমতা নেই, যেখানে কোনও অন্যায় নেই, বৈষম্য নেই,যেখানে কোনও রোগ নেই, শোক নেই, মৃত্যু নেই। যেখানে শুভ্রতার ঘ্রাণ নিতে নিতে সুন্দরের সঙ্গে বাস করব আমরা, ভালবাসা আমাদের চৌহদ্দি ছেড়ে কোথাও যাবে না। চন্দনা ভাল না লাগায় ভুগতে ভুগতে লেখে *আমার ভাল লাগছে না, আমি যেন জাগতিক সবকিছুর উর্ধে। ভাল লাগা ভালবাসা এসব শব্দগুলো সব পুরোনো মনে হচ্ছে। আমি তোকে বোঝাতে পারছি না। কেবল মনে হচ্ছে আমি যেন আমাতে নেই। আজ সারাদিন মন খারাপ, সামান্য আঘাত লেগে মেহগিনি পাতাগুলো যখন ঝিরঝির ফুলের মত প্রশান্তির মত ঝরে পড়ে তখন ইচ্ছে করে কোনও জিনস জ্যাকেটের পিঠে মাথা রেখে হোন্ডায় চড়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাই। আমি জানি, কি নির্মম ভাবে জানি অথচ বলিনি কারও কাছে এসব আমার জন্য কেবল অলীক স্বপ্ন মাত্র। আমাকে আঘাত কর তুই, চোখে জল না থাকলে আমি ভাল থাকি না তো, কিছুতেই না, আসলে আমার কি হয়েছে আমি তোকে বলতে পারব না, তাহলে জেনে যাবে, সবাই জেনে যাবে। আমি কেবল ছটফট করছি, আকুল হয়ে মরছি অথচ কি জানিস পুরো ব্যাপারটা তুই জানবি না, নেভার, তুই আমার এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ, হৃদয়ের এত কাছে থাকিস তুই, তবু বলা হবে না। হায়রে মন। এই মনটাই আমার শত্রু। সব যখন ঠিকঠাক চলে, ঠিক সে মুহূর্তেই আমি বদলে যাই। মন নামক এই পদার্থটি বিদ্রোহ করে বসে আমার সঙ্গে। আমি ভাল নেই, একদম না, চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়, একধরনের ঈর্ষায় হিংসেয় আমি ছিন্নভিন্ন হই অবিরত, অথচ বোঝাতে পারি না। বুঝতেও পারি না এই ঈর্ষা কার বিরুদ্ধে, এই দ্বন্দ্ব কেন। তবে কি আমি আমার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে চাই? আমি কি আমাকে আর ভালবাসি না? কি জানি .. যদি কোনও এক নীল চোখের গ্রীক যুবক, যদি কোনও এপোলো আমাকে ভালবাসার কথা বলত ..! আমার ভেতর সবকিছু ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। আমি আর কোনওকিছুতে আনন্দ পাই না। মনে পড়ে আসামী হাজিরের সদানন্দ কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় আর্তনাদ করত, মনে কর তেমন কোনও অব্যক্ত যন্ত্রণায় আমি আর্তনাদ করছি। এই একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। তুই আমাকে মনোহর উত্তরণে নিয়ে যেতে পারবি? মন কাঁদে, তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার, তাই জনম গেল শান্তি পেলি না রে মন মনরে আমার। বুঝতে পারিস কি বললাম? বুঝিস না? আমি তোকে কাছে পেতে চাইছি। আমি কেবল তোকেই চাই, কতকাল দেখিনি তোকে। এই সংসার এই মায়ার বন্ধন ছেড়ে চল ঘুরে বেড়াই বাউলের একতারা নিয়ে, তুই হবি বৈষ্ণব আমি বৈষ্ণবি, টুংটাং শব্দ তুলে আমরা গাইব দুজনেই,*

পাখি ছটফটাইয়া মরে, শিকল ছিঁড়িতে না পারে, খাঁচা ভাঙিতে না পারে, পাখি ছটফটাইয়া মরে। অথবা চোক্ষেরই নাম আরশিনগর, একদিন ক্ষইয়া যাবে, পোড়া চোখে যা দেখিলাম তাই রইয়া যাবে।

চন্দনাকে দীর্ঘ দীর্ঘ চিঠি লেখা ছাড়া ছাদে, ঘরের কোণে, বারান্দায়, মাঠের ঘাসে, ভোরের শিউলিতলায়, সেগুন গাছের ছায়ায় বসে একটি জিনিসই তখন হয়, কবিতা লেখা। দেশের বিভিন্ন শহর থেকে কবিতা পত্রিকা আসে আমার ঠিকানায়। পশ্চিমবঙ্গের নানা অঞ্চল থেকেও আসে কবিতার ছোট কাগজ। এগুলো এক ধরনের শেকলের মত, একটি থেকে আরেকটি, আরেকটি থেকে আরেকটি করে করে ব্যাপ্ত হতে থাকে। ছোট কবিতা পত্রিকায়, ঢাকার সাপ্তাহিক পত্রিকাতেও পাঠাই কবিতা। কোথাও না কোথাও ছাপা হতে থাকে কিছু না কিছু। একদিন আমার ভাবনার পুকুরে ঢিল পড়ে, কোত্থেকে পড়ে, কি করে পড়ে কিছু না জেনে আমি পুকুর পাড়ে নিস্পন্দ বসে থাকি। পুকুরের ছোট ছোট ঢেউ ক্রমে বড় হতে হতে পায়ে আছড়ে পড়ে, আমার শরীর ভিজতে থাকে জলে। আমি তবু নিস্পন্দ বসে থাকি। নিস্পন্দ আমাকে দেখতে লাগে, ভেতরে আমার উঁকি দিচ্ছে একটি ইচ্ছের অঙ্কুর। আমি তো চেষ্টা করলে নিজেই একটি কবিতা পত্রিকা বের করতে পারি। পারি না কি? পারি। মন বলে পারি। ডলি পালের বাড়ি থেকে ভেসে আসা উলুধ্বনির শব্দ আমাকে সচকিত করে। দশদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কী নাম দেব পত্রিকার? কী দেব নাম? আমাকে দুদিন কিংবা তিনদিন ভাবতে হয় না। মন বলে, সেঁজুতি! হ্যাঁ সেঁজুতিই। সন্ধ্যাপ্রদীপ। চন্দনার কাছে চাওয়ামাত্র কবিতা পাঠিয়ে দেয়, ইশকুল শেষ হওয়ার পরও বাংলার শিক্ষিকা সুরাইয়া বেগম আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, তাঁকে দিয়ে নতুন একটি কবিতা লিখিয়ে নিই আর ছোটদাকে বলে শহরের কিছু কবির কবিতা আনিয়ে শখের বশে সুখের ঘোরে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলি সেঁজুতির, কিছু টুকরো খবর শেষের পাতায়, সাহিত্যের সাহিত্যিকের, সাহিত্যের কোন ছোট পত্রিকা কোত্থেকে কারা বের করেছে, কেমন হয়েছে ভাল না মন্দ, মন্দ হলে কেন ভাল হলে তাই বা কেন, এসব। দাদা বললেন *আমার একটা কবিতা ছাপা।* তাঁর কবিতার খাতা থেকে সবচেয়ে ভাল কবিতাটি নিই। *আমার খবরটাও লেইখা দে। লেইখা দে পাতা পত্রিকার সম্পাদক ফয়জুল কবীর নোমানএর প্রথম কবিতার বই পারাপার শিগরি বেরোচ্ছে।* তাও লিখে দিই। দাদা খুশি। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাজানোর সময় হয়ে এল, কে টাকা দেবে, কে প্রেসে যাবে, কে ছেপে আনবে সেঁজুতি! পারাপার নামে দাদা কোনও বই লেখা শুরুই করেননি, তবু তাঁর অনুরোধে খবরটি দেবার কারণেই সম্ভবত তিনি বললেন *ঠিক আছে যা, আমি তর এই সেঁজুতি ছাপার খরচ দিয়াম নে। প্রেসের সবাইরে তো আমি চিনি, পাতা পত্রিকা ছাপানোর কারণে।* দাদার কানের কাছে পিনপিন করে বেজেই চলল আমার গানা *ও দাদা, ও দাদা, তুমি তো কইছ ছাপাইয়া দিবা, দেও।*

ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর।
ধৈর্য আর কত ধরাম?
আরও ধৈর্য ধর। আরও।
কতদিন?
আরও কিছুদিন।

ধৈর্য ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। দিন দিন অস্থির হতে থাকি। শেষ অবদি ছোটদার হাতে পাণ্ডুলিপি দিই। ছোটবাজারের একটি ছাপাখানায় সেঁজুতি দিয়ে আসার পর ছোটদার লেজে লেগে থাকি, *কবে ছাপা হবে?* ছাপার দেরি আছে। *কত দেরি?* সামনের মাসে ছাপা হইব। *উফ এত দেরি!* প্রেসের কি আর কাজ নাই নাকি?

আমারে একদিন নিয়া যাইবা ছাপাখানায়? তুই যাইতি কেন? আমিই ছাপাইয়া নিয়া আসব।

ছাপাখানায় যাওয়ার ইচ্ছেটির গলা ধরে দাদা ধাক্কা দেন, *প্রেসে যাইবি কেন?*

কেমনে ছাপায় দেখতে ইচ্ছা করতাছে।

মেয়েরা প্রেসে যায় না।

কেন যায় না?

যায় না।

কোনও কারণ আছে?

মেয়েদের প্রেসে যাইতে হয় না।

কেন হয় না? গেলে কি হয়?

অসুবিধা হয়।

কি অসুবিধা? মাইনষে চাক্কাইব?

চাক্কাইব না হয়ত, কিন্তু হাসব।

হাসব কেন? হাসির কি আছে? আমি সম্পাদনা করতাছি পত্রিকা, আমি কেন প্রেসে যাব না?

সম্পাদনা ঘরে বইয়া করা যায়। পুরুষমানুষের মত প্রেসে দৌড়ানোর দরকার নাই।

দাদা আমার উৎসাহ নিবৃত্ত করতে পারেন না। ছোটদার সঙ্গে প্রেসে আমি যাই যে করেই হোক যাই। কালো কালো কাত করা ঘরকাটা বড় টেবিল মত, তার সামনে বসে লোকেরা এক একটি ঘর থেকে এক একটি ক্ষুদ্র বর্ণ নিয়ে লোহার পাতে রাখছে। তুমি লিখতে গিয়ে, ত এর ঘর থেকে ত তুলে,ু র ঘর থেকেু, তারপর একটি ি নিয়ে তার পাশে ম বসাচ্ছে। এক তুমিতেই চারবার হাত বাড়াতে হয়। কি করে লোকেরা জানে কোন ঘরে ত আছে, কোন ঘরে ম, কি করে হাতগুলো এত দ্রুত সঞ্চালিত হয়! ইচ্ছে করে সারাদিন বসে প্রেসের কাজ দেখি, দেখি কি করে অক্ষর জুড়ে শব্দ বানায় ওরা। ছাপার মেশিনটি ঘড়ঘড় শব্দে ছেপে যাচ্ছে বিড়ির কাগজ, আগরবাতির কাগজ, মলমের কৌটোর কাগজ,বিয়ের কার্ড, রাজনৈতিক পোস্টার। সেঁজুতির পাণ্ডুলিপি দেখে প্রেসের মালিক হরে কৃষ্ণ সাহা *অন্যরকম* কিছুর স্বাদ পেয়ে *অন্যরকম* হাসি হাসলেন। ছেপে দেবেন শীঘ্র বললেন। প্রতি ফর্মা দুশ টাকা। কেবল দুশ টাকাই কি! আছে কাগজ কেনার টাকা। বাড়ি ফিরে শিশিবোতলকাগজঅলার কাছে বাড়িতে আস্ত অনাস্ত যত কাগজ আছে, পুরোনো চিত্রালী পূর্বাণী রোদে শুকিয়ে উই ঝেড়ে, পুরোনো রোববার সন্ধানী বিচিত্রার মায়া কাটিয়ে বিক্রি করে টাকা জমা করি। মার আঁচলের খুঁট থেকেও কিছু অর্জন হয়। এদিক ওদিক থেকে আরও কিছু। যক্ষের ধন মুঠো করে ছোটদাকে সঙ্গে নিয়ে হরে কৃষ্ণ সাহার ছাপাখানার পাশেই কাগজের দোকান থেকে পছন্দ করে কাগজ কিনে দিয়ে আসি ছাপাখানায়। এরপর বাড়িতে ছোটদা প্রুফ নিয়ে এসে প্রুফ কি করে দেখতে হয় শিখিয়ে দেন। নিজে তিনি পত্রিকায় কাজ করেন, জানেন। ছাপার টাকার জন্য দাদার ওপর ভরসা করি, একবারে টাকা পাওয়া না গেলেও কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা মেলে।

যেদিন হলুদ রঙের পাঁচশ সেঁজুতি ছাপা হয়ে বাড়িতে এল, সেঁজুতির রূপ রস গন্ধ সব গ্রহণ করার পর বিছানায় বসে সেজুঁতির পাতা ভাঁজ করে করে পিন আটকে আলাদা করে রাখছিলাম, বাবার বাড়ি ঢোকার শব্দ শুনে চালান করে দিই সব খাটের নিচে। খাটের নিচেও চোখ যায় বাবার। বাবার চোখ, ইয়াসমিন বলে, শকুনের। কারও সাধ্য নেই কিছু লুকিয়ে রাখে। বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা তিনি বেশির ভাগ সময় বাড়ি না থেকেও জানেন। কে যে কখন বাবার দূত হয়ে কাজ করে, অসম্ভব অনুমান করা। মাকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, *কি ওইসব, লেখাপড়া রাইখা করে কি মেয়ে?*

মা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলেন, *কি জানি কি কবিতার পত্রিকা ছাপাইছে।*

কবিতার পত্রিকা আবার কি?

কবিতা লেখে। পত্রিকা ছাপায়।

কবিতার পত্রিকা দিয়া কি হইব? তারে না কইছি লেখাপড়া করতে? মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করাইব কেডা ওরে? কবিতা দিয়া পাশ হইব?

মার ওপর ধকল যায়।

টাকা পাইল কই? বাবার কৌতূহল উপচে ওঠে।

মা নীরস মুখে বলেন, *নোমান দিছে।*

নোমান দিছে কেন?

চাইছে। দিছে।

চাইলেই দিতে হইব নাকি?

ছোট বোন শখ করছে তাই দিছে।

নোমানের লাভ কি?

লাভ কি সবাই খুঁজে? ভাল লাগে বইলা কবিতা লেখে। নোমানও তো কবিতার পত্রিকা ছাপত। এহন নাসরিন ধরছে।

আমি যে দিনরাইত খাইটা আইনা তাদেরে খাওয়াই, তা কি এইসব আজে বাজে কাজ কইরা সময় নষ্ট করার লাইগা?

মা বলেন, *আমারে জিগান কেন? মেয়েরে গিয়া জিগান।*

বাবা আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস করতে আসেন না। দাদাকে ধরেন, *ওরে যে উস্কাইতাছস, ও পাগল হইছে বইলা কি তুইও পাগল হইছস?*

দাদা মিনমিন করেন, *ওরে তো উস্কাই নাই আমি।*

টাকা দিছস কেন?

বেশি দেই নাই ত।

দিছস ত। তুই টাকা না দিলে এইগুলা কি করতে পারত ও?

দাদা গর্বে ফুলে বলেন, *না।*

কবিতা লেইখা কি হয় জীবনে? কিছু হয়?

না।

তাইলে লেখে কেন?

এমনি।

কবিতা ভাত দেয়?

দাদা মাথা নাড়েন, *ভাত দেয় না।*

কাপড় দেয়?

দেয় না।

বাড়ি দেয়?

না।

ইলেকট্রিসিটি দেয়?

না।

দাদা নতমুখে নরম স্বরে উত্তর দিতে থাকেন।

শহরে ঘুইরা ঘুইরা মাইনষের জীবন ত দেখছস। কেউ কি আছে কবিতা লেইখা বাড়ি বানাইছে?

না।

কোনও ভদ্রলোকে ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে?

না।

পাগল ছাড়া আর কেউ কি কবিতা লেখে?

দাদা এবার আর কোনও উত্তর দেন না। বাবা আরও দুবার প্রশ্নটি করে দাদাকে ওভাবেই নিরুত্তর রেখে জুতোর মচমচ শব্দ তুলে বেরিয়ে যান।

বাবা মুখে তালা দিয়েছেন। বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বলবেন, আমার সঙ্গে নয়। বাবা কথা না বলা মানে টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ করা। আমার এখন কলেজও নেই যে কলেজে যাওয়ার রিক্সাভাড়ার দরকার হবে, একরকম স্বস্তিই পাই বাবার রক্তচোখ আর দাঁত কটমট আর গালিগালাজ আর পড়তে বসার আদেশের সামনে পড়তে হবে না বলে। বাবার স্বভাবই এমন, হঠাৎ হঠাৎ কথা বন্ধ করে দেন। দীর্ঘ দীর্ঘ দিন এভাবেই চলতে থাকে। বাড়িতে এক কাজের মানুষ ছাড়া আর সবার সঙ্গেই তিনি দফায় দফায় কথা বন্ধ করেছেন। যখন কথা বলা ফের শুরু হয়, তিনি নিজে থেকেই কথা বলতে শুরু করেন বলে হয়। মুখের তালা তিনি যখন ইচ্ছে খোলেন যখন ইচ্ছে লাগান, চাবি তাঁর বুক পকেটে। অনেক সময় এমনও হয় যে বাবা কার সঙ্গে কি কারণে কথা বন্ধ করেছেন, সে কারণ খুঁজে পাওয়া আমাদের সবার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।এবার আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করার কারণটি হল সেঁজুতি। মুখে তালা দেওয়ার সপ্তাহ পার না হতেই আমার উদ্দেশে তিনি পত্র পাঠাতে শুরু করলেন। মুখ বুজেই তিনি মুখের শব্দগুলো পত্রাকারে, সাধুকে চলিতের সঙ্গে গুলে পাঠাতে লাগলেন। পত্রবাহক আরোগ্যবিতানের কর্মচারি সালাম। সালামকে মা সালামের পুরো নাম ধরেই ডাকেন। সালাম হল আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের একটি নাম। সরাসরি আল্লাহর নামে কাউকে ডাকতে হয় না, আবদুস বা আবদুল জুড়ে দিলে নামের অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর গোলাম। যেহেতু মানুষ মাত্রই *আল্লাহর গোলাম,* মা তাই সালামকে আবদুস সালাম অর্থাৎ *আল্লার গোলাম* বলেই ডাকেন। কুদ্দুস নামে মার এক পাড়াতুতো ভাই আছে, সবাই ওকে কুদ্দুস ডাকে, মা ডাকেন আবদুল কুদ্দুস। আবদুস সালাম আমার হাতে পত্র দিয়ে যাওয়ার পর মা আমাকে পড়ে শোনাতে বলেন প্রতিটি পত্রই। আমি জোরে পড়ি, কেবল মা নন, বাড়ির আর সবাই শোনে। দশ বারো পৃষ্ঠার পত্র, পিতার আদেশ নিষেধ মানার ফজিলত বর্ণনা করে পত্রের শুরু, চরম হতাশা আর হাহাকার দিয়ে পত্র শেষ, মাঝখানে নীতিবাক্যের নহর। শেষ বাক্যটি যথারীতি *ইতি তোমার হতভাগ্য পিতা।* পত্র আমি পড়ি ঠিকই, তবে ভর্তি পরীক্ষার জন্য বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে থাকার কোনও চেষ্টাই করি না। করি না কারণ ইচ্ছে করে না। বাবা যে লেখাপড়ার কথা বলেন, সেটা না হলেও অন্য ধরণের লেখা আর পড়ায় আমি দিবস রজনী কাটাতে থাকি।

কবিদের ঠিকানায় আর বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের ঠিকানায় সেঁজুতি পাঠাবার কিছুদিন পর থেকেই প্রচুর চিঠি আসতে থাকে, চিঠির সঙ্গে কবিতা। কবিতা পড়, শুদ্ধ কর, পরের সংখ্যায় ছাপার জন্য তুলে রাখো। সেঁজুতিকে করেছি ত্রৈমাসিক। কিন্তু ইচ্ছে করে কালই ছেপে ফেলি। দীর্ঘ তিনটে মাসের অপেক্ষা সহ্য হয় না। চিঠি আসে এত, বাবা আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাকে বলেন, *যত্র তত্র পত্রমিতালি কি ও বন্ধ করে নাই এখনো?* যত্র তত্র পত্রমিতালি বন্ধ হয় বটে, যত্র তত্র কবিতা লেখা বন্ধ হয় না, ও চলে। বারান্দার টেবিলে পড়ে থাকা একটি সেঁজুতি তিনি একদিন আলগোছে সরিয়ে নেন। দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়েন সেঁজুতির সবগুলো কবিতা। পড়া হলে সেটি পকেটে নিয়েই বাইরে যান। কি হতে যাচ্ছে ঘটনা তা আঁচ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাতে তিনি মাকে নিজের ঘরে ডেকে পাশে বসিয়ে সেঁজুতি থেকে একটি কবিতা শুনিয়ে বলেন, *দেখ এইখানে কবি বলতাছে কাগজ হইল মাটি, কলম হইল কোদাল, আর কবিতা লেখা হইল নিজের কবর খোঁড়া। ঠিক কইছে না? কবিরা নিজেরা খোঁড়ে নিজের কবর, এই কথা তো এক কবিই কইল।*

পত্রের কোনও প্রত্যুত্তর বাবা পান না। তিনি মুখ কালো করে বাড়ি ফেরেন, মুখ কালো করেই বেরিয়ে যান। আমার লম্বা ফর্সা কোঁকড়া চুলের *উত্তম কুমার-বাবা*-র পেটে কত ধমক,কত খিস্তি জমা হয়ে আছে, ছিটকে বেরোতে চায়, কিন্তু তিনি ওসব নীতি-চাপা দিয়ে রাখেন। নৈঃশব্দ তাঁর অনেক নীতির এক নীতি কি না! পত্রাঘাতে আমি হেলে পড়ছি না বলে তিনি যে কাজটি করেন এরপর, সেটি অভিনব। তাঁর ঘরের দরজায় একটি কাগজ সেঁটে তিনি লিখেছেন,

আমি আর সহিতে পারছি না এত অন্যায়,
এই কি ছিল আমার কপালে হায়!
ছেলেমেয়েরা গেছে উচ্ছন্নে,
কাঁদিয়া মরি আমি মনে মনে।

লেখাটি পড়ে বাবার ঘরের লাল নীল জানালার লাল কাচে ভাতের আঠায় একটি কাগজ সেঁটে দিয়ে আসি, কাগজে লেখা,

কী আবার অন্যায় করলাম হঠাৎ
আমার তো কাটে দিন আর রাত
অবকাশে বসে, যাই না কোথাও,
বাড়াই না দরজার বাইরে এক পা ও।

বাবা বাড়ি ফিরলে আমি গুটিয়ে রাখি নিজেকে ঘরের ভেতর। প্রতিক্রিয়ার জন্য কান পেতে রেখেও কোনও লাভ হয়নি। বাবা নিঃশব্দে এসে নিঃশব্দে চলে গেছেন। চলে যাওয়ার পর জানালার কাগজের অবস্থাটি দেখতে গিয়ে দেখি ওই কাগজের পাশে আরেকটি কাগজ সাঁটা, ওতে লেখা

বাইরে না গেলেই কি সাধু হওয়া যায়!
এই লোক ঠিকই খবর পায়!
অবকাশে কি কি হয়।
শখ করে করা হচ্ছে জীবনের ক্ষয়।
নাই কোনও ভয়
যত্রতত্র পত্রমিতালি করে কেউ হয়না বড়,
লেখাপড়া না করলে জীবনের খুঁটি হয় নড়বড়।

বাবার লেখা পড়ে আবার কাগজে বড় বড় করে লিখি, লেখার সময় আমার মাথার পাশ থেকে ইয়াসমিনের মাথাটি কিছুতে সরে না।

তা তো জানি, তাকি আর জানি না !
তবে একটা জিনিস আমি মানি না
যে, কিলিয়ে কাউকে মানুষ করা যায়।
বাবারা কি এতে খুব সুখ পায়,
কন্যারা যখন কেঁদে বুক ভাসায়!

বাবা সন্ধের মধ্যেই ফিরে এলেন, এসেই ঘরে ঢুকে ঘন্টা খানিক কারুকে ডাকাডাকি না করে কাটিয়ে, বেরিয়ে মার কাছে এক গেলাস পানি চেয়ে খেয়ে, বাড়িতে আনাজপাতি কিছু লাগবে কি না জিজ্ঞেস করে চলে গেলেন। ঘরে কেঁচো হয়ে বসে ছিলাম। বুক ধড়ফড় করে, এই খোলা পদ্যের গোলা শেষ অবদি কতটা বিস্ফোরক হবে কে জানে! বাবা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেঁচো কেটে বের করি কিংশুক।

বাবা লিখে গেছেন, এবার জানালার বেগুনি কাচে।

মরমে গিয়া আঘাত করিল আত্মজার ক্রন্দন
পিতাই শুধু বোঝে কন্যার সহিত কতখানি তার আত্মার বন্ধন।
পিতা আজ আছে, কাল যাবে মরে
তাইতো কন্যাকে সে দিতে চায় ভরে
শিক্ষা দীক্ষা আর দেখাইতে চায় সত্যের পথ
যে পথে চললে সকলে ভাল বলে, এই তো পিতার মত।

এই কথোপকথন আমাকে ভীষণ উৎসাহিত করে। বাড়ির সবাই এসে জানালার কাচে সাঁটা পদ্য পড়ে যায়। দাদার দেওয়া লাল ডায়রিতে কবিতা লেখা বাদ দিয়ে জানালায় সাঁটা এই পদ্য পদ্য খেলায় আমি মেতে উঠি।

রবীন্দ্রনাথ পড়ে কি কোনও সত্য যায় না পাওয়া?
কাজী নজরুলকে কার সাধ্য আছে করে হাওয়া!
আর সুকান্ত? সে তো দুর্দান্ত।
কবিতা মানে কি মিথ্যের পথ?
যদি হয়, তবে এই দিচ্ছি নাকে খত
ওপথ মাড়াবো না,
কারো দুঃখ বাড়াবো না।
আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণী,
কেবল এইটুকু জানি
আমার কোনও তৃষ্ণা নেই মণি মুক্তা মালার,
একটু শুধু তাগিদ আছে সন্ধ্যাদীপ জ্বালার।

এক জানালা শেষ হলে আরেক জানালায় সাঁটা হচ্ছে। এটি পড়ে মা বললেন, *আমি তুচ্ছ ক্ষুদ্র প্রাণীডা কাইট্টা দে।*

কাইট্টা দিলে কি দিয়া মিলাবো?
লেইখা দে, আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান প্রাণী।

কাটা হয় না, কারণ বাবার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। বাবা আজকাল ঘন ঘন বাড়িতে ঢুঁ মারেন। পেচ্ছাব পায়খানা তো আছেই, এক গেলাস পানি খেতেও নতুন

বাজার থেকে আমলাপাড়া পাড়ি দেন। উদ্দেশ্য অবশ্য কবিতা। কখনও এমন হয়েছে তিনি লিখে যাওয়ার আধঘন্টার মধ্যেই খামোকা ফিরে এলেন বাড়ি। ঘরের জানালা দরজায় নতুন কিছু সাঁটা হয়েছে কি না দেখে যান। কারণ ছাড়াই আমার ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখেন আছি কি না। চোখাচোখি হয় না, ও জিনিসটি তিনিও এড়িয়ে চলেন, আমিও। কথা বন্ধের কালে দৃষ্টিও সংযত করার নিয়ম, এ নিয়ম বাবারই শেখানো।

রবিবাবু কবিতা লিখেছেন নির্ভাবনায়
জমিদারদেরই এইসব মানায়।
ছাত্রজীবনে কবিতা কি শোভা পায়?
এই হতভাগা বড় কষ্টে সংসার চালায়
এত কষ্টের ফল কি সে পায়?
পিতার কথা কি তারা এতটুকু ভাবে?
আমি তো দেখি না কোনো সম্মান হাবে ভাবে।
কত বলি হইতে মানুষের মত মানুষ
তবুও দেখি না তাহাদের কোনও হুঁশ।
সময় গেলে সময় নাহি আসে
পিতা মরে গেলে কেউ আর নাই পাশে।
ছাত্রজীবনে অবসর বলে কিছু নাই
এই কথা আমি বারবার বলি, আবারও বলে যাই
হেলাফেলা করিলে জীবনটি হবে নষ্ট
দেখে আর কেউ নয়, পিতাই পাইবে কষ্ট।

বাবা এই পদ্যটি লিখতে সময় নিয়েছেন বেশ। সালামকে খুঁচিয়ে খবর জোটে, বাবা কাগজ কলম নিয়ে আজকাল আরোগ্য বিতানে বসে মাথা চুলকোন। রোগী বসে থাকে অপেক্ষা-ঘরে। তিনি চুলকোচ্ছেন, লিখছেন, ফেলছেন, আবার নতুন করে লিখছেন। পরে বেরিয়ে এসে রোগীদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে তিনি বাড়ি থেকে ঘুরে যান। ঘুরে যাওয়া মানে জানালায় পদ্য সেঁটে যাওয়া।

এ পদ্যটি পড়ে মা বলেন, *হুঃ! এই সংসার চালাইতে কষ্ট হয় নাকি কোনও? সাতদিনে একদিন বাজার করে। হেই বেডির বাড়িত ত প্রত্যেকদিন মাছ মাংস যায়। টাকা ত আর কম কামায় না। তোদেরে কি দেয়? শখের একটা জিনিস দিছে কোনওদিন?*

মার প্রেরণায় লিখি

কি হয় এমন খরচ সংসারে!
কাটাই তো অনেকটা অনাহারে।
ঈদ এলে জামা পাই, সব ঈদেও জোটে না
মনে কত কথা জমা, মুখে কিছু ফোটে না।
চারিদিকে মেয়েরা কথা বলে চুটিয়ে
আমরাই এ বাড়িতে ভয়ে থাকি গুটিয়ে।
মনে তবু আশা থাকে লুকিয়ে,
বাবার আদর পেলে ভুলগুলো চুকিয়ে

বড় হব এত বড় আকাশ নাগাল পাবো
দিগন্তের ওইপারে একদিন হারাবো।

পদ্যটি পড়ে মা বলেন *হারানোর কথা লেখছস কেন?* দাদা শব্দ করে পড়ে বলেন, *সুন্দর হইছে।* বাবা এরপর আর কিছু লেখেন না। পদ্যের জীবন আর সত্যিকার জীবনে যে অনেক পার্থক্য তা একদিন বাবার *নাসরিন* ডাকের চিৎকারে অনুভূত হয়। বাবার সামনে আগের সেই নতমুখ নতচোখ দাঁড়াই। তিনি আগের মতই দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, *কি করা হইতাছে?*

আমি নিরুত্তর।

সারাদিন আড্ডা মাইরা জীবন চলবে?

নিরুত্তর।

কোনও মেডিকেলে তর মত গাধার পক্ষে যে পাশ করা সম্ভব না, এইডা বুঝা যাইতাছে না?

নিরুত্তর।

কবিতা লেখস? কবিতা কি একলা তুইই লেখতে পারস? সবাই লেখতে পারে। কামের ছেড়ি মালেকারে জিজ্ঞাসা কর, সেও পারবে লেখতে।

গাধা থেকে শব্দ বেরোয়, *মালেকা তো লিখতে জানে না।*

না জানুক, মুখে ত কইতে পারব। লালন ফকির মুখে মুখে কবিতা বলে নাই? হাছন রাজা বলে নাই?

নিরুত্তর।

আমি শেষ ওয়ারনিং দিয়া দিলাম, মেডিকেলে ভর্তি হইতে না পারলে বাড়িত তর ভাত বন্ধ। খবর রাখছ কবে ঢাকা ইউনির্ভাসিটির ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইব?

নিরুত্তর।

আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা সামনের মাসে। ঢাকায় গিয়া পরীক্ষা দিতে হইব। এক্ষুনি অঙ্ক করতে ব। পরীক্ষায় পাশ না করলে কপালে কি আছে তা নিজে বুঝতে চেষ্টা কর।

বাবার উপদেশবাণী নীরবে হজম করে আমি নতমস্তকে তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে অঙ্ক নয়, আনন্দ উৎসব শুরু করি। ঢাকা যাওয়ার আনন্দ।

ঝিককির ঝিককির ময়মনসিং, ঢাকা যাইতে কত্তদিন !
ঢাকা যাইতে কত্তদিন, ঝিককির ঝিককির ময়মনসিং।
ঢাকা যাইতে সাতদিন, ঝিককির ঝিককির ময়মনসিং!

আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা দিতে তিনি নিজ মুখে বলেছেন, এর চেয়ে বেশি আমি আর কি চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় ভর্তি হওয়ার কথা বললে তিনি হয়ত ঢাকা যাওয়ার এই সুযোগ থেকেও আমাকে বঞ্চিত করবেন। আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পাঠাতে বাবা রাজি হতেন না যদি না এম এ কাহহারের পুত্রধন ফরহাদের মুখে শুনতেন *আর্কিটেকচার ভাল সাবজেক্ট।* ফরহাদ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে দীর্ঘ বছর বসে আছেন, পরীক্ষা এলেই তাঁর খুব বমি আর পাতলা পায়খানা শুরু হয়। প্রতি বছর পরীক্ষার আগে আগে ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে যান। পরীক্ষা দেওয়া হয় তাঁর, কিন্তু পাশ হয় না কখনও। না হলেও তাঁর কথার তো মূল্য আছে। স্থাপত্যশিল্প ভাল বিষয়, কেবল ভাল বিষয় নয়, ফরহাদ জোর দিয়ে বলেছেন, ডাক্তারির চেয়ে ভাল। যুক্তি দেখিয়েছেন, ডাক্তার মেয়েকে এক ডাক্তার ছেলে ছাড়া আর কেউ বিয়ে করে না,

মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার মুশকিল হল এই। ফরহাদ যে যুক্তিই দিন না কেন, কোনও যুক্তি বাবার কাছে টেকে না, বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না ডাক্তারির চেয়ে ভাল বিষয় পৃথিবীতে আর কিছু আছে, সে মেয়ের জন্য হোক কি ছেলের জন্য হোক, কী কুকুর বেড়াল কীটপতঙ্গের জন্যই হোক। হাত পা নেড়ে ফরহাদ দাদাকে বলে গেছেন, *আরে মিয়া ঘরে বইসা কাজ করা যায়, বাইরেও যাইতে হয় না। একটা বড়লোকের বাড়ির ডিজাইন কইরা দিবা, ধর একটা গভমেন্টের বিল্ডিং অথবা ধর নতুন সংসদ ভবনের ডিজাইন, কইরা দিলা, কোটি টাকা ঘরে বইয়া পাইয়া গেলা, সারা বছর আর তোমার কিছু না করলেও চলে। আর্কিটেকচার ভাল সাবজেক্ট* এ কথা ছোটদাও বলেন। *আরে আমগোর রফিক ওইখানে পড়তাছে না!* রফিক পড়ছে বলেই সাবজেক্টটি ভাল,রফিক না পড়লে সাবজেক্টটি এত ভাল নাও হতে পারত। বন্ধু আর্কিটেকচারে পড়ছে বলে ছোটদা কালো-মাড়ি-হাসিটি এমন প্রসারিত করে রাখেন যে মনে হয় বিষয়টির স্বরেঅ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সব তাঁর নখদর্পণে। ভর্তি হওয়ার আগে সাতদিন ক্লাস করতে হয়। ক্লাস নেয় শেষ বর্ষের ছাত্ররা। তাঁর বন্ধুটি আমাকে *ইভেন ফ্রি কোচিংও দিতে পারে।* যে জিনিসটি স্থাপত্যশিল্পে ভর্তি হওয়ার জন্য এখন জরুরি করা, তা অঙ্ক। আমার টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে লিটল ম্যাগাজিন। অঙ্ক বইয়ের খোঁজ পাওয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তা বুঝি। অঙ্কের খাতাগুলোও বাড়িতে আর আছে বলে মনে হয় না। সেরদরে বিক্রি করে সেঁজুতির কাগজ কিনতে চলে গেছে।

আমি যে খুব শীঘ্র *স্থাপত্যশিল্পী* হতে যাচ্ছি, সে কথা চন্দনাকে জানাই। চন্দনা ভর্তি পরীক্ষা দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাংলা সাহিত্যে পড়াশোনা করবে। ঢাকায় আমরা একসঙ্গে থাকব, শেকল ছিঁড়ে দুটো মুক্ত পাখি হাওয়ায় উড়ে বেড়াবো, দুচোখে জীবন দেখব, দুপায়ে দৌড়ে যাবো, ক্রমশ উঁচুতে আরও উঁচুতে কি আছে না-দেখা, দেখব; স্বপ্নের সিঁড়ি আমাদের পায়ের নাগালে এসে যাচ্ছে। আমাদের ডানায় এসে ভর করছে ঝাঁক ঝাঁক আনন্দ।

সেঁজুতির দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য চন্দনা *তারুণ্য এ্যাক মোহন নদী* নামে কবিতাটি পাঠিয়েছে।

আমার চারপাশে অমিত তারণ্যে
খেলা করে কয়েকজন সুদর্শন তরুণ
ঝড় ওঠে দ্রৌপদীর বুকে
উন্মত্ত সজীবতায় অবিরাম
ওরা হয় লুণ্ঠিত, হৃতসর্বস্ব..।

জানালায় বসে কেবল কৃষ্ণচূড়াই নয়, কেবল মেহগিনি পাতার ঝরে যাওয়া নয়, চন্দনা তরুণ সুদর্শনদেরও দেখছে। এক সুদর্শনের সঙ্গে কিছু ভেবে কিছু না ভেবে দেখা করেও এসেছে। অনুপুঙ্খ বর্ণনা করেছে সেই দেখা হওয়া, সেই চোখে চাওয়া, সেই বুকের মধ্যে কেমন কেমন করা। হাত স্পর্শ করতে চেয়েছিল সুদর্শনটি, চন্দনা আলগোছে সরিয়ে নিয়েছে নিজের হাত। ওর কেবল ভাল লেগেছে চোখে চাওয়াটুকুই, ওটুকুই ওকে বাকি দিন রাত্তির অদ্ভুত আবেশে জড়িয়ে রাখে। প্রেমের মত সুন্দর কিছু আমার মনে হয় জগতে আর নেই। প্রেমের গল্প আমি তন্ময় হয়ে শুনি। কল্পনায় এক রাজকুমার উড়ে আসে পঙ্খীরাজে করে। *আমার এখন ভালবাসার সময়, আমি এখন*

ইচ্ছে করলেই ভালবাসার প্লাবন বইয়ে দিতে পারি..। নিজেও এমন কবিতা লিখতে থাকি।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ঢাকার এক উদীয়মান কবি, সেজুঁতির জন্য কবিতা পাঠিয়েছে। বাঁজে থেকে চন্দ্রবিন্দু তুলে তার *তামাটে রাখাল তুই* কবিতাটি পরের সংখ্যায় ছাপার জন্য রাখি।

বারবার বাঁশি তো বাজে না, বাঁশি শুধু একবারই বাজে।
তামাটে রাখাল তোর বাঁশিটি বাজে না কেন!
বাজে তোর নিঃসঙ্গতা, বাজে তনু, ব্যথিত খোয়াব
গহন সুরের মত বাজে তোর দিবস রজনী-
তবু কেন বাঁশিটি বাজে না।

কবিতার সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে রুদ্র, লাল কালিতে লেখা চিঠি। সেঁজুতির সম্পাদিকার সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায় এবং তাকে *তুমি* সম্বোধন করতে চায় কারণ *আপনি* সম্বোধনটি তার বড় অপছন্দ। সেঁজুতির রং হলুদ কেন প্রশ্ন করেছে। সন্ধেদীপের শিখাটি হলুদ, তাই হলুদ, সোজা উত্তর। পরের চিঠিতে অবলীলায় *তুমি* সম্বোধন করে সে, যেন সে কত আপন আমার! চিঠিতে মানুষকে আপন করে নেওয়া আমার স্বভাবের অন্তর্গত, আমি বিস্মিত হই না।

সেঁজুতির জন্য কবিতা কেবল দুই বাংলার শহর নগর গ্রাম গঞ্জ অলি গলি আনাচ কানাচ থেকে আসছে। কলকাতা থেকে অভিজিৎ ঘোষ, নির্মল বসাক, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, জীবন সরকার এরকম অনেকে কবিতা পাঠাচ্ছেন। নাম দেখে নয়, কবিতা দেখে কবিতা ছাপি। কবিতা ভাল হলে সে নতুন কবি হোক, অজ পাড়া গাঁয়ে তার বাস হোক, পরোয়া করি না। লক্ষ করি, শব্দের বানানে পরিবর্তন চলছে চারদিকে। মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় আনা হচ্ছে। চন্দনা এক লিখতে এ্যাক লিখেছে। আমিও কোরেছিলাম, বোলেছিলাম, দ্যাখা হয়েছে, এ্যাকা লাগছে এরকম লিখছি। নির্মল বসাক কবিতায় প্রায়ই কোনও দাঁড়ি কমা ব্যবহার করেন না। রুদ্র শব্দ থেকে ণ তুলে দিচ্ছে এটি থাকার কোনও কারণ নেই বলে। ঊ, ঈ, ী, ূ, কেও আর জরুরি মনে করছে না। নতুন একটি যতিচিহ্নের উদ্ভাবন করেছে, ইংরেজি ফুলস্টপের মত একটি শুধু বিন্দু, এই যতিতে, কমাতে যতক্ষণ থামা হয়, তার চেয়ে কম থামতে হবে। রুদ্র যখন প্রাণ লিখতে প্রান লেখে, কারণ লিখতে কারণ লেখে, দেখতে অচেনা লাগে শব্দ। তবু সেঁজুতিতে যে কোনও পরিবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছি। ভাষা তো স্থবির কোনও জলাশয় নয় যে থেমে থাকবে! সেজুঁতির টুকিটাকি বিভাগে লিটল ম্যাগাজিনের খবর দিই, ঠিকানাও, যে পড়বে সেঁজুতি সে আরও কুড়ি পঁচিশটি লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। কেবল লিটল ম্যাগাজিনের খবর নয়, কোথায় কবিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে, কে কেমন লিখছেন, কার কি বই বেরোচ্ছে, এসব খবরও সংগ্রহ করে দিতে থাকি। সেঁজুতির ঘোষণা, *একজন নির্ভেজাল কবিতাপ্রেমিক মাত্রই সেঁজুতির অধিকারী। সেঁজুতির উজ্জ্বল আলোয় ঘুচে যাবে কাব্য জগতের সকল কালো। সেঁজুতি সর্বদা সত্য ও সুন্দর।* সেঁজুতির বিনিময় মূল্য *চাট্টে সিকি মাত্র।* কিন্তু চাট্টে সিকির বিনিময়ে যে কেউ সেঁজুতি কিনছে তা নয়। বিজ্ঞাপনহীন পত্রিকা নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে বের করে যারাই কবিতা লেখে বা কবিতা পত্রিকা বের করে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি। পাঠাতেও গাঁটের পয়সা কম খরচা হয় না। *কবিতা পড়ুন, কবিতা পত্রিকা কিনুন, কবিতার বই কিনুন* সাধারণের কাছে এই অনুরোধ জানাচ্ছি সেঁজুতির মাধ্যমে। পুরো জগতটিকে কবিতার জগত না

বানিয়ে আমার স্বস্তি নেই। আমাকে সত্যি সত্যি কবিতায় পেয়েছে। কবিতা আমার রাত্রিদিনের সঙ্গী।

বাড়িতে কেউ নেই, চন্দন ও ফুল হাতে আমি আমি কবিতার পুজোয় বসেছি,
অভিমানে সারাটা দিন নিষ্কর্মার মত বসে থাকি অহেতুক,
দরোজায় দাঁড়িয়ে কৃতঘ্ন শব্দেরা চোখ টিপে সহাস্যে অপমান করে
দুধেল জ্যোৎস্নায় ওত পেতে বসে থাকে নিন্দুক ও সমালোচকের দল

টানা গদ্যে লেখা অভিজিতের দীর্ঘ কবিতাগুলো পড়তে পড়তে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত থেকে বহুদূরে ভাসতে থাকি সময়ের স্রোতে।

রুদ্র সদ্য ছাপা হওয়া তার প্রথম কবিতার বই *উপদ্রুত উপকূল* পাঠিয়েছে। বইয়ের কবিতাগুলো সশব্দে পড়ি, সঙ্গে ইয়াসমিনকেও ডেকে আনি পড়তে। অবকাশের বাতাসে রুদ্রর কবিতার শব্দ। কবিতার গন্ধ। আমাদের মুখে কবিতা। মনে কবিতা।

আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি,
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে
এ দেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত, সেই রক্তাক্ত সময়?
বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে
মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ।
এই রক্তমাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিল
জীর্ণ জীবনের পুঁজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আঁধার
আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায়।
জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।
রক্তের কাফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে, শকুনে খেয়েছে যারে
সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।
স্বাধীনতা, সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন
স্বাধীনতা, সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।
ধর্ষিতা বোনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা।

রুদ্রর কবিতা আমাকে শোয়া থেকে বসিয়ে দেয়। দাঁড় করিয়ে দেয়। বারান্দায় অস্থির হাঁটায়। এমন সত্য কথন, এমন দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ বক্তব্য আমাকে আকৃষ্ট না করে পারে না। রুদ্রর কবিতা সজোরে পড়ার মত, আবৃত্তি করার মত একঘর লোকের সামনে,খোলা মাঠে, জনসভায়। কবিতা আবৃত্তি করা নিতান্তই নতুন নয় আমার জন্য, দাদার ছোটবেলায় মা শিখিয়েছেন দাদাকে, আর আমার বড়বেলায় দাদার কাছে তালিম পেয়েছি আমি, আর আমি শেখাতে শুরু করি ইয়াসমিনকে। ইয়াসমিন ইশকুলের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, কেবল ইশকুলের নয়, ময়মনসিংহ জেলার সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব চলছিল, সেই উৎসবের আবৃত্তিতে নাম লিখিয়ে আসে। ঠিক ঠিক একদিন গিয়ে আবৃত্তি করে তিন তিনটি পুরস্কার পেয়ে গেল, ময়মনসিংহ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাত থেকে ঢাউস ঢাউস রবীন্দ্ররচনাবলী, গীতবিতান, নজরুলের সঞ্চিতা, রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা নিয়ে বাড়ি ফিরল। গীতবিতান খুলে একা একাই ও গান গাইতে শুরু করে। ওর গানে চমৎকার সুর ওঠে, সুর শুনে বার বার বলি, *তর একটা হারমোনিয়াম থাকলে ভাল হইত।* বাড়িতে কোনও বাদ্যযন্ত্র নেই। দাদার বেহালা ভেঙে পড়ে আছে, ছোটদা নিজের গিটার বিক্রি করে গীতাকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন। বাবা গান বাজনা পছন্দ করেন না,

বাবার কাছে ইয়াসমিনের জন্য হারমোনিয়াম কেনার কথা বলা মানে গালে দুটো চড় খাওয়ার ব্যবস্থা করা। গান গাওয়ার স্বপ্ন ইয়াসমিনকে আপাতত হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে হয়। তারচেয়ে কবিতা পড়, কবিতা পড়তে কোনও যন্ত্রের দরকার হয় না।

মাথায় যখন সেঁজুতি, মনে যখন কবিতা তখন আর্কিটেকচারে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য দাদা আমাকে ঢাকা নিয়ে গেলেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটদার বন্ধু রফিকের হোস্টেল-রুমে নিয়ে যান ভর্তি পরীক্ষায় কি প্রশ্ন আসে, কি রকম কি তার সামান্য হলেও যদি তিনি আভাস দেন। রফিক মলিন হেসে বলেন, *কালকে পরীক্ষা, আজকে কি আর দেখাবো!* তবু আমাকে বসিয়ে কাগজ পেন্সিল দিয়ে একটানে একটি সরলরেখা আঁকতে বললেন, একটানে বৃত্ত। আঁকার পর বললেন, *এই ঘরটার ছবি আঁকো।* তাও আঁকার পর বললেন *হাত তো ভালই।* ওই হাত ভাল নিয়ে পরদিন পরীক্ষা দিতে বসে ছবিগুলো, যা আঁকতে বলা হয়েছে, এঁকে দিই। কিন্তু দশটি অঙ্কের একটি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হবে কেন, অঙ্ক নিয়ে তো বসিনি, বসেছি কবিতা নিয়ে। দুঘন্টা পরীক্ষা, কিন্তু একঘন্টা পর পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে দাদাকে নিস্প্রাণ কণ্ঠে বলে দিই, আমার পাশ হবে না। কদিন পর,আশ্চর্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিসঘরের পাশে মৌখিক পরীক্ষায় যাবার জন্য টাঙানো নামের তালিকায় আমার নামটি আছে খবর পাই। মৌখিক পরীক্ষা দিতে ঢাকা যেতে হবে, আমাদের সুটকেস গোছানো সারা। কিন্তু আমাদের যাত্রাভঙ্গ করে বাবা বললেন, *ঢাকা যাওয়ার দরকার নাই।*

কেন, ঢাকা যাওয়ার দরকার নাই কেন? ঢাকা না গেলে তো মৌখিক পরীক্ষা দেওয়া হবে না,না দেওয়া হলে আর্কিটেকচারে আমার ভর্তি হওয়া হবে না! বাবার অনড় অটল মূর্তিটির সামনে এক পাহাড় প্রশ্ন নিয়ে আমি স্তম্ভিত বসে থাকি।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, *আর্কিটেকচারে পড়তে হইব না।*

আমার স্বপ্নের স্থাপত্য হুড়মুড় করে আচমকা ভেঙে পড়ে। হৃদয় জুড়ে ভাঙন নিয়ে একা উদাস বসে থাকি।

আর্কিটেকচারে পড়তে হইব না কারণ *মেডিকেলে পড়তে হইব* আমাকে। আমার নাম উঠেছে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাওয়াদের তালিকায়।

বাবা যা বহাল করেন বাড়িতে, তা যে বছরের পর বছর বহাল থাকে তা নয়। দড়ি তাঁর হাতে, যখন ইচ্ছে ঢিলে করেন, যখন ইচ্ছে শক্ত। তাঁর নেওয়া কিছু কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত থেকে তিনি হঠাৎ একদিন সরে আসেন। আমার কাছে পত্রমিতাদের চিঠি আর না আসতে থাকায় তিনি নতুন আসা ডাকপিয়নকে নতুন করে বাগিয়ে নিয়ে চিঠি হাত করতে চেষ্টা করেন না। ডাকপিয়ন আগের মত বাড়িতে চিঠি দিতে শুরু করেছে। রান্নাঘরের বন্ধ আলমারির তালা খুলে যেভাবে গুনে গুনে সবকিছু দিচ্ছিলেন তাতেও ভাটা পড়ে, তাঁর পক্ষে এত ঘন ঘন নতুন বাজার থেকে প্রতিবেলা রান্না চড়ানোর আগে বাড়ি আসা সম্ভব হয় না। আলমারি এখন খোলাই থাকে। মা আগের মতই সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হন। জরির মা চলে গেলে নানিবাড়ির পেছনের বস্তি থেকে মালেকাকে এনেছিলেন, সেই মালেকাও মাস পার না হতেই চলে গেছে, দুদিন এদিক ওদিক খুঁজে কাউকে না পেয়ে পাড়ার রাস্তায় ভিক্ষে করা হালিমাকে ধরে আনলেন মা। হালিমা তার মা সহ বাড়িতে বহাল হয়ে গেল। টুকটাক সওদা করতে গিয়ে রাস্তায় কোনও এক শিশিবোতলকাগজঅলার সঙ্গে দেখা হয় হালিমার, সেই অলা তাকে বিয়ে করবে বলেছে বলে খুশিতে সে আটখানা থেকে ষোলখানা হয়ে যায়। মা একটি রঙিন শাড়ি দিলেন হালিমাকে, কাগজঅলা জামাইকে একটি নতুন লুঙ্গি। বিয়ে হওয়া হালিমা সদর্পে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। হালিমার মা একাই রয়ে গেল এ বাড়িতে। খুক খুক কাশতে কাশতে একা। একা তার পক্ষে বাড়ির সব কাজ করা কঠিন হয়ে ওঠে। গা প্রায়ই জ্বরে পুড়তে থাকে। যেদিন কাশির সঙ্গে দলা দলা রক্ত বেরোল, মা তাকে হাসপাতালে নিজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করিয়ে এলেন। দু সপ্তাহ পার না হতেই হালিমা ফিরে এল অবকাশে। কি হয়েছে? *জামাই ভাত দেয় না।*

হালিমা আগের মত বাসন ধোয়ায়, কাপড় ধোয়ায়, ঘর মোছায় লেগে গেল। থেকে থেকে কেবল বলে *রাইতে ঘুমাইতে পারি নাই বেডার জ্বালায়।* জ্বালাটি কি ধরনের জ্বালা শুনতে আমরা উৎসুক।

রাইতে ঘুমের মধ্যে শি.. শি.. বোত..ল কা....গজ কইয়া চিল্লাইয়া উডে। সারাদিন রাস্তায় ঘুইরা ঘুইরা কয় ত, রাইতে ঘুমাইয়াও রাইতেরে দিন মনে করে।

এই হালিমা আবার কিছুদিন পর রাস্তায় দেখা আরও এক কিঅলার প্রস্তাবে রাজি হয়ে অবকাশ ছাড়ে।

অবকাশে ভাসমান দরিদ্রদের আসা যাওয়ার খেলা দেখে অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের। কে আসছে কে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে এসব নিয়ে কোনও গবেষণা চলে না। কাজের মানুষ থাকলে মার খানিকটা আরাম, না থাকলে মার কষ্ট। ব্যাপারটি

সম্পূর্ণ মার। কেউ থাকুক বা না থাকুক আমাদের আরামে কখনও কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। আমরা যেমন আছি তেমন থাকি। কাজের মানুষ পেতে আমাদের চেয়ে মার উৎসাহ তাই সবসময়ই বেশি। একবার হাঁটু অবদি তোলা লুঙ্গি, ছেঁড়া একটি গেঞ্জি গায়ে এক লোক ঢুকেছিল মাঠে। জোয়ান বয়স। লোকটিকে দেখেই আমার ডাকাত বলে সন্দেহ হয়। ডাকাত না হলে দা কেন হাতে!

কি চান? চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি জানালায় দাঁড়িয়ে।

কাম করাইবাইন?

কি কাম?

দাওয়ের কাম।

দৌড়ে গিয়ে মাকে খবর দিই, *একটা ডাকাত আইছে। কয় সে নাকি দাও এর কাম করে। দাওএর কাম মানে বুঝছ ত! দাও দিয়া খুন করার কাম।*

মা মশলা বাটছিলেন, বললেন, *খাড়ইতে ক।*

আমি আর ওমুখো হই না। মা মশলা বাটা রেখে দরজা খুলে মাঠে গেলেন। লোকটিকে দিব্যি বাড়ির ভেতরে এনে টিনের ঘরের পেছনের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে এক থাল ভাত দিলেন খেতে, সঙ্গে ডাল তো আছেই, এক টুকরো মাছও। মার কোনও ভয় ডর নেই। এ বাড়িতে এত চুরি হওয়ার পরও মার কাউকে চোর বলে মনে হয় না। ডাকাতির খবরও শোনেন মা, তবু মা কাউকে ডাকাত বলেও মনে করেন না। যখন হাভাতের মত খাচ্ছে লোকটি, মা বললেন, *কি গো মিয়া তোমার কোনও মেয়ে নাই? এই ধর বারো তেরো বছর বয়স।* যুবতী মেয়ে কাজে রাখতে ভয় হয় মার। তাই মেয়ে চাইলে বারো তেরোর বেশি এগোতে চান না। আর বেশি বয়স হলে চল্লিশের নিচে নয়।

লোক বলল, *আফা, আমার একটাই ছেলে, মেয়ে নাই।*

ছেলের বয়স কত?

লোক ছেলের বয়স বলতে পারল না। দাঁড়িয়ে পেট বরাবর বাঁ হাত রেখে মাপ দেখালো, *আমার পেট সমান লম্বা।*

কামে দিয়া দেও ছেড়ারে। কি কও! ফুট ফরমাইসটা ত অন্তত করতে পারব।

লোকটি মার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পরদিন নজরুলকে নিয়ে এল। নজরুল পেটে ভাতে থাকবে। দাওয়ের কাম করতে গিয়ে এ পাড়ায় এলে লোক তার ছেলেকে দেখে যেতে পারবে। লোক যতবার আসে, মা ভাত দেন খেতে। লোক খুশি মনে ছেলেকে একনজর দেখে চলে যায়। নজরুল প্রায় দুবছর মত টানা ছিল এ বাড়িতে। দু বছর পর একদিন পালিয়ে চলে গেল, তারপর মাস দুই গেলে আবার সেই নজরুলকে তার বাবা বুঝিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের কাছে। রাতে সব কাজ শেষ করে সে ঘরে এসে যাত্রার রাজার ভূমিকায় অভিনয় করত। একাই করত। আমরা ছিলাম দর্শক, শ্রোতা। মাঝে মাঝে আমাদের হাত ধরে নিয়ে যেত রানি হওয়ার জন্য মুখোমুখি দাঁড়াতে, হোক না সে সংলাপহীন। *কি রে নজরুল বড় হইয়া কি হইবি রে? যাত্রায় পাট করবি?* নজরুল চিকচিক চোখে বলত, হ। নজরুল রাঁধতে পারত না প্রথম প্রথম। কাপড় ধুতেও পারত না। পরে সব শিখে গেছে। যখন সে তার বাবার বুক সমান লম্বা হল, তাকে দাওএর কাজে লাগানোর জন্য নিয়ে গেল তার বাবা। যাবার দিন মা তাঁর আঁচলে আর তোশকের তলে গুঁড়ো পয়সা যা ছিল, জড়ো করে বারো টাকার মত, নজরুলের বাবার হাতে দিয়েছেন। বাড়িতে কোনও কাজের মানুষ না থাকলে মা নানির বাড়ির পেছনের বস্তিতে চলে যান, ওখানে না পেলে যান ব্রহ্মপুত্রের চরে, চরে ভাঙা বেড়া আর খড়ের ছাউনি

দিয়ে ঘর তুলে দরিদ্র মানুষের বাস, এক ঘরে না পেলে আরেক ঘরে লোক মেলে। লোক না মিললে ভিক্ষে করতে যারা আসে, তাদের দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে দুপুরে ভাত খাইয়ে বেশি করে চাল দিয়ে দেন টোনায়। তারপরও যখন হাহাকার পড়ে, কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ঠেকার কাজ সামলাতে নান্দাইল থেকে কাউকে পাঠাতে বলেন বাবা। বেশির ভাগই বাবার নিজের আত্মীয়। খুব দূরের নয়, কাছেরই। নিজের বোনের মেয়ে। বাবার ছোট দু বোনের বিয়ে নান্দাইলের হালচাষ করা কৃষকের কাছেই হয়েছে। অসুখ বিসুখে বোনেরা এ বাড়িতে এসে ডাক্তার ভাইকে অসুখ দেখিয়ে ওষুধ নিয়ে যায়। বোনের ছেলেরা বড় হয়েছে, একা একাই চলে আসে। আসে টাকা পয়সা সাহায্য চাইতে। দুদিন এ বাড়িতে থাকে খায়, বাবা ওদের ডেকে জমিজমার অবস্থা জিজ্ঞেস করে উপদেশ এবং অর্থ দুটোই বিতরণ করেন। বিয়ের বয়সী মেয়ে নিয়ে বোনেরা আসে। পাত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে, কিন্তু পাত্র চাকরি চায়। গ্রামের জমি চাষ করবে না, শহরে পাত্রীর বড়লোক মামা থাকে, সেই মামা যদি চাকরি যোগাড় করে দেন তবে বিয়ে নচেৎ নয়। বাবা এদিক ওদিক চাকরি খোঁজেন। চাকরি দেনও ওদের। কিন্তু মেয়ে যদি বাবার কাছে বিচার নিয়ে আসে স্বামী মারধোর করে, বাবা বলেন, করুক। স্বামী মারধোর করুক, চাকরির পয়সা পেয়ে দুটো যদি ডালভাত খেতে দেয়, তবে মুখ বুজে স্বামীর সংসার করতে উপদেশ দিয়ে ওদের বিদেয় করেন। আর স্বামী যখন বউ তালাক দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করে, বাবা উঠে পড়ে লেগে যান স্বামীর চাকরিটি খেতে। বাবা তাঁর বোনের মেয়ে সুফির স্বামীকে ক্যাডেট কলেজে বই বাঁধাই করার চাকরি দিলেন। ফুটফুটে একটি মেয়ে হল সুফির। এরপর স্বামী সুফিকে মেরে বের করে দিয়ে আরেকটি বিয়ে করল। সুফি এসে কেঁদে পড়ল বাবার পায়ে। বাবা বলেন, *যা সতিনের ঘরে কাম কাজ কইরা বাঁইচা থাক।* সুফি সতিনের ঘরে অনেকদিন ছিল, শেষে স্বামী আর ওকে ভাত দেয় না বলে চলে এল বাপের বাড়ি। বাপের বাড়িতে ফুটফুটে মেয়ে নিয়ে *বাড়তি ঝামেলা* পড়ে থাকে মুখ বুজে। ওকে একদিন নিয়ে আসা হল শহরে। বাইরের মানুষেরা সুফিকে কাজের মেয়ে বলেই মনে করে। বাড়ির মানুষ কেউ শুধরে দেয় না যে এ কাজের মেয়ে নয়। আমরা মাঝে মাঝে ভুলেও যাই যে সুফি আমাদের ফুপাতো বোন, বাবার আপন বোনের মেয়ে। কারণ সুফি বাড়িতে কাজের মেয়ের মতই কাজ করে। কাজের মেয়ে ঈদের সময় যে কাপড় পায়, সুফিও তাই পায়। যে এঁটোকাঁটা খেতে পায়, সুফিও সেই এঁটোকাঁটা পায়।

ধান ওঠার পর নান্দাইল থেকে বাড়ির লোকেরা যখন আসে, পিঠা নিয়ে আসে, মেড়া পিঠা। পিঠা দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন দাদা। সেই মেড়া পিঠা ফালি ফালি করে কেটে ভেজে গুড় দিয়ে খাওয়া হয়। মাঝে মাঝে বড় পাতিলে করে শিং মাগুর মাছ পানিতে সাঁতার কাটছে, আনেন। কেউ কিছু আনলে মা খুশি হন। মাছ রান্না করে পাতে দিতে দিতে বলেন, *মাছগুলা খুব তাজা ছিল, পুস্কুনির মাছ।* কেউ ঝাল পিঠা আনলে দাদা একাই ভেতরের বারান্দার চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে অর্ধেকই খেয়ে ফেলেন। বাবার বড় বোনের অবস্থা ভাল। নান্দাইলের কাশিরামপুর গ্রামে থাকেন, অনেক জমিজমা, ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করেছে। বড় বোনের মেজ ছেলে রাশিদ শহরের কলেজে লেখাপড়া করেছে। এ বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়ত। অবকাশে থেকে বাবার অনেক আত্মীয়ই লেখাপড়া করেছে। বাবা তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের পড়াতে যত আগ্রহী, বোনের ছেলেদের নয়। চাকরির খোঁজে, অসুখে বিসুখে, লেখাপড়ার কারণে লোক লেগেই থাকে, যে-ই আসে জায়গা হয় টিনের ঘরে, টিনের ঘরে লম্বা বিছানা পাতা আছে

গ্রাম থেকে আসা মানুষদের থাকার জন্য। মার কাঁধে নিজের স্বামী সন্তানসহ বাবার বংশের লোকদের রেঁধে বেড়ে খাওয়ানোর দায়িত্ব। মা দায়িত্ব পালনে কোনওরকম ত্রুটি করেন না। এমনকি গ্রাম থেকে ভর দুপুরবেলা বাড়ি ওঠা অনাহূত অতিথিদের পাতেও ছোট হলেও মাছ মাংস দেন মা। মা অনেকটা জাদুকরের মত। এক মুরগি রেঁধে বাড়ির সবাইকে দুবেলা খাওয়ান, পরদিন সকালেও দেখি রুটির সঙ্গে খাবার জন্য কিছু মাংস রেখে দিয়েছেন। গরুর মাংস সস্তায় মেলে, বাবা সস্তার গরুর মাংস কিনে বাড়ি পাঠান প্রায়ই। এ খেলে আমার দাঁতের ফাঁকে মাংসের আঁশ আটকে থাকে, দাঁত খুঁচিয়ে বেলা পার হয়। বেছে বেছে আমার জন্য হাড় রাখেন মা, বড় হাড় মাংস কম, এ হলে কোনওরকম চালিয়ে নিতে পারি। মুরগির দাম বেশি। মুরগি খেতেও স্বাদ। খেতে স্বাদ হলেও মুরগি খাওয়ার ইচ্ছে দপদপ করলেও মুরগি জবাই কেউ আমাকে দিয়ে করাতে পারেনি। অনেক সময় এমন হয়, মা ব্যস্ত, দোকানের কোনও কর্মচারিরও আসার নাম নেই যে মুরগি জবাই করে দেবে, দাদারাও নেই কেউ, মা আমাকে বলেন জবাই করে দিতে। উঠোনে কাজের হাতে মুরগি ধরে দাঁড়িয়ে, আমার কেবল গলার চামড়া উঁচু করে ধরে আল্লাহু আকবর বলে কাটতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। দা নিয়ে গেছি অনেকদিন। গলার চামড়া ধরে উঠিয়েছিও। দা ও গলার কাছে এনেছি। শেষ অবদি পারিনি। আমার পক্ষে কক্ষনো সম্ভব হয়নি জ্যান্ত মুরগির গলা কাটা। গলা কাটা মুরগি যখন উঠোন জুড়ে লাফায়, দেখলে কষ্টও অমন করে আমার বুকের ভেতর লাফায়। দাদার কোনও কষ্ট হয় না দেখতে। দাদা বেশ উপভোগ করেন মুরগির অমন লাফানো। আমি মাকে অনেক সময় বলেছি,*আমাদের খাওয়ার মজার জন্য মুরগিটার জীবন দিতে হইল!* মা বলেন, *ওদেরে আল্লাহ বানাইছেন মানুষের খাদ্যের জন্য। আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানি দিলে কোনও গুনাহ হয় না।* গুনাহ হয় না মা বলেন, কিন্তু চারমাস উঠোন জুড়ে হেঁটে বেড়ানো, ফার্মের বড় একটি শাদা মুরগিকে, যাকে মা ঝুমঝুমি বলে ডাকতেন, যাকে তাকে কামড় দিত বলে যখন জবাই করার কথা উঠল, মা বললেন, *পালা মুরগিরে জবো করা ঠিক না।* শেষ অবদি জবাই মুরগিটিকে করা হয়েছিল। মা যে কেবল মুখে তোলেন নি কোনও মাংস, তা নয়, উঠোন রক্তাক্ত করে ঝুমঝুমি যন্ত্রণায় লাফাবে এই বীভৎস দৃশ্যটি দেখার আগেই যেভাবে ছিলেন যে কাপড়ে, ওপরে একটি বোরখা চাপিয়ে চলে গেছেন নানির বাড়ি। ওখানে তৃপ্তি করে শাক দিয়ে ভাত খেয়েছেন। মার থেকে থেকে মনে হয়েছে ঝুমঝুমি মাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

ঢাকায় থেকে আসা বার্মা কোরিয়া ঘুরে আসা গীতাকে আমরা বিস্মিত চোখে দেখলেও সে যে মার পুত্রবধূ,মা তা ভোলেন না। পুত্রবধূর হাতে সংসারের দায়িত্ব কিছুটা হলেও দিয়ে নিজে তিনি বিশ্রামের সময় পাবেন ভাবেন। মার ভাবনাই সার। গীতা রান্নাঘরের ছায়াও মাড়ায় না। আগের চেয়ে গীতার ঔজ্জ্বল্য আরও বেশি বেড়েছে। আগের চেয়ে তার হিলজুতো থেকে শব্দ হয় বেশি যখন হাঁটে। ঘাড় অবদি চুল কেটেছে। ভুরুদুটো সম্পূর্ণ চেছে ফেলে কাজল-পেনসিলে দুটো ধনুক এঁকে দেয় ভুরুর জায়গায়। আগের চেয়ে মুখমালিশের জিনিসপত্র বেশি তার। ঠোঁটে কায়দা করে লাল গোলাপি লিপস্টিক লাগায়, চোখের পাতায় রং লাগায়, নীল শাড়ি পরলে নীল রং, সবুজ পরলে সবুজ। আগের চেয়ে সুন্দর শাড়ি পরে, আগের চেয়ে রঙিন। আগের চেয়ে বেশি বাইরে বেড়াতে যায়। আমি আর ইয়াসমিন আগের মতই খানিকটা বিস্ময়ে, খানিকটা মুগ্ধ হয়ে, খানিকটা আহত হয়ে, খানিকটা বুঝে, খানিকটা না বুঝে গীতাকে দেখি। মার আয়নার

টেবিলটির মাথায় তিনটে বাতি লাগিয়ে দিয়েছেন ছোটদা। কড়া আলোর তলে গীতাকে ফর্সা দেখতে লাগে আয়নায়। সেজে গুজে দাঁড়ালে গোলপুকুর পাড়ে সুধীর দাসের মূর্তি বানানোর দোকানে সাজিয়ে রাখা অবিকল দুর্গামূর্তিটি, দশ হাতের বদলে দু হাত, এই যা পার্থক্য। গীতা ফাঁক পেলেই আমাদের ঢাকার গল্প শোনায়। রাহিজা খানমের তিন ছেলেমেয়ের গল্প। শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েগুলোর স্বভাব চরিত্র সব আমাদের জানা হয়ে যায়। বার্মা কোরিয়ার গল্প যখন করে শুনতে শুনতে মনে হয় বার্মা আর কোরিয়া বুঝি আমলাপাড়ার পরের গলিতেই। আগের মতই মা রান্না করে বাড়ির সবাইকে খাওয়ান। *আফরোজা উঠ, কিছু খাইয়া লও,* থেকে থেকে মার ডাক শুনি। ছোটদার জীবনে লেখাপড়া জাতীয় কিছু হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই বলে বাবা তাঁকে উপদেশ দেন *আরোগ্য বিতানে* বসতে। আড়াইশ টাকা মাইনে পাবেন। ছোটদা চাকরিটি লুফে নেন। এই চাকরি নেওয়ার পর দাদার ওষুধের ওপর হামলে পড়া প্রায় পুরোটাই কমে গেছে ছোটদার। তিনি ফুরফুরে মেজাজে দিন যাপন করেন। ফুরফুরে মেজাজে বিকেলবেলা গোলপুকুরপাড়ের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে যান। কালো ফটকে ছোটদার বাইরে যাওয়ার শব্দ হওয়া মাত্রই দৌড়ে গিয়ে সবরি গাছের নিচে মেথরের যাওয়া-আসা করার ছোট দরজার ছিদ্রে চোখ রেখে কলস কলস নিতম্বটি বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গীতা। ওই ছিদ্রে চোখ রাখলেই রাস্তার উল্টোদিকে ডলি পালের বাড়ি, গীতা দেখে ওই বাড়ির দিকে ছোটদার ভুলেও কখনও চোখ পড়ে কি না। বিয়ে হয়ে কাচ্চা বাচ্চার মা হয়ে তালাক হয়ে বাপের বাড়ি পড়ে আছে ডলি পাল। ডলি পালের দিকে ছোটদা এখন আর তাকান না, তারপরও বার্মা কোরিয়া ঘুরে আসা গীতার সন্দেহ মোচন হয় না। গীতার সবকিছু এমনকি সবরি গাছের তলে দৌড়ে গিয়ে ছোটদাকে দেখার কৌতুহলও আমাদের কৌতূহলি করে। গীতার উচ্চারিত শব্দও লুফে নিতে দেরি হয় না। গীতা যে ভাষায় কাজের মানুষদের গাল দেয়, তার বেশির ভাগই আমরা আগে শুনিনি, অর্থও অনেক গালের জানি না। আমেনাকে পানি দিতে বলার পরও দিতে দেরি হচ্ছিল বলে যখন বলল, *বেডি এহনো পানি দেয় নাই। করে কি বেডি? বেডির কি বিগার উঠছে নাহি! বিগার* শব্দটি অর্থ না জেনে ইয়াসমিন এখানে সেখানে ব্যবহার করতে লেগে যায়।

এ বাড়িতে গীতার আদরের কমতি নেই। ঈদ এলে দাদা গীতাকে সিল্কের শাড়ি কিনে দিলেন, মার জন্য সুতি। মার পছন্দ খয়েরি বা লাল রংএর শাড়ি, দাদা কেনেন পাড়অলা শাদা শাড়ি। শাদা শাড়িতেই *মাকে মা মা লাগে,* দাদা বলেন। যে শাড়িই মার জন্য কেনা হয়, মা আমাকে আর ইয়াসমিনকে দেন পরতে প্রথম। আমরা পরে, পরে মানে লুটোপুটি করে শখ মেটালে, পরে মা পরেন। মার অভাব আছে, কিন্তু অভাবের বোধ নেই। শাদা শাড়িটিই, হয়ত দুদিন পরে গ্রাম থেকে কেউ এসে নিজের অভাবের কথা বলে কাঁদল, মা দিয়ে দিলেন। গীতার কাছে রাজিয়া বেগমের নতুন নতুন অনেক কথা শোনেন মা। গীতার খোঁড়া মাসির সঙ্গে, যে মাসির নাম হেনা, যে মাসি আমাদের বাড়ি এসে একসময় আমাকে আর ইয়াসমিনকে পড়াতেন, রাজিয়া বেগমের খুব ভাব। নতুন বাজারের এক এতিমখানার মেট্রন হয়েছেন রাজিয়া বেগম, সেই এতিমখানায় গীতার হেনা মাসিও চাকরি করেন। রাজিয়া বেগমের কথা যত শোনেন মা, তত মার পাগল পাগল লাগে। পাগল পাগল মা বাবা বাড়ি ঢুকলে মুখ বিষ করে বসে থাকেন। বাবা রাগ দেখালে মাও রাগ দেখান। বাবা সেই রাগ দেখানো মাকে তোশকের তল থেকে চাবুক এনে মেরে রক্তাক্ত করে উঠোনে ফেলে রাখলেন একদিন। গলা কাটা

মুরগির মত ত্রাহি চিৎকার করতে করতে মা লাফালেন, মার গা থেকে রক্ত ঝরল, গাছের কাকগুলো কা কা রব তুলে সরে গেল এলাকা থেকে। দৃশ্যটি নৃশংস বলে সামনে যাইনি, ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি আর ইয়াসমিন বসে ছিলাম, বাবার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নেওয়ার শক্তি বা সাহস কোনওটিই আমাদের নেই। আমরা পাথর হয়ে থাকি। বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মিনিট পাঁচ পর ছোটদা ঢোকেন। মাকে উঠোনে পড়ে গোঙাতে দেখে দৌড়ে বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। সোজা আরোগ্য বিতানে। টেবিল থেকে ডাক্তার লেখা ত্রিকোণ কাঠটি নিয়ে *আমার মারে মারছস কেন? তরে আমি আজকে মাইরাই ফেলছি* বলে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাবার ওপর। পুরো নতুন বাজারের লোক জড়ো হয়ে যায় চিৎকার শুনে। ছোটদাকে পাঁচজনে ধরে বেঁধে থামায়। ঘটনা ওদিকে এটুকুই। বাবার কপালের একটি দিক শুধু সামান্য ফুলে উঠেছে। এর বেশি কিছু হয়নি। ছোটদার রক্তারক্তির ইচ্ছে ছিল, সেই ইচ্ছে সফল না হলেও শান্ত হতে হয় তাঁকে। আর এদিকে উঠোনের কাদামাটি থেকে উঠে গীতাকে অদ্ভুত শান্ত গলায় বললেন, *চল আফরোজা, কই যাইতে হয় চল।* রক্তমাখা শাড়ির ওপরই বোরখা চাপিয়ে মা বেরিয়ে যান গীতাকে নিয়ে। আদালতে গিয়ে সত্যিকার তালাকের কাগজে সই করে বাড়ি ফিরে আমার আর ইয়াসমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে *ভাল হইয়া থাইকো তোমরা, মাইনষের মা মইরা যায় না? মনে করবা আমি মইরা গেছি। তোমার বাবা আছে, ভাইয়েরা আছে। তারা তোমাদেরে আদর কইরা রাখবে। তোমরা ভাল কইরা লেখাপড়া কইর* বলে মা নিজের সহায় সম্পদ যা আছে ছোট একটি পুঁটলিতে বেঁধে চলে গেলেন নানির বাড়ি। মা চলে যাওয়ার আগেই গীতার সঙ্গে বাবার বেশ ভাব হয়েছিল। বাবা গীতাকে আলাদা করে ডেকে বাড়িতে কি হচ্ছে না হচ্ছে খবরাখবর নিতেন। বাবার চিরকাল এমনই অভ্যেস, বাড়িতে সব সময় একজন চর নিযুক্ত করেন গোপন খবর পাওয়ার আশায়। কাজের মানুষরাই সাধারণত বাবার চর হিসেবে ভাল কাজ করে। এবারের চর অবশ্য কাজের মানুষ থেকে অনেক উঁচু মর্যাদার বুদ্ধিসুদ্ধি সম্বলিত।

মা যে নেই, মা যেদিন চলে গেলেন সেদিন বুঝিনি। অথবা মা চলে গেলে বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ আগের চেয়ে আরও করতে পারার স্বাধীনতা বেড়ে গেছে বলে একধরনের গোপন আনন্দে ভুগেছিলাম। কিছুদিন পর হাড়ে কেন, মজ্জায় টের পেয়েছি। টের পেয়েছি আমাকে কেউ গা মেজে গোসল করিয়ে দেওয়ার নেই, মুখে তুলে কেউ খাইয়ে দেওয়ার নেই, চুল বেঁধে দেওয়ার নেই। কাপড় চোপড় ময়লা হলে কেউ দেখে না। খেলাম কি না খেলাম কেউ খোঁজ নেয় না। কেউ আর বিকেলে সন্ধেয় ছড়া শোনায় না। আমার কখন ক্ষিধে পেয়েছে, তা আমার জানার আগে মা জানতেন, অস্থির হয়ে উঠতেন আমাকে তৃপ্ত করতে। এখন আমার ক্ষিধে লাগলেই কি না লাগলেই কি, কারও কিছু যায় আসে না। মা চলে যাওয়ার পর সংসার দেখার জন্য নান্দাইল থেকে বাবা তাঁর ছোট ভাই মতিনের বউকে আনিয়েছেন। বউটি ইয়া মুটকি, কুচকুচে কালো। মতিন বিডিআরএ চাকরি যখন করতেন রাজশাহীতে, তখনই বিয়ে করেছেন। বউ নিয়ে কমাস আগে যখন এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন, আমরা মুখ টিপে হেসেছি বউ দেখে। *এক্কেরে মনে হয় কামের বেডি!* কামের বেডির আশপাশ মাড়ায় না কেউ, কিন্তু মা দিব্যি সুখ দুঃখের গল্প বললেন মতিনের বউএর সঙ্গে। যেন বউটি মার দীর্ঘদিনের সই। আমাদের মুখ টেপা হাসির দিকে ফিরে মা বলেছেন, *ও মেসে কাম করত। তাতে কি হইছে।মানুষটা খুব সাদাসিধা।* সাদাসিধা মানুষকে সে *কাজের বেডি* হোক, পথের ফকির হোক, মার পছন্দ। মতিনের বউ এ বাড়িতে রাঁধে বাড়ে, সকলকে খাওয়ায়। কিন্তু মার মত কে হতে

পারে! মার মত কার আবেগ উথলে উঠবে আমাদের জন্য! খাওয়ার সময় কলমি শাক পাতে তুলে দিয়ে বলতেন, *কলমি লতা কলমি লতা জল শুকোলে থাকবে কোথা? থাকব থাকব কাদার তলে, লাফিয়ে উঠব বর্ষাকালে।* মার ছড়ার অন্ত ছিল না। সেই ছোটবেলায় পড়া যে কোনও ছড়াই মা অনর্গল বলে যেতে পারতেন। এত ছড়া মার জানা ছিল যে আমি মাঝে মাঝেই ভাবতাম মার সব ছড়া একদিন লিখে রাখব, কোনওদিন মা ছড়াগুলো আবার ভুলে যান যদি! মা সম্ভবত ছড়াগুলো ভুলে গেছেন, অনেকদিন তো তাঁর ছড়া বলে বলে কাউকে খাওয়াতে হয় না। মন ভাল থাকলে দিদার, সবার উপরে, হারানো সুর, সাগরিকা, বৈজু বাওরা, দীপ জ্বেলে যাই ছবির সংলাপ মা মুখস্থ বলতেন মা। রাতের অনড় স্তব্ধতা ভেঙে চমৎকার গলায় গেয়ে উঠতেন, *এখনো আকাশে চাঁদ ওই জেগে আছে, তবু জেনে গেছি তুমি আছ কাছে....!* এখন দিন রাত রাতের স্তব্ধতা বিরাজ করে বাড়িটিতে।

ইয়াসমিন ইশকুল থেকে ফিরে চেঁচাচ্ছে *আমার ভাত কই?* মতিনের বউ বলে, ভাত নাই। *ভাত নাই মানে? ইশকুল থেইকা আইসা ভাত পাই নাই এইরম ত হয় নাই কোনওদিন।* তা ঠিক, হয়নি কোনওদিন। মা ইশকুল থেকে ফিরলেই ভাত বেড়ে দিতেন। চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে ইয়াসমিন। মতিনের বউ দিয়ে সংসার চলছে না নিশ্চিত হয়ে বাবা গীতার ওপর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব দিলেন। ছোটদার সঙ্গে বাবার যে বচসা হয়েছিল, তা আপনা আপনি মিটে গেল, যেন কোনওদিন বাবার মাথায় কোনও দ্বিকোণ, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ কোনও কাষ্ঠবস্তুর আঘাত লাগেনি। গীতা যা আদেশ করে, মতিনের বউ আর আমেনা সেই আদেশ পালন করে। দিন এভাবেই চলছে। দিন হয়ত চলে, আমার আর ইয়াসমিনের চলে না। গীতা আমাদের নিয়ে ছাদে দৌড়োদৌড়ি করছে, ঘরে নাচের ইশকুল খুলছে, আমাদের সিনেমায় নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু যেন বাকি থেকে যায়। বাবা বাড়ি ফিরেই গীতাকে ঘরে ডাকেন, অনুমান করি রাজ্যির কথা জিজ্ঞেস করছেন, সংসার ছেলেমেয়ের কথা। কেউ আবার কোনওরকম অঘটন ঘটাচ্ছে কি না জানতে চাচ্ছেন। গীতা বাবাকে আশ্বস্ত করেন বলে যে সব কিছু সে নিখুঁত চালাচ্ছে, সবই বিন্যস্ত, সবই সন্নদ্ধ। নিষেধ থাকার পরও এক বিকেলে ইয়াসমিনকে বলি, *চল নানির বাসায় মারে দেইখা আসি।* ইয়াসমিন লাফিয়ে ওঠে। ভয়ডর তুচ্ছ করে একটি রিক্সা নিয়ে দুজন যখন নানির বাড়িতে পৌঁছোই, মা দৌড়ে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

মুখটা এত শুকনা লাগতাছে কেন, খাও নাই?

মাথা নাড়ি, *খাইছি।*

মা কাছে বসিয়ে কি দিয়ে খেয়েছি, কে রাঁধে, কে কাপড় চোপড় গোছায়, কে বিছানা করে দেয় সব পই পই করে জিজ্ঞেস করেন। মুখে তুলে ভাত মাছ খাইয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে দেন। তেল না পড়া জট বাঁধা চুল সযত্নে আঁচড়ে বেণি গেঁথে দেন। আড়ালে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন বাবা কিছু বলে কি না তাঁর কথা। আমি মাথা নাড়ি। বাবা কিছু বলেন না। বাবা যে প্রায়ই আমাদের বলেন *কোনও জ্বালাউরা বেডি বাড়িতে নাই, এহন নিজের খাওয়া নিজে খাইবি, নিজের পরা নিজে পরবি, নিজের বুঝ নিজে বুঝবি* পেটের ভেতর লুকিয়ে রাখি। মা বলেন তিনি ভাল আছেন, নানা তাঁকে শাড়ি কিনে দিয়েছেন, এখানে খাওয়া দাওয়ায় কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, এ বাড়ির সবাই মাকে খুব ভালবাসেন।মা বারবার বলেন এই কদিনে আমি আর ইয়াসমিন দুজনই নাকি শুকিয়ে গেছি। চোখের জলে মার গাল ভিজে যায়, বুক ভিজে যায়।

আমার জন্য মন খারাপ লাগে তুমগোর? মা মা বইলা কান্দো?

আমি আর ইয়াসমিন পরস্পরের চোখে চাই। *কান্দি না* বললে মার যদি কষ্ট হয়, বলি না। নিরুত্তর আমাদের বুকে জড়িয়ে মা বলেন, *না কাইন্দো না, কান্দা আইলে তোমরা গীতার সাথে গপ্প কইর, নাম দেশ ফুল ফল খেইল। এখন থেইকা আর কাইন্দো না।*

মাথা নাড়ি। *আইচ্ছা।*

নোমান কামাল আইল না যে! ওদেরে বইল আসতে।

মাথা নাড়ি। *আইচ্ছা।*

মা খুঁটিয়ে আরও কথা জিজ্ঞেস করেন।

রান্না কেমন হয়?

ভাল হয় না।

কেন ভাল হয়না? মতিনের বউ তো খারাপ রান্ধে না।

ঝাল দেয়।

বইলা দিবা ঝাল যেন না দেয়।

শাকের মধ্যে চুল পাইছি।

শাক ভাল কইরা ধইয়া নিতে কইবা।

আইচ্ছা।

মা, তুমি কি আর কোনওদিন যাইবা না? কণ্ঠে কষ্ট চেপে বলি।

খিলালে দাঁত খোঁচাচ্ছিলেন নানি, থুতু ফেলে বললেন, *কেন যাইব? নিজেরা বড় হ। তারপরে মারে নিয়া থাহিস। ওই বাড়িত ঈদুন আর যাইব না।*

মা বলেন, *নোমানের ত টাকা পয়সা আছে। সে যদি আলাদা বাসা নেয়, তাইলে ত থাকতে পারি।*

অনেকক্ষণ উঠোনে উদাস তাকিয়ে থেকে মা আবার বলেন, *দেইখেন মা, এইবার ওই রাজিয়া বেগমরে বাড়িত আনব।*

তোমার বাবা কি কিছু কয়? রাজিয়া বেগমরে বাড়িতে আনব, এই ধরনের কিছু?

মাথা নাড়ি। *না।*

তোমার বাবা কি বাসায় খায়?

খায়।

খাওয়া পছন্দ হয় তার?

জানি না।

কিছু কয় না?

না।

মা পাংশুমুখে বসে থাকেন। চোখের নিচে কালি মা,বসে থাকেন। গালে চোখের জলের দাগ মা, বসে থাকেন। আমরা যখন চলে আসি, পেছনে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বাসি গোলাপের মত, স্পর্শ লাগলেই ঝরে যাবেন এমন।

গীতার হাতে যখন সংসার, *হাতে সংসার* মানে *কাজের বেডি বা ছেড়ি বা ছেড়া* যেই থাকে কাজে ফাঁকি যেন না দেয়, দেখা; বাসন মাজা কাপড় ধোয়া ঘর মোছা ইত্যাদি কাজ আদেশ দিয়ে বিরামহীন করানো;পটল দিয়ে মাছ হবে, কি শাক দিয়ে মাছ হবে, ডাল পাতলা হবে কি ঘন হবে, আর ভাতের চাল কয় কৌটো নিতে হবে এসব বলে দেওয়া; গীতা যখন মাতব্বর, বাবার সঙ্গে যখন গীতার দহরম মহরম, তখনই একদিন

গীতার ছোট ভাই ভাল নাম শিশির মিত্র, খারাপ নাম টুলু আসে, দেখা করে যায় বোনের সঙ্গে। এরপর প্রায়ই আসে। গীতা ঘরে ডেকে নিয়ে টুলুকে এটা সেটা খেতে দিয়ে ফিসফিস গল্প করে। টুলুর আসার খবরটি আমি আর ইয়াসমিন দুজনেই গোপন রাখি। গীতা মুসলমান বিয়ে করে মুসলমান হয়ে গেছে, তার এখন কোনও হিন্দু বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না, এরকম একটি অলিখিত নিয়ম চালু এ বাড়িতে। গীতা যখন ছোটদাকে নিয়ে নিজের বাড়ি যায়, সে কথা বাড়িতে গোপন রাখে। টুলুর আসার ব্যাপারটিও গোপন।

দাদা নানির বাড়িতে মাকে দেখতে যেয়ে নানির হাতের চমৎকার রান্না খেয়ে নানির পানের বাটা থেকে পান খেয়ে বাড়ি ফেরেন মুখ লাল করে। ছোটদাও সন্ধেবেলা বউ নিয়ে বেরিয়ে বন্ধুদের বাড়ি হয়ে, পিওনপাড়া বউএর বাড়ি হয়ে, নানিবাড়ি গিয়ে মাকে দেখে আসেন। দুজনকেই বলি, *মারে নিয়া আসো না কেন?*

কেউ এর কোনও উত্তর দেন না। না দাদা, না ছোটদা। দিব্যি আছেন তাঁরা। মা-হীন অবকাশ তাঁদের কাছে মোটেও অসহনীয় বলে মনে হয় না।

দাদা একটি মোটর সাইকেল কিনে এনেছেন, লাল রঙের একশ দশ সিসি হোন্ডা।কিনেছেন কিন্তু চালাতে জানেন না। বারান্দার ঘরে রাখা হোন্ডাটি তিনি দুবেলা পরিষ্কার করেন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, হোন্ডায় বসে বিকট শব্দে ইঞ্জিন চালিয়ে ওই ঘরেই আধহাত সামনে যান, আধহাত পেছনে যান। আর হোন্ডার আয়নায় বার বার নিজের মুখটি দেখেন কেমন লাগছে। ইঞ্জিন চালিত কোনও বাহন এই প্রথম আমাদের বাড়ি এল। বাবার হঠাৎ একবার শখ হয়েছিল এম এ কাহহারের বাড়ির লাগোয়া আকন্দ লজের জুলফিকার আকন্দের পুরোনো গাড়িখানা কেনার, বায়নার পঞ্চাশহাজার টাকা দিয়েও দিয়েছিলেন। বাড়ি সুদ্ধ আমরা তখন মনে মনে সেই শাদা ফক্সওয়াগন চালাচ্ছি। কিন্তু ইঞ্জিনে কি না কি দেখা দেওয়ায় সেই গাড়ি বাবা আর কিনলেন না, বায়নার টাকাও ফেরত পেলেন না, ফেরত পাওয়ার নাকি নিয়ম নেই। হোন্ডা কেনাতে বাবাও এর তদারকি করতে লাগলেন। বারান্দার ঘরের দরজা যেন সবসময় বন্ধ থাকে, কেউ যেন আবার চুরি করে না নিয়ে যায় এটি, রাতে তিনি নিজের হাতে ঘরের দরজায় ভেতর থেকে তালা লাগাতে শুরু করলেন। সেই শখের লাল হোন্ডাটি যেটি এখনও রাস্তায় বেরোয়নি, ছোটদা তুলে নিয়ে আমাকে বললেন পেছনে বসতে। ছোটদাও এর আগে কখনও মোটর সাইকেল চালাননি। ঈশ্বরগঞ্জে বাবার হাসপাতালের জিপ চালাতে শিখেছিলেন, সেই জ্ঞান কেবল। হোন্ডা আধমাইল পর্যন্ত যেতে তিরিশবার থামল। রাস্তার লোকেরা থেমে থেমে আমাদের তিরিশবার দেখল। মেয়ে মানুষ হোন্ডায় চড়েছে, দেখার বিষয়টি ছিল এই। মেয়েমানুষ এ শহরে হোন্ডায় বসলেও কৌতূক বা কৌতূহলের বিষয় হয়। অথচ এই শহরে নিতু নিজে মোটর সাইকেল চালায়, বিদ্যাময়ী ইশকুলে পড়ে নিতু, ছোটবোন মিতুকে পেছনে বসিয়ে ইশকুলে যায় প্রতিদিন। শহরের বিস্ময় সে। মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে করে নিতু হতে, কাউকে পরোয়া না করে শহরের পথে মোটর সাইকেল চালাতে। ইয়াসমিন যখন নিতু আর মিতুর কথা বলে, আমি মোহগ্রস্তের হয়ে শুনি।

দাদা হোন্ডা শিখে হোন্ডা চড়ে শহর এবং শহরের আশেপাশের শহরগুলো কোম্পানির কাজে যেতে লাগলেন। একদিন তিনি *চল তরে পাহাড় দেখাইয়া আনি* বলে আমাকে তুলে নেন হোন্ডায়। অপ্রত্যাশিত আনন্দ জানলা ভেঙে হুড়মুড় করে ঢুকে আমার ভুবন ভাসিয়ে দেয়। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে এসে থামতেই আকাশ কালো করে মেঘ দৌড়োতে

লাগল, যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে সূর্যটি, কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে পোড়া সূর্য থেকে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ওই বৃষ্টির মধ্যেই একটি যাত্রীবোঝাই নৌকোর মধ্যে আমরা, দাদার হোন্ডা, দাদা,আমি আর আমার মৃত্যুভয় উঠে পড়ি। নৌকোডুবিতে প্রাণটি যে আজ সকালে হারাতে হচ্ছে এ জেনেও জীবনে প্রথম পাহাড় দেখার ইচ্ছেটি আমি কিছুতেই হাতছাড়া করি না। শম্ভুগঞ্জ পৌঁছে, বাসের বাজারের কোলাহল পেরিয়ে হোন্ডা ছুটে চলল নির্জনতার দিকে। বাতাসে চুল উড়ছে, জামা উড়ছে। যেন এ আমি আর দাদা নই, দুটো প্রজাপতি উড়ে যাচ্ছে। যতদূর দৃষ্টি যায় কোনও বসতি নেই, কেবল বিল হাওড় আর ধানক্ষেত। গলা ছেড়ে হেঁড়ে গলায় গান গাইছি, মুখস্থ কবিতা বলছি, দাদার পেট ভর্তি গল্প, বানানো অবানানো, বলে যাচ্ছেন। দাদা ছোটবেলায় আমাদের গল্প শোনাতেন অনেক। কত আর গল্প জানে একজন মানুষ! দাদা পুরোনো গল্পগুলো আবার শোনাতে গেলে আমরা বিরক্ত হতাম। নতুন গল্পের জন্য জেঁকে ধরতাম। একদিন দীর্ঘ একটি গল্প শোনাবেন বলে আমাদের ডাকলেন। গল্পটি নতুন। খেয়ে দেয়ে লেপের তলায় একেবারে গল্প শোনার পরিবেশ তৈরি করে শোয়া হল, দাদা শুরু করলেন, *অচিনপুর নামের এক গ্রামে আলাউদ্দিন নামের একটা কাঠুরে ছিল।একদিন দুপুরে বাড়িতে খুব খাওয়া দাওয়া কইরা একটা নতুন লুঙ্গি পইরা,কান্ধে একটা গামছা নিয়া আলাউদ্দিন বাড়ির বাইর হইল। সামনে বিশাল মাঠ, কোথাও আর কিছু দেখা যায় না। সেই মাঠে আলাউদ্দিন হাইটা হাইটা যাইতাছে, যাইতাছে তো যাইতেই আছে। যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে ..*

তারপর?

তারপর মানে?

তারপর কি হইল? কই গিয়া পৌঁছল?

এহনো কোথাও পৌছায় নাই? এহনো যাইতেই আছে। যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে যাইতে..

আমি উৎসুক জানতে আলাউদ্দিন কোনও নদীর ধারে পৌঁছোল নাকি কোনও বটগাছের কাছে। কিন্তু আমার জানা হয় না কারণ দাদা ওই রাতে এক *যাইতে যাইতে* ছাড়া আর কিছু বললেন না। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, *তারপর কি হইল, আলাউদ্দিন কই গেল?* দাদা বললেন,*এহনো যাইতেই আছে। এহনো যাইতেই আছে?*

হ এহনো যাইতাছে।

কই যাইব?

ওইডা ত পরে জানবি। আগে যাইতে থাকুক।

সপ্তাহ পার হওয়ার পরও দাদা বললেন, *যাইতাছে এহনো।* কবে পৌঁছবে, কোথাও গিয়ে পৌঁছবে, কি ঘটবে পরে তার কিছুই দাদা জানান না। নতুন কোনও গল্প শুরুও করেন না। কারণ একটি গল্প তো তিনি বলছেন। একমাস পরও দাদা বললেন এখনও আলাউদ্দিন যাচ্ছে। আমি আর ইয়াসমিন গভীর চিন্তায় ডুবে থাকি, *তর কি মনে হয়?আলাউদ্দিনের শেষ পর্যন্ত কি হইব?* ইয়াসমিনের বিশ্বাস আলাউদ্দিন ক্ষিধের চোটে মরে যাবে পথে। দাদার কি বিশ্বাস তা তিনি কখনও বলেন না। দাদার আলাউদ্দিনের যাওয়া কখনও শেষ হয়নি। দাদার কাছ থেকে আর কোনও গল্পও আমাদের শোনা হয়নি। যেতে যেতে আমার ইচ্ছে করে আমাদের এই পথও না ফুরোক কোনওদিন। তারাকান্দা ফুলপুর পার হয়ে কাঁচা রাস্তা পাকা রাস্তা ভাঙা রাস্তা পেরিয়ে কংস নদীর

সামনে আসি। বিষম স্রোতের নদী। যেন দুপাড় এক্ষুনি ভেঙে চুরে নদীর পেটের ভেতর ঢুকে যাবে। দুটো নৌকোর একটি পাটাতন, সেই পাটাতনের ওপর বাস ট্রাক ওঠে, দড়ি টেনে নদী পার করা হয়। নদী পার হতে হতে দাদা আমাকে উজান, ভাটি, লগি টানা কাকে বলে বোঝান, নদী এবং নৌকোর জীবন সম্পর্কে বোঝান। কংস পেরিয়ে আবার হাওয়ার বেগে ছোটা। ধান খেত, পাট খেত, রাস্তার ওপর শুকোতে দেওয়া ধান, পাখির এসে খুঁটে খাওয়া, মানুষের বাড়িঘর, উঠোন মাঠ দেখতে দেখতে হালুয়াঘাট পার হয়ে আরও ভেতরে গারো মেয়েদের ধানবোনা ধানকাটা, পিঠে বাচ্চা বেঁধে হেঁটে যাওয়া দেখতে দেখতে জয়রামকুরায় সুন্দর একটি হাসপাতালের সামনে থামি। এক অস্ট্রেলিয়ান গারোদের জন্য এই হাসপাতালটি বানিয়েছেন। দাদা অস্ট্রেলিয়ান ডাক্তার নেইল পালকারের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁকে ওষুধ পত্র দিলেন। আমি হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহাড় দেখছি তখন। পাহাড়ের অন্য পাশে ভারত। বাংলাদেশ থেকে মেঘ ভেসে যাচ্ছে ভারতের দিকে, পাখি উড়ে আসছে ওদিক থেকে এদিকে। দাদাকে জিজ্ঞেস করি, *পাহাড় পার হইয়া ওই পাশে যাই যদি!* দাদা বললেন *না যাওয়া যাবে না, ওইটা অন্য দেশ।* পাহাড়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে অন্য দেশ ভারত, আমার মনে হয় আমি শুনতে পাচ্ছি ভারতের হৃদপিণ্ডের শব্দ, শুনতে পাচ্ছি শ্বাস ফেলার শব্দ। এত কাছে, এত কাছে ভারত যে ইচ্ছে করে কানে কানে কিছু কথা কই। কই *ভাগ হলি কেন রে? তুই কি আমাদের পর?* পাহাড় দেখে ফেরার পথে দাদা অনেকের সঙ্গে থেমে থেমে কথা বললেন। দুটো ফার্মেসিতে থামলেন, চা মিষ্টি দেওয়া হল আমাদের। সারাদিন না খাওয়া অথচ ক্ষিধের কিছুই অনুভব করি না। ফার্মেসির একটি লোক পেছনে তাঁর বাড়িতে বউ বাচ্চার সঙ্গে পরিচয় করাতে ঢোকালেন, বউএর সঙ্গে দিব্যি কথা বলি এমনকি বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে নাম জিজ্ঞেস করি। ওখান থেকে বেরিয়ে পথে দাদা বলেন, *বাহ, তর তো উন্নতি হইছে। তুই ত এমনিতে মানুষের সাথে কথা কস না। আজকে কইতে দেখলাম।*

আমি হেসে বলি, *সকালে ডেল কার্নেগি পড়ছি কয়েক পাতা। মনে হয় সেই কারণেই।*

দাদা অট্টহাসি হাসেন। আমরা আবার হাওয়ায় ভেসে যাই।

দাদাকে এক সময় জিজ্ঞেস করি, *আচ্ছা দাদা, এই যে তুমি সবার সাথে এত সুন্দর ব্যবহার কর, হাইসা হাইসা কথা কও, সেই নিশিবাবুর সাথে, মাথায় হ্যাট গলায় স্টেথোককোপ ঝুলাইয়া মাটির রাস্তায় সাইকেল চালাইয়া আসা হাতুড়ে ডাক্তারটার সাথে, কেমিস্ট নাজমুলের সাথে, জনমানবহীন এই বনবাসে জীবন কাটানো হাসপাতালের ওই ডাক্তারের সাথে--তুমি কি ডেল কার্নেগি মুখস্ত করছ?*

দাদা অনেকক্ষণ হেসে উত্তর দেন, *ডেল কার্নেগি তো আমার সাথে দেখা করতে আইছিল, আমার লাইফটা দেইখা গিয়া উপদেশমূলক রচনা লিখছে।*

ছোট ছোট কাপে চা বিক্রি করে পথের ধারে ঝুপড়িগুলোয়, চায়ের তৃষ্ণায় থেমে ওখানে চা খেতে গেলে দাদা বলেন, *চা খাইস না, চা খাইলে ভেতরে ক্ষয় হইয়া যায়। দেখস না চায়ের কাপে চা রাইখা দিলে কিরম দাগ পইরা যায়, শত চেষ্টাতেও চায়ের কাপের দাগ আর উঠতে চায় না। এইভাবে তর কইলজা ক্ষয় হইয়া যাইব চা খাইলে, তর হৃদপিণ্ডটাও চায়ের কাপের মত নষ্ট হইয়া যাইতাছে। বীভৎস হইতাছে। ঝাঁঝরা হইয়া যাইব একদিন।*

মা দুধছাড়া চায়ে আদা মিশিয়ে দেন, সেই চায়ের স্বাদের ধারে কাছে গ্রামের বাজারের দুধমেশানো বাসিগন্ধের চা দাঁড়াতে পারে না। তবুও এই ঝুপড়িদোকানের চা আমি পরমানন্দে পান করি, পান করি ঘরের বাইরে বলেই। বাহির আমাকে টানে। সর্ষে ফুলে ছেয়ে থাকা গ্রামের হলুদ ক্ষেত আর বাজারের নানারকম ঝুপড়ি দোকান দেখতে আমার আনন্দ হয়। ব্রহ্মপুত্র পার হওয়ার সময় অদ্ভুত সুন্দর রঙে সেজে ওঠা আকাশ দেখতে দেখতে ভয় উবে যায়, নৌকো ডুবে মরে যাওয়ার ভয়। যখন বাড়ি পৌঁছই, সারা গা ধুলোয় কিচকিচ, এমন কি কথা বলতে গেলে দাঁতে কিড়কিড় করে ওঠে ধুলো। ধুলোয় চুল জট হয়ে আছে। দেখতে আমাকে, ইয়াসমিন বলে, ভূতের মত লাগছে। ভূত পেত্নী যেমনই দেখাক না কেন আমাকে, এই ভ্রমণ আমাকে আশ্চর্য রকম সুখী করে। অর্ধেক রাত অব্দি দাদাকে ধমকেছেন বাবা, *তর মাথায় ত বুদ্ধি টুদ্ধি আছে জানতাম। এই মেয়েরে নিয়া তুই মোটর সাইকেলে বাইর হস, মাইনষে কি কইব!*

রাতে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চোখ, ইয়াসমিনকে বলি, *ধর আমি একটা পাহাড়, আমার শরীরের অর্ধেকটা ভারত, অর্ধেকটা বাংলাদেশ। আমার ডান হাত বাঁদিকে যাইতে পারবে না, আমার বাঁ হাত ডান দিকে আসতে পারবে না। কিন্তু আমার ওপর দিয়া তুই যদি পাখি হস, যাইতে পারবি। পাখির স্বাধীনতা মানুষের স্বাধীনতার চেয়ে বেশি।*

নানির বাড়িতে আমরা গিয়েছি, সে খবর বাবার কাছে পৌঁছে যায়। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, *ঠ্যাং লম্বা হইয়া গেছে তর। আরেকদিন যদি শুনি বাসার বাইর হইছস, টেংরি ভাইঙ্গা ফেলব।* বাবার হুমকি কাজ করে না। আমি ঠিকই নানির বাড়ি যেতে থাকি। মাকে বলি, *মা চল।* নানি বলেন, *তুই কইলেই হইব নাকি! নোমান কামালরে পাঠা, তর বাপরে পাঠা। তর বাপ আইয়া নিয়া গেলে যাইতে পারে।* শুকনো-মুখ-মা, শুকনো- ঠোঁট-মা বলেন, *ওর বাপ কি আসবে? মেয়েদুইটার কষ্ট দেইখাও ত মুখ বুইজা রইছে। কি জানি যদি রাজিয়া বেগমরে বাড়িত তুলে, তাইলে তো আর কারও না হোক, মেয়েদুইটার কষ্ট হবে!*

নানির বাড়িতে যাওয়ার আসার পথে দেখি আজিজ প্রিন্টার্স নামে একটি ছাপাখানা।রিক্সা থামিয়ে সেই ছাপখানায় নেমে ডিমাই সাইজ প্রতি ফর্মা ছাপতে খর্চা কত জেনে আসি। এরপর দাদার কাছে টাকা চেয়ে কাগজ কিনে ছাপাখানায় দিয়ে ওখানে বসেই সেঁজুতির দ্বিতীয় সংখ্যার প্রুফ দেখি। মোহাম্মদ আজিজ নামের লোকটি ছাপাখানার মালিক, দাদা চেনেন তাঁকে, দাদাও মাঝে মাঝে দেখে আসেন ছাপা কদ্দুর। একদিন ছাপার বাকি খরচ দিয়ে বাড়িতে সেঁজুতি নিয়ে আসেন। সেঁজুতি এবার শাদা কাগজে, দাদা একটি কপি হাতে নিয়ে বললেন, *নাহ, ছাপা ভাল হয় নাই। এরপর থেইকা জমানে ছাপাইস। জমান হইল সবচেয়ে ভাল প্রেস। পাতা পত্রিকা ত জমান থেইকাই ছাপতাম।* দাদা যখন তাঁর এককালের পাতার কথা স্মরণ করেন, তাঁর চোখ থেকে ঝিলমিল আনন্দ ঝরে। পাতা নামে দাদা আর তাঁর বন্ধুরা মিলে যে সাহিত্যের কাগজ প্রকাশ করতেন, তা আসলেই খুব সুন্দর ছিল। পাতার চিঠি লেখার কাগজ, এমনকি সদস্য হওয়ার কাগজ, সদস্যচাঁদা নেওয়ার রশিদ এসবও ছাপা ছিল চমৎকার জলছাপঅলা, দাদা এখনও স্মৃতি হিসেবে পাতার কাগজপত্র রেখে দিয়েছেন কাছে। মাঝে মাঝে বের করে ধুলো ঝেড়ে হাত বুলোন আর বলেন, *দেখিস পাতা আমরা আবার ছাপাইয়াম।* যে তিনজন পাতা ছাপতেন তার মধ্যে একজন শীলার ভাই, শীলার সঙ্গে দাদার প্রেম হওয়াতে *চিকন ফরহাদ* দাদার মুখদর্শন করা বন্ধ করে দিয়েছেন, আরেকজন মাহবুব, ও ছেলে পাগল হয়ে এখন মানসিক রোগীর হাসপাতালে শেকল

দিয়ে বাঁধা। দাদা একটি কেন দশটি সাহিত্যপত্রিকা ছাপতে পারেন ইচ্ছে করলে কিন্তু পাতা নামটি ব্যবহার করতে পারবেন না। পাতা দাদার একার সম্পত্তি নয়। দাদা ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক, আসল সম্পাদক ছিলেন ফরহাদ। দাদা বলেন, *ফরহাদ আর কি করত, সব ত আমিই করতাম!* তা বলে স্বস্তি জোটে অবশ্য, কিন্তু কোনও পত্রিকার নাম পাতা দেওয়ার অধিকার জোটে না। দাদা আবার পত্রিকা বের করতে চান পাতা নামে, খবরটি শুনে ফরহাদ জানিয়ে দিয়েছেন, দাদার বিরুদ্ধে তিনি মামলা করবেন।

আমি যখন সেঁজুতিতে ডুবে আছি, একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে বাড়িতে। ইয়াসমিনের পিঠে ছোট্ট একটি পাখা গজায়। পাখা গজানোটি ভয়ঙ্কর নয়, পাখা গজানোর কারণে যেটি ঘটে, সেটি ভয়ঙ্কর। ইয়াসমিনের এই পাখি হওয়ার ইচ্ছে কোনও ভারত বাংলাদেশ সীমানা অতিক্রম করার জন্য নয়, তার নির্দিষ্ট গন্ডির বাইরে একদিন খুব গোপনে উড়ে যাওয়ার জন্য। পাড়ার ফুটফুটে ছেলে বাদল, ইয়াসমিনেরই সমবয়সী, দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তায় ইয়াসমিন যখন ইশকুলে যেত, একদিন সাহস করে এগিয়ে এসে কথা বলেছে। রাস্তায় কথা বললে আবার কে না কে দেখে ফেলে কি না কি কাণ্ড ঘটায়, তাই পরদিন সে ইয়াসমিনকে *বোটানিক্যাল গার্ডেনে* যেতে বলে। গন্ডি থেকে বেরোবার এমন তীব্র আকর্ষণ ইয়াসমিনের, সে ইশকুল শেষে একটি রিক্সা নিয়ে সোজা সেই গার্ডেনে যায়। বাদল গিয়েছিল তার এক কাকাকে নিয়ে। সেই কাকা বাদল আর ইয়াসমিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাছপালা দেখছে, বাগান জুড়ে ফুটে থাকা নানা রঙের ফুল দেখছে, নদী দেখছে, কিন্তু দেখছে না ওদের দেখে পাড়ার একটি ছেলের বাবাকে খবর দেওয়ার জন্য দৌড়ে যাওয়া। খবর পেয়ে বাবা এক মুহূর্ত দেরি না করে সেই গার্ডেনে নিজে গিয়ে ধরে আনেন ওদের। বাদলকে চুলের মুঠি ধরে বাড়িতে এনে হাত পা শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে বারান্দার ঘরে সারা বিকেল চাবকেছেন বাবা। বাদলের আর্তনাদে সারা পাড়া কেঁপেছে, বাবা পরোয়া করেননি। অর্ধমৃত বাদলকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বাড়ির বের করেন, তাও আবার পুলিশের হাতে দিতে। মেয়ে-কিডন্যাপের মামলা ঠোকেন সেদিনই, বাদলকে কোমরে দড়ি বেঁধে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। জেল থেকে ছেলে ফিরে এলে এ পাড়া ছেড়ে বাদলের বাবা সমীরণ দত্ত চলে যান। কেবল বাদলকেই নয়, ইয়াসমিনকে ঘরের দরজা বন্ধ করে বাবা মেরেছেন একই চাবুকে।ওর শরীরের একটি ইঞ্চিও বাদ ছিল না কালসিটে দাগ থেকে। হু হু করে জ্বর আসে ওর, মাথার ঘন কালো চুল মুঠো মুঠো উঠে আসতে থাকে। এই ঘটনার পর ইয়াসমিন প্রায়ই ইশকুল থেকে ফিরে মন খারাপ করে বসে থাকে। ইশকুলে ওর ক্লাসের মেয়েরা বলতে শুরু করেছে, *তুই নাকি কোন ছেড়ার সাথে ভাইগ্যা গেছিলি গা?* ময়মনসিংহকে খুব বড় শহর বলে মনে হয়, কিন্তু লোকে যখন রসের গল্প বলতে গিয়ে, *রজব আলীর ছোট মেয়ে একটা ছেলের সাথে ভাইগ্যা গেছিল, হাহা হিহি* বলে আর এসব আমার কানেও যখন আসে, বুঝি শহরটি বড় ছোট। মানুষের মনও বড় ছোট। বাবা যদি সেদিন ওই ঘটনাটি না ঘটাতেন, ইয়াসমিন ওই গার্ডেন থেকে ফিরে আসত বাড়িতে, *দেরি হইছে কেন ইশকুল থেইকা ফিরতে* জিজ্ঞেস করলে হয়ত বলত, *রিংকুর বাসায় গেছিলাম।* ওর বান্ধবী রিংকু, ইশকুল শেষ হলে রিংকুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসা এমন কোনও অপরাধ নয়। সেদিন ইয়াসমিনের কৌতূহল বাদলের জন্য যত ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল গার্ডেনের জন্য। সেই গার্ডেন একবার দেখা হয়ে যাওয়ার পর ওর গার্ডেনের শখ হয়তো মিটত, গোপনে গোপনে গন্ডির বাইরে যাওয়ার আনন্দ ও পুষে রাখত নিজের ভেতর। কেউই ইয়াসমিনের দিকে ছুঁড়ে দিত না কোনও *ছেড়ার সাথে ভাইগ্যা যাওয়ার* জন্য

ঘৃণা। ইয়াসমিন নিজেকে এমন অপরাধী ভাবত না, সকলের চক্ষু থেকে এমন প্রাণপণে লুকোতে চাইত না নিজেকে।

গীতা টুলুকে কিছু দিয়েছে, বস্তায় করে। ছোট্ট খবর। এই খবরটি বাবার কানে পৌঁছয়। বাবা দাপাদাপি করেন ঘরে। ফিসফিস কণ্ঠ, *কি দিছে রে কি দিছে?*

কি জানি, চাইল টাইল মনে হয়। আমেনা বলে।

টুলু কয়দিন আইছে?

আইছে অনেকদিন।

আইয়া কি করে?

এই গপ্প সপ্প করে।

কার সাথে করে?

তার বইনের সাথেই।

বাবা যখন গভীর করে কিছু ভাবেন, চশমা খুলে ফেলেন এক টানে। মাথা নিচু করে বসে থাকেন। চোখ মুহূর্তে হয়ে ওঠে লাল। পায়চারি করেন বারান্দায়। হাতদুটো পেছনে। কখনও কোমরে। মাঝে মাঝে এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল টেনে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছেন। বসছেন চেয়ারে, চেয়ার সশব্দে সরিয়ে উঠে যাচ্ছেন। আবার বসছেন। বাবাকে এ অবস্থায় দেখলে বাড়ির সবার একটিই কাজ, অপেক্ষা করা, কারণ একটি বিস্ফোরণ ঘটতে যাচ্ছে খুব শিগগির। কিন্তু এবার বিস্ফোরণ কিছুরই হল না। শান্ত কণ্ঠে তিনি দাদাকে ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, *যা তর মারে নিয়া আয়।*

আমরা যখন মাকে নিয়ে আসতে গেলাম, মা চমকালেন না, যেন অপেক্ষা করেই ছিলেন। মার ওই শুকনো মুখে হাসি ফুটে উঠল, মা আড়াল করতে পারেন না কোনও আনন্দ। চোখে ঠোঁটে গালে খুশির রেণু চিকচিক করে।

অবকাশে মার উপস্থিতি বাবা আড়চোখে দেখেন। কোনও কথা বলেন না। কিন্তু মা ঠিকই বাবার ভাত টেবিলে সাজিয়ে রাখেন। বাবা যেভাবে সংসার চালাতে বলেন, আগের চেয়ে আরও নিপুণ ভাবে সেই সংসার চালাতে থাকেন। ঘরের মেঝেগুলো ঝকঝকে, উঠোন তকতকে। বাবার ঘরটি আলোময়, পরিচ্ছন্ন। আলনায় কাপড় ধোয়া, গোছানো। বিছানায় পরিষ্কার চাদর। রাতে বাবা বাড়ি ফেরার আগেই বাবার বিছানা মশারি টাঙিয়ে তৈরি করে রাখা। আমাদের চুল বাঁধা, চুলে ফিতের ফুল বাঁধা। ক্ষিধে লাগার আগেই আমাদের খাওয়ানো, পানি চাইতেই পানি দেওয়া। না চাইতেই ডাবের পানি, বেলের শরবত, ডাশা পেয়ারা, পাকা আম, জাম ভর্তা, ডালিমদানা হাতের কাছে, মুখের কাছে। মার উপস্থিতি আমাদের সবাইকে আরাম দিতে থাকে।

চিকিৎসাবিদ্যা

মেডিকেল ভর্তি হওয়ার জন্য এ বছর কোনও পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়নি। মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েটের পরীক্ষার ফল দেখে ভর্তি, বারোশ নম্বরের ওপর যাদের আছে, তাদেরই নেওয়া হয়েছে। দু পরীক্ষায় বারোশর কিছু বেশি ছিল আমার, ময়মনসিংহ যদিও আমার প্রথম পছন্দ, নম্বর যেহেতু তেরোশ-চৌদ্দশ নয়, পছন্দ বাতিল করে আমাকে পাঠানো হয়েছে সিলেট মেডিকেলে। মুহূর্তে তৎপর হয়ে ওঠেন বাবা, নানা রকম দরখাস্তে আমার সই নেন। দাদাকে বললেন তৈরি হতে। দাদা আমাকে নিয়ে শেষরাতের ট্রেনে চড়লেন। আখাউড়া ইস্টিশনে সকালে ট্রেন থামল, এখান থেকে ট্রেন বদলে সিলেটের ট্রেনে উঠতে হবে আমাদের। ইস্টিশনে পানিঅলা, বিড়িঅলা, বাদামঅলা, ঝালমুড়িঅলা কলাঅলা পানঅলা বিস্কুটঅলার ভিড়ে আমি হারিয়ে যাই, দাদা আমাকে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেন মেয়েদের অপেক্ষা করার একখানা ঘর আছে, সেখানে। কিছু বোরখাঅলা, কিছু বোরখাহীন, কিছু ট্যাঁ ট্যাঁ, কিছু আ আ, কিছু গু, কিছু মুত, কিছু বমি, সবকিছুর মধ্যিখানে ভদ্রলোকের মেয়ে ইস্ত্রি করা জামা পাজামা, বসে থাকি। আখাউড়া ইস্টিশন থেকে ট্রেন ছাড়ছে সিলেটের, নাগারে লোক উঠছে, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, খালি পা, জুতো পা, টুপিমাথা, টুপিছাড়া--সুটকেস, ট্রাংক, বস্তা, ঠেলাঠেলি ভিড়। মেয়েমানুষ বলে আমাকে বসার একখানা জায়গা দেওয়া হয়েছে, মেয়ের ভাই বলে দাদাও ঠেলেঠুলে বসার একটি জায়গা করে নিলেন আমার পাশে, পরপুরুষের গায়ে যেন আমার গা না লাগে। *সেকেন্ড ক্লাসে* ওঠা *থার্ড ক্লাস* লোকগুলো *সিট দখলে যায় না,* মেঝেতেই পাছা পেতে বসে থাকে, কারও সামনে বস্তা, কারও সামনে খোলা দরজা গলে আসা লু হাওয়া। কোণে জড়সড় জবুথবু কটি মেয়েমানুষ, নাকে নথ, মুখে খিল। বুক পকেটে টিকিট রেখে ,*সেকেন্ড ক্লাস* পুরুষেরা খলবল করে কথা বলে যাচ্ছে, কান পেতে থেকেও বুঝতে পারি না একটি শব্দও।

ও দাদা কি ভাষায় কথা কয় এরা?

সিলেটি ভাষা সিলেটি ছাড়া আর কারও বাপের সাধ্য নাই যে বোঝে বলে নিরুদ্বেগে দরদাম করে এক ঠোঙা বাদাম কিনে, সঙ্গে এক চিমটি ঝালমশলা, দাদা বেশ মন দিয়ে খেতে লাগলেন। ভিড়ে গরমে চেঁচামেচিতেও আমার আনন্দ হতে থাকে নতুন একটি শহরে যাচ্ছি বলে। দাদা আমাকে জানলা থেকে দূরের একটি মাঠ দেখিয়ে বললেন *ওই যে মাঠটা দেখতাছস, ওই মাঠটার ওইপারেই হইল ভারত।* ইচ্ছে হয় দৌড়ে মাঠটি পেরিয়ে যাই, দেখে আসি ভারত দেখতে কেমন, ভারতের আকাশ দেখতে কেমন। ট্রেন যায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার জলে ভিজতে ভিজতে, চা বাগানের কিনার ধরে, অন্ধকার

অন্ধকার অরণ্য ডিঙিয়ে। হাত বাড়িয়ে দিই জানলার বাইরে, আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ঝুলে পড়া ডালে, পাতায়।

নতুন একটি শহরে পা দিয়ে খুশির ফোয়ারা ওঠে মনে। এটি ময়মনসিংহ নয়, অন্য একটি শহর, এই শহরের অন্য একটি নাম, নিজেকে বোঝাতে বারবার পড়ি দোকানের সাইনবোর্ড। স্টেশন রোড, সিলেট। পুরান বাজার, সিলেট। দরগা রোড, সিলেট। এ শহরে দাদা আগে এসেছেন বলে জানেন কি করে কি করতে হয়, এখানকার রিক্সাঅলাদের ডাকতে হয় *ড্রাইভার,* রিক্সাঅলা বলে ডাকলে বিষম রাগ করে। একটি চৌকোনা রিক্সায় চড়ে আমরা শহরে ঢুকে পড়ি, ছোট একটি রেস্তোরাঁয় অসম্ভব ঝাল খাবার খেয়ে একটি হোটেলে শুতে যাই। জীবনে প্রথম কোনও হোটেলে রাত কাটানো আমার। দাদা বেঘোরে ঘুমোন। পাশের ঘর বা বারান্দা থেকে আসা খরখরে কথা আর হাসির শব্দে আমার হাত পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যায়। এক্ষুনি বুঝি লোকগুলো দরজা ভেঙে এ ঘরে ঢুকবে, এক্ষুণি বুঝি আমাকে কেটে টুকরো করবে, ছিঁড়ে খাবে, আমার সর্বনাশ করবে। দাদাকে আমি কাঁপা গলায় নিচু স্বরে, উঁচু স্বরে, কান্না স্বরে ডেকে যাই। দাদার ঘুম ভাঙে না। এক লাফে দাদার বিছানায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে জাগাই, ঘুমচোখে *কি হইছে* বলে পাশ ফিরে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। ধড়ফড় বুক নিয়ে দাদার বিছানার এক কিনারে গুটি মেরে শুয়ে থাকি, সারারাত ঘুমোতে পারি না। ভোরের আলো ঘরে এলে, ঘরের বাইরের খরখরে গলা থেমে এলে আমার ধড়ফড় থামে।

তুই রাইতে ডরাইছিলি নাকি?

হ।

আরে ধুর! এত ডরাস কেন!

সকালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে, বদলির চিঠি জমা দিয়ে আমরা ট্রেন ধরলাম, ট্রেন সারারাত ধরে অন্ধকার অরণ্য পেরোলো, আর আমার গা ছমছম করল সারারাত।

সিলেট থেকে ফিরে আসার পর শাদা টেট্রনের কাপড় কিনে দুটো এপ্রোন বানিয়ে দিলেন বাবা, এপ্রোন পরে কলেজে যেতে হবে। নিজের শহরের কলেজে, বাপের কলেজ, বাড়ি থেকে দুদিনের পথ পাড়ি দিয়ে নয়, গাঙ্গিনার পাড় পেরিয়ে রেললাইন পেরিয়ে পুরোনো আবাসিক ইশকুল পেরিয়ে চড়পাড়ার মোড় ছাড়িয়ে যে কলেজ, সে কলেজে। জোয়ান রিক্সাঅলা হলে পনেরো মিনিট, বুড়ো হলে পঁচিশ। সিলেটের পাট চুকিয়ে ময়মনসিংহে। আদেশ মত এপ্রোন পরে কলেজে যাই, এপ্রোনের তলে জামা পাজামা, ওড়না পরার ঝামেলা নেই, এপ্রোনের তলে ওড়না আছে কি নেই তার খোঁজ কেউ নেয় না। এই ঘটনাটি আমাকে আনন্দ দেয় বেশ। ওড়নার বাধ্যবাধকতা নেই। যে কেউ, ছেলে বা মেয়ে, যে পোশাকই পরুক না কেন, ওপরে চাপাতে হবে শাদা এপ্রোন। এপ্রোনে কোটের কলারের মত কলার আছে, পকেট আছে, কোমরে বেল্ট আছে--পরে পুলক লাগে আমার। কলেজে সব অচেনা মুখ। বেশির ভাগের বাড়ি ঢাকায়, থাকে হোস্টেলে, আমি আর হাতে গোনা দুএকজন কেবল শহরের। মেয়েদের ইশকুল কলেজে পড়ে আসা মেয়ে আমি, ছেলেছোকরা দেখে অভ্যস্ত নই, আর এখানে ক্লাসে, করিডোরে, মাঠে, সিঁড়িতে বাঁকা চোখের, হাসি চোখের, তেরচা চোখের, হাঁ হয়ে থাকা চোখের সামনে নিয়ে আমাকে হাঁটতে হয়, ভয় ভয় লাগে। জড়তা আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে রাখে। যে কক্ষটিতে আমাদের, নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের, প্রথম নিয়ে যাওয়া হল, সে কক্ষের দরজার

মাথায় শাদা কালিতে লেখা *শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষ।* কক্ষটিতে ঢুকতেই বিশ্রি একটি গন্ধে আমার চোখ নাক কুঁচকে থাকে,নাড়ি পাক খেতে থাকে, মুখে থুতু জমতে থাকে, বমি ঠেকাতে শ্বাস বন্ধ করে রাখি, কিন্তু শ্বাসেরও তো বন্ধ হয়ে থাকার একটা সীমা আছে, সীমা ছাড়ালেই গন্ধটি ছোবল দেয় নাকে, আর নাক থেকে পেটে পিঠে পায়ে, এমনকি পায়ের আঙুলেও ছড়িয়ে পড়ে। মরা মানুষগুলো টেবিলে শোয়া, টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শাদা এপ্রোন পরা ছেলেমেয়ে, কেবল দাঁড়িয়ে নয়, রীতিমত ঝুঁকে, যেন মরা মানুষের গায়ে দোলনচাঁপার ঘ্রাণ, শুঁকছে। মানুষগুলো একসময় হাসত, কাঁদত, কাউকে ভালবাসত, আঙুলে সুঁই ফুটলে চিৎকার করত, আর এখন এই যে কাটা হচ্ছে, ছেঁড়া হচ্ছে, বুকের মাংস সরিয়ে ভেতরের হৃদপিণ্ড তুলে আনা হচ্ছে, এতটুকু টের পাচ্ছে না। শিরদাঁড়া বেয়ে এক শীতল মৃত্যু নামতে থাকে, ছড়িয়ে যেতে থাকে আমার সমস্ত শরীরে। একদিন সবাই আমরা এক এক করে মরে যাব, মরে এরকম অনুভূতিহীন এক একটি বস্তু হয়ে উঠব। দল ফেলে রেখে দ্রুত বেরিয়ে আসি কক্ষটি থেকে, সঙ্গে মৃত্যু আসে গায়ে গায়ে লেগে। করিডোরে হাঁটি, মৃত্যুও হাঁটে। বাইরে ইউকেলিপটাস গাছের তলায় বসি, মৃত্যুও বসে।

পুরো ক্লাসের ছেলেমেয়েদের চারভাগ করে দেওয়া হল দ্বিতীয় দিন। মাথা, বুক, হাতপা, তলপেট। আমার ভাগে তলপেট পড়ল, অথবা তলপেটের ভাগে আমি। ব্যস, এখন মরা মানুষ কেটে কেটে তলপেট শেখো, তলপেটে যা যা আছে, ট্রেতে নিয়ে, সঙ্গীসহ একটি নিরিবিলি কোণ বেছে নাও,কানিংহামের বই আছে, একজন পড়বে,আরেকজন শুনবে, একজন বুঝবে, আরেকজন প্রশ্ন করবে, একজন সায় দেবে, আরেকজন আপত্তি তুলবে। সদলবলে পড়া আর যাকে দিয়ে হোক আমাকে দিয়ে হবে না। হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা স্থায়ী সঙ্গী বেছে নিয়েছে পড়ার জন্য, আমার স্থায়ী অস্থায়ী কিছুই নেই, আমি একা। বাড়ি থেকে রিক্সা করে একা আসি, ক্লাস শেষে একা বাড়ি চলে যাই, একা পড়ি। বাবা ঢাউস ঢাউস কিছু বই কিনে দিয়েছেন, বড় বড় রঙিন ছবি আছে ওতে, পাতা উল্টে যখন বইয়ের ছবি দেখি, ইয়াসমিন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে। পড়তে গেলে ষাট ভাগই মাথায় ঢোকে না, পনেরো ভাগ ঢুকেই আবার বেরিয়ে যায়, আর পঁচিশ ভাগ মাথা তো মাথা, আমার ত্রিসীমানায় ঘেষে না। গ্রে -র এনাটমি বইটি দেখে সবচেয়ে খুশি হন মা। মা এসব বইয়ের নাম আগেই জানেন, বাবা যখন ডাক্তারি পড়তেন, তিনি গুছিয়ে রাখতেন, চাইলে এগিয়ে দিতেন। বাবার আমলে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এত বিশাল ছিল না বই, আমার আমলে এসে সব আজদাহা পাথর আর গাছের গুঁড়ির আকার ধারণ করেছে। যখন বইয়ের ওপর ঝুঁকে থাকি, পড়ি কি না পড়ি, মা লেবুর শরবত, নয়ত মুড়িভাজা, নয়ত আদা চা রেখে যান টেবিলে, নিঃশব্দে। বাড়িতে আদর উপচে পড়ছে আমার জন্য, কলেজে যাবার আগে মা চুল আঁচড়ে দেন, ইস্ত্রি করে দেন জামা কাপড় এপ্রোন, সেন্ডেল এগিয়ে দেন পায়ের কাছে। আর কলেজে ঢুকেই আমার দশা রীতিমত করুণ হয়ে ওঠে - না বলতে পারি পড়া, না কাটতে পারি মড়া। ঢাকার মেয়েরা হোস্টেলে থেকে থেকে নিজেদের মধ্যে বন্ধু পেতে নিয়েছে, দল বেঁধে হাঁটে, দল বেঁধে হাসে, দল বেঁধে উত্তর দেয় মাস্টারের রাশি রাশি প্রশ্নের। এমন দুর্দশায় সুজিত কুমার অপু নামের এক চশমা পরা, গাল বসা, তেলে চপচপ চুলের ছেলে আমাকে উদ্ধার করল, বলল *চল একলগে পড়ি, তুমার বাসার লগে দিয়াই ত আমার বাসা। কি কও, বিকালে যামুনে!* অপুর সঙ্গে পড়া শুরু হল আমার, তলপেট। প্রথম দিনই পড়তে হল যৌনাঙ্গ, কানিংহামের বইয়ে হাঁ হয়ে থাকা এক বেশরম যৌনাঙ্গ সামনে নিয়ে আমাকে বসতে হয়, অপু বিস্তারিত

বর্ণনা করে যৌনাঙ্গের কোন মাংসের কোন তল দিয়ে কোন স্নায়ু কতদূর যায়, রক্তের নালিগুলো কোন পথে ভ্রমণ শেষে কোথায় পৌঁছয়। মা আমাদের জন্য চা বিস্কুট নিয়ে আসেন। বাবা রাতে ফিরে আরাম কেদারায় গা ফেলে আমাকে ডাকেন *কি পড়তাছ দেখি, বইডা আন তো!* বাবার সামনে কানিংহামের যৌনাঙ্গ মেলে ধরি, এই পড়ছি, এই পড়ানো হচ্ছে ক্লাসে। বাবা অপ্রতিভ হয়েও হন না, ইংরেজির আশ্রয় নিয়ে দুচার কথায় যৌনাঙ্গ জ্ঞান দিয়েই তিনি প্রসঙ্গ পাল্টান। কলেজ থেকে ফিরে প্রায় বিকেলে অপু পড়তে চলে আসে, যৌনাঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণণায় যেই না মাতে অপু, তাকে থামিয়ে আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে উঁকি দিই, *আচ্ছা কলেজ থেকে একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করলে কেমন হয়!* অপুর কাকা প্রণব সাহা শহরের নামকরা ছড়াকার, অপু নিজেও ছড়া লেখে, প্রস্তাব শুনে সে লাফিয়ে ওঠে। ব্যস, দলীয় পড়াশুনায় ইতি টেনে আমি নেমে পড়ি সাহিত্যচর্চায়। কলেজে টাঙানো দেখেছি কবিতা গল্প ছড়া লেখা দেয়াল পত্রিকা, আপাতত একটি দেয়াল পত্রিকাই না হয় করি! পরীক্ষা আসার আগে যেমন মন দিই পড়াশোনায়, তেমন মন দিয়ে করি কৃশানু।কিন্তু কে টাঙাবে কলেজে এটি! অপুর নিজের একটি ছড়া নিয়েছি বলে এমনই কৃতার্থ যে সে একদিন আটটার কলেজে সাড়ে সাতটায় গিয়ে দেয়ালে কৃশানু টাঙিয়ে আসে। ছাত্র ছাত্রীরা করিডোরে হাঁটতে গিয়ে পত্রিকাটির সামনে দাঁড়ায়, লেখাগুলো পড়ে--দূর থেকে দেখি। কলেজে সাংস্কৃতিক সপ্তাহ শুরু হয়ে গেছে, দেয়াল পত্রিকাও প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবে। অপুকে বলি ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে লেখা যোগাড় করতে। ঢিমেতালে কিছু লেখা পৌঁছল হাতে; না কবিতা না ছড়া না গল্প না প্রবন্ধ - ওগুলোকেই খানিকটা *মানুষ* বানিয়ে, বাবার পকেট থেকে আলগোছে টাকা সরিয়ে কাগজ কলম রং তুলি কিনে বসে গেলাম *অমৃত* নামে আরও একটি দেয়াল পত্রিকা বানাতে। বৈঠকঘরের মেঝে জুড়ে অমৃতর কাজ করি সারারাত। আমার তখন সাতখুন মাপ, শত হলেও ডাক্তারি পড়ে মেয়ে, কবিতা টবিতা লেখার শখ আছে, নাহয় থাকুক। এসব *ছেলেমি* একদিন কেটে যাবে।

আমার অনেক কিছু কাটে, *ছেলেমি* কাটে না। অপু যাচ্ছে নেত্রকোনায়,তার বাড়িতে,রেলগাড়ি করে, যেহেতু রেলগাড়ি আমাকে চুম্বকের মত টানে, কিছু হালকা বন্ধুত্ব হওয়া মেয়েদের নিয়ে অপুর সঙ্গে নেত্রকোনা যাওয়ার *মতলব* করি। অপু কথা দেয়, বিকেলেই ফিরে আসবে। কলেজ থেকে বাড়ির পথ বাঁয়ে রেখে ডানে ইস্টিশনের দিকে যাই, কয়লার গাড়ি কালো ধোঁয়া ছেড়ে ঝিকির ঝিকির করে চলতে শুরু করে, গাড়ি যখন চলে আমার খুব আনন্দ হয়, যখনই কোথাও থামে, মন খারাপ হয়ে যায়, জানালায় গলা বাড়িয়ে ইঞ্জিনের দিকে আকুল তাকিয়ে প্রার্থণা করি পুনঃ ঝিকির ঝিকিরের। নেত্রকোনা নেমে অপুর বাড়িতে খেয়ে দেয়ে, শহরের নদীমাঠ ইত্যাদি দেখে যখন রেল ইস্টিশনে পৌঁছোই ময়মনসিংহের গাড়ি ধরার জন্য, গাড়ি মুহুর্মুহু আসছে, কিন্তু যাচ্ছে মোহনগঞ্জের দিকে, ময়মনসিংহের দিকে নয়। সন্ধে নেমে আসে, আকাশ থেকে অন্ধকারের পাথর পড়ে বুকে। বাড়িতে কি হচ্ছে তা অনুমান করারও দুঃসাহস হারিয়ে ফেলতে থাকি। হোস্টেলের মেয়েদের নিশ্চিন্তি দেখে আমার ইচ্ছে করে ওদের মত ভাগ্য পেতে, বাড়িছাড়া রক্তচোখছাড়া স্বাধীন জীবন যাপন করতে। শেষ অবদি গাড়ি এল। সেই গাড়ি চলে কি চলে না করে রাত দশটার দিকে পৌঁছল ময়মনসিংহ শহরে। সারা পথই আমি নানারকম উত্তর সাজিয়েছি বাড়িতে বলার জন্য, কোনও উত্তরই জুৎসুই হয় না, সারা পথই আমার মুখ গলা পেটের পানি তলপেটের দিকে নামতে থাকে। আমি একা অপরাগ বলে বাকিরা এগিয়ে আসে সমস্যা সমাধানে। অপু আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে, বলবে সে

আমাকে এবং আরও কজনকে নেত্রকোনা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল, *যত দোষ অপু ঘোষ।* সমাধানটি মনঃপূত হয় না। শেষে সকলকেই ধরে নিয়ে আসি অবকাশে, এক দঙ্গল মেয়েকে দেখিয়ে বাড়িতে বলি, এরাও ছিল আমার সঙ্গে। একা একটি পুরুষের সঙ্গে দূরে কোথাও *ফূর্তি* করতে যাওয়া নয়, এক দল মেয়ে নিয়ে *পিকনিক পিকনিক* ঘুরে আসা,বোধবুদ্ধিহীন রেলগাড়ির জন্যই দেরি হওয়াটি ঘটেছে, অপু ছিল সঙ্গে সেটিই সান্ত্বনা--মা বুঝে নেন। সে যাত্রা বেঁচে যাই। রক্ষে যে বাবা বাড়িতে ফেরেননি তখনও। ফিরলেও সম্ভবত খুব বিস্ফোরণ ঘটাতেন না, কারণ সে রাতে তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর মা মারা গেছেন। বাবার মা, আমার দাদি। দাদি মাঝে মাঝে বড়দাদার সঙ্গে আসতেন অবকাশে বেড়াতে। দাদি দেখতে কালো, কিন্তু সুন্দরী। নাক চোখ মুখ সব ধারালো। মার ধারণা এই দাদি বাবার আপন মা নন। বাবা আর বাবার বড় বোনের আপন মা ছিলেন এই দাদির বড় বোন। বড়দাদাকে, দাদিকে, বড় ফুপুকে এই গোপন কথাটি অনেকদিন জিজ্ঞেস করেও কোনও উত্তর পাইনি। আপন মা না হলেও এই মার জন্য বাবার আদর কম ছিল না। আদর বলতে শাড়ি কাপড় পাঠানো, অসুখ ব্যাধিতে ওষুধ পাঠানো, একেবারে শয্যাশায়ী হলে নিজে মাদারিনগর গিয়ে দেখে আসা। এবার বাবা ঠিক করলেন দাদির চল্লিশায় তিনি যাবেন গ্রামের বাড়িতে। আমাকে আর ইয়াসমিনকে চোখ নাচিয়ে বললেন, *কি যাবা নাকি কান্ট্রিসাইডে?* আমন্ত্রণের আভাস পেয়ে লাফিয়ে উঠি খুশিতে। আমার আর ইয়াসমিনের কখনও যাওয়া হয়নি গ্রামের বাড়িতে। দাদা ছোটদা গিয়েছিলেন যুদ্ধের সময়। দাদার ক্যামেরাটি হাতে নিয়ে বাবার সঙ্গে গ্রামের পথে রওনা হই ভোরবেলা। নৌকো, বাস, রিক্সা, পায়ে হাঁটা এসবের ধকলের পর বাড়ি পৌঁছি। ধকলকে ধকল মনে হয়নি। ঘরের বাইরে বের হতে পারার মত আনন্দ আর কি আছে! যে কোনও নতুন জায়গা, সে গ্রাম হোক শহর হোক, দেখতে ভাল লাগে আমার। ঢাকা শহরে যাওয়ার যে আনন্দ, নান্দাইলের মাদারিনগর গ্রামে যাওয়ার আনন্দ তার চেয়ে কম নয়। দুপুরবেলা প্রচুর লোক এল খেতে, গ্রামের গরিব লোক, বাবার গরিব আত্মীয়। সবাইকে উঠোনে বসিয়ে কলাপাতায় খাওয়া দেওয়া হল। বাবা নিজে পাতে পাতে বেড়ে দিলেন। ক্যামেরায় বাবার নানা ঢংএর ছবি তুলে রাখি। আমাদের দেখতে গ্রামের বাচ্চা কাচ্চা পুরুষমহিলা সব জড়ো হন ও বাড়িতে। শহর থেকে আসা যে কোনও প্রাণীই তাদের কাছে এক থোকা বিস্ময়!বাড়ির সবগুলো ঘর বাঁশের বেড়ায় বানানো, খড়ের ছাউনি,মাটির মেঝে। বড়দাদার বড় ঘরটির চারপাশ ঘিরে ঈমান আলী, রিয়াজউদ্দিন, আবদুল মতিনের ঘর তোলা হয়েছে। তাঁরা বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে আছেন। বড়দাদার ঘরে একটি বড় সিন্দুক, সিন্দুকের ওপর বিছানা পেতে ঘুমোন তিনি। সারাদিন বসে বসে মাছ ধরার জাল বোনেন। চোখে ভাল দেখতে পান না। কিন্তু অসুখবিসুখে যে যাবেন শহরে, থাকবেন অবকাশে, তা নয়, তাঁকে টেনে হিঁচড়েও শহরে নেওয়া যায় না আজকাল। নিজের ভিটে ছেড়ে কোথাও তাঁর এ বয়সে যেতে ইচ্ছে করে না। বাবা দিগন্ত অবদি বিস্তৃত সবুজ ধানি জমি দেখালেন আমাদের। সব তিনি নিজে কিনেছেন। এত জমি, এত গরু, এত গোলা ভরা ধান বাড়িতে, কিন্তু কারও জীবন যাপনে চাকচিক্য নেই। পরনে মাদারিনগর বাজারের সস্তা নীল লুঙ্গি। কুঁড়েঘরের তক্তপোষে ঘুমোন, বেগুন পোড়া আর *পাইন্যা* ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে হুঁকো টানেন দাওয়ায় বসে, দুশ্চিন্তার সুরুজ যেন মাথার এক হাত ওপরে বসে আছে, মুখগুলো তাই তিতিবিরক্তিতে বাঁকা। বউদের পরনেও মোটা সুতির কাপড়। পনেরোকে পঁচিশ লাগে দেখতে। পঁচিশকে পঞ্চাশ। তবু গ্রামের অন্য বাড়ির চেয়ে এ বাড়ির লোকদের ভাবা হয় ধনী। ধন তাঁরা জীবন যাপনে ব্যয় করেন না,

ধন জমিয়ে রেখে নতুন জমি কেনা আর এর ওর বিরুদ্ধে মামলা করার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। এ বাড়ির জন্য বাবা হলেন ভগবান। যে যতটুক যক্ষরাজ কূবের বনেছেন, বাবার টাকাতেই বনেছেন। বাবা যেভাবে আদেশ করেন, সেভাবে সকলে চলে। কার ছেলে ইশকুলে যাবে, কার মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে হবে, সবই বাবা বলে দেন, ইশকুলে পড়ার খরচাও বাবা দেন, বিয়ের খরচাও। গ্রামের ইশকুল শেষ হলে রিয়াজউদ্দিনের ছেলেকে শহরের ইশকুলে ভর্তি করাবেন বলে দেন। শহরের ইশকুলে ভর্তি হওয়া মানে অবকাশের উঠোনে টিনের ঘরে ওদের জায়গা হওয়া। রিয়াজউদ্দিনের বড় ছেলে সিরাজ, যখন অবকাশে থেকে শহরের ইশকুলে পড়ত, একদিন কাঠফাটা গরমের শুনশান দুপুরে ইয়াসমিনকে, বয়স কত হবে আর, নয় কি দশ, ন্যাংটো করেছিল। ঝুনুখালা বেড়াতে এসে উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে টিনের ঘরের দিকে উঁকি দিয়ে ন্যাংটো দৃশ্যটি দেখে ফেলেন, খবর পেয়ে বাড়ি এসে সিরাজ আর ইয়াসমিনের পিঠে উঠোনে যত খড়ি ছিল ভেঙে, সিরাজকে সেদিনই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাবা। সিরাজ শহরের অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া করে থেকে ইশকুল পাশ দিয়ে এখন কলেজে ঢুকেছে। দাদির চল্লিশায় সিরাজ এ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু ঘটনার এত বছর পরও বাবার মুখোমুখি হওয়ার সাহস তার নেই। বাড়ির পাশেই কবর দেওয়া দাদির মাথার কাছে একটি চারাগাছ পুঁতে বাবা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিকেল বিকেল শহরে ফিরে আসেন। পথে তিনি নিঃসংকোচে বর্ণনা করেন তাঁর গত জীবনের দুঃসহ দারিদ্রের কথা। কোন বাড়িতে জন্ম হয়ে আজ তিনি কোথায় এসে পৌঁছেছেন, তা আমাদের বুঝতে বলেন। বলেন আমরাও যেন ওপরের দিকে তাকাই, যেন বড় হই শিক্ষাদীক্ষায় কাজেকর্মে, যেন মানুষের মত মানুষ হই। আরাম আয়েশ আলসেমিতে যেন বৃথা উড়িয়ে না দিই সময়।

এদিকে কলেজে ছাত্রলীগ, ছাত্রইউনিয়ন, জাসদ-ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ইত্যাদি রাজনৈতিক দল ঢাকা থেকে গানের শিল্পীদের এনে চমৎকার চমৎকার *নবীন বরণ অনুষ্ঠান* করে আমাদের বরণ করছে। এক দল আরেক দলের চেয়ে জমকালো অনুষ্ঠান করার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। এক দল খুরশিদ আলমকে নিয়ে এলো, আরেক দল ফেরদৌস ওয়াহিদকে। কেবল গানের অনুষ্ঠানই নয়, লম্বা লম্বা রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার জন্যও ঢাকা থেকে রাজনৈতিক নেতা আনা হয়। মাহমুদুর রাহমান মান্না জাসদের অনুষ্ঠানে এসে নাগারে দুঘন্টা বক্তৃতা করেন, তন্ময় হয়ে শুনি। যে দলের যে নেতাই যে কথাই বলেন, মুগ্ধ হই। এত ভাল ভাল নেতা থাকতে দেশ কেন পড়ে থাকবে জিয়াউর রহমানের মত এক সেনানায়কের হাতে, ভাবি। আবার ছাত্রদলের ভাষণ শুনে মনে হয় দেশ বুঝি ঠিকই চলছে, এর চেয়ে ভাল চলার আর কোনও ব্যবস্থা নেই। নবীন বরণ উৎসব শেষ হতে না হতেই নির্বাচনের হাওয়া লাগে কলেজে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন। কলেজে নানারকম মানুষ ভোট চায়, সবাইকে মাথা নেড়ে কথা দিতে হয় ভোট দেব। বাড়িতেও আসতে শুরু করে প্রার্থীরা। বাড়ি এসে বলে গেলে নাকি সে বলা পোক্ত হয়। বাড়িতে ভোটের জন্য অথবা যে কোনও কারণেই হোক, আমাকে খুঁজতে হরদম ছেলেপিলে আসছে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নতুন আমার জন্য। প্রথম বর্ষের ক্লাস গড়িমসি করে চলে, এই সুযোগে তৃতীয় সংখ্যা সেঁজুতি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিই। কলেজে যত না সময় কাটে, তার চেয়ে বেশি কাটে জমান প্রিন্টার্সে। আগের চেয়ে আরও হৃষ্টপুষ্ট এই সেঁজুতি। এ সংখ্যা সেঁজুতিতে একটি জিনিস উল্লেখযোগ্য, প্রথম পাতার *সম্পাদিকা তসলিমা নাসরিন* চলে গেছে ছোট অক্ষরে শেষ পাতার শেষে। সম্পাদিকার বদলে সম্পাদক। সেঁজুতি হাতে নিয়ে দাদা প্রথম থেকে শেষ অবদি পড়ে শেষে থমকে যান,

বানান ভুল রইয়া গেছে। সম্পাদিকার জায়গায় সম্পাদক ছাপা হইছে।

হেসে বলি, *এইটা ভুল না। এইটা আমি ইচ্ছা কইরা দিছি।*

কস কি? তুই কি ছেড়া নাকি?

ছেড়া হইতাম কেন?

তুই কি লিঙ্গ বিশ্বাস করস না?

করি।

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ বইলা যে একটা ব্যাপার আছে, তা জানস?

জানি। কিন্তু সম্পাদিকা প্রকাশিকা এইসব ইকা টিকা আমি পছন্দ করি না। ছেলে মেয়ে দুইজনই সম্পাদক হইতে পারে। শব্দের মধ্যে অহেতুক কিছু লিঙ্গের আমদানি হইছে, যা আমি ব্যবহার করতে চাই না। যে মেয়ে কবিতা লেখে তারে আমি কবি কইতে চাই, মহিলাকবি না।

দাদা সেঁজুতি ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, *মাইনষে তরে পাগল কইব।*

ক্লাসে যাদের সঙ্গে আলাপ হয় এক দুকথার পরই বলি *শতাব্দী চক্র* নামে একটা সাহিত্যগোষ্ঠী করি, চল। হালকা হালকা বন্ধুত্বের মেয়েগুলোকেও বলি। বইপোকাগুলো মোটেও ভিড়তে চায়নি, আর পোকা যাদের ধারে কাছে ভেড়ে না, ওরা লাফিয়ে উঠল, ব্যস, চাঁদা তোলো, খামোকা লাফালে তো কাজের কাজ কিস্যু হবে না। ছোটখাট একটি কমিটি বানিয়ে ফেলে, এবার, আমার প্রস্তাব, কিছু একটা করা চাই। অমৃত দ্বিতীয় পুরস্কার পাওয়ার পর ঝোঁক চাপে শতাব্দী থেকে সেঁজুতির মত একটি কবিতাপত্রিকা করার। মনে কিছু উদয় হয় তো ঝাঁপিয়ে পড়ি, অবশ্য আমার সব ঝাঁপানোই নিঃশব্দে। বাংলা শব্দ শুদ্ধ করে লিখতে জানে, এমন যাকেই পাচ্ছি, বলছি, কবিতা লেখো। কবিতা তো আসে না বাবা! আরে আসবে। জীবনই তো কবিতা! যাপন করছ, অথচ লিখছ না! যে কটি কবিতা পাওয়া গেল, কড়া সম্পাদনা করে ছোট্ট একটা কবিতাপত্রিকা বের করি, নিজেই সি কে ঘোষ রোডের লিফা প্রিন্টার্সে গিয়ে ছেপে আনি। ছোটদার বন্ধুর ছাপাখানা এই লিফা। লিফা দাম রাখে কম, কিন্তু রাখে। পত্রিকার নাম দিই *রোদ। রোদ* প্রেসে যাও, প্রুফ দেখ, রোদে ভিজে বাড়ি ফেরো। রোদ হয়ে যাওয়ার পর অপুর আবদার, দুপাতা লম্বা একটি ছড়া নিয়ে এসে, *শতাব্দী থেইকা একটা ছড়াপত্রিকা হইলে কিন্তু মন্দ হয় না।* তাও হবে, ছড়ার কি দোষ যে বাদ থাকবে! *ঝনঝন* নামে ছড়াপত্রিকাও কদিনের মধ্যে হয়ে গেল। তবে অপুর ছড়াটি কেটে আধপাতা করতে হয়েছিল, অত টাকা নেই যে এক হাত লম্বা লম্বা ছড়া ঢুকিয়ে ঢাউস কোনও পত্রিকা করা যাবে, কলেজ থেকে পাওয়া বৃত্তির টাকা শতাব্দির পেছনে খরচা করি, সদস্যরা এমাসে চাঁদা দেয় তো ও মাসে বাদ থাকে। কাঁচা কবিতা পাকা-মত করে, ছেপে, পত্রিকা করার উৎসাহ তখনও ঘোচেনি, এর ওপর উথলে উঠল নতুন উচ্ছ্বাস, নাটক। ছোটদা তখন নাটকের দলের সঙ্গে অর্ধেক রাত, আর বেশি অর্ধেক দিন কাটাচ্ছেন। *ময়মনসিংহ থিয়েটার* শহরে নতুন নতুন নাটক করছে, ছোটদা আমাকে মহড়া দেখাতে নিয়ে যান মাঝে মধ্যে। যখন আমার মাথায় নাটকের এক পোকা থেকে লক্ষ পোকা জন্ম নিচ্ছে, পার্থ, আমার সঙ্গেই পড়ে, একদিন সিসিম ফাঁকের মত ফাঁক করল তার ট্রাংক, বেরোল সমরেশ বসুর একটি নাটক, আবর্ত। কলেজের ছেলেমেয়েদের দিয়ে এ নাটক হবে না, সত্যিকার নাট্যশিল্পী দরকার। পাণ্ডুলিপিটি আমি বাড়ি নিয়ে এসে ছোটদাকে বললাম এই নাটকটা থিয়েটারকে দাও করতে। তখন আমার পড়া হয়ে গেছে আবর্ত,পড়তে পড়তে ছেলেচরিত্রে, মেয়ে চরিত্রে থিয়েটারের সদস্যদের

কল্পনা করেছি, বিশাল একটি মঞ্চের সামনে থেকে পর্দা সরে যাচ্ছে, মঞ্চে আবছা আলো, সন্ধে হয়ে আসছের আলো, ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে গীতা, গীতাকেই মানাবে মংলার মা চরিত্রে, ডাকছে উৎকণ্ঠায়, *মংলা ও মংলা।* থিয়েটার দল লুফে নিল নাটকটি, মহড়া শুরু হল। প্রায় বিকেলে মহড়ার দিন থিয়েটার-ঘরে *উঁহু হচ্ছে না, আরেকটু পেছনে যান, মাথাটা চুলকাতে চুলকাতে বলেন, কারণ মংলার বাবা এখন কনফিউসড, আচ্ছা আঞ্চলিক টানটা আরও আনতে হবে কিন্তু সংলাপে,* যখন বলি, নাটকের জলে আকণ্ঠ ডুবে, যে কেউ ভেবে বসবে আমিই বুঝি নাটকের পরিচালক। একদিন ফরিদ আহমদ দুলাল, দলের প্রায় সব নাটকের পরিচালক, যখন বলল, *পরিচালনা কিন্তু যা দেখতাছি তুমিই করতাছ, সুতরাং, কি কও, নাটকটার পরিচালকই অফিসিয়ালি হইয়া যাও।*

আমি?

হ্যাঁ তুমি।

লজ্জায় মুখ লুকিয়ে বলি, *পাগল নাকি! আমার কোনও অভিজ্ঞতাই নাই নাটকের। জীবনে প্রথম।*

টেলিভিশনে কিছু নাটক আর ছোটদার সঙ্গে ঝুলে ময়মনসিংহের মঞ্চে কিছু নাটক দেখে আর কিছু নাটকের বই পড়ে নাটক পরিচালনা করার বিদ্যে অর্জন হয় বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমার ওপর যখন সত্যি সত্যি ভার পড়ল নাটক পরিচালনার, ছোটদা পার্থকেও বললেন ডেকে আনতে। পার্থ তুমুল উৎসাহে নেমে গেল। প্রায় রাতে ময়মনসিংহ থিয়েটারের ভাঙা বাড়িতে মহড়া চলে। গ্রামের গরিব পরিবারের গল্প। গীতা নায়িকার ভূমিকায়, নায়িকার ভূমিকায় গীতা অবশ্য মঞ্চে প্রথম নয়, এর আগেও নানারকম নাচের দল থেকে সে নকশি কাঁথার মেয়ে, চণ্ডালিকা, চিত্রাঙ্গদা করেছে। নায়কের ভূমিকায় ময়মনসিংহ থিয়েটারে নতুন যোগ দেওয়া গানের ছেলে সোহানকে নেওয়া হল। মংলা চরিত্রের জন্য ছোট একটি বাচ্চা ছেলে যোগাড় করা হল। প্রচণ্ড উদ্যম এক একজনের মধ্যে, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় টগবগ করা মানুষগুলো পারলে দিন রাতের যে কোনও সময় এক পায়ে খাড়া মহড়া দিতে। রাতে মহড়া শেষে পার্থ হোস্টেলে ফিরে যায়, কোনও কোনও রাত আবার অবকাশেও কাটায়। আবর্তর শো শুরু হল টাউনহলে, মঞ্চ সজ্জায় যার দায়িত্ব ছিল, চোখকাড়া মঞ্চ সাজিয়েছে সত্যিকার কুঁড়েঘর বানিয়ে, সত্যিকার মাটিতে সত্যিকার গাছ পুঁতে, সত্যিকার মাছ ধরার জাল উঠোনে, দেখে আমি অভিভূত। তিন রাত ধরে শো। টিকিট কিনে লোক এল নাটক দেখতে, তিনশ লোকের হল ধীরে ধীরে, আশ্চর্য, ভরে গেল। যেন চোখের পলকে ঘটে গেল এত বড় ব্যাপারটি। ময়মনসিংহ থিয়েটার শহরের নামি দল নাটকের, আর তাদের সবচেয়ে ভাল এবং সফল নাটক আবর্ত। নাটকের পোস্টারে ছাপা আবর্তর দুজন পরিচালকের নাম, ঈশিতা হোসেন পার্থ আর তসলিমা নাসরিন।

নাটক আরও দীর্ঘ দীর্ঘ দিন এভাবেই চলতে পারত, কিন্তু গীতার ডাক পড়ল ঢাকায়। টেলিভিশনে নাচের অনুষ্ঠান হবে, রাহিজা খানম তাকে ডেকেছেন নাচতে। বুলবুল একাডেমিতে নাচের মেয়ে কম পড়েছে, ডাক ডাক গীতাকে ডাক বলে রাহিজা খানম গীতা যেখানেই থাক ডেকে নিয়ে যান। গীতা নেচে বেড়ায় ঢাকায়। টেলিভিশনে গীতার নাচ থাকলে বাড়ির সবাই বসে সে নাচ দেখি। মা আর গীতাকে নর্তকী বলে গাল দেন না। গীতার জীবনটি রহস্যে ভরা। এক্ষুনি জীবন উজাড় করে দিল, পরক্ষণেই কেড়ে নিল। মঞ্চে চমৎকার অভিনয় করে গীতা, কী জানি জীবনের মঞ্চে সে যা করছে সবই অভিনয় কি না। গীতার জীবনের অনেকটাই গীতার ট্রাংকে লুকোনো। নানারকম জিনিস ওতে,

গোপন করার মত অনেক জিনিস। যখন সে বাড়ির বাইরে যায়, ট্রাংকে তালা লাগিয়ে যায়। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে কী কী আছে ট্রাংকের ভেতর। গোপন করার মত তখনও আমার কিছু নেই। সবই খোলা, সবই মেলা, ইচ্ছে করে আমারও গোপন কিছু থাক, আমার একার কিছু। ছোটদার সঙ্গে গীতার প্রেম বা বিয়ে যখনও কিছু হয়নি, তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, মূলত হেনামাসির কাছে যাওয়া যে মাসিটি আমাদের পড়াতেন, তখন গীতার ট্রাংকটি দেখেছিলাম, সরু চৌকিতে, যে চৌকিতে সে শুত, তার ওপরই বালিশের কাছে রাখা। বিয়ের পর সে বাপের বাড়ি থেকে আর কিছু না আনুক, তার যক্ষের ধন ট্রাংকটি এনেছে। ট্রাংকটি একদিন তালাহীন পেয়ে দেখি ওতে রাজ্যির জিনিস, ছোটদার লেখা তিরিশ চল্লিশ পাতার চিঠি, ছোট ছোট গয়না, পয়সার থলে, আমার দৃষ্টি কাড়ে তুলো লাগানো ব্রেসিয়ারগুলো। সতেরো পার হয়েছে, কিন্তু ও জিনিসটি কখনও পরে দেখিনি। মার ব্রেসিয়ারও মা সবসময় লুকিয়ে রাখেন, শাড়ি নয়ত শায়ার আড়ালে, উঠোনের দড়িতে কখনও ব্রেসিয়ার শুকোতেও দেন না, টিনের ঘরের পেছনে, যেখানে কুকুর বেড়ালও যায় না, রোদে ফেলে শুকিয়ে আনেন, যেন সাংঘাতিক নিষিদ্ধ জিনিস এগুলো। ইয়াসমিনকে আড়ালে ডেকে, কেউ যেন না দেখে না শোনে, নিষিদ্ধ জিনিস সম্পর্কে যা জ্ঞান আছে আমার, ঝেড়ে, বললাম, *যা তো গাঙিনার পাড় থেইকা এইরকম একটা জিনিস কিন্যা নিয়া আয়, রিক্সা কইরা যাইবি আর আসবি।* আমি ওর হাতে টাকা ধরিয়ে দিয়ে বারান্দায় বসে রইলাম, যেন ও এলেই জিনিসটি কারও চোখে পড়ার আগে আমি আড়াল করতে পারি। সেই বিকেলে ইয়াসমিনের কিনে নিয়ে আসা ব্রেসিয়ার পরে দিব্যি চুপচাপ বসে রইলাম, নিষিদ্ধ জিনিসে আনন্দ যেমন আছে, ভয়ও আছে, চাইছিলাম না কেউ আমার আশেপাশে আসুক, বুঝুক যে আমি নতুন একটি জিনিস পরেছি আজ। কিন্তু ছোটদার সঙ্গে সখ্য তখন এমন যে, ছোটদা বাড়ি ঢুকেই হৈ চৈ করে আমাকে ডাকেন, কোনও একটি গল্পের বই আমাকে পড়তে হবে, আর তিনি খেতে খেতে শুয়ে বিশ্রাম নিতে নিতে প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে শুনবেন। আমি যখন জড়সড়, বারবার জামা টানছি কাঁধের দিকে, যেন কিছুতেই উঁকি না দেয় নিষিদ্ধের ফিতে, ছোটদা এসে পিঠে এক চাপড় দিয়ে বললেন *কিরে কি হইছে তর, একলা একলা বইসা রইছস কেন?*

পিঠের চাপড়টিই বিপদ যা ডাকার, ডাকল। ছোটদা তুমুল হেসে বললেন *কি রে তুই দেখি ব্রেসিয়ার পরছস!*

গলা ফাটিয়ে সারাবাড়ি জানিয়ে দিলেন, *নাসরিন ব্রেসিয়ার পরছে।*

পরার পর পনেরো মিনিটও যায়নি, বাড়ির সবাই জেনে গেল, আমি কি পরেছি। টেবিলের দিকে গা ঠেসে থাকলাম, আমার মাথা ক্রমে নুয়ে আসতে থাকল বইয়ের ওপর, গোপন জিনিসটি গোপন না থাকার কষ্টে বইয়ের পাতা ভিজতে লাগল। মা এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন *ব্রেসিয়ার পরার ইচ্ছা হইছে, আমারে কইবা না? আমি তো তোমার সাইজের কিন্যা দিতে পারতাম।*

আমার মুখ মাথা কান শরমে গরম হতে থাকল। ব্রেসিয়ারের ঘটনা স্বাভাবিক হওয়ার পর মা বলেছিলেন, বিয়ের বছর দুই পর মা যখন প্রথম ব্রেসিয়ার পরলেন, বাবা এমন ক্ষেপেছিলেন যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠেছিলেন, *খারাপ মেয়েছেলের মত ঢং এর জিনিস পর ! শখে বাঁচ না!* এই জিনিসটি পরা মানে ঢং করা ফ্যাশন করা এরকমই ভাবে অনেকে। গ্রামের মেয়েরা সারাজীবন ব্রেসিয়ার কাকে বলে না জেনেই জীবন কাটিয়ে যায়। বাবা গ্রামের ছেলে, তাঁর দেখে অভ্যেস নেই কাপড়ের তলের বাড়তি কাপড়।

কলেজে একটি জিনিস আমাকে নিষিদ্ধ গন্ধমের মত টানে। সেটি কলেজ ক্যান্টিন। ক্যান্টিনে আর সব ছেলেদের মত চা খেতে খেতে গল্প করতে ইচ্ছে হয় আমার। ইচ্ছে হয় যদিও, ইচ্ছেকে পূর্ণ করতে অনেক সময় আমি নিজেই এর বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াই। উপকণ্ঠের সম্পাদক, আবার চমৎকার কবিতাও লেখে, হারুন রশিদ, যার কবিতার মুগ্ধ পাঠক আমি, আমার সঙ্গে দেখা করতে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে এসে এই ক্যান্টিনে অপেক্ষা করছিল, আমার সাহস হয়নি ভেতরে যেতে, সাহস হয়নি কোনও অসহ্য সুন্দরের সামনে দাঁড়াতে। ইতঃস্তত দাঁড়িয়ে থাকা আমার সামনে দিয়ে একটি মিষ্টি মুখের ছেলে বেরিয়ে গেল ক্যান্টিন থেকে, পেছন থেকে তাকে ডেকে থামানোর সাহসও হাত ফসকে পড়ে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। নিজের এই অপারগতাগুলো আমি ভেতরে একা একাই লালন করি। নিজেকে আমার অপদার্থ ভীরু *কা-নারী* ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। মূলত ছেলেরাই যায় ক্যান্টিনে তা জানি, দিব্যি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নয়ত দুটো ক্লাসের মাঝের অবসরটাতে, নয়ত ক্লাস কোনও কারণে না হলে। অবসর পেলে মেয়েরা হোস্টেলে গিয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে আসে, নয়ত জুটি বেঁধে নিরালায় চলে যায় মোটা বই মেলে পড়তে। মেয়েরা যায় কদাচিৎ ক্যান্টিনে, বড় ক্লাসের মেয়েরা কেবল, ছেলেবন্ধুদের নিয়ে, নয়ত দল বেঁধে। ক্যান্টিনে যাওয়ার ইচ্ছে করে আমার, ইচ্ছে করে আর সব ছেলেদের মত যখন তখন ক্যান্টিনে ঢুকে হাঁক দেব চায়ের জন্য, চা এলে পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে চা খাবো, ইচ্ছের পূর্ণতা যেহেতু আমার পক্ষে ঘটানো সম্ভব হয় না, আমি সঙ্গী খুঁজতে থাকি। ক্লাসের যে মেয়েকেই সাধি, পিছলে যায়। শেষ অবদি হালিদা রাজি হল, সুন্দরী এক মেয়ে, উদাস উদাস চোখ, ঢাকার ইন্দিরা রোডে বাড়ি, শুদ্ধ বাংলায় কথা বলে, ওকে নিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকেই দেখি জোড়া জোড়া ছেলে-চোখ আমাদের গিলছে, প্রথম বর্ষের মেয়ে হয়ে গটগট করে চলে এলাম ছেলেদের আড্ডাখানায়, আমাদের বুকের পাটা অনুমান করে ওরা খানিকটা চেঁচিয়েই কথা বলতে শুরু করল যেন ওদের প্রতিটি শব্দ আমাদের প্রতি লোমকূপ নাড়ায়। সেই শুরু। পরে, হাবিবুল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর ক্যান্টিন আমার ঠিকানা হয়ে উঠল প্রায়। হাবিবুল্লাহরও বাড়ি ঢাকায়, আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ে, দীর্ঘদিন আমাকে আড়ে আড়ে লক্ষ করে হঠাৎ একদিন পথ আগলে বলল সে আমার বন্ধু হতে চায়। বন্ধু হতে চাও ভাল কথা, তবে বন্ধু মানে বন্ধু, তুই তোকারি বন্ধু। হাবিবুল্লাহকে পরদিনই তুই বলে সম্বোধন করলাম, সে চমকাল যদিও, শর্ত মত তাকেও বলতে হল তুই। হাবিবুল্লাহ এরপর আঠার মত লেগে রইল আমার পেছনে। ক্লাসে ঢুকতে বেরোতে দেখি সে, দাঁড়িয়ে আছে আমার অপেক্ষায়।

কী ব্যাপার তোর ক্লাস নাই?

আছে।

ক্লাসে যা।

ধুৎ ভাল্লাগছে না। ক্লাস করব না।

কি করবি?

চল চা খাই গিয়া।

আমার ত ক্লাস আছে।

হাই স্যারের ক্লাস তো। ওই ক্লাস না করলেও চলবে।

কি কস!

আরে চল তো।

এমনিতে নাচুনে বুড়ি, তার ওপর ঢোলের বাড়ি। ক্যান্টিনে গিয়ে বসি। ক্যান্টিনে চা

সিঙ্গারা আসছে, হাবিবুল্লাহর বন্ধুরা আসছে, এনাটমি থেকে শুরু হয়, রাজনীতিতে গিয়ে শেষ হয় আড্ডা। আমরা সদর্পে সগর্বে হেঁটে বেড়াই কলেজ চত্বর। ক্লাসের ফাঁকে অথবা অজরুরি ক্লাস ফাঁকি দিয়ে যেখানেই আমি, সেখানেই হাবিবুল্লাহ। হাবিবুল্লাহ বাড়িতেও আসতে শুরু করল বিকেলের দিকে। বাবা বাড়ি এলে হাবিবুল্লাহ দাঁড়িয়ে *স্লামালেকুম স্যার* বলে। গম্ভীর মুখে বাবা ভেতরের ঘরে ঢুকে যান। ভেতরে গিয়ে মাকে প্রশ্ন করে উত্তর পান, ছেলেটি আমার *বন্ধু।* কলেজের শিক্ষক হয়ে বাবা এই একটি জায়গায় আটকে গেছেন, কলেজের কোনও ছাত্রকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

কলেজে খেলার মরশুম শুরু হয়েছে, ক্যারম আর দাবা খেলায় নাম লিখিয়ে দিব্যি খেলতে লেগে গেলাম। ক্যারমে হেরে গেলাম, জেতার কোনও কারণ ছিল না, সেই কতকাল আগে, নানিবাড়িতে খেলেছিলাম! আর দাবায়, এক তুখোড় দাবারু, গত বছরের চ্যাম্পিয়ানকে হারিয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে শেষ অবধি জিতে যাওয়া খেলা, অধৈর্যের কারণে ছেড়ে দিয়ে রানার্স আপ হলাম। অধৈর্য আমার লাগে গ্যালারির ক্লাসগুলোতেও, শিক্ষকরা কী বলেন বা কী বলতে চান, তার আশি ভাগই বুঝি না। প্রস্থানচর্চা বেশ চলে এখানে, যা ইশকুল কলেজে আগে দেখিনি, প্রক্সি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, ক্লাস ভাল লাগল না তো পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমি বেরিয়ে পড়তে শুরু করলাম, তখন অবদি মেয়েরা পাছায় আঠা লাগিয়ে সামনের সারিতে বসে শিক্ষকদের প্রতিটি বাক্য গোগ্রাসে গেলে, দুষ্টু ছেলেরাই নাকি কেবল বেরিয়ে যায়, আমি দুষ্টুর তালিকায় পড়লাম, তবে ছেলে নই, *মেয়ে।* বেরিয়ে যাওয়ার এই স্বাধীনতাও বেশ উপভোগ করতে শুরু করি, মুমিনুন্নিসা কলেজ থেকে বিকেল পাঁচটার আগে গগন দারোয়ান আমাদের বেরোতে দিত না, এখানে আর যাই থাক, সেই দমবন্ধ করা খাঁচাটি নেই। ইচ্ছে হল ক্লাসে গেলাম, ইচ্ছে হল গেলাম না। এরকম নিয়ম নেই যে সকাল আটটা বা নটায় কলেজে ঢুকতেই হবে। মেডিকেলের এই ব্যাপারটি বোঝার পর আমি কখনও কখনও দুপুরে বাড়ি থেকে রওনা হই, মা অবাক হন, *এই অসময়ে কই যাইতাছস?*

কলেজে।

এখন আবার কলেজ কি?

ক্লাস আছে।

তর তো সকাল আটটায় কলেজ শুরু হইছে।

হ হইছে। তাতে কি! আটটার সময় যে ক্লাস ছিল করি নাই।

এখন কলেজে যাইয়া কি করবি?

দেড়টার ক্লাস করতে যাইতাছি।

যখন ইচ্ছা তখন গেলে ত হয় না।

তোমার তো দৌড় ইশকুল পর্যন্ত, এই সব বুঝবা না।

নিয়মটি আমার খুব ভাল লাগে, যখন ইচ্ছে ক্লাসে যাও, ক্লাস করতে ইচ্ছে না হলে *প্রক্সি* দিয়ে বেরিয়ে পড়। প্রক্সি শব্দটির চল খুব বেশি কলেজে। ক্লাস না করতে পারি, কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা কম থাকলে পরীক্ষায় বসা যাবে না। বন্ধুরা নকল উপস্থিতি দিয়ে দেয়। প্রতিটি ক্লাসে নাম ডাকার সময় *ইয়েস স্যার* বলে দিলেই হয়। এখন কে বলছে ইয়েস স্যার, তোফাজ্জলেরটা মোজাম্মেল বলছে কি না, তা কে তলিয়ে দেখে! মাথা নিচু করে *ইয়েস স্যার* বলে উপস্থিত বন্ধুর অনুপস্থিত বন্ধুকে একরকম বাঁচায়। এই উপস্থিত আবার

যখন অনুপস্থিত হবে, তখন আগের সেই অনুপস্থিত উপস্থিত থেকে নতুন অনুপস্থিতকে বাঁচাবে।

সেঁজুতির চতুর্থ সংখ্যা নিয়ে পড়েছি। কলকাতা থেকে চিঠি, কবিতা,সাহিত্যপত্রিকা, বই ইত্যাদি আসে। নির্মল বসাক সময়ের খেলনা পাঠিয়েছেন, অভিজিৎ ঘোষের *নিঃসঙ্গ মানুষ* এসে দাঁড়ায় সামনে। তাঁদের কবিতাপত্রিকা সৈনিকের ডায়রি, ইন্দ্রাণী নিয়মিত পাচ্ছি। মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতিশ সাঁতরা, চিত্রভানু সরকার, শান্তি রায়, বিপ্লব ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র কুমার দেব, প্রণব মুখোপাধ্যায় কবিতা পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কবিতা পৌঁছতে থাকে হাতে। আলমগীর রেজা চৌধুরী, আহমদ আজিজ, খালিদ আহসান, জাহাঙ্গির ফিরোজ, মিনার মনসুর, মোহন রায়হান, রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, রমেশ রায়, হারুন রশিদ, সাজ্জাদ হোসেন এরকম আরও অনেকের লেখা পরপর সাজিয়ে নিই। চন্দনার কবিতা *হার্দিক রাইফেল* নামে। আমারটির নাম দিয়েছি *বুর্জোয়া কষ্টরা এসে আমার হৃদয় ধর্ষণ করছে।* দুই বাংলার সাহিত্য পত্রিকা প্রতিদিন দশ বারোটি করে আসে। জমিয়ে রাখি টুকিটাকি খবরের জন্য। দশ পৃষ্ঠাই চলে যায় টুকিটাকিতে। চতুর্থ সংখ্যা সেঁজুতিতে, ছোটদাকে জানিয়ে দিই, বিজ্ঞাপন দরকার। এটি বই আকারে বের করছি, বৃহৎ কলেবরে যাকে বলে। ছোটদা পিপুলস টেইলার্স, আর টিপটপ কনফিকশনারির দুটো বিজ্ঞাপন যোগাড় করে আনেন। বেঙ্গল এন্টারপ্রাইজের জিঙ্ক লোগো দিয়ে শেষ পাতায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন ধন। বই আকারে হবে তো বোঝা গেল, কিন্তু প্রচ্ছদ করবে কে? প্রচ্ছদ করার জন্য ছোটদাকে বলি শিল্পী যোগাড় করতে। গোলপুকুর পাড়ে পোড়ামাটি-শিল্পী অলক রায়ের ভাই পুলক রায় আড্ডা দিতে আসে, তার কাছে ছোটদা খবর পান অলক রায় শহরে নেই। সুতরাং অলক রায়ের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই, ছোটদার হাতে আর কোনও শিল্পী নেই। অতএব আমি নিজেই একটি মেয়ের মুখ এঁকে ছোটদাকে পাঠাই ব্লক করে আনতে। এরপর তো তাগাদা, *কই এত দেরি হইতাছে কেন, আইনা দেও।* কিছুতেই দেরি সয় না আমার। সবকিছু ইচ্ছে করে আজই করে ফেলি। এক্ষুনি। এই এক্ষুনি করে ফেলার স্বভাবটি মার মধ্যেও আছে। মা শাদা টেট্রনের কাপড় পেলেন একগজ বাড়ির ছেলেদের টুপি বানানোর জন্য, ঈদের আগে আগে। কাঁচিতে দুটো টুপির কাপড় কাটা হয়েছে, এবার তৃতীয় টুপির কাপড়টি কাটার জন্য হাতের কাছে মা আর কাঁচি পাচ্ছেন না, কাঁচি পাচ্ছেন না, আশেপাশে খুঁজলেন, এঘর ওঘর খুঁজলেন খানিক, এরপর বটি হাতে নিলেন, বটি দিয়েই কাটলেন কাপড়। ছোটদাও বলেন আমার ধৈর্য নেই। জমান প্রিন্টার্সের লোকরাও। আমার কিন্তু মনে হয় না আমার ধৈর্য কিছু কম, বরং মনে হয় মানুষগুলো বড় ঢিলে, যে কাজটি পাঁচ মিনিটে হয়ে যায়, সে কাজটি করতে পাঁচ দিন লাগায়। আমার বসে থাকতে ইচ্ছে হয় না। কবিতা লিখতে গেলেও দীর্ঘক্ষণ সময় নিতে ইচ্ছে করে না। সময় নিলেই মনে হতে থাকে কবিতা আমাকে শেকলে জড়িয়ে ফেলেছে। আমার দম বন্ধ লাগে। একটি কবিতার পর নতুন একটি কবিতা শুরু করতে ভাল লাগে। কিন্তু একটি নিয়ে রাত দিন পড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ঘষা মাজাও অত পোষায় না। যা লিখেছি লিখেছি। একজনের ধৈর্য দেখেছি, সে বড়মামার শ্বশুরমশাই। বেঁটে ফর্সা ভদ্রলোক, হিমালয়ের গুহা থেকে মাত্র বেরোনো কোনও সন্ন্যাসীর মত দেখতে। তিনি স্ত্রী মারা যাবার পর *বিরহ যাতনা* বলে একটি কবিতা লিখেছিলেন, দিয়েছিলেন দাদার *পাতা* পত্রিকায় ছাপতে। তিনশ একচল্লিশটি শব্দের কবিতায় দুশ ছিয়াশিটি শব্দই ছিল হয় যুক্তাক্ষর, নয় রফলা যফলা রেফঅলা শব্দ। তিনি গোটা একটি বছর নিয়েছেন কবিতা লিখতে। দাদা

পাতায় সেটি ছাপার পর দ্বিতীয় সংখ্যায় আবার একই কবিতা খানিক সংশোধন করে তিনি ছাপতে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় সংশোধিত কবিতা বের হওয়ার পর তিনি তৃতীয় সংখ্যার জন্য যখন একই কবিতার তৃতীয় সংশোধনী নিয়ে দাদার কাছে সকাল বিকাল ধরনা দিতে শুরু করলেন, একসময় এমন হল যে বড়মামার শ্বশুরমশাইএর শ্রীমুখখানা কালো ফটকের কাছে দেখলেই দাদা গোসলখানায় ঘন্টাখানিকের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

ক্লাস শেষে আমি বেশির ভাগ বাড়ির দিকে না ফিরে যেতে থাকি জমান প্রিন্টার্সের দিকে। জমান প্রিন্টার্স রাজবাড়ির ইশকুলের উল্টোদিকে একটি স্বচ্ছ সরোবরের পাশে। ছাপাখানার লাগোয়া বাড়িটি উঁচু দেয়াল ঘেরা। খুরশিদ খানের বাড়ি। খুরশিদ খানেরই ছেলে মন, ধন, জন। ধনের বড় ভাই মন দাদার পাতার আমলে ছিলেন। পরে দায়িত্ব চলে গেছে ধনের হাতে। অসম্ভব অমায়িক রসিক ভদ্রলোক ধন। ধোপদুরস্ত জামা কাপড় গায়ে। আমি ছাপাখানায় ঢুকলেই তিনি তাঁর ঘরে ডেকে আমাকে বসান। চায়ের কথা বলেন। বসিয়ে রাজ্যির গল্প করেন। খুরশিদ খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের ছোট ভাই, জাত মুসলিম লীগ। অথচ ধনকে দেখে মোটেও বোঝার উপায় নেই যে বংশের রাজনীতির মোটেও তিনি বাহক। এমন কোনও প্রসঙ্গ নেই, যা নিয়ে তিনি অনর্গল কথা বলতে পারেন না। মূলত আমি শ্রোতা, ধন মাঝে মাঝেই বলেন, *কি ব্যাপার আপনি সাহিত্য করেন, অথচ মুখ দিয়া কোনও কথাই বার হয় না আপনার। আমি অনেক কবি লেখকের কাছেই ঘেঁষতে চাই না ওদের কথার জ্বালায়।* ঠোঁটের স্মিত হাসিটুকু সম্বল করে আমি ধনের ধনচর্চা মনচর্চা জনচর্চা শ্রবণ করে সেঁজুতির যেটুকু ছাপা হয়েছে তা নিয়ে চলে আসি বাড়িতে, প্রুফ দেখে আবার পরদিন দিয়ে আসি। ছাপাখানার শ্রমিকদের সঙ্গে আমার ভাব হতে থাকে। ছাপাখানায় ঢুকলে, লক্ষ করি, ওদের মুখে প্রশান্তির ছাপ। *কি আপা কেমন আছেন?* আমাকে প্রতিবারই জিজ্ঞেস করেন কালিঝুলিমাখা শ্রমিকেরা। ধন না থাকলেও আমাকে বসতে দিয়ে চা নিয়ে আসে আমার জন্য। কাছ থেকে শ্রমিকদের কাজকর্ম দেখি, মেশিনগুলো কি করে চালাতে হয় শিখে নিয়ে নিজের হাতে চালাই। শ্রমিকেরা আমার *কাণ্ড* দেখে হাসে। কালি আমার গায়েও লাগে। ছাপাখানার বিষয়টি আমার কাছে আর দুর্বোধ্য বলে মনে হয় না। সেঁজুতি যেদিন ছাপা হল, মস্ত প্যাকেটগুলো রিক্সায় তোলার আগে ধনকে ছাপার খরচ দিতে গেলে তিনি বললেন, *আপনার মনে হয় টাকা বেশি হইয়া গেছে। যান যান। ওই কয়টা টাকা না নিলে আমি না খাইয়া মরব না।* চতুর্থ সংখ্যা সেঁজুতি ছাপা হয়ে বেরোলো, প্রচ্ছদ শাদা, ভেতরে সবুজ। প্রচ্ছদের কাগজ বাড়তি যা ছিল তা দিয়ে *সেঁজুতির প্যাড* বানিয়ে নিয়ে আসি। কাগজের ওপরে ডানপাশে *তসলিমা নাসরিন, অবকাশ, ১৮, টি এন রায় রোড, আমলাপাড়া আবাসিক এলাকা, ময়মনসিংহ।* আমলাপাড়ার লেজে এখানকার কোনও বাসিন্দা *আবাসিক এলাকা* জুড়ে দেয় না, এটি সম্পূর্ণই দাদার তৈরি। ঢাকার ধানমণ্ডির মত বড়লোকদের এলাকাকে আবাসিক এলাকা বলা হয়, আমলাপাড়ায় দোকান পাট নেই, লোক বসতি কেবল, এটিকে কেন আবাসিক এলাকা বলা হবে না! যুক্তি আছে বটে।

সেঁজুতি দিকে দিকে বিলি হয়ে যাওয়ার পর আবার অস্থির হই। কিছু একটা না করলে চলে কি করে। শতাব্দী চক্রের সদস্যদের ডেকে বলি, চল এবার একটা অনুষ্ঠান করি, নবীন বরণ অনুষ্ঠান। নতুন ছাত্র ছাত্রীরা ঢুকছে কলেজে, তাদের বরণ করব। কি হবে অনুষ্ঠানে? সব হবে, নাচ হবে, গান হবে, কবিতা হবে, নাটক হবে। কাজ ভাগ করে দেওয়া হল সদস্যদের, মঞ্চ সাজাও, মাইক ভাড়া কর, নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাও, বিলি কর,

প্রচণ্ড উৎসাহে ওরা নেমে পড়ল কাজে। অনুপম মাহমুদ টিপু, বিচিত্রায় ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দিত, সিনেপত্রিকায় লিখত, মিষ্টি মিষ্টি হাসে, হাতের লেখাও চমৎকার, ছবি আঁকেও ভাল, নামল মঞ্চ সাজাতে। আমার সঙ্গে মুমিনুন্নিসায় পড়ত উজ্জ্বলা সাহা, গান গাওয়ার অভ্যেস আছে, ওকে ধরলাম উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনাতে। অনুষ্ঠানের মহড়া শুরু হয়ে গেল, কেউ নাটক করছে, কেউ কবিতা, কেউ আবৃত্তি, কেউ গান। ছাত্র সংসদের সভাপতি আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ছাত্র সংসদের আগে কোনও দল নবীন বরণ করতে পারবে না। আগে সংসদ করবে, তারপর অন্যরা। এমন ক্ষুদ্র একটি দলকে ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই! দুচারটে তর্কসুরে বাক্য বিনিময়ের পর শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে সংসদকে পা বাড়াতে দিই আগে। দ্বিতীয় নবীণ বরণ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব শতাব্দির। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র ছেপে আনি। এনাটমির অধ্যাপক হারুণ আহমেদকে বলা হল সভাপতি হতে, তিনি এক পায়ে খাড়া, তাঁরও নাকি কবিতা লেখার অভ্যেস আছে, অনুষ্ঠানে কবিতাও পড়তে চাইলেন একটি। শুনেছি নির্মলেন্দু গুণ এ শহরেই আজকাল থাকেন, নীরা লাহিড়ী, গুণের বউ, আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়েন, কলেজের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। সেওড়াতলায় আঁতিপাঁতি করে খুঁজে গুণের বাড়ি পাওয়া গেল, বর্ষার জলে ঘর ডুবে আছে, বারান্দায় একটি চেয়ারে পা তুলে বসে কানে ছোট্ট একটি রেডিও চেপে ক্রিকেট শুনছিলেন তিনি। ঘরময় জল, আমন্ত্রণপত্রখানা তাঁর হাতে ধরিয়ে, শতাব্দির অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ার অনুরোধ করে চলে এলাম। নির্মলেন্দু গুণ থাকতে ঢাকা থেকে কবি আনার কোনও প্রয়োজন নেই। নাটকের জন্য ছোটদার বন্ধু ফরিদ আহমদ দুলালকে ধরলাম, তিনি কথা দিলেন একটি একক নাটক করে দেবেন অনুষ্ঠানে। অস্থির লাগছিল কী হয় কী হয়, আদৌ কোনও দর্শক আসে কি না। কিন্তু বেশ দর্শক এল, অনুষ্ঠান হয়ে গেল, কেউ বলল চমৎকার, কেউ বলল কবিতা আরও কমিয়ে দিলে পারতে, নাটকটা শেষে না রেখে মাঝখানে রাখলেই হত, কেউ কেউ বিষম উত্তেজিত, শতাব্দির পরের অনুষ্ঠান কবে হচ্ছে? সে জানি না কবে, ভাসছি তখন উতল হাওয়ায়, শরতের মেঘের মত হৃদয়ের সবটা আকাশ জুড়ে উজ্জ্বলার গাওয়া *আনন্দধারা বহিছে ভুবনে*র সুর।

ঢাকা থেকে গীতা চিঠি লিখল ছোটদাকে ঢাকা যেতে। ছোটদার নাকি কোথায় চাকরির ইন্টারভিউ আছে। ছোটদা আথিবিথি দৌড়ে ঢাকা গিয়ে সাতদিন পর ফিরলেন অবকাশে। ইন্টারভিউ দেওয়ার পর তাঁর চাকরি হয়ে গেছে। আমানুল্লাহ চৌধুরির অবদান এই চাকরি। তিনি বিমানের কর্তাব্যক্তিদের না *ধরলে* এ চাকরি হত না। ছোটদার মুখে *আমানুল্লাহ চৌধুরির মত লোক হয় না* ফুটতে থাকে খইএর মত। বাংলাদেশ বিমানে স্টুয়ার্ট হওয়ার ট্রেনিং নিতে তিনি ঢাকা চলে যাবেন, ওখানে বাড়ি ভাড়া নেবেন, ওখানেই থাকবেন। বিদায় অবকাশ, বিদায় বাবা মা, বিদায় ভাই বোন। বিদায় বলতে ছোটদার কণ্ঠ কাঁপে না, কিন্তু বিদায় শব্দটি শুনলে মাথা ঝিমঝিম করে আমার, বুকের ওপর দিয়ে এমন বোধ হয় যে একশ ঘোড়া দৌড়োচ্ছে, শব্দটি শুনলে একটি দৃশ্যের মধ্যে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি, ধু ধু মরুভুমি জুড়ে কোথাও কেউ নেই, কেবল একা আমি। এক গণ্ডূষ পানি পেতে চাইছি, একটি গাছের ছায়া চাইছি, একটি কোনও মানুষ দেখতে চাইছি, কিন্তু পাচ্ছি না কিছুই। কিন্তু ছোটদার মুখে হাসি লেগে থাকে। তিনি নিরলস বর্ণনা করতে থাকেন স্টুয়ার্টের মাহাত্ম্য।

বাবাকে খবর দেন মা, *কামাল চাকরি পাইছে।*

চাকরি আবার ও পায় কি কইরা? ও ত অশিক্ষিত। লেখাপড়া করে নাই। বাবা বললেন।

লেখাপড়া ওর কপালে নাই। ছোট বয়সে বিয়া করছে। এখন সংসার করতে চায়। চেষ্টা ত অনেক করছেন, ওর ত লেখাপড়ায় মন বইল না।

চাকরিডা কিয়ের শুনি? বাবা উৎসুক।

বিমানের ক্রু, খুব নাকি ভাল চাকরি, বিদেশ টিদেশ যাইতে পারব।

হায় রে ভাগ্য আমার, বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, *এক ছেলেরে মেডিকেলে পড়াইতে চাইলাম, চান্স পাইল না। ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স পড়তে গেল, মাস্টার্স পরীক্ষা না দিয়া বাড়িত ফিইরা আইল। আরেক ছেলে মেট্রিকে স্টার পাওয়া, সে লেখাপড়া ছাইড়া দিয়া অহন মানুষেরা ভাত খাওয়ানোর চাকরি লইছে, প্লেনে বইয়া মাইনষে হাগব, মুতব, বমি করবে, আমার ছেলে ওইগুলা পরিষ্কার করব। এই চাকরি করার জন্য আমি তারে পাঁচটা মাস্টার রাইখা পড়াইছি? এই চাকরি করার জন্য সে মেট্রিকে স্টার পাইছিল? ভালই, ডাক্তার রজব আলী, মানুষে জিগাস করবে, তোমার দুই ছেলে কি করে, বলতে হবে এক ছেলে ঘুইরা বেড়ায়, আরেক ছেলে উইড়া বেড়ায়।*

ছোটদার সঙ্গে আমার সখ্য যখন খুব, ছোটদা বিদায় নিচ্ছেন, চন্দনাও নিয়েছিল যখন চন্দনাই ছিল আমার এক এবং অদ্বিতীয় জগত। আমিই একা পড়ে থাকি যেখানে ছিলাম, সবাই আসে আর যায়। ছোটদা কথা দেন তিনি প্রায়ই ময়মনসিংহে আসবেন, প্রায়ই আমাকে ঢাকা বেড়াতে নিয়ে যাবেন। ঢাকা যাওয়ার সুযোগটি হয়েছে জেনেও আমার *মন কেমন করা* দূর হয় না। আমি মার মত হয়ত চিৎকার করে কাঁদি না, কিন্তু কাঁদি, গোপনে গোপনে কাঁদি।ছোটদার সঙ্গে আমার এমন নিবিড় সম্পর্কের কারণ,সাহিত্য। দাদার সাহিত্যজ্ঞান রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলে সীমাবদ্ধ, সাহিত্যাঙ্গনে নাটকাঙ্গনে সঙ্গীতাঙ্গনে ছোটদার টই টই ঘোরাঘুরির কারণে বা অন্য যে কারণেই হোক ছোটদার সাহিত্যজ্ঞান বিস্তৃতি পেয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গই আমাকে আনন্দ দিয়েছে বেশি। থানইটের মত মোটা উপন্যাসও দুজন পড়েছি একসঙ্গে। আমি পড়েছি ছোটদা শুনেছেন, ছোটদা পড়েছেন আমি শুনেছি। আমি শ্রোতাও যেমন হারাতে যাচ্ছি, পড়ুয়াও। হারাতে যাচ্ছি ছোটদার সঙ্গে গানের নাচের নাটকের কবিতার সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ। ছোটদার, লক্ষ করি, কোনও হারানোর ব্যথা নেই, বরং পাওয়ার আনন্দ। তিনি পেতে যাচ্ছেন ঢাকায় চাকরি, ভাল চাকরি, সচ্ছল সংসার,আলাদা সংসার। এতকাল অনিশ্চিতের সঙ্গে বসবাসের পর তিনি পেতে যাচ্ছেন নিটোলনিপাটনিশ্চিতি।

হাবিবুল্লাহর মত আরেকজন আমার পথ আটকাল একদিন, তবে বন্ধু হতে নয়, উদ্দেশ্য অন্য। কলেজ চত্বরেই, শ্যামগঞ্জীয় উচ্চারণে জানাল সে শফিকুল ইসলামের ভাই, ভাইয়ের মত সেও কবিতা লেখে, কলেজের নতুন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে, আমাকেও চাচ্ছে দাঁড়াই।

আমি?

হ্যাঁ তুমি।

আমি রাজনীতি করি না।

রাজনীতির কোনও প্রশ্ন নাই। তুমি সাহিত্য সদস্য পদে দাঁড়াইবা, কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনার দায়িত্বে থাকবা, ফাংশান টাংশান করবা, এইসব। তুমি হইলা যোগ্য।

ভোট চাইতে হয় তো! আমি ওগুলা পারব না।

ভোট চাইতে হইব না তোমার। তুমি এমনিতেই জিতবা। আরে পুরা প্যানেল, চোখ বন্ধ কইরা কইয়া দিতে পারি, জিতব।

ভোট চাইতে হবে না তো?

না মোটেও না।

ঠিক আছে।

আমি চত্বর থেকেই বাড়ির উদ্দেশে রিক্সা নিই, পেছনে ঝলকাতে থাকে হেলিমের আকর্ণবিস্তৃত হাসি, কালো মুখে শাদা দাঁত।

পরদিন হাবিবুল্লাহ আমাকে খপ করে ধরল, থমথমে মুখ, *কি ব্যাপার, তুই বি এন পি করস জানতাম না তো!*

আমি বি এন পি করি, কে বলল?

সবাই বলতেছে।

সবাই কারা?

সবাই কারা জানস না? তুই নির্বাচন করতেছিস বি এন পি থেকে? ঠিক কি না?

ওই কথা! হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু আমি কোনও দল করি না।

বিএনপির মত খারাপ দল আর আছে কোনও! ছাত্ররা সরকারি দল করে, সুবিধা আদায়ের তালে থাকে।

কী সুবিধা?

কী আর! পরীক্ষা পাশ। হাবিবুল্লাহ এপ্রোন খুলে ঘাড়ে ঝুলিয়ে বলল, *তুই আজকেই নাম কাটা, দাঁড়াবি, জাসদ থেকে দাঁড়া।*

হাবিবুল্লাহ নিজে জাসদ-ছাত্রলীগ করে, হাবিবুল্লারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাহমিদ, সেও জাসদ, চশমা চোখের ভাল ছেলে, ছুটে এল, হাবিবুল্লাহকে নাকি বলেওছিল যদিও আমি কোনও দল করি না, জাসদ থেকে সাহিত্য সদস্য কেন, সাহিত্য সম্পাদক পদে দাঁড়াব কি না, যদিও নিচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের করলে সদস্যই করা হয়, কিন্তু আমার বেলায় জাসদ উদার হবে। তাহমিদ জাসদ করা ছাত্রদের একটা তালিকা দেখাল, বলল *এরা সব স্ট্যান্ড করা ছাত্র। আর বিএনপির আনিস-রফিক? চার পাঁচ বছর ধরে এক ক্লাসেই পড়ে আছে।* জাসদ করা মানে তখন জাতে ওঠা। ছাত্রলীগেও দেখি এক পাল ফেল করা ছাত্রের ভিড়। ভাল ছাত্র ছাত্রীরা হয় জাসদ-ছাত্রলীগ অথবা ছাত্র ইউনিয়ন করে, নয়ত কোনও দলই করে না।

আমি সেদিনই হেলিমকে খুঁজে বের করে বলি *আমার নামটা কেটে দেন, আমি নির্বাচন করব না।*

কেন কি হইছে?

আমি রাজনীতির কিসু বুঝি না। ছেলেরা বলতেছে আমি নাকি বিএনপি করি।

আরে বোকা মেয়ে, জাসদের পোলাপানরা তোমার মাথাটা বিগড়াইয়া দিতাছে। বিএনপি কর না। কিন্তু বিএনপি থেকে দাঁড়াইতেছ যেহেতু বিএনপি জিতবে এইবার, দাঁড়াইতেছ কলেজের স্বার্থে, পার্টির স্বার্থে না। সোজা কথাটা কেন বুঝতে পারতেছ না? আর যদি এখন ছাত্রলীগ বা জাসদ থেকে কনটেস্ট কর, জেতার কোনও প্রশ্ন আসে না।

আমি চুপ হয়ে থাকি। গলায় স্বর ওঠে না, স্পষ্ট বুঝতে পারি, বড় একটি শক্ত *না* ছুঁড়ে দিলে হেলিমের মন খারাপ হবে, কারও মন খারাপ করে দিতে আমার অস্বস্তি হয় খুব। আমি হেলিম হয়ে নিজের দিকে তাকাই।

আর তাছাড়া লিফলেট ছাপা হয়ে গেছে। এখন কোনওমতেই কিসু ক্যানসেল করা

সম্ভব না। স্ক্যান্ডাল হইয়া যাবে।

আমাকে আরও চুপ হয়ে যেতে হয়। রফিক চৌধুরী আর আনিসুর রহমান ছাত্রদলের বড় দুজন নেতা আমার বাড়ি গিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বুঝিয়ে আসেন, আমি নির্বাচনে দাঁড়ানো মানে রাজনীতি করা নয়, কলেজের সাহিত্যসেবা করা।

নতুন নির্বাচনের মরশুম শুরু হল। সারা কলেজের দেয়ালে পোস্টার। মঞ্চে গরম গরম বক্তৃতা, ক্লাসের বেঞ্চে লিফলেটের ছড়াছড়ি, একটু পর পর বিভিন্ন দলের প্রতিযোগিরা ক্লাসে করিডোরে ক্যান্টিনে দেখা করছে, হেসে কথা বলছে, ভোট চাইছে। প্রতিটি দলের প্রতিটি ভোটপ্রার্থীকেই মনে হয় ভোট দিই। ছাত্রদলের সভাপতি আনিসুর রহমান আমাকে চা খাইয়ে, এক গাল হেসে বলেন, *চল নির্বাচনী প্রচারণায়।*

অসম্ভব।

রফিক চৌধুরি বললেন *পার্টির মেয়ে, এত লাজুক হলে চলবে!*

পার্টির মেয়ে আমি! অন্যরাও বলাবলি করে। এ রইল আমার গায়ে সেঁটে। যাই হোক, নির্বাচনের দিন কলেজে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ আর জাসদের ভাল ভাল ছেলেমেয়েদের, যাদের যোগ্য মনে হয়েছে, বিভিন্ন পদে, ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। পরদিন খবর পেলাম, ছাত্রদল মানে আনিস রফিক পরিষদ পুরো প্যানেল জিতেছে। গতবার জিতেছিল ছাত্রলীগ, এবার ছাত্রদল। এখন কি কাজ? ঢাকায় যেতে হবে, দেশের প্রেসিডেন্টর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

নিস্প্রভ ছিলাম। ঢাকা যাওয়ার কথায় প্রাণ ফিরে পাই। দল বেঁধে ঢাকা যাওয়া হল বাসে। দল বেঁধে একই বাসে ফেরাও হবে। ঢাকা আমাকে কাঁপায় তীব্র উত্তেজনায়। রুদ্রর সঙ্গে দেখা হওয়ার উত্তেজনা। জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর হেলিম আমাকে ছোটদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায় রাতে। মুহম্মদপুরের আজম রোডে একতলা হলুদ বাড়িতে থাকেন ছোটদা। ফকরুল মামার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন তিনি। ফকরুল মামা ঢাকার গ্রাফিকস আর্টসে লেখাপড়া করে ছোটখাটো চাকরি করছেন। ছোটদার ঘর সংসার দেখে আমার ভালও লাগে, আবার কষ্টও হয়। কষ্ট হয় ছোটদা অবকাশ ছেড়ে অত দূরে থাকেন বলে। ভাল লাগে, ছোটদার স্বপ্ন সফল হয়েছে বলে, একটি ভাল চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন। চাকরিটি নিয়ে ছোটদার উচ্ছাস খুব, এমন ভাল চাকরি নাকি আর হয় না। তিনি যখন তখন বিদেশ যেতে পারবেন, টাকাও নাকি প্রচুর। আমাকে তিনি পরদিন দাঁতের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, ডাক্তারটি আবার ছোটদার বন্ধু, ময়মনসিংহের অলি গলিতে যেমন ছোটদার বন্ধু, ঢাকার অলিগলিতেও। ভীষণ কষ্ট দিয়ে আমার একটি দাঁত তুলে ফেলল বন্ধুটি।। দাঁত নিয়ে ছোটদা সবসময়ই বড় সচেতন। তিনি যখন প্রথম জ্যামিতিবক্স পেয়েছিলেন ইশকুলের বড় ক্লাসে পড়ার সময়, কাঁটা কম্পাসে ঢুকিয়ে আমার দাঁতের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা মাংস এনে দিতেন আর বলতেন, *দাঁত পরিষ্কার না করলে দাঁত সব পইরা যাইব কইলাম।* সেই দাঁত সচেতন ছোটদার চাপে আমার ভাল দাঁতও মনে হয় দাঁতের ডাক্তার তুলে ফেলার প্রেরণা পায়। *পচা দাঁত থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল,* ছোটদা নাক কুঁচকে বলেন। তুলে ফেলা দাঁতের গোড়ায় তুলো চেপে বাড়ি ফিরি। ঢাকা এসেছি অথচ রুদ্রর সঙ্গে দেখা হবে না--দাঁতের কষ্টের চেয়ে এই কষ্টটি আমাকে ভোগায় বেশি।

ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে ফিরে বাড়ির সবাইকে তারস্বরে জানিয়ে দিলাম, *জিয়াউর রহমানের সাথে হ্যান্ডসেক কইরা আইছি, আমার হাতের হাড্ডি ভাইঙ্গাই যাইতাছিল, এমন জোরে চাপ দিছে হাতে।*

আর্মি মানুষ তো! শইলে জোর বেশি। মা বললেন।

মা সরে যান, মার নিস্পৃহ মুখটি চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকে, মার নিরুত্তাপ শব্দগুলোও। মনে মনে ভাবি জোর নিশ্চয়ই বেশি। জোর বেশি বলেই তিনি জোর খাটিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। বিমান বাহিনীতে জিয়ার ওপর অসন্তোষ গোপনে গোপনে বেড়েছিল, যে কোনও সময় একটি ক্যু হতে পারে আঁচ করে হাজার হাজার বিমানবাহিনীর লোককে নির্বিচারে হত্যা করেছেন। গর্তে লুকিয়ে থাকা স্বাধীনতার শত্রুদের পুনর্বাসন দিয়েছেন। শাহ আজিজের মত দেশের শত্রুকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এদেশে, সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়েছেন। এখন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে সাপগুলো আবার ছোবল দেবে বলে যেভাবে দিয়েছিল একাত্তরে, যেভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষ হয়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। সংবিধানকে বাপের সম্পত্তি মনে করে নিজে হাজম হয়ে মুসলমানি ঘটিয়েছেন সংবিধানের। কোরান পড়তে গেলে যে *বিসমিল্লাহির রাহমান ইররাহিম* অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি বলতে হয়, তা বসিয়েছেন সংবিধানের শুরুতে। দেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব ধর্মের মানুষকে জুতো পেটা করলেও বুঝি এর চেয়ে বেশি অপমান করা হত না। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। জোর তো তার বেশিই। হাতটি আমি গোসলখানায় গিয়ে সাবান দিয়ে ধুই, যেন যায়, যেন একটি কালো স্পর্শ আমার হাত থেকে মুছে যায়।

রুদ্র ময়মনসিংহে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলল, *তোমার মাথামুণ্ডু আমি বুঝি না, তুমি নাকি বিএনপি থেকে নির্বাচন করেছ? আমাকে আগে জানাওনি কেন?*

জানাইনি।

কেন জানাওনি?

সব কথা জানাতে হবে নাকি!

জানাতে হবে না?

না।

ঠিক আছে, যা ইচ্ছে তাই কর। মান সম্মান তুমি আর রাখলে না!

নির্বাচনের হল্লা শেষ হতে না হতেই ক্লাস শুরু হয়ে গেল পুরোদমে। তলপেট থেকে আমার বুকে উত্তরণ ঘটেছে। মরা মানুষ কাটতে হচ্ছে একদিকে। আরেকদিকে ট্রেতে করে ফরমালিনে ভেজা হৃদপিণ্ডের আগাগোড়া পড়তে হচ্ছে। মরা মানুষ কেটে বাড়ি ফিরে যখন খেতে বসি, হাতে গন্ধ লেগে থাকে, আস্ত সাবান খরচ করে হাত ধুলেও হাত থেকে গন্ধ যায় না। গন্ধের সঙ্গে বসবাসের অভ্যেস হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। একদিন তো খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখি হাতের কিনারে মরা মানুষের মাংস লেগে আছে, হাত ধুতেই ভুলে গিয়েছিলাম খাবার আগে। আর পকেটে করে যেদিন হৃদপিণ্ড বাড়ি আনলাম পড়তে, বাড়ির সবাই জিনিসটি দেখল, নাক চেপে, মুখ চেপে, বিস্ফারিত চোখে। আমি দিব্যি হৃদপিণ্ডটি টেবিলের ওপর রেখে কানিংহামের বই খুলে পড়তে শুরু করলাম, ওদেরও দেখাতে থাকি এই হচ্ছে এট্রিয়াম, আর এই হচ্ছে ভেন্ট্রিকেল, এই এখান দিয়ে রক্ত আসে, ওপর থেকে নিচে, তারপর নিচ থেকে রক্ত চলে যায় ওপরে, চলে যায় সারা শরীরে। মার দু চোখে অপার আনন্দ।

এই তো মা আমার ডাক্তার হইয়া গেল, আমার আর চিন্তা কি, আমার চিকিৎসা আমার মেয়েই করবে। মা বলেন।

দাদার প্রশ্ন, *এইটা পুরুষের হার্ট নাকি মেয়েমানুষের?*

তা জানি না।

দেইখা ত ছোট মনে হইতাছে,মনে হয় কোনও মেয়ের হার্ট।

মেয়েদের হার্ট ছোট হয় তোমারে কে কইল!

একটু ডিফারেন্ট থাকবে না!

না, ডিফারেন্ট থাকবে না।

ইয়াসমিন হৃদপিণ্ডকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে বলে, *বুবু, এইটারেই কি হৃদয় কয়?*

হৃদয় হয়ত কয়। কিন্তু এইটা হৃদপিণ্ড, হৃদয় না। হৃদপিণ্ডের কাজ রক্ত পাম্প করা, সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করা।

তাইলে হৃদয় কোনটা?

হৃদয় হইল মাথা। ধর আমার কাউরে ভাল লাগল, আমার স্নায়ুতন্ত্রে খবর হবে প্রথম। স্নায়ুর ঘর বাড়ি হইল মাথায়, বুকে না। বুকে যে ধ্বক শব্দ হয়, সেইটা মাথার স্নায়ুতে নড়চড় হয় বইলা।

ইয়াসমিন অবিশ্বাসী চোখে তাকায় পিণ্ডটির দিকে।

হাবিবুল্লাহর সঙ্গে জড়তা ঝেড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলে,একটি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক গড়ে তুলে, ছেলে মেয়েতে যে বন্ধুত্ব হতে পারে এবং তা যে কেবল চিঠিতে নয়, তা প্রমাণ করে আমার আনন্দ হয়। অবকাশে হাবিবুল্লাহর অবাধ যাতায়াত ক্রমে চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। এই সম্পর্কটি ভবিষ্যতে স্বামী স্ত্রী পর্যন্ত গড়াবে এরকম একটি চিন্তা মাথায় এনে মা যখনই কোনও রকম স্বস্তি পেতে চান, মার অলীক কল্পনা ভেঙে দিয়ে বলি, *হাবিবুল্লাহ হইল আমার বন্ধু, জাস্ট বন্ধু, আর কিছু না। চন্দনার সাথে আমার যেরকম বন্ধুত্ব, ঠিক সেইরকম বন্ধুত্ব, বুঝলা!* আমার উত্তর মাকে খুব সুখী করে বলে মনে হয় না। হাবিবুল্লাহ দেখতে সুন্দর, নম্র ভদ্র, দুজনই আমরা ডাক্তার হতে যাচ্ছি, এর চেয়ে ভাল জুটি আর হয় না এধরনের কথা মা আমার কাছে না হলেও মিনমিন করে বাড়ির অন্যদের বলেন। আমার কানে সেসব শব্দের কণামাত্র এলে মাকে আমি ধমকে থামিয়ে দিই। আমি নিশ্চিত সম্পর্কটি কেবল নির্মল বন্ধুত্বের। হাবিবুল্লাহও নিশ্চিত। তার সঙ্গে এক রিক্সায় বসে কোথাও যেতে আসতে আমার কোনও রকম গা কাঁপে না। দাদার সঙ্গে বা ইয়াসমিনের সঙ্গে বা চন্দনার সঙ্গে রিক্সায় বসার মত। হাবিবুল্লাহ জানে যে রুদ্রর সঙ্গে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠছে আমার, ফাঁক পেলেই রুদ্রর কবিতা তাকে শোনাই। কিন্তু আমাকে স্তম্ভিত করে হাবিবুল্লাহ একদিন সন্ধেয় বাড়িতে এসে আমাকে *তুমি* বলে সম্বোধন শুরু করে।তুই সম্বোধন নাকি তার ভাল লাগে না! কেন ভাল লাগে না এই প্রশ্ন করে কোনও উত্তর নয়, একটি সলজ্জ হাসি জোটে। হাসিটির কোনও অনুবাদ করা আমার সম্ভব হয় না। হাসিটি আমাকে অস্বস্তি দেয়, একই সঙ্গে আতঙ্কও। সামনে থেকে উঠে যাই, শোবার ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকি বিষণ্ণতাকে দুহোতে জড়িয়ে। বৈঠক ঘরের সোফায় বসেই থাকে হাবিবুল্লাহ, দীর্ঘ একটি চিঠি লিখে ইয়াসমিনের হাতে দেয়। ইয়াসমিন ঘরে আলো জ্বেলে চিঠিটি আমাকে দিয়ে যায় পড়তে। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটির সারমর্ম এই, আমাদের এমন চমৎকার বন্ধুত্ব যে কোনও সময় হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি একটি স্থায়ী সম্পর্কে আসা যায়, তবে হারানোর প্রশ্ন ওঠে না। আর নিজেও সে ভেবে দেখেছে, নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করে দেখেছে, উত্তর একটিই আমাকে সে ভালবাসে। বন্ধুত্বের উর্ধে এই সম্পর্কটি কি আমি নিয়ে যেতে পারি না! চিঠিটি পড়ে আমি স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কুঁকড়ে যাই। অপমান আর লজ্জা আমাকে ছিঁড়ে খেতে

থাকে। নিজেকে ওই বেদনা থেকে টেনে নিয়ে একটি ক্রোধের পেছন পেছন আমি হেঁটে যাই বৈঠক ঘরে। চিঠিটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাবিবুল্লাহর মুখের ওপর ছুঁড়ে চিৎকার করে বলি, *এক্ষুনি এ বাড়ি থেকে বার হয়ে যা। এক্ষুণি। আমি যেন কোনওদিন তোর মুখ না দেখি।*

হাবিবুল্লাহ, *নদ্র ভদ্র সুদর্শন, ডাক্তার হতে যাওয়া হীরের টুকরো ছেলে* অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে যায়। এরপর কলেজে আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে চেয়েছে সে,কোনও সুযোগ তাকে দিইনি। অনেকদিন বাড়ির দরজায় কড়া নেড়েছে, দরজা খুলিনি।

আবু হাসান শাহরিয়ার, ছড়া লিখে নাম করেছে, সেও আমার সঙ্গেই পড়ে মেডিকেলে। ওর সঙ্গে কখনও কথা হয়নি আমার। আমার এপ্রোনের পকেটে একদিন ও মরা মানুষের একখন্ড মাংসের সঙ্গে একটি চিরকুট আমার অজান্তে ফেলে রাখে, চিরকুটে ছড়া। ভীষণ বিরক্ত আমি শাহরিয়ারের ব্যবহারে, সাহিত্যের জগতের কেউ যে এত বদ হতে পারে আমার ধারণা ছিল না। বদ ছেলেটি এর কদিন পরেই মরা কাটায় অতিষ্ঠ হয়ে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চলে যায়। ছেলে বদ হোক আর যা-ই হোক, ডাক্তারি বিদ্যা ছেড়েও যে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায় তা আমার বিশ্বাস হয়। কিন্তু বাবা বেঁচে থাকতে তা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, সে আমি ভাল জানি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় পড়ার যে স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্ন সুব্রত চাকমার কারণে পূরণ হয়নি চন্দনার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে বলে ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যখন যোগাড় করছিল, ওর মেট্রিকের *মার্কসিট* তোলা ছিল না বলে আবাসিক আদর্শ বালিকা বিদ্যায়তনে, যেটি সম্প্রতি ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজে রূপ নিয়েছে, গিয়ে *মার্কসিট* যোগাড় করে ওকে পাঠিয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে চন্দনা এ মাসে ভর্তি না হলেও আগামী মাসে হবে এরকম যখন খবর, ওকে উপজাতির কোটায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন সুব্রত চাকমা, নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে। চন্দনা চট্টগ্রাম থেকে লিখছে, ওর মড়া কাটতে ভাল লাগে না। কুমিল্লায় ফেলে যাওয়া কোনও এক সুদর্শনএর কথা ও গভীর করে ভাবছে, সেই সুদর্শন চিঠি লিখেই যাচ্ছে চন্দনাকে, চন্দনাকে ছাড়া *সে বাঁচবে না* জাতীয় চিঠি। মড়ার গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে জীবিতর ঘ্রাণ নিতে চন্দনাও এক রাতের সিদ্ধান্তে চট্টগ্রাম ছেড়ে কুমিল্লা চলে যায়। কুমিল্লা থেকে হঠাৎ একদিন জানায় ও বিয়ে করেছে ওই *বাঁচবে না*কে। এর চেয়ে যদি খবর পেতাম, চন্দনা মরে গেছে, আমার বিশ্বাস হত। বিয়ে আর যে কাউকে করা মানায়, চন্দনাকে নয়। এর চেয়ে বড় কোনও দুঃসংবাদ পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। নিঃসঙ্গতার বিকট লোমশ হাত আমার কণ্ঠ এমন সজোরে চেপে ধরে যে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। দৌড়ে ছাদে গিয়ে সকলের আড়াল করি নিজেকে। চন্দনাকে নিয়ে এক আকাশ স্বপ্ন ছিল আমার, সেই স্বপ্নের ওপর পুরো জগতটিকে দেখি ভেঙে পড়তে। ভাঙনের স্তূপে আমি শূন্য হাতে একা দাঁড়িয়ে আছি, একা, এত একা যে হঠাৎ নিজের কোনও অস্তিত্ব আমি অনুভব করি না, মাথার ওপর অন্ধকার আর শিশির ঝরে পড়ে ঝুপঝুপ করে, তারপরও না। মাস গেলে চন্দনার বাবা ডাক্তার সুব্রত চাকমার একটি চিঠি আসে আমার কাছে, আমাকেই লিখেছেন তিনি। *চন্দনা তাঁকে যে অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ তিনি যে করেই হোক নেবেন। চন্দনাকে এ পৃথিবীতে বাঁচতে দিতে তাঁর অন্তত কোনও ইচ্ছে নেই।* আমি দুদিন ভয়ে কাঠ হয়ে থেকে সুব্রত চাকমাকে লিখি চন্দনাকে যেন তিনি ক্ষমা করেন, ও ভুল করেছে এ স্বীকার করেই বলি, নিশ্চয়ই

একদিন বুঝতে পারবে নিজের ভুল। সুব্রত চাকমা আমার চিঠির কোনও উত্তর দেন না। কিন্তু আবারও মাস গেলে তাঁর একটি চিঠি পাই, তিনি আমাকে নেমন্তন্ন করেছেন রাঙামাটিতে, চন্দনার শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে। নিজের মেয়ের শ্রাদ্ধ করছেন তিনি। জাতচ্যুত মেয়েকে তিনি মেয়ে বলে স্বীকার করেন না, বৌদ্ধ মেয়ে পালিয়ে গিয়ে মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করেছে, এই মেয়ে মরে গেছে বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। সুব্রত চাকমার এই ভয়াবহ সিদ্ধান্ত শুনে চন্দনার জন্য আমার বড় মায়া হতে থাকে। ইচ্ছে করে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে সেই সুদর্শন দুর্বৃত্তের কবল থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসি। মন বলে চন্দনা ভাল নেই। কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদছে। আমারও ভাল লাগে না সারাদিন লাশের গন্ধ আর ফরমালিনে ঝাঁজের মধ্যে মোটা মোটা বইয়ে ঝুঁকে থাকতে। কলেজে *খারাপ ছাত্রী* হিসেবে আমার নাম ছড়াতে দেরি হয় না।

বিপর্যস্ত আমি কলেজে যাই, আসি। একদিন কলেজের অধ্যক্ষ ফর্সা লম্বা হাসি মুখ মোফাখখারুল ইসলাম আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে মুখের হাসিটি গিলে চোখের জ্যোতিটি নিভিয়ে খাম খুলে একটি টাইপ করা চিঠি হাতে নেন। চিঠিটি আমি চিনি। এ চিঠির একটি কপি আমি কদিন আগে পেয়েছি।

তুমি তো ডাক্তার রজব আলীর মেয়ে, তাই না?

আমার কণ্ঠে কোনও স্বর ওঠে না। মাথা নাড়ি।

আমার স্বর না ওঠা কণ্ঠের দিকে, আমার ভয়-লজ্জার নতচোখে তাকিয়ে মোফাখখারুল ইসলাম তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব কর্কশ করা যায় করে বলেন, *তোমার ভাই এর নাম কি নোমান?*

আমি মাথা নাড়ি।

আরেক ভাইএর নাম কি কামাল?

এবারও মাথা নাড়ি।

কামালের বউএর নাম কি গীতা?

এবারও মাথা।

তোমার ছোট বোনের নাম ইয়াসমিন?

মাথা।

মাথা মোফাখখারুলও নাড়েন। এর অর্থ হাতে ধরে রাখা চিঠিটির সত্যতা তিনি যাচাই করতে পেরেছেন। চিঠিটি, মোফাখখারুল ইসলাম জানেন না, যে আমি আগেই পড়েছি। আবদুর রহমান চিশতি নামের মাথা খারাপ একটি লোক আমাকে নিজেই এই চিঠির কপি পাঠিয়েছে। লোকটি দিস্তা দিস্তা চিঠি পাঠাতো আমাকে। শখের পত্রমিতা হয়েছিল কদিনের জন্য। ওসব দিস্তা দিস্তা পাতার চিঠিতে রূপকথা থেকে শুরু করে পৃথিবীর বাণিজ্যনীতি সম্পর্কে কঠিন কঠিন রচনা থাকত। বেশির ভাগই আমার পড়া হত না। সেই লোক হঠাৎ একদিন প্রেম নিবেদন করে বসার পর আমি চিঠি লেখা বন্ধ করে দিই। তারপরই এই হুমকি। আমি যদি সাড়া না দিই, তবে আমার ক্ষতি করবে সে এভাবে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে সরাসরি চিঠি লিখে জানাবে যে আমার বংশের সকলের চরিত্র থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। আমার বাবা শুয়েছে গীতার সঙ্গে, আমার বোন শুয়ে বেড়ায় এদিক ওদিক। আমি তো আছিই। আমি তো শুয়েছিই চিশতির সঙ্গে, কেবল তার সঙ্গে নয়, তার সব বন্ধুর সঙ্গেও। আমার দুভাইএরও একই অবস্থা। মেয়ে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। শোয়। ইত্যাদি। কেবল শোয়াশোয়ির গল্প। মোফাখখারুল ইসলাম, আমি অনুমান করি, বিশ্বাস করছেন চিঠিটির প্রতিটি শব্দ।

বড় একটি শ্বাস ছেড়ে বলি, *এটি একটি উড়ো চিঠি। এ চিঠির কথা আমি জানি। চিশতি নামের এক লোক এই চিঠি লিখেছে। লোকটিকে প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি বলে শোধ নিয়েছে।*

মাননীয় অধ্যক্ষের সারা মুখে বিদ্রূপ ঝলসাচ্ছে। ঠোঁটে বাঁকা একটি হাসি।

তুমি নিজেকে খুব চালাক মনে কর তাই না? প্রশ্ন করেন।

আমি উত্তর দিই না।

তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝি না?

আমি নিরুত্তর।

তোমার মত বাজে মেয়েকে আমি এই কলেজে রাখব না। টিসি দিয়ে দেব। শিগগিরি।

এবার আমি আমূল কেঁপে উঠি। সামনে দুলে ওঠে অধ্যক্ষের ঘর, অধ্যক্ষ, চিঠি। আমার সরল সত্য অধ্যক্ষ মেনে নেননি। মেনে নিয়েছেন একটি উড়ো চিঠি, যে চিঠিতে চিঠির লেখকের কোনও নাম নেই, কারও কোনও স্বাক্ষর নেই। যে চিঠির লেখককে অধ্যক্ষ চেনেন না, চেনেননা লোকটির কথাই তাঁর কাছে সত্য, চেনেন মেয়েটির কথা সত্য নয়। অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে লক্ষ করি কারও সঙ্গে আমি কথা বলতে পারছি না, আমি আড়াল করতে পারছি না চোখের সজল যন্ত্রণা। বাকি কোনও ক্লাস না করে সোজা বাড়ি ফিরি। শুয়ে থাকি দেয়ালের দিকে মুখ করে বিছানায়। ইয়াসমিন এলে পুরো ঘটনা বলি। মোফাখখারুল ইসলামের মেয়ে শারমিন ইয়াসমিনের ক্লাসে পড়ে বিদ্যাময়ী ইশকুলে। খুব সহজ শারমিনের কাছ থেকে ওদের পরিবারের সবার নাম যোগাড় করা। এরপর খুব সহজ একটি চিঠি লেখা। খুব সহজ চরিত্রে কালিমা লেপা। খুব সহজ চিঠিটি ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া। এতে অন্তত উড়ো চিঠি কাকে বলে, এই শিক্ষাটি তিনি পাবেন। শিক্ষাটি দিতে কেবল হাত নয়, মন নিশপিশ করে। কিন্তু নাম যোগাড় হওয়ার পর চিঠিটি লিখতে গিয়েও আমি লিখি না। আমার রুচি হয় না লিখতে। *কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়েছে পায়..* বলে লিখতে যাওয়া চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলি।

কলেজে যাই যদিও, ক্লাসে মন বসে না। করিডোরে হাঁটতে গেলে মোফাখখারুল ইসলাম সামনে পড়লে যেন সামনে কোনও মানুষ পড়েনি, যেন ফাঁকা, এভাবে হেঁটে যাই। সাধারণত সামনে কোনও শিক্ষক পড়লে হাত তুলে সালাম দিতে হয়। নিয়মটি আমার কোনওদিনই ভাল লাগে না। আমি এমনিতেও ব্যাপারটি এড়িয়ে চলি। এড়িয়ে চলি বলে অভদ্র বলে আমার দুর্নাম রটে। সেই দুর্নামকেও পরোয়া করি না বলে আমি আপাদমস্তক একটি হাস্যকর বস্তু হিসেবে পরিচিত হই। পরীক্ষায় পাশ করতে হলে সালাম ছাড়া নাকি গতি নেই, এরকম ফিসফিস শুনি। ফিসফিস থেকে আমার নাক কান মুখ মন সব সরিয়ে রাখি। জরুরি ক্লাস যা আছে করেই কলেজ থেকে বেরিয়ে যাই। বইয়ের দোকান থেকে রাজনীতি সমাজ সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের বই কিনে বাড়ি ফিরতে থাকি। বিকেলে ইয়াসমিনকে নিয়ে এদিক ওদিক বেড়াতে যেতে থাকি, পাবলিক লাইব্রেরিতে ভাল ভাল আলোচনা অনুষ্ঠানে যাই। কিছু না কিছু থাকে প্রায়ই। আর কোথাও যাবার না থাকলে পদ্মরাগমণির বাড়ি গিয়ে কবিতা নিয়ে গল্প করি, নয়ত নাটকঘরলেনে ইশকুলের বান্ধবী মাহবুবার বাড়িতে উঠোনের রোদে শীতল পাটিতে বসে চা মুড়ি খেতে খেতে সহজ সরল জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলি, নয়ত নানিবাড়িতে রেললাইনের ওপারে সেই কতকাল আগে ফেলে আসা ছোট্ট চড়ুই ছানা, ছেঁড়া ঘুড়ি, নীল বেলুন, পানা পুকুর, পুঁতির

মালার নিভৃত জগত থেকে ঘুরে আসি। মা বলেন, *এইযে দুইটা মেয়ে এইরকম একলা একলা বাইরে যাস, মাইনষে কি কইব?*

যা ইচ্ছা তাই কউক।

তগোর সাহস বেশি বাইড়া গেছে।

দোষ ত কিছু করতাছি না।

তর বাপ যদি জানে। ঠ্যাং ভাইঙ্গা বাড়িত বওয়াইয়া রাখব।

ভাঙুক। বলে আমি মার সামনে থেকে সরে যাই। মার এই ঘ্যানঘ্যানে বড় বিরক্তি ধরে আমার।

চন্দনা আর আগের মত ঘন ঘন চিঠি লেখে না। যা লেখে তা শ্বশুর বাড়ির গল্প। আগের মত চন্দনা আর স্বপ্নের কথা বলে না। আর কবিতাও লেখে না। অনেক বদলে গেছে ও।

হালকা হালকা বন্ধুত্ব হওয়া ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আসে বেড়াতে, আড্ডা দিতে, খেতে। ঢাকায় বাড়িঘর ফেলে পারিবারিক পরিবেশ থেকে দূরে হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করা এরা স্বাদ পেতে চায় কোথাও *ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ের,* মায়ের হাতের রান্নার মত রান্নার। এদের সঙ্গে সময় উড়তে থাকে আমার।

আবারও কবিতায় পায় আমাকে। সেঁজুতি ছাপার নেশা দপদপ করে জ্বলে। অগুনতি সাহিত্য পত্রিকা, কবিতার খাতা আর সেঁজুতির পাণ্ডুলিপির ওপর বাবা একদিন বস্তা উপুড় করে এক শরীর হাড়গোড় ঢেলে বললেন *যা দেখতাছি, দশ বছরেও তর মেডিকেল পাশ হইব না।*

চাকরি নেওয়ার পর থেকে দাদা অবকাশের চেহারা ধীরে ধীরে পাল্টে ফেলতে শুরু করেছেন। বৈঠকঘর থেকে বেতের সোফা বিদেয় করে নরম গদিঅলা কাঠের সোফা বসিয়েছেন। চার পাঅলা একটি টেলিভিশন কিনে বৈঠকঘরে বসিয়েছেন। বিশাল সেগুন কাঠের পালঙ্ক বানিয়ে আনলেন অভিনব এক *হেডবোর্ড* সহ, আঙুর গাছের তলে পুরুষ রমণী উলঙ্গ শুয়ে আছে। *হেডবোর্ডের* দুপাশে আবার ছোটছোট নকশাকাটা ড্রয়ার। এক একটি আসবাব আসে বাড়িতে আর আমরা দূর থেকে কাছ থেকে ছুঁয়ে না ছুঁয়ে দেখি। আয়নার টেবিলও আনলেন, সেটিও বিশাল, নানারকম নকশা অলা। সিংহের পা অলা দশজনে বসে খাবার এক খাবার টেবিল আনলেন। আবার থালবাসন রাখার জন্য আলমারি আনলেন, সেও বিশাল, সামনে কাচ লাগানো। এতসব আজদাহা আসবাবে এমন হল, যে, ঘরে হাঁটার জায়গা রইল না। দাদা খুব গর্ব করে জানিয়ে দিলেন, *সব ফার্নিচার সেগুন কাঠের, আর আমার দেওয়া ডিজাইন।* লোকেরা, যারাই বাড়িতে আসে, চোখে বিস্ময় নিয়ে দাদার আসবাব দেখে যায়। এরকম আসবাব আর কোথাও তারা দেখেনি। নিজে নকশা এঁকে একটি সবুজ রঙের ইস্পাতি আলমারিও বানালেন, তাঁর সবচেয়ে আনন্দ, এরকম আর অন্য কারও বাড়িতে নেই।

তা ঠিকই, নেই। বৈঠকঘরের সামনের ঘরটি দাদা বানালেন তাঁর *আপিসঘর,* একটি ড্রয়ারঅলা টেবিল পাতলেন;ফাইসন্স কোম্পানির যাবতীয় কাগজপত্র, ওষুধের ব্যাগ, সব সাজিয়ে রাখলেন সে টেবিলে।

এত আসবাব বানানোর মূল কারণটি হল দাদা বিয়ে করবেন। বউ আসবে, একটি গোছানো বাড়ি পাবে অর্থাৎ *তৈরি সংসার* পাবে। দামি দামি কাচের বাসনপত্র কিনে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন, চাবি তাঁর পকেটে।

আত্মীয় স্বজনরা ঘুরে ঘুরে দাদার সাজানো ঘরদোর দেখে বলে যান *নোমানের তো সবই হইল, এইবার একটা বউ হইলেই হয়।*

বিয়ে করবেন বলে প্রায় কয়েক বছর থেকে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন দাদা। মেয়ে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু কোনও মেয়েকে পছন্দ হচ্ছে না। বিভিন্ন বাড়ি থেকে প্রস্তাব আসে, অথবা প্রস্তাব পাঠানো হয়, তিনি আত্মীয় বা বন্ধু সঙ্গে নিয়ে মেয়ে দেখে আসেন, যাবার সময় প্রতিবারই এলাহি কাণ্ড ঘটান, ঘন্টাখানিক সময় নিয়ে পুরো-সাবান খর্চা করে স্নান করেন, স্নান সেরে অসম্ভব বেসুরো গলায় গান গাইতে গাইতে মুখে পনডস ক্রিম আর পাউডার মাখেন, হাতে পায়ে জলপাই-তেল আর শরীরের আনাচ কানাচে তো আছেই, বুকে পেটে পিঠে, হাতের নাগালে শরীরের যা কিছু পান, মোটেও কার্পণ্য না করে সুগন্ধী

ঢালেন। এমনিতে সুগন্ধীর ব্যাপারে দাদা বেশ হিশেব করে চলেন, বাড়িতে এক দাদারই সুগন্ধীর আড়ত, মাঝে মাঝে কোথাও বেড়াতে যাবার আগে, *দাদা একটু সেন্ট দিবা?* যদি বলি, প্রথম বলে দেন, *নাই।* গাঁই গুঁই করলে কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি ইত্যাদি সব প্রশ্ন করেন, উত্তর পছন্দ হলে তিনি তার ঘরের গোপন এক জায়গা থেকে সুগন্ধীর শিশি বের করে বারবার বলেন *এইটা হইল আর্থমেটিক,* বা *এইটা হইল ইন্টিমেট, মেইড ইন ফ্রান্স,* মেইড ইনটা দাদা বলবেনই, তারপর এক ফোঁটা মত কিছু দিয়ে বলবেন *ইস অনেকটা পইড়া গেল!*

কি দিলা দেখলামই না তো!

আরে ওইটুকুর মধ্যেই তো দুইশ টাকা চইলা গেছে।

দাদা বাড়ি না থাকলে খুঁজে ওই গোপন জায়গায়, জুতোর ভেতর, সুগন্ধীর শিশি আর পাইনি, নতুন জায়গায় শিশি রেখেছেন লুকিয়ে, মা-বেড়াল যেমন বাচ্চা-বেড়ালের ঘাড়ে কামড় দিয়ে জায়গা বদলায়, দাদাও তেমন সুগন্ধীর শিশির জায়গা বদলান। যাই হোক, প্রচুর সময় নিয়ে সাজগোজ করে, আয়নার সামনে নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেন দাদা। আমাদের জিজ্ঞেস করেন *কী, সুন্দর লাগতাছে না!* আমরা একবাক্যে বলি, *নিশ্চয়ই।* নিঃসন্দেহে সুন্দর দেখতে দাদা, চুল যেমন ঘন কালো, নাক টিকলো, বড় বড় চোখ, চোখের পাপড়ি, দৈর্ঘে প্রস্থে রীতিমত সুপুরুষ। চকচকে জুতো পায়ে, গরমকালেও স্যুট টাইপরা দাদা চমৎকার হাসি নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোন মেয়ে দেখতে আর প্রতিবারই ফেরেন মলিন মুখ করে। প্রতিবারই পকেটের সোনার আংটি পকেটেই থাকে, কাউকে আর দেওয়া হয় না।

কী দাদা, মেয়ে কেমন দেখলা? জিজ্ঞেস করি।

দাদা নাক কুঁচকে বলেন *আরে ধুর!*

প্রতিবারই তিনি বাড়ির সবাইকে বৈঠকখানায় বসিয়ে দেখে আসা মেয়ের খুঁত বর্ণনা করেন।

বাবা একবার দাদাকে পাঠালেন তাঁর এক চেনা লোকের মেয়েকে দেখে আসতে। দাদা দেখেও এলেন। বাবা বাড়ি ফিরে দাদাকে নিয়ে বসলেন, *মেয়ে পছন্দ হইছে?*

দাদা সঙ্গে সঙ্গে মুখের যা কিছু কোঁচকানোর আছে কুঁচকে বললেন *না।*

কারণ কি? মেয়ে ত শিক্ষিত !

হ শিক্ষিত।

বি এ পাশ করছে!

তা করছে।

মেয়ে ফর্সা না দেখতে?

হ ফর্সা।

চুল লম্বা না?

হ।

মেয়ে তো খাটো না!

না খাটো না।

বাবা এডভোকেট।

হ।

বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিল ত অনেকদিন।

হ।

শহরে দুইডা বাড়ি!

হ।

ভাল বংশ।

হ।

মেয়ের কাকারা তো সব ভাল চাকরি করে। একজন সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার।

হ।

মেয়ের ফুপাতো একটা ভাই ত লন্ডনে থাকে।

হ।

মুরব্বি কারা কারা ছিল?

মেয়ের ভাই ছিল, বাবা ছিল।

বড় ভাই না ছোট ভাই?

বড় ভাই।

বড় ভাই তো বিয়া করছে কয়দিন আগে, খুব বড়লোকের মেয়েরে বিয়া করছে। মেয়ের বাবা ডিস্ট্রিক জাজ ছিল।

হ।

ওদের বাড়িঘরের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল।

হ ভাল। ড্রইংরুমে দামি সোফা টোফা আছে।

টেলিভিশন আছে তো!

হ।

কি খাওয়াইল?

তিন রকমের মিষ্টি খাওয়াইল, চা খাওয়াইল।

মেয়ের কথাবার্তা কেমন? আচার ব্যবহার?

তা ভাল।

ভদ্র তো!

হ ভদ্র।

শান্তশিষ্ট মেয়ে!

হ।

তাইলে পছন্দ হইল না কেন?

সবই ঠিক ছিল, কিন্তু

কিন্তু কি?

ঠোঁটটা...

ঠোঁটটা মানে?

নিচের ঠোঁটটা চ্যাপ্টা না, উঁচা। উঁচা ঠোঁটের মেয়েদের আমার দুইচোখখে দেখতে ইচ্ছা করে না।

হুম।

দাদার জন্য চ্যাপ্টা ঠোঁটের মেয়ে দেখা শুরু হল। একটি মেয়ের খবর এল, টাঙ্গাইলে বাড়ি, তার বোনের বাড়ি ময়মনসিংহ, আমাদের পাড়াতেই। মেয়েকে টাঙ্গাইল থেকে বোনের বাড়ি আনানো হল। কনে দেখার দিন তারিখ ঠিক হল। দাদা যথারীতি সেজে

গুজে আমাকে আর ইয়াসমিনকে নিয়ে ও বাড়িতে গেলেন। মেয়ের বোন দরজা খুলে দিয়ে আমাদের ভেতরে বসালেন। কিছু টুকটাক কথাও বললেন, যেমন, *তুমি তো এবার মেডিকেলে ভর্তি হলে, তাই না?*

তোমার নাম কি?

ইয়াসমিন! আমার ভাইঝির নামও ইয়াসমিন।

আমার মেয়েও তো বিদ্যাময়ী ইশকুলে পড়ে,ও আজকে ওর মামার বাড়ি গেছে।

আজকাল গরমও পড়েছে খুব, এই গরমে রাত্রে আবার ইলেকট্রিসিটি চলে যাচ্ছে!

আচ্ছা কী খাবেন বলেন, চা না ঠাণ্ডা?

এধরনের অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি ঘটল, ট্রেতে চা বিস্কুট নিয়ে ডানো ঢুকল ঘরে। অপলক তিনজোড়া চোখ ডানোর দিকে। ডানো অপ্রস্তুত হেসে বসল একটি চেয়ারে। চা খাওয়া হচ্ছে, এবং সঙ্গে চলছে অপ্রয়োজনীয় কথা।

টাঙ্গাইলের বিন্দুবাসিনী কলেজ আর আগের মত নাই, একসময় খুব নাম ছিল।

পোড়াবাড়ির চমচমএর সাইজ আগের চেয়ে ছোট করে ফেলল, আবার দামও বাড়ায়ে দিল!

ডানো খুব কাজের মেয়ে, আমার বাসায় আসলে তো ও-ই সব কাজ করে।

বাড়িঘর গোছানো, রান্নাবান্না, সব ও করে, আবার বাগান করারও শখ আছে। নিজের জামাকাপড় নিজেই শেলাই করে, দরজির কাছে দেয় না।

টাঙাইলে কাদের সিদ্দিকীর বাড়িটা চেনেন, কাছেই নাথবাবুর বাড়ি, ওইখানে আমি মাসে একবার যাই।

ও বাড়ি থেকে হেসে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরোতেই দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, *কী, পছন্দ হইছে?*

দাদার নাক চোখ ঠোঁটের দিকে দুজোড়া চোখ।

চোখগুলা সুন্দর। ইয়াসমিন বলল।

ঠোঁট তো চ্যাপ্টাই। আমি বললাম।

দাদার নাক কুঁচকোলো এবার, *বেশি চ্যাপ্টা।*

বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া হল, ঠোঁট বেশি চ্যাপ্টার কারণে ডানোকে দাদার পছন্দ হয়নি।

মাস কয় পর খবর এল, ডানোর সঙ্গে টাঙ্গাইলের নামী মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনে দাদাকে বললাম, *ইস কি মিসটা করলা, ওরে বিয়া করলেই পারতা!*

দাদা বললেন *ভাগ্যিস করি নাই। ওর সাথে নিশ্চয় কাদের সিদ্দিকীর প্রেম ট্রেম ছিল।*

এমনিতে কোনও সুন্দরী মেয়ের বিয়ের খবর শুনলে দাদার মন খারাপ হয়ে যায়, আহা আহা করেন, যেন হাতের নাগাল থেকে চমৎকার লেজঅলা পাখিটি চকিতে উড়ে গেল। দিলরুবার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর দাদা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছিলেন, *মেয়েডা একেবারে শীলার ট্রু কপি ছিল।*

ছিল কি !এখনও তো শীলার ট্রু কপি।

বিয়া হইয়া গেছে তো!এখন থাকলেই কি ..

হুম।

ওর একটা বইন আছে না? লতা! লতাও কিন্তু সুন্দরী ছিল।

ছিল কি এখনও সুন্দরী।

আচ্ছা লতারে প্রস্তাব পাঠানো যায় না?

কিন্তু ও তো তোমার অনেক ছোট।

তা অবশ্য ঠিক।

আর লতার সাথে শুনছি কার নাকি প্রেমও আছে।

তাইলে বাদ দে!

ময়মনসিংহ শহরে যত সুন্দরী আছে, কলেজে পড়ছে বা আইএ বিএ পাশ করেছে, সবাইকে এক এক করে দাদার দেখা হয়ে গেছে, কিন্তু কাউকে পছন্দ হয়নি। এবার ঝুনু খালা বললেন *চল ঢাকায় মেয়ে দেখাই, একটা সুন্দরী মেয়ে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইল এইবার।*

ওর বাড়ি কুমিল্লা, বাবা কলেজের প্রফেসর। ঝুনুখালা আরও খবর দেন।

মেয়েটা আমার খুব ভক্ত, সারাক্ষণই ঝুনু আপা ঝুনু আপা করে। রোকেয়া হলে, আমার পাশের রুমে থাকে।

দেঁতো হেসে ঝুনুখালা বললেন।

সুন্দরী কি না কও। দাদার প্রশ্ন।

খুব সুন্দরী।

দাদার পা ডানে বামে নড়তে থাকে দ্রুত।

ঠোঁট চ্যাপ্টা তো!

হ চ্যাপ্টা।

বেশি চ্যাপ্টা না তো আবার?

না বেশি চ্যাপ্টা না।

ঠিক হল, ঢাকার নিউমার্কেটে এক আইসক্রিমের দোকানে লাভলি আর তার এক বান্ধবী বসে থাকবে, দাদা দূর থেকে দেখবেন। দাদার পছন্দ হলে পরে আরও এগোনো হবে। দাদা ঢাকা গিয়ে নিউমার্কেটে হাঁটাহাঁটি করে সময় মত আইসক্রিমের দোকানের সামনে গেলেন, মেয়ে দেখলেন। ঝুনু খালাকে *চোখটা ট্যারা মনে হইল* বলে ময়মনসিংহে ফিরে এলেন।

ময়মনসিংহের আশেপাশের শহর, টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা সবখানেই দাদা মেয়ে দেখতে গিয়েছেন। মুখ মলিন করে ফিরে এসেছেন। এরপর সিলেট! সিলেটে যাবেন মেয়ে দেখতে। প্রস্তাবটি এসেছে দাদার সঙ্গে এক লোক চাকরি করে, তার থেকে। সিলেটে আমিও যাব বলে গোঁ ধরলাম, গোঁ এ কাজ হল। দাদা আমাকে নিয়ে সিলেট রওনা হলেন। সারা ট্রেনে বলতে বলতে গেলেন, *সিলেটের মেয়েরা কিন্তু খুব সুন্দরী হয়।*

আমি বললাম, *ফটোতে তো মেয়েরে সুন্দরীই মনে হইতাছে।*

তা মনে হইতাছে। ফটোতে সব খুঁত কিন্তু ধরা পড়ে না।

সিলেটের দরগা রোডে ফাইসন্স কোম্পানীর সুপারভাইজার মুনির আহমেদএর বাড়ি উঠলাম রাতে। বিশাল বাগানঅলা সুন্দর বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই আমাকে অস্থিরতায় পায়। *দাদা চল শহরটা ঘুইরা দেখি।*

দাদার তখন শহর ঘুরে দেখায় মন নেই। মেয়ের ফটোটি বারবারই বুক পকেট থেকে বের করে কড়া আলোর তলে ফেলে দেখেন, আমাকেও দেখতে দেন ফটো, বলেন *তর কি মনে হয়, আবার ভাল কইরা দেখ তো!*

বলি *দেখছিই তো কত বার!*

আবার দেখ। বারে বারে দেখলে কিছু একটা ধরা পড়ে।

ধুৎ। সিলেটে আইলাম কি বাসায় বইসা থাকতে! চল না একটু ঘুরতে যাই!

তর ধৈর্যশক্তিটা একটু কমই নাসরিন। দাদা বেজার হয়ে বলেন।

এত দূর জার্নি কইরা আইছি। শরীরে ধুলাবালি ভর্তি। গোসল টোসল করতে হইব।

কি হইব গোসল না করলে? আইসা কইর।

নাক টাক তো ঠিকই আছে কি কস! ফটোর দিকে চোখ দাদার।

আমি জানালায় বসে যতটুকু দেখা যায় বাইরেটা, দেখতে থাকি।একাই যদি বেরিয়ে পড়তে পারতাম শহরটিতে! রিক্সা নিয়ে ঘুরে ঘুরে একাই যদি দেখতে পারতাম সব!

পরদিন মেয়ে দেখা হল। মেয়ের বাবা পুলিশ অফিসার, মেয়ে বিএ পাশ।

সবই ভাল,হেভি ফর্সা মেয়ে, কিন্তু...সামনের দাঁত দুইটা একটু উঁচা। ব্যস। মেয়ে নাকচ করে দিয়ে দাদা আমাকে নিয়ে শাহজালালের মাজার দেখতে গেলেন। মাজার দেখার কোনও ইচ্ছে আমার ইচ্ছে ছিল না, তারচেয়ে শহরময় হুডফেলা রিক্সায় ঘুরে শহরের স্বভাব চরিত্র জানতে পারলে আমার আনন্দ হত।

মাজারে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করছে। পুকুরের কিনারে দাঁড়িয়ে লোকেরা কালো কালো মাছকে খাবার দিচ্ছে, মাছগুলো শরীর ভাসিয়ে খাবারগুলো মুখে নিয়ে জলে ডুব দিচ্ছে আবার! বাহ! দাদা বললেন এই *মাছগুলারে খাবার দেয় কেন মানুষ জানস? খাবার দিলে নাকি সওয়ার হয়। হযরত শাহজালাল নিজে আল্লাহর কাছে খাবারদেনেঅলা লোকদের জন্য বেহেসতের তদবির করেন।*

এরপর দাদা তাঁর জুতো খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন *জুতাগুলা লইয়া এইখানে দাঁড়া, আমি মাজারের ভেতরটায় যাইয়া দেইখা আসি। শাহজালালের কবর ওইখানটায়।*

আমারেও নিয়া যাও।

না, ওইখানে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ।

উঁচু সেই কবরঘরে দাদা একা গেলেন, আমি ঘরটির দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকি, মেয়েরা ওখানে গেলে অসুবিধেটা কোথায় হয়, কার হয়!

ট্রেনে করে ময়মনসিংহে ফেরার সময়, দাদাকে বললাম *তাইলে সিলেটের মেয়েরেও তোমার পছন্দ হইল না।*

দাদা বললেন *সিলেটের মেয়েরা এমনিতে সুন্দরই হয়।*

তাইলে পছন্দ হইল না কেন?

পছন্দ হইছে।

তাইলে যে কইলা দাঁত উঁচা।

আরে ওই দাঁতালরে না তো!

তাইলে কারে?

মুনির ভাইএর বউরে।

কও কি!

ঠোঁটগুলা দেখছস! ওই রকমের ঠোঁট চাইতাছিলাম আমি।

তারে তুমি বিয়া করবা? চোখ কপালে তুলে বলি।

বিয়া করব কেমনে? সে ত অলরেডি ম্যারেড!

দাদা অনেকক্ষণ জানালায় উদাস তাকিয়ে থেকে ফস করে বললেন, *ঠোঁটের ওপরের তিলটা দেখছস?*

কার ঠোঁটের ওপরে?

মুনির ভাইএর বউএর।

তুমি তো দেখতে আইছিলা পুলিশ অফিসারের মেয়েটারে। তার তিলের কথা কও। তার ত একটা তিল আছে গালে।

দেখিও নাই তার গালের তিল। উঁচা দাঁতের মেয়েদের দিকে আসলে বেশিক্ষণ তাকাইতে হয় না। চোখ টনটন করে।

নামের ব্যাপারেও দাদার আসক্তি কাজ করে। একবার এক মেয়েকে প্রস্তাব পাঠানো হল, কারণ দাদা জেনেছেন মেয়ের নাম নীলাঞ্জনা। নীলাঞ্জনাকে দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল।

এই মেয়ে সুন্দরী না হইয়া যায় না।

কি কইরা বুঝলা যে সে সুন্দরী?

এত সুন্দর নাম যার, সে কি দেখতে খারাপ হইতে পারে!

নীলাঞ্জনাকে দেখে এসে অবশ্য দাদা সারাদিন ছি ছি ই করলেন। মাজেদা নামের এক মেয়ে, যদিও খুবই সুন্দরী, দাদা নাম শুনেই নাকচ করে দিলেন, দেখতে যাওয়া তো দূরের কথা। তাঁর বক্তব্য, *মাজেদা নাম শুনলেই আমার বমি আসে। এত বাজে নামের মেয়েদের সুন্দরী হওয়ার কোনও কারণই নাই।*

আমরা,বাড়ির লোকেরা, দাদার বিয়ের আশা অনেকটা ছেড়েই দিই। একজনই আশা ছাড়েন নি, তিনি দাদা নিজে। তাঁর গভীর বিশ্বাস, দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকে তিনি অচিরে বিয়ে করছেন।

বিশ্বাসটুকু আছে বলেই তিনি দিব্যি স্ফূর্তিতে জীবন কাটাতে থাকেন। গানের একটি যন্ত্র কিনেছেন। আগের গানের যন্ত্রটি *মেইড ইন রাশিয়া,* যেটি তিনি উদয়ন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন, বাবার ঘরে ছিল, সে ঘর থেকে, এক রাতে বাবা ছিলেন না বাড়িতে, ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল, তাই করতেন তিনি, দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে বেরোতেন, জানালার শিক ভেঙে ঢুকে যা যন্ত্রপাতি ছিল চোর নিয়ে গেছে, সেই বিশাল গানের যন্ত্র *মেইড ইন জার্মানি,* ছোটদা সারাই করতে নিয়ে পরে যেটি সারাই ছাড়াই ফেরত দিয়েছিলেন, সেটিও। বড়মামা বলেছিলেন দাদাকে উদয়ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে, প্রতিযোগিতায় যে প্রশ্ন তার উত্তরও তিনি একরকম বলে দিয়েছিলেন দাদাকে, বলেছিলেন ঘুণাক্ষরেও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের কাউকে না জানাতে যে দাদা তাঁর কেউ হন। প্রথম পুরস্কার মস্কো ভ্রমণ, দ্বিতীয় পুরস্কার গানের যন্ত্র, তৃতীয় পুরস্কার ক্যামেরা। বড়মামার প্রভাব কতটুকু খেটেছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু দাদা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে মহানন্দে গানের যন্ত্রটি বগলদাবা করে বাড়ি এনে রাজ্যির গানের ক্যাসেট কিনে সেসব শুনতে শুরু করে দিলেন। তখনও দাদা হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, সতীনাথ থেকে বের না হওয়া মানুষ। চুরি হওয়ার পর অনেকদিন গানহীন ছিল বাড়ি। নতুন যন্ত্র কেনার পর দাদা ঢাকা থেকে পছন্দ করে গানের ক্যাসেট নিয়ে এলেন। এবার ফিরোজা বেগমের গাওয়া নজরুল গীতি। ফিরোজার প্রেমে উতলা হয়ে তিনি নিজে ফিরোজার আরও গানে মন দিলেন। গানের যন্ত্রের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কাছে ডাকেন, বেসুরো গলায় ফিরোজার সঙ্গে গাইতে থাকেন নিজে আর থেকে থেকেই আবেগের *আহা আহা।* কমল দাশগুপ্তর জন্য ফিরোজার ভালবাসার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, *এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে ....বইলা কি টানটা দিছে দেখ। কমল দাশগুপ্ত যেদিন মারা গেল, তার*

কফিনের সামনে বইসা এই গানটা গাইছিল ফিরোজা। গানটি শুনতে শুনতে দাদার চোখ বারবার ভিজে ওঠে।

গানের মোহ দাদার সামান্য দূর হয় যখন তিনি ভিসিআর নামের একটি যন্ত্র অমৃতর দোকান থেকে ভাড়া আনলেন। এরপর প্রায়ই এক রাত কি দুরাতের জন্য ভিসিআর ভাড়া এনে যত হিন্দি ছবি আছে বাজারে, দেখতে শুরু করে দেন দাদা। অমৃত গোলপুকুরপাড়ে নতুন একটি ভিডিও ক্যাসেটের দোকান শুরু করেছে, বড় দেখতে-সুন্দর ছেলে, জ্যোতির্ময় দত্তের সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করবে করবে করছে। ব্যবসায় কড়া সবুজ বাতি জ্বলছে অমৃতর। ময়মনসিংহে যখন প্রথম দুএকটি ভিসিআর এসেছিল, বিষয়টি ছিল *আহামরি* উত্তেজনার, কোনও কোনও অন্ধকার সিঁড়ি আর দরজাজানলাবন্ধকরা বাড়িতে মোটা টাকায় টিকিট বিক্রি করে সারারাত হিন্দি ছবি দেখানো হত। ছোটদা আমাকে একবার তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিসিআরএ ছবি দেখাতে। ঝিরঝির করা ছবি চোখের সামনে নিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকা আমার সম্ভব হয়নি। ছবি শেষ না করেই বাড়ি ফিরেছি। সেই আমার প্রথম ভিসিআরএ *চোখে-খড়ি।* এরপর যন্ত্র ভাড়া করে ছবি দেখতে দেখতে দাদা যখন হিন্দি ছবির উত্তেজনায় একটি যন্ত্র কিনেই ফেলেন আর রাত জেগে দিন জেগে দেখা কেবল নয় ছবি গিলতে শুরু করেন, প্রথম প্রথম সামনে বসেছি। কিন্তু দিন দিন *আশ্চর্য ধর্মেন্দ্রর জন্য ঘোড়া কে রাখল এই ফাঁকা মাঠে? একটু আগে তো কোনও ঘোড়া ছিল না! হেমামালিনী হঠাৎ লাফ দিয়া গান শুরু কইরা দিল কেন? গান কি কোনও মানুষ এইভাবে রাস্তায় নাচতে নাচতে গায়?* মন্তব্যের মাছি বাড়ির অন্য দর্শকদের নিমগ্নতার দিকে ভনভন করে উড়ে যেতে থাকে। আজগুবি মারদাঙ্গা ছবি দেখার কোনও রুচি আমার হয়নি। কিন্তু দাদা,ছবি যেরকমই হোক, *পাছায় জিগাইরা আঠা লাগাইয়া* বসে থাকেন সামনে। বরং বেছে বেছে যেখানে মারামারি নেই, আজগুবি গল্প নেই, হাস্যকর অবাস্তবতা নেই সেরকম ছবি আমি দেখি। অমিতাভ রেখা আমার প্রিয় হয়ে ওঠে। তারও চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে শাবানা আজমি স্মিতা পাতিল নাসিরুদ্দিন শাহ। দাদা আমার রুচির দিকে অবজ্ঞা ছুঁড়ে বলেন, *আইন্ধার ছবিগুলা আর আনিস না। বস্তির জীবন আমরা প্রত্যেকদিনই দেখতাছি, পর্দায় দেহনের কোনও মানে নাই।* আন্ধাইর ছবি ছাড়া অন্য যে কোনও গল্পের যে কোনও পরিচালকের যে কোনও শিল্পীর যে কোনও ছবি দেখতে দেখতে দাদা একদিন একটি ছবির জালে পুঁটি মাছের মত আটকা পড়লেন। ছবিটির নাম *মোগল ই আযম।* মোগল ই আযমের প্রেমে অনেকটা উন্মাদ হয়ে গেলেন তিনি। ছবিটি *ননস্টপ* চলতে লাগল। সংলাপ তিনি মুখস্থ আওড়াতে লাগলেন। বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ছবিটি একাধিক বার দেখালেন, নানিবাড়ি থেকে নানিকে, হাশেমমামাকে, পারুলমামিকে, এমনকি টুটুমামা আর শরাফমামাকে ডেকে এনেও দেখালেন। ছবি চলাকালীন দাদা বাংলায় বর্ণনা করেন কি ঘটছে, কে কি বলছে, যদিও হিন্দি সকলেই জানে, তারপরও দাাদা অনুবাদ করেন, আর থেকে থেকে আহা আহা উহ উহ। হাশেমমামা পুরোনো ছবির খুব ভক্ত। ছোটবেলার দেখা হিন্দি আর উর্দু ছবির গান তিনি ফাঁক পেলেই গেয়ে বেড়ান। টেনে হিঁচড়েও ফজলিখালাকে ছবিটির সামনে বসাতে পারেননি দাদা। ফজলিখালা টেলিভিশনের দিকে তাকান না *গুনাহ* হবে বলে। মা ছবি পেলে গুনাহর কথা ভুলে যান। মোগল ই আযম দেখার লোভ সংবরণ করা মার জন্য অসম্ভব হয়ে ওঠে বলে তিনি আল্লাহ এবং তাঁর আদেশ নির্দেশ আপাতত বালিশের তলে চাপা দিয়ে এসে ছবি দেখে নিয়ে আসর বা এশার নামাজের পর মোনাজাতের হাত তুলে

নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। আল্লাহর অসীম দয়া, তিনি ক্ষমা করেন তাঁর সন্তপ্ত বান্দাদের, মা জানেন।

বাড়িতে যে অতিথিই আসে, চা বিস্কুটএর বদলে দাদা *মোগল ই আযম* দিয়ে আপ্যায়ন করা শুরু করলেন।

রুদ্রর সঙ্গে যখন জীবন দেওয়া নেওয়া ইত্যাদি সব সারা তখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। চিঠিতেই আলাপ, চিঠিতেই প্রেম, চিঠিতেই যা কিছু। খেলার ছলে ওই জীবন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটি ঘটেছে। রুদ্র জানাল, ২৯ আশ্বিন তার জন্মদিন।

জন্মদিনে কি চাও বল। তুমি যা চাও, তাই দেব তোমাকে।

যা চাই তা দেওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব হবে?

কেন হবে না?

হবে না আমি জানি।

বলেই দেখ না।

রুদ্র জানাল তার চাওয়া হবে খুবই *কঠিন, কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য কিছু।*

পরের চিঠিতে তার প্রশ্ন, *যা চাই তা কি তুমি সত্যিই দিতে পারবে?*

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে, *বাহ পারব না কেন? বলেছি যখন দেব, দেবই* বলি। চড়ুই পাখির মত দেখতে একটি অহঙ্কার আমার কাঁধ থেকে উড়ে নাকের ডগায় এসে বসে।

ধর আমি যদি তোমাকে চাই?

এ আর এমন কি! এইসব খুঁটিনাটি খুনসুঁটিতে *ঠিক আছে যাও, এই আমাকেই আমি দিলাম।*

আমার সঙ্গে প্রেম রুদ্রের শব্দের সঙ্গে, উপদ্রুত উপকূলের কবিতার সঙ্গে, তার চিঠির অক্ষরের সঙ্গে। পেছনের মানুষকে আমি চিনিনা, দেখিনি কোনওদিন কিন্তু কল্পনা করে নিই অপূর্ব এক সুদর্শন পুরুষ ওপারে আছে, যে পুরুষ কোনওদিন মিথ্যে বলে না, মানুষের সঙ্গে কোনও অন্যায় আচরণ করে না, যে উদার, অমায়িক, প্রাণবান, যে পুরুষ কোনও মেয়ের দিকে এ যাবৎ চোখ তুলে তাকায়নি ইত্যাদি একশ রকম গুণ। রুদ্র যখন জানাল ময়মনসিংহে আসছে আমার সঙ্গে দেখা করতে, আমাকে বারবারই গেলাস গেলাস ঠাণ্ডা জল খেতে হচ্ছিল, গলা বুক শুকিয়ে আসছিল। তা দেখা হবে কোথায়! মাসুদের বাড়ি, মাসুদও কবিতা লেখে, এমনিতে গানের ছেলে মাসুদ, ছোটদার বয়সে ছোট-বড় বিশাল বন্ধুমহলে সেও একজন, তার সঙ্গে রুদ্রর আলাপ ঢাকায়, টিএসসির আড্ডায়,তার বাড়িতেই উঠবে রুদ্র, সানকিপাড়ায়, আমাকে সকাল এগারোটায় ওখানে যেতে হবে। সকাল সাতটা থেকে ঘড়ি দেখছি, ঘড়ির কাঁটা যত এগারোটার দিকে এগোয়, তত আমার বুকের ধুকপুক ঘন হয়, দ্রুত হয়।

চোখে একটি কায়দার রোদচশমা পরা, যত না আধুনিক, দেখতে তার চেয়ে।জামা পাজামা পরনে, তখনও ওড়না পরি না, কলেজের ইউনিফর্মের লাল ওড়না ছাড়া আর কোনও ওড়নাও নেই বাড়িতে, চন্দনার মত ওড়নার ওপর আমারও বড় রাগ বলে *ওড়না*

পরার বয়স হওয়ার পরও ওড়না না পরে ঘরেও থাকি, বাইরেও যাই। মাকে নানিবাড়ির কথা বলে লম্বা চুলের মেয়ে, *চিকন চাকন* মেয়ে, মেদ-নেই-মাংস-নেই-মেয়ে, পুকুরঅলা মাঠের ওপর ছোট্ট টিনের বাড়ির দিকে, মাসুদের বাড়ির দিকে। ছোট্ট বাড়ির ছোট্ট ঘরে ছোট্ট মেয়ের ছোট্ট বুকের সব ধুকপুক অকস্মাৎ থেমে গেল, যখন এক দাড়িঅলা, লম্বা চুলঅলা, লুঙ্গিপরা ছেলে বলল এসে যে সে রুদ্র। প্রেমিকার সঙ্গে প্রথম দেখা লুঙ্গিতে! রুদ্র দেখতে তখন গাঁ থেকে আসা রিয়াজউদ্দিনের শালাগোছের কেউ। কালো চশমার আড়ালেও নামিয়ে ফেলি চোখ।

চশমাটা খোল। আমি তোমার চোখ দেখতে পাচ্ছি না।

যার সঙ্গে জীবন বিনিময় হয়ে গেছে সহস্র লিখিত বাক্যে, তার প্রথম বাক্য, মুখোমুখি প্রথম বসে।

রুদ্রর ভারি স্বর আমাকে চমকায়, চশমা খুলি, কিন্তু তাকিয়ে থাকি মাসুদের ঘরের আসবাবে।

নৈঃশব্দ।

কী কথা বলছ না যে!

চপ্পলে পায়ের আঙুল ঘসতে থাকি। বাঁ হাতের নখের কিনারে দেখার কিছু নেই, তবু চোখ ফেলে রাখি ওতে, যেন এ মুহূর্তে শুশ্রূষা না করলে নখটি পচে গলে খসে যাবে। রুদ্রর দিকে না তাকালেও স্পষ্ট বুঝি সে আমাকে দেখছে, আমার চুল চোখ নাক চিবুক সব দেখছে। একঘর অস্বস্তির মধ্যে মাসুদ চা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢোকে। আমি চায়ের কাপে, সোফার রং উঠে যাওয়া হাতলে, শোকেসের পুতুলে আর মাঝে মাঝে মাসুদে তাকিয়ে চা শেষ করেই উঠে দাঁড়াই।

কী ব্যাপার অস্থির হচ্ছ কেন? রুদ্র বলে। আবারও সেই ভারি স্বর।

আমার চোখ তখন জানালায়। গাছের পাতাগুলো কড়া সূর্যের তলে ঝিমোচ্ছে। পুকুরটিও ঝিমোচ্ছে, জলপোকারা গায়ে বসতেই মৃদু তরঙ্গ তুলে নেচে উঠছে জল।

রুদ্রও দাঁড়ায়, একটু একটু করে এগিয়ে আসে আমার দিকে, শরীরটির দিকে এক পলক চেয়ে বুঝি, লম্বায় আমার চেয়ে দু বিঘৎ খাটো সে। জাহাঙ্গীর নামে তাঁর এক বেটে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর দাদা প্রায়ই আস্ফালন করতেন, *পুইট্যা লোক হইল খোদার দুশমন!* বেঁটে তো বেঁটেই,তার ওপর রুদ্রর মুখ ভর্তি দাড়ি মোচ, মোচ জিনিসটি দেখলেই আমার ঘেন্না হয়, দাড়ি দেখলে তো আরও।

আমি শরমে নাকি ভয়ে জানি না, খানিকটা সরে দাঁড়াই।

রুদ্র বলল *এক্ষুনি যাবার কি হল?*

নৈঃশব্দ।

চিঠিতে তো খুব কথা বল। এখন বলছ না যে!

নৈঃশব্দ।

ইস কী মুশকিল। তুমি কি বোবা নাকি!

বোবা মেয়ে জল আর জলপোকাদের প্রায় গা ঘেঁষে মাসুদের বাড়ির মাঠ পেরিয়ে চলে গেল।

যাবার আগে, দরজায় দাঁড়িয়ে, *কাল আসছ তো!* প্রশ্নের উত্তরে কেবল মাথা নেড়েছে *হ্যাঁ আসছে।*

গিয়েছি পরদিনও। পরদিনও ওর দিকে চোখ তুলে তাকাইনি, আমার সমস্ত শরীরে,

চুল থেকে পায়ের নখ অবদি, শরম। নিজেকে বারবার বলছি, *কথা বল মেয়ে, কথা বল, ও তোর প্রেমিক। ওর সবকিছু তুই জানিস, ওর উপদ্রুত উপকূল পড়ে মুখস্ত করে ফেলেছিস, এবার দুটো তিনটে বাক্য বল।* পারিনি। হয়নি।

রুদ্র চলে গেল। ঢাকা থেকে চিঠি লিখল, সে নাকি এমন মেয়ে দেখেনি। এমন লাজুক।

লাজুক মেয়ে উত্তরে বারো পাতার চিঠি পাঠাল। এই হয় আমার, লিখতে বল, আমার মত বাচাল আর কেউ নেই। কাছে এসো, এমন গুটিয়ে যাব যে ভাববে চিঠির মানুষটি নিশ্চয়ই অন্য কেউ! আমারও মাঝে মাঝে মনে হয়, লেখার আমি আর রক্তমাংসের আমি যে আমি নানিবাড়ি আর অবকাশের চৌহদ্দির মধ্যে বেড়ে ওঠা, দুজন। একজন পেখম মেলে পাখনা মেলে আকাশে ওড়ে, আরেকজনের মাটির পৃথিবীতে, অন্ধকারে, বন্ধ ঘরে বাস, গায়ে পায়ে শেকল,মস্তিষ্কেও।

রুদ্র এরপর আরও দুবার এল ময়মনসিংহে। মাসুদের দুএকজন বন্ধুর সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে নিয়েছে,এ শহরে সময় মন্দ কাটে না তার। রুদ্রর সঙ্গে দেখা হলে আমার কিন্তু সেই একই হাল, বুকের ধুকপুক এত দেখাতেও এমন হয়নি যে কিছু কমেছে। ভাই বন্ধুদের সঙ্গে আমি চুটিয়ে আড্ডা দিতে পারি, কিন্তু প্রেমিকের সামনে পড়লে গা হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। মুখে তালা, চাবি অদৃশ্য।

রুদ্রর তো আসা হচ্ছে, কিন্তু দেখাটা হবে কোথায়, বসব কোথায় দুজন! মাসুদের বাড়িতে তার দাদারা আপত্তি তুলেছে, ও বাড়িতে আর নয়। শহরের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করলে চেনা লোক কেউ দেখে ফেলবে আর মুহূর্তে বাবার কানে খবর চলে যাবে, সর্বনাশ! কোথায় তবে, ইশকুলের বান্ধবী নাদিরা আর মাহবুবার বাড়ি যাই, ওরা চা বিস্কুট খেতে দেয়, কিন্তু ফিসফিস করে বলে বাড়িতে নাকি জিজ্ঞেস করছে কে এই লোক! তখনও আমার বয়সী মেয়েদের কোনও প্রেমিক নিয়ে কারও বাড়িতে যাওয়া অশালীন একটি ব্যাপার, প্রেম করা ব্যাপারটিই যখন অশালীন! মেয়ে বড় হলে বাবা মা পাত্র খুঁজে মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসাবে, মেয়ে মুখ বুজে জানা নেই শোনা নেই লোককে দিব্যি স্বামী মেনে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঘর করতে যাবে--এ নিয়মের বাইরে মেয়েরা যে প্রেম করে না তা নয়, কিন্তু গোপনে, এত গোপনে যে কাক পক্ষী জানতে না পারে। কাকপক্ষী তো বটেই দুএকজন বন্ধুকে ব্যাপারটি জানাতে আমার আপত্তি ছিল না। চন্দনা আদ্যোপান্ত জানিয়েছি, রুদ্রকেও জানিয়েছি চন্দনার সমস্ত। দুজনকেই সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছি, পরস্পরকে লিখতে। লেখালেখি চলছে দুজনে। রুদ্রকে লেখা আমার চিঠির অনেকটা জুড়েই থাকে চন্দনা। চন্দনা যে আমার প্রাণের সঙ্গে কতটুকু জড়িয়ে আছে, তা বোঝে রুদ্র। মাঝে মাঝে অভিমান করে বলে, *কেবল চন্দনা চন্দনা চন্দনা। তোমার তো একজন বন্ধু হলেই চলে, আমার কি আর প্রয়োজন আছে তোমার জীবনে!* রুদ্রকে নিয়ে কোথাও যাওয়ার, কোথাও বসার জায়গা না পেয়ে একদিন নানিবাড়ি বেড়াতে যাই। নানি আমাদের জন্য চা করে নিয়ে আসেন, মুখ টিপে হেসে রুদ্রকে বলেন, *এই মেয়েকে পাইতে হলে আগে প্রতিষ্ঠিত হইতে হবে, বুঝলা!* আমি শরমে মুখ নিচু করি। তবু নানিবাড়িতে যা সম্ভব, অবকাশে তা নয়। রুদ্রকে নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়ি নানা বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবি, কিন্তু কখনও অবকাশে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারি না। সুতরাং, পার্কে বসে থাকো, বোটানিক্যাল গার্ডেনে বস গিয়ে, গাছের ছায়ায় বসে কথা বল। বোটানিক্যাল গার্ডেন শহর থেকে খানিকটা দূরে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, ওখানে

ব্রহ্মপুত্রের শুকিয়ে যাওয়া জলের দিকে মুখ করে ঘাসে বসে থাকি, দুএকটি বালু টানা নৌকা যায়, তাই দেখি বসে আর হ্যাঁ বা না জাতীয় কিছু শব্দ উচ্চারণ করি রুদ্রর অসংখ্য প্রশ্নের জবাবে। বাগানে হাঁটতে আসা লোকেরা অদ্ভুত চোখে আমাদের দেখে।

মেডিকেল কলেজে ঢোকার পর একটি নিয়মিত জায়গার ব্যবস্থা হল, কলেজ ক্যান্টিন। ক্যান্টিনে প্রথমদিন হাবিবুল্লাহকে নিয়ে রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে যাই, হাবিবুল্লাহ যেহেতু বন্ধু, যেহেতু আমার গভীর বিশ্বাস, ছেলেতে মেয়েতেও বন্ধুত্ব হতে পারে, ঠিক ছেলেতে ছেলেতে বা মেয়েতে মেয়েতে যেমন, হাবিবুল্লাহ আর চন্দনাতে যেহেতু আমি কোনও তফাৎ দেখি না, রুদ্রর মুখোমুখি বসে আমি যে কটা বাক্য ব্যয় করি, তা হাবিবুল্লাহর সঙ্গেই। আর কিছু শব্দ কেবল কাপের ভেতর চা আর দুধ চিনির মিশেলের রঙ খুঁজতে খুঁজতে, যখন রুদ্র জিজ্ঞেস করে ক্লাস শেষ হয়েছে?

হয়েছে।

আরও ক্লাস আছে?

আছে।

করতে হবে?

হু।

হু মানে কি? না করলে চলে না?

চলে।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রুদ্রর সঙ্গে বসে থাকি। দুপুরের পর ক্যাম্পাস খালি হয়ে যায়, ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে যায়, চত্বরে ঘাসের ওপর, নয়ত কলেজের সিঁড়িতে বসে আমাদের প্রেমালাপ চলে, প্রেমালাপ এরকম,

চিঠি পাচ্ছ ঠিকমত?

পাচ্ছি।

আমাকে প্রতিদিন চিঠি লিখবে, বুঝেছ?

আচ্ছা।

কবিতা লিখছ?

এই একটু আধটু।

পারলে মাত্রাবৃত্তে লিখবে।

মাত্রাবৃত্ত তো ছয় ছয় করে। তাই না?

হ্যাঁ। শেষে দুই যোগ করতে পারো। ছয় ছয় দুই।

অক্ষরবৃত্তটা বুঝতে পারি, মাত্রাবৃত্তটা কঠিন লাগে..

লিখতে লিখতেই ঠিক হবে। অক্ষরবৃত্ততেই প্রথম প্রথম লিখতে থাকো।

আট চার ছয়ে?

তাও করতে পারো, আবার আট চার দুই, ছয় চার দুই, ছয় চার দুই করলে অবশ্য মাত্রাবৃত্তের ছন্দটা চলে আসে..

উপদ্রুত উপকূলের কবিতাগুলো তো বেশির ভাগ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, তাই না?

হ্যাঁ তাই।

আমি তো লিখি আর অক্ষর গুনি, কী যে ঝামেলা লাগে..

ঝামেলার কি আছে, ছন্দটা হচ্ছে শোনায়. কানটা সজাগ রাখবে.. .

মাঝে মাঝে মনে হয় আমার এসব কবিতাই হয় না।

হয় হয়, লিখতে থাকো। তোমার কবিতার খাতাটা কাল এনো তো দেখব!

ভাল কবিতা লিখে নিই, পরে দেখাবো।

এনো তো বাবা! যা বলছি শোনো।. আচ্ছা একটা কথা...

কী?

তুমি আমাকে কোনও সম্বোধন কর না কেন?

কি রকম?

না ডাকো রুদ্র, না বল তুমি।

বলি তো!

কই বল!

চিঠিতে।

সে তো চিঠিতে। চিঠিই তো জীবন নয়। সামনে ডাকো না কেন?

লজ্জা আগুনের শলা ছোঁয়ালো সারা মুখে। প্রতিবারই রুদ্রর সঙ্গে দেখা করার আগে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অথবা মনে মনে *রুদ্র তুমি রুদ্র তুমির* মহড়া *দিই। রুদ্র তুমি কি খাবে বল, রুদ্র তুমি কি আজই চলে যাবে,* এসব বাক্যের চর্চাও চলে। কিন্তু তার সামনে এলেই, মূল মঞ্চেই, আমার মহড়া মুখ থুবড়ে পড়ে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমার *ভাববাচ্যের* শেকল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারি না।

তোমাকে এত দূরের মনে হয় কেন! একটুও তোমাকে স্পর্শ করতে দাও না। কত বলছি, হাতটা দাও। দিচ্ছ না। এত ভয় কিসের, আমি কি বাঘ ভালুক নাকি!

রুদ্র বাঘ ভালুক নয় তা জানি। রুদ্র সত্তর দশকের উজ্জ্বল তরুণ। সত্তর দশক যুদ্ধের মৃত্যুর ভাঙনের দশক, সত্তর দশক কবিতার দশক, কবিতায় লাশের গন্ধ, চিৎকার, প্রতিবাদ। রুদ্র তার কবিতায় এই দশকটির চিত্র চমৎকার এঁকেছে। যখন সে তার ঢাকার জীবনযাপনের গল্প করে, মুগ্ধ হয়ে শুনি। তার ওই জীবনটি বড় দেখতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে পুলিশের গুলিতে আহত মানুষ নিয়ে শহরে মিছিল করি, ইচ্ছে করে প্রতিবাদের লিফলেট ছেপে দেয়ালে দেয়ালে সেঁটে দিই। ইচ্ছে করে রুদ্রর মত আমিও টিএসসির মাঠে বসে চা খেতে খেতে লাকি আখন্দের গান শুনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সারা বিকেল ঝালমুড়ি খেতে খেতে সাহিত্যের আড্ডায় মেতে উঠি। মহিলা সমিতিতে সেলিম আল দীনের নাটক হচ্ছে, দেখি। কদিন পর পরই কবিতার অনুষ্ঠান হচ্ছে, অনুষ্ঠানগুলোয় যাই, কবিতা শুনি। রুদ্র যেন আমার অল্প অল্প করে জাগা কবিতার চারার আশপাশ থেকে আগাছা সরিয়ে জল ঢালে, অথবা বলা যায় ছিল বারুদ, সে আগুন জ্বালে। প্রবল তৃষ্ণা জাগে কোনও এক অদেখা অচেনা কবোষ্ণ জীবনের জন্য। না মেটা তৃষ্ণা নিয়ে আমাকে বিকেল বিকেল উঠতে হয়, যেতে হয় বাড়িতে, হিশেব দিতে হয় দেরি হওয়ার, মিথ্যে বলতে হয়, বলতে হয় যে ক্লাসের পর মেয়েদের হোস্টেলে ছিলাম, মিথ্যে বলার সময় আমার গলা কাঁপে, দুচোখ হয় মাটিতে নয় বইপত্রে। ঢাকায় রুদ্রর ওই জীবনটিও পরে দেখা হয়েছে আমার। বেহিসেবি, বেপরোয়া, উদ্দাম, উত্তাল জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, টি এস সি চত্বরে, চা সিগারেট খেতে খেতে কতরকম মানুষের সঙ্গে যে রুদ্র কথা বলে! রাজনীতির কথা। সাহিত্যের কথা।ঠা ঠা করে হাসে। তার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, বন্ধুরা হয় কবি নয় গল্পকার, নয় গায়ক, নয় নায়ক। তখনও আমি অচেনা কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারা *লাজুকলতা,* পাতাকাঠির মত শরীর আর ফিনফিনে চুলের মেয়ে। রুদ্রর জীবনের দিকে আমি আকণ্ঠ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকি। চমৎকার এক মুক্ত জীবন, কারও কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না কোথায় যাচ্ছে কী করছে, ঘরে ফিরতে দেরি হচ্ছে কেন। ঢাকাতেও আমার সময় বাঁধা থাকে রুদ্রর সঙ্গে সময়

কাটানোর, ঝুনুখালা এক ঘন্টা কি দেড়ঘন্টা সময়ের জন্য আমাকে হাতছাড়া করেন। রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি জেনেই করেন। ঝুনু খালার নিজের প্রেমের গল্প আমাকে নির্দ্বিধায় শুনিয়ে যান, আমারটি বলতেও আমি ঝুনুখালার কাছে দ্বিধাহীন হই। তিনি রক্তচক্ষু অভিভাবকের মত আমাকে এ ব্যাপারে শাসন করেন না মোটেও। অনেক আগেই বড়মামার বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হলে উঠেছেন ঝুনুখালা,প্রেম করছেন বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক আপিসে চাকরি করা মতিউর রহমান নামের এক বরিশালির সঙ্গে। বরিশালির সঙ্গে যখন তিনি দেখা করতে যান, বগলদাবা করে নিয়ে যান আমাকে। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ঘাসে বসে তিনি বরিশালিকে নিজের বাড়ির আর আত্মীয় স্বজনের গল্প করেন, শুনে এত চেনা ঝুনুখালাকেই আমার বড় অচেনা লাগে। যে কেউ ধারণা করবে ধনে মানে ঝুনুখালার আত্মীয়রা সাংঘাতিক কিছু, লাখপতি কোটিপতির নিচে কোনও আত্মীয়ই নেই তাঁর, এমন। ঝুনুখালার গা ঘেঁষে বসে বরিশালির চিকচিক চোখদুটো দেখি। ঝুনুখালার সবকিছু আমার খুব ভাল লাগে, তিনি একা যেখানে খুশি যাচ্ছেন, ঢাকা থেকে ছুটিছাটায় একা একা ময়মনসিংহ চলে যাচ্ছেন, এমনিতে তাঁর মাথা বোঝাই বুদ্ধি, কেবল একটি সময়ই তাঁকে খুব বোকা বোকা লাগে যখন তিনি বরিশালির সঙ্গে দেখা করেন। একেবারে ছোট্ট খুকির মত হয়ে যান তিনি, আমি যে বোকা, আমার চেয়েও বোকা তখন বুদ্ধির ঢেকিটি। একবার ঢাকা থেকে ট্রেনে ময়মনসিংহ আসার সময় স্মৃতিময় বন্দোপাধ্যায় নামে এক গল্পলেখকের সঙ্গে কথা হল, কথা হল আর তিনি লোকটিকে অবকাশে নিয়ে উঠলেন। চা বিস্কুট দেওয়া হল অতিথিকে। স্মৃতিময়ের সামনেও ঝুনুখালাকে বড় বোকা লাগছিল, মুখে একটি লাজরাঙা হাসি ছিল ঝুনুখালার, যেন স্মৃতিময় ঝুনুখালার দীর্ঘ দীর্ঘ বছরের প্রেমিক গোছের কিছু। ঝুনুখালা ময়মনসিংহ এলে অবকাশে সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে যান। আমার আবদারে তিনি মার অনুমতি নিয়ে আমাকে ঢাকা বেড়াতে নিয়ে যান একদিন বা দুদিনের জন্য, আমার তৃষ্ণা না ফুরোতে দিয়েও যান আমাকে মার হাতে বুঝিয়ে। ঝুনুখালার সঙ্গে আমাকে যেতে দিতে খুব আপত্তি ওঠে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারি মেয়ে ঝুনুখালা, বাবাও ঝুনুখালাকে অবজ্ঞা না করে কথা বলেন।

রুদ্রর সঙ্গে মুখোমুখি প্রেম না হলেও চিঠির প্রেমটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তার দাবি, প্রতিদিন তাকে চিঠি লিখতে হবে। প্রতিদিন সে নিজেও চিঠি লেখে। একদিন যদি বাদ পড়ে আমার চিঠি, রুদ্র চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে লেখে, *কি হয়েছে কি তোমার, আমাকে কি ভুলে যাচ্ছ!* না, রুদ্রকে আমি ভুলে থাকি না। কিন্তু তাকে চিঠি লেখার জন্য আমার যে খানিকটা আড়াল চাই, বাড়ির লোকেরা আমার গায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকলে আমার পক্ষে যে সম্ভব নয়, তা তাকে বোঝাতে পারি না। রুদ্রর আশংকা ধরে বেঁধে খুব শিগগির আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন আমার বাবা। আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই যে এ কাজটি আমার বাবা কোনওদিনই করবেন না, আমাকে খুন করে ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ডাক্তারি পাশ করার আগে তিনি আমার বিয়ে সম্পর্কে কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে দেবেন না কাউকে। রুদ্র অবিশ্বাসে আশংকায় উদ্বেগে দিন যাপন করতে থাকে। মোংলা আর মিঠেখালিতে অঢেল সময় কাটিয়ে সে ঢাকা ফেরে, ঢাকা থেকে একদিন বা দুদিনের জন্য ময়মনসিংহে আসে। নৈঃশব্দকে সঙ্গী করে আমরা আগের মত বসে থাকি মুখোমুখি। রুদ্র একদিন নৈঃশব্দের শরীরে সুচ ফুটিয়ে বলে, *চল বিয়ে করি।*

বিয়ে?

হ্যাঁ বিয়ে।

আমি হেসে উঠি। *চল মঙ্গলগ্রহে যাই, বা চল সমুদ্রে ডুবে মরি,* এধরনের অদ্ভুতুড়ে প্রস্তাব শুনছি বলে মনে হয়। না হেসে আমার উপায় থাকে না। রুদ্র ভুরু কুঁচকে বলে, *কি হাসছ যে!*

হাসি আসছে।

হাসি আসে কেন?

আসে।

আমরা কি বিয়ে করব না নাকি?

বিয়ের কথা উঠছে কেন?

কেন উঠবে না!

পাগল নাকি?

পাগল হব কেন?

পাগল না হলে বিয়ে বিয়ে করে কেউ!

বাজে কথা বোলো না।

এ বুঝি বাজে কথা।

হ্যাঁ বাজে কথাই।

রুদ্র বিষণ্ন বসে থাকে। বিষণ্নতা আমার দিকেও হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। অনেকক্ষণ নখ খুঁটি, অনেকক্ষণ বইয়ের পাতায় চোখ ফেলে রাখি অহেতুক। কণ্ঠে না-বোঝা বিষাদ।

বাবা মেরে ফেলবে।

বাবার সঙ্গে চল দুজন দেখা করি। রুদ্র গম্ভীর গলায় বলে। গাম্ভীর্যের গলা মুচড়ে দিয়ে আমার অট্টহাসি স্ফূর্ত হয়।

হাসছ যে!

আমার আবারও হাসি পায়। কিছু কিছু অস্বাভাবিক দৃশ্যও কষ্টেসৃষ্টে কল্পনা করা যায় হয়ত কিন্তু এই দৃশ্যটি, যে, আমি আর রুদ্র বাবার সামনে দাঁড়িয়েছি, বলছি যে আমরা বিয়ে করব, অনুমতি দিন বা কিছু--কল্পনাতেও আনা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমি অন্যমনে ঘাস ছিঁড়ি।

কি, তুমি হাসছ কেন, বল। বিয়ের কথা ভাববে না কোনওদিন?

বিয়ে আবার এখনই কি? আমি ডাক্তারি পাশ করে নিই। তারপর দেখা যাবে। আমার উদাসীন উত্তর। শব্দগুলো উত্তাপহীন, শীতল।

সে অনেক দেরি। উৎকণ্ঠা গেড়ে বসেছে রুদ্রর কণ্ঠে।

দেরি, তাতে কি?

রুদ্রর দেরি সয় না। এক্ষুনি সে কিছু একটা করে ফেলতে চায়। এক্ষুনি বিয়ে করে সংসার করার মত স্বপ্নও সে দেখে ফেলছে। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হতে থাকে, মানুষটিকে আমি চিনি না। খুব দূরের মানুষ। *মামার বাড়ির আবদার করা* জ্বালিয়ে মারা বুড়ো খোকা। *পরীক্ষা দাও, এমএ টা পাশ কর, তারপর তো বিয়ের প্রসঙ্গ, এক্ষুনি কিসের তাড়া!* চিঠিতে জানাই। রুদ্র লেখে, পরীক্ষা দেওয়া না দেওয়া সমান কথা তার কাছে। ওসব ফালতু ডিগ্রিতে তার কোনও উৎসাহ নেই। উৎসাহ তার না থাক, আমি তো জানি, আমার বাড়ির লোকের আছে। আর এমএ পাশ করা কোনও ছেলেকেও যে আদৌ আমার যোগ্য মনে করা হবে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। তার ওপর রুদ্র কবি, কবিদের ভাত নেই, কবিরা *টুডাইল্যা* জাতীয় লোক হয়, বাবার বদ্ধ ধারণা। রুদ্র বলে দেয় সে কবি, এই

তার পরিচয়, সে কখনও কোনওদিন কোনও চাকরি বাকরি করবে না, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করার কোনও যুক্তি নেই।

না তবু..

কিসের তবু?

বাবার ভয়ে ওষ্ঠে প্রাণ আমার। রুদ্রকে বোঝানো সম্ভব হয় না বাবার হৃদয় কী ধাতু দিয়ে গড়া।

বাবা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। কোনও অধ্যাপক না থাকায় তিনিই বিভাগটির হর্তা কর্তা। সকালবেলা প্রায়ই বাবার সঙ্গে রিক্সা করে কলেজে যাই। অর্ধেক পথ তিনি উদার হস্তে উপদেশ বিতরণ করেন। *এক চান্সে মেডিকেলটা পাশ করতে যেন পারো, সেইভাবে লেখাপড়া কর।* ভাল যে বাবা বলছেন না পরীক্ষায় তারকাখচিত কিছু না পেলে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। মেডিকেলে একবার ঢোকা মানে একদিন না একদিন ডাক্তার হয়ে বেরোনো, এ জিনিসটি তিনি বিশ্বাস করেন, তাই বেশ নিশ্চিন্ত দেখায় তাঁকে। মেডিকেলের পরীক্ষাগুলো শাদামাটা পাশ করে যাওয়াই অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপার, ভাল ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাও সবসময় এ কাজটি সম্ভব হয় না। এনাটমি ফিজিওলজির জটিল জিনিসগুলো নিয়ে, যেগুলো মাথায় ঢুকেও ঢুকতে চায় না, কোনও প্রশ্ন করলে বাবা এমন সহজ সরল করে উত্তর দেন যে সুড়সুড় করে সব মগজে প্রবেশ করে। এমন কোনও প্রশ্ন নেই, যার উত্তর তিনি জানেন না। তিনি এখনও রাত জেগে পড়াশোনা করেন। যেদিন তিনি ক্লাস নেবেন, তার আগের রাতে প্রায় দুটো পর্যন্ত পড়ে তবে বিছানায় যান। একসময় তিনি লিটন মেডিকেল ইশকুলে এনাটমির শিক্ষক ছিলেন। সেই লিটন তো কবেই উঠে গেছে, এখন আর বিদ্যালয় নেই, এখন মহাবিদ্যালয়, লাগোয়া মহা-হাসপাতাল, মহা-ক্যাম্পাস, আর আর মহা-শিক্ষকমণ্ডলির বেশির ভাগই, বাবা বলেন বাবার ছাত্র ছিলেন। একধরনের সুখ হয় শুনে, আমি যত না নিজের নামে চেনা, তার চেয়ে বেশি চেনা রজবআলীস্যারের মেয়ে হিসেবে, অন্তত কলেজে।

জটিল চিকিৎসাশাস্ত্রের জট খুলে দিতে থাকা বাবাকে আমার বড় আপন বলে মনে হয়। এ এক নতুন বাবা। বাড়ি ফিরেই আমাকে তিনি কাছে ডাকেন। সঙ্গে নিয়ে খেতে বসেন। খেতে খেতে গল্প করেন। নতুন কোনও বিদ্যা অর্জন হয়েছে কি না জানতে চান। যদি বলি না কিচ্ছু হয়নি, মোটেও বিরক্ত হন না, বরং পরম আগ্রহে তিনি কোনও একটি বিষয়ে উত্থাপন করেন। ধরা যাক লিভার, ফস করে বলে দিই, *লিভারের কিচ্ছু আমি বুঝতাছি না।* তিনি, হেসে, আমাকে পাশে বসিয়ে, আমার হাতখানি টেনে নিজের বুকের ওপর রেখে, বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে লিভার দেখতে কেমন, লিভার কোথায় থাকে, লিভার কি করে, লিভারে কি কি অসুখ হয়, সেই অসুখের ওষুধ কি করে দিতে হয় সব গল্পের মত করে বলে যান। এই যে আমি নির্দ্বিধায় বলে দিই যে আমি লিভার সম্পর্কে কিছু জানি না, তিনি কিন্তু একবারও দাঁত খিঁচিয়ে বলেন না, *কেন জানস না? বইএর প্রথম পৃষ্ঠা থেইকা শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, অন্তঃস্থ কইরা ফালা।* আমার লেখাপড়ার ব্যাপারে এরকম দুশ্চিন্তা না করা বাবাকে আমি আর আগে দেখিনি। আমাকে তিনি পড়ার টেবিলে দেখতে চান, এরকম কোনও দাবিও আর জানান না। আমি আড্ডা দিলে বা পড়ে পড়ে ঘুমোলে বাবা রাগ করেন না। বাবার দৃষ্টি ইয়াসমিনে। ওকে টেনে ঘুম থেকে ওঠানো, ঘাড় ধরে পড়তে বসানো, খেলা থেকে তাড়ানো, মনীষীদের বাণী শোনানো, মেট্রিকে

তারকাখচিত নম্বর না পেলে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি শোনানোর কর্তব্য নিরলস ভাবে পালন করে যান। আমাকে নিয়ে বাবার নিশ্চিন্তি দেখে ছোটবাজারের হরিপদ মল্লিকের বাদ্যযন্ত্রের দোকান সুর তরঙ্গ থেকে দেখে শুনে একটি গিটার কিনে গিটারে টুং টাং শব্দ তুলি, গিটারে গান বাজানোর স্বপ্নটি টুং টাং করে হৃদয়ে সুর তোলে সারাদিন। ভাল গিটারবাদক হিসেবে নাম আছে শাহাদাত হোসেন খান হিলুর, কেবল গিটারবাদক হিসেবে নয় হিলুকে এক ডাকে শহরের সবাই চেনে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে হিলু সর্বদা বিরাজমান, তাঁকে গুরু বলে মানার লোকেরও অভাব নেই, মাসুদের গুরু তিনি, রুদ্রর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর রুদ্রেরও গুরু মত হয়ে গেলেন, মোহাম্মদ আলী মিনার বলে একটি লম্বামত নবীন গল্পলেখককে নিয়ে রুদ্র একবার ময়মনসিংহ এসেছিল, সেই মিনারও শিষ্য হয়ে গেল হিলুর, হিলু এমনই সম্মোহনী শক্তি ধারণ করেন। ছোটদা আর গীতার সঙ্গেও হিলুর ঘনিষ্ঠতা ছিল, দাদারও নাকি বন্ধু। একদিন আকুয়ায়, নানিবাড়ির খুব দূরে নয়, তাঁর বিশাল পুকুরঅলা বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করি আমাকে যেন তিনি গিটার শেখান। শুনেছিলাম তিনি কাউকে শেখান না গিটার, গীতা বলেছে মেয়েমানুষদের নাকি দুচোক্ষে দেখতে পারেন না, সেই হিলু যখন রাজি হয়ে যান আমাকে শেখাবেন গিটার, আমি হাতে কি পেয়ে যাই, তা ঠিক তক্ষুনি ঠাহর করতে পারি না। অসম্ভবকে সম্ভব করলে যেমন আনন্দ হয়, তেমন হয় আমার। হঠাৎ যেন সোনার মোহরের কলস পেয়ে গেছি, কলসের গলা পেঁচিয়ে থাকা সাপ চলে গেছে কোথাও কামিনীর গন্ধ শুঁকতে। সপ্তাহে তিন সন্ধেয় তিনি আসেন গিটার শেখাতে, তিনি এলে আর সব গৃহশিক্ষককে যেমন চা বিস্কুট দেওয়া হয়, তাঁকেও দেওয়া হয়। মাও হিলুকে চেনেন, হিলুর বড় ভাই হাশেমমামার বন্ধু। হিলুর জন্য মা বেশি করে মিষ্টি দিয়ে পায়েশ বানান। হিলু আমাকে উদারা মুদারা তারা ইত্যাদি শিখিয়ে মার হাতের চা আর পায়েশ খেয়ে উঠে যান। দাদা এক সন্ধেয় মুখোমুখি হন হিলুর। দাদার মুখটি হিলুকে দেখেই ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে, ফ্যাকাসে মুখটিতে ম্লান একটি হাসি ধরে রাখেন তিনি। হিলু চলে যাওয়ার পর ফ্যাকাসে মুখ থেকে হাসিটি বিদেয় করে বলেন, *হিলুরে কইছস কেন গিটার শিখাইতে?*

তাতে কি হইছে?

কি হয়েছে তা তিনি বলেন না। কেবল জিভে অপছন্দের চুক চুক শব্দ করেন।

মাস গেলে হিলুকে শাদা খামে দুশ টাকা পুরে দিতে যাই সম্মানী।

জিজ্ঞেস করেন, *এইটা কি?*

টাকা।

টাকা কেন?

টাকা কেন, তা না বোঝার কথা নয় হিলুর। ঠোঁটে বাঁকা একটি হাসি, বলেন, *তোমারে গিটার শিখাই বইলা তুমি কি আমারে বেতন দিতাছ নাকি?*

আমি চুপ হয়ে থাকি। হিলু টাকা নেননি। শত অনুনয়েও না। হিলু ধনীর ছেলে, টাকার তাঁর প্রয়োজন নেই সে জানি। কিন্তু মাগনা শিখতে আমার যে অস্বস্তি হয়! আমার অস্বস্তি থাকে, সেই সঙ্গে আমার জন্য হিলুর এই ত্যাগ, সন্ধের অনুষ্ঠানাদি ফেলে আমাকে সময় দেওয়ার জন্য থাকে হিলুর প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাবোধ এই বোধের মধ্যে একদিন সামনে দাঁড়ালেন বাবা। হিলু বৈঠকঘরে বসে আমাকে গিটার শেখাচ্ছেন দৃশ্যটি দেখে তিনি এমন চমকে উঠলেন যেন ভূত দেখছেন। বাবাকে দেখি দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন হিলু। সালামের প্রত্যুত্তর ঘৃণ্য কটাক্ষ। বাবা ভেতর ঘরে গিয়ে বাড়ি ফাটিয়ে আমাকে ডাকেন। সামনে আমি আর আমার হৃদকম্প দাঁড়ায়।

হিলু আইছে কেন?

গিটার শিখায় আমারে।

গিটার শিখা তর পুটকি বাইর করাম হারামজাদি। বেডারে এক্ষুনি এই মুহূর্তে ভাগা।একটা বদমাইস আমার বাড়িতে আইছে। কত বড় সাহস!

হিলু নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন বাবার বাক্যগুলো, আমি না পারছি শ্বাস ফেলতে না পারছি নিতে। না এটি ঘটছে না, বাবা কিছুই বলছেন না, হিলু ওঘরে হতভম্ব দাঁড়িয়ে নেই, তাঁর কানে কোনও মালকোষ রাগের সুর ছাড়া আর কিছু প্রবেশ করছে না, আমি প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চাইছি, কোনও অঘটন ঘটছে না বাড়িতে, এ আমার দুঃস্বপ্ন কেবল। একঘর অন্ধকার নিয়ে স্থবির দাঁড়িয়ে থাকি, মাথাটি গ্যাস বেলুনের মত আমাকে ছেড়ে উড়ে যেতে থাকে আকাশে,মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হতে। শরীর, আমি লক্ষ করি, চলৎশক্তিহীন। পাথর চাপা পড়া হলদে ঘাসের মত মরা শরীর, ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে যাওয়া স্যাঁতসেঁতে শরীর। হিলুকে সে রাতে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন বাবা। তাড়িয়ে দেবার পর আস্ফালন করতে থাকেন বাড়িময়।

হিলুরে কে না চেনে! শহরের নামকরা গুণ্ডা। এই নোমান, নোমান, দাদাকে চিল্লিয়ে কাছে এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, *তুই কি জানতি হিলু এই বাড়িতে আসে?*

দাদা হ্যাঁ সূচক না সূচক দুরকমই মাথা নাড়েন।

লেলিহান আগুনের পাশে এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল নিয়ে দাঁড়ান মা, *হিলু তো এই বাড়িতে কোনও গুণ্ডামি করতে আসে নাই!*

মার মন্তব্যের দিকে বাবা ফিরেও তাকান না। আগুন আগুনের মত জ্বলে, জল মার আঁজলা থেকে পড়ে মেঝে ভিজিয়ে দেয়। সারারাতই কড়িকাঠের দিকে মেলা আমার অনড় দুই চোখ থেকে বাবার প্রতি ঘৃণা আর ক্ষোভ চুইয়ে পড়ে। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বিছানায় আমার পাশে এসে বসেন।

এত দেমাগ তর বাপের! কিয়ের এত দেমাগ, বুঝি না! মাইনষে অভিশাপ দিব। মাইনষের সাথে অন্যায় আচরণ করলে মাইনসে অভিশাপ দিব না কেন? নিশ্চয়ই দিব।

গিটার শেখা জন্মের মত বন্ধ হল। ঘরের এক কোণে জিনিসটি পড়ে থাকে, পড়ে থেকে থেকে ধুলো আর মাকড়সার বাসা হয়ে ওঠে। অনেকদিন ভেবেছি হিলুর কাছে গিয়ে একদিন করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব, কিন্তু এত ছোট মুখ নিয়ে অত বড় মানুষটির সামনে দাঁড়াতে আমার সঙ্কোচ হয়েছে।

এর পরপরই মিতু এল, সাজ সাজ রব পড়ে গেল বাড়িতে। বাড়ির আগাপাস্তলা সাজানো গোছানো হল। দাদার কোম্পানীর বড় কর্তার মেয়ে মিতু। ময়মনসিংহ মেডিকেলে ভর্তি হবে, এ বাড়িতেই থাকবে, যদ্দিন না হোস্টেলের ব্যবস্থা হয়। যেদিন তার বাবা মা সহ গাড়ি করে মিতু এল, গালে ব্রণ ভরা, হাসিতে মুক্তো ঝরা,কোকঁড়া চুলের ফর্সা ত্বকের মেয়ে মিতু এল, সেদিনই বাড়ির সবার সঙ্গে ও ভাব করে নিল। আমি ওর এক ক্লাস ওপরে হলেও নির্দ্বিধায় আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করল, ইয়াসমিনকে বলল, কোনও আপনি টাপনি নয়, তুমি। বাড়িতে পোলাও মাংস রান্না হয়েছে, মিতুর জন্য বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘরটি, ভাল ঘরটি মানে দাদার ঘরটি গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিতু চটপট ঝটপট উচ্ছল উজ্জ্বল মেয়ে, রাজ্যির গল্প করে ফেলল ঘন্টাখানিকের মধ্যেই। মিতুর মাও তাই, যেন আমরা ওদের জন্ম জন্ম চেনা। মিতুর মত গুছিয়ে গল্প বলা আমার হয় না। বলতে নিলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। আমি নৈঃশব্দের হাতে নিজেকে সমর্পণ

করে কেবল দেখে যাই, শুনে যাই। মিতুর মত অনর্গল ইংরেজি বলা আমার হয় না। এত শীঘ্র মানুষের আপন হয়ে ওঠার ক্ষমতা অর্জন করা আমার হয় না। মিতুকে রেখে তার বাবা মা ফেরত যান ঢাকায়। কলেজে ভর্তি হল মিতু। বাড়ির সবাই ওর সেবায় চব্বিশ ঘন্টা ব্যস্ত। মিতুর কখন কি চাই, এগিয়ে দাও। মিতু গোসল করবে, দৌড়ে যাও, গোসলখানায় পানি আছে কি না দেখ, না থাকলে কল চেপে দু বালতি পানি ভরে গোসলখানায় দিয়ে এসো। বাড়ির সবচেয়ে ভাল তোয়ালেটি, সাবানটি হাতে দাও। মিতু এখন খাবে, সব চেয়ে ভাল থালাটি ওকে দাও, মাছ মাংসের সবচেয়ে ভাল টুকরো তুলে দাও। মিতু এখন টেলিভিশন দেখবে, সোফার সবচেয়ে ভাল জায়গাটি ওকে দাও। মিতু ঘুমোবে, দৌড়ে যাও বিছানা ঝেড়ে মশারি ফেলে দিয়ে এসো। মিতু ঘুমোচ্ছে, কোনও টুঁ শব্দ যেন কোথাও না হয়। বাবাও বাদ পড়েন না মিতুর সেবা থেকে। অঢেল মাছ মাংস পাঠিয়ে দিচ্ছেন বাড়িতে, মিতুর জন্য রান্না হবে। ইংরেজি জানা মেয়ে শার্ট প্যান্ট পরা মেয়ে প্রতিরাতে টেলিভিশনের ইংরেজি ছবি দেখে, অবসরে ইংরেজি গল্পের বই পড়ে, ইংরেজি গান শোনে, মিতু ঘরেই থাকে ঘরের মেয়ের মত, অথচ প্রচণ্ড বাইরের মেয়ে ও। গলাগলি করলেও আমাদের সঙ্গে ওর বিস্তর তফাত থেকে যায়। ধনীর কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার কোনও বন্ধুত্ব হয় না। আমি ঠিক কি বলতে হয় ওদের সঙ্গে বুঝে পাই না। ওদের ফ্যাশনের গল্পে, বিদেশ ভ্রমণের গল্পে, বিদেশি সংস্কৃতির গল্পে আমি এক মাথা অজ্ঞতা নিয়ে নিরেট শ্রোতা হয়ে বসে থাকি। ইশকুলের চশমা পরা বড়লোকের মেয়ে বড়লোকি কায়দায় কথা বলা চলা আসমা আহমেদের সঙ্গেও কখনও ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি, যদিও আসমার বাড়িতে গেছি, যদিও আসমা আমার কবিতার খাতা প্রায়ই পড়তে নিয়ে যেত, যদিও আসমা আমার কবিতাকে *খুব ভাল খুব ভাল* বলে প্রশংসা করত। মুন্নি যখন মাঝে মাঝেই এ বাড়িতে আসত ওর মার সঙ্গে বেড়াতে, মা অবলীলায় বসে যেতেন মুন্নির মার সঙ্গে গল্প করতে, মুন্নি যেহেতু আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত, আমারই যাওয়া উচিত ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য, কিন্তু আমি ঠিক বুঝে পেতাম না কি কথা বলব ওর সঙ্গে। *কেমন আছো* দুশব্দের এই বাক্যটি আওড়ে আমি আর কোনও বাক্য খুঁজে পাইনি বলার। মেট্রিকে তৃতীয় বিভাগে পাশ করার পর মুন্নির বিয়ে হয়ে গেল গোবরে পদ্মফুলের সঙ্গে, ফুলটি কোনও এক অজ পাড়াগাঁর লেখাপড়া না জানা এক দরিদ্র কৃষকের ইঞ্জিনিয়ার ছেলে। স্বামী নিয়েও মুন্নি বেড়াতে এসেছিল এ বাড়িতে, বৈঠকঘরে একটু শুধু উঁকি দিয়েই ঠেলে সামনে পাঠিয়েছি ইয়াসমিনকে, মাকে। মা আর ইয়াসমিন যে কারও সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের গল্পগাছায় পটু না হলেও কায়ক্লেশে চালিয়ে নিতে পারেন। আমারই হয় না। অথচ এই মুন্নি যার সঙ্গে রিক্সা করে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বের ইশকুলে যেতাম। চতুর্থ থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছি,নতুন ক্লাসে ওঠার উত্তেজনা তখনও আমাকে ছেড়ে এক পা কোথাও যায়নি। নতুন বই কিনে দিয়েছেন বাবা, রঙিন কাগজে বইগুলোর মলাট বেঁধেছি, পড়ে ফেলেছি বাংলা গদ্য পদ্য দুটো বই-ই। আড়াআড়ি দাগ টানা বাংলা খাতা, চার দাগঅলা ইংরেজি,আর দাগহীন অঙ্ক খাতাও সাজিয়ে রেখেছি টেবিলের ওপর। সাড়ে নটা বাজার আগেই আমি তৈরি হয়ে নিই ইশকুলের পোশাক পরে, ঘি চিনি মেখে গরম ভাত খেয়ে, কালো একটি ছোট সুটকেসে বইখাতা ঢুকিয়ে। হেঁটেই যাওয়া যায় ইশকুলে, মোড়ের সরস্বতী মণ্ডপ পেরিয়ে সের পুকুর পাড় ধরে হেঁটে মনোরঞ্জন ধরের বাড়ির সামনে দিয়ে বড় রাস্তায় উঠলেই রাস্তার ওপারে লাল দালানের বিদ্যাময়ী ইশকুল। কিন্তু হেঁটে ইশকুলে যাওয়ার অনুমতি বাড়ি থেকে পাইনি। হাঁটতে গেলে গাড়ি গরুর তলে পড়ে হাত পা ভাঙব, এ ব্যাপারে বাড়ির সবাই নিশ্চিত। বাবা সকালে চার আনা পয়সা

দেন, সেই চারআনা নিয়ে অবকাশ থেকে বেরিয়ে বাঁ রাস্তায় তিন বাড়ি পর এম এ কাহহারের বাড়ির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই, আমাকে দেখে ভেতর ঘরে ইস্ত্রি করা পোশাক পরে, দামি জুতো পরে মোটা মেয়ে, ফর্সা মেয়ে, ধনীর মেয়ে, লেখাপড়ায় গোল্লা পাওয়া মেয়ে মুন্নি তৈরি হয়। কুঁচি কেটে শাড়ি পরা মুন্নির মার আঁচলে চাবির গোছা। হাঁটলে চাবিতে চাবিতে লেগে টিং টিং শব্দ হয়। আমাকে দেখে মুন্নির মা পান খাওয়া দাঁতে হেসে বলেন, *কি মেয়ে, তোমার মা কেমন আছে?* আমি মাথা নাড়ি, ভাল। আমার মা ভাল আছেন, রান্নাঘরের বারান্দায় বসে মাটির চুলোয় নারকেলের শুকনো পাতা গুঁজে আগুন ধরাতে চাইছেন, ফুঁকনি ফুঁকছেন, ধোঁয়ায় ঢাকা মা, ধোঁয়ায় ঢাকা মাঞ্চর মলিন শাড়ি। মার শাড়ির আঁচলে কোনও চাবির গোছা থাকে না, চাবির গোছা বাবার কাছে, বাড়ির কোনও দরজা কিংবা আলমারিতে তালা দিতে হলে বাবাই দেন, ভাঁড়ার ঘরেও সময় সময় তালা দেন, চাবি থাকে বাবার পকেটে, সে পকেট ছোঁয়ার সাধ্য অবকাশে কারও নেই। মার সঙ্গে মুন্নির মার তফাত অনেক। মুন্নির মার গা ভরা সোনার অলংকার, খোঁপা করে রাখা চুল, পায়ে রঙিন ফিতের চটি, মার কাদা পা খালি পা, মার এলো চুল, মার ধোঁয়া মুখ, মার শুকিয়ে চড়চড় ঠোঁট। মুন্নির সঙ্গে আমারও তফাত অনেক। মুন্নি দেখতে পুতুলের মত, ঝকঝকে। আমি সেরকম নই, না হলেও আমরা এক রিক্সায় বসে ইশকুলে যাই, ইশকুলে যাওয়ার রিক্সাভাড়া আমি দিই, ইশকুল থেকে বাড়ি ফেরারটি দেয় মুন্নি। মুন্নির মা প্রতিদিন আঁচলে বাঁধা বড় চাবি দিয়ে শোবার ঘরের আলমারি খোলেন, খুলে আরেক চাবি দিয়ে আলমারির ড্রয়ার, সেই ড্রয়ার থেকে বের করেন সোনালি রঙের কৌটো, কৌটোর ভেতর আরেক কৌটো, সেই কৌটোর ভেতর থেকে চার আনা পয়সা বের করে মুন্নির হাতে দেন। ইশকুলে যাওয়ার পথে মুন্নি অনর্গল কথা বলে, আমি কেবল শুনি। প্রায় বিকেলে ওর ছোট ভাই পাপলুকে নিয়ে যখন আমাদের বাড়ির উঠোনে লাল ফিতেয় চুলে দুবেণী গেঁথে খেলতে আসে, তখনও ও একাই কথা বলে, আমি শুনি।

সেই মুন্নির হাস্যোজ্জ্বল ঝলমলে মার পায়ের আঙুলের ডগা একদিন লাল হতে থাকে, লাল হতেই থাকে, লাল ছড়াতে থাকে, বাবা নানা রকম ওষুধ দিয়ে আঙুলের লাল সারাতে না পেরে একদিন কেটেই ফেললেন বুড়ো আঙুল। আঙুলহীন মুন্নির মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠে আবার বিকেলে সন্ধেয় পাড়া পড়শির বাড়িতে গল্প করতে যেতে লাগলেন। মাস কয় পর আবার তাঁর আঙুলের ডগা লাল হতে শুরু করে। আবার সেই লাল ছড়াতে থাকে। ছড়াতে ছড়াতে ঠ্যাং বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে, বাবা বললেন ত্বকের ক্যান্সার এটি, পুরো পা কেটে ফেললে ক্যান্সার রোধ করা যাবে। পা কাটতে ও বাড়ির কেউ রাজি হয়নি। বাবা নিয়মিত মুন্নির মাকে দেখতে যান। মাও যান দেখতে। গিয়ে নিজে পানি গরম করে মুন্নির মার পা-টি পানিতে ডুবিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে তাঁকে সুস্থ হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাতে থাকেন। শেষে এমন অবস্থা হয়, মুন্নির মার সারা শরীর থেকে গন্ধ বেরোতে থাকে, মশারির তলে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়। শিশি শিশি আতর ঢেলেও গন্ধ দূর করা যায় না। বাড়ির লোকেরাই মুন্নির মার ঘরে ঢুকতে চায় না, অথচ বাইরের মানুষ হয়ে মা গিয়ে সেই গন্ধের ভেতর ঢোকেন, ঢুকে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন, চোখের পানি আঁচলে মুছতে মুছতে বলেন *আল্লাহ আপনেরে সুস্থ কইরা তুলবেন, আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন।* মার দরদ সবার জন্য। মা বস্তিতে গিয়েও বস্তির নোংরা মেয়েমানুষের গায়ে হাত বুলোতে পারেন, বড়লোকের বাড়ি গিয়েও বড়লোকের বউএর গায়ে পারেন। মা অনেকদিন আমাকে সেধেছেন, *চল যাই মুন্নির মারে দেইখা আসিগা, মানুষটা খুব কষ্ট পাইতাছে।* আমি না বলে দিই। মা একা যান। মা পারেন, আমিই পারি না। কুণ্ঠা, ভয়, লজ্জা আমাকে

আমার হাড়গোড়ের ভেতর সেঁধিয়ে ফেলে। তাঁর মলিন কাপড়চোপড়, মলিন শরীর বা মলিন জীবনটি লোকে কি চোখে দেখবে, এ নিয়ে মা আর ভাবেন না। মুন্নির মাকে দেখে এসে মা বলেন, *বড়লোকের বউ হইলে কি হইব, অসুখ হইছে, শরীরে গন্ধ বইলা কেউ আর তার কাছ ঘেঁষে না। কাজের মানুষ রাখছে, সে-ই কাছে থাকে।* মেয়েমানুষের, সে দরিদ্রের কি ধনীর বউ হোক, কষ্টের সীমা নেই, মার ধারণা। মাকে বস্তির লোকেরা, ভিক্ষে নিতে আসা মানুষেরা *বড়লোকের বউ* বলে জানে। মা শুধরে দেন ওদের, *বড়লোকের বউ হওয়া আর বড়লোক হওয়া আলাদা কথা। আমার স্বামী বড়লোক হইতে পারে, আমি কিন্তু গরিব মানুষ। আমার কোনও পয়সাকড়ি নাই।* মা মাঝে মাঝে বলেন, *মানুষের বাড়িতে কাজ কইরা পাঁচটা টাকাও যদি কামাইতে পারি, সেইডা ত আমার রোজগার হয়। পাঁচটা টাকাই কি কেউ আমারে দেয়? বাড়ির কামের বেডিগোরও আমার চেয়ে ভাগ্য ভাল।* বড়লোকের বউ হয়ে মা যা পেয়েছেন, তার চেয়ে হারিয়েছেন অনেক। অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত তিনি, এদিক ওদিক সেলাইএর কাজ পাওয়ার জন্যও ঘুরেছেন, কাজ পাননি। মাকে বড় কাজ কেউ দেয় না মার লেখাপড়া নেই বলে, ছোট কাজও দেয় না মা *বড়লোকের বউ* বলে। মার এই সংসারের কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ জোটে না। ইয়াসমিনের মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। ইয়াসমিনকেও মা ধরেন, *আমারে একটু প্রাইভেটে মেট্রিকটা দেওয়ার ব্যবস্থা কইরা দিবা? তুমি যদি অঙ্কটা একটু দেখাইয়া দেও, আমি ঠিক পাশ কইরা যাব।* ইয়াসমিনের বইগুলো মা ঘাঁটেন। খুব যত্নে পাতা ওল্টান, গড়গড় করে পড়ে ফেলেন কোনও কোনও পাতা, বলেন *এ তো এমন কিছু কঠিন না!* মার মেট্রিক পরীক্ষা দেবার শখের কথা শুনে বাড়ির সবাই মুখ টিপে নয়, সশব্দেই হো হো করে হাসে, এমনকি আমেনাও।

এর মধ্যে ঝুনু খালা সেই বরিশালিকে বিয়ে করে ময়মনসিংহে নিয়ে এসেছেন। বরিশালিকে নিয়ে আসার আগে ঝুনুখালা নিজে একা এসে কি করে বাড়িঘর আগাগোড়া গোছাতে হবে, কে কি পোশাক পরে থাকবে, বাড়িতে কে কেমন আচরণ করবে, কি জিজ্ঞেস করলে কি বলতে হবে, কি কিই বা রান্না হবে ইত্যাদি নানা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন সবাইকে। আমাদের বাড়ি এসেও বরবউকে নেমন্তন্ন করার কথা বলে গেছেন। ঝুনুখালা আর তাঁর বরিশালি স্বামীকে দেখতে নানিবাড়ি গিয়ে দেখি সবাই গলা নামিয়ে কথা বলছে, নানি নানা পদের রান্না করছেন, ঝুনুখালা এ ঘর ও ঘর ছুটোছুটি করছেন, আর নতুন চাদর পাতা বিছানায় নতুন কড়কড়ে লুঙ্গি আর শাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে মুখ চুন করে বসে আছেন বরিশালি। বরিশালি অবকাশে যেদিন এলেন সেদিন মুখের চুনটি দূর হল। জুতোর মচমচ শব্দ তুলে হাঁটা বাবাকেও বেশ পছন্দ হল তাঁর। ঝুনুখালার বোনের স্বামী ডাক্তার, তাও আবার মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক-ডাক্তার, বরিশালি পলকহীন চোখে বাবাকে দেখেন আর বলেন, *আত্মীয় বলতে তো আপনারাই।* ঝুনুখালা চলে যাওয়ার পর মা বলেন, *ঝুনু অত তোয়াজ করে কেন জামাইরে? নিজে সে এমএ পাশ করা মেয়ে। সে এখন বড় চাকরি বাকরি করবে। তার তো ঠেকা পড়ে নাই জামাইরে মানাইয়া চলার!*

মার সুযোগ নেই বলে লেখাপড়া করতে পারেননি। মাঝে মাঝে ভাবি, আবার সুযোগ থাকলেও কেউ হেলায় সে সুযোগ নষ্ট করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় রুদ্রর নাম আছে, ওটুকুই। ক্লাসও করে না, পরীক্ষাও দেয় না, আমি তাকে অন্তত মাস্টারডিগ্রিটা পাশ করতে বলি, তার নিজের জন্যই বলি। তার দ্বারা হবে না এসব, কারণ, স্পষ্ট বলে দেয়, এসব একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের সে থোড়াই কেয়ার করে। সে সারাজীবন কবিতা

লিখবে, কবিতাই তার নেশা পেশা যা কিছু। রুদ্র ট্রেনে করে পাঁচ ঘন্টায় ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ আসে, বাসেও এলেও ওই একই সময়। একবার ভিড়ের ট্রেনে ঝুলতে থাকা নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সে ঝুলে পড়ল গুণের ঘাড়ে। গুণের বাড়ি আমাদের দেখা করার নতুন একটা জায়গা হল। কিন্তু ঠায় কতক্ষণই বা বসে থাকা যায় অন্যের বাড়িতে! ওদেরও তো ঝগড়াঝাটি আছে, চিৎকার চেঁচামেচি আছে! সুতরাং রিক্সা করে চল ঘুরে বেড়াই! শহরের কেউ যেন না দেখে ফেলে আমাদের, শহরের ভেতর দুজন দুটো আলাদা রিক্সা নিই, শহর থেকে দূরে গিয়ে একটি রিক্সা ছেড়ে দিয়ে দুজন এক রিক্সায় পাশাপাশি বসি। রুদ্রর স্পর্শ বিষম পুলক জাগায় মনে! শহরের বাইরে যাবার মত জায়গা এক মুক্তাগাছা, নির্জন গ্রামের রাস্তায় রিক্সা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, সারি বেঁধে দাঁড়ানো কড়ইগাছের তল দিলে, ছোট ছোট নদীর ওপর ছোট ছোট সেতু পার হয়ে চলে। আমার চোখ পড়ে থাকে সবুজ শস্যে, বিলের জলে ন্যাংটো ছেলেদের দাপাদাপিতে, শীর্ণ গরুর নির্বিকার রাস্তা পারে, আর মন পড়ে থাকে রুদ্রে। রুদ্রর চুমু খাওয়ার নিরন্তর চেষ্টাকে শরমে সরিয়ে সরিয়ে মুক্তাগাছা পোঁছি। সাপে শ্যাওলায় আগাছায় পরগাছায় আর মাকড়শার জালে ছেয়ে থাকা জমিদারবাড়ির আঙিনা ঘুরি ফিরি, রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটলেও ভয় নেই, এ শহরে টিটি ফেলার মত চেনা লোক নেই।

রুদ্র সেবার ঢাকা ফিরে যাবার পর, কদিন পর আর, সাতদিন, ক্লাসে ঢুকতে যাব, ওপরের ক্লাসের এক মেয়ে এসে জানাল নীরা লাহিড়ী খবর পাঠিয়েছে, এক্ষুনি যেন তার বাড়ি যাই।

ক্লাস ফেলে দৌড়োলাম গুণের বাড়ি।

দেখি রুদ্র বসে আছে গুণের বসার ঘরে। ঘরে দুটো কাঠের চেয়ার, একটি চৌকি। চৌকিতে। দেখে মন নেচে ওঠে। রুদ্রকে দেখলে এই হয় আমার, মন নাচে।

কী ব্যাপার হঠাৎ!

হ্যাঁ হঠাৎ। চিঠিতে জানাবার সময় পাইনি।

ও।

এরপর মুখোমুখি বসে থাকা নৈঃশব্দের সঙ্গে দুজনের। নৈঃশব্দের নীলিমা জুড়ে রুদ্রর স্টার সিগারেটের ধোঁয়া।

রুদ্র তার কাঁধের কালো ব্যাগ থেকে একখানা কাগজ বের করে বলল, *এই কাগজে একটা সই করতে হবে তোমার।*

কিসের কাগজ এটা?

পরে বলব। আগে সই কর।

কেন?

এত কথা বোলো না।

কাগজটা কিসের?

প্রশ্ন করি, কিন্তু আমি নিশ্চিত রুদ্র কোনও স্মারকলিপিতে অথবা নতুন কোনও কবি-সংগঠন তৈরি করেছে, আমাকে সেই সংগঠনের সদস্য করতে সই চাইছে। আমার নিশ্চিত চোখদুটোয় ভোরের স্নিগ্ধ আলো। আমার নির্দ্বিধ ঠোঁটে এক ঝাঁক পাখির ওড়াওড়ি।

কাগজটি নিতে হাত বাড়ালে রুদ্র সরিয়ে নেয় কাগজ। দ্বন্দ্বে পড়ি, ধন্ধে পড়ি।

কিসের কাগজ এটি? না পড়ে তো সই করব না!

রুদ্রর শ্যাওলা পড়া চোখ স্থির হয়ে থাকে আমার চোখে।

বিয়ের কাগজ। রুদ্রর ভারি কণ্ঠ, ভাঙা কণ্ঠ।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে। ঝাঁ ঝাঁর ঝঞ্ঝাট ঝেড়ে ঝরঝরে হই।

বিয়ের কাগজ?

হ্যাঁ বিয়ের কাগজ।

কেন?

কেন মানে?

বিয়ের কাগজ কেন?

কেন তা বোঝো না?

না।

সই করবে কি করবে না বল।

আশ্চর্য, এভাবে, এরকম করে বিয়ে করব কেন?

তাহলে তুমি সই করবে না?

কী লেখা আছে দেখি!

আমি কাগজটি হাতে নিতেই রুদ্র হাঁ হাঁ করে উঠল, *বৌদি আসছে, লুকোও।*

লুকোবো কেন?

বুঝে ফেলবে।

কি বুঝবে?

বুঝবে যে বিয়ের কাগজ।

কি করে?

আরে বুঝবে বললাম তো!

বুঝলে কি ক্ষতি?

ক্ষতি আছে।

কি ক্ষতি, শুনি!

রুদ্র টেনে নিল কাগজখানা হাত থেকে। পাথুরে গলায় বলল *তুমি সই করবে কি না বল, হ্যাঁ বা না।*

এ কি আশ্চর্য! বিয়ের কথা উঠছে কেন হঠাৎ!

উঠছে।

কে উঠিয়েছে?

আমি।

আমি তো বলিনি আমি বিয়ে করব!

আমি বলছি।

এক হাতে তালি বাজে?

সই করবে?

না।

কাগজটি ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল রুদ্র, বলল *ঠিক আছে, চললাম।*

বিস্ময় আমার জগত ধোঁয়াটে করে আনে, *কোথায়?*

ঢাকায়।

এক্ষুনি?

হ্যাঁ।

কেন, কি হয়েছে?

থাকার আর প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন নেই?

রুদ্রর নিরুত্তাপ কণ্ঠ। *না।*

কাগজে সই করিনি বলে সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল?

কোনও উত্তর না দিয়ে দরজা হাট করে খুলে বেরিয়ে যায় রুদ্র। বেরিয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে। ভালবাসায় উপচে ওঠা আমার হৃদয়খানা সে পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি সে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে। পেছনে আমি একা, রুদ্র ফিরে তাকাচ্ছে না। আমি আর তার কেউ নই। সে ফিরছে না।

তীব্র এক বেদনা আমাকে উঠিয়ে বারান্দায় নিল, তার চলে যাওয়ার দিকে নিল, তার চলে যাওয়াকে দুহাতে থামাল।

কই দেখি, কাগজটা দেখি তো!

কেন?

কেন আবার, সই করব!

রুদ্র কাগজ বের করে দিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে খচখচ করে কি লেখা না পড়ে না দেখে সই করে, কাগজটি রুদ্রর হাতে দিয়ে, মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা তার চোখের দিকে আমার বেদনার্ত দৃষ্টি ছুঁড়ে বললাম *এই সইএর যে এত মূল্য তা আগে বুঝতে পারিনি। সই হল। এবার খুশি তো! চলি।*

গুণের বাড়ির আঙিনা পার হয়ে রাস্তায় উঠলাম। দ্রুত।

পেছন থেকে রুদ্র *শোনো, দাঁড়াও* বলে ডাকছে।

আমি পেছন ফিরিনি।

রিক্সা নিয়ে সোজা কলেজে। পরের ক্লাসগুলো খুব মন দিয়ে করলাম।

তখনও আমার ভেতর এই বোধটিই আসেনি, যে, অভিমানের ওই সইটিই আমার বিয়ে ঘটিয়ে দিয়েছে। তখনও আমি রুদ্রকে রুদ্র বলে ডাকি না, তুমি বলে সম্বোধন করি না। তখনও কোনও চুমু খাইনি আমরা, স্পর্শের মধ্যে কেবল হাতের আঙুল। তখন সবে আমার উনিশ বছর বয়স।

কাগজে সই নিয়ে যাবার মাস দুই পর রুদ্র চিঠি লেখে, *বউ* সম্বোধন করে। সম্বোধনটি পড়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কেমন অদ্ভুত আর অচেনা এই ডাকটি। আমি তবে কারও বউ! ওই সইটি তবে কি সত্যি সত্যি বিয়ে ঘটিয়ে দিয়েছে! অবিশ্বাস্য একটি কাণ্ড। নিজের বিয়ে, কোনওদিন কল্পনাও করিনি ওভাবে হবে, হবে যে কোনওদিন, সে বিশ্বাসই ছিল না। জানুয়ারির ছাব্বিশ তারিখে কাগজে সই করলাম, আর কাগজটি উকিলের কাছে দিয়ে আসার পর উকিল তাঁর নিজের সই আর সীল বসালেন উনত্রিশ তারিখে। শাদামাটা চিঠিতে রুদ্র জানিয়েছে, উনত্রিশ তারিখটি আমাদের বিয়ের তারিখ। উনত্রিশ তারিখে আমি কি করছিলাম, ভাবি, সারাদিন কি একবারও রুদ্রর কথা ভেবেছি? না ভাবিনি, সময় পাইনি, মরা মানুষ কেটেছি, ছোটখাট একটি পরীক্ষা ছিল, প্রচুর পড়তে হয়েছে, পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে আর দিনের মতই টেলিভিশন দেখেছি, ভাই বোনের সঙ্গে খুনসুটিতে মেতেছি, আর দিনের মতই কবিতা পড়েছি, গান শুনেছি, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েছি। রুদ্রর চিঠি পেয়ে যতই আমি নিজেকে বলি, *দেখ তুই এখন আর অবিবাহিত নস, রীতিমত এক লোকের বউ। বিয়ে করলে তো বউই হতে হয়। এরকমই তো নিয়ম, তুই চাস বা না চাস কাগজের ওই সইটিই তোর বিয়ে ঘটিয়েছে,* ওই বলাই সার, ব্যাপারটিকে আমার বোধ ও বিশ্বাসের অন্তর্গত করতে পারি না। আমি সত্যি করে অনুভব করতে পারি না যে আমি আর আগের আমি নই, আমি এখন নানি,মা, ফজলিখালা,রুনুখালার মত বিবাহিতা। চন্দনাও বিবাহিতা। বিয়ের পর চন্দনা লিখেছে *আমি এখন ভয়শূন্য এক মানুষ। জীবন বাজি রেখে স্বপ্নের হাত ছুঁয়েছি। আমি খুব গভীর করে স্বপ্ন দেখতে জানি এখন। জীবন তো আমার একটাই। আমি ভুল করিনি। আমি এখন হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি রক্তগোলাপ।* বিবাহিতা চন্দনার আবেগ চাইলেও আমার ভেতর সঞ্চারিত হচ্ছে না। আমার বোধের সীমানায় নেই পুরুষের স্পর্শ নারীর শরীরে কিরকম কাঁপন তোলে, আর সেই কাঁপন কি রকম তৃষ্ণা জাগায়। কলেজে পুরুষ বন্ধু যা আছে, তা কেবলই বন্ধু। চন্দনা যেমন। কোনও পুরুষকে আজও আমার চুমু খাওয়া হয়নি। কারও জন্য শরীরে কোনও তৃষ্ণা অনুভব করি না। তৃষ্ণা বলে যে একটি জিনিস আছে তা আমার নেহাতই জলের বা চায়ের বা খুব গরমে লেবুর শরবতের।

বউ সম্বোধন করে লেখা রুদ্রর দ্বিতীয় চিঠিটি বাবার হাতে পড়ে। ডাকপিয়ন বাড়িতে চিঠি দিয়ে গেছে, আর *পড়বি পড় মালির ঘাড়ে,* বাবার হাতে। বাবার যেহেতু অন্যের চিঠি খুলে পড়ার প্রচণ্ড শখ, তিনি পড়েন। তার মেয়েকে কেউ বউ বলে ডাকছে, তিনি তা খালি চোখে, চশমা চোখে সব চোখেই দেখেন। ঘরময় পায়চারি শুরু হয় বাবার, আমার পড়ার টেবিলের বইখাতা তছনছ করেন আরও তথ্য পেতে। ঘন ঘন তিনি চশমা খুলতে

থাকেন, চেয়ারে বসতে থাকেন, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে থাকেন, একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, রোগী দেখায় মন বসে না, আবার বাড়ি ফেরেন। এবার মাকে ডাকেন। যখনই ছেলে মেয়ে সংক্রান্ত কোনও দুর্ভাবনা, তখনই বাবা মার খোঁজ করেন, অথবা বাড়িতে অতিথি আসবে, তখনই মার খোঁজ, *কই গেলা ঈদুন, এদিকে আসো তো!* বাবা হিশেব দেন, কজন আসবে, কতজনের জন্য রান্না করতে হবে, এমনকি কি কি রাঁধতে হবে তাও। মা মন দিয়ে শোনেন সব। শোনেন কারণ মার এসময় নিজেকে খুব মূল্যবান মানুষ বলে মনে হয়। এ সংসারে তাঁর যে প্রয়োজন আছে, তা উপলব্ধি করেন মা এবং বিচিত্র এক আনন্দ মাকে লেপ্টে থাকে মার ঘামের মত। এবার ডাকার পর হন্তদন্ত হয়ে মা সামনে দাঁড়ালে বাবা বলেন, *নাসরিনরে বউ ডাকে কেডা জানো নাকি? কার এত সাহস ওরে বউ ডাকে?*

কি জানি, আমি ত এইসব কিছু জানি না।

কোনও ছেলের সাথে জড়াইল নাকি?

এইরকম তো কিছু দেখি নাই। হাবিবুল্লাহরে ত বাড়ি থেইকা ভাগাইল। তেমন কোনও ছেলেও ত বাড়িত আসে না। কারও সাথে জড়াইছে বইলা মনে হয় না।

না জড়াইলে বউ নামে চিঠি তারে কোন বেডায় লেখে?

তা তো জানি না।

খবর তো কিছু রাখো না। কি কর সারাদিন বাড়িতে? মেয়ে কি করতাছে না করতাছে, তার খবর যদি না রাখতে পারো, তাইলে কি লাভ? আমি বাউণ্ডারি ওয়াল উঁচা করলাম। বাইরের কোনও ছেলেপিলে মেয়েদেরে যেন না দেখতে পারে সেই ব্যবস্থা করলাম। এখন কোথাকার কোন ছেলে ওরে বউ কইয়া ডাকে!

চিঠি লেখে তা জানি। পত্রিকা ছাপায়। এদিকে ওদিকে চিঠি লিখতে হয় কয়।

এই চিঠি কোনও পত্রিকার চিঠি না। এইটা অন্যরকম চিঠি।

আমি বাড়ি ফিরি কলেজ থেকে। মা দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসেন অন্যদিন। সেদিন তিনি মোটেও নড়েন না।

কি, ভাত কই?

ভাত পাতিলে। মা বলেন।

আমেনাও নড়ে কি নড়ে না চলে কি চলে না। অসম্ভব শ্লথগতিতে ভাত বেড়ে নিয়ে আসে। সঙ্গে ডাল।

কি!ডাল দিয়া ভাত দিলা যে! মাছ মাংস নাই।

প্রত্যেকদিন মাছ মাংস লাগব না। মার রুক্ষ কণ্ঠ।

মাছ মাংস ছাড়া আবার ভাত খাওয়া যায় নাকি?

আমি দুমুঠো খেয়ে থালা ঠেলে উঠে চেঁচাই, *পানি কই?*

মা বলেন, *পানি কলে।*

পানি কলে সে তো আমিই জানি, কিন্তু দিতে হবে তো।

কে দেবে আমাকে পানি! গজগজ শুরু করলে গজেন্দ্রগামিনী আমেনাই একসময় কল থেকে গেলাসে পানি ভরে নিয়ে আসে। বাড়ি থমথম। অনুমান করি কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে তা বোঝাবার জন্য মা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেন না। বিছানায় টান টান হয়ে একটি বই হাতে নিয়ে যখন শুয়েছি, গম্ভীর মুখে কাছে এসে গম্ভীর মুখেই জিজ্ঞেস করেন, *রুদ্র কেডা?*

রুদ্র?

হ রুদ্র।

কেন?

সে তরে বউ ডাকে কেন?

বুকের মধ্যে ঠাণ্ডা জলের গেলাস উপুড় হয়ে পড়ে। বোঁ বোঁ পাখার তলে আমি ঘেমে উঠি। দিনের ঝলমল আলো চোখের সামনে অমাবস্যার রাতের মত লাগে।

কী কস না কেন, রুদ্র কেডা?

আমার আর বলার দরকার নেই রুদ্র কে! আমার শুধু জানার দরকার, চিঠি মার হাতে পড়েছে না অন্য কারও হাতে। বাবার হাতে হলে জীবনের এখানে এ মুহূর্তে সমাপ্তি। ডাল ভাত তো জুটেছে আজ, কাল কিছুই হয়ত জুটবে না। খানিকটা নরম হলে মা নিজেই বলেন, চিঠি বাবার হাতে পড়েছে। এটি জানার পর নিষ্প্রাণ শরীরটি নিচ্ছিদ্র নিরালায় ফেলে ফেলে রাখি, বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে অপ্রকৃতিস্থের মত উঠে রুদ্রকে লিখি যেন বউ সম্বোধন করে আর একটি চিঠিও সে না লেখে। রুদ্রকে চিঠি আমার এভাবেই লিখতে হয়, বাড়িতে কেউ না থাকলে, অথবা সবাই ঘুমিয়ে গেলে। তা না হলে যে কেউ লেখাটির ওপর ঝুঁকে পড়বে, যে কারও এ বাড়িতে অধিকার আছে দেখার আমি কি লিখছি, আড়াল করতে চাইলে আগ্রহ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন সকালে বাবা বেরিয়ে যাবার আগে আমার আর ইয়াসমিনের চাইতে হয় ইশকুল কলেজে যাওয়ার রিক্সাভাড়ার টাকা। বাবা গুনে টাকা দিয়ে যান। পরদিন সকাল হয়, বাবার গোসল সারার শব্দ হয়, জুতোর মচমচও শুনি, বাবার নাস্তা খাওয়ার এমনকি পানি গেলার শব্দও পাই, কিন্তু ধড়ে প্রাণ নিয়ে সামনে গিয়ে অন্যদিনের মত নতমুখে দাঁড়িয়ে রিক্সাভাড়ার টাকা চাওয়ার মত কলজের জোর আমার থাকে না। নিজের অস্তিত্বটিই এক বড় বোঝা আমার কাছে। আমি যদি এক তুড়িতে হাওয়ায় হাওয়া হয়ে যেতে পারতাম। আমাকে যদি কেউ দেখতে না পেত! টেলিভিশনে *ইনভিজবল ম্যান* সিরিজটি দেখে মাঝে মাঝে অদৃশ্য হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি হাড়ে মাংসে অনুভব করি। বাবার কাছ থেকে নিরুদ্বেগে টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছে ইয়াসমিন। নিরুদ্যম আমি ঘরের ভেতর দমবন্ধমুখবন্ধ পেটেরতলপেটেরচাপ সব বন্ধ করে বসে থাকি, বাবার মুখোমুখি হতে যেন আমাকে না হয়। বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি ভেতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে যেন বাড়ির প্রত্যেকে শোনে, মাকে বলেন, *ওর লেখাপড়া বন্ধ। ওরে আর কলেজে যাইতে হইব না। সব বন্ধ। ওর খাওয়া দাওয়া বন্ধ কইরা দাও। ভাত দিবা না!*

বাবা চলে গেলেন। আমি দশটা অবদি ডাকপিয়নের জন্য অপেক্ষা করে রুদ্রর কোনও চিঠি নেই নিশ্চিত হয়ে মার তোশকের তল থেকে টাকা নিয়ে কলেজে যাই। আটটা থেকে কলেজে ক্লাস শুরু হয়। এভাবে ফাঁকি দিলে ভবিষ্যতের বারোটা কেন, তেরোটা বেজে যাবে তা অনুমান করি। পরদিনও একই অবস্থা। ভেবেছিলাম, দিন গেলে বাবা নরম হবেন!নরমের কোনও লক্ষণ নেই। দাদার কাছে হাত পেতে রিক্সাভাড়ার টাকা নিয়ে পরদিন যেতে হয় কলেজে। বাবা নির্বিকার। আমি যে বাড়িতে একটি প্রাণী, তা একেবারে তিনি ভুলে গেছেন। মা উঠতে বসতে ধমকাচ্ছেন আমাকে। মাকে বাবা যা-ই বুঝিয়ে গেছেন, মা তা-ই বুঝেছেন। মা এরকমই, যে যা বোঝায়, তাই বোঝেন, নির্বিবাদে মেনে নেন যে কোনও মানুষের যে কোনও যুক্তি। কেউ যদি বলে এসে, *জানো কচু গাছ থেকে পড়ে একজন মারা গেল,* মা বললেন *আহা, মইরা গেল!* মা সবাইকে বলবেনও, *জানো কচু গাছ থেকে পইড়া পাড়ার এক লোক একেবারে মইরাই গেল!* মা একটুও ভাববেন না

যে কচু গাছ থেকে পড়ে কেউ মরে না, আর কচু গাছে কেউ উঠতেও পারে না। মা পৃথিবীর সব লোককে বিশ্বাস করেন, সব লোকের সব কথাকেও করেন।

রুদ্র বউ সম্বোধন বন্ধ করেছে। কিন্তু চিঠি বেহাত হয়ে যাচ্ছে, বুঝি। চিঠি কেবল বাবা সরিয়ে নিচ্ছেন না, দাদাও সরাচ্ছেন। মাও। শেষ অবদি ডালিয়ার শরণাপন্ন হতে হয় আমাকে, খুলনার মেয়ে ডালিয়া, মোটা মোটা বইয়ে সারাদিন ডুবে থাকা ডালিয়া, *তোমার হোস্টেলের ঠিকানায় কি আমার চিঠি আসতে পারে ডালিয়া?* কাতরোক্তি শুনে *খুব পারে* বলে দিল। কবিতা লেখার অভ্যেস আছে তার, যেচে শতাব্দী চক্রের সদস্যও হয়েছে, তা না হলে এ কাজটি করতে এক কথায় রাজি হত কি না কে জানে, হয়ত সাত রকম প্রশ্ন করত। রুদ্র আবার মাস চার পর ময়মনসিংহে আসে, কলেজ ক্যান্টিনে বসে থাকা রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে যাই ডালিয়াকে নিয়ে। আসলে যখনই যাই, বেশির ভাগ সময়ই কাউকে না কাউকে নিয়েই যাই, হয় হালিদা, নয় মদিরা, নয় ডালিয়া। একা রুদ্রর মুখোমুখি বসে থেকে আমার কোনও কথা বলা হয় না। কেবল মুখোমুখিই বসে থাকা হয়। অনেকদিন সে বলেছে, একা আসতে পারো না? আমি যে পারি না, সে কথাও বলা হয় না তাকে। কেউ থাকলে সেই কেউএর সঙ্গে কলকল কথা বলে আমার একরকম বোঝানো হয় যে আমি যে কথা বলতে পারি না তা নয়, পারি, আমার শব্দসম্ভার নেহাত মন্দ নয়। অবশ্য শব্দ যা উচ্চারিত হয় তা বেশির ভাগই ডাক্তারিবিদ্যা সম্পর্কিত। রুদ্রকে তখন নীরব শ্রোতা হতে হয়। ফাঁক পেয়ে রুদ্র আমাকে বলে, এবার বিষয়টি জানাও তোমার বাবাকে। আমি সশব্দে হেসে উঠি, এ সত্যিই একটি হাস্যকর প্রস্তাব তার। পাঁচ বছর অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও রকম উপায় নেই। ডাক্তার হওয়ার পর যদি বাবাকে কিছু জানানো সম্ভব, জানাবো, তার আগে কোনও প্রশ্ন ওঠে না। রুদ্র মন খারাপ করে বসে থাকে। সে বারবারই আমাকে বোঝাতে চায় যে প্রথম বাবা মা একটু রাগ করবেনই, পরে ঠিক হয়ে যাবে। পরে যে কিছুতেই কিছু ঠিক হবে না, সে আমি রুদ্রকে বোঝাতে চেষ্টা করি। মাঝখান থেকে, বলি যে, আমার ডাক্তারি পড়াই জন্মের মত বন্ধ হবে। রুদ্র মুখ শুকনো করে চলে যাওয়ার পর আমি বুঝিয়ে চিঠি লিখি, পাঁচটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, ভেবো না। রুদ্র লেখে, *পাঁচটা বছর আসলেই খুব বেশিদিন নয়। দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। কিন্তু পাঁচ বছর আমার জন্য অনেক অনেক দিন, অনেক বছর। আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। তোমার সব কিছুই আমি বুঝি, তবু বলছি। সব কিছু বুঝতে পেরেও বলছি। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা কর। মানসিক পীড়ন কেন? আমার কালো অতীতের দিকে তাকালে বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, আমার এই পীড়ন কেন। তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না। তুমি জানো না, আমার কোনও বন্ধু নেই। অনেক শুভাকাংখি, অনুরাগী, স্বজনেরা আছে, তারা কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। আমার এখন তোমাকে প্রয়োজন, শুধু তোমাকে। অবলম্বনহীন হৃদয়কে আমি বেশিদিন ভাল রাখতে পারব না।* রুদ্রর কোনও কালো অতীতের কথা আমি জানি না। কালো অতীত বলতে ঠিক কি বোঝাতে চায় সে তা আমার বোঝা হয় না। আমি এর অর্থ করি, অযথা ঘুরে বেড়ানো, লেখাপড়া না করা, পরীক্ষা না দেওয়া। রুদ্রকে আমি আমার দৈনন্দিন জীবনের কথা, আমার স্বপ্নের কথা জানাতে থাকি। রুদ্র লেখে, *তোমার স্বপ্নের সাথে আমার স্বপ্ন একদম মেলে না। যেখানে তোমার স্বপ্ন খুব শুভ্র, কমনীয় ফুলের মত সেখানে আমি একেবারেই ইটপাথর। জীবনকে আমি অত্যন্ত নির্মম চোখে দেখি। এতটা নির্মমতা হয়ত ভাল নয় তবু কেন জানি এরোমই আমার হয়। এক কাজ করলে কেমন হয়, স্মৃতি বন্টনের মত শুভ্রতা আর শ্যামলিমার স্বপ্ন তোমার হোক, আমার হোক গ্লানি আর নির্মমতার স্বপ্ন। ভাল মন্দ*

মিলিয়েই তো জীবন। আমরা এইভাবে ভাগাভাগি করে নেব কেমন! আমার বোঝা হয় না মানুষ কি করে স্বপ্ন দেখতে পারে অসুন্দরের। অসুন্দরের সঙ্গে তো আমার নিত্য বসবাস, তাই স্বপ্ন দেখি সুন্দরের। রুদ্রকে যে করেই হোক পরীক্ষা দিতে বলি, এমএ পাশ হলে ভবিষ্যতে হয়ত রুদ্রর কথা কখনও কোনওদিন বাড়িতে উচ্চারণ করা যাবে, কিন্তু রুদ্র বলে *বোধহয় কোথাও একটা ভুল থেকে যাচ্ছে, একটা ফাঁকি, খুব সূক্ষ্ম যার ফাটল, না বোঝার তীক্ষ্ম আর মিহি ফাঁক থেকে যাচ্ছে। আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। এই সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে একদিন লক্ষিন্দরের বাসরে যে ভাবে কালনাগিনী ঢুকেছিল, ঠিক সেভাবেই অবিশ্বাসের সাপ ঢুকবে, ঢুকবে না পাওয়ার আক্ষেপ আর ব্যর্থ আকাঙক্ষার ক্লান্তি। আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত, আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। কৈশোর শেষ হবার সাথে সাথেই আমি খুব ধীরে ধীরে আমার জীবন যাপন, আমার বিশ্বাস পরিবর্তন করছি একটি বিশেষ লক্ষে। একাডেমিক ক্যারিয়ার বলতে যা বোঝায়, তা প্রায় সম্পূর্ণই ধ্বংস করে ফেলেছি। হ্যাঁ অনেকটা ইচ্ছে করেই। আমাদের এই সমাজ, এই জীবনের অনেক অন্ধকার, অনেক আলো, অনেক ঘৃণা অনেক অবিশ্বাস, প্রতারণা, আর অনেক বিশ্বাস আর ভালবাসা আমি দেখেছি। হয়ত সারা জীবন এইভাবে পুড়ে পুড়ে দেখব। দেখব দুরারোগ্য অসুখের জীবাণু দেহে নিয়ে কতটা তার যন্ত্রণা দেবার ক্ষমতা। আমার ঘরের উঠোনে হয়ত কোনওদিন রজনীগন্ধা ফুটবে না। হয়ত আমার টেবিলের ফুলদানির পরিবর্তে থাকবে একটা মস্ত বড় মাটির অ্যাশট্রে। হয়ত আমার প্রিয় সঞ্চয় হবে একজন নিহত মুক্তিযোদ্ধার হেলমেট। কিংবা একটা মানুষের খুলি। কোথাও নিশ্চয়ই কোনও ভুল হচ্ছে, এত ফুল, এত পাখি আর এত সুখের স্বপ্ন তো আমি দেখি না। তুমি কেন দেখ? আমি তো দুটি পরিশ্রমী আর কর্মব্যস্ত মানুষের স্বপ্ন দেখি। দিনে রাতে খুব কমই অবসর তাদের।*

বাড়িতে রুদ্রর চিঠি না আসতে থাকায় কোনও এক মাথা-পাগল কবি কোনও এক ভুল আবেগে আমাকে কোনও একদিন বউ বলে সম্বোধন করেছিল, বেটার দুঃসাহস এখন কমেছে ভেবে সকলে শান্ত হন, ঘটনা চাপা পড়ে। চাপা পড়ার আরও একটি কারণ হল, বউ বলে সত্যি সত্যি কেউ আমাকে ডাকতে পারে, সত্যি সত্যি আমি কারও বউ হতে পারি এ কল্পনা করা এ বাড়ির কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তার ওপর আমি সময়মত কলেজ থেকে ফিরছি, কোথাও কোনও *সন্দেহজনক বিলম্ব* হচ্ছে না, এনাটমি ফিজিওলজি বইয়ের ওপর মুখ গোঁজা থাকে বেশির ভাগ সময়, বাবা মা দাদার তিনজোড়া ভুরুর কুঞ্চন বন্ধ হয়। বাবা তাঁর রাগটি কলের জলে গুলে ফেলেন, কারণ সামনে পরীক্ষা আমার। পরীক্ষার নাম ফার্স্ট প্রফেশনাল, সংক্ষেপে *ফার্স্ট প্রফ।* তিনটে পরীক্ষা হয় মেডিকেলে, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষে ওঠার পরীক্ষাকে বলা হয় ফার্স্ট প্রফ, তৃতীয় থেকে চতুর্থ বর্ষে ওঠারটি সেকেন্ড প্রফ, আর চতুর্থ থেকে পঞ্চম বর্ষে উঠতে হয় থার্ড প্রফ দিয়ে। পঞ্চম বর্ষের যে পরীক্ষা, সেটি ফাইনাল। ফাইনালের পর ডাক্তার। একবছর প্রশিক্ষণ। তারপর চাকরি। প্রশিক্ষণের সময় ভাতা দেওয়া হয়, মন্দ ভাতা নয়। চাকরি করলে বেতনও মন্দ নয়, তবে বদলির চাকরি, সরকারি ইচ্ছেয় বদলি হতে হবে, এখানে নিজের ইচ্ছে বলে কিছু থাকে না। অবশ্য *মামা চাচা* থাকলে থাকে। মামা চাচা বলতে, *লোক* থাকলে, মন্ত্রণালয়ে নিজেদের আত্মীয় লোক, অথবা বিএমএতে *খাতিরের লোক।* ফার্স্ট প্রফ পরীক্ষায় আমার পাশ হবে বলে আমার মনে হয় না। এতকাল গৃহশিক্ষকেরা আমাকে পড়া গিলিয়ে দিয়ে গেছেন, মেডিকেলে কোনও গৃহশিক্ষক নেই, থাকার কোনও নিয়ম নেই, আমাকে গেলাবার কেউ নেই, নিজেকে গিলতেই হয় যা কিছু, স্বেচ্ছা গলাধঃকরণে অভ্যেস কম আমার, তাই উদ্বেগ আমাকে মাথার উকুনের মত কামড়ায়। তার ওপর বইয়ের ভাষা

ইংরেজি, কোনও দেবনাথ পন্ডিত নেই যে বলবেন *এরে ইংরেজি মিডিয়ামে না দিয়া বাংলা মিডিয়ামে দিয়া দেন, এর দ্বারা ইংরেজি পোষাবে না।* বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যার কোনও বই নেই। ইংরেজিতে লেখাপড়া ছাড়া গতি নেই কোনও।কিন্তু বাঁচা যে এ ইংরেজি সাহিত্য নয়। ইংরেজি লিখতে গিয়ে বা বলতে গিয়ে ব্যাকরণ কি বানান ভুল হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথায় কি আছে, কি কাজ তাদের, অনুপুঙ্খ জানা চাই। এতে কোনওরকম ক্ষমা নেই। এসবের বর্ণনা ইংরেজিতে লিখতে বা বলতে গিয়ে ব্যাকরণের কথা কেউ ভাবেও না। একটি জিনিস মনে উদয় হয় আমার, ফরাসি দেশ বা জার্মানি বা স্পেন বা ইতালি বা রাশিয়া, যেসব দেশের ভাষা ইংরেজি নয়, সেসব দেশে তাদের নিজেদের ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা শিখছে ছাত্রছাত্রীরা, তবে এ দেশে কেন বাংলায় বই হয় না? অন্য একটি ভাষায় কোনও বিদ্যা অর্জন করার চেয়ে নিজের মাতৃভাষায় বিদ্যা অর্জন করলে সে বিদ্যা রপ্ত হয় ভাল বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আমার বিশ্বাসের তোয়াক্কা কেউ করে না। একটি ভিনদেশি ভাষার ওপর নির্ভর করে সকলে এই বিশেষ বিদ্যাটি অর্জন করে। পড়াশোনার চাপে আমার যাবতীয় *আউটবই,* সেজুঁতির নতুন পাণ্ডুলিপি বা প্রতি সপ্তাহের না পড়া রোববার সন্ধানী বিচিত্রা কোথায় কোন তলে পড়ে থাকে, তার খোঁজ রাখার সময়ও আমার জোটে না। বই পড়ে মুখস্থ করে যখন প্রশ্নের বড় বড় উত্তর লিখছি খাতায়, দেখে বাবা বললেন *রিটেনে কেউ ফেল করে না, করে ভাইবায়। বাইরে থেকে এক্সটারনাল এক্সামিনার আইব, একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবি না তো ফেল।* আমার গভীর বিশ্বাস, পরীক্ষায় আমার পাশ হবে না। লিখতে দিলে হয়ত কায়ক্লেশে কিছু একটা কিছু দাঁড় করানো যায়, অবশ্য বানিয়ে লেখার ব্যাপারটি এখানে একদমই নেই, যদি প্রশ্ন করা হয় *প্যানক্রিয়াসের পজিশন কি?* এ সম্ভব নয় লেখা *শরতের আকাশের তুলো তুলো মেঘ থেকে একটুকরো মেঘ দুহাতের মুঠোয় নিয়ে দেখলে যেমন দেখায়, প্যানক্রিয়াস তেমন দেখতে। এটি শরীরের কোথায় যে কী করে লুকিয়ে থাকে! একে না খুঁজে পাওয়া যায়, না একে ভুলে থাকা যায়। অগ্নাশয় নিঃসঙ্গ পড়ে থাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের পাশে, প্লীহার তলে, হৃদপিণ্ড থেকেও খুব দূরে নয়, বুঝি হৃদপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ ওকেও আলোড়িত করে। এর শরীরের দুরকম কোষ থেকে জল প্রপাতের মত বয়ে যায় দুরকম নির্যাস....* ,হবে না, লিখলে জিরো, লিখতে হবে *প্যানক্রিয়াস ইজ এন ইলোংগেটেড অরগান, লোকেটেড এক্রস দ্যা ব্যাক অব দা এবডোমেন, বিহাইন্ড দা স্টমাক, দ্যা রাইট সাইড অব দ্যা অরগান লাইস ইন দ্যা কার্ভ অব ডিওডেনাম, লেফট সাইড এক্সটেন্ডস স্লাইটটি আপওয়ার্ডস বিহাইন্ড দ্যা স্পলীন, ইট ইজ মেইড আপ অফ টু টাইপস অব টিস্যুস, এক্সোক্রাইন এন্ড এন্ডোক্রাইন।* রস বলে এখানে কোনও ব্যাপার থাকতে নেই, যত বেশি কাঠখোট্টা, যত বেশি *টু দ্যা পয়েন্ট,* তত বেশি নম্বর, আর নম্বরের পরোয়া না করলে, ভাল কসাই হওয়া যাবে হয়ত, ভাল ডাক্তার নয়। অধ্যাপকদের সঙ্গে *তেরিমেরি* করলে জীবনেও পাশ হবে না, ওঁদের দেখলে, সে ক্লাসে করিডোরে, রাস্তায় বাজারে যেখানেই হোক, *আসসালামু আলায়কুম* বলতে হবে। এই *আসসালামু আলায়কুম* টি আমার একেবারেই আসে না, কদমবুসি যেমন আসে না। আরবি ভাষায় শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া আর কি উপায় নেই! বাংলায় তো জানানো সম্ভব, *কী কেমন আছেন, ভাল তো!* অথবা *নমস্কার। নমস্কার* শব্দটি বাঙালি হিন্দুদের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে, কোনও শব্দ কি হয় না যে শব্দের কোনও ধর্ম নেই? নাহ! হয় না। যাকেই জিজ্ঞেস করি, বলে, আর কোনও উপায়ই নেই। আমি অসহায় বসে থাকি। আমার ওটুকুই হয়, *স্মিত হাসি,* এটিই সম্ভাষণ, এটিই শুভেচ্ছা। এ দিয়ে পরীক্ষায় পাশ নাকি হয়

না। আরেকটি উপায় বের করি, করিডোরে অধ্যাপকরা হাঁটলে এমন ভাব করে পাশ কাটি, যেন বাইরে তাকিয়ে আছি, অথবা মাটির দিকে, অথবা অন্যমন আমার, অথবা হাতের বইটির দিকে দেখছি, যেন অধ্যাপক নামক বিরাট মানুষটিকে দেখিনি, দেখলে তো কপালে হাত ঠুকে *আসসালামু আলায়কুম স্যার* বলতামই। বাড়িতে ইয়াসমিনকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর অস্বস্তি লাগে না *আসসালামু আলায়কুম* বলতে? ইয়াসমিন নিঃসংকোচে না বলল, ওর লাগে না। আমার লাগে কেন! মাকে জিজ্ঞেস করলাম এই *আসসালামু আলায়কুমের* মানেটা কি? মা বললেন *আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।* কোত্থেকে বর্ষিত হবে? আকাশ থেকে? মা খানিক ভেবে বললেন আল্লাহ বর্ষণ করবেন। তাহলে তো আকাশ থেকেই, আল্লাহ যেহেতু আকাশেই থাকেন। মা আপত্তি করতে পারলেন না আমার আকাশ বিষয়ক ধারণার। খানিক বাদে মা বললেন, আকাশ বিষয়ে ভাবতে ভাবতে মোক্ষম উত্তরটি মার মনে পড়ল, বললেন *আল্লাহ কি শুধু আকাশেই থাকেন! আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।* আল্লাহ বিষয়ে কথা বলতে গেলে মা সাধারণত বইয়ের ভাষা ব্যবহার করেন, কঠিন কঠিন শব্দ, আল্লাহ প্রসঙ্গে না হলে মা *সর্বত্র* শব্দটি না বলে *সব জায়গায়* বলতেন, আর *বিরাজমান* না ব্যবহার করে *আছেন* বলতেন। আল্লাহ ব্যাপারটি মার কাছেও সম্ভবত *কঠিন* একটি ব্যাপার। আকাশ থেকে জল ছাড়া সুখ বা শান্তি কখনও বর্ষিত হতে আমি দেখিনি। সুতরাং আরবি বাক্যটির যে সরাসরি কোনও বাংলা অনুবাদ চালিয়ে দেব, তাতেও মন সায় দেয় না! সালাম ঠোকার অভ্যেস নেই বলে বেয়াদব, উদাসীন, অভদ্র এসব খেতাব পেয়ে গেছি ইতিমধ্যে।

রাত জেগে পড়তে হয়, *পরীক্ষা,* বাবা বলেন, *নাকের ডগায়।* কড়া রোদে দাঁড়ালেও নাকের ডগায় এক বিন্দু ঘাম জমে না আমার, এমন নির্ঝঞ্ঝাট ঝুটঝামেলাহীন নাকটিকে পরীক্ষার বোঝা এসে প্রায় থেতলে দিচ্ছে। পরীক্ষা কাছে এলে বাবা তাঁর আগের রূপটি ধারণ করেন, উপদেশের ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন বলতে বলতে যে *মেডিকেলের পড়া দিন রাইত চব্বিশ ঘন্টা না পড়লে হয় না। রাত জাইগা পড়, চোখে ঘুম আসলে, চোখে সরিষার তেল ঢালো।* যত পরীক্ষা এগোয়, তত আমার ঘুম বাড়ে, ভয়ের সঙ্গে ঘুমও বাড়ে। বাবা সাত সকালে উঠে ঘরের পাখা বন্ধ করে বাতি জ্বেলে দেন, গরমে আর আলোয় ঘুম ভেঙে যায়। তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে বিছানা ছাড়তে হয়। এক রাতে চোখে ঢালার জন্য এক শিশি সর্ষের তেল কিনে এনে আমার টেবিলে রেখে গেলেন বাবা। *কী করতে হবে তেল?*

যখনই ঘুম পাইব, চোখে ঢালবা, ঘুম বাপ বাপ কইরা পলাইব!

বাবার আড়ালে আমি সর্ষের তেল দিয়ে মুড়ি মেখে খেতে লাগলাম দিব্যি, আর রাত দশটার আগেই ঘুমের রাজ্যে ঢুকে ঘুমপরীদের সঙ্গে বিস্তর গল্প করে বেড়াচ্ছি। বাবা ফিরে এসে চিৎকার করে বাড়ি জাগান, *আরে পরীক্ষার আর তিনদিনও বাকি নাই আর তিনি কি না নাকে তেল দিয়া ঘুমাচ্ছেন!* বাবার সম্ভবত ধারণা, চোখে দেওয়ার বদলে বাবার আনা তেল আমি ভুল করে নাকে ঢেলেছি। চোখে আমার ঠিকই সর্ষের তেল ঢেলে রাত জাগতে হয়েছে, ঠিকই এনাটমি আর ফিজিওলজির আগা থেকে মাথা জানতে হয়েছে পড়ে পড়ে। রাত জাগলে বাবা পাশে এসে বসেন আমার। বাবা বসেন, সঙ্গ দেন। যেন আমি ভূতের ভয়ে চোরের ভয়ে নিঃসঙ্গতার ভয়ে আবার মশারির তলে না ঢুকি। মা ফ্লাস্ক ভরে চা দিয়ে যান টেবিলে, আর আমার থেতলে যাওয়া নাকের সামনে তখন আমি কারুকে দেখি না, অধ্যাপকদের রক্তচোখ ছাড়া।

লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেল, এবার মৌখিক। বাবা বললেন *তোমার হারুন স্যাররে একবার বাসায় দাওয়াত করতে হবে।* বাবার উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট, খাতির। খাতিরে যদি মৌখিক পাশ হয়। হারুন আহমেদ সপরিবার আমাদের বাড়ি এলেন, মা সারাদিন রান্না করলেন, শিক্ষিত লোক বাড়িতে এলে মার সামনে যাবার রীতি নেই, রান্নাঘর থেকে তিনি বাসন পত্রে খাবার সাজিয়ে দিলেন, আমি দাদা আর ইয়াসমিন সেগুলো নিয়ে বৈঠক ঘরে খাবার টেবিলে রাখলাম। হারুন আহমেদ খেলেন গল্প করলেন, গল্প পুরোটাই কবিতা নিয়ে। তিনি কবিতা লেখেন, আমি যদি তাঁর কবিতা কোথাও ছেপে দিতে পারি ভাল হয়। তিনি নিয়েও এসেছেন সঙ্গে দিস্তা দিস্তা কবিতা, একবার চোখ বুলিয়ে আমি অনুমান করি কবিতাগুলো *মম জীবনে তব আগমন* ঘটার পর অবশেষে *কোনও আঁধারে করিবে প্রস্থান।* হারুন আহমেদ বাবার ছাত্র ছিলেন। বাবার ছাত্ররা অনেকে অধ্যাপক হয়ে গেছেন। বাবা এখনও পুরো অধ্যাপক হননি, সহযোগীতেই পড়ে আছেন, *কিভাবে হব, তোমাদের জন্য পয়সা কামাই করতে করতে তো বড় কোনও পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই, তা না হইলে ছাত্র তো খারাপ ছিলাম না।* তা ঠিক বাবা ছাত্র ভাল ছিলেন, মেডিকেলে পড়তে এসে এমন হয়েছে যে তাঁর বই কেনার পয়সা নেই, এক ছাত্রের সঙ্গে বাবা তখন এক চুক্তিতে এলেন, রাত দশটার পর, ছেলেটি যখন ঘুমিয়ে যাবে, বই ধার নেবেন তিনি, তাই করতেন, ধার করা বই সারারাত পড়ে, সকালে সেই বই ফেরত দিতেন ছেলেকে, রাত জাগা বাবা সকালে ক্লাস করতে যেতেন।ওভাবে পড়ে, রাত জেগে, ধার করা বইয়ে, বাবা সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন মেডিকেলে। যেমন পেতেন চণ্ডিপাশা হাইইশকুলে।

বাবার মত মেধা আমার নেই। মৌখিক পরীক্ষায় হারুন আহমেদ আমাকে ইচ্ছে করলেই কঠিন প্রশ্ন করতে পারেন, খাতিরে করেননি। অন্য কলেজ থেকে যে পরীক্ষকরা এসেছিলেন, তাঁরা কঠিন প্রশ্নের দিকে গেলে হারুন আহমেদ কায়দা করে উত্তর ঠিক কোনদিকে যাবে বা যেতে পারে এরকম একটি ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেছেন। টেবিলে রাখা হাড়গুলো অন্য পরীক্ষক ছুঁতে যাওয়ার আগেই হারুন আহমেদ আমার দিকে ঠেলে দিয়েছেন ফিমার নামের সহজ হাড়টি। এটি হাতে নিয়ে কোন অংশের কি নাম, কোন জায়গায় কোন পেশি এসে লেগেছে, কোন পেশিতে কোন নালি রক্ত সরবরাহ করছে, স্নায়ুই বা কোত্থেকে এসে কি করে কোথায় যাচ্ছে, এসব রকমারি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ফিজিওলজি পরীক্ষাতেও খাতির জোটে, এই কলেজেরই সহযোগী অধ্যাপকের কন্যাটিকে জটিলতার মধ্যে নিয়ে নাস্তানাবুদ না করাটিই খাতির। প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রায় সকলেই জানে, এখানে ভাগ্যই বড় কথা, কারও ভাগ্যে জটিল প্রশ্ন, কারও ভাগ্যে পড়ে অজটিল। জটিলতা অজটিলতা অনেকটা নির্ভর করে পরীক্ষকদের মন মেজাজের ওপর। পরীক্ষকরা যখন দুপুরের খাওয়ার পর চা খেতে খেতে চেয়ারে হেলান দিয়ে প্রশ্ন করেন, সহজ প্রশ্ন করেন। যাই হোক, খানিকটা বিদ্যায়, খানিকটা খাতিরে আমি ফার্স্ট প্রফ পাশ করি।

ছোটদা ময়মনসিংহে ছুটিছাটায় চলে আসেন বউ নিয়ে। ঈদ আর পুজোর ছুটিতেই আসেন বেশি। বারো মাসে তেরো পুজো লেগে আছে, সব পুজোয় ছুটি না পেলে ছুটি নিয়ে তবে আসেন। গীতা ঈদের উৎসবে আছে, পুজোর উৎসবেও। এ বাড়িতে ঈদ পুজোর উৎসবের চেয়ে বড় উৎসব ছোটদার অবকাশ-আগমন উৎসব। বাড়িতে সত্যিকার উৎসব শুরু হয় ছোটদা এলে। মা ছুটে যান রান্নাঘরে, ছেলের জন্য পোলাও কোর্মা রাঁধতে, রেঁধে বেড়ে ছেলে আর ছেলের বউকে সামনে বসিয়ে খাওয়ান। পেট পুরে খাচ্ছে কি না তার ওপর কড়া নজর মার। ছোটদার পাতে বড় মাংস তুলে দেন, গীতার পাতেও।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ছোটদাকে বলেন, *ঠিক মত খাওয়া দাওয়া কর তো বাবা! কত কষ্ট না জানি হইতাছে চাকরি করতে!*

আরে না মা কি যে কন, আরামের চাকরি। ভাল বেতন পাই। এইতো ডমেস্টিক ফ্লাইট শেষ হইল, এখন ইন্টারন্যাশনাল শুরু করছি।

মা ডমেস্টিক ইন্টারন্যাশনালের প্যাঁচ বোঝেন না। মাটির পৃথিবী ছেড়ে অতদূর আকাশের ওপর কারও কি কষ্ট না হয়ে পারে, বিরুই চালের ভাত খেতে ইচ্ছে করল পাবে না, টাটকা শাক সবজি, তাও না। না পারবে ভাল করে শুতে, না হাঁটতে, পায়ের তলায় মাটিই যদি না থাকে, তবে সে হাঁটা আর কেমন হাঁটা!

আরব দেশে গেছিলাম মা। মক্কায় গিয়া কাবা শরিফ দেইখা আইছি।

আরব দেশে যাওয়া এত যে সহজ মা ধারণা করতে পারেন না।

উফ এত গরম। অবশ্য গাড়িতে এসি থাকলে অসুবিধা নাই।

ছোটদা আরব দেশ নিয়ে আর যা যা বলেন, মা স্থবির বসে থেকে শোনেন। মার কল্পনার আরবের সঙ্গে ছোটদার বর্ণিত আরব যে একেবারেই মেলে না, মার ম্রিয়মান মুখটি দেখলেই স্পষ্ট হয়। ছোটদা আরোগ্য বিতানে বাবার সঙ্গে দেখা করে শহরে ঘুরতে বেরোন, হাতে গোনা দু একজন পুরোনো বন্ধুকে খোঁজেন। বিকেলে গীতাকে নিয়ে বেরিয়ে যান, অনুমান করি এখন পিয়নপাড়ায় গীতার বাপের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। বাড়িতে এখন সবাই জানে যে গীতা পুজোতে পিয়ন পাড়ায় তার বাপের বাড়ি যায়, কেউ কোনও প্রতিবাদ করে না। না করলেও কখনও সে ফলাও করে জানায় না যে সে বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

ছোটদার দুনিয়া দেখা হতে থাকে, আর ছোটদাকে ঘিরে দুনিয়ার গল্প শোনাও হতে থাকে আমাদের।

আমস্টারডাম শহর থেইকা সমুদ্র অনেক উপরে।

কও কি? শহরটা তাইলে পানির নিচে ডুইবা যায় না?

বাঁধ দেওয়া আছে। ডুবে না।

আর লন্ডন?

লন্ডন ত বিশাল বড়।

ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখছ?

হ, দেখছি।

পিকাডেলি সার্কাসএ গেছিলা?

হ।

প্যারিস গেছ?

হ।

আইফেল টাওয়ার দেখছ?

দেখছি।

ছোটদাকে আইফেল টাওয়ারের মত উঁচু মনে হয়। এত কাছ ঘেঁষে বসে আছি, অথচ ছোটদাকে অনেক দূরের মনে হয়, হাত বাড়ালে যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। সকাল বিকাল *দিবি রে, দিবি রে দুইডা টাকা দিবি?* বলে হাত পাতার করুণ মুখের ছোটদাকে বেশি আপন মনে হত, এখন ছোটদার ব্যস্ততা বিষম, এখন টাকা পয়সাও অনেক। বাড়ি এসেই বলেন, *আজকে নয়ত কালকেই চইলা যাইতে হবে, ফ্লাইট আছে।* ছোটদার সঙ্গে অলস দুপুরে এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে, মাথার কাছে পা, পায়ের কাছে মাথা, রাজনীতি,

সাহিত্য.. গোল্লায় গেছে।--*ছোটদা, ময়মনসিংহে আসলা, তোমার নাটকের দলটার সাথে দেখা করছ?*

আরে না, সময় কই?

নজরুল, রুহুল, মিলু, শফিক এদের সাথে দেখা করছ?

সময় কই!

বাংলার দর্পণে গেছিলা? মঞ্জু ভাইদের সাথে দেখা করব না।

সময় থাকলে তো যাইতেই পারতাম।

প্রথম প্রথম যখন ময়মনসিংহে আসতেন, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা তাঁর ফুরোতো না, আগের মত আড্ডায় বসে যেতেন। এখন *সময় নেই সময় নেই।* কোনও কারণে তিনি যদি গোলপুকুর পাড়ের দিকে যান, আড্ডার পুরোনো বন্ধুরা ছোটদাকে দেখেই হৈ চৈ করে ডাকেন। ওরা আছে ওদের মতই, ওরা এখনও আড্ডা দেয়, কেবল ছোটদাই নেই।ছোটদার মুখে এখন বিদেশি সিগারেট, একসময় তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে দিশি স্টার সিগারেট চেয়ে খেতেন।

কি রে কামাল, এই সিগারেটের নাম কি রে?

কার্টিয়ে।

বাহ বাহ কামাল এখন ফিল্টার অলা সিগারেট খায়! দে না খাইয়া দেখি তর বিদেশি সিগারেট।

ছোটদাকে পুরো গোলপুকুর পাড় চোখ গোল করে দেখে। ছোটদা প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে দেন বন্ধুদের। বাড়ি ফেরার পর অবশ্য মুখ ধুয়ে সিগারেটের গন্ধ আগে দূর করে নেন ছোটদা। বাবা মার সামনে তিনি সিগারেট খান না, সিগারেট যে খান তার প্রমাণও রাখেন না। ছোটদার পায়ে বিদেশি জুতো, গায়ে নতুন শার্ট প্যান্ট, তাঁর নিজের। *টুডাইল্যা* বন্ধুদের কাছ থেকে ছোটদার দূরত্ব বাড়তে থাকে, কেবল তিনি আরও কাছে আসতে থাকেন গীতার। সুন্দরী মেয়ে গীতা, কালো মেয়ে গীতা, ফর্সা হতে থাকা গীতা, যার টিকলো নাক টিকলোই আছে, যার পাতলা ঠোঁট পাতলাই, এখন চায়ে যে চিনি নেয় না, মাংস থেকে আলগোছে চর্বি সরিয়ে রাখে।

ছোট ঈদে ছোটদা আমাদের জন্য নানারকম উপহার আনেন। দুবাই থেকে একটি লিপস্টিক, একটি শ্যাম্পু। দুটো সাবান। কলকাতা থেকে আমার আর ইয়াসমিনের জন্য থ্রিপিস, রং মিলিয়ে তো বটেই ছিট মিলিয়ে জামা পাজামা ওড়না। মার জন্য জায়নামাজ, তসবিহ। বাবা ছুঁয়েও দেখেন না তাঁর জন্য আনা কিছু। বাবার জন্য একজোড়া চকচকে জুতো এনে বললেন,*মেইড ইন ইতালি।* ইতালির জুতো হলে কি হবে,বাবা স্পষ্ট বলে দিলেন, তাঁর জুতোর দরকার নেই। জুতোর দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে দাদা বললেন, *একেবারে আমার পায়ের মাপের জুতা।* জুতোজোড়া দাদার জুটল। মার জন্য একখানা টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ি গীতাই তুলে দেয় হাতে,*মা ধরেন আপনের লাইগা ঈদের শাড়ি আনলাম।* আমাদের উপহারও আমাদের হাতে দেয় গীতা, যেন সে নিজের কামানো টাকা দিয়ে আমাদের জন্য কিনে এনেছে এসব। আসলে ছোটদাই গীতাকে দিতে বলেন সবার হাতে, *গীতা তুমি কি কি আনছ কার লাইগা, দিয়া দেও।* ছোটদা বললেই যে গীতা বাক্স খুলবে তা নয়, তার যখন ইচ্ছে হবে,তখন খুলবে। ইচ্ছে না হলে বন্ধ বাক্সই ফেরত নেবে ঢাকায়।

গীতার পরনে চমৎকার চমৎকার শাড়ি, গা ভর্তি *চাক্কা সোনার গয়না,* সব গয়না,

ছোটদা বলেন, সৌদি আরব থেকে কেনা। গীতার জৌলুস বাড়ছে, ছোটদারও। সন্ধে হলেই পুরোনো পুরোনো বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছেন বলে গীতাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোন তিনি। ইয়াসমিন বলে, *আসলে পিয়নপাড়ায় যায়, তার আত্মীয়ের লাইগা নানান জিনিসপাতি নিয়া যাইতাছে।*

মা বলেন, *আমার ছেলে সুখে থাকলেই হইল।*

খানিক থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন *মায়ের সুখ বইলা একটা কথা আছে না, কামাল যদি নিজের হাতে শাড়িডা আমারে দিত, ভাল লাগত। কামালই কিনে, কিন্তু বউএর হাত দিয়া দেওয়ায়।*

ছোটদাকে সুখী সুখী লাগে দেখতে। দেখে আমাদেরও সুখ হয়। আমি আমার বিছানা ছেড়ে দিই ছোটদা আর গীতাকে। অনেক রাত অবদি সেই বিছানায় আমাদের তাস খেলার হৈ হৈ চলে। স্পেডট্রাম খেলায় আমি আর ইয়াসমিন এক দল, ছোটদা আর গীতা আরেক দল। মা মধ্যরাতে আমাদের খেলার ভেতর ঢুকে বলেন, *বাবা কামাল, তুমি তো রাত্রে ভাল কইরা খাও নাই, এখন একটু ভাত মাংস আনি, খাইয়া লও।*

পাগল হইছেন। পারলে চা দেন।

মা দৌড়ে রান্নাঘরে ঢোকেন, ওই অত রাতে চা বানাতে।

আমি গলা তুলে বলি, *মা আমার জন্যও এক কাপ।*

ইয়াসমিন বলে *আমার জন্যও।*

আমরা আদা চা খেতে খেতে তাসের আনন্দে ডুবে থাকি। মা ছেঁড়া মশারির তলে, গায়ে বসা মশা দুহাতে তাড়াতে তাড়াতে ভাবেন, *কাল সকালে উঠেই পরোটা মাংস করতে হবে সকালের নাস্তা, কামালটা পরোটা মাংস খাইতে খুব ভালবাসে।*

যেহেতু সবে পরীক্ষা শেষ হয়েছে, ছোটদার সঙ্গে *ঢাকা যাব, ঢাকা যাব* বায়না ধরে ঢাকায় আসি বেড়াতে। এখন আর মুহম্মদপুরের বাড়িতে থাকেন না তিনি। সেগুন বাগিচায় রাহাত খানের বাড়ির ওপরতলায় একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। গীতার মুখে আগে যেমন চৌধুরি বাড়ির গল্প শোনা যেত, এখন তেমন আর শোনা যায় না। এখন রাহাত খান আর নীনা মামির গল্প। ছেলেমেয়ে অপু তপু কান্তা শুভ্রর গল্প। মুহম্মদপুরের বাড়িতে যখন ছিলেন তখন নাচের লোক গানের লোক সবার সঙ্গে ওঠাবসার ব্যস্ততা ছিল তার, ওদের কথাও ইদানিং আর বলেন না। ফকরুল মামার সঙ্গে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন ছোটদা,দুজনে অর্ধেক অর্ধেক ভাড়া দিতেন। তিনি ওড়াওড়ি করলে গীতাকে বাড়িতে একা থাকতে হবে না, ফকরুল মামা রইলেন, একজন পুরুষমানুষ রইল আর কী! মাস তিন পর গীতা জানিয়ে দিল, সে একাই থাকতে পারে, একাই একশ সে। ফকরুল মামাকে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হল। গীতা আরও জানাল, সে নিজেও চাকরি করবে। তারও চাকরি হল। তেমন বড় চাকরি নয়, বিমান অফিসের রিসেপশনিস্ট। ওই কাজেই সে প্রতিদিন সেজেগুজে যেতে থাকে। এখনও করছে সেই একই চাকরি। গীতা আমাকে বিমান আপিসে নিয়ে যায়, ঘন্টার পর ঘন্টা খামোকা বসিয়ে রাখে। তার এই ভাই সেই ভাইএর সঙ্গে তার *ননদকে* পরিচয় করিয়ে দেয়। খামোকা বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না, রুদ্রর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করি। ময়মনসিংহ থেকেই তাকে চিঠি লিখে দিয়েছি সকাল এগারোটায় যেন সে থাকে রোকেয়া হলের সামনে। আমাকে নিয়ে গীতা এখানে যাবে, ওখানে যাবে এরকম পরিকল্পনা করতে নিলেই আমি ক্ষমা চেয়ে ঝুনু খালার সঙ্গে জরুরি দেখা করতে যাচ্ছি বলে একটি রিক্সা নিই।

কহন আইবি?

এইত কিছুক্ষণ পরেই।

বলি কারণ রুদ্রর সঙ্গে দেখা না হলে তো আমাকে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরতেই হবে। দেখা হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাগ্য। ঢাকায় সে আদৌ আছে কি না, নাকি হুট করে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে কে জানে।

কিছুক্ষণ কতক্ষণ?

আধ ঘন্টা। বড়জোর এক ঘন্টা।

অফিসে আইয়া পড়িস। আমি আজকে তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়া নিব।

সময়ের দেড়ঘন্টা দেরি করে গিয়েও দেখি রুদ্র অপেক্ষা করছে। আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালো রুদ্র। হুডতোলা রিক্সায় রুদ্রর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে আমার এত ভাল লাগে! চাই সময় যেন না ফুরোয়। কিন্তু ফুরিয়ে যায় সময়। রুদ্র আমাকে তার দুটো বান্ধবীর বাড়ি বেড়াতে নিয়ে চা বিস্কুট খেতে খেতে গল্প করে এসেছে। এক ঘন্টার জায়গায় চারঘন্টা হয়ে যায়। গীতার অফিস ছুটি হয়ে গেছে, বাড়ি ফিরতে হয় আমাকে। আমাকে গীতার সামনে দাঁড়াতে হয় না, কারণ সে ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকে। আমি রাতে একা শুয়ে থাকি, আমাকে কেউ খেতেও ডাকে না, আমার সঙ্গে কেউ গল্প করতেও আসে না। গীতার বন্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে দুবার ডেকেছি, দরজা খোলেনি। পরদিনও আমাকে রুদ্রর সঙ্গে দেখা করতে বেরোতে হয়। গীতাকে আমার বেরোবার কথা জানাতে গেলে পরদিনও শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করে, *কই যাবি?* ঝুনু খালা আজও যেতে বলেছেন, বলি। মিথ্যে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না, কিন্তু তার অভিভাবকীয় আচরণে আমার গলা শুকিয়ে আসে, বলতে বাধ্য হই। পরদিনও জিজ্ঞেস করে, *কালকে তো দেখা করলি, আজকে আবার কী!*

আজকে ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার বিল্ডিং এ আমার রেজাল্ট পাওয়া যাবে। যাইতে হবে।

আমি ত তরে নিয়া যাইতে পারি ওইখানে।

ঝুনুখালার পরিচিত মানুষ আছে, সে অফিস থেইকা রেজাল্ট দেখার ব্যবস্থা করতে পারবে।

মানুষ কি আমার নাই?

এত কইরা বইলা দিছে। আমার যাইতেই হইব। আমার জন্য ত অপেক্ষা করতাছে।

পরদিনও গীতা জিজ্ঞেস করে--*কহন আইবি।* পরদিনও আমি বলি, *দেরি হবে না, আজকে তাড়াতাড়ি চইলা আসব।* গীতা আজ ছুটি নিয়েছে অফিস থেকে, আমাকে নিয়ে সে বেড়াবে। সুতরাং যেতে চাচ্ছি, ঠিক আছে, কিন্তু দুপুরের আগেই যেন ফিরি। রুদ্র আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে-লাইব্রেরির বারান্দায়,আমি পৌঁছতেই আমাকে রিক্সায় তুলে বাসাবোয় তার ঘরে নিয়ে যায়। শাদামাটা ঘরটিতে একটি বিছানা পাতা। বসে আপন মনে ঘরটির জিনিসপত্র আর বইখাতা দেখি। রুদ্র পাশে বসে আমাকে নিবিড় করে ধরে চুমু খায় ঠোঁটে। ঠোঁট থেকে চুমু বুকের দিকে নামে, তার শরীরের ভার দিয়ে আমাকে শুইয়ে দেয় বিছানায়,বুক থেকে আরও নিচের দিকে নামতে থাকে তার ঠোঁট, তার শরীরের তলে পড়ে হাঁসফাঁস করি, যেই না আমার পাজামার ফিতেয় তার হাত পড়ে, ছিটকে সরে যাই। তাকে ঠেলে সরিয়ে আমি লাফিয়ে নামি বিছানা থেকে। ভয় আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে ফেলে। বলি, *এখন যাবো।* ঠোঁট জোড়া ভারি ঠেকছিল, আয়নায় নিজের চেহারা চিনতে পারি না, ফুলে ঢোল হয়ে আছে ঠোঁট। রুদ্র উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে, কোনও কথা বলেনা। অনেকক্ষণ ওভাবেই শুয়ে থাকে, জিজ্ঞেস করি, ঠোঁটের ফোলা

আড়াল করে, কি হয়েছে, ওভাবে তার শুয়ে থাকার কারণ কি? বার বার বলি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমার যেতে হবে। ওভাবেই অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে রুদ্র গোসলখানায় চলে যায়। ওখানে মেলা সময় ব্যয় করে ফিরে বলে, *শুয়ে ছিলাম কারণ তলপেটে ব্যথা হচ্ছিল।*

ব্যথা? কেন?

রুদ্র কোনও উত্তর দেয়নি। দরদ ফোটে আমার গলায়, *নিয়মিত খাওয়া দাওয়া না করলে এসিডিটি হয়। নিয়মিত খাওয়া উচিত। বেশি ঝাল খাওয়া উচিত না। স্টমাক যদি এম্পটি থাকে, তবে যে এসিড সিক্রেশান হয়, তা কোনও ফুড না পেয়ে স্টমাককেই খেতে থাকে। এ কারণে এক সময় আলসার হয়ে যায় পেটে। পেপটিক আলসার বলে একে। এন্টাসিড খেলে ঠিক হয়ে যাবে।*

রাখো তোমার ডাক্তারি বিদ্যা, চল।

রুদ্র আমাকে নিয়ে বেরোয়। তার কোনও এক বন্ধুর বাড়ি যাবে।

অসম্ভব, আমাকে এখন সেগুন বাগিচা যেতে হবে।

এক্ষুনি যাওয়ার কি হল?

যেতে হবে। বৌদি কাল রাগ করেছে দেরিতে ফিরেছি বলে। আজ আমাকে নিয়ে সে বাইরে যাবে।

রুষ্ট রুদ্র বিকেলের দিকে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যায় সেগুন বাগিচায়। বাড়ি ফেরার পর গীতার সঙ্গে কথা বলতে গেলে দেখি সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বৈঠকঘরে বসে থাকি একা। আমার সঙ্গে কোনও কথা বলে না গীতা। সন্ধেয় বাড়ি ফিরে ছোটদা ভিসিআরএ একটি হিন্দি ছবি চালিয়ে গীতা গীতা বলে ডেকে যান, গীতা আসে না। ছোটদা শেষ অবদি ছবি দেখা বন্ধ করে গীতার মাথার কাছে বসে গীতার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে *ও গীতা ও গীতা গীতা গীতা* জপ করে যান। আমার সঙ্গে গীতার এমন আচরণ আমি আগে দেখিনি কখনও। ছোটদা গীতাকে খেতে ডাকেন খাবার টেবিলে, গীতা আসে না। গীতা আসেনি বলে ছোটদাও না খেয়ে থাকেন। এ বাড়িতে আমার উপস্থিতিই আমার মনে হতে থাকে, অশোভন। অপমান আমাকে মিশিয়ে ফেলে মেঝের ধুলোয়। না পারি রুদ্রকে ফেরাতে, না পারি প্রিয় স্বজনদের। দুটোতে প্রচণ্ড বিরোধ, আমি কোনদিকে যাই। পরদিন ভোরবেলা ছোটদাকে বলি *আমি চলে যাবো ময়মনসিংহে।* ছোটদা বলেন *আরও কয়টা দিন থাক।* আমি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বলি, *আমার ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে।* ছোটদা মুখ শুকনো করে আমাকে ট্রেনে পৌঁছে দিয়ে আসেন ময়মনসিংহ। একাই যেতে পারব বলেছিলাম, তিনি তবু নিজে এসেছেন। সারাটা পথ জানালায় মুখ রেখে রুদ্রকে ভেবেছি। রুদ্র নিশ্চয়ই তার বাসাবোর ঘরে অপেক্ষা করছে আমার জন্য, অপেক্ষা করতে করতে যখন দেখবে যে আমি আসছি না, তখন নিশ্চয়ই কষ্ট হবে খুব ওর। রুদ্রর কষ্টের কথা ভেবে আমার এত কষ্ট হতে থাকে যে চোখ ভিজতে থাকে, বারে বারেই ভিজতে থাকে। বাড়ি ফিরে রুদ্রকে লিখি আমার চলে আসতে বাধ্য হওয়ার কথা। লিখি চলে আসা ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।

রুদ্র লেখে, *তোমার কিছুই করার ছিল না--এটাই তোমার দোষ। কেন তোমার কিছু করার থাকে না? কেন তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য থাকে না? কেন তুমি বার বার ভুলে যাও যে তুমি একজনের খুব কাছের মানুষ? কেন ভুলে যাও যে আর একটি জীবনের সাথে তোমার জীবন জড়ানো রয়েছে। তুমি কেন ভুলে যাও যে তুমি একজনের স্ত্রী? কামাল থাকতে অনুরোধ করেছিল। বাড়ি থেকেও আরও বহুদিন থাকার অনুমতি ছিল,*

এর পরেও কী করে বিশ্বাস করি যে বাধ্য হয়েই তোমাকে যেতে হয়েছে? কী করে আমাকে বিশ্বাস করতে বলো তোমার কোনও দোষ নেই? তুমি কি এখনো শিশু রয়েছো যে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও মূল্য থাকবে না? আজ এই সামান্য থাকার ব্যাপারে তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তুমি প্রতিষ্ঠা করতে পারো না! অনিচ্ছার তোয়াককা না করে তোমাকে যদি আবার বিয়ে দিতে চায়, তখনও কি তুমি লিখবে আমার কোনও দোষ নেই! আশ্চর্য! কেন তোমার ইচ্ছা তুমি প্রকাশ করতে পারো না? প্রতিষ্ঠা করতে পারো না? আমার রাগ করা বা না করায় তোমার তেমন কিছু আসে যায় না। সেদিন সারাটা দুপুর ধরে তুমি তা প্রকাশ করেছো। এতোখানি কাছে আসার পরও তুমি এখনো বোকার মত দুজনের সম্পর্কের মধ্যে হার জিতের কথা ভাবো। কবে তোমার ম্যাচিউরিটি আসবে? স্বামীর অধিকার আমি কখনো জোর করে আদায় করতে চাইনি, এখনো চাই না। আর চাই না বোলেই আমি সব সময় তোমাকে সুযোগ দিয়েছি নিজে থেকে তোমার দায়িত্বটুকু বুঝে নেবার জন্যে। কতো ভাবে বুঝিয়েছি। কিন্তু তুমি ভাবো স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা মানে পরাজিত হওয়া। আর দশটা দম্পতির দিকে তাকিয়ে দেখ তো? আমি তো কখনো তোমাকে সেরকম ভাবে চাইনি। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ হিসেবে চেয়েছি। সামাজিক শৃঙ্খল আর পুরুষের দাসত্বের উর্ধে তোমাকে রাখতে চেয়েছি। কিন্তু তাই বলে তুমি তোমার দায়িত্ব নেবে না কেন? বিয়ের পর আট মাস কেটে গেল এখনো তোমার সঙ্কোচ কাটে না। এখনো তুমি যুক্তিহীন জেদ করে নষ্ট করো স্বাভাবিক জীবন। বিয়ের দিনটির কথা সারা জীবনেও আমার পক্ষে ভোলা সম্ভব হবে না।

জীবনের সহজাত কিছু নিয়ম আছে, কিছু শৃঙ্খলা আছে। তাকে কখনোই অস্বীকার করা চলে না। তোমার সমস্যা আমি বুঝি। খুব পষ্ট করে বুঝি। তোমাকে এতখানি বোধহয় কেউই বোঝে না। আর বুঝি বলেই আমি প্রথম থেকেই খুব যুক্তিসংগত ভাবে তোমাকে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। যেটা আমি ভাল জানি বা বুঝেছি, চেষ্টা করেছি তোমাকেও তা বোঝাতে। না হলে ২৬/১ এর পর আমাদের সম্পর্ক শেষ হতে বাধ্য ছিল। তোমার সেন্টিমেন্টগুলো আমি বুঝি বলেই তার অমর্যাদা করি না। কিন্তু সেই সেন্টিমেন্ট যদি আমাকে অমর্যাদা করে? যাতে না করে সে দায়িত্বটি তোমার। কখনো ভাবিনি এসব নিয়েও লিখতে হবে। সব সময় চেয়েছি তুমি বুঝে নেবে। আর বুঝতে শিখলে যুক্তিহীন ভাবে কিছু আর করবে না।

যদি তুমি শুধু আমার ভালোবাসার মানুষ হতে, যদি বউ না হতে, তবে হয়তো তোমার এই চলে যাওয়াটা আমার এতখানি লাগত না। তখন শুধু বুকে বাজত, কিন্তু এখন আত্মসম্মানেও বাজে।

নিজের সাথে এমন প্রতারণা করো কেন? নিজের ইচ্ছার সাথে কেউ প্রতারণা করে?

রুদ্রর চিঠি পড়ে আমার এত মন খারাপ হয়ে যায়। এত মন খারাপ যে লিখি *আমাকে যদি তোমার এতই অপছন্দ, আমার যুক্তিহীন কার্যকলাপ যদি তোমার আত্মসম্মানে এতই বাধে, তবে আর দ্বিধা করছ কেন? পছন্দসই মেয়ের অভাব তো নেই! তারা নিশ্চয়ই আমার মত বাজে ধরণের সেন্টিমেন্ট নিয়ে চলে না, যুক্তিহীন জেদ করে নষ্ট করেনা স্বাভাবিক জীবন, জীবনের সহজাত নিয়মকে, শৃঙ্খলাকে কখনই অস্বীকার করে না, তারা নিশ্চয়ই বোকার মত হারজিতের কথা ভাবে না, স্ত্রীর দায়িত্ব তারা সুন্দর নিয়ে নেবে, বিয়ের আট মাস হবার বহু আগেই তাদের সঙ্কোচ কাটবে। তাদের কাউকে পছন্দ করে ফেলো। তোমার সুখের ব্যাপারে আমার আপত্তি থাকবে না। ছোটবেলা থেকে আমি খুব বেশি একটা সুখে মানুষ হইনি--যে কোনও দুঃখকে আমি সহজে গ্রহণ করতে শিখেছি।*

তোমার সুখের জন্য তোমার নতুন জীবন বেছে নেবার ঘটনা শুনলে আমি অবাক হব না। আমি তোমার সুখের পথে কোনওদিন বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না। এই অসহ্য জীবন থেকে তুমি যদি মুক্তি পেতে চাও, নিয়ে নাও। আমার বলার কিছু নেই। আমি তোমাকে কোনওদিন দোষ দেব না। আমার অক্ষমতাটুকু আমার থাকবে। আমার একাকীত্ব আমার থাকবে। জীবন আর ক দিনের! দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে যাবে, দুম করে একদিন মরে যাবো। এতদিনে আমি বুঝে গেছি কোনও পুরুষকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। দাম্পত্যজীবনকে সুখী করার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই। আমি একটা আপাদমস্তক অহেতুক মানুষ। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কোনওদিন ভাবিনি এরকম চিঠি তোমাকে লিখব। কিন্তু মূর্খের মত জীবনে আমি সুখের প্রত্যাশা করেছিলাম, যতসব আজগুবি স্বপ্ন দেখেছিলাম, বাস্তবতা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, জীবনের সীমানা এত বিশাল নয়, বরং শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে কিছু একটা পেতে হলে হারাতে হয় লক্ষগুণ। অথচ নির্বোধ আমি হারাতে না চেয়েই পেতে চেয়েছিলাম। তাইতো হেরে গেলাম নিজেই। তাইতো বিয়ের পর বছর না পেরোতেই আমাকে লিখতে হয় এমন কষ্টের চিঠি। আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। তোমার উদারতার কথা কোনওদিন ভুলব না।

আমার চিঠি পেয়ে রুদ্র লেখে, *তোমার সমস্ত অক্ষমতা নিয়েই তুমি সারাজীবন আমার সাথে থাকবে। প্রায় তিন বছর ধরে আমি তিল তিল করে আমার জীবনে যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছি তাকে তুমি নষ্ট করতে পারো না। আমার শৃঙ্খলা আর স্থিরতা এখন তোমাতে। যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট করেছো--এই সব পাগলামি আর চলবে না। আমি তোমার সুখের পথে কোনওদিন বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না, এই কথাটি আরও সহস্রবার নিজেকে শোনাও। যখনি তুমি আমাকে এই কথাটি বলো, ঠিক তখনই তুমি আমার জীবনে সুখের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াও। দ্বিতীয়বার এই কথাটি আমাকে তুমি শোনাবে না। তোমার জীবনটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। তার ভাল মন্দ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। এই কথাটি ভুলে যাও কেন? আর শোনো শখ করে আর কখনই আমাকে কষ্ট দিও না। আমি খুব ভাল নেই, আর এই ভাল না থাকা তোমার কারণে।* ছোট্ট চিঠি, কিন্তু অমল এক আনন্দ আমাকে ঘিরে থাকে সারাদিন। আমি বুঝি, খুব ভাল করে বুঝি, রুদ্রকে আমি ভালবাসি। রুদ্র তার বাসাবোর ঘরে আমাকে চুমু খেতে খেতে হয়ত আরও *অন্য কিছু* করতে চেয়েছিল, সেই অন্য কিছুর একটি ভয় আমাকে আমূল কাঁপায়। রুদ্রকে আমি বোঝাতে পারি না এসবের কিছু।

চট্টগ্রাম থেকে ময়মনসিংহে তার মেয়ে বিনিকে নিয়ে বেড়াতে আসে শীলা। শীলা এসেছে খবর পেয়ে দাদা অস্থির হয়ে ওঠেন। বান্ধবী নিলমের বাড়িতে শীলা উঠেছে। শহরের কাচিঝুলির বাড়িটি বিক্রি করে দিয়ে গফরগাঁওএ গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে শীলার মা, ভাই বোন। গফরগাঁওয়ে যাওয়ার পথে ময়মনসিংহ শহরে থেমেছে শীলা, নিলমের সঙ্গেও দেখা হল,জন্মের শহরটিও দেখা হল। কিন্তু দেখতে গিয়ে দেখা হয়ে যায় দাদার সঙ্গে। দাদার সঙ্গে দেখা হোক শীলা চেয়েছিলই বলে দেখা হয়। সে দেখা থমকে দাঁড়িয়ে থাকা মুখোমুখি। সে দেখা বুকের মধ্যে একশ কথা জমা থাকার পর একটি কথাও উচ্চারিত না হওয়ার দেখা। সে দেখা অপলক তাকিয়ে থেকে ভিজে ওঠা চোখ আড়াল করতে ডানে বা বামে কোথাও তাকানো। শীলাকে দাদা বাড়িতে আসতে বলেন। নিজে বাজার করেন রুই মাছ, কই মাছ, চিংড়ি মাছ, চিতল মাছ, কিন্তু শীলা যদি মাছ খেতে পছন্দ না করে, তাই সঙ্গে খাসির মাংস, মুরগির মাংস, এমন কি কবুতরের মাংসও--মা সারাদিন ধরে সব রান্না করেন। সন্ধের দিকে বিনিকে সঙ্গে নিয়ে শীলা অবকাশে আসে। সেই আগের মতই আছে শীলা, আগের সেই পানপাতার মত মুখটি আছে, আগের সেই চোখ, চোখের হাসি, গালে শুধু মেচেতার কিছু কালো দাগ পড়েছে। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলে শীলা। তার মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলেন, *ভাল আছ শীলা? আহা কতদিন পর তোমারে দেখলাম। কি সুন্দর একটা ফুটফুটে মেয়ে তোমার!* খেতে বসে শীলা বারবারই বলে, *কি দরকার ছিল এত কিছুর!* শীলার পাতে মাছ মাংস তুলে দিতে দিতে মা বলেন, *নোমান শখ কইরা কিনছে, খাও।* খাওয়ার পর বিনিকে বারান্দায় খেলতে পাঠিয়ে দাদার ঘরে বসে দাদাকে তার দুঃসহ জীবনের কথা বলে সে। নিজের ভেজা চোখ হাতের তেলোয় মুছে দাদা শীলার চোখের জল মুছিয়ে দেন। শীলা চলে যাওয়ার পর দাদা উদাস শুয়ে থাকেন বিছানায়, চোখ খোলা জানালায়। বাইরের হাওয়া এসে দাদার ভিজে চোখ শুকিয়ে নেয় বারবার। দাদার গালে মেচেতার নয়, চোখের জল শুকোনোর দাগ লেগে থাকে। এভাবে অনেকদিন উদাস মন নিয়ে থেকে বাড়িতে তিনি বলে দিলেন, কেউ যেন তার বিয়ের জন্য আর পাত্রী খুঁজে না বেড়ায়। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি বিয়ে করবেন না। সবাই থ। থ হওয়া সবাইকে সপ্তাহ খানিক পর তিনি জানালেন, যদি বিয়ে করতেই হয় তবে তিনি শীলাকে করবেন। শীলাকে বিয়ে! সবাই আরও থ। বিয়ে হওয়া বাচ্চাঅলা শীলাকে কি করে দাদা বিয়ে করবেন! শীলা স্বামী ছেড়ে দেবে শিগগির। তারপর শীলাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবেন, বিনি আছে তো ক্ষতি কি, বিনি তো শীলারই মেয়ে। দাদা বড় বড় চিঠি লিখতে থাকেন শীলাকে। চিঠিগুলো নিলমের হাতে দিয়ে আসেন,নিলম নিজের চিঠির খামে পুরে দাদার চিঠি ডাকে পাঠিয়ে দেয় চট্টগ্রামে। একদিন খুব ভোরবেলা নিলম

এল বাড়িতে, দাদা সারারাত না ঘুমিয়ে নিলম আসার আগেই কাপড়চোপড় পরে তৈরি ছিলেন। দুজন যাচ্ছেন চট্টগ্রামে শীলার কাছে। দাদার পথ আগলাবে এমন শক্তি নেই কারও। দাদা উদভ্রান্তের মত নিলমের সঙ্গে চট্টগ্রাম চলে গেলেন।

চট্টগ্রামে এক সপ্তাহ কাটিয়ে দাদা ফিরে এলেন। এ সম্পূর্ণ নতুন এক দাদা। তিনি আর খোলা জানালা সামনে নিয়ে উদাস শুয়ে থাকেন না, বরং শীলা ছাড়া অন্য যে কাউকে বিয়ে করার শখ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মত বেড়ে যায়। চট্টগ্রামে কি ঘটনা ঘটেছে, তা তিনি বাড়ির কাউকে বলেন না। কেবল তাই নয়, শীলা নামটি তিনি মুখে নেন না, যেন শীলা বলে পৃথিবীতে কেউ নেই কিছু নেই। কেউ জানতে চাইলে তিনি পাথরের ওপর বসা পতেঙ্গা সমুদ্র বন্দরে তোলা নিজের কয়েকটি ফটো দেখান আর বলেন *চট্টগ্রাম জায়গাটা খারাপ না, ভালই।*

দাদার বন্ধুবান্ধবদের বিয়ে তো বিয়ে, বাচ্চা কাচ্চাও হয়ে গেছে, এমন কি যে *আদুভাই* ফরহাদের ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আগে বিয়ের নামগন্ধ নেওয়া নিষেধ ছিল, তিনিও ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ দিয়ে বিয়ে করে ফেলেছেন। দাদার তো আর কিছু পাশ দেওয়ার নেই। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছেন, এখনও যদি বিয়ে না করেন, তবে বাকি জীবনে আর বিয়ে করতে পারবেন বলে, দাদার অনেক বন্ধুরাই ধারণা দিয়েছে,মনে হয় না। দাদা প্রতি সপ্তাহেই মেয়ে দেখছেন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আবার সেই একই মুশকিল, পছন্দ হচ্ছে না কাউকে। ফাইসন্স কোম্পানীর নতুন প্রতিনিধি ফজলুল করিম দাদার চেয়ে বছর চারেকের ছোট, এ শহরে নতুন এসে শহরের আচার ব্যবহার বুঝে ওঠার আগেই বিয়ে করে ফেলেছেন, বউ ইয়াসমিনের ক্লাসের এক মেয়েকে। ফজলুল করিমের বউ দেখে এসে দাদা ইয়াসমিনকে ধমকের সুরে বললেন *তর ক্লাসে এত সুন্দর মেয়ে ছিল, আগে কস নাই ত!*

মেয়ে ত আছেই, কিন্তু তোমার মত বুড়ারে বিয়া করব নাকি আমার ক্লাসের মেয়েরা! কয়েক বছরের বছরের ছোট হওয়া এমন কিছু না।

দাদা শার্ট প্যান্টের বোতাম খুলে বসে থাকেন সোফায়। তিনি যে শরীরটিকে বয়ে নিয়ে ঘরে নিয়ে শার্ট প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরে আসবেন, তাঁর সেই উদ্যমটুকুও হারিয়ে গেছে।

ইয়াসমিনের ক্লাসের মেয়েরা তোমার চেয়ে পনর বছরের ছোট দাদা। আমি বলি।

তাইলে তর ক্লাসের কোনও মেয়ে টেয়ে দেখ না!

মেডিকেলের মেয়ে?

না মেডিকেলের মেয়ে বিয়া করা যাবে না।

কেন?

মেয়ে কয়েক বছর পর ডাক্তার হইয়া যাইব। সাবমিসিভ হইব না।

সাবমিসিভ চাও কেন?

আরে মেয়ের উপরে থাকতে হইব না আমার? বউ আমারে মাইনা না চললে ত চলবে না।

ও তোমার ত আবার ডাক্তারদেরে স্যার ডাকতে হয়। মেডিকেলের মেয়েরা ওষুধ কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভরে বিয়া করে না, ওই স্বপ্ন বাদ দেও।

মেডিকেল ত বাদই। মেডিকেলে সুন্দরী মেয়েরা পড়ে না।

দাদার আদেশ নিষেধ মেনে চলবে এমন এক মেয়ে চাই, মেয়ে এমএ পাশ হলেও চলবে না, কারণ দাদার এম এ পাশ হয় নি, দাদার চেয়ে বেশি শিক্ষিত মেয়ে হলে

বিপদ। দাদা আমার ইশকুল বা মুমিনুন্নিসা কলেজের পুরোনো বান্ধবীদের কথা জিজ্ঞেস করেন।

কেউ কি ছিল না সুন্দরী?

আমি বলি, *মমতা ছিল কিন্তু ওর তো বিয়া হইয়া গেছে।*

আরেকটা মমতা ছিল তো তর ইশকুলে, বাঘমারা থাকত। ভাল ছাত্রী, হেভি সুন্দরী।

ওরও বিয়া হইয়া গেছে।

এই মুশকিল সুন্দরী মেয়েগুলার ইশকুলে থাকতেই বিয়া হইয়া যায়। আইএ বিএ যারা পাশ কইরা ফালায়, অথচ বিয়া হয় না, তারা দেখবি, দুনিয়ার পচা দেখতে। হয় দাঁত উঁচা, নয় ঠোঁট উঁচা। কিছু একটা উঁচাই।

মা বলেন, *নোমান, কত ভাল ভাল মেয়ে দেখলি, তর কাউরে পছন্দ হইল না, না জানি শেষ পর্যন্ত তর কপালে কী আছে।*

কপালের কথায় দাদা সামান্য উদ্যম ফিরে পান, তিনি শার্ট প্যান্ট খুলে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বারান্দার চেয়ারে বসে গা চুলকোতে চুলকোতে বলেন, *সুন্দরী মেয়ে না পাইলে বিয়াই করতাম না ইনশাল্লাহ। অসুন্দরী মেয়েরে বিয়া করার চেয়ে সারাজীবন আনম্যারেড থাকা ভাল।*

সেবনিরে দেইখা আইলাম, কি সুন্দর মেয়ে, তর পছন্দ হইল না। মেয়েটা খুব নামাজি, পর্দা করে। আদব কায়দা জানে, বিএ পাশ করছে।

বেশি নামাজি আবার ভালা না মা। দাদা একগাল হেসে বলেন।

ওই সেবনিরে বিয়া না কইরা ভালই হইছে। মার বোরখার জ্বালায় বাঁচি না। বাড়ির মধ্যে দুই বোরখাউলি থাকলে বিপদ আছে। আমি ফোড়ন কাটি।

মা ধমকে ওঠেন, *সাবধানে কথা ক নাসরিন।*

মার ধমক আমার কানে পৌঁছয় না। পৌঁছয় না কারণ আমি মুমিনুন্নিসার মেয়েদের মুখের ছবি *চোখে ভাসাচ্ছি।* সুন্দরী কে ছিল দেখতে। বিড়বিড় করি, *মুমিনুন্নিসা কলেজে আর্টসে একটা সুন্দরী মেয়ে পড়ত। ও আবার নাফিসার বান্ধবী।*

নাফিসা কেডা?

নাফিসা আমার সাথে মেডেলেও পড়ছে, মুমিনুন্নিসায় পড়ছে।

ওই নাফিসা! উফ, ভুটকি। তর বান্ধবীগুলাও যা না! এক তো চন্দনা চাকমারে বন্ধু বানাইলি, নাক বোঁচা চাকমা। তর চয়েস দেখলে আমার .. কি কইতাম।

নাফিসাকে দাদা চেনেন। এ বাড়িতে এসেছেও ও। ওর বড় ভাই আবার দাদার সঙ্গে একই কলেজে একই ক্লাসে কোনও এক কালে পড়ত। এখন রাশভারি ভদ্রলোক, ঢাকায় চাকরি বাকরি করেন।

নাফিসা তো মেডিকেলে ভর্তি হইছে।

তা সুন্দরী মেয়েডা কেডা, ক।

নাম হাসিনা। আর্টস এ পড়ত, মুমিনুন্নিসায়, কথাবার্তা বেশি হয় নাই। নাফিসার সাথে খাতির ছিল খুব।

দাদা সিদ্ধান্ত নেন, এই মেয়ে তিনি দেখবেন।

নাফিসার কাছ থেকে হাসিনার একটা ফটো এনে দেখালাম দাদাকে। দাদা বললেন, এই মেয়ে তিনি দেখতে যাবেন। ব্যস, আয়োজন হল মেয়ে দেখার, দাদা মেয়ে দেখে এসে বললেন, *চলে।*

চলে মানে? বিয়া করবা?

আহামরি কিছু না দেখতে, তবে করা যায় বিয়া।

দাদার মুখে *করা যায় বিয়া,* এই বাক্যটি আমাদের বিস্মিত করে,আনন্দিতও। কারণ দীর্ঘ দীর্ঘ কাল বিয়ের জন্য ঝুলে থাকতে থাকতে দাদার জন্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত *পাত্রদায়গ্রস্ত* আত্মীয় আমরা ভুগেছি। দাদার পছন্দের কথা শুনে বাবা বললেন, *মেয়ের বাবা কি করে, বাড়ির অবস্থা কিরকম, ভাইয়েরা কি করে, এইসব না জাইনা বিয়া করার জন্য লাফাইলে চলবে?*

হাসিনা তার বোনের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত, তার বোনের স্বামী ছিল রেলওয়ে ইস্কুলের মাস্টার। সেই রেলওয়ে ইস্কুলে ছোটবেলায় হাসিনাও পড়ত, নাফিসাও পড়ত। মুমিনুন্নিসায় হাসিনা মানবিক বিভাগে, নাফিসা *অমানবিকে* অর্থাৎ বিজ্ঞানে, আমার সঙ্গে। নাফিসাই একদিন দূরে টিনের চালায় ক্লাস করা হাসিনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, মানবিকে পড়া মেয়েদের সঙ্গে অমানবিকের মেয়েদের দেখা হয় না বড়। হাসিনার সঙ্গেও দেখা হত না। সেই হাসিনা, ডাগর চোখের হাসিনা আমার দাদার বউ হবে! বাহ! যা আমার জানা ছিল না, নাফিসার কাছ থেকেই জানি, হাসিনার বাপ নেই, মা আছে। কিছু ভাই আছে, কিছু বোনও। এটুকু ছাড়া আর বেশি তথ্য আমি বাড়িতে জানাতে পারি না। দাদা খবর নিয়ে আরও তথ্য যোগাড় করে জানালেন, ফুলপুর শহর থেকে মাইল দশেক ভেতরে অর্জুনখিলা গ্রামে মেয়ের মা থাকেন, ভাই একজন চাকরি করে ফুলপুর শহরে, আরেকজন ময়মনসিংহ শহরে, খুব বড় কোনও চাকরি নয়, কিন্তু চাকরি। খেয়ে পরে চলে যায়। আরেক ভাই *টুডাইল্যা,* গ্রামে বসে আছে, বড় বোন যার বাড়িতে মেয়ে থাকত,তার নাম কুসুম। কুসুমের দু ছেলে। সম্প্রতি স্বামী ত্যাগ করে এক বিবাহিত লোকের সঙ্গে ভেগে গেছে, বিয়েও হয়েছে সে লোকের সঙ্গে। দ্বিতীয় বোন, পারভিন। অবশ্য পারভিনকে ছোটবেলায় পালক দেওয়া হয়েছিল ওর নিজের ফুফুর কাছে। ফুফুকেই মা বলে ডাকে পারভিন, আর নিজের মাকে ডাকে মামি বলে। পারভিনের ভাসুর হচ্ছেন স্বয়ং আমানুল্লাহ চৌধুরি, ছোটদার চাকরির *মামাচাচা।* তথ্য বাবা শোনেন, কিন্তু তথ্য পছন্দ হয় না। মেয়ে সুন্দরী, মেয়ে মুমিনুন্নেসায় বিএ পড়ে, এ জেনেও বাবা মুখ ভার করে থাকেন। মেয়ের বাবাভাই ধন সম্পদ করেনি, নামও নেই শহরে, ঠিক আছে, কিন্তু মেয়ের বড় বোন স্বামী ছেড়ে দিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে চলে গেছে, এই জিনিসটি বাবাকে খোঁচাতে থাকে। এই জিনিসটি যে দাদাকে খোঁচায় না তা নয়, কিন্তু সুন্দরী মেয়ের যে আকাল দেশে, এ মেয়ে নাকচ করে দিলে তিনি আশংকা করেন পৃথিবীতে সুন্দরী বলতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

দাদাই *যা আছে কপালে* বলে ঠায় বসে রইলেন, বিয়ে এ মেয়েকেই করবেন তিনি। বাবাকে অহর্নিশি বলতে থাকেন মা, *রাজি হইয়া যান, এহন যদি বিয়া না হয় নোমানের, জীবনে হয়ত আর হইবই না।* বাবাকে বলে কয়ে *না* থেকে *নিমরাজি* করার পর পর ই দাদা তারিখ নিয়ে বসলেন। ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে বিয়ে। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে তিনি দৌড়ে দৌড়ে কেনাকাটা শুরু করলেন। বাড়ি সাজানোর যা বাকি ছিল, সেরে ফেললেন। আমার জন্য হলুদ, ইয়াসমিনের নীল আর গীতার জন্য সবুজ রঙের কাতান শাড়ি কিনলেন, বিয়েতে পরার জন্য। *গায়ে হলুদ* এ পরার জন্যও সবাইকে লাল পাড় হলুদ শাড়ি দিলেন। সাজানো কুলো থেকে শুরু করে, মেয়ের জন্য শাড়ি কাপড় প্রসাধন, কেবল মেয়ের জন্যই শাড়ি নয়, মেয়ের মা নানি দাদি ইত্যাদি সবার জন্যই সব কেনা হল। সবকিছুর টাকা অবশ্য বাবা দিচ্ছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানের যাবতীয় খরচ বাবাকেই

পোষাতে হবে, যেহেতু তিনি বাবা। শখের জিনিসপাতির খরচ দাদার পকেট থেকে। যেমন পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর বউভাতের নিমন্ত্রণপত্র করার ইচ্ছেয় তিনি মখমলের লাল কাপড়ে নিমন্ত্রণপত্র নয় নিমন্ত্রণ কাব্য লিখে আনলেন, শিল্পী দিয়ে হাতে লিখিয়ে। একটি লাল সুসজ্জিত সুঅঙ্কিত লম্বা কৌটোয় মখমলের কাপড়টি থাকবে, কাপড়ের দুদিকে ঝুনঝুনিঅলা রুপোর কাঠি। নিমন্ত্রণকাব্যটি পড়তেও হয় রাজাবাদশাদের কাছে পাঠানো ফরমান পড়ার মত। দাদার মাথা থেকে আরও নানা সুড়সুড় করে আরও শিল্প বেরোচ্ছে, নিজের ঘরখানা রাজাবাদশাহদের ঘরের মত সাজিয়েছেন। বিয়ের খাট সাজানোর জন্য শহরের সেরা শিল্পীদের বলে রেখেছেন। কয়েকহাজার গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকায় খাট সাজানো হবে। লাল কার্পেট পেতে দিতে হবে কালো ফটক থেকে ঘর অবদি। বাবার কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে বউএর জন্য লাল বেনারসি আর প্রচুর সোনার গয়না দাদা নিজে ঢাকা গিয়ে কিনে আনেন। বিয়ের বাজার সারতেই মাস কেটে যায়।

গায়ে হলুদের দিন আমরা, আমি, ঝুনুখালা, ইয়াসমিন, ছোটদা, গীতা ফুলপুরের অর্জুনখিলা গ্রামে গিয়ে হাসিনার গায়ে হলুদ লাগিয়ে আসি। সাজানো কুলোয় সাজিয়ে নিই হাসিনার জন্য হলুদ শাড়ি, আর মুখে মাখার সপ্তবর্ণ রং। কুলোর পেছনে বত্রিশ রকমের মিষ্টির প্যাকেট। পরদিন দাদার গায়েও হলুদ। দাদা শীতল পাটিতে বসে থাকেন বারান্দায়। আত্মীয়রা দাদার মুখে হলুদ লাগান। সেই শীতল পাটিটি আবার চারজনে ধরে বিছাতে হয়। চারজনের একজন হয়ে প্রচণ্ড উৎসাহে যখন আমি পাটির এক কোণ ধরি, ঝুনুখালা দৌড়ে এসে আমার হাত থেকে কোণ কেড়ে নিয়ে বললেন, *তর ধরা যাবে না।*

কেন ধরা যাবে না?

কারণ আছে। পরে বলব।

আমি পাটি ছেড়ে দিয়ে ঘরে ম্রিয়মান বসে থাকি। কেন শীতল পাটিটি আমার ধরা যাবে না,এই প্রশ্ন মন থেকে দূর হয় না। ঝুনুখালা পরে বললেন, *তর তো মিনস হইছে, তাই।*

কে কইছে হইছে*? হয় নাই ত!*

ও আমি ভাবছিলাম, হইছে।

হইলেই বা কি? যদি হইত!

ওইসময় শরীর পবিত্র থাকে না। আর বিয়ে শাদির সময় খুব পবিত্র হাতে সবকিছু ধরতে হয়।

শুভ কাজে অশুভ জিনিস দূরে রাখতে হয়।

ও এই কথা!

মাকে ডেকে বলি, *মা ওইগুলা হইলে নাকি গায়ে হলুদের পাটি ছোঁয়া যায় না?*

মা বললেন, *নাপাক শইলে না ছোঁয়াই ভাল।*

না ছোঁয়াই ভাল কেন? ছুঁইলে কি হয়?

কি হয় ছুঁইলে মা তা বলেন না, মার ব্যস্ততা বিষম। ঝুনুখালা বলেন, *অমঙ্গল হয়।* কি রকম অমঙ্গল তা জানতে চেয়েছি, উত্তর পাইনি। বাড়ির পেছনে বাড়ি জীবনদের, জীবনের বিয়ের সময় দেখেছি শীতলপাটির তলে পান সুপারি রাখছেন জীবনের মা, পান সুপারির প্রয়োজন কি তা আমার বোঝা হয়নি। জীবনের বিয়ের পুরো অনুষ্ঠানটিই আমার দেখা হয়েছে, বরের সামনে আয়না ধরে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি দেখছেন, আয়নায় জীবনের সুন্দর মুখটি, বরের মুখ থেকে কথা বেরোয় না, একজন বলে দিল বলতে *চাঁদমুখ।* এরকমই নাকি নিয়ম। নিয়মগুলো আমার অদ্ভুত লাগে। ডলি পালের বোনের

বিয়েতে গিয়েছিলাম, ওখানে আগুনের চারদিকে পোতা হয়েছিল চারটি কলাগাছ, কলাগাছের চারপাশ দিয়ে বরবউকে সাত পাক দিতে হল, সারাদিন উপোস থাকা মেয়ে ক্লান্ত শরীরে পাক দিচ্ছিল। জীবনের গায়ে হলুদের দিন রং খেলা হয়েছিল, খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমি পালিয়ে বাড়ি চলে এসেছি, রঙ খেলার সময় ছুটোছুটি দাপাদাপি আমার স্নায়ুকে বিকল করে দেয়। একইরকম মাহবুবার বোনের গায়ে হলুদের দিন, ওখানেও বরের এক বন্ধু আমাকে রঙ দিতে নিয়েছিল, আমি ছিটকে সরে আসি, দৌড়ে বেরিয়ে যাই বাড়ি থেকে, আমার কেবলই মনে হয় রঙের উদ্দেশ্য বুঝি গায়ে হাত দেওয়া। মাহবুবা আমার চলে যাওয়া দেখে অবাক হয়েছে। নিজেকে আলগোছে বাঁচিয়ে চলি আমি, ছুটোছুটি দাপাদাপি কাড়াকাড়ি এসবে আমার বড় ভয়।

দাদার গায়ে হলুদে বাড়ির মেয়েরা সব হলুদ শাড়ি পরি। যারাই এসেছে বাড়িতে, এসেছে হলুদ শাড়ি পরে। নানি অবশ্য হলুদ শাড়ি পরেননি। তিনি শাদা শাড়িতেই দাদার মুখে হলুদ লাগিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলেছেন, সুখী হইও দোয়া করি। নানির কাছে সুখ জিনিসটির মূল্য অনেক, মার কাছেও। ছোটদা দূরে আছেন কিন্তু সুখে আছেন এই জিনিসটি ভেবে মা ছোটদার না থাকার কষ্টকে সান্ত্বনা দেন। বাড়ি ভরে গেল হলুদে, হলুদ শাড়িতে, মিষ্টিতে, উৎসবে। নানিবাড়ির সবাই এল, সবাই দাদার শরীরে হলুদ মেখে দিল। হাসিনার বাড়ি থেকে লোক এসে হলুদ দিয়ে গেল দাদার গালে কপালে। দাদাকে বড় নিরীহ দেখতে লাগছিল। হাসিনার আত্মীয়রা পেট পুরে পোলাও মাংস খেয়ে বিদেয় হল। শ্বশুরবাড়ির লোক না হলে ঠিক ঠিকই দাদা চাষাভুষো লোকগুলোকে *আনকুথ* বলে গাল দিতেন।

এরপর তো বিয়ের ধুম। কালো ফটকের সামনে গাছপাতা ফুলপাতায় চমৎকার একটি প্রবেশদ্বার বানানো হয়েছে। বাবার বন্ধুদের গাড়ি ধার করে বাবা, আমরা ছোটরা, দাদার বন্ধুরা গেলাম অর্জুনখিলায়। দাদার মত নিলাজ লোক মুখে রুমাল চেপে বসে রইলেন, মাথায় টোপর, পরনে শাদা শেরওয়ানি, শাদা পাজামা, শাদা নাগরা। বাইরে শামিয়ানার তলে বসে কাজীকে কবুল বললেন, ভেতর ঘরে হাসিনা কাজীর সামনে একই কথা বলল, কবুল। মেয়েদের অবশ্য অমুক লোকের অমুক পুত্রের সঙ্গে এত টাকা দেনমোহরে বিবাহ করিতে রাজি আছ কি না জিজ্ঞেস করার সঙ্গে সঙ্গে *কবুল* বলা শোভন দেখায় না, কিছুক্ষণ হু হু করে কাঁদতে হয়, কেঁদে কেটে ক্লান্ত হলে মা খালাদের কিছু ঠেলা গুঁতো খেয়ে শব্দটি উচ্চারণ করতে হয়। হাসিনা খুব একটা সময় নেয়নি কবুল বলতে। হাসিনার কবুল বলা মানে বিয়ে ঘটে যাওয়া। এবার বিদায় নেবার পালা। হাসিনার মা বাবার হাতে মেয়ে সমর্পণ করলেন। আমি অবাক হয়ে সব কাণ্ড দেখছিলাম, বিয়ের এমন সব কাণ্ড এত কাছ থেকে আমার আগে দেখা হয় নি। ফুলে সাজানো গাড়িতে দাদা বউ নিয়ে বসলেন, দুপাশে আমি আমি ইয়াসমিন, পেছনের গাড়িতে বরযাত্রী। দাদা সব কিছুর নীল নকশা আগে থেকেই এঁকে রেখেছিলেন। নীল নকশা অনুযায়ী আমরা গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে ঢুকলাম বাড়িতে বরবধূর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান জমকালো করতে, কুলো থেকে ফুলের পাপড়ি ছিটোতে বরবধূর গায়ে। কুলো হাতে নিয়ে ফুল ছিটোচ্ছি লাল কাপের্টের কিনারে দাঁড়িয়ে। ওদিকে বাবা লোক খুঁজছেন বউ বরণ করার জন্য। মা দাঁড়িয়ে ছিলেন খোলা দরজার সামনে বরবধূ বরণ করতে। সারাদিন বাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিলেন তিনি এই ক্ষণটির। মার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বাবার বন্ধুদের বউ। মাকে দরজার সামনে থেকে *তুমি সর, দূরে যাও, দূরে যাও* বলে কনুইয়ের ধাক্কায় সরিয়ে বাবা এম এ কাহারের ছোটভাই

আবদুল মোমিনের বউকে বিগলিত হেসে বললেন, *ভাবী আসেন আপনে, আমার ছেলে আর ছেলের বউরে বরণ করেন।* মা পেছনে পড়ে রইলেন, ধনী আবদুল মোমিনের সোনার গয়নায় মোড়া বউটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাদার আর লাল ঘোমটা মাথার নতমুখ হাসিনার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করলেন। ঝুনুখালা অবাক তাকিয়ে বললেন, *আশ্চর্য, বাড়িতে মা তার ছেলে আর ছেলের বউরে ঢোকালো না! ঢোকালো অন্য কেউ!* ঝুনুখালা সরে যান দৃশ্য থেকে। দাদার কিনে দেওয়া *না-কাতান শাড়ি* পরে পুত্রবধূসহ পুত্রের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে মা বিড়বিড় করে দোয়া পড়েন দাদা আর দাদার বউএর সুখী জীবনের জন্য।

দাদার সাজানো ঘর, বিছানায় ছড়ানো লাল গোলাপের পাপড়ি, ওর মাধ্যে লাল বেনারসি পরা বউ বসেছে। দাদা এঘর ওঘর করেন। দাদাকে দেখে আগের দাদাই মনে হয়, কিন্তু আবার ভাবি এ দাদা আগের দাদা নয়, এ বিবাহিত দাদা। ঠোঁটে একটি কাঁপা কাঁপা বিব্রত হাসি লেগে থাকে দাদার। রাতে সোফায় বসে পা নাড়ছিলেন তিনি, বাবা অন্যদিনের মতই বললেন, *অনেক রাত হইছে, যাও শুইয়া পড় গিয়া।* দাদা শুতে যাবেন তাঁর ঘরে, আগের রাতেও একা শুয়েছেন, আজ তাঁর বিছানায় আরেকজন, যার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়নি, প্রেম হয়নি। আমি ভাবছিলাম কি কথা বলবে দুজন! দুটো অচেনা মানুষ! ইচ্ছে করে দাদার ঘরের দরজায় কান পেতে শুনি কী হচ্ছে ভেতরে! দাদা যদি বউএর কোনও খুঁত আবিষ্কার করেন এই রাতে, তবে আবার রাতেই সোফায় এসে বসে থাকেন কি না। অনেক রাত অবদি বিষম কৌতুহলের যন্ত্রণায় আমার ঘুম হয় না।

সকালে দাদা বেরোলেন আগে, পেছন পেছন হাসিনা। দাদার লজ্জা লজ্জা মুখ, পেছনে হাসিনার নির্লজ্জ হাসি। বাড়ির সবার চোখ দুজনের মুখে।

ছোটদা চোখ নাচিয়ে বললেন *কী বৌদি, নাকের ফুল খুলছিলা রাতে?*

হাসিনা খসখসে গলায় বলল *কিছু হয় নাই তো।*

জিজ্ঞেস করি, *নাকের ফুল খুলতে হয় কেন?*

হাসিনা আমার পিঠে খোঁচা মেরে বলল, *বিয়ের রাতে খুলতে হয়।*

কেন খুলতে হয়?

জানো না?

না তো!

ওইগুলা হওয়া মানেই নাকের ফুল খোলা।

ওইগুলা কোনগুলা?

হাসিনা জোরে হাসল।

নিজেকে খুব বোকা মনে হয় আমার। হাসিনা খুব সহজে সহজ হয়ে যায়। ছোটদা বয়সে অনেক বড় হলেও ছোটদাকে দিব্যি নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। গীতাকেও। অবলীলায় *তুমি* সম্বোধন করছে। সে বড় বউ বলেই নাকি দাদার যারা ছোট, তাদের তার ছোট হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। হাসিনাকে অবাক হয়ে দেখি, আমার মনে হয় না মুমিনুন্নিসা কলেজে পড়া এটি সেই মেয়ে, যে মেয়েটিকে দূর থেকে দেখতাম হাঁটছে চত্বরে, নাফিসার সঙ্গে হাতে হাত ধরে।

আনুর মা, বাড়ির নতুন কাজের মহিলা, বালতিতে পানি নিয়ে ঘর মুছতে এল, বললাম, *দেখছ নতুন বউরে?*

বউএর শইলে তো গোসত নাই।

তা ঠিক, হাসিনার শরীরে মেদমাংসের অভাব, আমার যেমন।

আর বউ তো সকালে গোসলও করল না, কাপড়ও লাড়ল না !

কেন, এই শীতের সময় সকালের ঠাণ্ডা পানিতে কেউ কি গোসল করে নাকি!

হ। সকালে ঘুম থেইকা উইঠাই গোসল কইরা,শইলের কাপড় ধইয়া পরে ঘরে যাইতে হয়।

কেন, দুপুরে গোসল করলে হয় না? আর কাপড় না ধইলে হয় না?

আনুর মা সজোরে মাথা নাড়ে, নিশ্চিত কণ্ঠে বলে, *না।*

কৌতুহল আমাকে গ্রাস করছে। হাসিনাকে বলি, *কী নাকি গোসল করতে হয়, আর কাপড় ভিজাইতে?*

হাসিনা বলল, *ওইগুলা হইলে হয়।*

ওইগুলা কোনগুলা?

হাসিনা এবারও জোরে হাসল। আমার জানা হল না *ওইগুলা* কোনগুলা।

হাসিনা আর আমি যদিও মুমিনুন্নিসা কলেজে এক বর্ষেই পড়েছি, তাকে আমার মোটেও বান্ধবী গোছের কিছু বলে মনে হয় না, বরং দাদার বউ বলেই মনে হয়।

দুদিন পর বউভাতের অনুষ্ঠান। দাদা সকাল থেকে বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই চালিয়ে দিয়েছেন ক্যাসেটে। এক পাশ শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে দিয়ে যান ক্যাসেট, সানাই বেজে চলে সারাদিন। সুপুরুষ দাদা দামি স্যুট পরেছেন, পায়ে বিদেশি জুতো, *মেইড ইন ইটালি।* মাঠে বিশাল শামিয়ানার নিচে টেবিল চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে। ভেতরের উঠোনেও। টিনের ঘরের পাশে বিশাল গর্ত খুঁড়ে বাবুর্চিরা বিশাল বিশাল পাতিলে বিশাল বিশাল চামচে নেড়ে নেড়ে পোলাও মাংস রান্না করছে। হাসিনা বউভাতের নতুন শাড়ি পরে বিছানায় মাথা নুইয়ে বসে আছে। অতিথি আসছে উপহার নিয়ে, অতিথি বলতে আত্নীয় স্বজন, দাদার বন্ধু, বাবার বন্ধু, ছোটদার বন্ধু, আমার আর ইয়াসমিনের কিছু বান্ধবী। কেউ একজন কাগজে লিখে রাখছে উপহারদাতা বা দাত্রীর নাম উপহারগুলো এক কোণে জমিয়ে রাখছে। অতিথিরা বউএর মুখ দেখে এক এক করে খেতে চলে যাচ্ছে; পুরুষেরা মাঠে, মেয়েমহিলা উঠোনে। দুপুর থেকে বিকেল অবদি এই চলে। ভিড়ের মধ্যে আমার হাঁসফাঁস লাগে। রাত্তিরে ভিড় কমে আসে। তখন উপহার খোলার পালা। কাচের বাসনপত্র, পিতলের কলস, ঘড়ি, শাড়ি, সোনার গয়না ইত্যাদি উপহারে ঘর ভরে ওঠে। দাদা উপহারগুলো নিয়ে নিজের ঘরে গুছিয়ে রাখেন।

মাস গেলে হাসিনা আমার কাছে তার একটি সমস্যার কথা বলতে আসে। সমস্যাটি এক আমার কাছে ছাড়া আর কারও কাছে বলা যাবে না। সমস্যাটি কি? হবু ডাক্তার কান পাতে।

বিয়ের প্রথম প্রথম স্বামী স্ত্রীর মিলনের সময় আমি একটা জিনিস পাইতাম, সেইটা আজকাল আর পাইনা।

মিলন শব্দটি শুনে কান লাল হয়ে ওঠে। কানকে আমি যথাসম্ভব বাদামিতে ফিরিয়ে বলি,--*কি জিনিস পাইতা?*

একটা তৃপ্তি।

আগে পাইতা এখন পাও না, কেন?

তাই তো আমার জিজ্ঞাসা, পাই না কেন?

ইন্টারকোর্স হইলে তো মেইল অরগান থেকে মানে টেসটিসের পেছন দিকের কয়েল্ড টিউব এপিডিডাইমিস থেকে ভাস ডিফারেন্স হয়ে স্পার্ম চলে যায় ব্লাডারের ওপর দিয়ে

ব্লাডারের পেছনেই সেমিনেল ভেসিক্যাল নামের গ্ল্যান্ডে, সেমিনেল ভেসিকেলে সেমিনেল ফ্লুইডএর সাথে মিক্সড হয়ে সিমেন ফর্ম কইরা

স্পার্ম ইউরেথ্রো দিয়া পাস করে।

আমি একটি কলম নিয়ে শাদা কাগজে ছবি এঁকে স্পার্মের গতি প্রকৃতি বুঝিয়ে দিই হাসিনাকে। এই হল টেসটিস, এই সেমিনাল ভেসিক্যাল, ভাস ডিফারেন্স, এই হল ইউরিনারি ব্লাডার, এই প্রসটেট, এরপর তীর চিহ্ন দিই ইওরেথ্রার দিকে।

হাসিনার খসখসে কণ্ঠটি তেতে ওঠে, *তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি বলতাছি তৃপ্তির কথা, পাই না কেন!*

হাতে কলম আমার, কলমটি দ্রুত নড়ে, কলমটি একবার গালে, একবার চিবুকে, একবার চুলে।

ইজাকুলেশন কি হয়?

বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে পা নাড়তে নাড়তে নিজের কর্কশ কণ্ঠটি থেকে চেষ্টা করে ফিসফিস আওয়াজ বের করতে ,পারে না। যে কোনও শব্দই তার গলা থেকে ঢোল বাজিয়ে বের হয়। কেউ যেন আচমকা ঘরে না ঢুকে এই গোপন কথা না শোনে, শব্দও যেন ঘরের বাইরে কম যেতে পারে, ভেতর থেকে ছিটকিনি এটে দিই দরজায়।

ইজাকুলেশন কি?

সিমেন সিক্রেশান।

সিমেন কি?

কও কি? সিমেন বুঝো না? মেইল অরগানের যে সিক্রেশান, সেইটারে সিমেন বলে।

ওইটা হয়।

তাইলে ত কোনও অসুবিধা দেখতাছি না।

হাসিনা হতাশার শ্বাস ফেলে চলে যায়। চিকিৎসাবিদ্যার বই ঘেঁটে হাসিনার প্রশ্নের কোথাও কোনও উত্তর আছে কি না খুঁজি। *সেক্সুয়াল রিলেশান* সম্পর্কে যত কথা আছে সব সারারাত ধরে পড়ে পরদিন বিনে পয়সায় ডাক্তারির উপদেশ দেওয়ার জন্য তাকে ডাকি। হাসিনা দৌড়ে আসে উপদেশ লুফে নিতে। যত লজ্জা ছিল ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে আমি যেন দাদার বোন নই, হাসিনাার ননদ নই, একজন ডাক্তার কেবল, এভাবে জিজ্ঞেস করি,-- *আচ্ছা, তোমার স্বামীর কি ইরেকশান হয়?*

তা হয়। হবে না কেন?

তোমার কি ভ্যাজাইনাল সিক্রেশান হয়?

ভ্যাজাইনাল সিক্রেশান মানে কি?

মানে তোমার ভ্যাজাইনা থেকে কি কিছু নির্গত হয়?

হ। সেইটা হয়।

প্রিম্যাচিয়র ইজাকুলেশন হয় কি? মানে ইরেকশানের পরই সিমেন বার হয় কি?

না না সেইরকম কিছু হয় না। টাইম তো অনেকক্ষণ নেয়। বরং আগের চেয়ে বেশি। কিন্তু তৃপ্তি পাই না।

তোমার কি ডিসপেরিনিয়া আছে? মানে কপুলেশানের সময় কি তোমার পেইন হয়?

না।

ভ্যাজাইনিসমুস আছে কি? মাসল স্পাসম বেশি হওয়ার কারণে তা হয়। অথবা হাইপোথাইরোডিসম থাকলে সেক্সুয়াল ডিসফাংশান হইতে পারে।

তা তো জানি না, সব আগের মতই আছে, খালি এই দু সপ্তাহ হইল এই সমস্যা

হইতাছে।

শুন, হাইপোথ্যালামাস নামে একটা জিনিস আছে, সেইটা ব্রেইন এর থার্ড ভেন্ট্রিক্যালের লোয়ার পার্টে থাকে। এই হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে পিটিউটারি গ্ল্যান্ডের কানেকশান আছে। বাদ দেও, তোমারে সংক্ষেপে বলি, গোনাডোট্রপিন রিলিজিং হরমোন হাইপোথ্যালামাস থেইকা আইসা পিটিউটারি গ্ল্যান্ডরে স্টিমুলেট কইরা লিউটিনাইজিং হরমোন আর ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন সিক্রেট করাচ্ছে। লিউটিনাইজিং হরমোন আবার টেসটিসের লেইডিগ সেলকে স্টিমুলেট করে টেস্টোস্টেরন রিলিজ করাচ্ছে। ওদিকে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন সেমিনিফেরাস টিবিউলসের সেলকে স্টিমুলেট করছে। এইভাবে স্পার্ম ডেভেলপ হচ্ছে। এসবের কোনও ফাংশানে যদি এবনরমালিটি দেখা দেয় তাইলে সেক্সুয়াল ডিসফাংশান হবে।

ডিসফাংশানের কিছু নাই। সব ফাংশান ঠিক আছে।

ঠিক থাকলে অসুবিধা কোথায়?

মিলনের সময় যে ফিলিংস, সেইটা পাইতাছি। কিন্তু একটা তৃপ্তি আসে একসময়, সেইটা আসতাছে না।

পার্থক্যটা কি?

মিলনের সময় একটা সুখ পাই। আর ওইটার সময় আরেক রকম। মিলন হওয়া আর ওইটা পাওয়া এক না।

তোমার পার্টনারও কি পায় না, যা পাওয়ার কথা বলতাছ?

আরে সে তো পায়ই।

সে পাইলে তুমি পাইবা না কেন?

তার পাওয়া আর আমার পাওয়া এক না।

এক হবে না কেন? জিনিসটা তো দুইজনের ব্যাপার।

এক না তো বললাম।

এইটা কোনও কথা হইল, এক হবে না কেন? ইরেকশান হইতাছে, এইদিকে ভ্যাজাইনাল সিক্রেশান ঠিক আছে। তার মানে হরমোনের একটিভিটিসগুলা ঠিক আছে। প্রিম্যাচুয়র ইজাকুলেশনও হয় না। তাইলে তো আমি কোনও সমস্যা দেখতাছি না।

আছে সমস্যা। কোথাও নিশ্চয় কোনও সমস্যা আছে। তা না হইলে আমি ওইটা পাইতাছি না কেন?

আবারও বই ঘেঁটে নতুন কিছু উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না।

হাসিনা আশা ছেড়ে দিয়ে বলে, *আমাকে গাইনির ডাক্তারের কাছে নিয়া চল।*

হাসিনাকে গায়নোকলোজির অধ্যাপক, চরপাড়ায় নিজস্ব চেম্বারে রোগী দেখেন, আনোয়ারুল আজিমের কাছে নিয়ে যাই। ডাক্তারের সঙ্গে সে একা কথা বলে অনেকক্ষণ। বেরিয়ে আসে সমাধান-পাওয়া-হাসি মুখে নিয়ে।

জিজ্ঞেস করি, *কি বলল ডাক্তার?*

হাসিনা হাসল, দেঁতো হাসি সারা মুখে, রহস্যের এক পুকুর জলে টুপ করে ডুব দিয়ে বলল, *তুমি বুঝবা না।*

তৃতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হয়ে যায় আমার। এই বর্ষে বিষয়গুলো তেমন কঠিন কিছু নয়। ফার্মাকোলজি আর জুরিসপ্রুডেন্স। তবে পাশাপাশি সার্জারি মেডিসিন গায়নোকলজির ক্লাসও হচ্ছে, কেবল ক্লাস নয়, হাতে ধরে শেখা, টিপে টুপে চেপে চুপে শেখা, ঘাঁটাঘাঁটি করে শেখা। বর্হিবিভাগেও রোগী পড়তে যেতে হচ্ছে। চক্ষু কর্ণ নাসিকা দন্ত যৌন চর্ম ইত্যাদি নানা বিভাগে কেবল ঢুঁ নয়, ওখানেও ঘাঁটাঘাঁটি। একা *থিওরেটিক্যাল নলেজ* এ কচু হবে, *প্র্যাকটিক্যাল নলেজই* হল আসল। মেডিকেল কলেজের ল্যাবরটরি হচ্ছে হাসপাতাল, এই ল্যাবরটরির জিনিসগুলো হচ্ছে মানুষ,শবব্যবচ্ছেদ কক্ষের মরা-মানুষ নয়, জীবিত মানুষ। তোমার আমার মত মানুষ। সারি বেধে বিছানায় শুয়ে থাকা, বিছানা না পেলে মেঝেয় শুয়ে থাকা মানুষ, ককাতে থাকা, কাতরাতে থাকা,গোঙাতে থাকা চেঁচাতে থাকা, ঝিম মেরে থাকা, হাতে স্যালাইন পায়ে স্যালাইন মুখে অক্সিজেনের নল মাথার কাছটা উঁচু করে রাখা বিছানায় চোখ উল্টে পড়ে থাকা মানুষ। এদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে, কি কষ্ট, কবে থেকে কষ্ট, কি রকম সেই কষ্টের চেহারা, ঠিক কোথা থেকে শুরু হয়, কখন শুরু হয়,কোথায় কখন শেষ হয়, আগে এরকম কোনও কষ্ট উদয় হয়েছে কি না, এই কষ্ট ছাড়া আর কোনও কষ্ট আছে কি না কোথাও, আত্মীয় স্বজনের কারও এই কষ্ট আছে কি না, কখনও ছিল কি না ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যাদি তথ্য নথিবদ্ধ করার পর আমাকে খালি চোখে দেখতে হবে কষ্টের জায়গাটি দেখতে কেমন, হাত দিতে হবে জায়গাটিতে, হাত দেওয়ারও নিয়ম আছে, সবগুলো আঙুলের মাথা দিয়ে চেপে চেপে এক কোণ থেকে আরেক কোণে যেতে হবে,অনুভব করতে হবে ঠিক কি রকম এই কষ্টের জিনিসটি, একটি গোলআলুর মত নাকি একটি তরমুজের মত এর আকৃতি, আমাকে অনুভব করতে হবে আশে পাশে নড়ছে কি না নাকি জগদ্দল পাথরের মত স্থির হয়ে আছে জিনিসটি, হাতে চাপ দেওয়ার সময় আমার এক চোখ থাকা চাই পেটের দিকে, আরেক চোখ রোগীর চোখে, দেখতে হবে রোগী চোখ কুঁচকোচ্ছে কি না ব্যথায়, কি থেকে এই গোলআলু বা তরমুজের উৎপত্তি হল তা বুঝতে আমাকে পেটের সর্বত্র দেখতে হবে যে জিনিসগুলো আছে পেটে তা ঠিক ঠিক আছে কি না, ডানদিকে চেপে চেপে লিভার, পেটের দু কিনারে কিডনি। এরপর বাঁ হাত পেটের ওপর রেখে পেটের আগাপাস্তলা দেখতে হবে ডান আঙুলে সেই হাতের ওপর টোকা মেরে, কি রকম শব্দ আসছে, এ কি জলের শব্দ, না কি মনে হচ্ছে কোনও কাঠের ওপর বা পাথরের ওপর টোকা দিচ্ছি। এরপর পকেট থেকে স্টেথোসকোপ বের করে কানে শুনতে হবে কি রকম শব্দ আসছে, পেটের নালি থেকে ভুরুৎ ভুরুৎ শব্দ আসা মানে নালির কাজ নালি করে যাচ্ছে, শব্দ না আসা মানে কোথাও বাধা পড়েছে চলাচল, কোথায়

বাধা পড়েছে, তাহলে কি এই রোগটির নাম ইনটেসটিনাল অবস্ট্রাকশান! গোলআলুর মত যে পিণ্ডটি সেটি কি নালি পেঁচিয়ে জড়ো হয়ে যাওয়া কিছু, তা যদি না হয় নালির ভেতর কি মল জমে পিণ্ড তৈরি করেছে, নাকি কৃমি! কেবল এটুকু করে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে ডায়াগনোসিস লিখে দিলে হবে না। রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে হবে। স্নায়ুতন্ত্র ঠিক ঠিক আছে কি না, রোগীর ভেতরের সমস্ত প্রত্যঙ্গ এবং প্রণালি ঠিক কি না, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস সব ঠিক ঠিক চলছে কি না সব। আঙুলে যন্ত্রণা নিয়ে কোনও রোগী এলেও মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরীক্ষা করতে হবে। সার্জারি বর্হির্বিভাগে সার্জারি ক্লাস করতে প্রথমদিন ঢুকেই দেখি লুঙ্গি খোলা এক লোক বিছানায় শুয়ে আছে। বর্হির্বিভাগের ডাক্তার লোকের নিম্নাঙ্গর অসুখ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দেবেন। অসুখটির নাম হাইড্রোসিল। পুরুষাঙ্গের নিচের থলেতে জল জমে কুমড়োর মত ফুলে উঠেছে। ডাক্তারের উপদেশ হচ্ছে ফুলে ওঠা জিনিসটিতে তাকিয়ে থাকো। আমার চোখ বার বার সরে আসে কুমড়ো থেকে। সরে আসে বলেই সম্ভবত তিনি আমাকেই ডাকেন জিনিসটি হাতে ধরে পরীক্ষা করতে, ডাক্তারের জিজ্ঞাসা কনসিসটিনসি দেখ। আমি এক পা যাই তো দু পা পেছোই। *কিন্তু উপায় নেই গোলাম হোসেন!* তোমাকে স্পর্শ করতেই হবে জিনিসটি। দুহাতে ধরে চেপে চুপে আমাকে বলতে হচ্ছে থলেটি নরম নাকি শক্ত বোধ হচ্ছে। এরপর হাত রেখে হাতের পিঠে টোকা দিয়ে ঢুপ্পুস ঢুপ্পুস শব্দ শুনে বলে দিচ্ছি ভেতরে জল আছে। লোকটি, বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে এদিক ওদিক সরিয়ে নিচ্ছিল শরীর। একটি মেয়ে তার গোপনাঙ্গ ঘাটাছে, লোকটির জন্য ঘটনাটি অস্বস্তিকর বটে। কিন্তু লোকটিকে গা পেতে দিতেই হয়। ডাক্তার অথবা হতে-যাওয়া-ডাক্তারদের কাছে লজ্জার কিছু নেই। চর্ম ও যৌনবিভাগের বর্হির্বিভাগে রোগীদেরও লজ্জা ভেঙ্গে জীবনের গোপন কাহিনী আর কারও কাছে না বলুক আমাদের কাছে বলতে হয়। যৌনবিভাগের ডাক্তার শিখিয়ে দিচ্ছেন রোগীর পেট থেকে কি করে কথা বের করতে হয়। পুরুষাঙ্গে ঘা নিয়ে রোগি এল, ডাক্তারের প্রশ্ন *কি, বাইরের মেয়েমানুষের সাথে মেলামেশা করেন নাকি?* রোগী প্রথম বলবে *না। কোনওদিন না। মেলামেশা* যা করার সে তার বউএর সঙ্গে করে, আর বউ যদি তার না থাকে তবে তো কোনওরকম *মেলামেশার* প্রশ্ন ওঠে না। এরপর সত্য কথা না বললে যে চিকিৎসা হবে না সে কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিলে লোক অনেকক্ষণ সময় নেয়, মাথা চুলকোয়, ঠোঁটে একটি না হাসি না কান্না ঝুলিয়ে বড় একটি শ্বাস নিয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেলে যে সে মেলামেশা করে অর্থাৎ গণিকাসঙ্গমে অভ্যস্ত সে। ডাক্তার বলেন, লিখে দাও *হিস্ট্রি অব এক্সপোজার* আছে। রক্তের ভিডিআরএল করতে পাঠিয়ে দাও। লিখে দিলে লোক কাগজ হাতে নিয়ে চলে যায়। পরীক্ষার ফল নিয়ে আসার পর ওষুধ লেখা হবে। যৌন বর্হির্বিভাগে বসে *মেলামেশা* শব্দটি আমাদের রপ্ত করতে হয়। এসব রোগী আমরা দূর থেকে দেখি, ছুঁতে নেই, নোংরা সংক্রামক জিনিস কখনো ছুঁতে নেই, তাই রোগীর হাওয়াও যেন শরীরে না লাগে এমন দূরে নিরাপদে দাঁড়াতে হয় আমাদের। ডাক্তার রোগীর শরীর স্পর্শ করার প্রয়োজন মনে করলে হাতে গ্লাবস পরে নেন। সিফিলিস গনোরিয়ার রোগীরা দেখতে কুৎসিত, দাঁতাল, চোখে শেয়ালের চাউনি, দেখেই বলে দেওয়া যায় যে লোকের পুরুষাঙ্গের ঘাটি সিফিলিসের ঘা। ঘরে বউ আছে এমন লোক এসে যখন চিকিৎসা নিয়ে যায়, ডাক্তার বলে দেন, বউকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করিয়ে যেতে। তারা কথা দেয়, কিন্তু বেশিরভাগ রোগিই বউ নিয়ে দ্বিতীয়বার আসে না। তারা কথা দেয় কসম কেটে বলে জীবনে আর গণিকাসঙ্গমে যাবে না। কিন্তু এক রোগী আবারও আসে আবার সিফিলিসের ঘা নিয়ে। ঘরের নিরীহ বউদের কথা ভেবে

এইসব দাঁতাল গুলোর ওপর আমার রাগ হয়। ডাক্তারকে একবার বলেও ফেলেছিলাম, *এদেরকে জেলে পাঠানো যায় না? নিশ্চয়ই বউগুলো চিকিৎসাহীন থেকে থেকে নিউরোসিফিলিস বাঁধাচ্ছে।* কে শোনে আমার কথা, ডাক্তারের কাজ ডাক্তারি করা। সিফিলিসের ঘা নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মেয়ে-রোগিও আসে। রোগ এসেছে স্বামীর কাছ থেকে। মেয়ের তো বটেই, কোলের বাচ্চার রক্ত পরীক্ষা করেও দেখা যায় ভিডিআরএল পজেটিভ। এই রোগীদের চিকিৎসা যখন দিই, সঙ্গে একটি উপদেশও জোর গলায় দিই, *বদমাইশ স্বামীর সঙ্গে আপনি আর থাইকেন না। আপনের স্বামী আপনের সর্বনাশ করছে, স্বামীরে আপনি তালাক দেন।* এরা আমার উপদেশ কতটা মানে তা আমার জানা হয় না, কিন্তু উপদেশটি না দিয়ে আমি পারি না।

জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মানুষটি বাবা।তিনি ক্লাস নেন আমাদের। সকালে ক্লাস থাকলে প্রায়ই বাবা আর আমি এক রিক্সা করেই কলেজে যাই। নাম ডাকার সময় আর সবার মত বাবাকে আমিও *ইয়েস স্যার* বলি। আমার শিক্ষক-পিতা চমৎকার পড়ান। বাবার যে সহকারি অধ্যাপক আছেন, তিনি পড়াতে এলে অবশ্য ছাত্রছাত্রীসংখ্যা ক্লাসে থাকে হাতে গোনা। বাবাকে খুব সহজ সরল হাসিখুশি শিক্ষক হিসেবে বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীরা। কেউ কেউ অবশ্য বলে *খুব কড়া।* পরীক্ষার সময় বলা হয়, বাবা *ইন্টারনাল* হিসেবে খুব ভাল, নিজের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাশ করাবার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু *এক্সটারনাল* হিসেবে নাকি বাবা রজব আলী থাকেন না, *গজব আলী* হয়ে ওঠেন। বাবা রজব আলীর চেয়ে শিক্ষক রজব আলীকে আমার ভাল লাগে বেশি। বাবা প্রথম দিনই একটা কথা বললেন ক্লাসে, বললেন, *পচা শামুকে পা কাটার মত লজ্জা আর নেই, জানো তো! ফরেনসিক মেডিসিনে ফেল করা মানে, পচা শামুকে পা কাটা। কাটো কাটো ইজ্জত থাকে এমন কিছুতে কাটো। সার্জারিতে ফেল কর, মেডিসিনে ফেল কর, কঠিন সাবজেক্ট, ঠিক আছে, ফেল করা মানায়। কিন্তু ফরেনসিক মেডিসিনে, মাথায় এক ছটাক ঘিলু থাকলে কেউ ফেল করে না।* শিক্ষক রজব আলীর ঘরে গেলে তিনি আমাকে নির্মল একটি হাসি সহ স্বাগত জানান, বেল টিপে বেয়ারা ডেকে চা আনতে বলেন আমার জন্য। কি ক্লাস হল, কোন শিক্ষক কি পড়ালো ইত্যাদি জিজ্ঞেস করেন। আমারও চিকিৎসাবিদ্যার নানা বিষয়ে অজস্র প্রশ্ন থাকে, করি। এই বয়সেও বাবার বই পড়ার শখ মেটেনি, তিনি এনাটমি থেকে শুরু করেন মেডিসিন সার্জারি সব বইই কাছে রাখেন, সময় পেলেই পড়েন। চিকিৎসাবিদ্যার এমন কোনও বিষয় নেই যে তিনি গড়গড় করে উত্তর দিতে না পারেন। শিক্ষক বাবা পরিশ্রমী, নিষ্ঠ, শিষ্ট, মিষ্ট,বিনত, বিনম্র। শিক্ষক বাবার জন্য আমার গর্ব হয়। পোস্ট মর্টেম দেখার জন্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের যেতে হয় সূর্যকান্ত হাসপাতালের লাশকাটা এলাকায়। ওখানে ডোম লাশ কাটে, আর পাশে দাঁড়িয়ে বাবা লাশের শরীরের ভেতর বাহিরের কি কি পরীক্ষা করতে হয়, কি করে খুঁজতে হয় মৃত্যুর কারণ, ছাত্রছাত্রীদের বলে দেন। আমরা নাকে রুমাল চেপে পচে ফুলে ওঠা লাশ দেখি, বাবা আর ডোমের জন্য কোনও রুমাল দরকার হয় না। ডোম দেখলে আমার খলিলুল্লাহর কথা মনে পড়ে। খলিলুল্লাহ এরকমই ডোম ছিল, লাশ কেটে লাশের কলজে খেত সে, খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর মায়েরা ভূতের ভয় দেখানোর বদলে খলিলুল্লাহর ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়াতে শুরু করেছে। ক্লাসের মেয়েরা যখন বলে, *রজবআলী স্যার এত ভাল!* আমার পুলক লাগে। পুলক লাগে যখন বাবার সঙ্গে কলেজ চত্বরে দেখা হয়, দুজনে মধুর বাক্য বিনিময় করি। অবকাশের *হিংস্র বাঘ* কলেজে এসে *মাটির মানুষ।* মুখে হাসি লেগেই থাকে, পচা শামুকের বিদ্যা বিতরণ করেন তিনি। বিদ্যা আর কি! খুনোখুনির

কারবার, কী ধরণের অস্ত্র আছে, কোন অস্ত্রে কেমন ধার, কোন দায়ে কেমন কোপ, কোন বুলেটে কেমন ক্ষত, কোনটি আত্মহত্যা, কোনটি খুন, কোনটি দুর্ঘটনা, এসব। একবার পঁচিশ বছরের এক মেয়ের দেহের পোস্ট মর্টেম দেখাচ্ছেন বাবা, খুন কি আত্মহত্যা, তা বের করতে হবে। ঘচঘচ করে দশ পনেরোদিনের মড়ার বুক চিরে ফেলল ডোম, বাবা অমন বমি আসা গন্ধের সামনে মড়ার ওপর ঝুঁকে, সামনে পেছনে ঘুরিয়ে, পরীক্ষা করে বলে দিলেন খুন করা হয়েছে। কী করে খুন? খুব সোজা। মাথায় কোপ, বাবা কোপের চিহ্ন দেখালেন। নিজের মাথার পেছনদিকে দায়ের কোপ দিতে পারে না কেউ, সুতরাং কোনও কারণেই এটি আত্মহত্যা নয়। আরেকটি মেয়েকেও, বলা হয়েছিল, গলায় দড়ি বেঁধে আমগাছে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে, বাবা হাতে পায়ে পেটে বুকে নখের আঁচড় দেখে বললেন একে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের লিখতে হয় এসবের সুরতহাল রিপোর্ট। ক্রমে *পচা শামুকে* আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে। বাবা আমার এই উৎসাহে মোটেও ঘি ঢালেন না, বলেন, *যেইডা কাজে লাগব সেইটা পড়, সার্জারি মেডিসিন পড়, গায়নোকলজি পড়।* আমার মন পড়ে থাকে মেয়েদুটোয়, কে কোপ বসালো ওই পঁচিশ বছর বয়সী মেয়েটির মাথায়, কে-ই বা নিরীহ গ্রামের কিশোরীটিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে! দরজায় *বিভাগীয় প্রধান* লেখা বাবার ঘরটিতে ঢুকে মাঝে মধ্যে দেখি অল্প বয়সী মেয়েরা বসে আছে। বাবা এক এক করে পর্দার আড়ালে নিয়ে ওদের দেখছেন। মেয়েরা চলে গেলে *মেয়েরা কেন এসেছিল, কী পরীক্ষা করতে* জিজ্ঞেস করলে, বাবা বলেন *রেপ কেইস।* বাবা আগের চেয়ে অনেক সহজ আমার কাছে। খুব সহজে তিনি শরীর এবং যৌনতা বিষয়ে আমার সঙ্গে ডাক্তারি ভাষায় কথা বলেন, অবশ্য ইংরেজির আশ্রয় নিয়ে। আমার জানতে ইচ্ছে হয় কে ওই মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, এসবের উত্তর তিনি দেন না। কারণ এসব *মামলার বিষয়, ডাক্তারির বিষয়* নয়।

বাবা প্রায়ই মামলার সাক্ষী হতে আদালতে যান। প্রায়ই বাবাকে খুঁজতে অচেনা অচেনা লোক আসে বাড়িতে। *এরা কারা?* মা বলেন, *তর বাবা সাক্ষী দেয় তো। পোস্ট মর্টেমের ব্যাপারে আসে।*

আমার উৎসাহ তিড়িংবিড়িং করে লাফায়। পোস্ট মর্টেমের ব্যাপারে লোকেরা বাবার কাছে আসবে কেন, বাবার সঙ্গে বারান্দার ঘরে বসে নিচু স্বরে কথা কি বলে ওরা, জানতে ইচ্ছে হয়। লক্ষ করি বাড়িতে নানা রকম জিনিস পৌঁছে দিচ্ছে অচেনা অচেনা লোকেরা। বাবা এক দুপুরে বাড়ি নেই, একটি লুঙ্গি পরা, মোচঅলা লোক এসে বলল, *ডাক্তার সাইব আছে?*

নাই।

আইচ্ছা, আমার পুকুরের মাছ চাইরটা রাখেন। বলে চারটে বড় রুই মাছ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে এক অচেনা লোকটি চলে গেল।

আমি খুশিতে বাগ বাগ চারটে রুই মাছ নিয়ে দৌড়ে রান্নাঘর, *মা ধর, এক বেটা মাছ দিয়া গেল।*

কে দিল, চিনস?

না।

রাখলি কেন?

বাহ দিল যে।

দিলেই রাখবি?

কেন কি হইছে? মাঝে মাঝে বাবার রোগীরা ত দিয়া যায়।

আর মাছ টাছ রাখবি না। শত সাধলেও না।

মার মুখ থমথম করে। মাছগুলো থেকে দুহাত দূরে সরে বলেন, *এইসব মাছ খাওয়া অন্যায়।*

অন্যায় কেন?

পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট পাল্টাইতে তর বাবার কাছে তদবির করতে আসে এইসব লোক।

আমার মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় শতরকম ভাবনা।

কোন দল আসে? যারা অন্যায় করে, না যারা নির্দোষ?

তা জানি না।

মা কি কোনও কথা লুকিয়ে রাখছেন পেটে! মার তো লুকোনোর পেট না মোটে।

যারা নির্দোষ, তারা খুশি হইয়া কিছু দিলে ত ক্ষতি নাই, মা শ্লথবেশে শ্লথপায়ে কলপারের দিকে যেতে যেতে শ্লেষকণ্ঠে বলেন, *দুই দলই আসে।*

বাবা কি মিথ্যা রিপোর্ট দেন?

তা আমি কি কইরা জানব? আমি কি কোর্টে যাই দেখতে?

মাছ শেষ পর্যন্ত রাঁধা হয়েছে। মা ওসব ছুঁয়েও দেখেননি। বাবা খেতে বসে, পাতে মাছের বড় বড় টুকরো নিয়ে বললেন, *মাছ কোত্থেকা পাইলা?*

মা বললেন , *এক লোক আইসা দিয়া গেছে।*

শুনে কেশে পরিষ্কার গলা আরও পরিষ্কার করে বাবা বলেন, *মাছটায় ধইন্যা পাতা না দিলে স্বাদ হইত বেশি।*

আমি তখনও ভাবছি, আত্মহত্যার পক্ষের লোকগুলো কি ঘুষ দিয়ে বাবাকে *খুন* বাদ দিয়ে *আত্মহত্যা* লিখে দিতে বলে? বাবা কি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘুষ খান। আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না, বাবা এমন অসৎ হতে পারেন।

কিন্তু শরাফ মামা যেদিন মার পরনে ছেঁড়া শাড়ি দেখে বললেন, *এত ফকিরনির মত থাকো বড়বু। আর এইদিকে দুলাভাই ত হেভি টাকা কামাইতাছে। দেখলাম এক লোক টাকার বুন্দা দিয়া গেল। পোস্ট মর্টেম করে ত! এখন ত টাকার পাহাড় হইয়া গেছে। আর তোমারে একখান শাড়ি কিইন্যা দেয় না!*

আমি বললাম, *পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট মিথ্যা লেখা যায় না শরাফ মামা, হুদাই বাবারে দোষ দিও না।*

শরাফ মামা কাষ্ঠহাসি ছড়িয়ে বললেন, *আরে ঘুষ দিয়া ডাক্তারেরা এই চাকরি লয়, পোস্ট মর্টেম করা মানে কোটিপতি হইয়া যাওয়া। ডাক্তারের কলমের ডগায় মাইনষের জীবন মরণ।*

টাকাটা দেয় কেডা?

টাকা দেয় দুই দলই। মামলায় ফাঁসছে যে, মামলা করছে যে। দুলাভাই নান্দাইল ত পুরাডাই কিনা ফেলল।

বাবার ওপর আমার ঘৃণা জন্মাতে থাকে। যে লোকটি একশ একটা মনীষীদের বাক্য আওড়ান সারাদিন, আর ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য হেন কাজ নেই যে না করছেন, আর তিনি বাদি বিবাদি দু পক্ষ থেকে টাকা নিয়ে আদালতে যাচ্ছেন!

দাদকে জিজ্ঞেস করলাম, *তুমি জানো কিছু ?*

দাদা বলে দিলেন, *আজে বাজে কথায় কান দিস না। বাবা ঘুষ খায় না।*

জানো কি কইরা ঘুষ খায় না? ওইদিন যে মাছ দিয়া গেল, মাছ ত ঘুষ ছিল।

কোন মাছ?

কোন মাছ জানো না? রুই মাছ। খাইলা ত মজা কইরা।

আহ খুব স্বাদ ছিল মাছটা। আসলে মাছটা ভুনা করলে ভাল হইত আরও।

বাবার ঘুষ খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারটি আমার কাছে রহস্য থেকে যায়। এত কাছের মানুষ, এক বাড়িতে জীবন যাপন, অথচ বাবাকে আমার সবচেয়ে বেশি দূরের মানুষ মনে হয়। আসলে বাবার কিছুই আমার জানা হয় না। জানি বা জেনেছি বলে মাঝে মাঝে ভুল করি। বাবা কখন কাকে কাছে টানবেন, কখন দূরে সরাবেন, আমি কেন, বাড়ির কেউ জানে না, মাও না। মা হয়ত কখনও কুঁচি কেটে শাড়ি পরে পানের রসে ঠোঁট লাল করে মিষ্টি মিষ্টি হেসে বাবার সামনে গেলেন, বাবা ধমকে মাকে সরিয়ে দিলেন। এমন অনেক হয়েছে, যে বাবার কাপড় চোপড় ধুয়ে, আলনায় ভাঁজ করে রাখলেন মা, সারাদিন ধরে ঘর ধুয়ে মুছে, বন্ধ দরজা জানালা খুলে আলো বাতাস ঢুকিয়ে, দেয়ালের কোণ থেকে খাট সরিয়ে জানালার কাছে রাখলেন, ধোয়া চাদর বিছিয়ে দিলেন বিছানায়, দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন বাবার, বাবা আসবেন, দেখবেন, ভাল লাগবে। বাবা বাড়ি ফিরে, ঘরের অবস্থা দেখে চেঁচিয়ে বলেন, *আমার ঘর নষ্ট করছে কে?* টেনে খাটখানা সরিয়ে আগের জায়গায় রাখেন। খটাশ খটাশ করে জানালাগুলো বন্ধ করে দেন। বিছানার চাদর একটানে সরিয়ে দেন।

আমার ঘর আমি যেমনে রাখি, ঠিক তেমন ভাবেই যেন থাকে।

মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন দেখে। মার কিছুই বাবার পছন্দ হয় না।

কখনও হয়ত তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে মা একে গাল দিচ্ছেন, ওকে গাল দিচ্ছেন। বাবা নরম গলায় ডাকলেন, *ঈদুন আসো তো, কথা শুইনা যাও।* ঈদুনের তখন কারও কথা শুনতে ভাল লাগছে না। বাবা আরও নরম গলায় ডাকেন *ঈদুন ঈদুন।*

বাবা আচমকা অসময়ে বাড়ি ঢুকে দেখলেন, আমি লেখাপড়া করছি, আর ইয়াসমিন ধুলোয় খেলছে। ইয়াসমিন তটস্থ হয়ে রইল, আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত যে বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেবেন। কিন্তু বাবা আমাকেই দাঁত খিঁচিয়ে বললেন *খালি বইয়ের দিকে গাধার মত চাইয়া থাকলে হইব না, মাথায় যেন ঢুকে যা পড়তাছস।* আর ইয়াসমিনকে বলে গেলেন, *লিচু খাইবা মা? তোমার জন্য এক্ষুনি লিচু পাঠাইয়া দিতাছি।*

রহস্যে ঘেরা বাবা দূরেই থেকে যান, তাঁকে আমার চেনা হয় না, বোঝা হয় না। বাবার বিয়ের ব্যাপারটিও রহস্যময়। মা বলেন, লোকে বলে বাবা বিয়ে করেছেন রাজিয়া বেগমকে। বাবা কিন্তু কখনও রাজিয়া বেগমকে বাড়ি এনে বলেননি, *এই আমার বউ।* আর কখনও বাড়ি ছাড়া বাবা অন্য কোথাও রাতও কাটাননি, যখন ময়মনসিংহে থাকেন। কী করে বুঝি!

মাকে বলেছিলাম, *মা এই যে কও বাবা বিয়া করছে, কই বাবা তো ওই রাজিয়া বেগমের বাড়িতে কখনও থাকে না।*

রাইতে এই বাড়িতে থাকে, কারণ তর বাবা না থাকলে এই বাড়িতে চুরি হয়। যতবারই এই বাড়িতে চুরি হইছে, তর বাবা ছিল না বাড়িত। চোর খেদানোর লাইগা তর বাবা রাইতে বাড়িত ফিরে।

তাইলে রাজিয়া বেগমের বাড়িতে চোর খেদায় কে?

মা হেসে বলেন *ওই বেটিরে দেখলে চোর নিজেই ডরাইব!*

বাবার রহস্য যতই দেখি, ততই ইচ্ছে করে তাঁর ঘরের মতই অন্ধকার তাঁর রহস্যের

চাদরখানা সরাই। মার ছোটখাট দুঃখগুলো, সুখগুলো এত চেনা, মার ঠোঁটের হাসি, বিরক্তি, এসবের কারণ এত স্পষ্ট, মা যেন *পড়ে ফেলা বই, লিখে ফেলা খাতা।* মা আমাকে কৌতুহলি করে না, করে বাবা। মার ভালবাসা না চাইলেই পাওয়া যায়, বাবার ভালবাসা পেতে সাধনার প্রয়োজন। এরপরও নিশ্চিত হওয়া যায় না যে পাবই। জীবন নিয়ে অনেকটা জুয়ো খেলার মত। মার অঢেল ভালবাসা চোখে পড়ে না, বাবার দু মুহূর্তের নরম সুরের ডাক সারাদিনের জন্য মন ভাল করে দেয়।

মা বলেন *মেয়েদের একটু বাবার দিকে টান বেশিই থাকে।*

আমি জিজ্ঞেস করি, *তাহলে কি ছেলেদের মায়ের দিকে বেশি?*

মার মুখে আজকাল উত্তর নেই এর।

ছোটদা এ বাড়িতে বউ নিয়ে বেড়াতে এলে, বউ নিয়েই ঘরে শুয়ে থাকেন, অথবা বেরিয়ে যান একসঙ্গে। মার বড় শখ, ছোটদাকে পাশে বসিয়ে গল্প করেন, ছোটদার সময় নেই। বিয়ে করার পর দাদারও সময় হয় না।.

বাবা যে বিষয়গুলোয় মন দেওয়ার জন্য বলেছেন, সে বিষয়গুলোর ক্লাস হয় রাতেও, হাসপাতালে। আমাকে প্রতি সন্ধেবেলা তিনি দিয়ে আসেন, আবার নিয়েও আসেন। রোগী বসে থাকে চেম্বারে, সেসব ফেলেই তিনি চলে আসেন এই কাজটি করতে। রহস্যে মোড়া বাবার ভালবাসা আমি টের পাই। তিনি আমাকে বলেন, আমি তাঁর স্বপ্ন পুরণ করছি, আমিই তাঁর মান সম্মান রাখছি, আমিই তাকে পিতা হিসেবে গৌরব দিচ্ছি। শুনে মন থেকে ঘুষের কারণে বাবার জন্য জন্মানো ঘৃণার পিণ্ডটি হৃদয় ফসকে পড়ে যায় ধুলোর রাস্তায়। আমার কষ্ট হতে থাকে বাবার জন্য। কষ্ট হতে থাকে কারণ একদিন তাঁকে বলতে হবে যে কাউকে না জানিয়ে আমি এক দাড়িঅলা লোককে বিয়ে করেছি, লোকটি লম্বায় আমার চেয়ে খাটো, লোকটি সাধারণ এমএও পাশ করেনি, কবিতা লেখা লোকটির পেশা, যে পেশায় মাসে দুশ টাকাও লোকটির আয় হয় না। কোন আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে দেব বাবার মান সম্মান, বাবার গৌরব! আমি যত মনোযোগী হই লেখাপড়ায়, বাবার স্বপ্নের গোড়ায় তা জল সারের মত হয়ে চারা লকলক করে বড় হয়, বৃক্ষ হয়। যত বেশি বৃক্ষ হয়, তত আমার ভয় হয় যে নিজ হাতে এই বৃক্ষটি আমাকে উপড়ে ফেলতে হবে একদিন! দাদা বা ছোটদা কেউ বাবাকে সুখী করতে পারেনি। এক আমিই আছি সুখী করার। কিন্তু সুখের মাথায় পেছন থেকে যেদিন আমাকে কোপ বসাতে হবে! স্বস্তির গলা ফাঁস লাগিয়ে যেদিন ঝুলিয়ে রাখতে হবে! কি করে এই কাজটি আমি করব! নিজের ওপর বড় রাগ হয় আমার। বাবা যত আমাকে ভালবাসেন, তত নিজের ওপর ভালবাসা আমার উবে যেতে থাকে! বাবা আমাকে সারাপথ, মেডিসিনের *লিভার সিরোসিস* আজ যদি পড়ানো হয়, সেটি নিয়ে এমন চমৎকার বলতে থাকেন যে রিক্সায় বসে বাবার কাছ থেকে শুনে আমার যা শেখা হয়, সে শেখা বইপড়ে বা অধ্যাপকদের বড় বড় লেকচার শুনে হয় না। বাবার দোষগুলো আমি ছুঁড়ে দিতে থাকি গাঢ় অন্ধকারের দিকে যেন কেউ দেখতে না পায়। বাবাকে আমি *বাবা* বলে ডাকি না, *তুমি* বা *আপনি* কোনও সম্বোধনই করি না। তবু বাবাকেই মনে হতে থাকে আমার সবচেয়ে আপন। সম্বোধন না করার এই রোগটি বড় অদ্ভুত আমার। নানা নানি বড় মামা ফজলিখালা রুনুখালা ঝুনুখালা হাশেমমামা ফখরুল মামা কাউকে আমি কোনও সম্বোধন করি না। সবার সঙ্গেই কথা বলি, বলি ভাববাচ্যে। ভাববাচ্যে কথা বললে অনেক সময় কথা খোলসা করে বলা হয় না, সম্ভব নয়। আমি অনেক চেষ্টা করেছি ভাববাচ্য থেকে নিজেকে মুক্ত করতে, পারিনি। বড় হয়ে অনেকদিন ভেবেছি, কেন আমি ওঁদের সঙ্গে ভাববাচ্যে কথা বলি, কি কারণে! যখন ছোট ছিলাম,

ওঁরা কি আমাকে ধমক দিতেন বা চড় কষাতেন, বা আড়ালে নিয়ে গিয়ে কান মলে দিতেন যে অভিমান করে কিছু ডাকিনি, আর না ডাকতে ডাকতে অভ্যেস হয়ে গিয়েছে না ডাকা! বড় হয়ে চাইলেও আর ডাক ফিরিয়ে আনতে পারিনি! মাকে দাদাকে ছোটদাকে সম্বোধন করি, তুমি বলি। বাবাকে চিরকালই দূরের মানুষ বলে মনে হত, বাবাকে সম্বোধন করি নি। কিন্তু নানিবাড়িতে বেড়ে ওঠা মেয়ে আমি, শরাফ মামাকে, ফেলু মামাকে ছটকুকে সম্বোধন করি, তুমি বলি। বাকিরা যাঁরা কাছে ছিলেন, তাদের কেন সম্বোধন করা হয়নি আমার, কাছে থাকলেও ওঁদের খুব দূরের মনে হত কি!

যে বিষয়গুলোকে জরুরি বলে বাবা আমাকে মন দিয়ে পড়তে বলেছেন, সেগুলোর জন্য সামনে আরও বছর পড়ে আছে বলে আমি রুদ্রে মন দিই। রুদ্র একটি নিষিদ্ধ ঘটনা আমার জীবনে, গভীর গোপন নিভৃত আনন্দ। রুদ্রর প্রতি আকর্ষণ এত তীব্র যে রুদ্রর চিঠি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখের রিনরিন সুর বাজে প্রাণে, সেদিন আমি সারাদিন ভাল থাকি। *ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম*, রুদ্রর দ্বিতীয় বই, মুহম্মদ নুরুল হুদার দ্রাবিড় প্রকাশনী থেকে বের হওয়া বই। দ্রাবিড় থেকে আরও কয়েকটি বই বের হয়েছে। রুদ্রর সঙ্গে মুহম্মদ নুরুল হুদার সম্পর্ক বেশ ভাল, ভাল বলেই রুদ্র এখন হল ছেড়ে বাসাবোতে নূরুল হুদার বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। আগে ছিল সিদ্ধেশ্বরীতে তার এক বন্ধুর বাড়ি, সেটি ছেড়ে উঠেছিল ফজলুল হক হলে, হল থেকে এখন ঘরে। সিদ্ধেশ্বরীর বাড়িটি কেন ছেড়েছিল! ছাড়তে হয়েছিল কাজী রোজির কারণে। কাজী রোজি কবি সিকান্দর আবু জাফরের বউ, রুদ্রকে নাকি বিরক্ত করত। রুদ্রর মত প্রতিভাবান তরুণের সঙ্গে ওই মধ্যবয়সী কাজী রোজি আগ্রহী ছিলেন হয়ত, কিন্তু তাই বলে রুদ্রর বাড়ি ছাড়তে হবে কেন? ব্যাপারটি বুঝিনি।

রুদ্রর এই বইটি তার আগের বইটির চেয়ে আকারে ছোট, বইয়ের প্রচ্ছদে একটি হাত, হাতের তলায় গাছের শেকড়। ভেতরে নিউজপ্রিন্টে ছাপা কবিতা। দেখতে বইটি দরিদ্র, কিন্তু ভেতরে কবিতাগুলো ঘুমের মানুষকে সজাগ করে দেয়। গ্রন্থসত্বে আমার নামটি। দেখে পুলক লাগে। গ্রন্থসত্ব ব্যাপারটির আসলে কোনও মানে নেই, এ দেশে যে কোনও লেখকই গ্রন্থসত্বের জায়গায় প্রিয় একটি নাম বসিয়ে দেয়, এর মানে এই নয় যে প্রকাশক কখনও সেই গ্রন্থসত্তের মানুষকে বই বিক্রির টাকা দিয়ে আসবে। যাই হোক, আমার পুলক লাগে। রুদ্রর কবিতাগুলো উচ্চস্বরে বাড়িতে পড়ি, ইচ্ছে হয় মঞ্চে উঠে তার কবিতাগুলো পড়ি, একশ মানুষ শুনুক। একশ মানুষ শিখুক প্রতিবাদের ভাষা। ময়মনসিংহের বিভিন্ন কবিতা অনুষ্ঠানে আমাকে প্রায়ই কবিতা পড়ার জন্য ডাকা হয়, মাঝে মাঝে গিয়ে কবিতা পড়ে আসি। রুদ্রর কখনও শোনা হয়নি আমার কবিতা পড়া, রুদ্রর পড়া আমি শুনেছি, ময়মনসিংহের একুশে ফেব্রুয়ারির এক অনুষ্ঠানে। চমৎকার আবৃত্তি করে রুদ্র। অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ে এসে রুদ্র বলে, *সবচেয়ে ভাল পড়েছি!* আমার ভাল লাগে শুনে। বইটি ছাপা হওয়ার পর সে পুঁথি পড়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকেরা যেভাবে সুর করে পুঁথি পড়ে, সেভাবে পড়ার জন্য সে লিখেছেও *রাস্তার কবিতা!* রুদ্র দরিদ্র বঞ্চিত নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষদের নিয়ে কবিতা লেখে, শাসকের বিরুদ্ধে শোষনের বিরুদ্ধে কবিতা। শ্রমজীবি মানুষের জন্য কবিতা। আমাকে উদ্বুদ্ধ করে রুদ্রর বোধ।

মনে করো তুমি যাচ্ছো, তুমি একা ..
তোমার হাতে আঙুলের মত শিকড়, যেন তা আঙুল
তোমার হাড়ে সঙ্গীতের মত ধ্বনি, যেন তা মজ্জা,

তোমার ত্বকে অনার্যের শোভা মসৃণ আর তামাটে
তুমি যাচ্ছো, মনে করো তুমি দুই হাজার বছর ধরে হেঁটে যাচ্ছো।
তোমার পিতার হত্যাকারী একজন আর্য
তোমার ভাইকে হত্যা করেছে একজন মোঘল
একজন ইংরেজ তোমার সর্বস্ব লুট করেছেড্ড
তুমি যাচ্ছো, তুমি একা, তুমি দুই হাজার বছর ধরে হেঁটে যাচ্ছো।
তোমার দক্ষিণে শবযাত্রা, তোমার উত্তরে মৃত্যুচিহ্ন,
তোমার পেছনে পরাজয় আর গ্লানি--তোমার সামনে?
তুমি যাচ্ছো, না না তুমি একা নও, তুমি আর ইতিহাসড্ড
মনে করো তাম্রলিপ্তি থেকে নৌবহর ছাড়ছে তোমার,
মনে করো ঘরে ঘরে তাঁতকল, আর তার নির্মাণের শব্দ
শুনতে শুনতে তুমি যাচ্ছো ভাটির এলাকা মহুয়ার দেশে,
মনে করো পালাগানের আসর, মনে করো সেই শ্যামল রমণী
তোমার বুকের কাছে নতচোখ, থরো থরো রক্তিম অধর--
তুমি যাচ্ছো, দুই হাজার বছর ধরে হেঁটে যাচ্ছো তুমি......।

বইটি আগাগোড়া পড়ি, একবার দুবার নয়, বার বার। ইয়াসমিনের গানের গলা যেমন ভাল, আবৃত্তিও করতে পারে ভাল। হাড়েরও ঘরখানি কবিতাটি আমার সঙ্গে ইয়াসমিনও আবৃত্তি করে।

বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
রাজনীতিকের ধমনী শিরায় সুবিধাবাদের পাপ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
বুদ্ধিজীবীর রক্তে স্নায়ুতে সচেতন অপরাধ
বেশ্যাকে তবু বিশ্বাস করা চলে
জাতির তরুণ রক্তে পুষেছে নিবীর্যের সাপ,
উদোম জীবন উল্টে রয়েছে মাঠে কাছিমের মত।

কোনো কথা নেই--কেউ বলে না, কোনো কথা নেই--কেউ চলে না,
কোনো কথা নেই--কেউ টলে না, কোনো কথা নেই--কেউ জ্বলে না--
কেউ বলে না, কেউ চলে না, কেউ টলে না, কেউ জ্বলে না।
যেন অন্ধ, চোখ বন্ধ, যেন খঞ্জ, হাত বান্ধা,
ভালোবাসাহীন, বুক ঘৃণাহীন, ভয়াবহ ঋণ
ঘাড়ে চাপানো--শুধু হাঁপানো, শুধু ফাঁপানো কথা কপচায়--
জলে হাতড়ায়, শোকে কাতরায় অতিমাত্রায় তবু জ্বলে না।
লোহু ঝরাবে, সব হারাবে--জাল ছিঁড়বে না য়ড়যন্ত্রের?
বুক ফাটাবে, ক্ষত টাটাবে--জাল ছিঁড়বে না ষড়যন্ত্রের?

ঝোপে জঙ্গলে আসে দঙ্গলে আসে গেরিলার
দল, হাতিয়ার হাতে চমকায়। হাতে ঝলসায়
রোষ প্রতিশোধ। শোধ রক্তের নেবে,তখতের
নেবে অধিকার। নামে ঝনঝায়-যদি জান যায়

যাক ক্ষতি নেই, ওঠে গর্জন, করে অর্জন মহা ক্ষমতার,
দিন আসবেই, দিন আসবেই, দিন সমতার।

সমতার দিনের জন্যও আমার ভেতরেও স্বপ্ন জন্মে। রুদ্র শেখ মুজিবর রহমান কর্ণেল তাহের আর সিরাজ শিকদারকে উৎসর্গ করেছিল ওর প্রথম বইটি, *হাড়েরও ঘরখানি* কবিতায় লিখেছে *হাজার সিরাজ মরে, হাজার মুজিব মরে, হাজার তাহের মরে, বেঁচে থাকে চাটুকার, পা চাটা কুকুর, বেঁচে থাকে ঘুণপোকা, বেঁচে থাকে সাপ।* যদিও মুজিব তাহের আর সিরাজ শিকদার এক দলের লোক নন, মুজিবের সঙ্গে সর্বহারা পার্টির সিরাজ শিকদারের বিরোধ ছিল, তিনি খুনও হয়েছেন, বলা হয় মুজিবের ষড়যন্ত্রে, কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রুদ্র যে কোনও মৃত্যুর বিরুদ্ধে, ঝড়ে বন্যায় ক্ষুধায় মন্বন্তরে পুষ্টিহীনতা জুলুমে জখমে দিতে তো হচ্ছেই প্রাণ, আর কত! *এবার জাতির রক্তে ফের অনাবিল মমতা আসুক, জাতির রক্তে ফের সুকঠোর সততা আসুক।*

অনেকদিন সেঁজুতি ছাপিনি। পড়া আর পরীক্ষার চাপে সম্ভব হয়নি। আবার উদ্যোগ নিই ছাপার। আবার রক্তে বান ডাকে। রুদ্র *মানুষের মানচিত্র* নামে সিরিজ কবিতা লিখে যাচ্ছে। ও থেকে কিছু নিয়ে আর নিজের কবিতা কিছু, কেবল দুজনের কবিতা দিয়ে সেঁজুতি। আগের সেঁজুতি, সেঁজুতির কাগজপত্র, লিটলম্যাগাজিনগুলো কোথায় কোন তলে পড়ে আছে, খবর নেই। টুকরো খবরের কিচ্ছু এবার আর থাকবে না, কারণ অনেক দূরে চলে এসেছি সেই জগত থেকে। কোথায় কে কোন লিটল ম্যাগ ছাপছে, কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কার কি লেখা বেরোলো, কোথায় কবিতা অনুষ্ঠানে কি আলোচনা হল, এসব এখন আমার আর জানা নেই। লিটল ম্যাগ আন্দোলন থেকে চিকিৎসাবিদ্যা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। বাংলা ১৩৮৮র হেমন্তে দীর্ঘ দুবছর পর সেঁজুতি। বই আকারে নয়, আগের সেই জমাখরচের লম্বা খাতার আকারে, এর কারণ, হাতে অত টাকা নেই। এবার আর দাদা কোনও টাকা খরচ করছেন না। প্রশ্নই ওঠে না। লুকিয়ে আমাকে লেখা রুদ্রর প্রেমের চিঠি পড়ে *রুদ্র* এই নামটি তিনি আর সহ্য করতে পারেন না। পারেন না যে তার একটি প্রমাণও দেখিয়েছেন, আমার ঘরে ঢুকে আমার লাল ডায়রিটি, যেটি তিনি দিয়েছিলেন আমাকে কবিতা লিখতে, সেটি এবং আরও কবিতার খাতাপত্র ছুঁড়ে একদিন ফেলে দিলেন বৃষ্টি পড়ে কাদা হয়ে থাকা উঠোনে। প্রতিবাদ করতে গেলে এমন জোরে চড় কষিয়েছেন গালে যে গাল লাল হয়ে ছিল দুদিন। সুতরাং গাঁটের পয়সা খরচ কর। গাঁটে পয়সা এসেছে মেডিকেল কলেজ থেকে বৃত্তির টাকা পেয়ে। ইন্টারমিডিয়েটে ভাল ফলের কারণে এই বৃত্তি। কলেজে কোনও বেতন দেওয়ার দরকার হয় না, তার ওপর টাকাও জোটে। এই বৃত্তির টাকা কখন পাচ্ছি, টাকা দিয়েই বা কি করব, সে কথা বাবাকে জানাই না। মেট্রিকের ভাল ফলের কারণে ইন্টারমিডিয়েটে যে বৃত্তি জুটেছিল, তাও বাবার হাতে লক্ষ্মী মেয়ের মত দিতে হয়েছে। এবার আর নয়। ঘটে বুদ্ধি এসেছে বলেই এখন বাড়ির সবার সামনে বৃত্তির টাকা পাওয়ার খবরটি ফলাও করে বলি, কেবল বাবার সামনে নয়। টাকা হাতে পেয়ে সেঁজুতি প্রেসে দিই। সি কে ঘোষ রোডের ছোটদার এক বন্ধুর প্রেস লিফা প্রিন্টার্সে দিই। খালেককে বলে কয়ে পিপুলস টেইলার্সের একটি বিজ্ঞাপন আদায় করি। বিজ্ঞাপনের টাকা পেতে পিপুলসে যেতে রিক্সাভাড়া খরচ হতে থাকে, খালেকের দেখা পাওয়া যায় না। *সেঁজুতিকে ভুলে থাকার স্পর্ধা করেছিলাম, আসলে তা ছিল নিজের ইচ্ছের সঙ্গে প্রতারণা করা। আর্থিক দৈন্যতায় কুষ্ঠরোগির মত কুঁকড়ে না থেকে প্রচণ্ড দাপটে প্রতিষ্ঠা করছি অনন্ত সুন্দর। বিক্ষোভের ভাষা না শিখে, দুমুঠোয় প্রতিবাদের শ্লোগান না তুলে যে কবি ভীরু কচ্ছপের মত নিজেকে আমূল গুটিয়ে নিয়ে*

সস্তা আবেগের মদ গিলে কবিতায় মাতলামি করে, আমি সেই স্বার্থলোভি সুবিধাভোগীকে আস্তাকুঁড় দেখিয়ে দেব, সেঁজুতি নয়। যে কবিতায় সাহসী উচ্চারণে লেখা শ্রমজীবী মানুষের জীবন যাপন, আমার নিদ্রার স্নায়ুতে লক্ষাধিক ঘুণ ঢেলে প্রচন্ড ক্ষুধায় গ্যাস্ট্রিক আলসার নিয়েও সংশোধন করব সেই কবিতার প্রুফ। দম্ভ আছে, তা ঠিক। আমার কবিতা, নিজেই লক্ষ করি বদলে গেছে অনেক, রুদ্রর অনুকরণ নয়, রুদ্রর কবিতার প্রখর প্রভাব। *পরানের গপ্প* নামে নিজের কয়েকটি কবিতা আছে এ সংখ্যায়, কবিতাগুলোয় শ্রমজীবি মানুষের ক্রন্দন, দরিদ্রের হাহাকার আর ধনী শোষকের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা থিকথিক করছে। রুদ্রর কটি *মানুষের মানচিত্র আছে,* আছে তার চৌকিদার।

বনের হরিণ নয়, বাঘ নয়, এত রাতে চৌকিদার চলে।
হোই কে যায়, কে যায়? গঞ্জের বাতাস ফেরে হিম নিরুত্তর,
কে যায়? কে যাবে আর!দশমির অন্ধকার একা একা যায়--
একা একা চৌকিদার আঁধারের বাঁকে বাঁকে নিজেকে তাড়ায়।

নিজেকেই প্রশ্ন করে কে যায়? কী নাম তোর? কোথায় থাকিস?
কী তুই পাহারা দিবি, জীবনের কতটুকু আগলাবি তুই!
ছিঁচকে সিঁদেল চোর, আর যেই চোর থাকে দিনের আলোয়?
আর যেই চোর থাকে দেহের ভেতর, শরীরের অন্ধকারে?

রাতের আঁধারে খুঁজে তারে তুই পাবি, চৌকিদার পাবি তারে?
যে চোর পাহারা দেয়, পাহারার নামে করে ভয়ানক চুরি,
চুরি করে মানুষের ঘিলু.মাংশ.রক্ত.হাড়.বুকের বাসনা,
তারে পাবি, যে তোর জীবন থেকে চুরি করে পূর্ণিমার রাত?

যে তোর জীবন থেকে চুরি করে রৌদ্রময় দিনের খোয়াব,
যে তোর শিশুর স্বাস্থ্য ,দুধভাত, চুরি করে বোনের সিঁদুর,
তারে পাবি, যে তোর গতর থেকে খুলে নেয় মানব-শরীর?
কিসের পাহারা তবে,কেন তবে রাতভর রাতকে তাড়ানো?

অন্ধকার পৃথিবীতে শুধু কিছু তারা জ্বলে দূরের নক্ষত্র
ঝিঁঝি ডাকে, পাটের পচানি থেকে গন্ধ আনে রাতের বাতাস।
নোতুন কবর খুঁড়ে শেয়ালেরা বের করে আধপচা লাশ
হোই কে যায়, কে যায়...পৃথিবীর অন্ধকারে চৌকিদার চলে।

জীবন এভাবেই যাচ্ছিল, কিছুটা রুদ্রে কিছুটা হাসপাতালে,বইপত্রে, রোগিতে কিছুটা অবকাশের কোলাহলে আর বিষণ্নতায়। এমন সময় একটি খবর আমাকে চমকে দেয়, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করেছেন চট্টগ্রাম সেনাবাহিনীর কমান্ডার অফিসার মেজর জেনারেল মঞ্জুর। সম্পূর্ণই একটি ব্যর্থ উদ্যোগ। মঞ্জুরের পক্ষে জিয়াকে হত্যা ছাড়া আর কিছু করা অর্জন হয় না। ঢাকা না হয়ে চট্টগ্রাম বলেই হয় না। জিয়া নিজে *খাল কেটে কুমির* এনেছিলেন প্রচুর, মঞ্জুর নিতান্তই একটি বাচ্চা কুমির। কামড় দিয়েছেন ঠিকই, তবে কিছু দুধের দাঁত ছিল বলে কামড় তেমন লাগেনি। তা না হলে মঞ্জুরই সে রাতে *কিছু একটা* হয়ে যেতে পারতেন, সামরিক

আইন জারি করে দেশের হর্তাকর্তা। কিন্তু তা না হয়ে ঘটনা ঘটল অন্যরকম, উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতির ভার গ্রহণ করতে হয়। গ্রহণ করা আর দেশ চালানো এক নয়, বুড়োকে সামনে বসিয়ে পেছনে বন্দুকঅলা জোয়ানেরা চালাচ্ছেন দেশ। দেশ কি আর চলছে!দেশ ভাসছে রক্তে। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা স্বাধীনতার গায়ে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ, স্বাধীনতার শরীরে কেবল মৃত্যুর গন্ধ। বাবাকে যদি জিয়াউর রহমানের সুরতহাল রিপোর্ট দিতে হত, তিনি বুলেট কটি গায়ে, হিশেব নিতেন। কি ধরনের বন্দুকের কি ধরনের গুলিতে কতটা দূর থেকে কতবার গুলি ছোঁড়া হয়েছে বলতে পারতেন। বাবা নিজের মন্তব্যে লিখতেন, *ইহা সুইসাইড নহে, ইহা হোমিসাইড।* যদি এই দেশটির সুরতহাল রিপোর্ট লিখতে বলা হয়, তবেও তো এরকম হোমিসাইড জাতীয় কিছু লেখা যায়। লেখা যায় আততায়ীরা দেশটির বক্ষ লক্ষ করে গুলি ছুঁড়ছে, ঝাঁঝড়া হয়ে গেছে দেশটির পাঁজর। পাঁজরের হাড়গুলো ভেঙে গেছে, মাংস ছিদ্র হয়ে গুলি ঢুকে গেছে ভেতরে, হৃদপিণ্ড থেমে আছে। থেমে আছে অনেক অনেকদিন।

এর পর খুব বেশিদিন সময় নেয়নি নেপথ্যের সেনাঅধিনায়কের *চেহারামোবারক* প্রদর্শন করতে। আরেকটি শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট ক্যু। দেশে সামরিক শাসন জারি হয়ে গেল। জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরশাদের যাত্রা শুরু হল। এক সেনা আরেক সেনার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলেন। মেজর জেনারেল মঞ্জুর এবং তার সঙ্গী সাথীকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়ে গেল। জিয়া যেমন জাতীয়তাবাদি দল তৈরি করে হ্যাঁ না ভোটের মাধ্যমে অবৈধ ক্ষমতা দখলকে বৈধ করেছিলেন, এরশাদও তেমন। এরশাদও একইরকম নিজের একটি দল গঠন করে রাজনীতিতে নেমে বৈধ করে নিলেন নিজের অবৈধ আগমন। *উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ!* সমাজতন্ত্র না থাক,তাই বলে কি যৎসামান্য গণতন্ত্রও দেশটির ভাগ্যে নেই! দেশের জন্য মায়া হয় আমার, দুশ্চিন্তা বাড়ে। যেসব রাজনৈতিক নেতা এক দল থেকে আরেক দলে নাম লেখায়, তারা, ক্ষমতায় যেই আসে, তার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। চরিত্রহীন ছাড়া এদের অন্য কিছু মনে হয় না আমার। একটি বিশ্বাস আমার ভেতর দিন দিন ঘনীভূত হয়, রাজনৈতিক নেতাদের এমন দুর্বল চরিত্রের কারণে সামরিক বাহিনীর স্পর্ধা হয় বন্দুকের নলের মুখে দেশের দখল নিতে।

রাজনীতি ভাবনা, কাব্য ভাবনা সব ভাবনা দূর করে আমাকে পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হয়। এ পরীক্ষায়, যেহেতু আমি পরীক্ষা দেব, বাবা পরীক্ষক হতে পারবেন না। পরীক্ষক হিসেবে তিনি অন্য কলেজে চলে গেলেন, এ কলেজে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে আসা নতুন অধ্যাপক আবদুল্লাহ, যাঁর ক্লাসে ছেলেমেয়েরা বেশির ভাগই প্রক্সি মেরে কেটে পড়ে, সহকারি অধ্যাপককে নিয়ে ইন্টারনাল পরীক্ষক হিসেবে রইলেন। আমার ক্লাসের বন্ধুরা *হায় হায়* করছে খবর শুনে, আমাকে দেখেই বলছে, *ধুৎ, তোমার কারণে রজব আলী স্যাররে আমরা পাচ্ছি না।* রজব আলী স্যার ইন্টারনাল হিসেবে ভাল, নিজের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাশ করানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, এ কথা কলেজের প্রায় সবাই জানে। কিন্তু নিয়ম তো পাল্টানো যাবে না, পুত্র-কন্যা পরীক্ষার্থী হলে পিতা বা মাতা পরীক্ষক হতে পারেন না। অসন্তুষ্ট ছাত্রছাত্রীরা *কড়া এক্সটারনাল* আর *মেন্দামারা ইন্টারনাল* এর সামনে মৌখিক দিল ভয়ে কেঁপে কেঁপে। কারওরই তখন মনে হয়নি বিষয়টি নিতান্তই গৌণ, পচা শামুক।

ডালিয়া জাহানের ঠিকানায় রুদ্রর চিঠি আসতে থাকে নিয়মিত। কখনও মোংলা বা মিঠেখালি থেকে, কখনও ঢাকা থেকে। রুদ্রর চিঠি হাতে নিয়ে টের পাই বুকের মধ্যে কেমন করা।চিঠি যেদিন পাই, এক অমল আনন্দ আমাকে সারাদিন ঘিরে থাকে।

তুমিহীন একটি মুহূর্ত এখন যে কত দুঃসহ তা তোমাকে কোনো ভাবেই বোঝাতে পারলাম না। তোমাকে ছাড়া আমার দিনগুলো যে কি রকম বিশৃঙ্খল আর কি রকম অসংযত তুমি তো তা বুঝতেই চাও না। জানি, অনেক সমস্যা আছে, এ মুহূর্তে তোমাকে কাছে পেতে গেলে হাজার হাজার সমস্যা জেঁকে বসবে। পরেও কিন্তু এ সমস্যাগুলো আমাদের নিস্তার দেবে না। কাজেই যে সমস্যাকে একদিন না একদিন মোকাবেলা করতে হবে তাকে এখনই সামনে নিয়ে আসা উচিত। লুকোচুরি করে তো আর সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এজন্যেই দাদার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমরা বিয়ে করেছি এটা জানাতে চেয়েছিলাম, তুমি শুনলে না। আমার দিন আর রাত্রিগুলোকে অসংযম আর অনিয়মের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তুমি খুব সুখে আছো। তোমার এই উদাসীন ভাল থাকা আমাকে ভীষণ ঈর্ষাকাতর করে তোলে। আমি পারি না। আমি কোনোভাবেই নিজেকে বাধ্য রাখতে পারি না।

আকাশে মেঘের মত প্রতিদিন স্বপ্ন জমে বৃষ্টি হয় না। তুমিহীন দিন যায়, রাত্রি যায়। তোমার স্পর্শহীন এই উষর প্রান্তর...। কতদিন তোমাকে দেখি না! কতদিন তোমার আনতচোখদুটিকে আদর করি না! ভীষণ কুয়াশাচ্ছন্ন তোমার চোখ, ভীষণ মেঘলা আর ভীষণ সুদূরের। কবে আমি ওই কুয়াশা পার হয়ে তোমাকে ছোঁবো! কবে আমি ওই মেঘের মানে বুঝতে পারব! অপেক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। প্রতীক্ষা আর ফুরোয় না। প্রিয় স্পর্শ নেই, দিনগুলো প্রাণহীন! প্রিয় স্পর্শ নেই, রাত্রিগুলো কি শীতল আর ক্লান্তিময়! এই শীতল আঁধারে তুমি রোদের উত্তাপ নিয়ে কবে আসবে? আজ মন ভাল নেই, নির্জন আর সেই খুব শান্ত কষ্টগুলো সারাদিন আজ আমার বুকের ভেতরে জমে উঠেছে। কোনও ভাষায় আমি এই কষ্টগুলো বোঝাতে পারি না। মেঘলা আকাশের মত ভারি, শীতল আর কি শান্ত এই কষ্ট আমার!আজ আমার মন ভাল নেই। আজ খুব শীতল কষ্ট।

রুদ্রর কষ্টগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করি আমি। কিন্তু আমার পক্ষে তার ইচ্ছেকে পূর্ণতা দেওয়া সম্ভব হয় না। রুদ্র স্বামীর দাবি নিয়ে বলে, বাড়িতে বল যে বিয়ে করেছি, নিজে বলতে না পারো কাউকে দিয়ে বলাও। এও যে সম্ভব নয়, তা আমি বারবার বলি। কোনও কাউকে দিয়ে এ কথাটি উচ্চারণ করানো যাবে না, যে, আমি এক *চালচুলোহীন কবি*কে বিয়ে করে বসে আছি। রুদ্রর ধারণা বিয়ের কথা বাড়িতে জানালে বাবা আমাদের আড়ম্বর করে বিয়ে দেবেন, তারপর আমি রুদ্রর সঙ্গে সংসার করতে চলে যাব এ বাড়ি

ছেড়ে অথবা রুদ্রই এ বাড়িতে জামাই আদরে থাকবে অথবা বাড়ি থেকে যদি আমাকে তাড়িয়েও দেয় তবে আমি হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া চালিয়ে যাব, ছুটিছাটায় রুদ্রর কাছে ঢাকায় যাব অথবা এই কলেজ থেকে বদলি হয়ে অন্য কলেজে, যেন তার সঙ্গে সংসারও করতে পারি, কলেজেও যেতে পারি এমন অথবা অন্য কিছু অথবা লেখাপড়া ছেড়েই দেওয়া। সংসার করার জন্য রুদ্র উন্মাদ হলেও আমি হই না। রুদ্রই জীবনে একটি বড় অনিশ্চিতি, এরপর আরও একটি অনিশ্চিতিকে স্বাগত জানাতে আমার একবিন্দু সাহস হয় না।

রুদ্র ময়মনসিংহে আসে দেখা করতে। যেদিন আসার কথা থাকে আসতে পারে না। আমি দীর্ঘক্ষণ প্রেস ক্লাবের ক্যান্টিনে অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসি। কথা দেওয়া তারিখে সে যে সবসময় আসতে পারে, তা নয়। তবে যে করেই হোক, সে তারিখে না হোক, কাছাকাছি অন্য একটি তারিখ বেছে চলে আসে। কলেজ ক্যান্টিনে চা সিঙ্গারা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না তাছাড়া কলেজ ক্যান্টিন কলেজের ছাত্রছাত্রীর জন্য, ক্যান্টিনে রুদ্রর উপস্থিতি লোকে প্রথম প্রথম আড়চোখে দেখত, এখন বড় বড় চোখ করে দেখে। আসাদ আর আনোয়ারের সঙ্গে রুদ্রর জমে ওঠাটিও খুব ভাল চোখে দেখা হয় না। আসাদ আর আনোয়ারকে মেডিকেলের খারাপ ছাত্র তো বটেই গুন্ডা ছাত্র বলে মনে করা হয়, মেডিকেলে ঘটা যে কোনও খারাপ কাজের জন্য ওদের দায়ি করা হয়। ওরা মদ খায় বলেও গুঞ্জন আছে। রুদ্রকে কলেজের ক্যান্টিনে দেখে একদিন কথা বলতে এল আসাদ, দুজন নাকি একই কলেজে লেখাপড়া করেছে, একই ক্লাসে। ব্যস, হয়ে গেল। জমে গেল। ত্রাস দুটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে ছাত্রছাত্রীরা, এক পথে ওদের আসতে দেখলে, বিশেষ করে ছাত্রীরা, অন্য পথ ধরে। কিন্তু ত্রাসদুটি আমাকে রুদ্রর সঙ্গে জমে ওঠার পর খাতির করে, *কি নাসরিন কেমন আছো* বলে এগিয়ে আসে দুজনই। আমারও হেসে বলতে হয় ভাল। ধীরে ধীরে একটি জিনিস আমি উপলব্ধি করি, ওরা আমার জন্য ত্রাস নয়, আর যার জন্যই হোক। রুদ্র না থাকলেও ওদের সঙ্গে বসে ক্যান্টিনে চা খেয়েছি, আসাদের হাতের কজিতে ব্যান্ডেজ বা আনোয়ারের কপালে কাটা দাগ হয়ত থাকে, কিন্তু কখনও মনে হয়নি ওরা খারাপ লোক, বরং অনেকের চেয়ে অনেক আন্তরিক আর সৎ মনে হয় ওদের। মাঝে মাঝেই ওরা বুক ফুলিয়ে বলে *কেউ তোমারে ডিসটার্ব করে কিনা জানাইও, নাকের হাড্ডি ভাইঙ্গা দেওয়ার জন্য আমরা রেডি আছি।* আসাদ আর আনোয়ারের সঙ্গে রুদ্রর আড্ডা দেওয়া অন্য ছাত্রদের চোখ আরও বড় করে। দুপুরবেলা চা সিঙ্গারা খেয়ে আমাদের দুপুরের পেট কামড়ে ধরা ক্ষিধেও মরে না, একসময় উঠতেই হয়। কলেজে আসা যাওয়ার পথে সি কে ঘোষ রোডের প্রেস ক্লাবের ক্যান্টিনটি আবিস্কার করে ওতেই আজকাল দেখা করি রুদ্রর সঙ্গে। প্রেসক্লাবের ক্যান্টিনে যে হলুদ রঙের বিরানি পাওয়া যায়, তা রীতিমত বিখ্যাত। রামপ্রসাদ বাবু মারা যাওয়ার পর তার ফটো টাঙিয়ে ফটোর ওপর মালা ঝুলিয়ে বাবুর ছেলে হরিপ্রসাদ নিজেই এখন সেই বিখ্যাত বিরানিটি রাঁধে। দুপুরে গিজগিজ ভিড়ের মধ্যে খাওয়া হয়, খেয়ে দেয়ে সব চলে যায়, আমরা বসে থাকি, আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে। প্রেস ক্লাবের কর্মচারি আমাদের আড়ে আড়ে দেখে, দেখে যে আমরা যাচ্ছি না, একটু পর পর চা খেয়ে খেয়েও থেকে যেতে চাইছি। কোথাও কোনও নির্জন ঘরের ব্যবস্থা আমি করে রাখি না বলে রুদ্র অনুযোগ করে, মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। কর্মচারিরা ক্রমাগত আমাদের ইঙ্গিত করে উঠে যেতে, চেয়ারগুলোকে শব্দ করে করে টেবিলের ওপর উপুড় করে রাখে, ওতেও যখন কাজ হয় না, মুখেই বলে দেয় ক্যান্টিন বন্ধ এখন। আমাদের ক্যান্টিন থেকে বেরোতে হয়, কিন্তু

যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। একটু নির্জনতা খুঁজে বেড়াই সারা শহরে, জোটে না। অবশেষে মেডিকেল কলেজ চত্বর বিকেলে যখন নির্জন হয়ে আসে, বসি দুজন। দশ বছর বয়সী একটি পঙ্গু ছেলে পাশের বস্তি থেকে প্রায়ই হাঁটুতে হেঁটে এসে আমার পাশে বসে থাকে, ওর সঙ্গে কথা বলতে যত সহজ বোধ করি, রুদ্রর সঙ্গে নয়। ছেলেটির নাম দুলাল, বাবা নেই, মা আছে, অভাবের সংসার, নিজে ভিক্ষে করে সংসার চালায়, দুলালকে দু তিন টাকা যা থাকে পকেটে, দিই। জীবনের নানা রকম কথা রুদ্রর সঙ্গে বলি। চন্দনার কথা, চন্দনা ঢাকা এসেছে, স্বামীর বোনের বাড়ি উঠেছে, রুদ্রকে দেখা করতে বলি চন্দনার সঙ্গে, কেমন আছে ও, দেখে আসতে বলি, যদি দেখা করতে যায়, তবে তো কিছু আমি হাতে দিতে পারি, কি দিতে পারি, আমার ভাণ্ডারে যে একটি দামি জিনিস আছে, সেটিই দিই, দাদা তাঁর বিয়ের সময় যে হলুদ কাতান শাড়িটি দিয়েছিলেন, সেটি। চন্দনার জন্য মন কেমন করা, বিয়ের পর দাদার বদলে যাওয়া, ছোটদার না থাকার কারণে আমার একা হয়ে যাওয়া, পড়াশোনা ভাল না হওয়া ইত্যাদি কথা মৃদু স্বরে একটু একটু করে রুদ্রকে বলি। রুদ্র বার বার আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কাছে টানে, চুমু খেতে চায়। বার বার তার হাত যায় বুকে। যে কোনও সময় যে কেউ দেখবে বলে রুদ্রর হাত সরিয়ে দিই। তাছাড়া নিজের লজ্জাটিও একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুজনের জন্য কোনও নির্জন ঘরের ব্যবস্থা করতে পারি না বলে সে অভিমান করে বসে থাকে, কথা না বলে। ইচ্ছে করে রুদ্রর ঠোঁটদুটো স্পর্শ করি আঙুলে, চোখের ওপর আলতো আঙুল রাখি। ইচ্ছে করে রুদ্রর উষ্ণ হাত ধরে হেঁটে বেড়াই খালি পায়ে। সবুজ ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে আমার বড় ভাল লাগে। ঘাসের ডগার স্পর্শ আর শিশিরের শীতলতা পেতে চায় পা। আমার সম্বোধনহীন আড়ষ্টতা, বিয়ের পরও এ রকম *শুকনো দেখা হওয়ায়* রুদ্র মন খারাপ করে ঢাকা ফিরে যায়। প্রতিদিন যেন চিঠি লিখি, বার বার অবশ্য বলে যায়। যেন লিখি রাত দশটার পর, ঠিক সে সময় সে আমাকে ভাববে, ভাববে যে আমি তাকে লিখছি, তাকে মনে করছি। রুদ্র চলে যাওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরে লম্বা ঘুম দিই, পড়ে পড়ে আমার এমন ঘুমোনো দেখলে ইয়াসমিন সন্দেহ করে যে রুদ্র এসেছিল। ছোটদা ময়মনসিংহ ছাড়ার পর ইয়াসমিন ধীরে ধীরে আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে বাড়িতে। ওর সঙ্গে সখ্য আমার খুব, চুলোচুলিও কম নয়। আমার চেয়ে গায়ের শক্তি ওর বেশি থাকায় আমাকে বরাবরই রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ইয়াসমিনকে আমি পেটের সব কথা বলি, অথচ রুদ্রর যত কাছে আসছি, তত আমি নিভৃত হয়ে উঠছি। রুদ্রর জন্য বাড়তে থাকা আমার বেয়াড়া আবেগের কথা ইয়াসমিনকে বলতেও সঙ্কোচ হয়। বাৎসায়নের একটি ইংরেজি পকেট বই রুদ্র আমাকে পড়তে দিয়ে গেছে, বইটি পড়া তো হয়ই না, বরং কোথায় লুকোনো যায়, কোথায় লুকোলে ইয়াসমিনের চোখে পড়ার আশঙ্কা নেই, এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার ঘোড়া লাগাম ছিঁড়ে ছুটতে থাকে। বইটি নিজের কাছে রাখার বরাদ্দ সময় ফুরিয়ে যায় বইটি লুকোতে লুকোতেই।

তুমি ব্যস্ত মানুষ। তোমাকে প্রতিদিন লিখতে বলবো, এমন সাহস আমার নেই। *এই কথা বলে রোজ আমাকে লেখার হাত থেকে নিস্তার চাইছো! সেটি হচ্ছে না। যতো ব্যস্তই থাকি না কেন, রোজ তোমাকে লেখার মত সময় আমার আছে। কাছে থাকলে রাতে যেটুকু সময় আমি তোমাকে দিতে পারতাম, চিঠি লিখতে তার চেয়ে অনেক কম সময় নেয়। যেহেতু তুমি কাছে নেই, কাজেই আমি রোজই তোমাকে লিখতে পারি, এবং লিখব। তোমার অত রাতটা কোথায়? সাড়ে দশ কি রাত? সে তো সন্ধ্যা। এইটুকু রাত্রি জাগার*

অভ্যেস এখন থেকে না করলে পরে বিপদে পড়বে তো! একেবারে নির্ঘুম প্লাবনের রাত তো আসবে, সেই সব জলোচ্ছ্বাসের রাতে কি করবে? চন্দনাকে আমি একটি বর্ণও মিথ্যে লিখিনি, বরং অনেক কম করে বলেছি। কেন, আমি কথা না বল্লে কথা বলা যায় না? আমি মুখ না তুল্লেও তুমি মুখ তুলতে পারো না? সম্পর্কের সবটুকু দায়িত্বই কি আমার? ভাগাভাগি তো সবকিছুর আধাআধি করা হয়েছে। এখানে কেন তবে পুরোটা আমার হবে? তুমি গাল ফুলিয়ে রাখো, চোখ রাঙিয়ে রাখো, আমি আমার আদরের হাত সঙ্কুচিত করি। *প্রশ্নই আসে না। তোমার আদরের হাত কি কখনো প্রসারিত থাকে? যে হাত প্রসারিত নয় তার আর সংকোচন কি? কেন, আমি তোমার অভিমান ভাঙাই না? তুমি না ডাকলেও আমি কাছে যাই না? তুমি কথা না কইলে আমি কথা কইনা? তুমি মুখ না তুল্লেও কি আমি আদরের ছোঁয়ায় তোমার মুখ তুলি না? তোমার নিরুত্তাপ চোখ জোড়াকে আদরে ভেজাই না? তাহলে তুমি পারো না কেন? আজো আমি অভিমানের ভাষা বুঝতে পারি না। যে বুঝেও সবকিছু না বোঝার ভান করে পৃথিবীর কোন শক্তি আছে তাকে বোঝায়! আজ আশ্বিনের আট। পরিচয়ের আজ তিন বছর চার দিন। কি রকম মনে হয় জানো? মনে হয় হাজার বছর ধরে আমি তোমাকে চিনি। হাজার বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। কখন কি ভাবে দেখা হয়েছিল মনে নেই। শুধু মনে আছে এক রোদে পোড়া মন একখানি শ্যামল করতল পটে কোনও কথাহীন নিঃশব্দে এসে লিখেছিলো একখানি কথা--আমি। যেন আমরা অনন্ত সময় ধরে পরস্পরকে খুঁজে ফিরছিলাম। একদিন দেখা হল। আর প্রথম দেখায় আমরা চিনে ফেল্লাম একজন আরেকজনকে। কোনো ভূমিকার প্রয়োজন হল না। দুজনেই মিলিয়ে নিলাম ভেতরে যে ছবি ছিলো তার সাথে। হ্যাঁ এই তো সে। যাকে বেদনার রঙ দিয়ে এঁকেছি। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লিখেছি যার নাম। নিভৃত কষ্ট আর নির্জন স্বপ্ন দিয়ে যাকে নির্মাণ করেছি এই তো সে। কোনো কথাহীন তাই এসে আমরা পরস্পরের করতলে একটি কথা লিখলাম, আমি। অর্থাৎ আমি সেই যাকে তুমি নির্মাণ করেছো নিজের ভেতর।*

নির্জন একটি ঘর, যেটি ময়মনসিংহে পাওয়া সম্ভব হয় না, তা যে ঢাকায় আছে তা রুদ্র বার বার বলে। আমাকে ঢাকায় যেতে বলে। কিন্তু ঢাকা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি করে! একা একা ট্রেনে উঠে হয়ত ঢাকা যাওয়া সম্ভব হবে আমার, কিন্তু যেতে কে দেবে? শেষ অবদি ছোটদা ময়মনসিংহে এলে আমি গোঁ ধরি ঢাকা যাবো। ঢাকা কেন? ঢাকা থেকে সার্টিফিকেট আনতে হবে ফ্রার্স্ট প্রফ পরীক্ষার। ছোটদার সঙ্গে ঢাকা যাওয়া হয়, গিয়েই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে ইশকুলের এক পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাই। বেরিয়ে সোজা রুদ্রর বাসাবোর ঘরে ঢোকা, ওরকমই কথা ছিল। রুদ্রর খুশির প্রকাশ নেই। আনন্দে লাফিয়ে ওঠা, কষ্ট পেয়ে চোখের জল ফেলা এসব রুদ্রকে দিয়ে হয় না। আপাদমস্তক একটি কাঠ। যা হচ্ছে যা ঘটছে ভেতরে। কাগজে তার প্রকাশ হয়। রুদ্র অবশ্য একই কথা বলে আমার সম্পর্কে, আমি নাকি চিঠিতেই সহজসুন্দরস্বাভাবিক, সামনে নই। সামনে ওই একই, মরা কাঠ। রুদ্র আমাকে একটি শাড়ি দিল পরতে, শাদার ওপর ছোট ছোট ফুল পাতা প্রিন্ট শাড়ি, সঙ্গে সায়া ব্লাউজ, শাড়ি পরে বাইরে যেতে হবে। এ শাড়িটি রুদ্রর বোন বীথি পছন্দ করেছে। রুদ্র নিজে পছন্দ করে কখনও শাড়ি কেনেনি আমার জন্য, এর আগে সবুজ একটি সুতি শাড়ি কিনেছিল, সেটি কিনতেও সে তার বান্ধবী মুক্তিকে সঙ্গে নিয়েছে পছন্দ করতে। রুদ্রর জন্মদিনে আমি যা কিছু উপহার দিই, নিজে পছন্দ করে কিনি। কোন রঙের শার্টের সঙ্গে কোন রঙের প্যান্ট ভাল মানাবে, তা নিজেই বিচার করি। রুদ্র যখন অন্যকে আমার

জন্য শাড়ি পছন্দ করতে বলে, আমার গায়ের রঙের কথা বলে, *শ্যামলা রঙের মেয়েকে কোন রঙের শাড়ি ভাল মানাবে!* মেয়েদের শাড়ি নাকি মেয়েরাই ভাল বোঝে। শাড়ির কথা জানাতে হয়েছে বলেই কি না জানি না রুদ্র বীথিকে জানিয়েছে আমাদের বিয়ের কথা, এমনকি মুক্তিকেও। সে রাতে আমাকে শাড়ি পরিয়ে একটি চিনে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায় সে। ওখানে রাতের খাবার খেয়ে ফিরে আসে বাসাবো। মুহম্মদ নূরুল হুদাকে সে আমাদের বিয়ের কথা জানিয়েছে, জানাতে হয়েছে, যেন রাতে ও বাড়িতে আমার থাকা অশোভন না দেখায়। আমার কাছ থেকে এ অবদি কেউ বিয়ের কথা জানেনি। রুদ্র জানাতে শুরু করেছে। এর আগেও দুএকজন বন্ধুকে সে জানিয়েছে। এই জানানোয় আমার উদ্বেগ হয় জেনেও জানিয়েছে। এ রাতটি রুদ্রর সঙ্গে থাকতে হবে। থাকতে হবেই। কিন্তু আমার তো যেতে হবে। যেতে হবে, ছোটদাকে বলে এসেছি ঘন্টাখানিক পর ফিরবো। গুল্লি মারো ছোটদা, তুমি আমার বউ, সেটিই তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। কিন্তু এ পরিচয়ই নিয়ে, যে জীবন যাপন করছি আমি, তা করতে পারব না। বেশ পারবে। তবে কি আমি বাড়িতে বলব ঝুনুখালার ঘরে ছিলাম, যদি না ফিরি আজ রাতে! সে নিয়ে ভেবো না, আমি ঝুনুখালাকে বলে দেবক্ষণ ম্যানেজ করে নিতে। কিন্তু ঝুনুখালা কি মানবেন? মানবেন না কেন, তাকে জানিয়ে দেব যে বিয়ে করেছি। অসম্ভব। তোমার অসম্ভব নিয়ে পড়ে থাকো তুমি, আমি যা করার করব। আজ রাত রুদ্রর সঙ্গে কাটাতে হবে এ রুদ্রর আবদার অনুরোধ দাবি আদেশ সবই। রুদ্র বলে, *আজ রাতে আমি তোমাকে সম্পূর্ণ করে চাই।* সম্পূর্ণ মানে? সম্পূর্ণ মানে সম্পূর্ণ। কোনও বাকি রাখা নেই। এর অর্থ অনুমান করে আমার ভেতরে কোথাও কেঁপে ওঠে, সময় যত ঘনিয়ে আসে, তত আমার কোথাওএর কাঁপনটি শরীরে ছড়াতে থাকে। দিন যত রাতের দিকে এগোয়, তত শ্বাস দ্রুত হয়। নিজেকে বোঝাই, আমি তো কোনও অন্যায় করছি না, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে বৈধ ভাবে রাত কাটাবো, আমার বয়সী হয়ে হাসিনা যদি এ কাজটি পারে আমি কেন পারব না! আমার ক্লাসের মেয়ে মদিরা ক্লাসেরই এক ছেলে শওকতকে লুকিয়ে বিয়ে করেছে, অনেকে বলে লুকিয়ে নাকি মদিরা শওকতের হোস্টেলের ঘরে যায়, রাত কাটায়। ও যদি পারে, আমি কি এমন কচি খুকি রয়ে গেছি যে পারব না!

শেষ অবদি রাত এলো। বৈঠক ঘরে হুদা আর তাঁর বউ সাহানার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় রুদ্র বউ বলে। হুদার ছোট্ট মেয়েটি অবাক তাকিয়ে থাকে *বউ* নামক আমার দিকে। অনেক রাত না হলেও রুদ্র বলে, শুয়ে পড়ার সময় হয়েছে। শুয়ে পড়তে রুদ্র তার ঘরটিতে আমাকে নিয়ে যায়। শার্ট প্যান্ট খুলে কেবল একটি লুঙ্গি পরে বাতি নিবিয়ে চেয়ারে পাথর হয়ে বসে থাকা আমাকে শুইয়ে দেয় বিছানায়। নিজেকে বারবার বলি, *তুই বিয়ে করেছিস, বিয়ে করলে স্বামীর সঙ্গে শুতে হয় বোকা মেয়ে। শুতে হয়! এরকম প্রতিটি মেয়েই শোয়। লজ্জা ঝেড়ে ফেল।* আমি প্রাণপণে লজ্জা ঝেড়ে ফেলতে থাকি। জানালা দিয়ে আলো আসছে বাইরের ল্যাম্পপোস্টের, ভাবতে চাইছি এ চাঁদের আলো। রুদ্রকে আমি ভালবাসি, সে আমার স্বামী। আমার স্বামীর সঙ্গে আমার আমি প্রথম রাত কাটাবো। আজকের রাতে আমার যেন কোনওরকম আড়ষ্টতা না থাকে। আড়ষ্টতা না থাকার কথা নিজেকে সেই সকাল থেকে যদিও বলছি, তবুও রুদ্রকে রুদ্র বলা তুমি বলা আমার পক্ষে সারাদিনেও সম্ভব হয়নি। রুদ্রর দিকে পিঠ দিয়ে আমি এক কোণে জড়সড় পড়ে থাকি হাত পা গুটিয়ে। সেই গুটোনো আমাকে রুদ্র কাছে টানে। আমি নই, আমার শরীর রুদ্রর সেই আলিঙ্গনে জবুথবু পড়ে থাকে, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে শক্ত হয়ে থাকা আমারই দুটি হাত, আমি সরিয়ে নিতে পারি না। ও থাকে। ওই হাতদুটিকে রুদ্র তার

গায়ের শক্তি দিয়ে সরায়। আমি চাই না আমার ভেতরে কোনও কাঁপন, কিন্তু চাইলেও আমি থামতে পারি না ভেতরের কাঁপন, থামাতে পারি না সেই কাঁপন থেকে সঞ্চারিত সমস্ত শরীরের কাঁপন। ঠোঁটে গাঢ় চুমু খায় রুদ্র। ঠোঁটজোড়া, আমি অনুভব করি ফুলে উঠছে, ভারি হয়ে উঠছে, আমি চাই না কিন্তু আমার হাত দুটো রুদ্রকে ঠেলে সরাতে চায়। ব্লাউজটির বোতাম খুলতে থাকে রুদ্র এক হাতে, অন্য হাতে শক্ত করে ধরে রাখে সরিয়ে দিতে চাওয়া আমার হাত। বোতাম খোলা ব্লাউজের ভেতরে রুদ্র মুখ ডুবিয়ে দেয়, ভিজে জিভ ভেজাতে থাকে আমার স্তনজোড়া, চর্বচোষ্যলেহ্য স্তনজোড়া। আমি আলুথালু শাড়িতে রুদ্রর বন্ধনের ভেতর তড়পাচ্ছি। রুদ্র নিজের দুটো পা দিয়ে সরিয়ে দিতে থাকে আমার পা দুটো। আমার এক পা যত বেশি আরেক পার ঘনিষ্ট হতে চায়, ততই রুদ্র তার সমস্ত শক্তি খাটায় পা দুটোর ঘনিষ্ঠ হওয়ার বিরুদ্ধে। পা দুটো তোমার স্বামী যেমন করে বলেছে, তেমন করে রাখো মেয়ে, রাখতে হয়, এ নিয়ম, রুদ্র যা করছে সব জেনে বুঝেই করছে, এই করে স্বামীরা, এই করতে হয়, নিজেকে বলি। বলে আমি শরীরের ভেতর থেকে আপনাতেই উঠে আসা প্রতিরোধের শক্তিকে সমস্ত শক্তিবলে নিস্তেজ করি, যেন আমি অবশ পড়ে থাকতে পারি। তাই করি, সজোরে চক্ষুদুটো বুজে, দুহাতে বোজা চক্ষুদুটো ঢেকে, যেন এ আমি নই, এ আমার শরীর নয়, যেন আমি ঘুমিয়ে আছি বাড়িতে আমার ঘরে, আর এখানে যা কিছু ঘটছে, যে অশ্লীল কান্ড ঘটছে, এ কান্ডের সঙ্গে আমি মোটেও জড়িত নই, আমার শরীরের ওপর জীবনের ওপর কিছু ঘটছে না, এ অন্য কেউ, এ অন্য কারও শরীর, ভাবি। এরপর রুদ্র আমার পুরো শরীরের ওপর উঠে আসে, এবার শুধু চক্ষুবন্ধ নয়, এবার আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অবশ শরীরের দু পাও ঘনিষ্ঠ হতে চায়। আমার দুপাকে রুদ্র তার দু পা য়ের বাঁধ দিয়ে উরুসন্ধিস্থলে বাড়তি কিছু দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে, আমি শ্বাস বন্ধ অবস্থায় চাপটিকে স্বামীর সৃষ্ট স্বাভাবিক চাপ বলে ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু আমার ভাবনা ছিঁড়ে গিয়ে একটি আর্তচিৎকার আমি না চাইতেও আমার কণ্ঠ থেকে বেরোয়। রুদ্র আমার মুখ চেপে ধরে দু হাতে। চেপে ধরে, কিন্তু নিম্নচাপটি ওদিকে থেকে যায়। তীব্র যন্ত্রণায় আমি গোঙাতে থাকি, উর্ধচাপ নিম্নচাপ সমস্ত চাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা আমার লোপ পায়। রুদ্রর লৌহশরীরটি আমার শরীরে শত ভালবেসেও শত যুক্তিতেও প্রবেশ করতে পারে না। সারারাত ধরে রুদ্র ক্রমাগত যুক্তিমত স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলামত প্রবেশের চেষ্টা করে গেছে, প্রতিবারই আমার না বোঝাতে পারা যন্ত্রণা *ও মাগো ও বাবাগো* বলে রাতকে জাগিয়ে তুলেছে। প্রতিবারই রুদ্র আমার চিৎকারের ওপর ঢেলেছে আরও চাপ। সেই চাপ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে চিৎকার। একটি ভয়াবহ রাত শেষ হলে ক্লিষ্ট ক্লান্ত মানুষটি শাড়ি পাল্টে সালোয়ার কামিজ পরে নিয়ে বলি, *আমি যাই।* আমার নতমুখ, আমার নতচোখ, আমার পরাজিত অক্ষম শরীরকে আমি দূরে সরিয়ে নিতে চাই। রাতের কুণ্ঠা, লজ্জা,ভয় আর ঘৃণা আমাকে সকালেও আঁকড়ে থাকে। একই সঙ্গে অপরাধবোধ। রুদ্রকে রুদ্র বলে মনে হয়, স্বামী বলে মনে হয় না। সেগুন বাগিচায় যাওয়ার পথে কেবল বলে, রাতে ওই *নাটকটা* না করলেই পারতে। সারাপথ আর কোনও কথা বলে না। আমিও না। আমি নিশ্চুপ বসে ভাবি রাতটির কথা, এর চেয়ে যদি সারারাত আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারতাম, এর চেয়ে যদি কবিতা পড়ে পড়ে, শুধু দুএকটি খুনসুটি, দুএকটি নির্ভেজাল চুমুতে আমাদের সময় কাটত!

সেই সকালে সেগুন বাগিচায় ফিরে ছোটদাকে কাঁপা কণ্ঠে বলি, *রোকেয়া হলে ঝুনুখালার রুমে ছিলাম।*

ঝুনুখালা তো এখন আর হলে থাকে না। ছোটদা বলেন।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে থাকেন। এ ছোটদা জানেন।

কালকে ছিল।

রুম এখনো ছাড়ে নাই নাকি?

না।

হুম। তর বান্ধবীর সাথে না দেখা করতে গেছিলি? দেখা হইছিল?

হ।

কি নাম?

নাদিরা।

নাদিরা? ও ওইযে রামকৃষ্ণমিশন রোডের মেয়েটা না?

হ।

তুই না একদিন কইলি ও জাহাঙ্গীরনগরে ভর্তি হইছে।

কালকে আসমার সাথে দেখা করতে আইছিল রোকেয়া হলে। থাইকা গেছে।

আসমা কুনডা? হাশিমুদ্দিনের মেয়েডা না?

হ।

ও কি ঢাকা ইনিভার্সিটিতে পড়ে?

হ।

তর না সার্টিফিকেট তোলার কথা!

হ। তুলাম।

আমি আর কথা না বাড়িয়ে কম্পমান কণ্ঠটিকে বিশ্রাম দিতে ঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে দুঃস্বপ্নের মত রাতটির কথা ভাবি। গত রাতটির কথা। রুদ্র বলেছে আমি নাটক করেছি। ও কি নাটক ছিল! অভিমান আমাকে নিঃশব্দে কাঁদাতে থাকে। সারা শরীরে যন্ত্রণা, যেন এইমাত্র বাঘের গুহা থেকে ফিরেছি। হাঁটতে গেলে যন্ত্রনা হচ্ছে উরুসন্ধিতে। পেচ্ছাব করতে গিয়ে দেখি যন্ত্রণার এক ফোঁটা দু ফোঁটা পেচ্ছাব। বুক যেন বুক নয়, দুমণ পাথর, চুমুর লাল দাগগুলো টনটন করছে, আঙুল ছোঁয়ানো যায় না। একটি রাত কাটানোর কথা রুদ্র সেই কাগজে সই করার পর থেকে বলছে। সই করার আগেও সে কম কামড় দিতে আসেনি, ঝাঁপিয়ে পড়েছে চুমু খেতে, বুকে হাত দিতে, নিজেকে ছাড়িয়ে বাঁচিয়ে নিয়েছি। ধস্তাধস্তি আঁচ করে মাসুদের বাড়ি থেকে না বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি না হওয়াতে অভিমান আর রাগ দুটোই সে কম দেখায়নি আমার সঙ্গে। রাতের মূল্য রুদ্রর কাছে এত বেশি কেন, বোঝা হয়নি আমার। আমি তাকে অনেক বলেছি, জীবনের সমস্ত রাত তো পরেই আছে সামনে, অপেক্ষা করি চল। অপেক্ষার যে কষ্ট, সে কষ্ট তো একরকম সুখ দেয়। না রুদ্র অপেক্ষা করবে না। অপেক্ষায় কোনও সুখ নেই, সে বলে। আমি যত বলি, চল ভালবাসি, রুদ্র বলে চল শুই, শুতে যাই। রুদ্র হাভাতের মত খাই খাই করছে। আজই তার চাই। এক্ষুনি চাই। এক্ষুনি না হলে তার আর চলছে না। ময়মনসিংহে যখন যায়, নির্জন একটি ঘর পেতে উন্মাদ হয়ে ওঠে। আমার পক্ষে নির্জন ঘর পাওয়া সম্ভব নয় জেনেও ঘর আমি কেন পাইনি এ নিয়ে অভিমান করে, কেবল অভিমান নয়, রাগ। একটি রাত তার কাটানোই চাই। একটি রাত তো শেষ অবদি কাটানোই হল, দুঃস্বপ্নের একটি রাত। আমি এমন করে নিজের জীবনকে ভাবিনি কখনও। আমারও তো অভিমান হয়, আমারও তো রাগ হতে পারে। রুদ্রকে ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু ফেলতে গেলে দেখি হাত দুটো অচল হয়ে আছে আমার। যেন পঙ্গু আমি। কেবল ওই কাগজটির কাছে

হার মেনেছি, আমার ওই সইটির কাছে, যেহেতু ওই কাগজে সইএর নাম বিয়ে! নাকি রুদ্রকে আমি ভালবাসি! ভাবি। ভাবনা আমাকে ছেড়ে কোথাও এক পা যায় না।

ছোটদাকে বলা মিথ্যেটি নিয়েও ভাবি। ছোটদা তো ভাবতে পারেন এরকম যে ঝুনু খালার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার সেই ইশকুলের বান্ধবীর সঙ্গে অনেকদিন পর আমার গল্প করা গড়িয়ে গড়িয়ে মধ্যরাত ছুঁলে, অগত্যা ঝুনুখালার পুরোনো ঘরটিতে আমি বাকিরাতটুকু শেষ করেছি ঘুমিয়ে। ছোটদা কি রকম ভেবেছেন কে জানে, তবে আমাকে আগলে রেখে আর কোনও *বান্ধবীর* সঙ্গে দেখা করতে একা বেরোতে না দিয়ে, রেজিস্টার বিল্ডিংএ আমাকে নিজে নিয়ে গিয়ে সার্টিফিকেট তুলিয়ে, দুদিন পর আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসেন ময়মনসিংহে।

রুদ্র পরে বলেছে, আমি তাকে সম্পর্ণ বিশ্বাস করি না। আমার এখনও সংশয় মনে। আমি আহত হয়েছি শুনে। বলেছি তাকে বিশ্বাস করি বলেই, তাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি বলেই ভালবাসি, ভালবাসতে হলে যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সে বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের মধ্যে একসুতো ফাঁক থাকলে ভাল লাগা হয়ত হয়, ভালবাসা হয় না। রুদ্র লিখেছে, *আমি কি এতটাই হতভাগ্য যে আমাকে সব কিছুই জোর করে নিতে হবে? সব কিছু আদায় করে নিতে হবে? জোর করে যতটুকু নেওয়া যায়, যতটুকু নেওয়া শোভন, আমি তা নিয়েছি। আমার আর যা একান্ত পাওয়ার, যা আমার নিভৃততম পাওয়া, যদি কোনোদিন নাও পাই, তবু আমি তা জোর করে নেবো না, আদায় করে নেবো না। বিশ্বাস আর ভালবাসা নিয়ে আমি কখনোই প্রশ্ন তুলি না।* সম্পূর্ণ বিশ্বাস *বলতে আমি অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছি, সেটা বুঝতে না পারার তো কোনো কারণ নেই।*

এই ঘটনার প্রায় দেড়বছর পর রুদ্র লেখে, *বউসোনা, এবার কি হয়েছে জানো? শাড়ি পরা তোমাকে দেখে প্রথম মনে হল আজ যেন প্রথম তোমাকে দেখছি। যেন তুমি অন্য কেউ, যেন এক অন্য মানুষ, এক নোতুন মানুষ। গত দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রকম ভালো লাগা পেয়েছি কিন্তু এ যেন তার সব কিছু থেকে আলাদা। একেবারে আলাদা এক ভালো লাগা। মনে হলো যেন আমাদের এইবারই ভালবাসার শুরু। যেন এতোদিন শুধু মহড়া হয়েছে। আজ একেবারে মঞ্চে।*

দেড় বছরে দুমাস কি তিন মাস অন্তর অন্তর একবার এসেছে রুদ্র ময়মনসিংহে। সম্বোধন করি না বলে রাগ করে আমাকে সম্বোধন হীন চিঠি লিখেছে বেশ কয়েক মাস। প্রেসক্লাবের ক্যান্টিনে আমাদের সময় কেটেছে। ক্যান্টিন থেকে যখন উঠতে হয়েছে, এদিক ওদিক কোথাও বসে কথা বলার জন্য আগের মতই জায়গা খুঁজেছি। বরাবরের মতই জায়গা খুঁজে পাওয়া আমার জন্য দুঃসাধ্য হয়েছে। রুদ্রর অনুরোধে একদিন শাড়ি পরে দেখা করতে যাই। শাড়ি আমি ভাল পরতে জানি না, ইয়াসমিনের সাহায্য নিয়ে মার একটি শাড়ি পরে বান্ধবীর জন্মদিনে যাচ্ছি বলে বেরোই। সে দিনটিতে খানিকটা নির্জনতার সুযোগে দুটো তিনটে চুমু খাবার, বুকে হাত দেবার সুযোগ রুদ্র পেয়েছিল, ফিরে গিয়ে লিখেছে ওই চিঠি।

মনে মনে হাসছো, না?

আসলেই, সত্যি মনে হলো এতোদিনে আমাদের ভালবাসার শুরু। যেন এতোদিন আমরা শুধু পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিলাম, আজ যেন আমরা পরস্পরের শরীরের উত্তাপ পাচ্ছি। বুঝতে পারছি পরস্পরের হৃদপিণ্ডের ধ্বনি। আজ মনে হচ্ছে কোনোবারই বুঝি এতোটা মন ভরেনি। তুমি একটু একটু করে সহজ হচ্ছো, স্পষ্ট হয়ে উঠছো। আমি যেন এক অচেনা পৃথিবীকে চিনতে পারছি। আমি তো এতোদিন ধরে তোমার এই সহজ হয়ে ওঠার

প্রতীক্ষায় ছিলাম। তুমি আরো, আরো বেশি সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। তুমি আরো বেশি উন্মোচিত হয়ে উঠবে। আমাদের মতো এতো সুন্দর আর কারো ভালোবাসার ঘর হবে না---তুমি দেখে নিও। এবার একটু আদর করো না লক্ষ্মী। না. না. মুখটা ঘুরিও না।তাকাও, আমার চোখের দিকে তাকাও। এতো লজ্জার কি আছে। আমি তো তোমার সেই কতোদিনের চেনা। এই চোখ, এই ভুরু, এই কপাল, এই মুখ, এই শরীর তুমি কতোবার ছুঁয়েছো। কতোবার আমরা আমাদের আলাদা কোরে চিনতে পারিনি। তবে? তবে এতো লজ্জা পাচ্ছো কেন? ঠোঁটটা ছোঁয়াও। কই--ছোঁয়াও।

একটু একটু কোরে বশ করছি নিজেকে। এরোম কোরে আমায় যদি একটু ভালোবাসা দাও, দেখো আমি ঠিক তোমার মনের মতো হয়ে উঠবো। অথবা তুমি ঠিক আমার মনের মতো। আসলে ভালোবাসা মানে বোধহয় দুটি মনকে একটি মন বানিয়ে ফেলা। ইচ্ছে করছে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে চিৎকার কোরে সবাইকে ডেকে বলি--তোমরা শোনো, আমি আমার ভালোবাসার মানুষ পেয়েছি, আমরা একটি হৃদয় হতে পেরেছি।

লক্ষ্মী থেকো, সোনা আমার। ভালো থেকো প্রাণ। আদর আদর আদর। তোমার রুদ্র।

অবকাশের চেহারাটি খুব পাল্টে গেছে। ইয়াসমিন মেট্রিক পাশ করেছে। পাশ করেছে প্রথম বিভাগে। রসায়নে একটি *লেটার* আছে তার। এই লেটারের কারণে ইয়াসমিন আমার চেয়ে *বেটার* ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে সংসারে। বাবা,ওকেও, স্বপ্ন দেখেন ডাক্তারি পড়াবেন। ওর আনন্দমোহনে ভর্তি হওয়ায় বাবা আপত্তি করেননি। ইয়াসমিন হঠাৎ করে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। আগের ছোট্ট বাচ্চাটি নেই আর। আমরা দুবোন কোথাও গেলে, অনেকে, যারা ইয়াসমিনকে চেনে না, ভাবে যে ও আমার বড় বোন, গায়ে গতরে আমার চেয়ে বেশি বেড়ে উঠেছে বলেই। আমি যে বয়সে ওড়না পরতে শুরু করেছি, অবশ্য ঘরে নয়, বাইরে, ইয়াসমিনকে তার আগেই পরতে হয়েছে। বুকের বেঢপ বেড়ে ওঠার কারণে ও কুঁজো হয়ে হাঁটতে শুরু করেছে আমার মতই, ওড়না না পরার মাশুল এভাবেই দিতে হয় কি না। মা ওর কুঁজো পিঠেও কিল দিয়ে বলেন, *সোজা হ। ওড়না পইরা আয়, তবু সোজা হইয়া হাঁট। বড় হইছে মেয়ে ওড়না পরতে শরম কেন?* বয়সে না হয় বড় লাগে আমার চেয়ে ওকে, দুজনের মধ্যে দেখতে কে সুন্দর এই প্রশ্ন উঠলে, আমার দিকে পাল্লা ভারি হয়। ইয়াসমিন নিজের চেহারা, বয়সের চেয়ে বেশি বয়স দেখতে লাগা শরীরটি নিয়ে ভোগে মনে মনে। অথচ চোখের তুলনা করলে ও যদি হরিণ হয়, আমি হাতি,ওর ঘন কালো চুলের সামনে আমার চুল নিতান্তই ফিনফিনে, কিন্তু ছোট নাক, ছোট চিবুক, পুরু ঠোঁট নিয়ে ইয়াসমিনের খুঁতখুঁতুনির শেষ নেই। ওর ভেতরে গোপনে গোপনে একটি ঈর্ষার জন্ম হয়। আমার কোনও ঈর্ষা হয় না, বরং ওকে বাইরের সকল প্রলোভন থেকে, ভুল থেকে মিথ্যে থেকে সরিয়ে রাখতে ইচ্ছে হয়। আমি কিছুতেই চাই না আমি যে দুঃখ বাবাকে দেব, সেরকম কোনও দুঃখ ইয়াসমিনও দিক। আমার চোখের ওপর একটি স্বপ্নের প্রজাপতি এসে বসে, বলে, ইয়াসমিন মেডিকেল কলেজে পড়বে, আমি যত বড় ডাক্তার হব, তার চেয়ে বড় হবে ইয়াসমিন। ডাক্তারি পাশ করে হাবিবুল্লাহর মত কোনও সুদর্শন ডাক্তার ছেলেকে বিয়ে করবে। এতে যদি আমার দেওয়া দুঃখ খানিক লাঘব হয় বাবা মার। ইয়াসমিনের ঈর্ষা আমাকে ব্যথিত করে। লক্ষ করি ও দূরে সরছে। আমার গায়ে গায়ে লেগে থাকা ইয়াসমিন এখন দাদার বউএর গায়ে গায়ে বেশি লেগে থাকে। কলেজে যায় আসে, বাকিটা সময় দাদার বউএর সঙ্গে হাস্যরসের ঢলে সাঁতার কাটে। যদি ওর পড়াশোনার খবর নিতে যাই, ও এমন চোখ করে তাকায় আমার দিকে যেন আমি ওর সবচেয়ে বড় শত্রু। ছোটদা নেই অবকাশে। সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে আমার মেতে থাকা নেই। ছোটদা যেহেতু লেখাপড়া না করা, অকালে বিয়ে করা, টইটই করে ঘুরে বেড়ানো বখাটে ছেলে ছিলেন, তার সঙ্গে, নাচ গান কবিতা নাটকের অনুষ্ঠানে বাবাকে লুকিয়ে মাকে নিমরাজি করিয়ে আমার আর যাওয়া হয় না। ছোটদাও এখন

পাল্টে গেছেন। তাঁকে এখন এ বাড়িতে বড় পিঁড়িটি দেওয়া হয়, *টুডাইল্যা* নামটি তাঁর ঘুচেছে, তিনি আর খবর রাখেন না শহরে কোথায় কি হচ্ছে, কোথায় নাটক, কোথায় নাচ গান। দাদা আছেন, তবে থেকেও নেই। এ বাড়ির মানুষগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বদলে গেছেন দাদা। তিনি আর সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামান না। সেঁজুতির প্রসঙ্গ এলে তিনি আর বলেন না, *যা আমি ছাপাইয়া দিয়াম নে।* সংসারের অন্য কারও কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। গান শোনা, ছবি তোলা, নিজের সুটবুট কেনা, দামি সুগন্ধি মাখা এসব ব্যাপারেও তাঁর আগ্রহ নেই আর। তিনি বউএর জন্য শাড়ি গয়না কেনায় ব্যস্ত। প্রায়ই শাড়ি কিনে নিয়ে আসেন, আমাদের দেখান শাড়ি কেমন হয়েছে, আমরা বলি খুব ভাল শাড়ি, খুব মানাবে বউকে। বউএর আত্মীয়ের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে ব্যস্ত দাদা। বাড়িতে অতিথি এখন বেশির ভাগই হাসিনার বোন, বোনজামাই, ভাই, ভাইবউ ইত্যাদি। আত্মীয়ের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, কে বেশি কথা বলে, কে কম, কে দেখতে সুন্দর, কে নয়, কার কত ধন আছে, কার কত দারিদ্র এসব নিয়ে আলোচনা করতে তিনি পছন্দ করেন বেশি। বাঁশের কঞ্চির মত শরীর হাসিনার। মা প্রতিদিন ভাল ভাল রান্না করে তাকে খাওয়াচ্ছেন। হাসিনা দাদার সঙ্গে প্রায় বিকেলে বেড়াতে যায়, বাকিটা সময় মুখে কাঁচা হলুদ মেখে দুপুরবেলা বারান্দায় বসে থাকে, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে গোসল করে, পাঁচ ছ বেলা খায়, আর ঘুমোয়। তবু সে একটি নতুন জিনিস বাড়িতে, আমাদের উৎসাহ কমে না। বিশেষ করে ইয়াসমিনের। ইয়াসমিন হাসিনার সঙ্গে লেপ্টে থাকে, এমনকি হাসিনার ব্লাউজ খুলে স্তন মুঠোয় নিয়ে *মায়ের দুদু খাওয়া বাচ্চার* মত শুয়ে থাকে। দেখে লজ্জায় সরে গিয়ে আমি দূর থেকে বলি হাসিনাকে, *তোমার শরম করে না?* সে বলে, *বিয়া হইয়া গেলে আবার শরম থাকে নাকি?* মারও তো বিয়ে হয়ে গেছে। মা কখনও স্তন উদোম করে রাখেন না। গীতাও কোনওদিন রাখেনি। গীতার অবশ্য স্তন জিনিসটি কম, ব্রেসিয়ারে তুলো ভরে পরতে হয় তাকে। হাসিনা যেহেতু ভাল শাড়ি পরতেও জানে না, ভাল সাজতেও জানে না, বেড়াতে যাওয়ার আগে ইয়াসমিন হাসিনাকে শাড়ি পরিয়ে দেয়, গীতার শাড়ি পরা দেখে দেখে এই জিনিসটি ভাল শিখেছে ও। হাসিনার মুখ সাজিয়ে দেয়, এও গীতার কাছ থেকে ওর শেখা। হাসিনাকে প্রথম প্রথম আমি হাসিনা বলেই ডাকতাম, কিন্তু এতে সে খুশি হয়নি, বৌদি ডাকার আদেশ দেয়। ইয়াসমিন দিব্যি বৌদি ডাকে। বৌদিকে নিয়ে সে বৌদির বোনের বাড়ি ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। বৌদি শাড়ি কিনতে যাবে, ইয়াসমিন সঙ্গে যাবে পছন্দ করে দিতে। বৌদি জুতো কিনবে, ইয়াসমিন বাজারের সবচেয়ে ভাল জুতোটি দাদাকে বলবে কিনে দিতে। আমার পক্ষে সম্ভব হয় না কলেজের চেনা একটি মেয়েকে বৌদি ডাকার। হাসিনা ডাকে আপত্তি তোলার পর এই হয় আমার, আমার হাসিনা ডাকটিও বন্ধ হয়ে যায়, *এই শোনো, এই দাদার বউ শুনে যাও,* এভাবে কাজ চালাই। *হাসিনা* নামটি দাদার খুব অপছন্দ, তিনি হাসিনা মমতাজ থেকে হাসিনা বাদ দিয়ে, মমতাজ থেকে মম নিয়ে, মমকে মুমু বানিয়ে হাসিনাকে মুমু বলে ডাকেন। দাদা এখন আর মার জন্য বা আমার আর ইয়াসমিনের জন্য কোনও জিনিস কেনার কথা ভাবেন না। ঈদ এলে হাসিনার জন্য বাজারের সবচেয়ে দামি শাড়িটি কিনে আনেন। মাকে একটি শাড়ি দেবার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঈদের আগের রাতে মার জন্য হয়ত একটি সস্তা সুতির শাড়ি কিনে আনেন। মা টের পান, এই দেওয়ায় আগের সেই ভালবাসা নেই। আমরাও টের পাই। আমাদের, আমাকে আর ইয়াসমিনকে যে তিনি চক্ষুলজ্জার খাতিরেও কিছু দিচ্ছেন না এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন বা অনুযোগ আমরা করি না। কারণ এরকমই নিয়ম বলে ভাবি যে দাদার এখন বউ হয়েছে দাদা বউকেই সব

দেবেন। বউকে সুখী দেখলে আমাদের ভাল লাগে। বউএর মুখে হাসি ফুটলে দাদার মুখে হাসি ফোটে। দাদার পকেট থেকে আমাদের আর টাকা নেওয়া হয় না, ছোটদা চলে যাওয়ার পর আমি আর ইয়াসমিনই সে কাজ নিজ দায়িত্বে অনেকদিন চালিয়েছি, ঘরে এখন বউএর পাহারা আছে। দাদার হাত থেকে দুপয়সা খসলে সে পয়সা বাড়ির অন্য কারও জন্য খসতে দিতে রাজি নয় হাসিনা। দাদার টাকাকে দাদার জিনিসপত্রকে হাসিনা তার নিজের টাকা, নিজের জিনিসপত্র বলে মনে করে। আমাদের কাচের বাসনপত্র থেকে সে দাদার কেনা কাচের বাসনপত্র আলাদা করে সরিয়ে নিতে নিতে বলেছে, *আমারগুলা তুইলা রাখতে হবে। এইগুলা যেন ইউজ না হয়।* দাদার কেনা ফ্রিজে আনুর মা পানির বোতল রাখতে যায়, যেমন আগে রাখত, এখন আনুর মাকে থামিয়ে হাসিনা বলে *আমার ফ্রিজে হাত দিতে হইলে আমারে আগে জিগাস কইরা নিবা।* ফ্রিজটি নিজ হাতে মুছতে মুছতে সে বলে, *আসলে ফ্রিজ একজনের হ্যান্ডেল করা উচিত, এত লোক ফ্রিজে হাত দিলে আমার এই ফ্রিজটা কয়দিন পরেই নষ্ট হইয়া যাইব।* হাসিনার এই *আমার* শব্দটি শুনে মনে হয় আমরা যেন এ বাড়িতে দুটো দল, এক দলে আমরা, আমি বাবা মা ইয়াসমিন, অন্য দলে দাদা আর হাসিনা। রিয়াজউদ্দিনের ছেলে জয়নাল টিনের ঘরে থাকে, ইশকুলে পড়ছে শহরে। জয়নালকে দেখলে হাসিনা বলে, *এই ছেড়া এক গ্লাস পানি দে তো* অথবা *এই ছেড়া দৌড়াইয়া একটা রিক্সা লইয়া আয়, যা।* জয়নাল পানি নিয়ে দেয়। দৌড়ে রিক্সা ডেকে আনে। হাসিনা শাড়ি পরছে, আশেপাশেই ছিল জয়নাল, *এই ছেড়া জুতাডা মুইছা দে তো।* জয়নাল হাসিনার পায়ের কাছে বসে ছেঁড়া ত্যানায় তার জুতো মুছে দেয়। মা একদিন বললেন, *জয়নালরে এইভাবে কইও না বৌমা। জয়নাল ত বাড়ির কাজের ছেলে না, নোমানের আপন চাচাতো ভাই লাগে।* হাসিনা খসখসে গলায় বলে, *ছেড়ারে কইতাম না তো কারে কইতাম? বেডি যে একটা আছে, ও তো পাকঘরেই পইড়া থাহে। ডাইকা পাওয়া যায় না।*

আনুর মা তো সারাদিন কাম করে।

সারাদিন কি কাম করে যে এই দিকে আমার কাম করার সময় কেউ পায় না!

আনুর মার কাছে চাও কি চাইবা। সে কি না করছে যে করব না কাম?

এরপর হাসিনা অর্জুনখিলা থেকে তার জুতো মোছা, তার জন্য গোসলের পানি তোলা, গোসলে যাওয়ার আগে তার তোয়ালে আর সাবান গোসলখানায় রেখে আসার জন্য, শুয়ে থাকলে তার মাথায় বিলি কেটে দেওয়ার জন্য ফুলেরা নামের একটি মেয়ে নিয়ে এল। এক বাড়িতে এক চুলোয় সবার জন্য খাবার রান্না হলেও ধীরে ধীরে দুটো সংসার গড়ে উঠছে। হাসিনার গলার স্বর, আমরা সবাই লক্ষ করি খসখসেই কেবল নয়, উঁচুও। এ বাড়িতে বাবার গলাই এমন উঁচুতে ওঠার স্পর্ধা রাখে।

হাসিনার এরকম ঘরে বসে থাকা সইতে না পেরে বাবা তাকে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। বইপত্র খাতা কলম যা দরকার কিনে দিয়েছেন, টেবিল সাজিয়ে দিয়েছেন ঘরে। বিয়ের পর আর লেখাপড়ার ঝামেলা নেই বলে দিব্যি ছিল হাসিনা। দাদারও আপত্তি ছিল না। কিন্তু বাবার আপত্তি। তিনি হাসিনাকে নিজের কন্যাদের যেমন মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করার পরামর্শ দেন, নিজের পুত্রবধূকেও দেন। মনীষীদের বাণীর বর্ষণ এবার হাসিনার ওপর, যেন সে বাবার আরেক মেয়ে, তবে একটি সুবিধে তার, বাবার চড় থাপড়, সন্ধিবেত আর চাবুকের চেহারা তাকে দেখতে হয় না। মাও আমাদের যেমন যত্ন করে খাওয়ান, তার চেয়ে অধিক যত্ন করে হাসিনাকে খাওয়ান, হাসিনার এখানেও সুবিধে যে, মা মাঝে মাঝে আমাদের যে ধমক দেন গালাগাল দেন, তা

হাসিনাকে দেন না। বাড়ির মানুষগুলো হাসিনার সেবায় নিয়োজিত, সবচেয়ে বেশি নিয়োজিত দাদা। মধুচন্দ্রিমা উদযাপন করতে বউ নিয়ে কক্সবাজার ঘুরে এসেছেন। রেলগাড়িতে নয়, উড়োজাহাজে। সমুদ্রের পাড়ে বড় হোটেলে ছিলেন, নরম বিছানায় শুয়েছেন, হোটেলের লোকেরা তিনবেলা খাবার দিয়ে গেছে ঘরে। হাসিনা সুখে আছে, বুঝি। এত সুখের কথা সে বিয়ের আগে কল্পনা করেছিল বলে মনে হয় না।

জীবন বদলে যাচ্ছে, একসময় রান্নাঘরে চুলোর পাড়ে পিঁড়িতে বসে ভাত খেতাম, পিঁড়ি থেকে পরে শোবার ঘরের মেঝেয় শীতল পাটিতে বসে, পরে খাবার ঘরে শাদামাটা চেয়ার টেবিলে, ধীরে ধীরে টেবিল বড় হল, মসৃণ হল আরও, চেয়ারের মাথা মানুষের মাথা পেরিয়ে ওপরে উঠল। বেতের সোফা সরে কাঠের সোফা এল। হারিকেন থেকে বিদ্যুৎ বাতি এল। হাতপাখা থেকে বৈদ্যুতিক পাখা।টিনের থালা থেকে চিনেমাটির থালা এল। মেঝেয় কয়লা গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো আঙুলে তুলে দাঁত মাজতাম--এরপর নিমের ডাল দিয়ে, ডালের মাথাটা দাঁতে কামড়ে নরম করে নিয়ে--এরপর এল টুথপেস্ট, তিব্বত কোম্পানি থেকে কোলগেট। ঋতুর রক্ত শুষে নেওয়ার জন্য পুরোনো শাড়ির টুকরো বা ত্যানাতুনোর বদলে বাজার থেকে কিনে তুলোর প্যাড ব্যবহার করি। কোরবানির ঈদের সময় আস্ত একটি গরু জবাই করা হল, এর মাংস রাখা হবে কোথায়, বড় বড় পাতিলে ওসব হলুদ আর লবণ মিশিয়ে সেদ্ধ করে রাখা হত, এরপর রান্না করতে হলে সেদ্ধ মাংস তেলে মশলায় নেড়ে রান্না হত, আর অনেকটাই চলে যেত রোদে শুকিয়ে শুটকি করায়। মাংসের টুকরোগুলোর মাঝখানে ফুটো করে দড়ির ভেতর ঢুকিয়ে রোদে টাঙিয়ে দেওয়া হত। সন্ধের আগে আগে রোদে শুকোনো কাপড় যেমন করে তোলা হয়, রোদে শুকোনো মাংসও তেমন তোলা হত। পরদিন সকালে আবার রোদে দেওয়া। ফ্রিজ আসার পর নিয়মগুলো পাল্টে গেছে। এখন আর হলুদ লবণ মিশিয়ে সেদ্ধ করে রাখা হয় না মাংস, শুটকি করাও হয় না খুব, মাংসগুলো ঢুকে যায় রেফ্রিজারেটরের হিমায়িত চেম্বারে। নানারকম যন্ত্র এসেছে বাড়িতে, রেডিওই ছিল ভরসা, এখন টেলিভিশন, শাদা কালো থেকে রঙিন। আগে কেবল শোনা ছিল, এখন দেখা আর শোনা দুটোই। নাটক সিনেমা দেখার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হয় না, ঘরে বসেই দেখা যায়। নাচ গানও বোতাম টিপলেই। বড় বড় ক্রিকেট ফুটবল খেলা দেখার জন্য কোনও মাঠে দৌড়োতে হয় না, সেও বোতাম টিপলেই। ছবি তোলার জন্য কোনও ছবিঘরে যেতে হয় না আর, কেনা ক্যামেরা দিয়েই যত চাই যে ভঙ্গিমায়, তোলা যায়। জীবন অনেক পাল্টে গেছে। অনেক কিছুই আর আগের মত নয়। এভাবেই একটু একটু করে জীবন পাল্টে যাচ্ছে, সামনে এসে পেছনের দিকে খুব একটা তাকাই না, যেন ফেলে আসা জীবন ভুলে যাবার জীবন। একটি জিনিস কেবল সেই আগের মত রয়ে গেছে, বাড়িতে তিনবেলা ভাত রান্না হত, এখনও হয়। মাটির চুলোয় উঠোনের মাটিতে ঝরে পড়া ডাল পাতা জড়ো করে আগুন ধরাও, আগুন বার বার নিভে যাবে, যতবার নিভবে, ততবার ফুঁকনিতে ফুঁ, চোখ ভেসে যাবে ধোঁয়ায়, চুল ভেসে যাবে ধোঁয়ায়, মা নিজে গোটাটাই ভেসে যাবেন ধোঁয়ায়, আগুন জ্বললে ধোঁয়া উড়ে যাবে, ধোঁয়া উড়ে গেলে দেখতে পাবো মাকে, গালে কালি, হাতে কালি, কপালে কালি। কালিময় বিচ্ছিরি মাকে দেখে আমার বা বাড়ির কারো কোনও অবাক লাগবে না, কারণ মা এমনই, মাকে এমনই দেখে এসেছে সবাই। চুলোর পাড়ে কালিঝুলি মাখা মা রান্না করবেন, ক্ষিধে লাগার আগেই মা ভাত বেড়ে দেবেন প্রত্যেকের থালায়। মা তো এ কারণেই। জীবন পাল্টে যাচ্ছে কিন্তু মার মাটির চুলো পাল্টাচ্ছে না, চুলোর পাড়ে বসে শুকনো পাতায় আগুন ধরিয়ে ফুঁকনি ফুঁকে চুলো ধরাতে মাকে জন্মের

পর থেকেই দেখে আসছি, এর কোনও পরিবর্তন নেই।

গীতার বাচ্চা হওয়ার তারিখ পড়েছে, ছোটদা জানিয়ে দিলেন, মা যেন সময়মত ঢাকা চলে যান। মা ঢাকা চলে গেলেন বাসে করে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন ছোট ছোট কাঁথা, ছোট পাতলা কাপড়ের জামা। চামেলিবাগে ডাক্তার টি এ চৌধুরির ক্লিনিকে সতেরোই জুন গীতা নয় পাউন্ড ওজনের একটি ছেলের জন্ম দেয়। ক্লিনিক থেকে ফিরে সে হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে থাকে, আর দাগ দূর করার মলম মাখতে থাকে পেটে। মা রেঁধে বেড়ে গীতাকে খাওয়ান, গীতার *স্নানের জল* গরম করে দেন,ম্যাজম্যাজ করা গা মালিশ করে দেন, বাচ্চাকে গীতার কোলে বসিয়ে মিনতি করেন, *বাচ্চারে নিজের বুকের দুধ খাওয়াইতে চেষ্টা কর আফরোজা। মায়ের দুধটা বাচ্চার জন্য বড় উপকারি।* গীতা আগেও চেষ্টা করেছে, তার বুক থেকে বাচ্চার জন্য কোনও উপকারি দুগ্ধ নির্গত হয় না। এসব তো আছেই, প্রচণ্ড উদ্যমে বাচ্চাকে খাওয়ানো, গোসল করানো, ঘুম পাড়ানো, কাঁথা বদলানোর কাজ করে যান মা। গীতার মা মাসি, বোন ভাই এসে বাচ্চা দেখতে এসে সপ্তাহ খানিক কাটিয়ে যায়। কড়া লাল সিঁদুর পরা, হাতে শাখা পরা গীতার মার সঙ্গে মা হেসে কথা বলেন, নিজেকে বোঝান, হিন্দু হোক তাতে কি, বাচ্চার তো সে নানি। তারও ত হক আছে বাচ্চা দেখার। মা একাই বাচ্চার যত্ন, বাচ্চার মার যত্ন, বাচ্চার দিদিমা, মামা মাসির যত্ন করে যান। তিনমাস অবদি এই চলল, তিন মাস পর ছেলেকে ছেলের বাবা মার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে মা বলেন, *এইবার তোমাদের ছেলেরে তোমরা পালো, আমি ময়মনসিংহে যাই।* মা ব্যাগে যখন কাপড় গোছাচ্ছেন, গীতা আড়মোড়া ভেঙে তার দীর্ঘ বিশ্রাম সেরে উঠে ঘোষণা করল, সে চাকরি করতে যাবে আবার, ঘরে বসে থাকতে তার ভাল লাগছে না।

তাইলে বাচ্চা দেখবে কে?

গীতা নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, *আমি কি জানি! তোমার বাচ্চা তুমি জানো!*

ছোটদা মুখ চুন করে ঘরে বসে রইলেন। গীতা যদি চাকরি করতে চলে যায়, বাচ্চা তবে কার কাছে থাকবে?

কাজের লোক রাইখা লও। বাচ্চা রাখুক। গীতার নিরাসক্ত স্বর।

ছোটদা গীতার শিয়রের কাছে বসে গীতার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গীতা ও গীতা গীতা গীতা করে গেলেন সারা দুপুর, এরপর গীতার কানের কাছে মুখ এনে অনেকক্ষণ ফিসফিস করলেন, মুখটি ঘুরিয়ে ঠোঁটে চুমু খাবার চেষ্টা করে গেলেন অনেকক্ষণ। বিকেলে গীতা শাড়ি পরল, ছোটদার সঙ্গে বাইরে বেরোল। ফেরত এল মার জন্য একটি শাড়ি নিয়ে। মার হাতে শাড়িটি দিয়ে বলল, *অনেক খাটছেন ছেলের জন্য, এই নেন শাড়ি।*

ছোটদা বললেন, *শাড়িটা গীতা পছন্দ কইরা কিনছে। টাঙ্গাইলের বেস্ট শাড়ি।*

মা শাড়ি হাতে নিয়ে, *হ খুব ভাল শাড়ি* বলে শাড়ি বিছানার ওপর রেখে কপালের উস্কোখুস্কো চুল সরিয়ে বললেন, *বাবা কামাল, আমারে কালকে কি একটু বাসে তুইলা দিতে পারবা?*

কই যাইবেন?

ময়মনসিং।

ময়মনসিং যে যাইবেন, বাচ্চা কার কাছে থাকব? গীতা ত অফিসে যাবে কালকে থেইকা।

ক্লান্তিতে নুয়ে আসা মা ভাঙা কণ্ঠে বলেন, *আমি ত অনেকদিন থাকলাম। এইবার যাই।*

তাইলে বাচ্চারে আপনে নিয়া যান মা। ময়মনসিংহে নিয়া যান।

মা চমকে ওঠেন প্রস্তাব শুনে। এ কি করে হয়। এ কদিনের মামলা! কদিনের তা ছোটদা বলেন না, গীতাও বলে না। গীতার সাফ কথা, চাকরি সে যে করেই হোক করবে, বাচ্চার জন্য চাকরি বাদ দেবে না। এখন, মা যদি এ বাড়িতে থেকে বাচ্চা লালন পালন করেন, তো ভাল, নয়ত ময়মনসিংহে নিয়ে করুন।

পরদিন মা বাচ্চা কোলে নিয়ে ময়মনসিংহে এলেন। গীতার হাঁড়িমুখে হাসি ফোটে।

মা যখন অবকাশে এলেন বাচ্চা নিয়ে, মার রাতজাগা ক্লান্ত মুখের দিকে কারও নজর পড়েনি, নজর পড়েছে নজরফোঁটা লাগানো চমৎকার দেখতে বাচ্চাটির দিকে। অবকাশে এত ছোট শিশু কখনও জীবন যাপন করেনি, আমি আর ইয়াসমিন ঝাঁপিয়ে পড়ি বাচ্চাকে কোলে নিতে। ওকে ছোঁয়া সহজ কথা নয়, গোসল করে পরিষ্কার জামা গায়ে দিয়ে তবেই কোলে নেওয়া যাবে। এ বাচ্চা আমাদের মত ধুলো কাদায় বড় হওয়ার কপাল নিয়ে আসেনি, এর ব্যবহারের সমস্ত জিনিস, এখনও খেলার বয়স না হলেও, আগাম খেলনা, বিদেশ থেকে তো আনা বটেই, ছোটদা নাকের পাটা বুকের পাটা যত পাটা আছে ফুলিয়ে আরও বলেন, *জনসন বেবি লোশন আর পাউডার লন্ডনের মাদার কেয়ার থাইকা আনি, দুধ আনি সিঙ্গাপুর থাইকা, কাপড় চোপড় আনি দুবাই থেইকা।*

বাচ্চার থাকার জায়গা হল বাবার ঘরে, বাবার বিছানায়। বাবা ঘরের কিনারে অন্য একটি খাট পেতে নিলেন নিজের জন্য। ঘরের বন্ধ জানালা খুলে দেওয়া হল, বাবার গায়ে প্রয়োজন না হলেও বাচ্চার গায়ে আলো বাতাস লাগার প্রয়োজন আছে। বাবার ঘরটি ধুয়ে মুছে ঝকঝক করে ঘরে টেবিল পেতে বাচ্চার খাবার সরঞ্জাম সাজিয়ে নিলেন মা, কমলার রস করার যন্ত্র, ভাত শাক সবজি মাছ মাংস মিহি করার যন্ত্র, বিদেশি দুধের কৌটো, বিদেশ আরও নানারকম গুঁড়ো খাবারের কৌটো, বিদেশি ফিডার, বিদেশি বাটি, চামচ। বাচ্চার খেলনা আর কাপড় চোপড় চলে গেল আলমারিতে। বাচ্চার জন্য প্রতিদিন মুরগির বাচ্চার সুপ লাগবে,বাবা বারোটি মুরগির বাচ্চা কিনে পাঠিয়ে দিলেন। প্রথম নাতির জন্য বাবা *দাতা হরিশচন্দ্র* হয়ে উঠলেন।

দাদার আদরের মুমু চোখ বড় বড় করে বাচ্চার বিদেশি জিনিস দেখে। বিদেশি জিনিসে মার কোনও আগ্রহ নেই। কতদূর গেলে ঠিক বিদেশ যাওয়া হয়, মার কোনও ধারণা নেই, বিদেশ খুব সাংঘাতিক কিছু হবে হয়ত, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যেতে হয়, কিন্তু বিদেশি সিল্কের জামা দূরে সরিয়ে দেশি সুতির জামা বাচ্চাকে পরান মা, গরমের দেশে সুতির মত আরাম আর কি আছে! সেরেলাক্স, ফেরেলাক্স ইত্যাদি নানারকম বিদেশি গুঁড়ো খাবার সরিয়ে নিজের হাতে তিনি টাটকা টমেটো, গাজর, পুই শাক পালং শাক নরম করে বাচ্চাকে খাওয়ান। প্যাকেটের ফলের রস ফেলে দিয়ে বাজারের টাটকা ফল থেকে নিজের হাতে রস করে খাওয়াতে লাগলেন। গুঁড়ো দুধে মার বিশ্বাস বাচ্চার পেট খারাপ হয়, ব্রহ্মপুত্রের ওপারে গিয়ে নিজে তিনি ভাগীরথীর মাকে বলে আসেন, তাঁর নাতির জন্য এখন থেকে প্রতিদিন খাঁটি গরুর দুধ লাগবে। ভাগীরথীর মা পরদিন থেকে প্রতিদিন আধ সের করে দুধ দিয়ে যায়। বাড়িতে বাচ্চাটি রাজার বাচ্চার মত বড় হতে থাকে। মার ঘুম হারাম, বাবারও অনেকটা। আমি আর ইয়াসমিন ঘুম হারাম না করলেও বাচ্চা নিয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে থাকি। বেশ তো চলছে, কিন্তু বাচ্চার নামের তো দরকার আছে, *মণিটা সোনাটা বাবুটা* এসব ডাকলে কি চলবে! বাবা আকিকার

আয়োজন করলেন। আমরা যে যার বন্ধু বান্ধবকে নেমন্তন্ন করলাম, ছোটদা আর গীতাকেও নেমন্তন্ন করা হল। আকিকার দিন বিশাল এক ষাঁড় জবাই হল, বাবুর্চি আনা হল, বেল গাছের তলে বিশাল গর্ত করে, বড় বড় পাতিলে পোলাও মাংস রান্না চড়ানো হল। মহা আড়ম্বরে আকিকা অনুষ্ঠান হল। বাবা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে নাম পড়লেন বাচ্চার।

ডাক নাম হল সুহৃদ, আর আসল নাম আলিমুল রেজা।

কি? আলিমুল রেজা? ইয়াসমিন আর আমি পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। আমার ঠোঁট নাক ভুরু সব বেঁকে থাকে।

আলিমুল রেজা আবার কি? এইটা কোনও নাম হইল? আজকাল আরবি নাম কেউ রাখে?

বাবা কঠিন স্বরে বললেন, *রাখে।*

সুন্দর একটি বাংলা নাম রাখব ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছে ছিল হৃদয় রাখব, হৃদয় সমুদ্র। আমার ইচ্ছের কোনও মূল্য নাম রাখার মত বড় ক্ষেত্রে নেই। মা বললেন, *কোন এক পীরের কাছ থেইকা আলিমুল রেজা নামডা আনছে।*

কোন পীর?

রাজিয়া বেগমের পীর। তর মাথার তাবিজও ওই বেডির কাছ থেইকা আনছিল।

মাস দুই পর ছোটদা গীতাকে নিয়ে এলেন সুহৃদকে দেখতে। সুহৃদের জন্য একগাদা বিদেশি জিনিসপাতি রেখে ক্যামেরায় সুহৃদকে কোলে নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন কায়দার ছবি তুলে নিয়ে বিকেলেই চলে গেলেন ঢাকায়। অবশ্য পিয়নপাড়া হয়ে গেলেন। সুহৃদ মার কোলে কাখে বড় হচ্ছে। মার রাত দিন ব্যস্ততা। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। শাড়ি আলুথালু, চুল না আঁচড়ানো। সুহৃদের কাজের জন্য নার্গিস নামের এক মেয়েকে রাখা হয়েছে, নার্গিস সুহৃদের থাল বাটি ধোয়, খাবার জল ফুটোয়, সুহৃদের কাঁথা কাপড় কাচে, তবু মার এক ফোঁটা বিশ্রাম নেই। সুহৃদ মার যত্নে আদরে মোটা তাজা হতে থাকে। ক্যালেন্ডারের গ্লাক্সো কোম্পানীর বাচ্চাদের থেকেও সুন্দর হয়ে উঠতে থাকে ও। মা মা ডাকার আগে শেখে দা দা, দা দু। বাড়িতে সুহৃদের আদর হাসিনা আড়চোখে দেখে। দাদাও। বড় আদরে বড় হতে থাকলেও সুহৃদের একটি অসুখ দেখা দেয়। পেচ্ছাব করার সময় ও চিৎকার করে কাঁদে। ডাক্তার দেখে বললেন, অপারেশন করতে হবে। সুহৃদকে নিয়ে আমি আর বাবা হাসপাতালে যাই। বাড়িতে মা গলা ছেড়ে কাঁদছেন দুশ্চিন্তায়। অপারেশন থিয়েটার ফেটে যায় সুহৃদের চিৎকারে, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা আমারও চোখ ভেঙে জল নামে। পরের মাসে ছোটদা আর গীতা এলে সুহৃদের কষ্টের কথা শুনে দুজনের চোখই ভিজে থাকবে সারাক্ষণ, ভাবি। কিন্তু এলে, যেই না বিস্তারিত বর্ণনা করতে নিই কি করে এইটুকুন একটি বাচ্চা যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, ছোটদা মাঝপথে আমাকে থামিয়ে বলেন, *মুসলমানি হইয়া গেছে ভালাই হইছে।* এটুকুই, একটি *আহা* শব্দ শোনার সৌভাগ্য আমার হয় না। ভারি গলায় বলি, *এইডা মুসলমানি না, ফাইমসিস হইলে এই অপারেশন করতে হয়।*

চল তাস খেলি গা। ছোটদা এক হাতে আমাকে, আরেক হাতে গীতাকে ধরে শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলেন।

তাস যখন খেলছি এ ঘরে, ও ঘরে মা সুহৃদকে ঘুম পাড়ানি গান গাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছেন। ঘুম আসেনা ওর, ছটফট করে, গায়ে জ্বর আসছে ওর। মাথায় জলপট্টি দিচ্ছেন মা, জ্বর আসছে খবর পেয়ে আমি আর ইয়াসমিন দৌড়ে খেলা থেকে উঠে যাই।

বাবাকে খবর পাঠানো হয়, বাবা এসে সুহৃদের জ্বর দেখেন। দ্রুত চলে যান ফার্মেসি থেকে ওষুধ আনতে। ছোটদা আর গীতাকে বলি, *সুহৃদের গা জ্বরে পুইড়া যাইতাছে।* গীতা কপাল কুঁচকে বলে, *জ্বর হইল কেন? বাসি কিছু খাওয়াইছিল নাকি?*

বাসি? পাগল হইছ? মা দুধের বোতল ফুটানো পানিতে সাতবার ধইয়া নেয়।

চোখ কপালে তুলে গীতা বলে, *সাতবার ধইয়া নেয়?* যেন সাতবার যে কোনও জিনিস ধোয়া যায়, তা সে এই প্রথম শুনল। মা তাই করেন, মার ভয়, কখন আবার পেটের অসুখ, জ্বরজ্বারি হয়ে যায়। সুহৃদের খুব অল্প কিছুতেই কিছু হয়ে যায়।

যাও, সুহৃদের কাছে যাও না একটু। যাও, দেইখা আসো। বলি গীতাকে। সে অগত্যা তাস ফেলে সুহৃদের কাছে বসতে যায়। কিন্তু বসার দুমিনিট পর শুয়ে পড়ে, শুয়েই ঘুম। শেষ অবধি অন্য বিছানায় এসে তাকে ঘুমোতে হল। মা সারারাত জেগে রইলেন জ্বর হওয়া সুহৃদকে নিয়ে।

সুহৃদ অবকাশে তিন মাস যাপনের পর হাসিনাকে হাসপাতালে যেতে হল। তার বাচ্চা হবে। দাদার বন্ধুরা ডাক্তার, বাবার বন্ধুরা অধ্যাপক, মহা সুবিধে হাসপাতালে, বাচ্চা হয়ে যাবার পর, ইঁদুরের মত ছোট্ট ছেলেটির জন্য হাসপাতালের কেবিনে সব ডাক্তারদের মিষ্টিমুখ নয় কেবল, বিরানি-মুখ করালেন দাদা। আমি ক্লাসের বন্ধুদের নিয়ে বিরানি খেয়ে এলাম। ইদুঁরটি নিয়ে অবকাশে ফেরা হল। সুহৃদের যেমন যত্ন হয়, ঠিক তেমন যত্নের আয়োজন করল হাসিনা তার নিজের বাচ্চার জন্য। অর্জুনখিলা থেকে বাচ্চার জন্য একটি কাজের মেয়ে নিয়ে আসা হল, নতুন মেয়ে নতুন বাচ্চাকে কোলে রাখে, নতুন বাচ্চার কাঁথা কাপড় কাচে। বাড়িতে কাজের মানুষ এখন চারজন। নার্গিস আর ঝর্ণা, সুহৃদ আর নতুন বাচ্চা শুভর জন্য। বড়দের কাজ করার জন্য, রান্নাবান্নার, কাপড়চোপড় ধোবার, ঘর দোর পরিষ্কারের জন্য আনুর মা আর সুফি। আরেক জন ফুলেরা, অর্জুনখিলা থেকে আনা, হাসিনার ব্যক্তিগত কাজকর্ম করার জন্য। বাবা একদিন বাড়ির মানুষের মাথা গুনতে বসেন। গুনে বলেন, *এতগুলা মানুষের খাওন একজনের যোগাড় করতে হয়! লোক বিদায় কর।*

কারে বিদায় করতে কয় তোমার বাবা? ঝর্ণারে নাকি? হাসিনা কটাক্ষ করে।

দাদা বলেন, *ঝর্নার কথা কয় নাই।*

ঝর্নারে আনার আগে তো বাবা মাথা গুনে নাই!

বাবা মাথা প্রায়ই গোনে।

নার্গিস আসার পর গুনছিল?

তাও তো কথা! গুনে তো নাই।

দুনিয়াডা একটু বুঝার চেষ্টা কর।

দুনিয়া কি আমি বুঝি না নাকি?

না, মোটেও বুঝো না। বুঝলে তুমি মুখ ফুইটা কিছু কইতে পারতা। সুহৃদই তাদের একমাত্র নাতি না। সুহৃদের জন্য যা করা হয়, তার কয়ভাগ শুভর জন্য করা হয়? হিশাব আছে।

দাদা চুপ হয়ে থাকেন। সম্ভবত দুনিয়া বোঝার চেষ্টা করেন।

খসখসে কণ্ঠটি উঁচুতে ওঠে।

যাও,বাচ্চার পাউডার লাগবে, পাউডার নিয়া আস।

কি কও মুমু, পাউডার না কালকে আনলাম!

বাজে পাউডার। মুখ খসখস করে। জনসন আনো।

জনসন বেবি পাউডার বাজারে যা পাওয়া যায়, তা নকল। ময়দা ঢুকাইয়া রাখে কৌটায়। তিব্বত পাউডারই ভাল।

আরে কি আশ্চর্য, দেশি জিনিস ব্যবহার করব নাকি শুভর জন্য? তোমার কি মাথা খারাপ? আরেকটা বাচ্চার যত্ন ত চোক্ষের সামনেই দেখতাছ? কোনও দেশি জিনিস ব্যবহার হইতাছে ওই ঘরে?

কামালের মত বিদেশ গেলে না হয় বিদেশি জিনিস আনতে পারতাম। সেদিন পয়জন সেন্ট কিনলাম, মেইড ইন ফ্রান্স, শালার বোতলের মধ্যে নুরানি আতর ভইরা রাখছে। এই যে ফেরিওলারা খালি শিশি বোতল কিনতে আসে, ওরা কি করে জানো, শিশি বোতল গুলা নিয়া না বেইচা দেয় জিঞ্জিরায়, জিঞ্জিরায় সব তো দুই নম্বর মাল জানো তো!

অর্ধেক খরচ হওয়া জনসন পাউডারের একটি কৌটো হাসিনার দিয়ে মা বললেন *আমার চাইর পুলাপান বড় হইছে দেশি পাউডারে, শইলের চামড়া দেইখা পাড়ার মানুষে কইছে, কী মাখ যে চামড়া এত সুন্দর?*

হাসিনা পাউডারের কৌটো নেয় না। অর্ধেক ছাড়া পুরো নেই, মা কথা দেন পরের বার ছোটদা এলে তিনি শুভর জন্য বিদেশি পাউডার আনতে বলবেনই। পাউডারের ঘটনার দিনই ইয়াসমিন কলেজ থেকে ফিরে হাতের কাছে ঝর্ণাকে পেয়ে বলল, *এক গ্লাস পানি দে তো ঝর্ণা।*

ঝর্ণা এদিক ওদিক হাঁটে, কিন্তু পানি দেয় না।

কী রে পানি আনলি না?

আমি বাচ্চার কামের লাইগা। অন্য কাম করতে না করছে মামী। আপনেগো নার্গিস আছে, নার্গিসরে কন।

বড়দের কাজ করার দুজনের জায়গায় এখন একজন কেবল। এ বাবার লোক কমানোর আওয়াজে কমেনি, আনুর মা স্বেচ্ছায় হাওয়া হয়েছে, এরকম হাওয়া হওয়া খুব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। একজন হাওয়া হলে, আরেকজন উদয় হয়। এখন নার্গিসকে ছোটর কাজ শেষ করে এসে বড়র কাজে নামতে হয়। ভর সন্ধেয় ঘর মুছছে নার্গিস, তেরো বছর বয়স, ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ, ত্বক শুকিয়ে কাঠ,গা থেকে বোঁটকা গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘর মোছা রেখে *বোঁটকা গন্ধ* দৌড়ে গিয়ে কল চেপে গেলাসে পানি ভরে নিয়ে ইয়াসমিনকে দেয়। বোঁটকা গন্ধ ফিরে আসে ঘরে।

কি রে নার্গিস গোসল করস না নাকি?

করি তো।

খাওয়া গোসলের কথা জিজেস করলে ও শরমে মাথা নামিয়ে রাখে।

কি রে, খাইছস নার্গিস?

এই তো ঘরগুলা মুইছা গিয়াই খাইয়াম।

সন্ধ্যা হইয়া গেল, তর দুপুরের খাওয়া এখনও হয় নাই?

খিদা লাগে নাই তর? জিজ্ঞেস করি।

না খিদা লাগে নাই। খাইছি ত!

কখন খাইছস?

সকালে নাস্তা খাইছি তো।

প্রতিদিন কি সন্ধ্যার পর দুপুরের খাবার খাস?

না না। কী যে কন আপা। কাপড় ধোয়া হইছে তো। একটু দেরি হইয়া গেছে আজকে।

চোখে আমার করুণাধারা, মনে কন্টকীর বেড়ে ওঠা।

চুলোয় পাশে দুধ জ্বাল দিতে থাকা গরমে ঘামতে থাকা মাকে আমার রোষানলে আরও তপ্ত করি।

তুমি কি নার্গিসরে গোসল করার, খাওয়ার সময়ও দেও না নাকি?

মা ফুঁসে উঠলেন, *ও কখন খায়, কখন গোসল করে, এইসব খবর তুই জানস নাকি! ছেড়িডা এত ধীর গতির, একটা বোতল ধুইতেই দশ মিনিট লাগায়। নিজেই কইছে ঘর মুইছা পরে খাইব।*

সে সন্ধেয় নার্গিসের আর খাওয়া হয় নি। খেতে খেতে রাত বারোটা। মেয়েটির জন্য আমার বড় মায়া হতে থাকে। পরদিন সকালে রান্নাঘরে রুটি বেলছে। আমার *চা চাই* এর হাঁক শুনে, চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই ওর মুখে মুখে চেয়ে চমকে উঠি, সারা মুখে লাল ফুসকুড়ি।

কি রে তর কি হইছে, বসন্ত নাকি?

না, কিছু হয় নাই তো!

মুখে কিসের দাগ এত!

না কিছু না। নার্গিস হেসে হাতে মুখ ঢাকে।

ওর হাত সরিয়ে নিয়ে মুখের দাগগুলো দেখি। কয়েকশ ফুসকুড়ি মুখে, বীভৎস দেখাচ্ছে মুখটি। ফুসকুড়ি হাতেও আছে। পায়েও।

তর ত বসন্ত হইছে।

না, বসন্ত হইব কেন? কি যে কন আপা। মশার দুএকটা কামড়।

মশায় এইভাবে কামড়াইছে?

সুহৃদের গুমুতের কাঁথা নার্গিসের হাতে দিতে এসেছেন মা, কলপারে নিয়ে ধুতে হবে, রুটি বেলবে সুফি।

নার্গিসরে একটা মশারি দিতে পারো না নাকি মা? ওর তো মুখের অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ!

মশারি আছে তো। লাগায় না কেন? মার নিরুদ্বেগ স্বর।

মশারি লাগাই তো। ওই দুইএকটা ছিদ্র দিয়া মশা আসে। এমন কিছু না। নার্গিস তার গাল আড়াল করে রাখে দু হাত বোঝাই কাপড়ে।

ছিঁড়া মশারি শিলাই কইরা লইতে কইছি, ছেড়িডা আইলসার আইলসা। মা বলেন।

সেই রাতে মেঝেতে একটি ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে নার্গিস যখন শুয়েছে, রাত তখন অনেক। আমি ওকে টেনে তুলে বললাম, *যা মশারি লাগাইয়া শ।* ঘুমচোখে ও রান্নাঘরের খোপ থেকে মশারি নিয়ে এল। নার্গিস ছেঁড়া মশারিটিই টাঙাতে থাকে, এক ফিতে এক চেয়ারে, আরেক ফিতে এক ছিটকিনিতে। মশারিটিতে আমি গুনে দেখি, আটানব্বইটি ছিদ্র। ওই শত-ছিদ্র মশারি ব্যবহার করা না করা সমান কথা।

নার্গিসের মুখে আরও নতুন ফুসকুড়ি। পরদিনও আমি মশারি নিয়ে পড়ি।

মা, সুহৃদকে পায়ের ওপর শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছিলেন, কাছে গিয়ে সুহৃদের গালে আদর করে দিতে দিতে মাকে বলি, *মা ওই ছেঁড়া মশারি ছাড়া আর কোনও মশারি নাই নাকি? নার্গিসের মুখটা দেখছ?*

আর কোনও মশারি থাকলে কি আমি দেই না নাকি? তর বাপে কি কিছু কিনে? ছিঁড়া ছিঁড়া মশারি তো শিলাই কইরা চালাইতাছি। আমি যদি কই কামের মানুষের লাইগা মশারি লাগব, আমারে উল্ডা যা তা কথা কইব। সুহৃদের বিছানার লাইগা নতুন মশারি কিনছে। আমার ত নাইলে থাকতে হইত ছিঁড়া মশারি দিয়াই।

কও তাইলে যে আমার বিছানায় একটা মশারি লাগব, তারপর নতুনটা আমি লাগাইয়া আমারটা কাজের মানুষদের দিয়া দিই। সুফিরেও ত মশা কামড়ায়।

তর বাপেরে চিনস না! কিছুতেই কিছু কিনব না। টাকা পয়সা তো সব পাঠাইয়া দেয়। কাইলও রিয়াজউদ্দিন আইসা টাকা লইয়া গেছে।

সুহৃদ হঠাৎ ওয়াক করে উঠল, বমি।

মেজাজ খিঁচড়ে ওঠে মার। *পেটে কিচ্ছু থাকে না ছেলেটার, যা খাওয়াই তাই বমি কইরা ভাসাইয়া দেয়।*

মা দুধের বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নার্গিস সুপ এনে নরম গলায় বলল, *খালা, সুপটা কি এখন খাওয়াইবেন?*

ফালাইয়া দে সুপ। খাওয়াইয়া লাভ কি, সবই তো ভাসাইব।

জানি, মা যাই বলুন না কেন, নতুন উদ্যমে আবার সুপ বা দুধ খাওয়াতে শুরু করবেন, আবারও বমি করে ভাসাবে, আবারও খাওয়াবেন। মার অতি যত্নে ছেলেটি নাদুসনুদুস হচ্ছে।

ছোটদা গীতাকে নিয়ে যেদিন নাদুস নুদুসকে দেখতে এসে শহরে ঘুরে পিয়নপাড়া হয়ে সন্ধেয় বাড়ি ফিরে ফুরফুরে মন নিয়ে বলেন, *কালকে চইলা যাইতে হইব, পরশুদিন ফ্লাইট আছে।*

আইসাই যে যাই যাই করস, মা বলেন *সুহৃদরে তো একটু কোলেও নিলি না।*

কোলেই আসে না, কি আদর করাম!

মা, বাবা, আমার আর ইয়াসমিনের কোল ছাড়া আর কারও কোল সুহৃদের ভাল লাগে না। ওর নিজের বাবা মা এলে মুখ ফিরিয়ে রাখে। এতে ছোটদার আপত্তি না থাকলেও গীতার আপত্তি।

আমার পেটের ছেলে হইয়া আমার দিকে ফিরে না?

মা হেসে বলেন *আমাদেরে দেখে তো চোখের সামনে, তাই। তুমি আরও ঘন ঘন আসবা, তাইলেই চিনব তোমারে।*

সকালে ছোটদার নাস্তার জন্য ঘি এ ভাজা পরোটা আর খাসির মাংস করতে মা রান্নাঘরে ছোটেন।ছোটদারা বাড়ি এলে সুখাদ্যের আয়োজন হয়। যে ছোটদাকে বাবা ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছিলেন, সেই ছোটদাকে এখন কাছে বসিয়ে *বাবা আমার, ছেলে আমার* বলে আদর করে কাছে বসান। যে ছোটদা চুরি করে দাদার জামা পরতেন, সেই ছোটদার পরনের জামা দেখে দাদার চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, *বাহ! শার্টটা তো সুন্দর! আমার লাইগা এইরকম একটা শার্ট আইনা দিস তো!* যে ছোটদা আমার কাছে এক টাকা দু টাকা ভিক্ষে চাইতেন, সেই ছোটদা বলেন, *কী রে তর সেঁজুতির খবর কি!*

খবর আর কী! ছাপানোর টাকা নাই।

দে তর পাণ্ডুলিপি দে। ঢাকা থেইকা ছাপাইয়া আইনা দিই।

সেই ছোটদা সেঁজুতির পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন ঢাকায়, ছাপতে। পাণ্ডুলিপি তৈরিই ছিল। এ সেঁজুতিতে রুদ্রর কবিতা তো আছেই, *এখন যৌবন যার ,যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়* এর নিভৃত নির্জন কবি হেলাল হাফিজের আর পশ্চিমবঙ্গের কিছু কবির কবিতা। রুদ্রর এক বন্ধু,মইনুল আহসান সাবের, নতুন গল্প লিখতে শুরু করেছে, চমৎকার গল্প লেখে, ওর একটি গল্প আর নিজের একটি গল্পও, এই প্রথম সেঁজুতিতে আমার গল্প, আর আনন্দমোহন কলেজের বাংলার অধ্যাপক শরফউদ্দিন আহমেদের কবিতার একাল সেকাল নিয়ে একটি প্রবন্ধ। এবার নিজে প্রচ্ছদ করিনি। শিল্পী দিয়ে করা। ছোটদার হাতে

পাণ্ডুলিপি দেওয়ার আগে তড়িঘড়ি সম্পাদকীয় লিখে দিই, *একেবারে নিরুৎসাহ ছিলাম। সত্য ও সুন্দরের এমন আকাল পড়েছে দেশে, সৃষ্টিশীল কিছু একটা করতে এক পা এগোলে দু পা পেছোতে হয়। আমার বাবা বলেন সেঁজুতি করে করে আমি নাকি আমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজাচ্ছি। মা দুঃখ করে বলেন, মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেল। একেবারে নিরুৎসাহ ছিলাম, একজন বাড়িয়ে দিল সহযোগিতার হাত। আমার শৈশব আর কৈশোরের ভালবাসা। গোপনে গোপনে যার লেখা থেকে আমার কবিতার প্রেরণা। তার হাতে আমার শ্রম আর সাধনার ধন সেঁজুতি তুলে দিলাম আর আমার পরম বিশ্বাসটুকু দিলাম।*

পরম বিশ্বাসের মর্যাদা ছোটদা রেখেছেন। দিব্যি সেঁজুতি ছেপে আনলেন। অবশ্য সে ঘরে আসতে আসতে তিন মাস পেরোলো। ছোটদা বললেন, *ওই দাড়িঅলা বেডার কবিতা বাদ দিছি।*

রুদ্রর কবিতাহীন সেঁজুতিটি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। প্রথম কাজ রুদ্রর ঠিকানায় দশ কপি পাঠিয়ে দেওয়া। পেয়ে সে জানাল, আরও পঁচিশ কপি পাঠাতে। পঁচিশ কপির পর আরও চাইল। ময়মনসিংহেও সেঁজুতি বিলি হল। স্টেশন রোডের পত্রপত্রিকার দোকানে বিক্রি করতে দিলে বেশ বিক্রিও হল। সেঁজুতির পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে আবারও মন চায়। কিন্তু সময় কোথায়। লেখাপড়ার চাপ বাড়ছে। বাবা বললেন, *এখন থেইকা যদি ফাইনালের জন্য প্রস্তুতি না নেস, তাইলে আর পাশ করা হইব না।* বাবা কথা ভুল বলেন না। প্রতিবছর শেষ পরীক্ষায় আটকে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। দুবারে গতি হচ্ছে না,এমন কি চারবারেও না। আমার এক ক্লাস ওপরের ছাত্র রাজিবকে বাবা বলেছেন আমাকে যেন তিনি তাঁর নোটখাতাগুলো পড়তে দেন। রাজিব মেডিকেলের সবগুলো পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছেলে, শিক্ষকদের আদরের ধন। এক কথায় চিকিৎসাবিদ্যার যে কথা বলা যায়, একশ কথায় তার *নাড়ি নক্ষত্র* তুলে ধরে লেখা খাতার স্তূপ দিয়ে গেলেন আমাকে। নাড়ি নক্ষত্রে ঝুঁকে আমার বেলা ফুরোতে লাগল।

নানা আসছেন প্রায়ই দুপুরে। বারান্দার চেয়ারে বসে তিনি উঠোনের রোদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাকিয়ে থাকেন যতক্ষণ না মা এসে বারান্দার বা উঠোনের রোদে পিড়ি পেতে বসিয়ে নানার ফর্সা শরীরটিকে মেজে গোসল করাতে ডাকেন। মার নাভিশ্বাস ওঠে সংসার সুহৃদ সামলাতে। তারপরও নানা এলে নানাকে রোদে বসিয়ে শরীর মেজে গোসল করিয়ে বাবার একটি ধোয়া লুঙ্গি পরিয়ে শুইয়ে রাখেন। নানা বাচ্চা ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুম থেকে উঠলে মা ভাত এনে দেবেন খেতে, ভাতের পর পায়েস। নানার পায়েস খাওয়ার মধ্যে বাবা চলে আসেন। মা অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, *বাজান তো এই বাড়িতে আসেই না, আসলেও তো কিছু খায় না। কত কইয়া একটু পায়েস খাইতে দিলাম।*

বাবা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, *তোমার বাপেরে যে পায়েস খাওয়াইতাছ, তার ত ডায়বেটিস!*

একটু খাইলে কিচ্ছু হইব না। বাজান মিষ্টি খাইতে পছন্দ করে।

আমি *নাড়ি নক্ষত্রে।* নাড়ি নক্ষত্র থেকে উঠে যেই না মার শরবতের কিনারা করতে পেশাবখানায় যাচ্ছি, দেখি মা দরজা ধরে বসে আছেন।

কি? রক্ত গেছে পাইলসের।

হ।

মা ওই রক্ত যাওয়া শরীরেই উঠে সুহৃদের দুধের বোতল ফুটোনো পানিতে ধুতে শুরু করেন। বোতলে দুধ ভরে, সুহৃদকে ফুটফুটে এক রাজকুমারের গল্প বলতে বলতে দুধ

খাওয়াবেন মা। দুধ খাওয়ানো শেষ হলে বনবাসী এক রাজকুমারীর গান শোনাতে শোনাতে ঘুম পাড়াবেন। সে রাতে বাবা ফিরলে বলবেন, *পাইলসের কোনও চিকিৎসা নাই? রক্ত যা আছে শইলে, সব তো গেল গা!*

বাবা উত্তর দেবেন না। একবার আমার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে যাবেন নাড়িনক্ষত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নাকি কবিতা লিখছি নাকি প্রেমপত্র!

মা কাতরকণ্ঠে বলতে থাকবেন, *আমার তো একটু দুধ খাওয়া দরকার। একটা কলা অন্তত দিনে। একটা ডিম। এইভাবে রক্ত গেলে শইলে তো আর কিছু থাকব না। আমার জন্য এক পোয়া কইরা দুধ দিতে কই ভাগীর মারে?*

বাবা এসবের উত্তর দেবেন না।

সুহৃদ হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। চারপাশে রাজ্যির খেলনা নিয়ে খেলতে শিখেছে। সুহৃদের প্রতিটি উত্তরণে আমার আর ইয়াসমিনের আনন্দ উপচে ওঠে। আমরা কাড়াকাড়ি করি ওকে কোলে নিতে। ওকে নিয়ে বেড়াতে। ওকে দোলাতে। সুহৃদকে কোলে নিয়ে বারান্দার দোলনায় দোলাচ্ছি।

দাদা বারান্দায় বসে গলা ছেড়ে গান গাইছেন, *হাড়ের ঘরখানি চামড়ার ছাউনি বান্ধে বান্ধে জোড়া।* টাঙ্গাইলের রাস্তায় এক ভিখিরিকে গানটি গাইতে দেখে শিখেছেন।

হাসিনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খেঁকিয়ে ওঠে, *গান গাইলে চলব! শুভর মুরগি নিয়া আস।*

দাদা গান থামিয়ে বলেন, মুরগি নাই?

না নাই। শুভর মুরগি নাই।

একদিন মুরগি না খাইলে কিছু হইব না মুমু।

হাসিনার গলা চড়ে, দাঁড়কাকের কর্কশতা গলায়, *কিছু হইব না মানে! বাড়িত ত আরেকটা বাচ্চা আছে, কেমনে ফু পাইড়া পালা হইতাছে দেখতাছ না! তুমার বাচ্চার বেলায় এত অবহেলা কেন! নাতি কি একটাই নাকি? শুভ কি নাতি না?*

মুরগি নাই কও কেন? ওই তো উঠানে মুরগি হাঁটতাছে।

হাসিনার চোখ থেকে আগুনের ফুলকি ওঠে।

বাচ্চা-মুরগি নাই।

ওই যে দেখ মুমু খাঁচার মধ্যে বাচ্চা মুরগি। জবো করতে কও।

ওইগুলা সুহৃদের, ভাল কইরাই ত জানো। তুমার ছেলের জন্য তো আর বাবা মুরগি কিন্যা রাখে নাই।

মা শব্দ শুনে বেরিয়ে এসে নাক গলান, *বৌমা এই সব কি কও, সবসময় না তোমার শ্বশুর দুই বাচ্চার জন্য মুরগি কিনতাছে। সবসময় না দুইটা মুরগির সুপ হইতাছে। সুহৃদের একটা, শুভর একটা। তোমার শ্বশুর তো দুই বাচ্চার জন্যই দুধ ডিম সব কিনতাছে। শুভ সুহৃদ দুই জনই ত নাতি।*

দুই জনই ত নাতি। তা ত জানি। কিন্তু এক নাতির দিকেই ত সবার নজর। শুভর দিকে কে ফিরা চায়! হাসিনা কড়মড়িয়ে ওঠে।

ফির্যা চায় না মানে! কি যে উল্ডা পাল্ডা কথা কইতাছ। সুহৃদের বাবা মা কাছে নাই। তাই ওরে দেখতে হয়।শুভ ত তার বাপ মার সাথেই আছে।

হাসিনা ঘরে গিয়ে শাড়ি পাল্টে, *আমি পারভিন আপার বাসায় যাইতাছি, মা শুভরে দেইখা রাইখেন ত।*

বলে গটগট করে পেছনে না ফিরে চলে যায়। মা তখন এক হাতে সুহৃদকে, আরেক হাতে শুভকে সামলাচ্ছেন।

দাদা বাকি গানটুকু গাইছেন।

হাসিনা প্রায়ই তার নকলে ফুপাতো বোন আসলে আপন বোন পারভিনের বাড়িতে যায়। কুসুমের বাড়িতেও যায়। কুসুম নিজের স্বামী, রেলওয়ে ইস্কুলের হেডমাস্টারকে ছেড়ে করিম নামের এক বিবাহিত ছেলেমেয়েঅলা লোককে বিয়ে করেছে। করিম দেখতে অনেকটা তরমুজের মত, গোলগোল। কুসুমও। গোলগাল তরমুজ দাদার বিয়ের পর প্রায়ই এ বাড়ি বেড়াতে এসে বলে *যাইও, তোমরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াইয়া আইস।* করিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনটি একধরনের দেখাশোনার কাজ করে। একধরনের, কারণ না সে বোটানিস্ট, না মালি। বেড়াতে গিয়ে একদিন নানারকম ফুলের চারা নিয়ে এসে বাড়ির মাঠে মাটি কেটে পুঁতে দিয়েছি, হাজারি গোলাপ ফুটছে, তরতর করে বাড়ছে চেরি, এমন যে ছাদ ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাগানের শখ আমার হঠাৎ হঠাৎ হয়। একবার টিনের ঘরের কিনার ঘেঁষা বাগানে ধনে পাতা লাগালাম, প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে মাটিতে আঙুল বুলিয়ে হতাশ হয়ে যেতাম, এত দেরি করে যে এরা বড় হয়! গোলাপ গাছ লাগিয়ে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় একবার দেখে আসি ফুল ফুটেছে কি না, সপ্তাহ পেরিয়ে যায়, গোলাপের কোনও চিহ্ন নেই, ব্যস উৎসাহ নিবে গেল। আর সব আগাছার মত গোলাপ গাছও বড় হতে লাগল, কলেজ থেকে একদিন ফিরে হঠাৎ চমকে উঠি দেখে ফুটে থাকা লাল গোলাপ। চেয়ে পাওয়ায় যত সুখ, তার চেয়ে বেশি বুঝি না চেয়ে পাওয়ায়!

হাসিনা ফিরে এলে, বিকেলে, শুভকে তার মার হাতে বুঝিয়ে দিয়ে সুহৃদকে সাজিয়ে গুজিয়ে মা নিয়ে গেলেন নানি বাড়ি, অনেক দিন ও বাড়ি যান না তিনি। বারান্দার গা ঘেঁষেই আমার ঘর, বারান্দার যে কোনও ফিসফিসও কানে আসে আমার, ইয়াসমিন বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে যখন বলছে, *কি রে শুভর গুঅলা পটটা সকাল থেইকা বারান্দায় পইড়া রইছে, সরায় না কেন কেউ!*

হাসিনা বারান্দার চেয়ারে পা তুলে বসেছিল, বলল, *তুমি সরাও না কেন?*

কী কইলা?

কইলাম তুমি সরাও না কেন? দেখতাছই যহন যে পটটা পইড়া রইছে।

আমি সরাইতাম কেন?

সুহৃদের পট সরাও না?

সরাই।

তাইলে শুভর পট সরাইতে পারবা না কেন?

শুভর পট সরাইতাম ক্যা?

কেন শুভর পট সরাইতে পারো না?

পারি না।

পারি না কইলেই হইব নাকি? পারতে হইব।

পারতে হইব না।

পারতে হইবই।

পারতে হইবই কেন? শুভর কাজের ছেড়ি আছে না? ঝর্ণা কি করে?

সুহৃদের তো নার্গিস আছে। তাইলে তরাও ত সুহৃদের পট সরাস। তরা ত সুহৃদের চাকর।

হ চাকর। সুহৃদের চাকর হইছি ভালা হইছে।

শুভরও চাকর হইবি।

কেন হইতাম?

হইতে হইব।

তুই কইলেই হইতে হইব?

হ। আমি কইলেই হইতে হইব।

কি কইলি?

যা কইলাম, কইলাম।

আবার ক।

সুহৃদের গু খাইতে পারস, শুভর গু ও খাইতে হইব।

ইয়াসমিন এবার লাখি মেরে শুভর পটটিকে ফেলল উঠোনে।হাসিনা উড়ে এসে ইয়াসমিনের চুল টেনে বলল, *যা পট তুইলা আন।* ইয়াসমিনও হেঁচকা টান দিয়ে হাসিনার চুলে বলল, *তুই আন।*

আমি শব্দ শুনে *নাড়ি নক্ষত্র* থেকে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে এই চুলোচুলি দেখেই শরীর গলিয়ে ইয়াসমিনকে ছাড়িয়ে আনতে গেলাম। তিন জনে ধস্তাধস্তি। এর মধ্যে কোত্থেকে উড়ে এসে স্যুটেড বুটেড দাদা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমার আর ইয়াসমিনের ওপর, ইয়াসমিনের চুল শক্ত মুঠিতে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে ফেললেন উঠোনের মাঝখানে যেখানে শুভর পট উল্টে পড়ে আছে। হাসিনা দৌড়ে গিয়ে পড়ে থাকা ইয়াসমিনের মুখ বুক খামচে পিঠে ধড়াম ধড়াম কিল বসাতে শুরু করেছে। ইয়াসমিন খোয়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেয়ে চাইছে হাসিনাকে ওই পটের ওপর ফেলতে। হাসিনা দুহাতে ওর মুখ ঠেসে ধরে পটের ওপর, মুখ সরিয়ে ইয়াসমিন খামচি দিয়ে ধরে হাসিনার পা, টেনে ফেলতে চায়, পারে না। দাদা এবার লাথি বসালেন ইয়াসমিনের ঘাড়ে। ক্রমাগত। লাথি ঘাড়ে পিঠে নিতম্বে, উঁরুতে। ইয়াসমিন হাত ছুটে যায় হাসিনার পা থেকে। লাথি খেয়ে কুণ্ডুলি পাকাতে থাকা ইয়াসমিনের মুখের ওপর হাসিনা উপুড় করে ধরে পট। ওর মুখে লেপ্টে থাকে শুভর গু। এই নৃশংস কাণ্ড দেখে আমি হাঁ হয়ে আছি। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এ আমাদের দাদা! এর মধ্যে আরোগ্য বিতান থেকে শুভর জন্য আলাদা করে বাবার পাঠিয়ে দেওয়া দশটি মুরগি হাতে সালাম দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দায়, হতবাক সালাম উঠোনের নৃশংস দৃশ্যটি দেখে। দেখল। আমার পক্ষে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব হয় না আর, ইয়াসমিনকে ছাড়িয়ে আনতে ছুটে যাই, পারি না, আমার পিঠেও কিল পড়ে, আমার চুলেও শক্ত টান পড়ে। ইয়াসমিনের সারা শরীরে তখন দাদা আর হাসিনার শক্ত শক্ত লাথি। ইয়াসমিন কাঁদে না। ওর চোয়াল শক্ত হতে থাকে। আমি অসহায় বসে থাকি ইয়াসমিনের পাশে। আমাদের দুজনের গা ধুলোয় গড়াতে থাকে।

এই ঘটনার পর দাদা আর হাসিনার সঙ্গে আমি কথা বলা বন্ধ করে দিই।

মা বাড়ি এলে সব শুনে এ ঘর ও ঘর হাঁটেন, খামোকা হাঁটেন, বলতে বলতে, *এর শইলডা হিংসায় ভরা। সুহৃদরে সহ্য করতে পারে না। কবে যেন বিষ খাওয়াইয়া ছেড়াডারে মাইরা ফেলব।*

বাবা ঘটনা শুনে কোনও রা করলেন না।

বাবার চুপ হয়ে থাকায় মা চেঁচিয়ে বলেন,*মেয়ে দুইডারে যে ছেলে তার বউরে নিয়া মাইরা শেষ কইরা রাখল, সব শুইনাও কোনও কিছু করতাছেন না! ইয়াসমিন তো শইল নড়াইতে পারে না, হাড্ডিগুড্ডি ভাইঙা থইছে মাইরা! আমি সুহৃদরে দিয়া দেই কামালের*

কাছে। এ হইল ওগোর শত্রু। ছেড়াডারে এই বাড়িতে পালা হইতাছে, এইডাই ওগোর সহ্য হয় না। আপনে থাকেন আপনার ছেলে আর ছেলের বউরে নিয়া। আমি কোথাও যাই গা। কী ছেলে জন্ম দিছিলাম রে খোদা, আপন বইনদেরে মারে, তাও আবার বউরে নিয়া।

বাবার নৈঃশব্দের মধ্যেও মা চেঁচান, *নাসরিন ইয়াসমিন, তরা ছেলে দেখ, বিয়া টিয়া কইরা এই বাড়ি থেইকা তাড়াতাড়ি যা। বাপেও তার ছেলেরে আশকারা দিব তোদেরে মাইরা লুলা বানাইতে।*

মার এসব কথার উত্তর কেউ দেয় না।

এর সাতদিন পর, গুমোট বাড়িটিতে দাদা জানিয়ে দিলেন যে তিনি বদলি হয়েছেন বগুড়ায়। বাবা দাদাকে ডেকে পাশে বসিয়ে বললেন, *বগুড়ায় কেন?*

আমি কি জানি! কোম্পানী বদলি করল। দাদার উদাস উত্তর।

বগুড়া কোনও একটা জায়গা হইল যাওয়ার? বগুড়ায় কি আছে?

মহাস্থান গড় আছে।

মহাস্থানগড় দিয়া তুমি কি করবা?

বগুড়ার দই তো ভাল।

তা কি দই এর লোভে যাইতাছ নাকি?

বদলি হইছি বইলা যাইতাছি।

বাড়িঘর ফালাইয়া দূর দেশে কই থাকবা, কী খাইবা!

দাদা উঠে যান, বাবা বসেই থাকেন। মা তাড়া দেন, *ভাত বাড়া আছে, খাইয়া লন।*

বাবার সে রাতে আর খেতে ইচ্ছে হয়নি। তিনি দুহাতে মাথার চুল খামচে ধরে বসে থাকেন।

দাদার বদলি হওয়াতে সবচেয়ে যে বেশি খুশি হয়েছে এ বাড়িতে, সে হল হাসিনা। হাসিনা গুনে গুনে কাচের বাসন, চামচ এসব বাক্সে ভরল। কালো ফটকের সামনে চেয়ার পেতে বসে পা নাড়তে নাড়তে, বাড়িতে যত আসবাব ছিল দাদার, হিশেব করে ট্রাকে তুলল। টেলিভিশনটিও।

দাদারা চলে যাবার পর ঘরগুলো হঠাৎ ন্যাংটো হয়ে গেল। এক কোণে পড়ে আছে রং ওঠা পুরোনো বেতের সোফা আর কয়েকটি ছালওঠা চেয়ার, দেয়ালে চৌকোনা দাগ, আর কটি বাঁকা তারকাঁটা।

প্রায়ই লক্ষ করি বারান্দায় একলা বসে থাকেন মা, সন্ধের দিকে। হু হু বাতাসের নাকি মার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে ঘরে, ঠিক বুঝি না। সন্ধেয় বাতি জ্বলে ঘরে ঘরে, মা বসেই থাকেন একা অন্ধকারে, মার হাতে তসবিহটি ঝুলে থাকে, নড়ে। ঘর ছেড়ে জড়ত্ব ঝেড়ে উঠোনে নেমে কোনও কারণ ছাড়া হাঁটতে থাকি এক সন্ধেয়।

মা, বাইরে বইসা রইছ কেন? ঘরে যাও।

মা শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলেন, *নোমানডা রাগ কইরা বাড়ি থেইকা চইলা গেল! ঘরের ছেলে যদি ঘরে না থাকে তাইলে কি ঘরে থাকতে ইচ্ছা করে!*

নোমান নোমান কর কেন? আমরা আছি না? নাকি আমরা কেউ হই না তোমার!

মেয়েরা তো বিয়া হইলে পরের বাড়ি চইলা যায়।

আমি তেতো গলায় বলি, *তোমার ছেলেরাই তো পরের বাড়ি গেছে গা। মেয়েরাই রইছে।*

মেয়েরা আইজ আছে, কাইল নাই। মা বলেন।

তোমার ছেলেরা তো আইজও নাই। কাইল তো নাই ই।

মা চুপ হয়ে যান।

বারান্দার কাপড় শুকোনোর দড়িতে দুহাত রেখে সামনে পেছনে দুলতে দুলতে উঠোনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলি, *এত যে ছেলে ছেলে কর, দুইটা ছেলেই তো দূরে সইরা গেল।*

হ সব গেল গা। এখন বউই তাদের কাছে আপন। বাপ মা ভাই বোন কিছু না। মা মিহি গলায় বলেন।

আমি ভেতরে ঢুকে যাই। শীতল নিস্তব্ধতা জুড়ে বসে থাকি। ইয়াসমিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় কেবল। আনন্দমোহনে যাচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু বাড়িতে বই পত্তরের কোনও খোঁজ নেই। দেবনাথ পন্ডিতকে বাড়ি এসে ইয়াসমিনকে পড়াতে বলেছিলেন বাবা, তিনি রাজি হননি। রাজি হননি কারণ ছাত্রছাত্রীসংখ্যা এত বেশি তাঁর যে একা কারও জন্য তাঁর সময় দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র তিনি *গ্রুপে* পড়াতে পারবেন। ইয়াসমিন দেবনাথ পন্ডিতের বাড়িতে *গ্রুপে* পড়তে যায়, ফিরে এসে খাতা বই ছুঁড়ে দিয়ে বলে, *কি পড়ায় কিচ্ছু বুঝি না!* বাড়িতে বই নিয়ে বসার নাম গন্ধ নেই। নিথর বাড়িটিকে চমকে দিয়ে আমি চেঁচাই, *ইয়াসমিন পড়তে ব।* ইয়াসমিন পাশ ফেরে শোয়। আবারও চেঁচাই, *ওঠ, পড়তে ব।* ইয়াসমিন চেঁচিয়ে থামায় আমার চেঁচানো। ওর কি করতে হবে না হবে, ও নিজে ভাল বোঝে, কারও পরামর্শ দেওয়ার দরকার নেই। আমাকেও ও দূরে সরিয়ে রাখে। আমার সঙ্গী হয় একটি শাদা বেড়াল। একটি শাদা বেড়াল আমার সঙ্গী।শাদা একটি বেড়াল আমার সঙ্গী। সঙ্গী শাদা বেড়াল। বেড়ালই ভাল। মানুষের চেয়ে সহস্রগুণ ভাল। বেড়ালটিকে আমি বুকে জড়িয়ে বসে থাকি। এ বাড়িতে নর্দমার ফাঁক গলে অথবা পাঁচিল পেরিয়ে বেড়াল আসে, বেড়ালেরা তক্কে তক্কে থাকে সুযোগ বুঝে রান্নাঘরে ঢুকে পাতিলে মুখ দেয়। যে বেড়ালই আসে, মা তাড়িয়ে দেন। সব বেড়াল নাকি *চোরা বিলাই।* তাড়ালে চলে যায়, আবার আসে। এই শাদা বেড়ালটি যখন এসেছিল, একেও তাড়ানো হয়েছিল, কালো ফটকের ওপারে নর্দমায় ফেলে আসা হয়েছে, বেড়ালটি পরিষ্কার হয়ে এ বাড়িতে চলে এসেছে আবার। শেষে বেড়ালটিকে নিয়ে নতুনবাজারের কাঁচাবাজারের জটলায় ফেলে আসা হল, পরদিন দেখি উঠোনের রোদে বেড়ালটি শুয়ে আছে। এবার বাবার আদেশ, একে বস্তায় পুরে নদীর ওপারে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। তাই করা হল। সালাম একটি বস্তায় বেড়ালটিকে পুরে বস্তার মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নৌকো ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্রের ওপারে গিয়ে কাঁটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এল। বাড়িতে সকলে জানে, বেড়াল আর ফিরবে না, কোনও কারণ নেই ফেরার। সাতদিন পার হয়েছে, বেড়ালের কথা ভুলেই গেছে সবাই। কিন্তু হঠাৎ দেখি বেড়ালটি বিকেলবেলা কালো ফটকের সামনে সজল চোখে দাঁড়িয়ে আছে, আমি আয় আয় বলে ডাকতেই দৌড়ে ও চলে এল আমার কাছে। রান্নাঘরে নিয়ে পাতিলের তলায় যেটুকু ভাত ছিল দিই। হাভাতের মত খেয়ে বেড়ালটি আমার পেছন পেছন, যেখানেই যাই, যেতে লাগল। সেই থেকে এ বেড়ালটিকে আমি আর কাউকে দিই না কোথাও ফেলে আসতে। থেকে গেছে এ বাড়িতে, রাতে বিছানায় আমার পায়ের কাছে ঘুমোয়। চেয়ারে বসলে লাফিয়ে আমার কোলের ওপর এসে বসে। বেড়ালটি ভাত আর মাছের কাঁটাকুটো খেয়ে জীবন কাটাচ্ছে এ বাড়িতে। আমি খেয়ে পাতে সামান্য রেখে দিই বেড়ালটির জন্য। মাকে লুকিয়ে আমার নিজের ভাগের মাছের টুকরো থেকে কিছুটা ওর ভাতে মিশিয়ে দিয়ে দিই। বেড়ালটিকে বুকে জড়িয়ে আমি বসে আছি আমার ঘরে। অন্য ঘরে, যেটি একসময় ছোটদার ঘর ছিল,

অসময়ে ইয়াসমিন ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে উঠে ভাত খেয়ে আবার ঘুমোবে সে। যেন ঘুমের মত এত সুখের জিনিস পৃথিবীতে আর নেই। ওর ঘাড়ের হাড়ে ব্যথা, পিঠের হাড়ে ব্যথা, হাঁটুতে ব্যথা। দাদা আর হাসিনার নৃশংসতা ওকে এই অসুখগুলো দিয়েছে। ইয়াসমিনকে নিয়ে হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে গিয়েছি। মেডিসিনের অধ্যাপক প্রভাকর পুরকায়স্থকে দেখিয়েছি, তিনি ওর বুকে স্টেথোসকোপ বসাতে গিয়ে বারবারই চাপ দিচ্ছিলেন স্তনে। ও প্রভাকরের ঘর থেকে মুখে বিরক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর ওর হাঁটুর ব্যথা এমনই তীব্র হয়ে উংল যে হাঁটু নিয়ে ও আর উঠতে বসতে পারছিল না। সেই হাঁটু পরীক্ষা করতে দাড়িঅলা হারুনুর রশিদ খানের কাছে যাই, তিনি হাড়ের ডাক্তার, কেবল ডাক্তার নন, রীতিমত অস্থিবিদ্যা-বিভাগের প্রধান। ইয়া লম্বা দাড়ি মুখে, মাথায় টুপি, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। কোনও অধ্যাপককে এই লেবাসে দেখে অভ্যেস নেই আমার। লেবাস যেমনই হোক, ডাক্তার ভাল তিনি। আমাকে চেনেন তিনি, আমার বাবাকেও। বাবা যখন হাসপাতালে ছিলেন, বাবাকে একটি তাবিজ দিয়ে এসেছিলেন বালিশের নিচে রাখতে। ওটি নাকি অসুখ ভাল করার ওষুধ।সেই ফর্সা লম্বা দাড়িঅলা ভাল ডাক্তার অস্থিরোগ চিকিৎসায় এক নম্বর তাবিজ কবজে আল্লাহ রসুলে বিশ্বাসী ইয়াসমিনকে তাঁর চেম্বারের রোগি দেখার টেবিলে শুইয়ে দিয়ে পর্দা ঢেকে দিয়ে ওর হাঁটু টিপতে টিপতে হাঁটু থেকে হাত ওপরে নিতে নিতে তলপেট -পেট টিপে টিপে বুকে গেলেন। বুক টিপে বাইরে থেকে ফুসফুস বা হৃদপিণ্ডের অস্তিত্ব বুঝতে চাইলেন কি!ইয়াসমিন বের হয়ে আমাকে শুধু বলল, *আমারে আর কোনওদিন কোনও ডাক্তারের কাছে নিও না। আমার অসুখ ভাল হওয়ার দরকার নাই।* আমার অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে হারুনুর রশিদ খানের কাছে জিজ্ঞেস করি, *আমার বোনের হাঁটু পরীক্ষা করার কথা ছিল আপনার, বুক পরীক্ষা করার নয়। বুকে কি ছিল পরীক্ষা করার?* ইচ্ছে হয়েছে প্রভাকর পুরকায়স্থকে বলি, *আপনার তো কোনও পারকিনসনস রোগ হয়নি যে বুকে স্টেথেসকোপ বসালে হাত বার বার সরে যায় চাকতি থেকে!* ইচ্ছে হয়েছে, পারিনি। গলার কাছে শব্দগুলো কষ্ট হয়ে বিঁধছিল, বেরোতে পারেনি।

মা তখনও বাইরের অন্ধকারে, মার হাতের তসবিহ নড়ছে না।

পুকুর দেখেছি, নদী দেখেছি, সমুদ্র দেখা হয়নি কোনওদিন। বউ নিয়ে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে মধুচন্দ্রিমা করে আসার পর দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম *দাদা গো সমুদ্র দেখতে কেমন!* দাদা একটি কথাই বলেছেন,না গেলে বুঝবি না। *সমুদ্র কেমন সে কথা কখনও বইলা বুঝানো যায় না, সমুদ্রের সামনে দাঁড়ায়া উপলব্ধি করতে হয় সমুদ্র।* সমুদ্রের চেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস দাদার উড়োজাহাজ নিয়ে। উড়োজাহাজে প্রথম চড়েছেন তিনি। ছোটদা উড়োজাহাজের গল্প করলে দাদা এতকাল তৃষ্ণার্ত নয়নে তাকিয়ে থাকতেন। নয়নের সেই তৃষ্ণা দাদার ঘুচেছে এখন। আমার অবশ্য কিছুই ঘোচেনি। উড়োজাহাজের চেয়ে সমুদ্র দেখার উৎসাহটিই আমার বেশি।

সমুদ্রপাড়ে তোলা দাদা আর হাসিনার ছবি দেখে, সমুদ্র না দেখেই লিখে ফেলি সমুদ্র নিয়ে তিনটে কবিতা। না দেখা সমুদ্র যখন আমার হৃদয় জুড়ে, তখনই *চল চল সমুদ্র দেখবে চল, কাপড় চোপড় গোছাও* রব। চতুর্থ বর্ষে এই একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে, এক ক্লাস ছাত্রছাত্রী নিয়ে কমিউনিটি মেডিসিনের শিক্ষকরা দূরে কোথাও চলে যান, দূর বলতে দেশের মাথা থেকে লেজে যাওয়া, লেজের কাছে থই থই করছে রূপোলি জল, সেই জলে ডোবো, ভাসো। অবশ্য বলা হয় জলীয় আবহাওয়া দেখাতে নিচ্ছেন, আসলে এ অনেকটা হাওয়া বদলের মত, রোগীদের যেমন হাওয়া বদলের দরকার হয়, হবু ডাক্তারদেরও হয়। দিনরাত হাসপাতালের পুঁজ-গন্ধময় হাওয়া থেকে খানিকটা নিস্তার পাওয়া হয়।

ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়ে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে বাসে চড়ে কক্সবাজার। বাড়িতে হইচই পড়ে গেল, হইচইই বটে, এমন তো কখনও ঘটে না, আত্মীয় কাউকে না নিয়ে দূরের কোনও শহরে চলে যাওয়া। মা বার বার জিজ্ঞেস করলেন *মাস্টাররা থাকবে তো!* দুঘন্টার পথ ঢাকা, ঠিক আছে মানায়, ঢাকায় আত্মীয়ও আছে, কিন্তু চট্টগ্রামে তো আমার মামাও থাকে না কাকাও না। মামা কাকার সীমানার বাইরে বলেই সম্ভবত পেখম মেলে একশ ময়ূর নাচে হৃদয়ে। বাবা দরাজ হস্তে দিয়েছেন টাকা, *হাইজিন ট্যুরের* চাঁদা তো আছেই, বাড়তি টাকাও। ট্রেনে চড়ে দলের ঢাকা যাত্রা হয়। সেগুনবাগিচা ছেড়ে ছোটদা এখন নয়াপল্টনে বাড়ি ভাড়া করেছেন। নয়াপল্টনে একরাত থেকে পরদিন কমলাপুর রেলইষ্টিশনে পৌঁছতে হবে সকাল আটটায়। রাতে গীতার কাছে শাড়ি চাইতেই আলমারি খুলে বিছানায় লাল নীল সবুজ হলুদ কাতান সিল্ক এমনকি মসলিন বিছিয়ে দিল পছন্দ করে নিতে একটি নয়, যত খুশি। বোতাম টিপলে আলো জ্বলে এমন একটি ক্যামেরাও মিলল। আর কি চাই! আশাতীত পাওয়া আমার।

পরদিন ট্রেনে চড়ে কখনও হৈ হল্লায় মেতে, কখনও জানালায় উদাস চোখ মেলে পৌঁছই চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম থেকে বনের ভেতর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথে সারি সারি রাবার

গাছের বাগান পার হয়ে কক্সবাজার যখন পৌঁছই, উত্তেজনা তুঙ্গে। একটি শব্দ, ভীষণ এক শব্দ, অন্যরকম, মাটি কাঁপানো, জল কাঁপানো, শব্দটির দিকেই বাস যেতে থাকে। ঠিক কোত্থেকে শব্দটি আসছে বুঝতে আমি চারদিক খুঁজি। বাসের জানালা থেকে কিছুতেই চোখ সরে না। দূরে একটি শাদা কিছু একবার উঠছে একবার নামছে। সাফিনাজ, হালকা হালকা বন্ধুত্ব অতিক্রম করে ঘনিষ্ঠ হওয়া একজন, জানালায় ঝুঁকে বলল, *ওইটাই কি সমুদ্র নাকি!* কোনওদিন সমুদ্র না দেখা মেয়ে আমি, ইচ্ছে করে, বাস থেকে নেমে দৌড়ে যাই দেখতে ,যদি ওটাই সমুদ্র হয়, কিন্তু কে দেবে আমাকে ছুটে যেতে! আগে মোটেলে নামো, তারপর। মোটেলে দুজনের জায়গায় চারজনকে ঢোকানো হল এক ঘরে। বরাদ্দ ঘরে সুটকেস নামিয়ে রেখে আগে দৌড়ে যাই ওই শব্দের দিকে। গোসল নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। আগে আমি সমুদ্র দেখব তারপর অন্য কিছু। সাফিনাজ পরিপাটি মেয়ে, *খাওয়ার সময় খাওয়া পড়ার সময় পড়া ঘুমের সময় ঘুমের* মেয়ে। ওকে যেতে হয় আমার উত্তেজনাকে সঙ্গ দিতে। সেই তীব্র গর্জনের দিকে হেঁটে নয়, দৌড়ে যাই। যখন পৌঁছই, বিস্ময় আর মুগ্ধতা আমাকে স্থবির করে রাখে, আমাকে নিস্পন্দ করে রাখে,আমাকে বিবশ করে রাখে। একটি শব্দ আমি আর উচ্চারণ করতে পারি না। এত বিশাল কিছু, এত অদ্ভুত সুন্দর কিছু, এত আশ্চর্য হৃদয়রঞ্জন কিছু আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি। নানিবাড়ির ছোট্ট পুকুরের ধারে বড় হয়েছি, শহরের তিনকোনা পুকুর ছিল নানিবাড়ির পুকুরের চেয়ে দ্বিগুন, সেটি দেখতে যেতে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল কয়েকটি বছর, বড় হয়ে ব্রহ্মপুত্র দেখা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্রের শীর্ণ জলের ধারা দেখেই মনে হয়েছে এর চেয়ে বিশাল কিছু বুঝি পৃথিবীতে নেই। আমার কল্পনায় ছিল সমুদ্র। সেই সমুদ্র এই সমুদ্রের সৌন্দর্যের ধারে কাছে আসতে পারে না। আমার অবাধ কল্পনা এত বিশাল কিছু এত আশ্চর্য সুন্দর কিছু এত কূল কিনারাহীন কিছু আমাকে দিতে পারেনি। আমি লক্ষ করি না আমার চোখ যে ভিজে যাচ্ছে চোখের জলে। সূর্য ডুবছে সমুদ্রে। আমি তন্ময় হয়ে শব্দ শুনি সমুদ্রের, ভেজা চোখে সূর্যের ডুবে যেতে থাকা রূপ দেখি। সূর্যাস্ত আমি আগেও দেখেছি অনেক, এমন রূপ দেখিনি আগে। আমাকে বিহ্বল করে রাখে, বিমুগ্ধ করে রাখে, বিমূঢ় করে রাখে প্রকৃতির এই অনিঃশেষ সৌন্দর্য। ধীরে ধীরে দল বেঁধে আসতে থাকে ছেলেমেয়েরা, সূর্যাস্তের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। এই সুন্দর থেকে কোথাও আমার আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। রাত নেমে এলে সাফিনাজ আমাকে টেনে নিয়ে যায় মোটেলে, রাতের সৈকত নাকি নিরাপদ নয়। মেয়েরা সব চলে যায় মোটেলে, ছেলেরা পূর্ণিমা দেখবে বলে থেকে যায় অনেক রাত অবদি সৈকতে। আমার বড় ছেলে হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে সারারাত সমুদ্র আর চাঁদের জলে ভিজি। মোটেলের ঘরের বারান্দায় চাঁদের আলোয় বসে বসে একা একা সমুদ্রের ডাক শুনি। আয় আয় আয় বলে ডাকছে আমাকে। ভোরবেলা সূর্য ওঠার আগে সূর্যোদয় দেখব বলে দৌড়ে যাই সমুদ্রের দিকে। পরনে লাল একটি শাড়ি আমার। খালি পা। খোলা চুল। সমুদ্রের ঢেউ আমাকে ভাসিয়ে নেয়, ডুবিয়ে নেয়। উঠি উঠি সূর্য আমার শরীরের জলের ফোঁটায় চুমু খায়। ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে আসে, ওদেরও বলি ঢেউএর সঙ্গে খেলা করতে। *ওইতো ফেনিয়ে ওঠে শরীর ভাসিয়ে নেয় জোয়ারের ঢেউ, এর নাম ভালবাসা, আমি তাকে নেশা বলি, তীব্র তৃষ্ণা বলি। হৃদয় ভাসিয়ে নেয়, জীবন ভাসিয়ে নেয় মোহন ঘাতক, আয় আয় ডাকে আয়, সর্বনাশ তবু ডাকে আয় আয় আয়, এর নাম ভালবাসা, আমি তাকে সুখ বলি, স্বপ্ন বলে ডাকি!* সারাদিন সমুদ্রের জলে খেলা করি। আমাকে নেশায় পায়, ভালাবাসায় পায়। বিকেলে ঝুপড়ি দোকানে দারুচিনি চা পান করতে করতে সূর্যাস্তের জন্য অপেক্ষা করি।

নোনাজলে ঠোঁট রেখে উপচে পড়েছে দেখি আকাশে পূর্ণিমা, শরীরে উল্লাস নাচে,কাঁচা অঘ্রাণের ঘ্রাণ তুফান নামায়। ঘুম আয় ঘুম আয় হৃদয়ে সমুদ্র ডাকে আয় আয় আয়, শিয়রে সোনার কাঠি রাজকন্যা ঘুম যায় যাদুর পালঙ্ক।

সমুদ্র থেকে আমাদের নিয়ে আসা হয় চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীদের, ছাত্রাবাসে ছাত্রদের থাকার জায়গা করা হয়েছে। হালিদা, সাফিনাজ, শিপ্রা আর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে ঘুরে ফিরি সবুজ টিলার নিচে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া নীল জলের ফয়েজ লেকের ধারে। ঘাসে বসে বালিহাঁসের পাখনা মেলে ওড়া দেখি। সব কিছুই আমার এত ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে রুদ্রর না থাকা আমাকে একটু একটু বিষণ্ন করতে থাকে। রুদ্র এলে হাতে হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটা যেত এই লেকের জল, এই পাহাড় এই সবুজের অপরূপ রূপে হৃদয়ে ভেজাতে ভেজাতে। ময়মনসিংহ ছাড়ার আগেই রুদ্রকে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম খবর জানিয়ে যে আমি সমুদ্রপাড়ে যাচ্ছি, যেন যায় সে ওখানে। কক্সবাজার থেকে কবে ফিরব চট্টগ্রাম, কোথায় থাকব, আবার চট্টগ্রাম থেকেই বা কবে ফিরে যাবো ঢাকায়, সবই জানিয়েছিলাম। এমন চমৎকার সময় আমার জীবনে আর আসেনি আগে, যে করেই হোক যেন সে যায়। মিঠেখালিতে বসে আছে সে অনেকদিন, মিঠিখালি থেকে রুদ্র যত কথাই দেয় যে বেরোবে এক বা দু সপ্তাহ পর, দুমাস তিনমাস কেটে যায়, তার বেরোনো হয় না। গ্রামটিতে একটি শেকল আছে, যখনই সে যায়, শেকলে জড়িয়ে যায়, সে চাক বা না চাক।

যেদিন আমরা চট্টগ্রাম থেকে ফিরে যাবো ঢাকায় তার আগের রাতে রুদ্র এসেছে। সাইফুল,রুদ্রর ছোটভাই, ছাত্রীনিবাসে আসে, রুদ্রকে সঙ্গে করে। সাইফুল চট্টগ্রাম মেডিকেলে প্রথম বর্ষে সবে ভর্তি হয়েছে। সাইফুলকে প্রথম দেখি সে রাতে। ছোটখাটো হাসিখুশি ছেলে। রুদ্রর চোখের মত ডাগর চোখ ওর। পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ছেলে। ছেলেটি চমৎকার, কথা বলে এমন করে যেন আমাকে এক যুগ ধরে চেনে। ওর সঙ্গে আমি সহজে সহজ হই। সে রাতে তিনজন রিক্সা করে বেরিয়ে একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে যখন রাতের খাবার খাচ্ছি, রুদ্রর লাল হয়ে থাকা চোখ, বড় হয়ে যাওয়া চুল,দাড়িতে দৃষ্টি বারবার হোঁচট খায়। সাতদিন স্নান করেনি, ঘুমোয়নি, যেন এইমাত্র কোনও গুহা থেকে উঠে এসেছে। সাতটি দিন কেটে গেল আমি ময়মনসিংহের বাইরে কেন সে আগে আসেনি, কেন ফিরে যাবার আগের দিন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এল, আমরা দুজন কি সুন্দর খেলা করতে পারতাম সমুদ্রের জল নিয়ে, ঢেউ নিয়ে, পাশাপাশি বসে দেখতে পারতাম সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, পূর্ণিমায় গভীর রাত অব্দি বালুতে পা ছড়িয়ে বসে দেখতে পারতাম জলের ওপর চাঁদের আলোর সাঁতার কাটা। বাবার রক্তচক্ষুহীন টিঁ টিঁ পড়ার ভয়হীন এই চট্টগ্রাম শহরটিতে রিক্সার হুড ফেলে আমি নিশ্চিন্তে তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে পারতাম। অভিমান আমাকে ধোঁয়ায় ঢাকতে থাকে। ধোঁয়া সরিয়ে রুদ্রর ভারি কণ্ঠস্বর আমাকে স্পর্শ করে, চট্টগ্রাম থেকে কাল আমাকে ঢাকা নয়, যেতে হবে মোংলা। যদিও নতুন কোনও শহর দেখার ইচ্ছে আমার প্রচণ্ড, কিন্তু মোংলা যাওয়ার প্রস্তাবটি শুনে *না* বলে দিই। না বলি কারণ দল থেকে মাস্টারেরা আমাকে বেরোতে দেবেন না। হয় না, ঢাকায় আরও ট্যুর আছে, সেরে, দলের সঙ্গে ফিরতে হবে ময়মনসিংহে। রুদ্র চোখ কুঁচকে ঠোঁট কুঁচকে রাখে এই না বলায়। সাইফুল বলে, *আরে যাও না বৌদি একটু ঘুরে আসো মোংলায়।* সাইফুলের বৌদি ডাকে আমার চেতন হয় যে আমি কারও বৌদি, কারও বৌদি মানে আমি কারও বউ। রাতে ছাত্রীনিবাসে সাফিনাজের পাশে শুয়ে এপাশ ওপাশ করি, ভাবনার

একটি রশি বেয়ে বন্ধ ঘর থেকে ছাদের ওপর উঠি, ছাদ থেকে আরও ওপরে শূন্যে, দুহাত মেলে দিই ভাসতে থাকি, কী আনন্দ কী আনন্দ! আর কবে পাবো এমন ছুটি!এর চেয়ে সুযোগ কি আমার জীবনে আসবে আর, হারিয়ে যাওয়ার সুযোগটি হাতছাড়া করি কেন! পরদিন রুদ্রকে নিয়ে ট্রেনে উঠে ঢোক গিলতে গিলতে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাদাসিধেটিকে বলি, যে আমাকে আজই খুলনা যেতে হচ্ছে, খুলনা থেকে কালই ঢাকায় ফিরব, ঢাকার ট্যুর এ থাকবো। কিন্তু শিক্ষক সাদাসিধে হোক আর যাই হোক, তিনি আমাকে যেতে যেবেন কেন, এতগুলো হবু ডাক্তাদের ভালয় ভালয় ভ্রমণ করিয়ে ভালয় ভালয় ফেরত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব যখন নিয়েছেন, তিনি সুষ্ঠু ভাবেই পালন করবেন।

কার সঙ্গে যাবে?

কার সঙ্গে যাব? এর সহজ উত্তর, দাড়িঅলা লোকটিকে দেখিয়ে বলে দেওয়া, *ওর সঙ্গে।* এরপরই তো প্রশ্ন উঠবে *ও কে, ও কি।* তাও না হয় দেওয়া গেল, *ও রুদ্র, ও কবি।* এর পরের প্রশ্নটি, তিনি খুব সাদাসিধে বলেই করা স্বাভাবিক, *ও তোমার কি হয়?*

আমার অপ্রফুল্লবদনটি দেখে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো শওকত আর মদিরা, দুজনে প্রেম করে বিয়ে করেছে, ওরা জানে দলছুট হওয়ার আনন্দ। শওকত কানে কানে বলে, *আগে বল তুমি বিয়ে করেছ কি না, স্যারকে বলতে হবে হাজবেণ্ডের সাথে যাচ্ছে, তা না হইলে ছাড়বে না।*

না, এ কথাটি বলা যাবে না, এই *স্যার* গিয়ে আমার *বাবা-স্যারের* কানে কথাটি দিলে সব্বনাশ হবে। শওকত হেসে, আমার *বলব কি বলব না* ভঙ্গির দিকে, তাকিয়ে, বলে,

স্যাররে বইলা দিই জিনিসটা গোপন যেন কাউকে না জানায়!

যদি জানায়?

আরে তুমি ঢাকায় দুইদিন পর চইলা আসো, দলের সাথে পরে ময়মনসিংহে ফিরো, অসুবিধা কি!

শওকত আমার খুলনা যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে। এ যে অবৈধ পুরুষ নিয়ে ভেগে যাওয়ার কোনও ব্যাপার নয়,রীতিমত *বৈধ পুরুষের* সঙ্গে হাওয়া হওয়া, তা সে ইঙ্গিতে শিক্ষক-কাম-পাহারাদারকে বুঝিয়ে আমাকে পার করে। আমি রুদ্রর সঙ্গে পথে নেমে পড়ি। পথ থেকে ট্রেনে করে খুলনা, খুলনা থেকে লঞ্চে মোংলা। দলছুট হওয়ার পর বড় একা লাগে আমার। দলের সঙ্গে উচ্ছ্বাস ছিল, হঠাৎ যেন মিইয়ে গেল সব। হঠাৎ যেন একটি সম্পর্কের বন্ধন এসে আমাকে জড়ালো। আমাকে একটি কর্তব্যের কুয়োয় টুপ করে ব্যাঙের মত ফেলে দিল।

রূপসা নদীর ওপর দিয়ে লঞ্চ চলছে মোংলায়। নতুন একটি নদী দেখছি, নতুন নতুন মানুষ দেখছি। আমার ভাল লাগতে শুরু করে। লঞ্চে উঠে রুদ্র বলল *শাড়িটা পাল্টে নাও।*

শাড়ি পাল্টাবো কেন? এই তো বেশ।

শাদা একটি সুতির শাড়ি পরনে আমার। শাড়ি পরার অভ্যেস না থাকলেও সমুদ্র যাত্রায় মেয়েরা সব শাড়ি পরেছে, শাড়ি পরার এই সুযোগ পেয়ে আমারও আহ্লাদ কম নয়।

যা বলছি কর।

কেন, এই শাড়িতে কি খারাপ লাগছে দেখতে?

হ্যাঁ লাগছে। পাল্টাও। শিগরি কর, ঘাট এসে গেল।

খুব কি দরকার শাড়ি পাল্টানোর?

হ্যাঁ খুবই দরকার।

রুদ্র কেবল কবিতা নয়, শাড়ি নিয়েও ভাবে। সুতি শাড়ি ও মানে না। কাতান পরতে হবে।

কাতান পরতে ইচ্ছে করছে না।

কেন ইচ্ছে করবে না?

করছে না।

কি আশ্চর্য!

কোনওটা তো ইস্ত্রি নেই।

না থাক, তবু পর।

কাতান পরতে হবে। সবুজ বা নীল হলে চলবে না। লাল পরতে হবে।সমুদ্রে ভিজে সব শাড়ি দলামোচা হয়ে আছে। দলামোচা থেকেই একটি পরতে হল।লাল। দুপুরবেলা ঘাটে পৌঁছে দেখি এক বিরান বন্দর। কটি খালি সাম্পান বাঁধা ঘাটে। কেমন গ্রাম গ্রাম,আবার ঠিক গ্রামও নয়। বুকের মধ্যে হু হু করে ওঠে। টানা বস্তি পেরিয়ে রুদ্র একটি দোতলা বাড়ির সামনে রিক্সা থামিয়ে বলল, *এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত মাথায় ঘোমটা দাও তো!*

আমি চমকে উঠি রুদ্রর কথায়।

মাথায় ঘোমটা? কেন?

আরে দাও না।

আমি কখনও এসব দিই না।

দাও না জানি, এখন দাও।

কেন?

বুঝতে পারছ না কেন, তুমি তো এ বাড়ির বউ!

শুনে গা কাঁপে। অনেকটা আনন্দ, অনেকটা শরম, অনেকটা ভয় মিশিয়ে আমি তখন ঠিক বুঝে পাচ্ছি না কী করব। রুদ্র বলল, *সালাম করতে হবে কিন্তু পা ছুঁয়ে।*

না।

কেন?

আমি কখনও ওসব করি না।

করতে হবে।

আমার দ্বারা হবে না। অসম্ভব।

তুমি বুঝতে পারছ না কেন! সালাম না করলে খারাপ দেখায়।

কেন খারাপ দেখাবে?

দেখায়।

দেখায় কেন? কী মানে আছে পা ছোঁয়ার?

বড়দের করতে হয়। বুঝতে পারছ না কেন! আর তুমি তো এ বাড়ির বউ।

খারাপ দেখাক। আমি পারব না এসব।

ইস কি জ্বালা!

পা না ছুঁয়ে মুখে সালাম বললে হবে না?

না, হবে না।

আনন্দ উবে গিয়ে এক শরীর অস্বস্তি আমাকে গ্রাস করে। এই পা ছোঁয়ার ব্যাপারটি আমি পারি না। ঈদ এলে নতুন কাপড় জামা পরার পর মা এখনও বলেন, *যাও তোমার বাবারে সালাম কইরা আসো।*

দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মা যত ঠেলেন, কাঠ তত ভারি পাথর-মত হয়ে ওঠে। *ঈদের সময় মুরব্বিদেরে সালাম করতে হয়।* এই *করতে হয়* ব্যাপারটি আমি বুঝি, কিন্তু কেন করতে হয় তা ঠিক বুঝি না। তোমাকে বড় বলে মানি, শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তা কেন পা ছুঁয়ে বোঝাতে হবে আমাকে! আর কোনও উপায় কি নেই বোঝাবার! আমি অবাক তাকিয়ে থাকি রুদ্রর দিকে, ধর্ম না মানা, রীতি নীতির তোয়াক্কা না করা রুদ্রও পা ছোঁয়ার ব্যাপারটিকে কেমন সায় দিচ্ছে! এত দূরে একটি বিরান বন্দরে এনে রুদ্র যেন আমার ঘাড় ধরে ধাক্কা দিল তার মা বাবার পায়ের দিকে। আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, এই বন্দরে চেনা কেউ নেই এক রুদ্র ছাড়া, অথচ এই রুদ্রকেই বড় অচেনা লাগে। মাথা আমার আঁচলে ঢাকা, পিঠে রুদ্রর খোঁচা, এক খোঁচা, দুই খোঁচা,তিন খোঁচার পর আমি তার মার পায়ের দিকে নত হই। ঠিক জানিও না সালাম জিনিসটি কি করে করে। পায়ে হাত ছুঁইয়ে হাতদুটো বুকে নিতে হয়, নাকি কপালে নাকি ঠোঁটে ধাঁধা লাগে। পা ছুঁইয়ে সংশয়ের ভারে আমার হাত হাতের জায়গায়ই থাকে। এক দঙ্গল ভাই বোন রুদ্রর, এক এক করে এল পরিচিত হতে। ভিড়ের মধ্যে আরও একা লাগে আমার। যেন আমি অদ্ভুত এক জীব এসেছি মানুষের ভিড়ে। বীথি, রুদ্রর ছোটবোন, বলল *কী দাদা, তোমার বউ কি বোবা নাকি কথা কচ্ছে না কেন!* কি কথা বলব ঠিক বুঝে পাই না। বুঝে পাই না কি কথা বলা উচিত আমার। আমি গুটিয়ে থাকি।

রুদ্রর বাবা, রুদ্রর চেয়েও লম্বায় খাটো, পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার কাঁধ সমান হবেন, মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি, পাজামা পাঞ্জাবি পরা, বাড়িতে ঢোকেন। রুদ্রকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি, *উনি তো ডাক্তার তাই না!*

হ্যাঁ।

তাহলে এই পোশাক যে!

ধর্ম বিশ্বাসী।

ডাক্তার হয়ে ধর্ম বিশ্বাস করেন!

আমি অবাক তাকিয়ে রই। বারান্দায় পিঁড়িতে বসে বদনির তোলা পানিতে অযু করেন তিনি। রুদ্রর মা তোয়ালে এগিয়ে দিলেন অযুতে ভেজা হাত মুখ মুছতে, ঘরে জায়নামাজ বিছানো, তিনি নামাজ পরবেন। নামাজ শেষ হলে রুদ্র আমাকে নিয়ে যাবে তার বাবার সামনে। বুক টিপটিপ করে। *বাবা* জিনিসটিই আমার মনে হতে থাকে বড় ভয়ের। রুদ্র অস্থির পায়চারি সেরে আমাকে নিয়ে ঢোকে নামাজ সেরে চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতে তসবিহ জপতে থাকা তার বাবার কাছে। আমি শাড়ির আঁচলে আঙুল পেচাচ্ছি।

আব্বা, এই আমার বউ। বলে আমাকে বলল, *যাও আব্বাকে সালাম কর।* আমি লজ্জার মাথা খেয়ে উপুড় হই। তিনি দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলেন, *বস।*

তোমার বাবা মার শরীর ভাল?

আমার বাবা মাকে তিনি চেনেন না, তাঁদের শরীর ভাল কি না ভাল নয় তা জানতে চাচ্ছেন কেন আমি বুঝতে পারি না। মুহূর্তে বাবা মার মুখ মনে ভেসে ওঠে। হাইজিন ট্যুরে যাওয়া মেয়ে তাঁদের কোথায় এখন, যদি জানেন, তবে তাঁদের ভাল থাকা কোথায় যে উবে যাবে!

কোন ইয়ারে পড় তুমি।

ফোর্থ ইয়ার।

ও। ডাক্তার হতি তো বেশি দেরি নেই। তোমাদের বাড়ি তো ময়মনসিংহে!

হ্যাঁ ময়মনসিংহে।

এ কি ঢাকার উত্তরে না দক্ষিণে।

উত্তরে।

তা মোংলায় থাকবে কিছুদিন তো!

রুদ্র বলে, *হ্যাঁ থাকবে।*

তা শহিদুল্লাহ, ওকে নিয়ে মিঠেখালি যাবে কি?

দেখি।

মিঠেখালি ঘুরি আসো।

খাওয়া দাওয়া হইছে?

না।

যাও খাওয়া দাওয়া করি বিশ্রাম নাওগে যাও, অনেকদূর জার্নি করে এসেছো।

রুদ্র আমাকে নিয়ে দোতলায় ওঠে। নতুন চুনকাম হয়েছে। দোতলা নতুন করা হচ্ছে, এখনও কাজ শেষ হয়নি। এই দোতলা করার ব্যাপারটি রুদ্র বলে, *যা তা,* হুড়মুড় করে ওপরের ঘরগুলো একদিন ভেঙে পড়বে, কারণ মাটির তত গভীরে যায়নি বাড়ির শেকড়। শুনে ইট কাঠ লোহার সঙ্গে চুন সুরকির মত আমিও ভেঙে পড়ি। দোতলার একটি ঘর রুদ্র আর আমার জন্য গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে, মোংলা এলে রুদ্র এ ঘরটিতেই থাকে। একটি মাঝারি খাট, একটি টেবিল, টেবিলের পাশে দুটো চেয়ার ঘরে। শাদা দেয়াল চারদিকে, একটি শুধু জানালা। তাকালে কিছু গোলপাতার গাছ আর একটি দোতলা বাড়ির পশ্চাতদেশ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না।

বিকেলে রুদ্র বেরিয়ে যায়,একা। আমি সঙ্গে যেতে চাইলে বলেছে এই বন্দরে বাড়ির বউএর এভাবে বেরোনো ঠিক নয়। তবে কি আমি মোংলা বন্দরটি, এই নতুন জায়গাটি দেখব না? না,দেখার কিছু নেই এখানে, শ্রমিকদের বস্তি ছাড়া আর কিছু নেই। শ্রমিকদের বস্তিই দেখব। না। শ্রমিকেরা আমাকে হাঁ হয়ে দেখবে, গিলে খাবে। তার চেয়ে রুদ্রর ভাই বোনদের সঙ্গে আমি যেন গল্প করি। কিন্তু ওদের সঙ্গেই বা কি গল্প করব! কাউকে আমি চিনি না। আমার বড় একা লাগে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি সামনে জল আর জল। উঠোন পেরোলেই নদী। বীথিকে বলি, আমি ওই নদীটি দেখতে দেখতে যাবো। নদী? ও দেখার কিছু নেই। ও তো কেবল জল! জলই দেখব। জল দেখে কি করবে, বীথি হাসে। জলের কাছে গেলে আমাকে বলে, নোংরা জল, জলে হাত দিও না, পা ভিজিও না। জলহীন হাঁস আমি, হাওয়ায় সাঁতার কাটি। ডাঙাই আমার ঠিকানা, ডাঙায় আমার বসতবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি। হাতের কাছে পায়ের কাছে অগাধ অফুরন্ত জল, যেদিকে চোখ যায় জল, থৈ থৈ জল অথচ বাড়িটিতে জলের অভাব। বাইরে থেকে একটি ছেলে দু তিন বালতি নদীর জল দিয়ে যায় প্রতিদিন, ও দিয়ে রান্না করা, পায়খানা পেচ্ছাব করা, গোসল করা, সবই সারতে হয়। গা লবণ লবণ লাগবে, চুল আঠা আঠা লাগবে, করার কিছু নেই, জলের অভাব, জলের তীরে বাস করে জলের এমন অভাব দেখে বিস্ময়ের ঘোর কাটে না আমার। পান করার জলও আসে বাইরে থেকে। ওরা বলে *মিষ্টি জল,* যদিও এক ফোঁটা মিঠে নয় স্বাদ, খরচা করতে হবে বুঝে, কেবল যদি তেষ্টায় ছাতি ফাটতে থাকে। মিষ্টি জল এ বন্দরে মেলে না, খুলনা শহর থেকে এখানে নৌকো করে জল আসে, এ দিয়েই তেষ্টা

মেটাতে হয় বন্দরের সবার। বীথি বলে *খুলনা থেকে পানি তো এই সেদিন থেকে আসে, এর আগে তো খাতি হত বিষ্টির পানি।*

বৃষ্টির পানি?

মিঠেখালিতে তো ওই খাই আমরা। বড় বড় কলসি পেতে রাখি উঠোনে, ওতে বিষ্টির পানি জমি থাকে, ওই খাই।

ও পানি খাওয়া যায়?

যাবে না কেন?

বীথি *জলপানির* প্রসঙ্গ থেকে আলটপকা সরে গিয়ে বলে, *আচ্ছা বৌদি তুমি কি গয়নাগাটি কিছু আননি? বাড়ির বউ, লোকে কি বলবে বল! কাল বিকেলে লোকজন আসবে, সীমুর জন্মদিন। আমি কিছু গয়না দিয়ে যাবনি, ও পরে রেখো।*

সন্ধে শেষ হয়ে রাত নেমে আসে। বার বার ঘড়ি দেখি,ছটফট করি।

তোমার দাদা এখনো ফিরছে না!

ফিরবেনি, অত ভেবো না। পুরুষমানুষ, বাইরে বন্ধুবান্ধব থাকি, যাতি হয়।

তাই বলে এত রাত করবে?

ফিরবে ফিরবে। বউ আছে ঘরে, যত রাত হোক ফিরবে। বীথি হাসে। হাসিতে মুক্তো ঝরে।

অনেক রাত করে রুদ্র ফেরে। যখন শার্ট প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরে নিচ্ছে, বিছানাটির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে আমার বুক কাঁপে, খুব বৈধভাবে এ বিছানায় আমাদের শুতে হবে দুজনকে, শোবার দিন শেষ অবদি এলই আমাদের। একটি রাত কাটানোর জন্য রুদ্র সেই যে কবে থেকে মরিয়া হয়ে উঠেছে, সেই রাত কাটানোর রাত তবে এলই। যেন আমরা দাম্পত্য জীবনে কতকালের অভ্যস্ত মানুষ, *চল শুয়ে পড়ি,* বলে সে মশারি ফেলে শুয়ে পড়ে।

কই এসো।

আসছি।

আসছি, বুকের কাঁপন খানিক থামুক, আসছি। *তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে* যাচ্ছে, এক গেলাস জল খেয়ে এই আসছি। অস্থির হয়ো না, আমি আসছি। না এসে আমার উপায় কি!

কি ব্যাপার বসে আছো কেন? সারারাত ওখানেই কাটাবে নাকি?

আমাকে যেতে হয় বিছানায়, শরীর যেতে থাকে দেয়ালের দিকে। দেয়াল সাঁটা শরীর টেনে রুদ্র তার বুকের কাছে নিয়ে আসে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, যেন ছুটে যেতে না পারি। ছুটে আর কোথায় যাব আমি! আমার তো যাওয়ার আর জায়গা নেই। রুদ্রর কাছে আসব বলেই তো নিজেকে তৈরি করছি। নিজেকে শতবার করে বুঝিয়েছি *রুদ্র তোমার স্বামী, স্বামীর সঙ্গে রাত কাটানোর এই সুযোগ তুমি নষ্ট করো না, তুমি বাইশ বছরের তরুণী এখন, ছোট্ট খুকি নও, আর সবাই যদি স্বামীর সঙ্গে শুতে পারে, তুমি পারবে না কেন!* নিষিদ্ধ জিনিসটির স্বাদ পেতে আমারও ইচ্ছে করে গোপনে গোপনে। রুদ্র আমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাইছে। আমি প্রাণ মন তাকে কবেই দিয়ে বসে আছি, কেবল শরীর গুটিয়ে থাকে শামুকের মত। সমস্ত লজ্জা আর ভয় ভাঙার সময় কি আমার আসেনি! আজ যদি আমার গুটিয়ে থাকা শরীরকে খুলে না দিই, যদি আজ আমি শেকল ছিঁড়ে শরীরটিকে মুক্ত না করি, আজ যদি আমার ভালবাসার মানুষকে বঞ্চিত করি, এ আমার নিজেকেই বঞ্চিত করা হবে। রুদ্র কোনও অন্যায় দাবি করেনি। স্বামীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা অন্যায় নয়। একদিন না একদিন তো আমাকে দিতেই হবে যেটুকু

বাকি আছে দিতে, তবে আজ নয় কেন! রুদ্র আমাকে চুমু খায়। ঠোঁটে গাঢ় করে চুমু খায়। চুমু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, বাতি জ্বলছে। এর অর্থ বাতি নেবাতে হবে। বাতি নিবিয়ে ঘর কালো করে তুমি এবার যা ইচ্ছে কর, আমি বারণ করব না। রুদ্র বাতি নিবিয়ে ঘর কালো করে আমার বোজা চোখ, শুকনো ঠোঁট, চিবুকের ভাঁজ ভিজিয়ে দেয়। ব্লাউজের বোতাম খুলে মুখ ডুবিয়ে দেয়। স্তনবৃন্ত কেবল ভিজিয়ে দেয় না, দাঁতে কাটে। দুহাতে মুঠো করে ধরে স্তন, এত জোর-চাপ মুঠোয় যেন সে গলিয়ে এদের জল বানাবে, রূপসার ঘোলা জলের মত জল। রুদ্র আমার শাড়ি ওঠাতে থাকে ওপরের দিকে, আমি চাই না তবু আমার হাত আমার অজান্তে চলে যায় সে হাত থামাতে। আমার শরীরের ওপর নিজের শরীর তুলে দেয় রুদ্র। আমি চাই না, তবু আমার হাত চলে যায় তাকে শরীর থেকে নামাতে। এরপর সেই একই পদ্ধতি, দুপায়ে বিযুক্ত করতে থাকে আমার দু পা। চোখ বুজে আছি শক্ত করে। যেন চোখ না খোলে, যেন চোখের সামনে আমি লজ্জায় মরে যেতে হয় এমন কোনও দৃশ্য না দেখি। শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে থাকি, সজোরে যুক্ত করে রাখি ঠোঁটজোড়া, যেন কোনও শব্দ আমার মুখ ফুটে না বেরোয়। এরপর আচমকা একটি আঘাতে আমি চিৎকার করে উঠি। রুদ্র আমার চিৎকারের মুখে দুহাত চেপে বলে, আরেকটু সহ্য করলেই হয়ে যাবে, এইতো হয়ে এল। লক্ষ্মীটি আরেকটু সহ্য কর। আরেকটু। রুদ্র ক্রমাগত আঘাত করেও নড়াতে পারে না কোনও পাথর। শরীর থেকে নেমে এসে সে তার আঙুল ব্যবহার করে অদৃশ্য পাথরখানি সরাতে। থরথর করে কাঁপছে আমার উরু, উরু থেকে কাঁপন সঞ্চারিত হয় সারা শরীর। মনে হচ্ছে আমি মারা যাচ্ছি। রুদ্র ঘেমে উঠেছে কিন্তু হাল ছাড়ছে না। পথে কোনও বাধা সে মানবে কেন, যে করেই হোক পথ প্রশস্ত করে তার এগোতে হবে, সামনে সোনার খনি, ওই খনি তার হাতের মুঠোয় চাই। নিজেই নিজের মুখ দুহাতে চেপে রেখেছি। হাত ফুঁড়ে যেই না বেরিয়ে চায় কিছু, রুদ্র শাড়ির আঁচল গুজে দেয় মুখে, যেন এই রাতের একটি কণাও আমার চিৎকারে না ভেঙে পড়ে। না কিছুই ঘটছে না, আমি কোনও যন্ত্রণা পাচ্ছি না, এই যে নিম্নাঙ্গ, এ আমার নয়, এ আমার শরীরের কোনও অংশ নয়। অপারেশন থিয়েটারের টেবিলে শুয়ে থাকা এ কোনও অবশ হয়ে থাকা শরীর। ধরা যাক আমাকে পেথিডিন দেওয়া হয়েছে। রক্তে থায়োপেনটাল সোডিয়াম ঢুকিয়ে আমাকে অচেতন করা হয়েছে। শরীরের সমস্ত কষ্ট আমার উবে গেছে। মাথার ওপর সিলিংপাখা বনবন করে ঘুরছে, আমার অচেতন শরীর তবু ঘেমে উঠছে। শাড়ির আঁচল, হাত, ঠোঁট দাঁতের কামড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। রুদ্র বাধা বিঘ্ন যা কিছু ছিল সব সরিয়ে সোনার খনির দিকে আমার ভেতর বাহির চুরমার করে ঢুকে যায়।

রুদ্র নেমে যায় ওপর থেকে। একদিকে দেয়াল আরেকদিকে রুদ্র, আমার শক্তি নেই কোনও দিকে একবিন্দু নিজেকে সরাই। স্থির হয়ে আছি। ধীরে ধীরে চোখ মেলে দেখছি যেন আমি অপারেশন থিয়েটারের বাইরে, পোস্ট অপারেটিভ রুমে। আমার জ্ঞান ফিরছে। জ্ঞান ফিরলে আমি টের পাই আমি কোনও পোস্ট অপারেটিভ রুমেও নই, আমি রূপসা নদীর ঘোলা জলে শুয়ে আছি। আমার শরীর ভাসছে জলের ওপর। চারদিকে কেউ নেই, একা আমি। এত একা কোনওদিন বোধ করিনি। যেন আমার কেউ নেই, কোনওকালে ছিল না। আমার বাবা নেই, মা নেই। আমার কোনও ভাই বোন নেই। আমার কোনও বন্ধু নেই, কোনও প্রেমিক নেই, কোনও স্বামী নেই। আমার কোনও ঠিকানা নেই কোথাও যাওয়ার। আমি রূপসার জলের ওপর ভেলার মত ভেসে কোথাও যাচ্ছি আমি জানি না। যখন শক্তি জোটে নিজেকে তোলার, তুলে আমি নামতে যাই বিছানা থেকে, পথ জুড়ে

পাহাড়ের মত একটি বাধা, সেটি রুদ্র। বলি, *যেতে দাও।* এই প্রথম আমি রুদ্রকে সম্বোধন করি। রুদ্র পথ ছেড়ে দিলে আমি নেমে পেচ্ছাবখানা খুঁজতে থাকি অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে। নিম্নাঙ্গ ছিঁড়ে যাচ্ছে, হাঁসের মত হাঁটতে থাকি জলহীন ডাঙার অন্ধকারে। পেচ্ছাবখানায় পেচ্ছাব নয়, রক্ত বয়ে যায়, রূপসার জলের দিকে যায়। আর্তনাদের শক্তি আমার নেই। গোঙাতে থাকি অসহ্য যন্ত্রণায়।

পরদিন রুদ্র যখন বেরিয়ে যায় আমাকে ফেলে, আমার আবারও একা লাগতে থাকে। আমি ঠিক বুঝে পাই না কি কর্তব্য আমার। শ্বশুরের পা টেপা, শাশুড়ির উকুন বাছা, তেষ্টা পেলে পানিটা এগিয়া দেওয়া, গোসলের সময় গামছাটা, নামাজের সময় জায়নামাজটা! আমাকে কি ঘোমটা মাথায় রান্নাঘরে ঢুকতে হবে রান্না করতে, যেহেতু এ বাড়ির বউ আমি! আমাকে কি রান্নাঘরের পিড়িতে বসে পেঁয়াজটা রসুনটা অন্তত কেটে দিতে হবে! হাঁসের মত হেঁটে রান্নাঘরে ঢুকি। গোলপাতার ছাউনি দেওয়া রান্নাঘর, মাটির মেঝেয় মাটির চুলো, চুলোর আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে, যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপ থেকে ওঠা ধোঁয়া, ইচ্ছে করে এক্ষুনি ধোঁয়া থেকে দৈত্য বেরিয়ে আমাকে বলে দিক, কি করা উচিত আমার, ভাত তরকারি রান্না করব, নাকি রুদ্রর ভাইবোনদের ইশকুলের পড়া দেখিয়ে দেব, বলে দিক বাড়ির মানুষগুলো আমি কি করলে খুশি হবে, বলে দিক কি করলে বলবে বউটি বড় লক্ষ্মী, বড় ভাল। দৈত্যের দেখা পেতে আমি ধোঁয়ার দিকে এগোই। রান্নাঘরে যেই না মাথা গলিয়ে দিই, বীথি বলে, *এখানে ঢুকছো কেন? ধোঁয়ায় টিকতে পারবে না।*

কি করছ তোমরা দেখি।

দৈত্যের অপেক্ষায় বসে না থেকে বলি, *আমি কি কিছু করব!*

বীথি হাসে, রুদ্রর আর সব ভাই বোনেরাও হাসে। আমার অস্বস্তি হতে থাকে। আমাকে ঠিক কোথায় দাঁড়াতে হবে, কোথায় বসতে হবে, কার সঙ্গে কথা বলতে হবে, বললে কি কথা বলতে হবে এসব আমি জানি না। আমার একা লাগে। আমি চাই দ্রুত রাত নেমে আসুক, তখন আমি জানি, আমাকে কি করতে হবে, তখন আমাকে শুতে হবে, ঘুমোতে হবে।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে বীথি বলে, *তুমি গোসল করে নাও! পরে পানি ফুরিয়ে যাবে।* এখন কি করতে হবে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গোসলখানায় ঢুকে দেখি দরজা আছে, কিন্তু দরজায় কোনও ছিটকিনি নেই। সংকোচে বেরিয়ে আসি। দেখে বীথি হাসতে হাসতে বলে,*নিশ্চিন্ত মনে গোসল করে নাও তো, কেউ ঢুকবে না।* আমার গোসল হয়, কিন্তু *নিশ্চিন্ত* মনে হয় না।

বারবার খসে যেতে থাকা আঁচলটি বারবার মাথায় তুলে দিতে দিতে, আঁচলের কোণ টেনে আঁচলকে মাথা থেকে খসতে না দিয়ে, *নিশ্চিন্ত* হয়ে, শুয়ে থাকা শাশুড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে রুগ্ন কণ্ঠে তাঁর ন ছেলেমেয়ের মধ্যে বাড়িতে উপস্থিত সাতজনের একজনকে, *এই তর বৌদিরে বসতে দে* বলে আপাতত আমাকে তাঁর চক্ষুর সামনে থেকে সাদরে বিদেয় করে চক্ষু বন্ধ করেন। শাশুড়ির ঘরের পাশে একটি ঘরে আমকে বসতে বলা হয়, বিছানার এক কোণে বসি। বউ কথা বলে না, বউএর দেমাগ বেশি এরকম কথা যেন কেউ না বলে, তাই হাতের কাছে যাকে পাই ছোট ছোট ভাই বোন, নাম জিজ্ঞেস করি, কোন ইশকুলে কোন ক্লাসে পড়ে জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়ে বসে থাকি চুপ হয়ে, আর কোনও প্রশ্ন পাই না করার, ওরাও কোনও প্রশ্ন করে না। ভাইবোনগুলো আশ্চর্যরকম শান্ত, কোনও চিৎকার চেঁচামেচি নেই বাড়িতে। এতগুলো ভাইবোন থাকলে

অবকাশ সারাদিন মাছের বাজার হয়ে থাকত। নদী থেকে তপ্ত হাওয়া আসে ঘরগুলোয়। কেমন হু হু করে। আমার একা লাগে। বিকেলে বীথি আমাকে সোনার গয়না দেয় পরতে। সোনার গয়না না পরলে সংসারে মান থাকে না, তাই মান বাঁচাতে বীথির দেওয়া ভারি গয়না পরে বসে থাকতে হয়, নিজেকে কিম্ভুত লাগে দেখতে। আসলে কানে গলায় হাতে এত অলংকার আমাকে মানায় না। আমার সয়ও না এসব। মাতৃ জুয়েলার্সে হালখাতার নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কানের লম্বা লম্বা দুল কিনে দিয়েছিলেন বাবা, সবই হারিয়েছে। আমি অনেকক্ষণ পরে রাখতে পারি না কানে কিছু সে সোনা হোক রূপো হোক, কান চুলকোয়। আঙুলে কিছু পরলে আঙুল চুলকোয়, খুলে রাখি এখানে সেখানে, ব্যস অদৃশ্য হতে সময় নেয় না। মা আক্ষেপ করেন, *স্বর্ণের গয়নার দিকে ওর একদম নজর নাই। কই যে খুইলা রাখে জানেও না।* অতিথিরা চলে গেলে বীথির গয়না খুলে রাখি, নিজেকে এক জড়বস্তু বলে মনে হয়, যেন পুতুল আমি, আমাকে শাড়ি পরানো হচ্ছে, গয়না পরানো হচ্ছে, আর আমার মুখে কোনও রা নেই, উঠতে বললে উঠছি, বসতে বললে বসছি আর হ্যাঁ শুতে বললেও শুচ্ছি।

এই রাতেও রুদ্র বাড়ি ফিরে আমাকে *লক্ষীটি একটু সহজ হও, এত শক্ত করে রেখো না, একটু নরম করো শরীর* বলে বলে প্রশস্ত করা পথে প্রবেশ করে। অন্ধকার ঘরটি চোখ বুজে থেকে আরও অন্ধকার করে আমি যখন রুদ্রর দেওয়া যন্ত্রণা শরীর পেতে নিচ্ছি, নিচ্ছি--হঠাৎ সারা শরীরে এক তীব্র ভাল লাগা মাথা থেকে পা অবদি বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে যায়। আমি সেই বিদ্যুৎ-চমকে রুদ্রর পিঠ খামচে ধরি দশ নখে। হাঁপাতে থাকি, হাঁপাতে হাঁপাতে বলি, *কি হল!*

কি হল তার কিছু বলে না রুদ্র। আমার সোনা আমার মানিক আমার লক্ষ্মী বউ বলতে বলতে সে আমার ওপর এলিয়ে পড়ে। রাতে একবার নয়, বহুবার সে আমাকে তীব্র সুখ দেয়। এই সুখে যন্ত্রণার স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। আমি সুখে, শীর্ষসুখে কাতরাতে থাকি।

কাতরানো আমি একসময় লক্ষ করি রুদ্র আমার পাশে নেই। অনেকক্ষণ সে আমার পাশে নেই।

কোথায় তুমি!

অন্ধকারে লাল একটুকরো আগুন জ্বলছে। আগুনটি নড়ছে।

শোবে না?

আসছি।

লাল আগুন নিবে যায়, সিগারেট শেষ হয়ে যায় খাওয়া, রুদ্র তবু শুতে আসে না। আমার *আবেশে অবশ তনু* চাইছে তাকে নিবিড় করে কাছে, একটি হাত ফেলে রাখি তার বালিশে, এলে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোবো বাকি রাত, তার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে ঘুমোবো। আবারও ডাকি, *কই গেলে!*

ডেটলের গন্ধ ঘরে।

কি ব্যাপার ডেটলের গন্ধ কেন!

ডেটল লাগাচ্ছি আমি। অন্ধকার থেকে রুদ্রর কণ্ঠ।

কেন, কি হয়েছে?

শরীরে চুলকোনি হয়েছে।

তা হলে বুঝি ডেটল লাগাতে হয়!

মলমও দিচ্ছি।

কি মলম?

জানি না।

আলোটা জ্বালো তো, দেখি কোথাও চুলকোচ্ছে, কি মলম লাগাচ্ছো দেখি।

রুদ্র আলো জ্বেলে *আসছি* বলে মলম নিয়ে চলে গেল পেচ্ছাবখানায়। আলোর নিচে আলুথালু শাড়ি গুছিয়ে বসে থাকি অপেক্ষায়। রুদ্র এলে হাত পা দেখি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, কোনও স্ক্যাবিসের চিহ্ন নেই।

কোথায় চুলকোচ্ছে?

রুদ্র কথা না বলে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। পাশে শুয়ে, তার বুকের ওপর একটি হাত রেখে বলি, *স্ক্যাবিস তো দেখছি না।*

আছে।

কোথায়?

হয়েছে ওই জায়গায়।

ওই জায়গা কোন জায়গা?

পেনিসে হয়েছে।

কোথায়?

পেনিসে।

ডেটল দিচ্ছ কেন?

ডেটল দেওয়া ভাল তো।

কোনও ডাক্তার বলেছে দিতে?

না।

মলম দিয়েছে কে? কোনও ডাক্তার?

না। নিজে কিনেছি।

এই মলম কি কাজে দেবে?

জানি না।

তাহলে দিচ্ছ কেন! পারমেথ্রিন মলম লাগাতে হয় স্ক্যাবিস হলে। খুব চুলকোয় কি?

হ্যাঁ চুলকোয়। আবার গোটা হয়েছে।

ছোট?

অত ছোট না।

বড় হওয়ার তো কথা নয়। বড় হবে কেন?

বড়ই।

ডাক্তারি উৎসাহে উঠে বসে, আলো জ্বেলে, বলি, *দেখি তো কিরকম!*

রুদ্র নিচের দিকে নামাতে থাকে লুঙ্গি। লোমশ শরীর আরও লোমশ হয়ে আসছে নিচে, লোমশ হতে হতে একটি শীতল পুরুষাঙ্গ। পুরুষাঙ্গের গোড়ায় একটি লাল ফুল। এই বাসরশয্যায় আমার প্রথম রাত্রিযাপনে কেউ কোনও ফুল বিছিয়ে দেয়নি। না গোলাপ,না গাঁদা, না জবা, না জুঁই। রুদ্রর পুরুষাঙ্গের ফুলটিই আমাকে ফুলশয্যা দেয়। কিন্তু এরকম পুরুষাঙ্গ আমি অনেক দেখেছি। পুরুষাঙ্গের এই ঘা খুব চেনা ঘা। হাসপাতালে, যৌনরোগ-বহির্বিভাগে পুরুষ-রোগীরা লুঙ্গি নিচের দিকে নামিয়ে ঠিক এমন ঘা ই দেখায়, যে ঘাগুলোকে যৌনরোগের ডাক্তার সিফিলিসের ঘা বলে চিহ্নিত করেন, যে ঘাগুলো নিরাপদ দূরত্ব থেকে অনেক দেখেছি। রুদ্রর ঘা যদিও সিফিলিসের ঘা এর মত দেখতে, কিন্তু একটি ঘা অন্য একটি ঘা এর মত দেখতে তো হতে পারে! নিশ্চয়ই অনেক

নিরীহ ঘা আছে, দেখতে অন্য কুৎসিত ঘা এর মত। নিশ্চয়ই আছে, মন বলে, আছে।

কবে হয়েছে এটি?

এই তো দশ বারোদিন আগে।

রক্ত বেরোয়?

না।

রুদ্রর আর যে রোগই হোক, সিফিলিস হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমি অন্য অন্য রোগের কথা ভাবতে থাকি। এ কি একজিমা নাকি সোরিওসিস! নাকি পিনাইল প্যাপিউলস! নাকি রেইটারস সিনড্রোম! নাকি পেমফিগাস!

পেইন আছে?

রুদ্র মাথা নাড়ে। *নেই।*

এই নেইটিই অন্য সব সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। সিফিলিসের ঘাএ কোনও ব্যথা থাকে না।

পেইন কি একটুও নেই?

ভাবছে রুদ্র। ভাবো রুদ্র, আরও ভাবো, আরও একটু ভাবলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করতে পারবে যে তোমার ব্যথা আছে।

রুদ্র মাথা নাড়ে আবারও। *নেই।*

আচ্ছা তুমি কি কোনও অচেনা লোকের কোনও নোংরা বিছানায় শুয়েছো? তোয়ালে ব্যবহার করেছো কারও!

মাথা নাড়ে এবারও। *না।*

রাজিয়া বেগম নামের এক লেখিকা চা বাগানের শ্রমিকদের নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার জন্য সিলেটের চা বাগানে তিন মাস ছিলেন। এরকম কি হতে পারে রুদ্র কোনও কবিতা লিখতে, বা কোনও গল্প, কোনও গল্পের প্রয়োজনে কোনও গণিকালয়ে গেছে, সেখানে কিছু ব্যবহার করেছে, তোয়ালে বা কিছু। পেচ্ছাবখানায় কিছু ছুঁয়েছে, ওসব জায়গা থেকে হাতে এসে লেগেছে সিফিলিসের জীবাণু ট্রিপোনেমা পেলিডাম। যদিও জানি ওভাবে সিফিলিস ছড়ায় না, তবু জিজ্ঞেস করি, যদি ছড়ায়! যদি কোনও না কোনও ভাবে কোনও ফাঁক ফোকড় দিয়ে প্রবেশ করে!

তুমি কি কোনও কারণে প্রস্টিটিউশানে গিয়েছো। ধর লেখালেখির কারণে বা কিছু?

কেন, না তো!

কক্ষনো যাওনি?

নাহ।

আমি খুঁজছি আরও আরও কারণ, এরকম দেখতে ঘা এর অন্য কারণ। খুঁজছি। খুঁজছি। রুদ্রর তো এই প্রথম কারও সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক, আমার যেমন। এমনই তো হওয়ার কথা। ভালবাসার নিয়মই তো এমন। যাকে ভালবাসি, তার জন্য শরীর খানা তোলা থাকে। শরীরের গোপন গভীর সুখগুলো তোলা থাকে। রুদ্রর ঘা-টির দিকে তাকিয়ে থাকি। তবে কেন এই ঘা? এই ঘা তো আর কোনও ঘা এর মত লাগছে না! হারপেস সিমপ্লেক্স, বা জেনিটাল ওয়ার্টস যদি হয়, সেও তো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ! ধরা যাক এটি সিফিলিস, কিন্তু সিফিলিস রুদ্রর শরীরে কোন পথে ঢুকবে! সে যদি কোনওদিন কোনও গণিকালয়ে না যায়! গভীর ভাবনায় মগ্ন আমি। ঘা-টিকে ছুঁয়ে দেখি, ডান থেকে দেখি, বাঁ থেকে দেখি। ঘা এর আকার আকৃতি দেখি। রং দেখি।

একেবারে সিফিলিসের ঘা এর মত দেখতে। চোখ বলে, মন বলতে চায় না। কিন্তু সিফিলিস হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। তবে কি হতে পারে এটি! দু ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ে আমার।

আচ্ছা, তোমার কি কোথাও কোনও মেয়ের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক হয়েছে।

আবোল তাবোল কি বলছ তুমি!

রুদ্র লুঙ্গি ওপরে তুলে নেয়। ঘা ঢেকে যায়।

শুয়ে পড় তো। অনেক রাত হয়েছে।

রাত হোক, আমার নিদ্রা উবে গেছে। এই ঘাটির কারণ জানার জন্য আমি উদগ্রীব। কোনও রকম মেলামেশা ছাড়া এমন একটি ঘা কেন হতে যাবে!

তোমার বাবাকে দেখিয়েছো?

না।

দু সপ্তাহ ধরে এটি, কোনও ডাক্তারের কাছে গেলে না কেন?

যাইনি।

পরীক্ষা না করে মলম লাগালে ঘা তো যাবে না।

রুদ্র তার দাড়ি চুলকোতে থাকে। কিছু নিয়ে খুব ভাবলে সে এই করে।

আমি হঠাৎ বলি, *জানো, প্রস্টিটিউটদের সঙ্গে রিলেশান হলে এরকম ঘা হয়।*

তুমি নিশ্চয়ই কোনও প্রস্টিটিউটের কাছে যাওনি! প্রশ্ন করি।

না। রুদ্রর বরফ-কণ্ঠ।

সত্যিই তো তুমি যাওনি? এই প্রথম তো আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, তাই না!

রুদ্রর মুখটি হঠাৎ বদলে যায়। কালো ভুরু দুটো জড়ো হতে থাকে। যেন তার যন্ত্রণা হচ্ছে শরীরে কোথাও। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে আমার চোখে। চেষ্টা করেও আমি পড়তে পারি না তার চোখের ভাষা।

অনেকক্ষণ নীরব বসে থাকি দুজন। হঠাৎ রুদ্র বলে, *আসলে কি জানো, আমি পাড়ায় গিয়েছি।*

পাড়া মানে?

বেশ্যাপাড়া।

গিয়েছো? কেন?

যে কারণে লোকেরা যায়।

কি কারণে?

রুদ্র কথা বলে না। আমার মাথাটি কি ঝিমঝিম করছে? বুকের মধ্যে কি হুড়মুড় করে একটি *শ্বাসকষ্ট* ঢুকে গেল? শব্দগুলো আগের চেয়ে ধীরে উচ্চারিত। স্বরটি ভাঙছে, কাঁপছে।

কোনও প্রস্টিটিউটের সঙ্গে শুয়েছো?

কথা বলছে না। তার চোখদুটো পাথর হয়ে আছে।

বল, বলছো না কেন, বল।

আমার দুচোখে আকুলতা, বল *না,* তুমি না বল রুদ্র। *না* বল। একটি *না* শব্দের আশায় আমি মোহগ্রস্তের মত বসে থাকি।

হ্যাঁ। রুদ্র বলে।

কি, সেক্সুয়াল রিলেশান হয়েছে?

নিজের স্বরকে আমি চিনতে পারি না, যেন এ আমার কণ্ঠস্বর নয়, অন্য কারও। যেন একটি যন্ত্রে বোতাম টিপে দেওয়া হয়েছে, যন্ত্রটি কথা বলছে।

হ্যাঁ।

আলো জ্বলছে ঘরে, অথচ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে আমার চোখের সামনে। আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। অনেকক্ষণ আমি কোনও নিঃশ্বাস নিতে পারি না। আমার সামনে এ কি কোনও যৌনরোগী, নাকি এ রুদ্র! আমার প্রেমিক, আমার স্বামী! আমার বিশ্বাস হয় না এ রুদ্র, বিশ্বাস হয় নার এর সঙ্গে আমার বছর বছর ধরে প্রেম।

গিয়েছো কবে?

এই তো দু সপ্তাহ আগে।

একবারই গিয়েছো?

হ্যাঁ।

আর কোনওদিন যাওনি?

না।

তোমার ঘা তো দু সপ্তাহ থেকে!

হ্যাঁ।

যেদিন সম্পর্ক হয়েছে, সেদিনই তো ঘা হয় না। হতে কিছু সময় নেয়। মনে করে দেখো একবারের বেশি আরও গিয়েছো কি না।

রুদ্র আমার চোখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে থেকে ধীরে বলে, *আরও গিয়েছি।*

নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না। আমার বিশ্বাস হতে চায় না যে আমি রুদ্রর জীবনে প্রথম মেয়ে নই! অনেকক্ষণ ওভাবেই নিস্পন্দ বসে থাকি।

আমাকে তো কখনও বলনি এসব?

বলিনি।

কেন বলনি?

রুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে জানি না কি দেখে সে, কোনও উত্তর দেয় না।

বেশ্যপাড়া, তাই না? কোথায় সেটা?

বানিশান্তায়।

বানিশান্তা কোথায়?

এই বন্দরেই।

কেন যাও? তুমি না আমাকে ভালবাস?

ভাল তো বাসিই।

ভালবাসলে অন্য কাউকে ছুঁয়েছো কি করে? আমাকে এতদিন তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, বলেছ তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে স্পর্শ করনি কোনওদিন। জানো, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এসব কিছু!

আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় রুদ্র অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে শুয়েছে, যেভাবে আমার সঙ্গে সে শুয়েছে। যেভাবে আমার মুখে বুকে চুমু খেয়েছে সেভাবে আর কাউকে খেয়েছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় রুদ্র আর কারও গভীরে প্রবেশ করেছে এমন। মনে হতে থাকে মাঝসমুদ্রে আমার তরীটি ডুবে গেছে। আমি ডুবে যাচ্ছি, যতদূর চোখ যায়, কেউ নেই,

কিছু নেই। আমি একা, আমি ডুবছি। আমার আকাশ ভেঙে পড়েছে, আমার জগতটি খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিটকে পড়েছে, ছিটকে পড়া টুকরোগুলো গড়াতে গড়াতে সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। কূলকিনারাহীন উত্তাল সমুদ্রে খড়কুটো নেই, আমি ডুবছি। আমি যেন আমি নই, অন্য কেউ। সেই অন্য কেউএর জন্য আমার কষ্ট হতে থাকে। কষ্টটি আমার স্নায়ুতন্ত্রে পাক খেয়ে খেয়ে নামতে থাকে বুকে। বুকের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত পাথর এসে যেন চাপ দিচ্ছে। কোনও শব্দ উচ্চারণ করার সামর্থ আমার নেই। আমি বোধবুদ্ধি হারিয়ে হু হু করে কাঁদি, সারারাত কাঁদি। চোখের জলে ভিজে যেতে থাকে আমার বালিশ, শাড়ি, বিছানার চাদর। রুদ্রর হাত ধরে পা ধরে আমি কাঁদি, *বল বল যে তুমি মিথ্যে কথা বলেছো। বল যে তুমি কারও কাছে যাওনি। কারও সঙ্গে শোওনি। বল বল।*

পাথরের মত স্তব্ধতা রুদ্রর। ফ্যাকাসে মুখে সে আমার কান্না দেখে সারারাত।

কান্না দেখে সে সকাল, দুপুর, বিকেল। না খাওয়া না নাওয়া আমার কান্না দেখে সে সারাদিন। নিজে সে নায়, খায়। নিজে সে আর দিনের মত যাপন করে দিন। ঘুমোতে চাই, সব ভুলে ঘুমোতে চাই। কিন্তু ঘুম তো আসছে না। ঘুমের ওষুধ চাইলে তার বাবার ডাক্তারখানা থেকে রুদ্র দু পাতা সিডাক্সিন এনে দেয়। খুঁজে দু পাতা পেয়েছে, দু পাতাই দিয়েছে। দু পাতার কুড়িটি বড়ি থেকে একটি বড়ি শুধু তুলে নেব। একটি বড়ি শুধু খাব, এরপর মোট কুড়িদিন যেন বড়ি খেয়ে ঘুমোতে পারি। কিন্তু বড়ি যখন রুদ্রর আড়ালে আমি কুড়িটিই একবারে খেয়ে নিই, সেদিনই, সেই বিকেলে, *আমি দূরে চলে যাবো তবু আমারে দেব না ভুলিতে*র কোনও সুর আমার ভেতর ছিল না, চাচ্ছিলাম দূরে চলে যেতে, আমাকে রুদ্র ভুলে যাক, কখনও আর মনে না করুক আমি নামে কেউ ছিল তার জীবনে। নিজের এই অস্তিত্বকে আমার আর মোটেও মনে হচ্ছিল না আমি বহন করতে পারব, মনে হচ্ছিল না যে আমার জীবনের কোনও মূল্য আর আছে। মনে হচ্ছিল না তীব্র এই কষ্টগুলো নিয়ে তীব্র এই অপমানগুলো নিয়ে আমি আর একটি মুহূর্তও বাঁচতে পারব বেশি। কাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর দিকে আমি যখন দৌড়ে যাচ্ছি, আমাকে পেছন থেকে খামচে থামাল কেউ। যখন ফিরিয়ে আনা হল ওই পথ থেকে দেখি শক্ত নল আমার নাকে, পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্রর ডাক্তার বাবা। বিষ বের হল শরীর থেকে, কিন্তু মন থেকে একফোঁটা বিষ বের হয়নি, মন মরতে থাকে। আমার চোখের সামনে মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে মন। সারারাত মৃত মনকে পাশে নিয়ে নির্ঘুম কাটাই।

ভোরের আলো ফুটলে বলি, *আমি এক্ষুনি যাব।*

রুদ্র তৈরি হয়। একবারও বলে না, আরও দুদিন থাকো বা কিছু। বাড়ির সবাই অবাক, *কী ব্যাপার, হঠাৎ চলে যাচ্ছ যে।*

রুদ্র ওদের বলে, *ওর যেতে হবে।* কেন যেতে হবে, তা কিছু বলে না। নাস্তা খেতে বলে ওরা, আমি না বলি।

লঞ্চের ভেতরে পেচ্ছাবের ঝাঁজালো আর মাছের আঁশটে গন্ধে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত ভোঁ শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার গা গুলোয়, সারারাত জেগে থেকে কেঁদে ভোরের হাওয়া নিতে গিয়ে বমি করে ভাসাই লঞ্চের বারান্দা। রুদ্র লোকের ভিড়ে বসে পেছনে ঘাড় ফেলে ঘুমোচ্ছে, হাঁ হয়ে আছে মুখ। এই লোকটিকে আমার চেনা কেউ বলে মনে হয় না। মনে হয় না এই মানুষটি আমার কেউ হয়।

লম্বা লঞ্চ যাত্রা, ততোধিক লম্বা রেল যাত্রা নিঃশব্দে ফুরোয়। রেল যাত্রা ফুরোলো নিঃশব্দে। সব জেনেও মৃত মনকে বারবার বলেছি, *ও আসলে অন্য রোগ। অন্য ঘা।*

যৌনাঙ্গে তো কত রকম ঘা হতে পারে। আমি কি আর সব জানি, এখনও ডাক্তার

হওয়ার ঢের বাকি আমার। পরীক্ষা করে একবার দেখি না কেন ঘা- টি! হয়ত এমনও হতে পারে, এটি নতুন একরকম ভাইরাস রোগ। এমনও হতে পারে, রুদ্র আমার সঙ্গে মজা করছে বলে যে সে বেশ্যালয়ে গেছে, একাধিকবার গেছে। সে নিশ্চয় আমাকে একদিন চমকে দেবে বলে, যে সব মিথ্যে ছিল, যা সে বলেছে। আমাকে পরীক্ষা করেছে সে, কতটুকু তাকে বিশ্বাস করি, তার পরীক্ষা। রাত কাটিয়েছে, যেরকম রাত আমার সঙ্গে কাটাতে সে বার বার চেয়েছে।

ঢাকায় নেমে দেখি ঢাকা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অন্ধকারের পায়ে। শহরটি এত প্রিয় আমার, এত প্রাণবন্ত শহরটিকে মনে হয় নিস্তেজ। রাতে মুহম্মদপুরে রুদ্রর ভাড়া বাড়িটিতে যাই।একটি পড়ো পড়ো তিনতলা বাড়ি, বাড়িটির দোতলায় রুদ্রর দুটো ঘর, একটি ঝুল বারান্দা, ঘরের বাইরে ছোট্ট একটি রান্নাঘর, আর করিডোর পেরিয়ে একটি মলমুত্রগোসলের জায়গা, সেটি বাড়িঅলাও ব্যবহার করে, রুদ্রও। খুব বেশিদিন হয়নি সে এটি ভাড়া নিয়েছে। দুটো ঘরের একটি শোবার, একটি পড়ার। পড়ার ঘরে টেবিল চেয়ার আর বই রাখার একটি তাক, বইয়ে উপচে পড়ছে তাকটি। জায়গা নেই বলে বই মেঝেয়, ছড়িয়ে নয়, গোছানো। শোবার ঘরের বিছানাটিও গোছানো। রুদ্র খুব গোছানো মানুষ। বিছানা টেবিল আমার এরকম গোছানো হয় না। তাই নিজের জীবনটিকে বড় এলোমেলো বলি। রুদ্রও নিজেকে বলে *এলোমেলো*, গুছিয়েই যদি সে রাখে তবে কেন *এলোমেলো?* তবে কি তার নিয়ন্ত্রণহীন জীবনটিকে বোঝাতে সে *এলোমেলো* শব্দটি ব্যবহার করে! দুই জীবনে একটি শব্দের অর্থের কী ভীষণ পার্থক্য! আমাকে ঘরে রেখে রুদ্র বেরিয়ে যায় দুজনের জন্য খাবার কিনে নিয়ে আসতে। আমি মেঝেয় শুয়ে তাকের কিছু বই উল্টে দেখি। মোটা মোটা দুটো কবিতার খাতা তাকটির নিচে সাজানো। পাতা উল্টে যাই, এত কবিতা সে জীবনে লিখেছে! সবই গভীর প্রেমের কবিতা। কাউকে খুব সাংঘাতিক ভাবে ভালবাসতো রুদ্র। কে সে যাকে বলছে আমার গান আমার সকল কবিতা তোমার জন্যই লেখা। রুদ্র খাবার নিয়ে ফিরে এলে জিজ্ঞেস করি, *কে এই রমণী যাকে জীবন উৎসর্গ করেছো?*

করেছিলাম।

কে সে?

খুব কি জানার দরকার?

বলই না শুনি।

নেলি।

লালবাগে বসে কবিতাগুলো লেখা।

লালবাগে মামার বাড়ি। ওখানে ছিলাম। নেলি হচ্ছে আমার মামির বোন। ও বাড়িতেই থাকত।

মামির বোন হলে তো তোমার খালা হয়।

হ্যাঁ খালা হয়।

খালার সঙ্গে প্রেম করতে?

রুদ্র মাথা নাড়ে, করত। বয়সে যে তার চেয়ে অনেক বড় তার খালা সে কথাও বলে।

কেবল কি প্রেমই করতে? নাকি আরও কিছু?

আরও কিছু।

মানে শুয়েছো তোমার খালার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

ও বাড়িতে যখন ছিলে, তখন তো ইশকুলে পড়তে। ওই ইশকুলে পড়ার সময়ই শুয়েছো?

হ্যাঁ, রুদ্র সেই ইশকুলে পড়ার সময়ই জীবনের সব সেরে নিয়েছে। ছোটবেলাতেই সঙ্গম শিখেছে।

উপদ্রুত উপকূলে পেছনে হলুদ বাড়ি পঞ্চাশ লালবাগ, নিবেদিত বকুল বেদনা নামের ওসব তাহলে নেলিকে নিয়ে লেখা?

হ্যাঁ।

আমি হেসে বলি, *জানো, ওই বইয়ের কবিতাগুলো পড়ে আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম, ভাবলে এখন হাসি পায়।*

তা তোমার প্রেমিকা নেলি এখন কোথায়?

এক মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তালাক হয়ে গেছে। এখন লালবাগে আছে।

যাও না ওর কাছে? গিয়ে রাত কাটাও না ওর সঙ্গে? তোমার খালার সঙ্গে?

বাজে কথা বোলো না।

বাজে কথা বুঝি?

বাজে কথাই তো।

রুদ্রর চোখের ভেতর লাল রক্তের রেখা, সবুজাভ দাগ, চোখে এসব কি জিজ্ঞেস করাতে রুদ্র একবার বলেছিল, শ্যাওলা জমেছে। শ্যাওলা জমা চোখ রুদ্র আমার চোখে ফেলে রেখে অনেকক্ষণ, বলে, *ও প্রস্তাব দিয়েছিল, রাজি হইনি।*

কেন? তোমার তো কারও সঙ্গে এই সম্পর্কে যেতে কোনও বাধা নেই! রাজি হবে না কেন?

ওর সঙ্গে তো হৃদয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক তোমার সঙ্গে।

বাহ, বেশ ভাল নীতি তোমার। যার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক মানে যাকে ভালবাসো তার সঙ্গেই শোও শুধু, হাসতে হাসতে বলি, *তাহলে বেশ্যাদের কি কর? ভালবেসে ওদের সঙ্গে শুতে যাও?*

রুদ্র কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে যায়। দুটো কাপে পানি নিয়ে আসে। *চল খেয়ে নি। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।* তাড়া দেয়।

তোমার খালাকে বিয়ে করলে না কেন? অবশ্য এখনো করতে পারো। শান্ত স্বর আমার।

অতীতের কথা টানছো কেন?

অতীত! কেবল তোমার অতীতেই ওসব ছিল। বর্তমানে তুমি শুদ্ধতম মানুষ, তাই না?

কোনও উত্তর দেয় না রুদ্র। খেতে খেতে আমি তাকে দেখি। এত চেনা তার খাওয়ার, তার হাত ধোওয়ার, মুখ মোছার, এত চেনা তার সিগারেটে আগুন ধরাবার, সিগারেট ফোঁকার ভঙ্গি!

রুদ্র প্রসঙ্গ পাল্টায় কবিতা পড়ে। চৌদ্দই ফেব্রুয়ারিতে সরকারি আদেশে পুলিশ ট্রাক চালিয়ে দিয়েছিল ছাত্র মিছিলে। ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়েছে অগুনতি মানুষ। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাড়ছে, আর সরকারি আদেশে গুলি চালাচ্ছে পুলিশ নিরীহ মানুষের বুক লক্ষ করে।

আমি তোমাকে আর ঘৃণা করতে চাই না,
আমি থুতু দিতে চাই জলপাই বাহিনীর মুখে-
যারা শিশু একাডেমি, নীলক্ষেত রক্তে ভিজিয়েছে,

যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে গুলিবিদ্ধ লাশ,
বুটের তলায় পিষে যারা খুন করেছে মানুষ,
আজ সেই জলপাই বাহিনীর রক্ত নিতে চাই। ..

রুদ্র একটির পর একটি কবিতা পড়ছে। ভারি কণ্ঠে, স্পষ্ট উচ্চারণে।

একদা অরণ্যে যেভাবে অতিকায় বন্যপ্রাণী হত্যা করে
আমরা অরণ্য জীবনে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি,
আজ এইসব অতিকায় কদাকার বন্যমানুষগুলো নির্মূল করে
আমরা আবার সমতার পৃথিবী বানাবো,
সম্পদ আর আনন্দের পৃথিবী বানাবো। শ্রম আর প্রশান্তির পৃথিবী বানাবো।

মেঝেয় আধশোয়া হয়ে কবিতা শুনতে শুনতে আমি ভুলে যেতে থাকি মোংলা বন্দরে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা। যেন চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি আমি ঢাকায় এসেছি, রুদ্রকে সেই আগের মত আমি ভালবাসি, তার জীবনের কুৎসিত নোংরা চেহারাটি আমার দেখা হয়নি। আমি মুগ্ধ তাকিয়ে থাকি, বিলীন হতে থাকি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সচেতন শব্দাবলীতে, মনে হতে থাকে রুদ্র আমার কেবলই এক বন্ধু, আমার প্রেমিক নয়, স্বামী নয়। কবিতার খাতাটি পাশে রেখে রুদ্র জানালায় স্থির তাকিয়ে বলে *আমার একটা খুব স্বপ্নের কথা তোমাকে বলি। আমি মিছিলে মরতে চাই গুলি খেয়ে।* চোখদুটোয় দু ফোঁটা স্বপ্ন, চোখদুটো তার রাতের আকাশের দুটো তারা। মৃত্যু নিয়ে কাউকে এমন স্বপ্ন দেখতে দেখিনি আগে। মিছিলে মরতে রুদ্র কেন চায়! তাকে নিয়ে যেন মিছিল হয়, আন্দোলন জমে ওঠে, যেন সে অমর হয়ে থাকে! মৃত্যু ভাবনাটি আমাকে স্পর্শ করতে থাকে, সেই স্পর্শ সরিয়ে রুদ্র আমাকে চুমু খায়। চুমু খেতে খেতে আমার শরীর সে একটু একটু করে অবশ করতে থাকে। অবশ হতে থাকি, ভুলে যেতে থাকি আমি কে আমি কোত্থেকে, আমার সঙ্গে রুদ্রর সম্পর্ক, যেন আমি নই, এ অন্য কেউ, রুদ্রর প্রেমিকা, যে প্রেমিকাকে নিয়ে সে অনেক কবিতা লিখেছে। সেই প্রেমিকাকে সে আদর করছে, প্রেমিকা শরীর ভরে রুদ্রর আদর নিচ্ছে। রুদ্র তার বুকের কাপড় খুলে নিচ্ছে। সমস্ত শরীর দিয়ে ভালবাসছে তার সমস্ত শরীর। তার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদছে তার প্রতি অঙ্গ। এক শরীর হারিয়ে যাচ্ছে আরেক শরীরে। সুখে, তীব্র সুখে প্রেমিকা জড়িয়ে ধরছে প্রেমিকের শরীর। যখন সব থেমে যায়, যখন চেতন ফেরে, প্রেমিকা হাঁসের মত হেঁটে যৌনাঙ্গে যন্ত্রণা নিয়ে পেচ্ছাব করতে যায়। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরতে থাকে পথে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পেচ্ছাবখানায়। তখন সে আর প্রেমিকা নয় রুদ্রর। তখন সে আমি, রুদ্রর বউ আমি। এ কি হল! এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। কি করে আমি রুদ্রর সঙ্গে মিলিত হয়েছি আবার, আবার কেন আমি তাকে আমার শরীর স্পর্শ করতে দিয়েছি? সে তো এই দাবি রাখে না। তার সঙ্গে ওই রাতের পরই কি আমার সম্পর্ক শেষ হয়নি? শেষ হয়েছে নিশ্চয়ই। তবে জেনেও কেন আমি একটি অসুখ তার শরীর থেকে আবার নিয়েছি। কেন এই ভুল। কেন আবার পাপের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো! কেন আবার রোগের জীবাণু নিজের শরীরে নিয়ে নিজেকে অসুস্থ করা! ছি ছি! নিজেকে আমি কি একটুও ভালবাসি না। সাধ করে কেউ অসুস্থ হতে চায়! একটি নোংরা রোগ নিতে চায় নিজের রক্তে! নাকি ওই যৌনসুখ এমনই সুখ যে আমি এর গায়ে লেগে থাকা সংক্রামক অসুখটির কথা ভুলে যাচ্ছি! জানি না। আমি কিছুই জানি না! নিজের ওপর রাগ হয়, ঘৃণা হয়। আবার এও মনে হয়, রোগের জীবাণু তো ঢুকেই গেছে আমার রক্তে!শুদ্ধতা তো গেছেই শরীর থেকে, তাহলে আর কিসের প্রতিরোধ! যে জীবাণু আমার রক্তে নেচে বেড়াচ্ছে সেই প্রথম মিলনের রাত থেকে সেই জীবাণু দ্বিতীয় বার গ্রহণ

করতে আর ক্ষতি কি! রুদ্র আমাকে তো নষ্ট করেছে, আমার আর নতুন করে নষ্ট হতে বাধা কোথায়! নিজেকে একটি নষ্ট পচা কীটের মত মনে হয়, নর্দমাতেও আমার স্থান হওয়া উচিত নয়। আমি আর আগের আমি নই। আগের আমার মৃত্যু হয়েছে। এ আমি নতুন আমি। এ আমি নষ্ট আমি। এ আমি রুদ্রর মতই পথভ্রষ্ট, রুদ্রর মতই নিয়ন্ত্রণহীন। বোধহীন। নিজের লাগাম খসে গেছে নিজেরই হাত থেকে। এখন আমাকে নিয়ে যে কেউ যা খুশি করতে পারে। নিজেকে বেশ্যার মত মনে হয়। বেশ্যার রোগ শরীরে। আমি বেশ্যাই তো। আর কি! সারা রাত দীর্ঘশ্বাসের এপাশ ফিরি, দীর্ঘশ্বাসের ওপাশ ফিরি। পরদিন ময়মনসিংহে যাওয়ার জন্য বেরোই ছোট্ট গুমোট ঘরটি থেকে, ভোরের শীতল স্নিগ্ধ হাওয়া আমার শরীরের ক্লান্তি তুলে নেয় এক নিমেষেই। রুদ্র পেছনে দৌড়ে আসে, সেও যাবে আমার সঙ্গে ময়মনসিংহে।

তুমি কেন যাবে? পথে যদি বিপদ হয় রক্ষা করতে? কারণ তুমি আমার খুব মঙ্গল কামনা করো, তাই না? আমার শরীরে যেন কারও আঘাত না লাগে, আমার দিকে চোখ তুলে যেন কোনও পুরুষ না চায়, সে কারণে, তাই তো!

রুদ্র কথা বলে না।

ঠিক আছে চল। আমার জন্য নয়। তোমার জন্য চল ময়মনসিংহে। ওখানে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেব।

মহাখালির বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস দুঘন্টা সময় নেয় ময়মনসিংহে পৌঁছতে। বাসের পুরো পথ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শুনি না নিজের। পৃথিবীতে আর যেন কোনও শব্দ নেই। পাশে বসে রুদ্র নিঃশব্দে ঘুমোয়। ঘুমের রুদ্রর মুখ হাঁ হয়ে থাকে। কি করে মানুষটির ঘুম আসে, এমন নিশ্চিন্তি সে কোত্থেকে পায় আমি বুঝে পাই না। ময়মনসিংহে নেমে রুদ্র কোথাও যায়, কোনও হোটেলে। আমি অবকাশে ফিরি। মা দৌড়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, *আহারে আমার মেয়েটা কতদিন ঘরছাড়া ছিল।* ইয়াসমিন *বুবু আইছে বুবু আইছে* বলে ছুটে আসে। ইয়াসমিনের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কোলে সুহৃদ। আমি লুকোতে চেষ্টা করি চোখের জল, পারি না। ইচ্ছে হয় চিৎকার করে কাঁদি। গলা ছেড়ে কাঁদি। ইচ্ছে হয় মেঝেয় লুটিয়ে কাঁদি। বাবা বলেন, *সমুদ্র কেমন দেখলা মা? আমারই সমুদ্র দেখা হয় নাই এখনও, আমার মেয়ে সমুদ্র দেইখা ফেলল।* মা দৌড়ে গেলেন রান্নাঘরে, তাড়াতাড়ি ভাল কিছু রান্না বসাতে। সুফি হেসে বলে,*ইস কতদিন পরে আইলাইন! মা বাপ ছাড়া কেমন লাগছে এত দূরে! মামি ত নিত্যিদিন কয়, আমার মেয়েডা না জানি কি করতাছে!* সুহৃদকে ইয়াসমিনের কোলে তুলে দিয়ে দৌড়ে গোসলখানায় যাই, আমার এক্ষুনি পেচ্ছাব না করলে নয়। গোসলখানায় বসে মুখে পানি ঢালি যেন চোখের জল পানির স্রোতের সঙ্গে চলে যায়। বদনি বদনি পানি ঢালি, বালতির পানি ফুরিয়ে যায়, চোখের জল ফুরোয় না। আমি প্রাণপণ শক্তি দিয়ে নিজের চিৎকার থামাতে পারি, চোখের জলকে পারি না। তার চেয়ে এরকম যদি হত, আমি বাড়ি ঢুকলেই বাবা আমাকে গাল দিতেন, গালে দুটো চড় কষিয়ে বলতেন, *আইজকা সকালে তো হাইজিন ট্যুরের দল ময়মনসিংহ পৌঁচেছে, তর দেরি হইল কেন হারামজাদি?* মা যদি বলতেন, *সমুদ্রের নাম কইয়া আসলে কই গেছিলি ক তো! ওই যে যেই বেডা তরে বউ কইয়া চিঠি লেকছিল, হেই বেডার সাথে কাডইয়া আইছস না তো।* ইয়াসমিন যদি কাছে না আসত, আমার বাড়ি ফেরায় না ফেরায় ওর যদি কিছু না যায় আসত, সুহৃদকে কোলে নিতে চাইলে সুহৃদ যদি মুখ ফিরিয়ে নিত, আমার ভাল লাগত। আমি ভালবাসা পেতে চাই না কারও কাছ থেকে আর। ঘৃণা করুক আমাকে সবাই। প্রচণ্ড

ঘৃণা করুক।

পরদিন কলেজে গিয়ে কোনও ক্লাস না করে রুদ্রকে ক্যান্টিন থেকে উঠিয়ে নিয়ে চড়পাড়ার রাস্তায় সারি সারি ওষুধের দোকান, ডাক্তারের চেম্বার আর ল্যাবরটরির পাশ দিয়ে হাঁটি। কোথায় যাব, কোন ডাক্তারের কাছে? যে কোনও ডাক্তারই আমাকে চেনে, নামে চেনে, মুখে চেনে, নয়ত বাবার মেয়ে হিসেবে চেনা। যে কোনও ডাক্তারই অবাক হবে আমি একটি সিফিলিস রোগিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে, বার বার প্রশ্ন করবে কে এই রোগি? কি হয় আমার? ভাবি কোনও ডাক্তারের না গিয়ে রক্ত পরীক্ষাই করে নেওয়া ভাল। ভেবে কোনও ডাক্তারের চেম্বারে নয়, রক্ত পরীক্ষার জন্য ঢুকি একটি প্যাথলজি ল্যাবএ। এক চৌকোনা চোয়ালের কালো লোক, চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে, অনুমান করি টেকনিশিয়ান, বলি *এর ভিডিআরএল টেস্ট করতে হবে।* বলার সময় কণ্ঠ কাঁপে আমার। লোকটি তীক্ষ্ম চোখে আমাকে দেখে। চোখের প্রশ্ন *লোক কি হয় আপনার?* আমি চোখ নামিয়ে ফেলি, যেন পড়িনি কোনও প্রশ্ন। চোখের তীক্ষ্মতা দেখিনি। মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীরা চেনা রোগি নিয়ে এমন কি রাস্তায় পড়ে থেকে কাতরাতে থাকা রোগীদের দয়া করে তো চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এরকমই হয়ত কিছু। হাসপাতালের করিডোরে এক লোক হাঁটছিল, আমার সাহায্য চাইল তার রোগের চিকিৎসার জন্য। আমার অবসর ছিল বলে, ঠিক এক্ষুনি কোনও ক্লাস ছিল না বলে, লোকটিকে দেখাতে নিয়ে এসেছি কি করতে হবে, কোথায় যেতে হবে। মুখের ভাবে যে রকম কারণই দিই না কেন লোকটির ঠোঁটে বাঁকা একটি হাসি খেলতে থাকে, বুঝি যে এই লোক আমাদের দুজনকে আগে অনেক দেখেছে, এই লোক খুব ভাল করে চেনে আমাকে, রুদ্র আমার স্বামী এ কথা না জানলেও জানে রুদ্র আমার প্রেমিক।

রুদ্রর রক্ত পরীক্ষার ফল হাতে এল। *ভিডিআরএল পজিটিভ।*

কাগজটির দিকে তাকিয়ে, যে এক চিলতে আশাকে লালন করেছিলাম, শক্ত পায়ে কেউ মাড়িয়ে গেল। হাহাকার ছাড়া কিছু আর অবশিষ্ট নেই। সারা জীবনের জন্য ওই আমার সম্বল।

রক্ত পরীক্ষা হল মেডিকেল কলেজের আঙিনায়। চৌকোনা লোকটি হাসপাতালে যেতে আসতে আমাকে ফিরে ফিরে দেখে। এ লোক কি তাবৎ ডাক্তারদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে যে আমার সঙ্গে একটি দাড়িঅলা লোক ঘোরে, লোকটির সিফিলিস হয়েছে! বোধবুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আর কিসের সতর্কতা আমার! ওই আঙিনাতেই বিকেলে যৌনবিশেষজ্ঞের চেম্বারে ঢুকি প্যাথলজির কাগজটি হাতে নিয়ে। পেছনে রুদ্র। বিশেষজ্ঞ চোখ কুঁচকে কাগজের দিকে, রুদ্রর দিকে, আমার দিকে ঘন ঘন তাকিয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখে জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, *এ কি তোমার চেনা রোগি?*

হ্যাঁ স্যার। শান্ত কণ্ঠ।

ও।

বিশেষজ্ঞের ভাবনার ভেতরে নেই এই রোগী আমার কোনও আত্মীয় হতে পারে। কোনও উদ্ভট কল্পনাও যদি এই বিশেষজ্ঞ করেন, তার ত্রিসীমানার মধ্যে নেই এই রোগী আমার প্রেমিক হতে পারে, অথবা আমার স্বামী। তাই রোগী তোমার কি হয় জিজ্ঞেস না করে জানতে চেয়েছেন এ আমার চেনা রোগী কি না। চেনাই তো। রুদ্র আমার সেই কতকালের চেনা। ফের কোনও বাক্যালাপের সুযোগ না দিয়ে ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরোই। বাইরে এসে ফুসফুস ভরে মুক্ত হাওয়ার ঘ্রাণ নিয়ে শান্ত গলায় বলি, *এবার?*

সবই তো হল। যাও, ঢাকায় গিয়ে পেনিসিলিন ইনজেকশন নাও। কোনও এক ফার্মেসিতে গিয়ে বল, কমপাউন্ডার পুশ করে দেবে।

আর তুমি?

আর আমি?

হ্যাঁ তুমি।

আমি কি?

তুমি কি করবে?

আমি আর কি করব, লেখাপড়া করব, ডাক্তার হব, রোগির চিকিৎসা করব।

সম্পর্ক?

কিসের সম্পর্ক? কার সঙ্গে?

আমার সঙ্গে।

আমি হেসে উঠি।

তোমার সঙ্গে এখনও কি সম্পর্ক আমার ফুরোয়নি রুদ্র?

রুদ্র অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বলে, *ক্ষমা করতে পার না?*

ক্ষমা? ক্ষমা তো আমি তোমাকে করেছিই। নিজের মান সম্মানের তোয়াক্কা না করে এই জন্ম-চেনা শহরে এনে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলাম। তোমাকে তো ওই মোংলা বন্দরেই পারতাম, পারতাম না ত্যাগ করতে?

পারতে।

রুদ্রর চোখে সেই চিরকেলে ধূসরতা।

আমার জীবনে আর আছে কি বল। এত বছর প্রেম করে, বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে প্রথম মিলন, দীর্ঘ বছর অপেক্ষার পর সেই দিনটি এল। বিষম সুখের সময় আমার, বিষম আনন্দের। তাই না? সমস্ত ভয় লজ্জা দূর করে নিজের সমস্তটুকু দিয়েছি তোমাকে, যে সমস্তটুকু চাইতে তুমি। সম্পূর্ণ করে আমাকে চাইতে। পেলে তো! এখন তো তোমার সাধ মিটেছে, তাই না! আমার বিয়েতে তো আমি কোনও লাল বেনারসি পরিনি, গয়না পরিনি, বিয়েতে তো কোনও বাদ্য বাজেনি, অতিথি আসেনি, কেবল তুমি আর আমি উদযাপন করেছি। আমি তোমাকে উপহার দিয়েছি আমার সমস্ত ভালবাসা, সমস্ত বিশ্বাস, তুমি আমাকে উপহার দিয়েছো একটি রোগ। আমার বিয়ের উপহার তোমার কাছ থেকে তো এটিই। কি বল?

তোমারও তো ইনজেকশন নিতে হবে। ঢাকায় চল।

আমাকে নিয়ে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। অনেক ভেবেছো। এবার অন্য কিছু নিয়ে ভাবো। নিজের জীবন নিয়ে ভাবো। পারোতো রোগ বালাই থেকে দূরে থেকো।

তুমি আমাকে ত্যাগ করছ?

নিস্পৃহ কণ্ঠ আমার।

হ্যাঁ ত্যাগ করছি। ভেব না তোমার সিফিলিস হয়েছে বলে আমি তোমাকে ত্যাগ করছি। নেহাত দুর্ভাগা বলে তোমার রোগটি হয়েছে, তুমি বেশ্যাবাড়ি যাও, ওদের সঙ্গে থাকো, নাও হতে পারত এই রোগ তোমার। সবার হয় না। আমি তোমাকে ত্যাগ করছি, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ বলে।

রুদ্রর চোখ ছলছল করে।

আমার জায়গায় হলে তুমি কি করতে রুদ্র?

সত্যিই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ?

সত্যিই।

একবার ভাল হবার সুযোগ দেবে না?

আমি মলিন হাসি। নিঃস্ব, রিক্ত, সব হারানো মানুষ আমি। আমি সুযোগ দেবার কে! আমি কি কোনও মানুষ। নিজের ওপরই লজ্জা হয়, নিজেকেই ঘৃণা হয়। রুদ্র দাঁড়িয়ে থাকে চরপাড়ার রাস্তায়, একা। আমি চলে আসি, আমার একবারও ইচ্ছে হয় না পেছনে তাকাতে। একবারও ইচ্ছে হয় না রুদ্রকে বলি আবার এসো, চিঠি লিখো। ইচ্ছে হয় না আমার। আমি জানি এই শেষ দেখা আমার তার সঙ্গে। আর হয়ত কোনওদিন দেখা হবে, হঠাৎ কখনও ঢাকার রাস্তায়, কখনও কোনদিন কোনও বইমেলায়। রুদ্রকে আমার স্বামী বলে তো নয়ই, কোনও প্রেমিক বলেও মনে হয় না। মনে হয় এক চেনা লোক। চেনা লোকটি কবিতা লেখে। চেনা লোকটির অসুখ হয়েছে বলে, যেহেতু আমার হাতের কাছে চিকিৎসার সুযোগ আছে, করুণা করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। চেনা লোকটি তার চেনা জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার চেনা জায়গায়। চেনা লোকটিকে নিয়ে আমার কোনও স্বপ্ন নেই। চেনা লোকটি আর কোনওদিন আসবে না আমার কাছে, আমার জীবনে, আমার শরীরে, আমার মনে। আর কোনও প্রেমের চিঠি নয়। আর কোনও শোয়াশোয়ি নয়। আর কোনও সংসার নয়। কোনও বন্ধন নয়। বন্ধন ছিন্ন করতে কোনও একদিন কোনও একটি কাগজে সই করে দেব। চেনা লোকটি ধীরে ধীরে অচেনা হয়ে উঠবে। চেনা লোকটির কবিতাই শুধু চেনা থেকে যাবে। আর কিছু নয়। চেনা লোকটির কবিতা হয়ত পড়ব, ধূসর ধূসর কিছু স্মৃতি হয়ত আমাকে মুহূর্তের জন্য আনমনা করবে। কেবল এই। এর বেশি নয় কিছু আর।

সমুদ্রে তোলা ছবিগুলো দেখে মা বলেন, আমাকে নাকি জলকন্যার মত লাগছে। সমুদ্রের শাদা ঢেউয়ে ভেসে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি, জলে ভেজা শরীর রোদে চিকচিক করছে, খালি পায়ে সূর্যাস্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছি, অনেক সময় এক দঙ্গল মেয়ে আছে সঙ্গে। মা বলেন, *আর কাউরে তো তোমার মত এত সুন্দর লাগতাছে না। তোমারেই মনে হইতাছে জল থেইকা উইঠা আইছো।* মা যদি জানতেন কি ঘটেছে আমার জীবনে, আমার শরীর এখন আর জলকন্যার মত পবিত্র নয়, তবে নিশ্চয়ই এ নামে আমাকে ডাকতেন না। মা যদি জানতেন সমুদ্রের হাওয়া খেয়েই আসিনি আমি, কদিনের জন্য হাওয়া হয়েও গিয়েছিলাম। আগুনের হলকা ছিল সে হাওয়ায়। আমি শুকনো হাসি হাসি। কার কাছে বলব নিজের এই পরাজয়ের কথা! না কেউ নেই কোথাও যার কাছে বসে কাঁদি। আমাকে একা একাই কাঁদতে হয়। একা একাই বসে থাকতে হয় ছাদে, নৈঃশব্দের কোলে মাথা রেখে। চোখের জল লুকিয়ে রাখতে হয় জলকন্যার। শওকত টিপ্পনি কেটেছে, *কি, হাইমেন রাপচার হইছে?*

আমি ম্লান হেসেছি।

কি গো জলকন্যা সমুদ্র নিয়া কবিতা লিখবা না! ইয়াসমিন বার বারই জিজ্ঞেস করে।

নাহ, কবিতায় মন নেই, মন শরীরে। দীর্ঘ দিন কবিতা লিখিনা, কবিতা আসে না আজকাল। জলকন্যাকে মনে মনে যাদুর পালঙ্কে ঘুম পাড়াই, মনে মনে বুঝি ঘুম নেই তার চোখে, দুশ্চিন্তার চাদর মুড়ি দিয়ে একা একা জেগে থাকে সে। জলকন্যা চিঠি পায়, *এসেই নিয়ে নিয়েছি। ব্যথা তেমন লাগেনি। ক্ষত এখনো অপরিবর্তিত। অভাবিত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি নিজেকে। তবে শোচনার কষ্ট খুব বেশি। .. দুর্ভাবনা করো না। কিছুই হারাইনি আমরা। সোনা মানিক, বিভ্রান্তির কালো রোদ আর কখনো আমাকে স্পর্শ করবে না। আমি ভাল থাকছি। ভাল থাকবো। আমি তোমার স্বপ্নের মত ভাল থাকব। তোমার শরীরের ঘ্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরে--আমি সেই ঘ্রাণের সাথে খেলি। তোমার হৃদয়ের রোদ উজ্জ্বল করে রেখেছে আমার পরান। আমি সকালের রোদ হয়ে উঠব, সকালের রোদ।* রুদ্রকে আমি চিঠিতে রোদ বলে ডাকতাম, রুদ্র ডাকত আমাকে সকাল বলে। ওইসব বাঁধনছেঁড়া প্রেম এখন কী বিষম অর্থহীন মনে হয়। রুদ্র এখন সকালের রোদ হয়ে উঠতে চায়। সে এখন আমার রুদ্র হয়ে উঠতে চায়। এখন কেন? কেন সে সেই প্রথম থেকেই ছিল না আমার! কেন সে বার বার বলেছে সে আমার ছিল! কেন সে ঠকিয়েছে আমাকে! কেন মিথ্যে বলেছে! এখন সে সকালের রোদ হয়ে উঠবে, কি করে বিশ্বাস করি তাকে!কেন আর চিঠি লেখে রুদ্র আমাকে। আমি তো তাকে আর আমার এ জীবনের সঙ্গে জড়াবো না। আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি রুদ্র নামের প্রতারকটির নাম। *ধূসর আকাশ*

থেকে অবিরল বৃষ্টি হয় হোক, জলের প্রপাত বেয়ে বন্যা এসে দুকূল ভাসাক, তবু ভাল নির্বাসন। খানিকটা ঝিকমিক রোদ আচমকা সুখ এনে পূর্ণ করে ঘরের চৌকাঠ, গোপনে বিনাশ করে স্বপ্নে ধোয়া সোনার বাসর, ঘুণপোকা খুঁটে খায় শরীরের সুচারু বৈভব, হৃদয়ের রক্ত খায়, খেয়ে যায় বাদামি মগজ। সেই রোদে পুড়ে পুড়ে খাক হয় অনন্ত আগামী, জীবন পুড়িয়ে দিয়ে আগুনের হল্কা ওঠে নেচে। আমার উঠোন জুড়ে মাটি আর খরায় চৌচির, জগত আঁধার করে নামে যদি তুমুল তুফানতবু ভাল নির্বাসন, রোদহীন বিষণ্ন সকাল। পৃথিবী আঁধার করে ফিরে যায় অমল রোদ্দুর, পেছনে কালিমা রেখে ফিরে যায় সবুজ সুষমা, শিকার খুবলে খেয়ে ফিরে যায় চতুর শৃগাল, লম্পট জুয়ারি ফেরে, অমানুষ, মদ্যপ শকুন। তুমিও তেমনি করে ফিরে যাও পরানের রোদ, ঘুরঘুট্টি কালো রাত ফেলে তুমি বনবাসে যাও, সোনালী ডানার রোদ উড়ে যাও পরবাসে যাও। এক ফোঁটা জ্যোৎস্না নেই, সেই ভাল, নিকষ আন্ধার, অমাবস্যা ডুবে থাক, তবু রোদ খুঁজো না সকাল। তবু রোদ তার সকালকে খুঁজেই যাবে। আর যা কিছুই হারাক, সে তার সকালকে হারাতে চায় না।

কেবল চিঠি নয়, চিঠির সঙ্গে কবিতাও পাঠায় রুদ্র। কবিতায় সেই রাতের কথা, সেই আমাদের প্রথম মিলন-রাত্রির কথা, আমার রাত জাগা রাতটির কথা।

ধ্বংসস্তূপের উপর বসে আছে একটি শালিক
পাশে এক মৃত্যুমাখা বেদনার বাজপোড়া তরু,
শূন্যতার খা খা চোখ চারপাশে ধূসর আকাশ।
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো স্বপ্নহীন আঁখি।

তোমার চোখের তীর ভেঙে পড়ে পাড়ভাঙা নদী,
তোমার বুকের পাশে জেগে থাকে নিভৃত পাথর।
কিসের পার্বন যেন চারদিকে কোলাহল রটে--
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো পরাজিত পাখি।

সুচাগ্র সুযোগে সাপ ঢুকে গেছে লোহার বাসরে,
বিষের ছোবলে নীল দেহে নামে শীতল আঁধার,
গাঙুরের জলে ভাসে কালো এক বেদনার ভেলা।
দুঃখিতা আমার, তুমি জেগে আছো বালিয়াড়ি-নদী।

নিখিল ঘুমিয়ে গেছে দিনশেষে রাতের চাদরে,
কামিনীর মিহি চোখে ঘুম এসে রেখেছে চিবুক,
জোনাকিরা নিভে গেছে সংসারের স্বপ্ন শুনে শুনে--
জেগে আছো, শুধু তুমি জেগে আছো আমার দুঃখিতা।

রুদ্র কি সত্যিই অনুভব করেছে আমার কষ্টগুলো! যদি তার হৃদয় বলে কিছু থাকে, তবে কেন সে অন্য মেয়েদের ছুঁয়েছে! হৃদয় বলে কিছু আমার ছিল বলে আমি কখনও কল্পনাও করতে পারিনি রুদ্র ছাড়া অন্য কোনও পুরুষকে। প্রতিদিন কলেজের সুদর্শন বুদ্ধিমান হিরের টুকরো ছেলেদের দেখেছি, কারও দিকে আমি তো ফিরে তাকাইনি।

কেবল হাবিবুল্লাহ নয়। আরও অনেক হিরের টুকরো তো আমাকে প্রেমের প্রস্তাব পাঠিয়েছে, সব তো দ্বিধাহীন ছুঁড়ে দিয়েছি। রুদ্র কেন পারেনি! শরীর তো আমারও ছিল, এই শরীর তো কখনও কাউকে কামনা করেনি! এই শরীর প্রতিদিন একটু একটু করে প্রস্তুত হয়েছে রুদ্রর জন্য। এই প্রস্তুত শরীরটি রুদ্র তার বহুভোগী কালিমায় কালো করেছে।

ভাঙনের শব্দ শুনি, আর যেন শব্দ নেই কোনও,
মাথার ভেতর যেন অবিরল ভেঙে পড়ে পাড়।
করাত কলের শব্দে জেগে উঠি স্নায়ুতে শিরায়
টের পাই বৃক্ষ হত্যা সারারাত রক্তের ভেতর।

কেন এত বৃক্ষহত্যা, এত ভাঙনের শব্দ কেন?
আর কোনও ধ্বনি নেই পৃথিবীতে, ব্রহ্মাণ্ডে, নিখিলে?
কোথায় ভাঙছে এত? কোনখানে? নাকি নিজেরই
গভীর মহলে আজ বিশ্বাসের গোপন ভাঙন!

উদাসীন দূর থেকে ডেকে যাই সকাল সকাল..
তবে কি সকাল ভাঙে পৃথিবীতে আমার সকাল!
আমার নগর ভাঙে, প্রিয় এই নিভৃত নগর?
তবে কি আকাঙক্ষা ভাঙে, স্বপ্নময় পরম পিপাসা?

প্লাবনের ক্ষতচিহ্ন মুছে নেয় মানবিক পলি,
আগুনের দগ্ধ শোক কবে আর মনে রাখে গৃহ।
দুর্যোগের রাত্রি শেষে পুনরায় তুলেছি বসত,
চিরকাল তবু এই ভাঙনের শব্দ শুনে যাব?

হ্যাঁ তোমাকে চিরকালই এই ভাঙনের শব্দ শুনে যেতে হবে। আমি আর ফিরব না তোমার ওই নষ্ট জীবনে। কবিতা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কবিতা আমাকে কাঁদায়, কিন্তু না, কবিতা আর জীবন এক নয়, কবি হতে হলে যদি বাণিশান্তার বেশ্যার সঙ্গে শুয়ে অসুখ বাঁধাতে হয়, তবে সে কবির কবিতা আমি ভালবাসতে পারি, সে কবির সঙ্গে জীবন জড়াতে পারি না। ফাঁকি তো যথেষ্ট দিয়েছ, আর কত রুদ্র! আমাকে বোকা পেয়ে কাছে টেনে যেটুক অবশিষ্ট আছে আমার, তাও নষ্ট করতে চাও! *আর কত ফাঁকি দেবে, আমি কি বুঝি না ভাবো চাতুরি তোমার! ভেতরে নরক রেখে কেমন বাহানা ধরো সুবোধ শিশুর! চুম্বনের স্বাদ দিলে বিষাক্ত সাপের মত ছোবলের ঘায়ে, মুখোশ খুলেই দেখি আসলে তোমার এক বীভৎস আদল। আর কত প্রতারণা, ভাঙনের নৃশংস খেলা এতটা নির্মম! পুন্নিমাবিহীন চাঁদ অশুভ অমাবস্যাকে ডাকে আয় আয়--জোনাকিকে জোৎস্না ভেবে নিকষ আন্ধার রাতে উৎসবে মেতেছি, এই তো আমার ভুল, এই তো আমার পাপ জালেতে জড়ানো.,এখন ছুটতে চাই, দুদাঁতে কামড়ে চাই ছিঁড়তে বাঁধন,এখন বাঁচতে চাই, প্রাণপণে পেতে চাই বিশুদ্ধ বাতাস। আর কত ফাঁকি দেবে, আমি কি বুঝি না ভাবো চাতুরি তোমার? জীবনে জঞ্জাল রেখে সুবাসিত হাসি টানো ঠোঁটের কিনারে ! গ্লানিতে অতীত*

ভরা, গ্লানিতে শরীর ভরা, ঘৃণার জীবন। অমৃতের মত ভেবে তবুও ছুঁয়েছি আমি বিষের অনল। এই কি আমার প্রেম, সাজানো গোছানো সাধ, সাধনার ধন? এই তো আমার ঘর, মাটি নেই, খুঁটি নেই, অলীক মহল, নিশ্চিত মরণ থেকে এবার বাঁচতে চাই, শুভ্র মুক্তি চাই, সুচারু স্বপ্নকে চাই, অমল ধবল চাই হৃদয়ের ঘ্রাণ। কিন্তু শুভ্র মুক্তি আমি পেতে পারি না। অমল ধবল জীবন আমি পেতে পারি না। রুদ্র নিজের অসুখের চিকিৎসা করে অনুতপ্ত অন্ধকার লিখছে। তার অনুতাপ আমাকে অসুখ থেকে রক্ষা করে না। আমি একা, আমার সমস্ত যন্ত্রণা নিয়ে একা আমি। হঠাৎ একদিন লক্ষ করি যৌনাঙ্গে ঘা হচ্ছে। তাহলে সংক্রামিত হয়েছিই! মনে একটি ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত হইনি। কেবল আশায় বসতি। এই চেনা শহরে আমার পক্ষে সম্ভব নয় রক্ত পরীক্ষা করা, কোনও ওষুধের দোকানে গিয়ে পেনিসিলিন ইনজেকশন চাওয়া। সম্ভব নয় নিজের শরীরে নিজে সুঁই ফোটানো। সম্ভব নয় কাউকে সুঁই ফোটাতে বলা। পেনিসিলিন ইনজেকশনের ডোজ দেখেই সকলে জেনে যাবে কোন রোগের চিকিৎসার জন্য এই *হাই ডোজ।* রুদ্র সুস্থ হচ্ছে, তার ক্ষত সেরে যাচ্ছে একটু একটু করে, ক্ষত আমার যৌনাঙ্গে বাড়ছে একটু একটু করে, আমি অসুস্থ হচ্ছি। এই অসুখটি আমি লুকিয়ে রাখি শরীরের গভীর গুহায়। কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন না জানে। একটি ভয় আমার গায়ে লেগে থাকে সারাক্ষণ, যেখানেই যাই যা কিছুই করি, ভয়টি আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় না। হাসপাতালে নার্সের ঘরে শত শত পেনিসিলিন, হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা লিখে দিচ্ছি, নানারকম পেনিসিলিনের নাম, রোগীর আত্মীয়রা সে ওষুধ আনছে, নার্সকে বলছি ইনজেকশন দিতে রোগীদের, চোখের সামনে নার্সও দিচ্ছে। কিন্তু নিজে একটি পেনিসিলিন নিজের জন্য নিতে পারছি না। নিজে কোনও ডাক্তার বা নার্সকে বলতে পারছি না আমাকে একটি ইনজেকশন দিয়ে দিন, একটি হাই ডোজের পেনিসিলিন দিন। এর চেয়ে যদি ক্যান্সার হত আমার, যে কোনও দুরারোগ্য রোগ, স্বস্তি পেতাম, অন্তত বলতে পারতাম আমার অসুখের নাম, চিকিৎসা করাতে কোনও লজ্জা হত না। কাকে বলব এখন কি রোগে ভুগছি আমি। কুণ্ঠার করাত আমাকে ফালি ফালি করে কাটে। ভয় লজ্জা আমাকে শক্ত দড়িতে বাঁধে। আমার সীমানা কমতে কমতে একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছোয়। কিন্তু কতদিন লুকিয়ে রাখব এই রোগ! ক্যানেসটেন মলম ব্যবহার করে জানি কাজের কাজ কিছু হবে না, তবু কিনি ওষুধটি। সঠিক ওষুধটি কেনার উপায় নেই বলে অন্য ওষুধ কিনি। এ মলম যৌনাঙ্গের ফাংগাস দূর করে, এ মলম ট্রিপোনেমা পেলিডামএর মত ভয়ঙ্কর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে পারে না। তারপরও প্রতিদিন জামার আড়ালে মলম নিয়ে গোসলখানায় ঢুকি, যেন গোসল করতে বা পেচ্ছাব পায়খানা সারতে যাচ্ছি। আর কারও চোখে কিছু পড়ে না, কেবল মার চোখে পড়ে। মলমটি বিছানার সবচেয়ে তলের তোশকের তলে লুকিয়ে রাখি। কেউ কখনও তোশকের ওই তলে হাত ঢোকায় না। এত লুকোনোর পর মা বলেন, *তর হইছে কি রে, বারে বারে বাথরুমে যাস কেন?*

কিছু হয় নাই তো! ফ্যাকাসে মুখটি আড়াল করে বলি।

তর কি কিছু অসুখ টসুখ হইছে নাকি?

কি কও এইসব? অসুখ হইব কেন!

আমার কিন্তু মনে হইতাছে তর কিছু হইছে।

মার চোখের দিকে তাকাই না। বুকের ধুকপুক বুকেই থাকতে দিই।

সামনে পরীক্ষা। ছেলেমেয়েরা দিনরাত পড়ছে। কলেজে যাই, ক্লাস করি। অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের বক্তৃতার দিকে চোখ, কিন্তু মনটি অন্য কোথাও, মন শরীরে। বাড়িতে বই সামনে নিয়ে বসে থাকি, মন চলে যায় বইয়ের অক্ষর থেকে শরীরে। শরীরে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। চিকিৎসা এক্ষুনি দরকার। কিন্তু কি করে চিকিৎসা পাবো, কোথায় পাবো! রুদ্র মোংলায় বসে কবিতা লিখছে। ঢাকা গিয়ে চিকিৎসা করারও উপায় নেই। হাই ডোজের পেনিসিলিন সিফিলিস ছাড়াও হৃদপিণ্ডের অসুখে ব্যবহার হয়। হৃদপিণ্ডের অসুখও যদি হত আমার, বাঁচা যেত। অন্তত সে কারণে নিশ্চিন্তে একটি ইনজেকশন আমি নিতে পারতাম। চাইলেই তো হৃদপিণ্ডকে অসুখ দিতে পারি না। মাঝে মাঝে কনুইয়ে যে ব্যথা হয়, এক কনুই থেকে আরেক কনুইয়ে লাফ দিয়ে ব্যথা যায়, এই রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিসএর সময় হৃদপিণ্ডের মাইট্রাল স্টেনোসিস ঘটাতে পারে। মাইট্রাল স্টেনোসিস হলে শ্বাসকষ্টের উপসর্গ থাকে। এই যে হঠাৎ রাতে রাতে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, যেন একটি ছোট্ট ট্রাংকের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি, শ্বাস নেওয়ার জন্য বাতাস পাচ্ছি না সেরকম লাগে, শোয়া থেকে উঠে বসে ফুসফুসে বাতাস নিতে থাকি, বসে না হলে দাঁড়িয়ে, তাতেও না হলে জানালা খুলে হলে শ্বাস নিই। সেটিরই তো নাম *অকেশনাল নকচারনাল ডিসনিয়া।* তবে তো আমি যোগ্যতা রাখি *হাই ডোজ পেনিসিলিন* পাওয়ার। এই যোগ্যতার সুযোগ পেয়ে আমি ক্লাসের একটি সাদাসিধে ভালছাত্রী নাসিমাকে বলি, *আমার নকচারনাল ডিসনিয়া হয়। ভয় করছি মাইট্রাল স্টেনোসিস আবার না হয়ে যায়। ভাবছি পেনিসিলিন ইনজেকশন নেব। নিলে তো মাইট্রাল স্টেনোসিস অন্তত প্রিভেন্ট করা যাবে কি বল।* নাসিমা যদি বলে আমার নেওয়া উচিত পেনিসিলিন, তবেই নাসিমাকে সাক্ষী রেখে আমি ইনজেকশনটি নিতে পারি। নাসিমাই আমার হৃদডিণ্ডটি বাঁচাতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমার অত বড় অসুখের কথা শুনে নাসিমা হাসে। বলে, *আগেই ইনজেকশন নেবে কেন? আগে হার্টটা দেখ। মারমার পাও হার্টে?* বিপাকে পড়ি, স্টেথোসকোপ নিজের বুকে কখনও লাগাইনি। রোগির হৃদপিণ্ড নিয়েই ব্যস্ত, নিজের হৃদপিণ্ডের খবর কে রাখে। কেবলই অনুমান। অবশ্য এসব অনুমানের ওপর আমাকে কেউ পেনিসিলিন নিতে দেবে না, কাউকে না জানিয়ে গোপনে কোনও ইনজেকশনও আমাকে দেবে না কেউ, এমন কি নাসিমাও। ভাল ছাত্রীর ভাল কান স্টেথোর নলে, নল বেয়ে আমার হৃদপিণ্ডের কোনও মন্দ শব্দ ভাল কানে পৌঁছে না। কোনও *মারমার* নেই, সুতরাং পেনিসিলিন নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই আমার। বুঝি, ইনজেকশন ছাড়া উপায় নেই।

রুদ্র মোংলা থেকে ফিরে এলে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে আমি ঢাকার বাসে চড়ি। বাড়ির কারও অনুমতির জন্য অপেক্ষা করলে আমার চলবে না। ঢাকায় শাহবাগের এক ওষুধের দোকানে, রুদ্র যেখানে নেয় ইনজেকশন, নিয়ে যায়। নিতম্বের মাংসে লম্বা মোটা সুঁই ফোঁটালো যে লোকটি, বাঁকা একটি হাসি ঝুলে রইল তার ঠোঁটে, স্পষ্ট দেখি। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি সুঁই আর হাসি, দুটোই। ওষুধের দোকানের পাশেই চায়ের দোকান, ওখানে বসে রুদ্র খুব নরম কণ্ঠে বলে *আজ থেকে যাও।* রুদ্রর চোখদুটোয় তাকালে আমার এখনও, অবাক কাণ্ড,আগের মতই, কীরকম যেন লাগে। ঘরে ফিরে রুদ্র আমার হাতে আঙুল বুলোয়, আঙুলগুলো দেখি যে আঙুল অন্য কোনও নারীর শরীর ছোঁয় ঠিক এভাবেই। রুদ্র চুমু খায় আমাকে, এভাবেই সে চুমু খায় অন্য নারীদের। রুদ্র বুকে হাত রাখে, এভাবেই সে রাখে অন্য নারীর বুকে। রুদ্র বিছানায় নিয়ে আমাকে শুইয়ে দেয়, সারা শরীরে আদর করে, এভাবেই সে করে আর নারীদের। এভাবেই সে আরেক নারীর

সঙ্গে শোয়। কোথাও খুব যন্ত্রণা হয়। বুকের ভেতরে। নিজেকে বার বার বলি, না, এ জীবন আর নয়। আমি ফিরে যাব ময়মনসিংহে আজই, আর কোনওদিন রুদ্র বলে কোনও মানুষের কথা ভাবব না। রুদ্র আমার পাশে শুয়ে আমার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে ধরা গলায় বলতে থাকে মদ আর মেয়েমানুষের নেশা তার জীবনের শুরু থেকে ছিল। আমাকে সে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছিল, আমি বুঝিনি। আমাকে তার জীবনের সব খুলে বলার ইচ্ছে ছিল খুব, কিন্তু বলা হয়নি তার। আমাকে বিয়ে করার পর তার যে খুব ইচ্ছে ছিল আগের জীবন যাপন করতে, তা নয়। আমি তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে দ্বিধা করেছি বলেই তাকে যেতে হয়েছে বেশ্যাবাড়ি। কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসা কোনও বেশ্যাবাড়ি গিয়ে নষ্ট হয়নি।

যে পেনিসিলিন আমাকে সুস্থ করার কথা, আমাকে অসুস্থ করতে থাকে আরও। একটি গোটার জায়গায় আরও পাঁচটি গোটা জন্ম নেয়। গোটা আর গোটা নেই, মুখ খুলে মেলে দেয়, খোলা ঘা থেকে পাজামায় রস গড়িয়ে নামছে। রস থিকথিকে হয়, রস শাদা থেকে কালো হয়। দুর্গন্ধ থেকে দুর্গন্ধতর হয়। রসের রং শাদা থেকে বাদামি হয়। বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি, গাঢ় বাদামি থেকে লালচে, লালচে থেকে কালচে। কালচে থেকে কালো। কালো থেকে আলকাতরার মত কালো। আমি মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি নিজের শরীর। আতর কিনে গায়ে মাখতে থাকি। যেন কেউ গন্ধ না পায়। সারা রাত কড়া আলো জ্বেলে রাখি ঘরে, রাত জেগে পড়তে হবে বলে। পরীক্ষা সামনে। টেবিলে নয়, বিছানায় বইখাতা এমন ছড়ানো যে আমি আমার আর বইখাতার পর ইয়াসমিনের শোয়ার জায়গা হয় না। আমি চাই না ওর জায়গা হোক। আমি চাই না এই জীবাণু আমার এই শরীর থেকে আমার জামা পাজামা, বিছানার চাদর বালিশ থেকে ইয়াসমিনকে স্পর্শ করুক। গোসলখানায় গোসল করি একবারের জায়গায় দুবার, কখনও তিনবার। বলি যে আমার গরম লাগছে। এত গরম যে বার বার গোসল না করলে আমার হয় না। গোসল করার উদ্দেশ্য পাজামা ধোয়া। পাজামা ভিজে যায় দুর্গন্ধ নির্যাসে। শেষ অবদি আমাকে তুলো ব্যবহার করতে হয়। তুলোও বড় লুকিয়ে। কারণ আমার ঋতুর হিসেব আমার না থাকলেও মার কাছে থাকে। প্রতি মাসেই আমাকে তলপেটের ব্যথায় বিছানায় গড়াতে হয়। সেইসব কোনওরকম উপসর্গ ছাড়াই আমি ঋতুর দেখা পেয়েছি এ একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়াবে। গোসলপেচ্ছাবপায়খানার পেছন দিকে একটি বন্ধ বারান্দায় রক্তভেজা কাপড় তুলো ফেলে দেওয়ার অভ্যেস আমার আর ইয়াসমিনের। বাবা মাঝে মাঝে ওই বারান্দা পরিষ্কার করেন।নিজের হাতে আমাদের রক্তের তুলো তোলেন। ওখানে রক্তহীন কোনও তুলো পড়ে থাকতে দেখলে মার সন্দেহ হবে, ভেবে গুটিয়ে যাই। তুলো যদি পায়খানায় ফেলি, বদনি বদনি পানি ঢেলেও সেটি দূর করা যাবে না। আটকে যাবে পথে, গু মুত সব ফোয়ারার মত উত্থিত হবে। মাথা থেকে সার্জারি মেডিসিন গায়নোকলজি গেছে আমার, মাথায় কেবল একটি রোগ, একটি রোগ থেকে বাঁচার উপায়। শরীরে মাথা ফুঁড়ে বেড়ে ওঠা একটি রোগ সবার চোখ থেকে লুকোনো।

হাসপাতালে প্রতিদিন রোগির চিকিৎসা করছি, অথচ নিজের শরীরে একটি রোগ। এই রোগ নিয়ে কোনও চেনা ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় না। এই রোগ এখন আর প্রাথমিক স্তরে নেই, দ্বিতীয় স্তরে চলে গেছে। পেনিসিলিন ইনজেকশন যেটি নেওয়া হয়েছে সেটিও শরীরে কাজ করেনি। রোগটি তৃতীয় স্তরে এসে স্নায়ুতন্ত্র অচল করে দেবে। নিউরোসিফিলিসে আক্রান্ত হওয়া মানে মৃত্যু। আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করতে থাকি। রাতে

একটি মৃত্যুকে আমি পাশে নিয়ে ঘুমোই। একটি মৃত্যুকে নিয়ে সকালবেলা জেগে উঠি। কলেজে যাই, সঙ্গে একটি মৃত্যু যায়। কলেজ থেকে ফিরি, একটি মৃত্যু ফেরে। সন্ধের বারান্দায় একা একা বসে থাকি উঠোনের দিকে মুখ করে। একটি মৃত্যু বসে থাকে পাশে। এ অবস্থায় একদিন মুখে খাওয়ার পেনিসিলিন ট্যাবলেট কিনি।এ কাজে দেবে না জেনেও কিনি। যদি অলৌকিক ভাবেও কাজে দেয়। যদি হাই ডোজ খেয়ে এ থেকে সামান্য হলেও মুক্তি পাই। ওষুধ লুকিয়ে রাখি তোশকের তলে যেন কেউ না দেখে। একসময় জ্বর হলে ওষুধ লুকিয়ে ফেলে দিতাম, ওষুধ খেতে,গিলতে ভয় ছিল। এখন লুকিয়ে ওষুধ খাই। এখন বারোটির জায়গায় বাহাত্তরটি খাই। এতেও কিন্তু কাজ হয় না। দাদার ফেলে যাওয়া ওষুধের বাক্স ঘেঁটে ঘুমের ওষুধ নিয়ে খাই। অন্তত ঘুমিয়ে যদি মৃত্যুকে আড়াল করা যায়। কিন্তু একসময় জাগতে তো হয়। মার মুখোমুখিও দাঁড়াতে হয়। বাড়ির আর কেউ লক্ষ না করলেও মা ঠিকই লক্ষ করেন, আমি ঠিক আগের মত নেই। কড়িকাঠের দিকে চোখ রেখে শুয়ে আছি, মা দরজার কাছে থামেন, *কী এত ভাবস?*

না কিছু ভাবি না তো! এমনি শুইয়া রইছি।

আমার কাছে লুকাস কেন?

লুকোনো ছাড়া আমার আর উপায় নেই মা, মনে মনে বলি।

তর কিছু একটা হইছে রে। খুব খারাপ কিছু হইছে তর। খুব খারাপ কিছু।

আমি পাশ ফিরে শুই। মার মুখ যেন আমাকে না দেখতে হয়। অথবা আমার মুখটি মাকে।

রুদ্র আবার মোংলা চলে গেছে। ওখানে বসে ধান চালের হিসেব করে। টাকা গোনে। কবিতা লেখে। আর আমার জন্য হঠাৎ হঠাৎ দুশ্চিন্তা করে। তার দুশ্চিন্তার উত্তর লিখি।

অবকাশ
১৬.৮.৮৩

রোদ,

এগারো তারিখে লেখা তোমার ছোট্ট চিঠিটি হাতে নিয়ে বাসায় ফিরলাম। *তোমার কিচ্ছু ভাল লাগে না, আমার কথা ভেবে তুমি একফোঁটা শান্তি পাচ্ছো না*--এসব পড়ে রীতিমত হাসি পায়। দয়া করে এধরণের কথা অন্তত আমাকে তুমি দ্বিতীয়বার বোলো না। বিশ্বাস করো, আর যা কিছুই সহ্য করি, এসব ন্যাকামো কথায় আমার ভেতরে আগুন জ্বলে ওঠে। আর কত আগুন তুমি জ্বালাবে? পুড়ে পুড়ে আমি তো ছাই হয়ে গেছি। এতটুকু টের পাও না? কিচ্ছু বুঝতে পারো না?

তুমি অনুযোগ করতে আমি নাকি কথা বলি না। আমি তো এখন অনর্গল কথা বলি, প্রচুর হাসি, হাসতে হাসতে ইদানিং আমার চোখ ভিজে যায়। চোখের ভেতরে একটা সমুদ্র লুকিয়ে থাকে, একটি নোনা জলের সমুদ্র নিয়ে এসেছি আমি। প্রতিনিয়ত যে রোগ আমাকে খুবলে খাচ্ছে, তা বাজারে সস্তায় বিক্রি হয়ে যাওয়া *খারাপ মেয়ে মানুষদের রোগ।* নিজেকে খুব বেশি ভালমানুষ ভাবতাম, ফুলের মত সুন্দর পবিত্র ভাবতাম, একফোঁটা পাপ করিনি কোনোদিন। তাই বোধহয় অহংকারের শাস্তি পেতে হল এভাবে। ফুলে যেমন কীট এসে খেয়ে ফেলে পাঁপড়ি, সব সৌন্দর্য নষ্ট করে, মানুষের ঘৃণায় অবহেলায় বেঁচে থাকতে থাকতে একদিন সবার অলক্ষ্যে টুপ করে মরে যায়। কেউ তাতে দুঃখ করে না।

খুব বেশি স্বপ্ন ছিল আমার। এতটা স্বপ্ন কেউ দেখে না। খুব বেশি বিশ্বাস আর ভালবাসায় নির্মাণ করা স্বপ্ন। চোখের সামনে দেখেছি আকাঙক্ষার ঘরদোর পুড়ে গেল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এখন শাদামাটা মানুষ আমি, স্বপ্নের বালাই নেই। বুকে বাসনা নেই, আশা নেই, আকাঙক্ষা নেই। কেবল একটা মানুষের শরীরের মত শরীর। ভেতরে সব ফাঁকা, সব শূন্য। বেশ হালকা মনে হয় নিজেকে। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই। কোথায় আছি, কি করছি, এসবও ভুলে থাকতে ইচ্ছে করে বলে *ডায়জিপাম* খাই। মনে হয় আকাশে উড়ছি, রাতের আকাশ। চাঁদ নেই, জ্যোৎস্না নেই, কালো আঁধার আকাশ।

বাবা মার উচ্চাকাঙ্খাকে পায়ে মাড়িয়ে, সমস্ত আত্মীয় স্বজনের কল্পনাকে গুড়িয়ে দিয়ে, তাবৎ লোকের সমালোচনাকে তুচ্ছ মনে করে আমি তোমার কাছে গেলাম। বিনিময়ে তুমি আমাকে যা দিলে সে তো আমার সারাজীবনের পরম পাওয়া। তোমার এই উপহার আমি মাথায় করে রাখব।

এ থেকে আমার পরিত্রাণ নেই। তাই তো আমি ভাল হচ্ছি না এবং ভাল হবো না। চারপাশে বড় বড় স্যাংকারে ভরে গেছে। আর প্রতিনিয়ত যে ডিসচার্জ হচ্ছে খুব র‍্যাপিডলি তার ক্যারেকটার পাল্টাচ্ছে। কালো আবর্জনার মত ডিসচার্জ, দুর্গন্ধে ডুবে থাকে শরীর। জটিল একটি ব্যাপার, খুব বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটছে, স্পষ্ট বোঝা যায়।

এখন একটি কমপ্লেক্স এসেছে আমার মধ্যে, ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। হঠাৎ খুব বেশি নীরব হয়ে গেছি। কারো সঙ্গেই কথাবার্তা বলি না। সব্বাই খুব পড়াশোনা করে। সামনে পরীক্ষা। আমি কোনোকিছু পড়তে পারি না। বইপত্র ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

কেবল ওই আকাশ। রাতের স্তব্ধ আকাশ। কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। ভুলতে চাই। ভুলতে চাই। সবকিছু ভুলে থাকতে চাই। তুমি আমার যন্ত্রণাগুলো জানো না। বুঝতে পারো না। মাঝে মাঝে আমার অবাক লাগে। আমি কি মানুষ!

একটা মানুষের মধ্যে তো অভিমান থাকে, রাগ থাকে, প্রতিশোধের ইচ্ছা থাকে। একটা মানুষের মধ্যে তো ঘৃণা থাকে,বিদ্বেষ থাকে, অবিশ্বাস থাকে। কেবল কি নোনা জলের সমুদ্রই থাকে!

দূরে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। যেখানে কেউ নেই, কিচ্ছু নেই, দুঃখ নেই, সুখ নেই। যেখানে সব কিছু ভুলে থাকা যায়। কষ্টগুলো এভাবে পোড়ায় না। কতটুকু আগুন তুমি আমাকে দিয়েছো, তুমি জানো না। আমি জানি কি হতে যাচ্ছে আমার শরীরে। তুমি এসব বুঝবে না। এসব খুব খারাপ জিনিস। ভাল মানুষদের এসব হয় না, বাজারে সস্তায় বিক্রি হয়ে যাওয়া খারাপ মেয়েমানুষদের হয়।

সকাল

অবকাশ
২০.৮.৮৩

রোদ,

বড় সাধ ছিল তোমাকে রোদ ডাকার। আসলে এ নামে তোমাকে মানায় না। তুমি তো অন্ধকারের মানুষ। তুমি কালো অভিশাপ ডেকে আনো আলোকিত জীবনে। সুন্দর স্বপ্নগুলোয় দুঃস্বপ্নের কালিমা লেপে দাও। তুমি তো জাহান্নামের আগুনের মত, পুড়ে ছাই

করে দাও। তুমি তো ভালবাসতে জানো না, তুমি জানো প্রতারণা করতে। তোমাকে বিশ্বাস করা পাপ, তোমাকে ভালবাসা পাপ। এই পাপ আমার শরীরে ঢুকেছে। আমি কেমন জ্বলে মরছি, জ্বালায় যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত আমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, তা তো তুমি জানো। আর কতটুকু ধ্বংস দরকার মরতে হলে? আর কতটুকু? বড় সাধনার ধন তুমি। জীবনভর সাধনা করে আমি একটা নষ্ট মানুষ পেয়েছি। আমার ভাগ্য দেখে তোমার হাসি পায় না রোদ, মনে মনে নিশ্চয়ই তুমি অট্টহাসি হাসো।

জানো রোদ, তোমাকে কাছে পেলে আমি, কি অবাক কাণ্ড, সব ভুলে যেতে চাই। আমার আর কোনও আশ্রয় নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, আর কোনও পথ নেই ঘুরে দাঁড়াবার--তাই হয়ত ভুলতে চাই--ভাবতে চাই সাজানো স্বপ্নের কথা, অস্বীকার করতে চাই তোমার নষ্ট অতীত। আসলে এভাবে হয় না, নিজের সাথে বেশি অভিনয় হয়ে যায়। বুকের মধ্যে চেপে রাখা কষ্টগুলো আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তুমি তো ভালবাসতে জানো না, তাই বোঝোনা এ কষ্ট কেমন, কতটা পোড়ায়।

আজ সারা বিকেল প্রাণভরে কেঁদেছি। এখনও কণ্ঠের কাছে কষ্টের মেঘ জমে আছে। পারি না, আমি আর এভাবে পারি না। এখন কেবল দুঃস্বপ্ন দেখি। পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন। এখন আর সৃষ্টির স্বপ্ন নয়, এখন ধ্বংসের, ভাঙনের দুঃস্বপ্ন দেখি। কষ্ট ভুলতে লোকে মদ পান করে, আমি প্রচুর মদ চাই। ঘুমোবার জন্য ট্রাংকুলাইজার চাই, সিডেটিভ চাই। এরপর মরবার জন্য একটু বেশি ডোজ হলেই চলবে।

জীবনের প্রতি এক ফোঁটা মোহ নেই, ভালবাসা নেই। আমি তো পাথর হতে চাই, পারি না। চোখের ভেতর পুরো একটা নোনা জলের সমুদ্র।

সে রাতে তুমি যখন অল্প অল্প করে আবেগের তুমুল জোয়ার আনলে, আমার শরীরে কোনও অনুভূতি ছিল না। এইসব ব্যাপারগুলোয় নরমাল সেস্কুয়াল অরগানে যে নরলাম স্টিমুলেশন হয়, তা আমার হচ্ছিল না। আমার মাথার ভেতর কেবল যন্ত্রণা হচ্ছিল। তীব্র যন্ত্রণা। তীব্র যন্ত্রণা।

তুমি কেন ঘুমোওনি? আমার যন্ত্রণায়? ঘুম হয়নি বলে সারা সকাল ঘুমোতে চেষ্টা করলে!

তোমার অনুশোচনা হয় না রোদ? এতটুকু অনুশোচনা হয় না? তোমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না? বিষ খেয়ে মরতে পারো না? তুমি মরে গিয়ে আমাকে একটু বাঁচাও। তুমি মরে গিয়ে আমাকে একটু শান্তি দাও।

সকাল

ইনজেকশনেও কাজ হয়নি, ট্যাবলেটেও নয়। আর কোনও রকম ওষুধের কথা তো বইয়ে লেখা নেই। কাজ না হলে ডাক্তারের কাছে যে যাবো, সে উপায়ও নেই। অতএব ছেড়ে দাও, অসুখ অসুখের মত বেড়ে যাক। বাড়িতে এমন কঠিন লেখাপড়া সম্ভব নয় বলে আমি কাপড় চোপড় বই পত্র নিয়ে হোস্টেলে চলে যাই। বাড়ির সকলের বাধাকে তুচ্ছ করার দুঃসাহস আমি দেখাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাব। ওখানে থেকে যে দল বেঁধে পড়া হয় আমার, তা নয়। সাফিনাজের ঘরে, যে ঘরে ওর আরও তিনজন রুমমেট আছে, সে ঘরেই ঢুকি। চারজনের জায়গায় পাঁচজন। এতে কারও আপত্তি নেই। ওরা জানে আমি প্রাণোচ্ছল এক মানুষ। ওরা জানে যে আমি হাসতে জানি, আনন্দ করতে জানি। চমৎকার চমৎকার কথা বলতে জানি। আমার উদাসিনতা যেমন সুন্দর, আমার উচ্ছলতাও। ওরা

সব জানে, কেউ জানে না একটি রোগ খুব গোপনে গোপনে আমি পুষছি। এই মেডিকেল কলেজ, এই হাসপাতাল, এই রোগ এই ওষুধ এই চিকিৎসার রাজত্যের মধ্যিখানে বাস করেও আমার একটি রোগ পুষতে হচ্ছে। ঘাগুলো ধীরে ধীরে নির্যাস কমাতে থাকে, ধীরে ধীরে বীভৎস চেহারাটির পরিবর্তন করতে থাকে, আবার হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ফুঁসে ওঠে। আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছে রোগটি। আমার সঙ্গে লুকোচুরি রুদ্রও খেলছে। ঢাকা ফিরে আসবে বলছে, অথচ আসছে না। এক সপ্তাহ পর ফিরবে বলেছে। দুমাস পার হয়ে যায় ফেরার নাম নেই। রুদ্রর চিঠি এখন আর ডালিয়ার ঠিকানায় আসার দরকার হয় না। হাসপাতালের পোস্ট অফিসের ঠিকানায় আসে চিঠি। পোস্ট মাস্টার আমার চিঠি রেখে দেয় যত্ন করে এক পাশে, তুলে নিই দুপুরের দিকে। চিঠির খামে আবারও কবিতা।

জানি না কখন হাতে বিষপাত্র দিয়েছি তোমার,
পিপাসার জল ভেবে তুমি তাকে গ্রহণ করেছ।
জীবনের খামে মোড়া মৃত্যু এনে কখন দিয়েছি
জানি না কখন হাতে দ্রাক্ষা ভেবে দিয়েছি গন্ধম।

রাত নামে, মৃত্যুময় রাত নামে শরীরের ঘরে,
এই রাত জ্যোৎস্নাহীন, জোনাকিও নেই এই রাতে।
কেবল আঁধার, এক ভাঙনের বিশাল আঁধার,
কেবল মৃত্যুর ছায়া স্বপ্নমগ্ন দুটি চোখ জুড়ে।

জানি না গোলাপ ভেবে বিষফুল করবীর স্মৃতি
কখন দিয়েছি তুলে হেমলক-জীবনের ভার,
কখন নিয়েছি টেনে ঘুণেজীর্ণ উষর অতীতে--
আজ শুধু শোচনার ম্লান শিখা সেঁজুতি সাজায়।

আঁধার মরে না এই রুগ্ন ভাঙা আঁধারের দেশে,
রোদের আকাঙক্ষা বুকে প্রান্তরের পথে নামে তবু
জীবনের গাঢ় তৃষ্ণা অমলিন উর্ণনাভ হিয়া--
রাতের আকাশ তবু নিয়ে আসে রোদের সকাল।

হোস্টেলের জীবন অন্য রকম। পড়ার সময় পড়া, গল্পের সময় গল্প, ঘুমের সময় ঘুম। সাফিনাজের নিয়মপালনে কোনও রকম ত্রুটি থাকার জো নেই। আমি এসেই অনেকটা এলোমেলো করে দিই। আমার রুটিন না মানা জীবন, আর হাতের কাছে এত মেয়ে, এত মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবন, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত আমার কাছে এত নতুন যে আমি বই থেকে বার বার উঠে যাই, ঘুমের সময় গল্প, পড়ার সময় অট্টহাস্য আর আডড ার সময়ও আড্ডা দিতে থাকি। যাদের এপ্রোন পরা দেখেছি এতবছর কলেজ বা হাসপাতালে, এপ্রোন খুলে ফেললে যে তাদের আর সাধারণ মেয়েদের মতই দেখতে লাগে, তখন আর সাধারণ মেয়েদের মতই তারা হাসে কাঁদে অভিমান করে, তারা খায় দায় ঘুমোয়, গান গায় নাচে *আউটবই* জাতীয় জিনিস পড়ে, তারাও প্রেম করে তারাও

স্বপ্ন দেখে--পড়াশোনার চেয়ে বেশি উৎসাহ আমার এসবে। আমি রুদ্রহীন জীবন চাই এখন। যে জীবন আমাকে ভুলে থাকতে দেবে আমার অতীত। আমি নিজেকে একা হতে দিতে চাই না। একা হলেই একটি রোগ আমার শরীর থেকে মাথায় ভ্রমণ করে। আমি আত্মহত্যার স্বপ্ন দেখতে থাকি। তবু হোস্টেলেও মাঝে মাঝে একা হতে হয়। একা হলে আবার সেই রোগটি আমার স্নায়ুর ওপর শুঁয়োপোকার মত হাঁটে। আবার রুদ্র নামের একটি দুঃস্বপ্ন। আবার চোখের জল, সে জল চিঠির অক্ষরে পড়ে অক্ষর মুছে দিতে থাকে।

হোস্টেল
১৫.৯.৮৩

রোদ

সেই সকাল থেকে হোস্টেলে বসে আড্ডা দিচ্ছি। খেয়ে দেয়ে এখন সবাই খানিকটা ঘুমোচ্ছে। ঘুম আসছে না বলে আমি লিখছি। তোমার সবকিছু জানিয়ে তুমি নাকি খুব বড় করে আমাকে চিঠি লিখবে, কেন? সব কিছুর শেষে, আমার জীবনের চরম সর্বনাশ করে এখন তুমি তোমাকে জানাবে কেন? আগে জানাতে পারোনি? আগে কেন ভাষার খোলসে ঢেকে রেখেছিলে তোমার আসল আদল? তখন তো *নষ্ট* হওয়ার মানে বুঝি না, তখন তো *অন্ধকারের* মানে বুঝি না, *উড়নচণ্ডি, এলোমেলো* এসবের মানে বুঝি না। তখন কেন স্পষ্ট করে কাঠখোট্টা ভাষায় তুমি আমাকে জানালে না? এসব রকমারি শব্দের আড়ালে কেন তুমি আমার সঙ্গে এতকাল অভিনয় করে গেলে?

আমার আর কি জানার বাকি আছে! কি আর জানা দরকার আমার? আর কি জানাতে চাও? এতকাল বাদে এসব জেনে কি দরকার আমার বলো? তোমার নষ্ট জীবনের কথা আর কতভাবে তুমি আমাকে জানাতে চাও?বিশ্বাস করো আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। যতক্ষণ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি, স্ফূর্তিতে থাকি, ভাল থাকি। বাসায় একা থাকি, কষ্ট বাড়ে। এই হোস্টেলে যদি একটা রুম থাকত আমার, কোনোদিন বাসায় যেতাম না।

তুমি ক্ষমাহীন অন্ধকার কি না আসলে--সন্দেহ প্রকাশ করেছো? আশ্চর্য! তোমার লজ্জা হয় না? তোমার এতটুকু লজ্জা হয় না? তুমি কি মানুষ না জন্তু? তোমার মরতে ইচ্ছে করে না কেন? তুমি ক্ষমাহীন অন্ধকার নও, তবে তুমি কি? তুমি আর কি হতে চাও? পৃথিবীতে এমন কোন দয়ার সাগর আছে তাকে বলো, বলো তোমার কীর্তির কথা, কে তোমাকে ক্ষমা করবে? একটি মানুষ আনো, সারা দেশ ঘুরে তুমি এমন একটি মানুষ এনে আমাকে দেখাও যে বলবে তুমি ক্ষমার যোগ্য, যে বলবে তুমি নষ্ট অন্ধকার নও। পারবে?

তুমি শিল্পের মানুষ জানি। তুমি ভাল কবিতা লেখো, তাতো জানিই। তাতে কি? তোমাকে অন্যভাবে দেখবো মানে? কিভাবে দেখতে বলছো? হ্যাঁ, তুমি যদি আমার কেউ না হতে, তুমি যদি কেবল একটি শিল্পের মানুষই থাকতে, তবে হয়ত অন্যভাবে দেখতাম। তুমি একশ একটা মেয়েমানুষ নিয়ে লীলা করতে, বেশ্যাবাড়ি যেতে, তোমার সিফিলিস হতো, তুমি মদ খেতে, গাঁজা খেতে--তাতে আমার কোনোকিছু আসতো যেতো না। তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা থাকতো না। তুমি শিল্পের মানুষ। তুমি যা সৃষ্টি করছ, তুমি যা লিখছ, আমি কেবল তা নিয়েই ভাবতাম। কিন্তু তুমি আমার স্বামী। তুমি শিল্পের হও, অশিল্পের হও, তুমি আমার স্বামী। তুমি অন্য কোনো মেয়েমানুষ নিয়ে ভাবলে, কবিতা লিখলে, বুকে বড় লাগে। তুমি গাঁজা খাও, মদ খাও,

দুঃখে কাঁদি। আর কত? বিয়ের আগে হাজারটা মেয়ের সাথে প্রেম করেছো, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু মেয়ে নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মত রাত কাটিয়েছো, উপভোগ করেছো অন্য কোনো নারীর শরীর, বিশ্বাস করো এসব সহ্য করা যায় না। প্রেমে মত্ত হয়ে কোনো মেয়েকে বিয়ে করার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলে একথা শুনলে বুকের ভেতরটা ভেঙে যায়। আমাকে বিয়ে করেছো অথচ তুমি নিয়মিত মদ খাও, বেশ্যাবাড়িতে যাও, এসব তো কোনোকালে কল্পনাও করিনি। এসব কোনো মেয়ে সহ্য করতে পারে না, কোনো মেয়েই পারে না, বিশ্বাস করো। তুমি এক্সাইটেড হবে ভাল কথা, অস্বাভাবিক তো কিছু নয়, তুমি মাস্টারবেট করো। তুমি বেশ্যার কাছে যাবে কেন? তুমি আমাকে এত বড় অপমান করবে কেন?

আমাকে ধোঁকা দিয়ে এতটা পথ এনে তুমি তোমার স্বরূপ দেখালে? এ আমার নারীত্বের অপমান। কোনো মেয়েই এসব সহ্য করতে পারে না। কোনো স্ত্রী এসব সহ্য করতে পারেনা। তুমি আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েও বহুবার মিথ্যে বলার চেষ্টা করেছো। মিথ্যে বলাটাকে আমি দারুণ ঘৃণা করি। অথচ তুমি কি অনায়াসে বলে যেতে পারো, নিজেকে কি সুন্দর লুকোতে পারো! অন্য কোনো মেয়ে এ সময়ে কি করত আমি জানি না। সহ্য করার প্রশ্নই তো ওঠে না এখানে। তবে এটা নিশ্চিত, তোমার মত স্বামী নামক প্রতারকের কাছে কেউ এক মুহূর্ত থাকত না। হয় তোমাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলত, নয় নিজে মরত। নয়ত বেরিয়ে গিয়ে অন্য কোনোভাবে কেঁচে থাকত। কিন্তু আমি কেন এখনো নিজেকে মুক্ত করছি না--ভাবলে আমার অবাক লাগে। আমার কিসের অভাব? তোমাকে ছাড়া আমার জীবন যাপনের এতটুকু হেরফের হবে না। তবে? আসলে বোধহয় আমি খুব ভীরু, পাছে লোকে কিছু বলে এসব ভাবি। অথচ এদুটোকে অস্বীকার করেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম। আমি তো তোমার রূপ দেখিনি, কেবল শিল্প দেখেছি, আমি তো তোমার ধন দেখিনি, তোমার শিল্প দেখেছি। তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে নিয়েছি।

এখন দুজনের আবেগঘন মুহূর্তে স্মৃতিচারণ এলেই তোমার অতীত খুঁড়ে বের করে আনো পচা গলা নষ্ট জীবন, আমি সহ্য করতে পারি না। তুমি আমাকে কি চমৎকার অসুখ দিলে, এ আমার ভেতর শক্ত খুঁটি গেড়ে বাসা বেঁধেছে। আর কি দেবে তুমি আমাকে? আমার জীবন কি শেষ হয়নি, আমার ভবিষ্যত? আমার তো স্বপ্ন শেষ, সাধ শেষ।

তুমি লিখেছো, *সব লিখবে, সব।*

কি লিখবে? কি জানাবে? তোমার জীবন জেনে আর আমার কি লাভ? তোমার জীবনে তো আমার জন্য একনিষ্ঠতা নেই, ভাল থাকা নেই, ভালবাসা নেই। আমার স্বপ্নের সেই সুন্দর মানুষ তো তুমি আর হতে পারো না!

তোমার জীবন জানলে কি হবে আমার? কি ফিরে পাবো আমি? তুমি তো আমাকে কোনওদিন ভালবাসোনি। নাছোড়বান্দার মত একগুঁয়ে হয়ে তোমাকে ভালবেসেছি কেবল আমিই। তুমি আমাকে ভালবেসে মানুষ হতে পারোনি। কবিতা লিখেই কি তুমি আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চাও, শুধু তোমার কবিতা দিয়েই কি আমার নারীত্ব সার্থক করতে চাও? কোনো মেয়ে কি এভাবে চায়?

তুমি তো বোঝোনা, নারী হয়ে দেখোনি, স্ত্রী হয়ে দেখোনি, এই ব্যাপারগুলো ধ্বংস করে দেয়, জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় মন। তোমার ভালবাসা পাইনি। তোমার ভালথাকা পাইনি আমার জন্য। তবে কিসের বিশ্বাস থাকে? তুমি অবিশ্বাসের আর প্রতারণার ওপর কি ঘর বানাতে চাও?

তাইতো তোমাকে বলেছি, তুমি বন্ধু হিসেবে চমৎকার। কিন্তু স্বামী হিসেবে তোমাকে কোনো মেয়েই সহ্য করতে পারবে না। পারে না। আনো সারা দুনিয়া খুঁজে আনো এমন একটি মেয়ে যে কি না তোমাকে বলবে--তুমি শিল্পের মানুষ বলে তোমাকে অন্যভাবে দেখা যায়।

এতই যদি অন্যের উদারতা পেতে চাও তবে নিজে তুমি উদারতা দেখালে না কেন? কেন যুদ্ধে ধর্ষিতা কোনো বীরাঙ্গনা নারীকে বিয়ে করলে না? কেন অভাব ও দুর্দশা থেকে একজন বেশ্যাকে বিয়ে করে বাঁচালে না? কেন স্বামী পরিত্যক্তা গৃহহারা কোনো অভাগীকে বিয়ে করে সমাজ ও দেশের উপকার করলে না? দেখাও, কালো কুচ্ছিত একটি আইবুড়ি বিয়ে না হওয়া মেয়েকে বিয়ে করে, রাস্তার একটি অনাথ ভিখিরি মেয়েকে বিয়ে করে দেখাও। অথবা নিজের স্ত্রীকে একশ একটা পরপুরুষের কাছে সঁপে দাও, এরকম উদারতা এখন দেখাও! আমার এতে কিছু যায় আসে না। তোমার কোনো কিছুতে এখন আমার কিছু যায় আসে না। তবে অন্যের উদারতা আশা করার আগে নিজের ওই উদারতাটুকু আমাকে দয়া করে দেখিও।

সকাল

আমি ফিরব না রুদ্র, মনে মনে বলি। আমি আর ফিরব না, আমি নৈঃশব্দের সঙ্গে বেঁধেছি ঘর। তুমি আমাকে আর ওই নষ্ট অতীত স্মরণ করিও না। আমাকে একা থাকতে দাও। রুদ্র আমাকে একা থাকতে দেয় না তবু। তবু তার কবিতা এসে আমাকে বিষণ্ন করতে থাকে।

নীরবতা কোনও এক উদাসীন পাথরের নাম--
অহল্যা সে কোনওদিন জানি আর হবে না জীবন।
হবে না সে পারিজাত, কোনোদিন হবে না সকাল,
দিন আর নিশিথের সন্ধিক্ষণে থেকে যাবে জানি--

অহল্যা সে চিরকাল থেকে যাবে, রক্ত মাংস নিয়ে।
যাবে না সে দগ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষের মিছিলে কখনও,
পোড়া মানুষের ক্ষত, রক্ত, গ্লানি বুকে সে নেবে না,
যাবে না সে জানি আর কোনওদিন সবুজ নিভৃতে।

ছোঁবে না সে চিবুকের থরো থরো বিষণ্ন উত্তাপ,
সেই হাত কখনও ছোঁবে না আর উদাসীন চুল।
নিঃশ্বাসের ঘ্রাণে আর জাগবে না ভেজা চোখ দুটি,
নক্ষত্রের স্মৃতি শুধু বেঁচে রবে স্নায়ুর তিমিরে।

হবে না বেহুলা জানি সে কখনও গাঙুরের জলে
ভাসবে না ভেলা তার, ভাসবে না স্বপ্নের সাহস,
বেহুলার স্বপ্ন-ভেলা কোনওদিন জলে ভাসবে না--
নীরবতা কার নাম? কার নামে নির্বাসন জ্বলে?

রুদ্র মোংলা থেকে ফিরে এলে হোস্টেল থেকে ঢাকা চলে যাই। বাড়ির কাউকে বলার

প্রয়োজন নেই যে আমি ঢাকা যাচ্ছি। কেন যাচ্ছি সে কথাও কেউ জিজ্ঞেস করার নেই। যাচ্ছি, আমার ইচ্ছে। এই উত্তরটিও আমার প্রয়োজন নেই উচ্চারণ করার। মাসের পর মাস ধরে পুষে রাখা অসুখটি এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে দেখতে হবে। কোনও ডাক্তার চাই, অচেনা ডাক্তার। শাহবাগের মোড়ের একটি ডাক্তারের চেম্বারে রুদ্র আমাকে নিয়ে যায়। ডাক্তারকে সে বলে, *এ অসুস্থ। কোথাও ঘা হয়েছে, যাচ্ছে না।*

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, *কোথায় ঘা?*

রুদ্র আমার দিকে ফিরে বলে, *কোথায় ঘা বল।*

তুমি বল।

রুদ্র ডাক্তারের দিকে ফিরে বলে, *ওর প্রাইভেট পার্টসে।*

কবে হয়েছে? কি রকম ঘা? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

রুদ্র তারিখ গোনার চেষ্টা করে। আঙুলের কড়ায় মাস গোনে। আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে কোনওরকম রাখঢাক না করেই বলি, *এ আমার স্বামী, এর সিফিলিস হয়েছিল, আমাকে সংক্রামিত করেছে। পেনিসিলিন নিয়েছিলাম। কিন্তু এখনো ভাল হচ্ছি না।*

ও এই কথা।

ডাক্তার অনেকক্ষণ আমাদের দুজনকে দেখলেন বোকার মত। তিনি আগে আমাদের দেখেছেন এ এলাকায়, তার চোখ দেখেই বুঝি। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষার কথা লিখে দেন। রক্ত দিয়ে, তাজমহল রোড মুহম্মদপুর। ওখানে বসে থাকো। ওখানে কবিতা পড়ো। ওখানে রুদ্রর সংসার -স্বপ্ন দেখো। রুদ্র থাল বাসন কিনবে। এ বাড়িতে সংসার গড়ে তুলবে সে। ছোট সংসার,সুখী সংসার। রুদ্র আপাদমস্তক শুদ্ধ হয়ে উঠবে। আমাকে আর কোনওদিন দুঃখ পেতে হবে না। কোনওদিন কষ্ট পেতে হবে না আর। একবার যেন আমি তাকে ক্ষমা করি। ক্ষমা জিনিসটি নিয়ে তাকে আগেই আমি বলেছি। রুদ্রর মেয়েমানুষের নেশা আছে, মেয়েমানুষ পেলে তার মাংস নিয়ে খেলতে তার আনন্দ হয়। এ তার হঠাৎ করে হয়ে যাওয়া কোনও ভুল নয়। নিজের জীবনের সব কথা যদি সে আগে খুলে বলত, আমি আমার জীবনটি তার সঙ্গে জড়াতাম না। কিন্তু সে বলেনি। ভুল সেখানে। ভুল তার নেশায় নয়। এ সম্পূর্ণই তার ব্যক্তিগত নেশা। এ রকম নেশা মানুষের থাকে। তার নেশাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। দিচ্ছি তার প্রতারণাকে। এই প্রতারণার একটিই উত্তর, সেটি তাকে ত্যাগ করা। *ভেরি সিম্পল।*

ভিডিআরএল পজিটিভ।

আবারও ইনজেকশন নিতে হল। একদিন নয়। তিনদিন।

তিনদিন পর ময়মনসিংহে ফিরি। হোস্টেলে। কাউকে জবাব দিতে হয় না কোথায় ছিলাম, কার কাছে। একধরনের মুক্ত জীবন। অথচ এই জীবনটিকে রুদ্রর বিষাক্ত হাওয়ায় আমি উড়তে দিই না। একটি মুক্ত জীবনের সাধ ছিল কত, পেলে যেন ঢাকার সাহিত্য অঙ্গন সাংস্কৃতিক চত্বর চষে বেড়াবো। কই! আমার তো একটুও ইচ্ছে করে না। আমি ফিরে আসি, রুদ্র পেছনে নিজের ওই ঘরে বসে লেখে,

বুকের ভেতরে জ্বলে, জ্বলে ওঠে নির্বাসন -শিখা।
পরান পোড়ায়ে আজ নির্বাসনে চলেছে সকাল
শরীর পোড়ায়ে আজ নির্বাসনে চলেছে সকাল
পৃথিবী আঁধার করে নির্বাসনে চলেছে সকাল..

কুসুমের মর্মমূল ছিঁড়ে গেছে গোপন-ঘাতক।

দখল নিয়েছে ঘুণ আজ নীল নক্ষত্রের দেশে,
নিয়েছে রঙিন ঘুড়ি ছিঁড়ে ওই দিগন্তের গ্রাম,
ফিরে আসে ব্যর্থ সুতো, ফিরে আসে স্বপ্নভাঙা হিয়া।

বিষের পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়েছে ঘাতক সময়--
নগ্ন এই দুই চোখে সর্বনাশা অপচয় জ্বলে,
সময় দিয়েছে তুলে এই হাতে অফুরন্ত ক্লেদ,
দিয়েছে রক্তে মাংসে জীবনের তপ্ত অন্ধকার।

ঘোর কৃষ্ণপক্ষ রাত, দুঃসাহসে ছুঁয়েছিল তবু,
আঁধারে পুড়েছে আজ স্বপ্ন তার নিভৃত নগর,
আঁধারে পুড়েছে তার বিশ্বাসের সবুজ নিখিল।
স্বপ্নহীন পোড়া ভিটে, পোড়া ঘর--কে ফেরাবে তারে?

কেবল কবিতা নয়। রুদ্রর পর পর অনেকগুলো চিঠির উত্তর লিখতে বসি। ঘা সেরে যাওয়া রুদ্র এখন মরিয়া হয়ে সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। ঘা সেরে যেতেই সে ভুলে গেছে আমাদের দুজনের মাঝখানে এখন একটি রোগ না থাক রোগের স্মৃতি আছে। মাঝখানে একটি দগদগে অবিশ্বাস আছে। আমার ভোলা হয় না।

অবকাশ
৪.১০.৮৩

রোদ,

বাসায় চলে এসেছি আজ দুপুরে। আসলে বাসা ছাড়া অন্য কোথাও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। বড়জোর দুদিন কিম্বা তিনদিন। শেষ পর্যন্ত হোস্টেলেও থাকতে পারিনি। আসলে সারা জীবন যে পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, হঠাৎ করে তার পরিবর্তন সহ্য করা যায় না। শুধু বিছানায় শুয়ে, টেবিলে পড়ার বই পড়ে আমার জীবন এগোতে চায় না। প্রচুর আড্ডা আছে, আনন্দ আছে। কিন্তু জীবন এগোতে চায় না। আমার যখন ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে পা ছড়িয়ে অথবা পা গুটিয়ে শুয়ে থাকব, একাডেমিক পড়াশোনার বাইরে আমার বহুকিছু পড়ার আছে, করার আছে। আমার লিখতে হয়, আমার মাথার মধ্যে দুলক্ষ ভাবনা চিন্তা এলোমেলো নাচানাচি করে একেবারে নিশব্দে আমাকে একা থাকতে হয়।

যাবতীয় ঝুটঝামেলা, একশ একটা কাজের কাজ ফেলে আমাকে উদাসীন হতে হয়--এ আমার চিরকেলে স্বভাব। তাই বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। এখানে আমার নিজস্ব একটাজট পাকানো আগোছালো সংসার আছে। আমি একাই এর অধিশ্বর। আমার এই নানান ধরণের বইয়ে কাগজে এলোমেলো ধুলোবালির বিছানায় খানিকটা কিনার করে শোয়ার জায়গা করে নিই, গভীর সুনিদ্রায় রাত্রি পেরোয়। অথচ সাজানো গোছানো পরিপাটি অন্য বিছানায় আমার একরত্তি ঘুম আসে না। অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করে কষ্টের রাত্রি পেরোয়।

বইখাতার কোনো ঠিক নেই। কিচ্ছু ঠিকঠাক খুঁজে পাই না, একটি আকাশে তো আরেকটি পাতালে। একটি এ মাথায়, আরেকটি ও মাথায়। তবু পড়াশোনা হয়। খুব অল্প সময় গভীর মনোযোগে পড়তে পারি।

এটা ঠিক নয় যে বাড়িসুদ্ধ লোক সবাই আমাকে খুব ভালবাসে, স্নেহ করে, আমার প্রয়োজন আমার সুবিধে অসুবিধে একটু বিচার করেদেখে। তা কেউ করে না। সম্ভবত এ বাড়িতে আমি একটি অহেতুক অপ্রেয়োজনীয় মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকছি। এটা ঠিক যে আমি এখন মরে গেলেও এ বাড়ির কেউ একফোঁটা কাঁদবে না, এতে কারো কিছু যায় আসে না। আমি খুব বেশিরকম অপরাধি মানুষ বলে এ বাড়ির সকলে ভাবে। ইদানিং এসব আর গায়ে মাখি না। আদরিণী কন্যার মত এখন আর কারো কাছে কোনোকিছুর আবদার করি না। কোনো কিছু নিয়ে অনুযোগ করি না। আমার একা থাকার এবং ভাবনার রাজ্যে অবাধ বিচরণের সময়সীমা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞ। আসলে হোস্টেলের শাদামাটা গোছানো জীবনে আমার দমবন্ধ হয়ে আসে। যেন খাঁচা থেকে উড়াল দিয়ে বনের পাখি বনে পালাতে চাই।

তোমার ঘরেও অবিকল একই অবস্থা। আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। পারি না। আমার ভাল লাগে না। বড়জোর দুদিন, এরপর সবকিছু অসহ্য লাগে আমার। এমনকি তোমাকেও, তোমার চালচলন, কথাবার্তা সব।

যে চরম পর্যায়ে আমাকে নিয়ে তুমি নিজেকে দমন করতে পারো, আমি পারি না। তাই অজান্তে ওই চরম ভুলটি হয়ে গেল। এতে এখন অবশ্য আমার একটি লাভ হয়েছে, তা হলো, এসবে চরম বিতৃষ্ণা এসেছে। আমি এখন খুব সহজেই স্বাভাবিক তৃষ্ণাগুলোকে অনায়াসে দমন করতে পারি। এ আমার জন্য খুব লাভ হল। কিন্তু লাভ ছাড়া যে ক্ষতিটা হয়ে গেল এবং অল্প কদিনের মধ্যে যা আমি হাড়ে হাড়ে টের পাবো সে ক্ষতি থেকে আমাকে তুমি যে করেই হোক দয়া করে বাঁচিয়ো। অন্তত একটু নির্ভরতা থাকলে শান্তি পাবো।

ব্যস, আর কিছু চাই না। যে অসুখটি যাচ্ছে না এবং যাবে না তা নিয়ে অযথা ঢাকা ময়মনসিংহ করে লাভ নেই। কারণ ও রোগ যাবে না। ও রোগ নাছোড়বান্দার মত আমার গায়ে সেঁটেছে। আমাকে বিনাশ করে তবেই ওর সুখ।

সেই যে বলেছিলাম হুট করে আবেগে আবেগে কিছু একটা করে আমাকে সারাজীবন পস্তাতে হয়। ঠিক তাই। যদি উদাহরণ চাও বলব, তোমাকে চিঠি লিখেছি, তোমার সঙ্গে প্রেম করেছি, তোমাকে বিয়ে করেছি, তোমাদের বাড়িতে গিয়েছি, নিজেকে সমর্পণ করেছি.. মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকেই কার কাছে সমর্পণ করেছি?: এর কি উত্তর আমি দেব? চারপাশ থেকে হা হা হাস্যধ্বনি ওঠে।

এর কোনো সদুত্তর আমি জানি না। লোকে বলে, অতি সোজা মানুষ যদি একবার বেঁকে বসে তখন আর রক্ষে থাকে না। একবার বেঁকে বসতে ইচ্ছে করে। একবার তছনছ করে, চুরমার করে ভাঙতে ইচ্ছে করে তোমার সাজানো স্বপ্ন। একবার জ্বালাতে ইচ্ছে করে তোমার সংসার। আমাকে যেমন ভেঙেছো, আমাকে যতটা কাঁদিয়েছো, ততটা তোমাকে কাঁদাতে ইচ্ছে করে। কষ্টের আগুনে পোড়াতে ইচ্ছে করে। কেন ইচ্ছে করবে না বলো? আমি তো মানুষ, দেবতা নই। দেবতা নেই বলে আমি তোমার ঘরে যাবো না। সুন্দর সাজানো গোছানো ব্যাপার স্যাপার, বাড়ি যাওয়া, বিয়ের অনুষ্ঠান, সামাজিকতা, দীর্ঘদিন থেকে খেয়ে বিশ্রাম নেওয়া, ঢাকায় প্রেসের কাজ, হাঁড়িকুড়ি কেনা, রান্নাবান্না, ঘরে খাওয়া, নিয়মমাফিক ঘরে ফেরা, রাত হলে বউকে নিয়ে শুয়ে থাকা--ইত্যাদি কোনোকিছুই আমি হতে দেব না। এতো সহজেই তোমার মত মানুষের হাতে সুখের পাখি ধরা দিক, তা আমি চাই না। তোমার জন্য কেন আমি বাড়ির সবাইকে ফাঁকি দিয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে ফাঁকি দিয়ে, আমার এই এতদিনকার প্রিয় আগোছালো জীবন

থেকে চলে যাবো প্রেমে মত্ত উন্মাদিনীর মত? তুমি আমাকে কি দিয়েছো এবং কি দেবে? যার বিনিময়ে এমন করে তোমার সঙ্গে চলে যাওয়ার সাহস আমি করতে পারি! তুমি কি কারণ দেখাবে? ওই একটি সই করা বিয়ের কাগজ! ঠিক ওরকম একটি সই করা তালাকনামাও পাওয়া যায়! এ কথা নিশ্চয়ই জানো। যদি বলো এদ্দিনকার মেলামেশা! আমি বলব ভুল। শুরু থেকে সবটাই আমার ভুল। হুট করে আবেগে আবেগে কিছু একটা করে ফেলা।

আমি তো মানুষ, দেবতা নই। তাই ভুল করেছি। এবং ভুল থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাহসও আছে। একটু সাহস তুমি আমার থাকতে দাও। তুমি তোমার পরিকল্পনাগুলো বাদ দিয়ে দাও। আমি আমার এই বিরুদ্ধ পরিবেশকে যথাসম্ভব মানিয়ে নিয়েছি। একা থাকতে আমার এখন ভাল লাগে। চারপাশের শত্রুতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখত দারুন একটা সুখ। এখানে আমি কারো সাতে পাঁচে নেই। আমার জন্য কেউ ভাবে না, আমি ও কারো জন্য ভাবি না। ব্যস সুন্দর কেটে যাচ্ছে।

প্রেম করে ঘর ছাড়ব, অতবড় প্রেমিক তুমি হতে পারোনি। লক্ষ্মী স্ত্রী হয়ে সংসারে মন দেব, অত বড় স্বামী তুমি হতে পারোনি। তোমার জন্য জীবন বাজি রেখে পৃথিবীসুদ্ধ তুলকালাম কাণ্ড বাঁধাবো, অতটুকু মানুষ তুমি হতে পারোনি।

তোমার ঘরের চেয়ে আমার এই ঘরে সুখ না থাক, শান্তি আছে। এখনো আমার সুনিদ্রা হয়। তোমার কাছ থেকে দূরে থেকে, আমার ভুলগুলোকে আমি ভুলে থাকতে পারবো। আর যেভাবেই আমি বেঁচে থাকি না কেন, ভাল থাকব। এটুকু নিশ্চয়তা তোমাকে আমি দিতে পারি। আমার কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি আমার ঘরে ফিরে এসেছি। আমি আমার মা বাবা ভাই বোনের কাছে ফিরে এসেছি--তা কিন্তু নয়। আমি আমার কাছেই ফিরে এসেছি। এবং বাকিটা জীবন আমি আমার কাছেই থাকব। পৃথিবীতে আমার চেয়ে বেশি আমাকে আর কেউ ভালবাসে না। আমি ছাড়া আমার সবচেয়ে আপন আর কেউ নেই।

তুমি আমাকে ভুলে যেও। অঘটন এ যাবৎ বহু ঘটেছে, আর ঘটাতে চেষ্টা কোরো না। দয়া করে আমাকে ভুলে যেয়ে আমাকে বাঁচাও।

আমি তো মানুষ। মানূষ বলেই বহুদিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।

সকাল

আমি যখন বেঁচে থাকায় মন দিয়েছি, রুদ্র ময়মনসিংহে এল। এল কিন্তু কিছুই আর আগের মত নয়। আমাদের সেই আগের মত দেখা করা, আবার আগের মত ভালবাসার হাওয়ায় হাওয়ায় দোলা, চেয়ে থাকা দুজনের চোখে কথাহীন শব্দহীন কিছুই হয় না। মাসুদের বাড়িতে বসে যে কবিতাটি লেখে সে, ঢাকা ফেরত যাবার সময় আমাকে ডাকে পাঠিয়ে যায়। কবিতাটি যখন বাড়ির ছাদে বসে সূর্যাস্তের মুছে যেতে থাকা আলোয় পড়ছিলাম, হু হু করে ওঠে বুকের ভেতর। তার প্রতিটি শব্দ আমাকে স্পর্শ করে। একা আমি কাঁদি বসে, অনেকক্ষণ কাঁদি, নিজের জন্য কাঁদি, রুদ্রর জন্য কাঁদি।

তোমাকে ফেরাবে প্রেম, মাঝরাতে চোখের শিশির,
বুকের গহীন ক্ষত, পোড়া চাঁদ তোমাকে ফেরাবে।
ভালবাসা ডাক দেবে আশ্বিনের উদাসীন মেঘ,

তোমাকে ফেরাবে স্বপ্ন, পারিজাত, মাটির কুসুম।

তোমাকে ফেরাবে প্রাণ, এই প্রাণ নিষিদ্ধ গন্ধম,
তোমাকে ফেরাবে চোখ, এই চোখ শাণিত আগুন,
তোমাকে ফেরাবে হাত, এই হাত নিপুণ নির্মাণে,
তোমাকে ফেরাবে তনু, এই তনু নিকষিত হেম।

তোমাকে ফেরাবে ওই নিশিথের নিদ্রাহীন পাখি,
বুকের বাঁপাশে জমা কালো এক কষ্টের কফিন,
তোমাকে ফেরাবে ফেনা, সমুদ্রের আদিগন্ত সাধ,
সৌরভের ভেজা চোখ, নীলমাছি ফেরাবে তোমাকে।

এই বিষ-কাঁটালতা ভালবেসে আগলাবে পথ,
ঝরা শেফালির শব পড়ে রবে পথের উপর,
নিভৃত অঙ্গার এক চিরকাল তোমাকে ফেরাবে,
অনুতপ্ত অন্ধকার মৃত্যু ছুঁয়ে ফেরাবে সকাল।

নির্বাসন আমার জন্য নয়। ট্রিপোনেমা পেলিডাম যত শক্তিমানই হোক, এর শক্তি নেই রুদ্রর জন্য আমার ভালবাসাকে এতটুকু মলিন করে। জীবনে মানুষ একবারই সম্ভবত ভালবাসতে পারে, বার বার পারে না। আর কারওর জন্য তো বুকের ভেতর এত কষ্ট জমে না, আর কারওর জন্য তো চোখের জল এমন ঝরে না! রুদ্রর ভালবাসাই আমাকে ফিরিয়েছে, আর কিছু নয়। আমি তার ভালবাসার কাছেই হেরে যেতে পারি। রুদ্রকে ঘৃণা করতে চেয়েছি প্রাণপণে, পারিনি। তার কবিতার প্রতিটি শব্দ আমার সেই চাওয়াকে দূরদূরান্তে উড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যাস্তের দিকে জল-চোখে চেয়ে নতুন একটি দিনের কথা ভাবি। সব অন্ধকার ধুয়ে দিয়ে যে দিনটি কাল আসবে, সে দিনটি নিশ্চয় অন্যরকম হবে।

নিষেধের বেড়া

নিষেধ কেন! শুদ্ধ সুন্দর থাকার জন্যই তো! এ ব্যাপারটির সঙ্গে সম্পর্ক আমার জন্মের মত চুকেছে। আর তবে কি কারণে আমার ওপর আদেশ নিষেধ! কিসের জন্য আমি বাবা মার আদেশ নিষেধ পালন করতে যাব। ওঁদের তো আর ভয়ের কিছু নেই। যে কারণে ভয় তার চেয়ে অনেক বড় কিছু ঘটে গেছে আমার জীবনে। আমার জন্য আর সতর্ক থাকার কিছু নেই। নিষেধ আরোপ করেই বা লাভ কি!নিষেধের বেড়া আমি পার হই। বেড়া ডিঙিয়ে ঘাস না খাই, বেড়া ডিঙিয়ে রুদ্রকে অবকাশে নিয়ে যাই। সবাই দেখুক কাকে আমি ভালবাসি, সবাই জানুক যখন জানতেই হবে একদিন, যখন ডাক্তারি পাশ করে তার কাছে যেতেই হবে সারাজীবনের জন্য! রুদ্রর সঙ্গে কারও পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেও রুদ্রকে নিয়ে যাওয়া নয় বাড়িতে। অবকাশে হরদম আমার ক্লাসের বন্ধুরা আসছে। কেবল বন্ধুরাই নয়, বড় ক্লাসের ভাইরা জ্ঞান দিতে আসেন, ছোট ক্লাসের ভাইরা জ্ঞান নিতে আসে। কারও জন্য বাধা নয় আর অবকাশ, বাবা হয়ত অনেককে দেখে আড়ালে দাঁতে দাঁত ঘঁষেন, কিন্তু সামনে কখনও নয়, তিনি নিস্পৃহতা দেখান, দেখিয়েছেন কিন্তু কাউকে তাড়িয়ে দিতে পারেননি, কাউকে মুখের ওপর বলতে পারেননি চলে যাও, ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটিই বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃতিত্ব আমারও আছে, আমিই সেই মেডিকেলের প্রথম বর্ষ থেকে একটু একটু করে এ বাড়িতে চোখ সওয়া করেছি ছেলেপিলেদের উপস্থিতির, কেবল রুদ্রর জন্যই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা ছিল, রুদ্রর জন্যই ভয় ছিল আমার, এই ভয়টি আমার হঠাৎ করেই উবে গেছে, তাই নিষেধাজ্ঞাটি ডিঙোতে আমার বুক ধুকপুক করে না। ইয়াসমিন বাড়িতে ছিল। মাও ছিলেন। কিন্তু রুদ্রর সামনে কারও যাওয়া হয়নি। তার চা খাওয়া হয়নি। চা খেতে খেতে বাড়িতে আসা আর ছেলেরা যেমন গল্প করে আমার সঙ্গে, তেমন করা হয়নি। কারণ বাবা এসেছেন। এই দুপুরবেলার সাড়ে বারোটায় চরম অসময়ে বাবার বাড়ি আসার কোনও কারণ নেই তবুও এসেছেন তিনি। আমরা দুজন তখন কেবল বাড়িতে ঢুকেছি। বাইরের দরজা তখনো হাট করে খোলা। রুদ্র কেবল সোফায় বসেছে। আমি কেবল বৈঠকঘর পার হয়ে ভেতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাএর কথা বলতে যাবো লিলিকে বা নার্গিসকে বা সুফিকে বা মাকে, তখন কালো ফটক খোলার শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি বাবা হেঁটে আসছেন মাঠ পেরিয়ে সিঁড়ি পেরিয়ে বারান্দাঘর পেরিয়ে বৈঠকঘরের দিকে। রুদ্রকে দেখলেন তিনি,বিস্ফারিত দু চোখ রুদ্রর দিকে ফেলে, তর্জনি কালো ফটকের দিকে তুলে, সারা বাড়ি কাঁপিয়ে তিনি বললেন, *গেট আউট!* বাবার চিৎকারে রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন মা, শোবার ঘর থেকে ইয়াসমিন। রুদ্র কালো ফটকের বাইরে অদৃশ্য হতেই আমি সকলকে হতবাক করে দিয়ে ফটকের দিকে হেঁটে যাই। পেছনে বাবার রক্ত চোখ, পেছনে তর্জনি, পেছনে মার

আর্তচিৎকার *নাসরিন যাইস না, ফিইরা আয়,* পেছনে ইয়াসমিনের *বুবু বুবু* বলে আমাকে ফেরাতে চাওয়া।

পিচ গলছে রাস্তায়। গোলপুকুর পাড়ের দিকে হাঁটতে থাকা রুদ্রর কাছে পৌঁছোই আমি, রুদ্র ফুঁসছে রাগে। আমি যে নিষেধের এই বেড়া ডিঙিয়ে তার কাছে চলে এলাম, আমি যে একদিকে বাবা মা বোন আরেক দিকে রুদ্র এ দুজনের মধ্যে রুদ্রকে বেছে নিলাম, এ যে কত বড় একটি পদক্ষেপ আমার, এ সম্ভবত তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। আমি যে সবল অস্বীকার করলাম তাঁকে যাকে আমি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি, যিনি আমার জীবনটি গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছেন, তাঁরই আদেশ জীবনে এই প্রথম আমি অমান্য করার সাহস করেছি, তাঁরই রক্তচক্ষুকে জীবনে এই প্রথম আমি পরোয়া করিনি, তাঁরই অহঙ্কার আমি চুড়ো থেকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়েছি মাটিতে, তাঁরই সম্মান আমি আজ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছি, তাঁরই স্বপ্ন আমি আজ ভেঙে টুকরো করেছি, বোঝা সম্ভব নয় বলেই রুদ্র বলে, *আমাকে অপমান করতে বাড়িতে নিয়েছিলে তুমি!* না অপমান করতে নয়। আমি তো জানতাম না বাবা অমন হঠাৎ বাড়ি আসবেন! তুমিই তো চাইতে অবকাশে যেতে, বাবার সঙ্গে দেখা করতে! চাইতে তো! চাইতে না! গোলপুকুর পাড়ের আগুনে রাস্তা থেকে একটি রিক্সা নিয়ে সোজা বাসস্ট্যান্ডের দিকে দুজন। কোনও প্রস্তুতি নেই আমার ঢাকা যাওয়ার কিন্তু বাসে চড়ি। বাড়ি থেকে অনুমতি তো নেওয়া হয়ইনি, এমন কি কাউকে না জানিয়ে, যে, আমি ঢাকা যাচ্ছি, আমি বাসে চড়ি। সকলে ভাববে কোথায় আমি, আমি কেন বাড়ি ফিরছি না, বিকেল হবে রাত হবে দুশ্চিন্তা বাড়বে তা জেনেও আমি বাসে চড়ি। বাস যেতে থাকে ঢাকার দিকে। আগুনে বাতাস আগুনে ধুলো উড়িয়ে চোখে মুখে ছিটোতে থাকে। আমি শীতল চোখে চেয়ে থাকি ওড়াওড়ি ধুলোর দিকে, শীতল চোখে চেয়ে থাকি রাস্তার কাক কুকুর আর মানুষের ছোটাছুটির দিকে। আমি শীতল চোখে চেয়ে থাকি গরুগাড়ি, মটর গাড়ি, রিক্সা,বাস, ট্রাকের দিকে। আমি শীতল চোখে চেয়ে থাকি ফসল উঠে যাওয়া নিঃস্ব খেতের দিকে, চেয়ে থাকি নিজের দিকে।

বাসের সবচেয়ে পেছনের আসনে বসা রুদ্রর বাঁ পাশে একটি লোক রাজনীতি নিয়ে কথা বলছে তার পাশের লোকের সঙ্গে। রুদ্র সেই রাজনীতিতে একটু একটু করে ঢুকে যায়। এরশাদ সরকারের পতন যে হবেই হবে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত, পাশের লোকগুলোও নিশ্চিত। রাজনীতি থেকে আলোচনা গড়িয়ে বাজার দরে নামে। চাল ডাল তেল নুন থেকে শুরু করে মাছ মাংসের দামে, এবং কি হারে কি গতিতে সব সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এসব নিয়ে ক্ষোভ হতাশা ইত্যাদিও শেষ হয়। এরপর আলোচনায় মানুষের চরিত্র। অসততা এবং সততা। এ নিয়েও কিছুক্ষণ। রুদ্রর মতের সঙ্গে পাশের লোকটির মত প্রায় একশভাগ মিলছে বলে লোকটি বারবারই প্রসন্ন চোখে রুদ্রকে দেখছিল। এবার যে সব প্রশ্ন বাসে ট্রেনে করা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই প্রশ্নগুলিই রুদ্রকে করা হয়। *তা আপনের বাড়ি কই ভাই?*

বাড়ি খুলনায়।

থাকেন কি ময়মনসিংহে।

না। ঢাকায় থাকি।

ও। তা উনি কি হয় আপনার?

আমার স্ত্রী।

আপনার শ্বশুরবাড়ি বুঝি ময়মনসিংহে।

হ্যাঁ।

তা ভাই কি করেন আপনে? মানে চাকরি বাকরি ..

লিখি।

মানে?

আমি লিখি।

লেখেন?

হ্যাঁ লিখি।

কী লেখেন?

কবিতা লিখি।

কবিতা লেখেন? লোকটি ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। কৌতূহলে লোকটির চোখ একবার ছোট হচ্ছে, বিস্ময়ে হচ্ছে বড়। ছোট বড় চোখ স্থির হয়ে আছে রুদ্রর চোখে, রুদ্রর শান্ত চোখে, শ্যাওলা পড়া চোখে।

লোকটি এবার চোখে চোখ রেখেই, শব্দগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে,ধীরে, কিন্তু যথাসম্ভব গলার এবং মনের জোর খাটিয়ে,যেন একটি শব্দও আবার কোনও ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে না যায়, বলে *তা তো বুঝলাম কবিতা লেখেন, আমার ছেলেও কবিতা লেখে, কিন্তু আপনার পেশা কি?*

আমার পেশা কবিতা লেখা। রুদ্র অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়।

এরকম উত্তর লোকটি সম্ভবত প্রথম শুনেছে। এরপর আর কোনও কথা বাড়ায়নি, বাসের জানালায় চোখ রেখে বাকি পথ পার করে।

রুদ্র আমাকে আগেও বলেছে, সে কোথাও চাকরি বাকরি করতে চায় না। চায় লেখাকেই পেশা হিসেবে নিতে। কেন এ দেশে লেখকেরা লেখাকে একমাত্র পেশা হিসেবে নেয় না তা তার আজও বোধগম্য নয়।

নেয় না কারণ টাকা পাওয়া যায় না ভাল। একটা কবিতার জন্য বল তুমি কত পাও? কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা, বড়জোর পঞ্চাশ টাকা, এই তো! এই টাকায় কি থাকা খাওয়া চলবে?

লেখকের সম্মানী বাড়াতে হবে।

বাড়াবে কে?

পত্রিকার লোকেরা।

তারা না বাড়ালে কি করবে?

আন্দোলন করব। লেখা দেব না।

লেখা না দিলে, যারা বিনে পয়সায় বা কম পয়সায় লেখা দেবে, তাদের লেখা নেবে ওরা।

বিনে পয়সায় কেউই দেবে না লেখা।

লিখি তো আমিও, লিখে টাকা রোজগারের কথা কখনও ভাবিনি। কবিতার সঙ্গে কোনও কিছুর বিনিময়, ভাবলে লজ্জা হয় আমার। তুমি আমাকে কবিতা দাও, আমি তোমাকে ভালবাসা দেব। এ চলে। কিন্তু টাকা দাও তাহলে কবিতা লিখব, কবিতা কি বেচা কেনার জিনিস! ওরকম হলে কবিতাকে আমার পেঁয়াজ রসুনের মত মনে হতে থাকে। টাকা জিনিসটি আমার হাতের ফাঁক গলে সবসময়ই বেরিয়ে যায়, কবিতাকে টাকার হাতে সঁপে দিলে ওই হবে, বেরিয়ে যাবে।

রুদ্রকে শত বলে *প্রেমিক* বানাতে না পারলেও এমএ পরীক্ষাটি দেওয়াতে পেরেছি।

পরীক্ষায় তাকে বসতেই দেওয়া হচ্ছিল না, শেষ পর্যন্ত ভিসিকে মহা অনুরোধ উপরোধে নরম করিয়ে পরীক্ষা দিতে সে পেরেছে। এমএ পাশ করে এ দেশে কিছু হওয়ার বা কিছু করার জো নেই জেনেও বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেছো যখন বেরোও, যে কোনও কোথাও ঢুকে পড়লে যেমন বেরোতে হয়, তেমন। পেছনের জানালা বা ঘুলঘুলি দিয়ে বেরোলে ঠিক ভাল দেখায় না, বেরোলে সদর দরজা দিয়েই বেরোও। বেরিয়েছে বটে কিন্তু লেখাকে পেশা করার স্বপ্ন তার যায়নি।

মহাখালিতে বাস থামলে রিক্সায় মুহম্মদপুর যাই। শেষ বিকেলে বেরোই বাইরে। টিএসসি চত্বরে দাঁড়িয়ে রুদ্র বন্ধু খুঁজতে থাকে আড্ডা দেওয়ার। সন্ধের অন্ধকারে মাঠে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে বন্ধুদের দেখা মেলে। লেখক বন্ধু কবি বন্ধু সাংবাদিক বন্ধু নাটক করা বন্ধু রাজনীতি করা বন্ধু গান গাওয়া বন্ধ কিছু না করা বন্ধু। কারও না কারও দেখা মেলেই। রুদ্র বউ বলেই আমার পরিচয় দেয় এখন, আমি আপত্তি করি না। এক বাড়িতে থাকছি, বাবার তর্জনি উপেক্ষা করেছি, আর কিসের সঙ্কোচ! আড্ডা শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুটো থালা, চারটে চায়ের কাপ, দুটো পানির গেলাস, দুটো ছোট পাতিল চাল ডাল তেল ডিম নুন চাপাতা চিনি ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরি। *সংসারের প্রথম কেনাকাটা,* রুদ্র হেসে বলে। রেস্তোরাঁয় খেতে তার আর ভাল লাগে না, এখন থেকে ঘরে রান্না হবে, ঘরে খাবে। কিন্তু রান্নাটি করবে কে! আমি তো কখনও রান্না করিনি, না করলেও এটি আমাকেই করতে হবে। এখন থেকে সংসারি হবে সে। আর *বাহির* নয়, আর *টইটই* নয়, আর *এলোমেলো জীবন* নয়। আমি যে রান্না করতে জানি না, আমাকে যে কাল সকালেই চলে যেতে হবে ময়মনসিংহে, ক্লাস আছে, খুব জরুরি ক্লাস, পরীক্ষা আছে, খুব কঠিন পরীক্ষা, বলা হয় না। সংসার উদ্বোধন করতে গিয়ে ভাত রাঁধতে গিয়ে ভাত হয় না সেদ্ধ, বাড়িঅলার কাছ থেকে মশলা ধার করে ডাল চুলোয় দেওয়া হয় বটে, তবে ডাল না হয়ে জিনিসটি অন্য কিছু হয়। শেষ পর্যন্ত ডিম ভেজে মুখ রক্ষা করি। ওই খেয়ে উৎফুল্ল রুদ্র রাতে আমাকে স্পর্শ করে। রুদ্র স্পর্শ করলে আমার সারা শরীর অবশ-মত হয়ে যায়। শরীরে রোধ নিরোধ মনে জোর যুক্তি যা কিছু আছে, নষ্ট হয়ে যায়। আমি জলের মত রুদ্র-পাত্রে গড়িয়ে যাই। এ কি ভালবাসা নাকি সংস্কার, নিজেকে প্রশ্ন করি।যেহেতু একটু একটু করে লোকে জানতে পারছে যে আমাদের বিয়ে হয়েছে, কাগজপত্রে নয়ত মনে, যেহেতু একবার বিয়ে হলে আর ফেরার উপায় থাকে না, যেহেতু লোকে বলে স্বামীর সঙ্গে যে করে হোক মানিয়ে নিয়ে বাকি জীবন পার করা, আর দশটা মেয়ে যেমন করে, ভাল, তাই কি!তাই কি আমি রুদ্র থেকে সরে আসতে পারছি না, সরবো ভেবেও? নাকি খুব সরল এবং সোজা একটি কারণ,যে,আমি তাকে ভালবাসি। সংস্কার কি আমি খুব একটা মানি? মানলে হাবিবুল্লাহর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হত না,যেহেতু মেয়েদের ছেলেবন্ধু থাকাটা সংস্কারের বাইরে। মানলে রুদ্রর সঙ্গেই কোনও সম্পর্ক দাঁড়ায় না, যেহেতু রুদ্র ডাক্তারও নয়, ইঞ্জিনিয়ারও নয়, একজন ডাক্তার-মেয়ের স্বামী সাধারণত যা হয়ে থাকে, এবং যা হওয়া স্বাভাবিক বলে সকলে, সকলে বলতে আমার আত্মীয়, প্রতিবেশি, চেনা অচেনা মানুষেরা মনে করেন। আমি তো সেই সংস্কারের পরোয়া না করে রুদ্রর মত চালচুলোহীন ছেলেকে বলেছি ভালবাসি। সম্ভোগে তৃপ্ত তুষ্ট রুদ্রকে দেখে ভাবি রুদ্র কি সত্যিই আমাকে ভালবাসে? ভালবাসলে অন্য নারীর শরীর কি করে ছোঁয় সে? আমি তো পারি না। এই যে হাবিবুল্লাহ প্রেমার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ, আমার তো ইচ্ছে হয় না ওকে খানিকটা ছুঁয়ে দেখতে। হাবিবুল্লাহর মত সুদর্শন পুরুষ চোখের সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমি তো এতটুকু তৃষ্ণার্ত হব না। শরীর তো মন থেকে খুব দূরে থাকে

না। এই ভাবনাগুলি একান্ত আমার, দূরে সরাতে চাইলেও ভাবনা আমাকে ছেড়ে এক পাও দূরে যায় না।

ময়মনসিংহে ফিরে আসি। মা জিজ্ঞেস করেন, *কই ছিলি?* আমি কোনও উত্তর দিই না।

আমি কোথায় যাই, বা না যাই, কোথায় থাকি না থাকি, তা কারও জানার দরকার নেই। বলে দিই। স্পষ্টই বলে দিই।

বাড়ি থেইকা বাইর হইয়া যা না। যেই বেডার সাথে রাইত কাডাইছস, তার কাছেই যা।

সময় হইলেই যাইয়াম। কারো কইয়া দিতে হইব না।

মা গাল দিয়ে হলেও কথা বলেছেন, বাবা কথা বলেন না। আমার ছায়াও মাড়ান না। কলেজে যাওয়ার রিক্সাভাড়াও দেন না। সাত দিন পার হয়ে যায়, বাবার হাত থেকে টাকা খসছে না। আমি যে একটি প্রাণী বাড়িতে আছি, বাবা যেন তা জানেন না, জানলেও ভুলে গেছেন। সাতদিন পর সকালবেলা মা মিনমিন করে বাবাকে বলেন, *ও কি কলেজ বন্ধ কইরা বইসা থাকব নাকি। রিক্সাভাড়া দিয়া যান।*

মার দিকে একটি *খেয়ে ফেলা* দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে রুখে ওঠেন, *ওরে বাসাত থেইকা বাইর হইয়া যাইতে কও। আমার বাসায় থাকার ওর কোনও অধিকার নাই।*

বাবা আমার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিতে থাকেন এক একটি বিষমাখা তীর, *আমার বাসায় থাকতে তাকে কেডা কইছে? ওই বেডা কেডা? কোথাকার বেডা? বেডা কি করে? কত বড় সাহস এই ছেড়ির ওই বেডারে বাসায় আনে। কত বড় সাহস আমার সামনে দিয়া বেডার সাথে বাইরে যায়! ও আমার বাসায় কি করে? লাত্থি দিয়া বাসা থেইকা বার করব, না কি ও এমনে যাইব?*

বাবা চলে গেলে মা বলেন আমাকে, *বুঝ,মজা বুঝ। নিজের জীবনডার কত সর্বনাশ করছস। তর বাপে তরে আর লেহাপড়ার খরচ দিব না। মেডিকেলে পড়া তো বন্ধ হইব। বাপের খুব স্বপ্ন আছিল একটা মেয়ে ডাক্তার হইতাছে। সব গেছে।*

সব গেছের বিলাপ শুনি বসে।

রাতে আমার পাশে বসে মা নরম স্বরে বলেন, *যেই লোকটার সাথে গেছিলি, তার নাম কি? তার নাম কি রুদ্র? রুদ্রকে কি তুই বিয়া করছস?*

আমি মার সামনে থেকে উঠে চলে যাই কথা না বলে। মা আমার পেছন পেছন হাঁটেন আর বলেন, *বিয়া না করলে ক যে বিয়া করস নাই। কই তর বাপেরে। তর বাপ হয়ত নরম হইতেও পারে।*

দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে বাড়ির পরিবেশে। আমার দিকে সকলের চোখ। ঘৃণার চোখ!চোখ সংশয়ের, অবিশ্বাসের। আমি যেন আর আগের আমি নই, আমি অপ্রকৃতিস্থ, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে বাড়িতে বসে আছি। ইচ্ছে করে বেরিয়ে পড়ি বাড়িটি থেকে। যেদিকে দুচোখ যায়, যাই। অনিশ্চয়তা আমাকে ছোবলে ছোবলে নীল করছে। এ সময় আপাতত সমস্যার একটি সমাধান করেন মা। মা নিজে গিয়ে নতুন বাজার থেকে ডাবঅলা ধরে আনেন। রশিদকে পাননি, অন্য লোক। নিজের দুটো গাছের কটি ডাব বিক্রি করে আমাকে টাকা দিলেন কলেজে যাওয়ার। দিলেন কিন্তু বললেন বাবার কাছে যেন আমার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে, এমন অন্যায় জীবনে আর কখনও করব না প্রতিজ্ঞা করে, নিয়মিত কলেজে হাসপাতালে যাওয়ার খরচ নিই। না আমি তা করি না। রুদ্রকে চিঠি লিখি বাড়ির অবস্থা জানিয়ে। এও লিখি সে যেন আমাকে কিছু টাকা পাঠায়। রুদ্র

চিঠি পেয়ে মানিঅর্ডার করে টাকা পাঠায়। এক হাজার টাকা। এই টাকা আমার সকল দুর্ভাবনাকে আমার চৌহদ্দি থেকে দূর দূর করে দূর করে। কেবল কলেজে যাওয়া আসাতেই যে টাকা খরচ হতে থাকে তা নয়। বিকেল হলে ইয়াসমিনকে নিয়ে রিক্সায় হুড ফেলে দিয়ে অর্থাৎ বাধ্যতামূলক ঘোমটাটি খসিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকি শহরময়। অদ্ভুত এক আনন্দ এই ঘুরে বেড়ানোয়। যেন দুটি মুক্ত পাখি, যেন বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়েছি এইমাত্র। মালাইকারি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নেমে খেয়ে নিই দুটো মালাইকারি, দইয়ের ওপর ভেসে থাকা রসগোল্লাও। বাবা বাড়িতে বিস্কুট পাঠাচ্ছেন না অনেকদিন, বিস্কুটের দোকানে গিয়ে এক পাউন্ড বিস্কুট কিনে নিই। মা পীরবাড়ি যাবেন, রিক্সা ভাড়া নেই, *উদার হস্ত* দিয়ে দেয় পাঁচ টাকা। বাড়িতে ডাল ভাত ছাড়া কিছু নেই, ইয়াসমিনকে নিয়ে গাঙ্গিনার পাড়ের রেস্তোরাঁয় গিয়ে মাংস ভাত খেয়ে আসি, কখনও আবার নতুন চিনে রেস্তোরাঁয়।

বাবা লক্ষ করেন আমি কলেজে যাচ্ছি, কিন্তু তার কাছে হাত পাতছি না। লক্ষ করেন, বাড়িতে ডাল ভাত ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবস্থা না করার পরও কোনও বাজারের লিস্টি কেউ পাঠাচ্ছে না তাঁর কাছে, এসব তাঁর দম্ভে বিঘ্ন ঘটায়। মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, *ওই ছেড়ি কলেজে যে যায় রিক্সাভাড়া কই পায়? তুমি দেও?*

আমি দিয়াম কোত্থেকা? আমার হাতে কোনও টাকা পয়সা দেইন নাকি?

তাইলে পাইছে কই?

কি জানি!

কি জানি মানে? তোমার জানতে হইব না?

জাইনা কি হইব? টাকা পয়সা দেওয়া বন্ধ কইরা দিছেন। তার তো যোগাড় করতে হইব! যোগাড় করছে।

কিভাবে যোগাড় করছে? কার কাছ থেইকা।

সেইডা তারে গিয়া জিগান। কথা বন্ধ করছেন কেন? কথা বন্ধ করলে কি সব সমস্যার সমাধান হইয়া যায়?

আমার বাড়ি থেইকা যে চইলা যাইতে কইছি, যায় না কেন?

কই যাইব?

যেই বেডার কাছ থেইকা টাকা নিছে তার কাছে যাক গা।

গেলে খুশি হইন নাকি? এহন তো নোমান কামালরে আর টাকা পয়সা দিতে হয় না। আমারে ত কিছুই দেইন-ই না। দুইডা মেয়েরে যা দিতাছিলেন, তাও সহ্য হইতাছে না আপনের। আপনের টাকা পয়সা একলা আপনেই ভোগ করতে চান, ভোগ করেন। মেয়েরা ত আইজ না হইলেও কাইল যাইবই এই বাড়ি ছাইড়া। এহনই ভাগাইতে চান কেন? বাড়ি খালি করতে চাইলে কন, আমরা সবাই যাই গা। একলা থাকেন।

বাবা কোনও উত্তর দেন না। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকেন উঠোনের দিকে। বাবা যে ইয়াসমিনকে ডেকে নিয়ে বলবেন, *তুমিই এখন আমার স্বপ্ন। তুমি এখন আমার মান রাখো।* সে সম্ভাবনাটিও নেই। ইয়াসমিন, বৃত্তিধারী ছাত্রী, মেট্রিকে প্রথম বিভাগ পাওয়া, রসায়নে তারকাখচিত নম্বর পাওয়া, ইন্টারমিডিয়েটে এসে দ্বিতীয় বিভাগ। বাবার আশার প্রদীপ নিবিয়ে খোলাম-কুচির মত ভেঙে পরীক্ষার ফল বেরোনোর পর ও বলতে শুরু করেছে, *আসলে ওই দেবনাথ স্যারের জন্যই আমার পরীক্ষা ভাল হয় নাই।*

দেবনাথ পণ্ডিত ইয়াসমিনকে বাড়িতে এসে পড়াননি, আমাকে যেমন পড়িয়েছিলেন। দলে পড়িয়েছেন।একশ ছাত্র ছাত্রীকে পড়াতে হলে দল ছাড়া আর কোনও গতি নেই। ওই দলের এক কোণে পড়ে থেকে ইয়াসমিন অংকের মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বোঝেনি। আমার অবশ্য মনে হয় বাড়ির নতুন দুজন মানুষ এক হাসিনা দুই সুহৃদ নিয়ে ওর উত্তেজনা এত বেশি ছিল যে বই নিয়ে ও মোটেও বসতে চায়নি। আমি পড়তে বসার জন্য অনুরোধ করলে আমাকে ধমকে সরিয়ে দিয়েছে। বাবা বললে অবশ্য বসেছে, কিন্তু সে বসা সত্যিকার বসা ছিল না। দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে ওর পক্ষে মেডিকেলে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। বাবা জলদগম্ভীর স্বরে বলেন,*জীবন তো বরবাদ হইয়া গেল। এখন ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দিয়া দেখ ফাস্ট ডিভিশান পাস কি না। মেডিকেলে ভর্তি হইতে পারস কি না। তা না হইলে গাধা ছাত্রীদের মত ওই আনন্দমোহনে গিয়াই বিএসসি তে ভর্তি হ। কি করবি আর।*

বাড়িতে ইয়াসমিনের আদর খানিকটা কমে যায়। অবশ্য মার কাছে কমে না। মা বলেন, *কোনও লেখাপড়াই খারাপ না। ভাল কইরা পড়লে সব লেখাপড়াই ভাল।*

শুনে, বাবা নাক সিটকে বলেন, *এই অশিক্ষিত বেটি বলে কি এইসব!*

মা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, *কেন সুলেখা তো ডাক্তারি পড়ে নাই। কি সুন্দর এম এ পাশ কইরা এখন ব্যাংকের জি এম হইছে।*

বাবা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসেন। বাবার হাসি থেকে দূরে সরতে মা রান্নাঘরের দিকে যখন যেতে থাকেন, থামিয়ে বলি, *কওতো জিএম মানে কি?*

বড় অফিসার।

আমিও খ্যাঁক খ্যাঁক।

মা চলে যান রান্নাঘরে। ও ঘরটিই মার জন্য শ্রেয়, তা মাও বোঝেন, আমরাও। ইয়াসমিনকে জন্য বিজ্ঞানের কোনও একটি ভাল বিষয় নিয়ে অনার্স পড়ার পরামর্শ দিই। চেয়ারে দুলতে দুলতে, পা টেবিলের ওপর।

ফিজিক্স?

অসম্ভব।

কেন অসম্ভব?

কঠিন।

তাইলে কেমেস্ট্রি। মেট্রিকে তো লেটার পাইছিলি।

না। কেমেস্ট্রিও কঠিন।

তাইলে ম্যাথ?

প্রশ্নই আসে না।

জুওলজি নে।

না।

তাইলে এক কাজ কর।

কি?

লেখাপড়া ছাইড়া দে।

ইয়াসমিনের লেখাপড়া অনেকটা ছেড়ে দেওয়া পর্যায়েই দাঁড়িয়েছে। ওকে দেখে মনে হয় না কোনও রকম ইচ্ছে আছে কখনও বই হাতে নেওয়ার। ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার ফরম পূরণ করে এসে, দাদা বগুড়া থেকে ময়মনসিংহে বেড়াতে এলেন দুদিনের জন্য, বললেন, *চল বগুড়া বেড়াইয়া আসবি,* ইয়াসমিন হৈ হৈ করে বগুড়া চলে গেল বেড়াতে। দাদা আর হাসিনার বদৌলতে পাওয়া ইয়াসমিনের ঘাড়ের আর হাঁটুর ব্যথা তখনও কিন্তু

সারেনি। সেদিনের সেই উঠোনের ঘটনার পর, দাদা আর হাসিনা দুজনের সঙ্গেই আমরা কথা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আমি বন্ধই রেখেছি, ইয়াসমিন শুরু করেছে, তবে ভাববাচ্যে। ওকে বগুড়া থেকে ঘুরিয়ে দাদা যখন ফেরত দিতে এলেন ময়মনসিংহে, বাবা কাছে ডাকলেন তাঁর জ্যষ্ঠ পুত্রটিকে, ঘন হয়ে বসলেন পাশে।

বগুড়ায় কেমন লাগতাছে?

ভাল।

কি রকম ভাল?

কোম্পানী বাড়িভাড়া দিতাছে।

বাড়ি কেমন?

ভালই। তিনটা রুম আছে। ড্রইং বেড ডাইনিং।

উঠান আছে?

না উঠান নাই, উঠান থাকব কেন? এপার্টমেন্ট বিল্ডিং ত।

নিজে বাজার কর?

জিনিসপত্রের দাম কেমন বগুড়ায়?

তা একটু দাম বেশিই আছে ওইখানে।

সংসার খরচে মাসের পুরা টাকাই কি চইলা যায়?

খরচ ত আছে, কিছু তো যায়ই।

রিপ্রেজেনটিটিভের চাকরি কইরা আর কতই বা পাও!

আমি ত আর রিপ্রেজেনটিটিভ না, কবেই না সুপারভাইজার হইয়া গেছি!

তফাতটা কি?

ঘোরাঘুরিটা কিছু কম।

টাকা পয়সা জমাইতাছ ভবিষ্যতের জন্য?

কিছু কিছু।

শরীরে সেন্ট মাইরা বাবুগিরি কইরা ঘুরতাছ, টাকা পয়সা ইচ্ছামত উড়াইতাছ, জমাইবা কেমনে?

কই সেন্ট? সেন্ট ত আজকাল কিনিই না।

নিজের বাড়িঘর সব রাইখা বিদেশে পইড়া আছ কেন?

চাকরি তো করতে হইব।

ওই চাকরি ছাইড়া দিয়া ময়মনসিংহে ফিরো। আমি তোমারে আরোগ্য বিতান দিয়া দিতাছি। ওষুধের ব্যবসা কর। চাকরিতে যা পাও, তার চেয়ে ব্যবসা ভাল কইরা করলে ভাল টাকা কামাইতে পারবা।

টানা চার ঘন্টার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়, দাদা ফাইসন্স কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে বাপের ব্যবসা দেখাশুনো করবেন। বগুড়া ফিরে গেলেন তিনি, ওখান থেকে মাস খানিক পর বউবাচ্চাজিনিসপত্র সব নিয়ে, কেবল শখের চাকরিটি না নিয়ে ফিরে এলেন। দাদা বগুড়ায় চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার পর বাবা নতুন আসবাব কিনেছেন, টেলিভিশন, ফ্রিজ, এসবও কিনেছেন। ঘর এখন খালি নেই যে দাদা তাঁর সব আসবাব ফেলতে পারবেন। বিশাল খাবার টেবিলটি আর তালাবন্ধ কাচের বাসনপত্রের আলমারিটি দাদা তাঁর আগের শোবার ঘরে রেখে ঘরটিকে আলাদা একটি খাবার ঘর বানিয়ে বাবার নির্দেশে নিজের আজদাহা খাট আলমারি আয়নার টেবিল আলনা ইত্যাদি উঠোনের দুটো টিনের ঘরের একটিতে গুছিয়ে স্ত্রীপুত্রসহ থাকতে শুরু করলেন। দাদারা ফিরে আসার পর দাদা আর

হাসিনার কোনও প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ বা না ছাড়া কিছু কথা হয় না আমার, বড়জোর খুব প্রয়োজনে দুএকটি কথা হতে থাকে, কিন্তু যা হতে থাকে তা ভাববাচ্যে। সম্বোধনহীন কথা বলায় পারদর্শি আমার জন্য এ কঠিন কিছু নয়। বাবা আরোগ্য বিতানের পাশে দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে একটি লেপতোশকের ব্যবসায়ীর কাছে ভাড়া দিয়ে আরেকটিতে নিজের আলাদা চেম্বারের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দাদার হাতে আরোগ্য বিতান, ওষুধের দোকান। বাবার হাতে রোগী দেখা, দাদার হাতে ব্যবসা। ব্যবসায় খাটাতে বাবা নিজের কয়েক লক্ষ টাকা অকাতরে ঢেলে দিলেন দাদার হাতে।

আমার খরচ চলতে থাকে রুদ্রর টাকায়। আমার কি প্রয়োজন না প্রয়োজন তার দিকে বাবা ফিরে তাকান না। আমাকে নিয়ে তাঁর কোনও আর উৎসাহ নেই। আমি উচ্ছন্নে চলে গেছি, লাগাম ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছি, আমি নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে গেছি, আমি আর আমি নেই, আমি নষ্ট হয়ে গেছি। আমাকে নিয়ে আশা ভরসাও নেই আর। এই বাবা, মনে হত,আমাকে ডাক্তার বানানোর জন্য, জীবন উৎসর্গ করেছেন। অথচ রুদ্রকে অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে আমার বেরিয়ে যাওয়া, এবং একরাত বাড়ি না ফেরার কারণে তিনি আমাকে প্রায় ত্যাজ্য-কন্যা করে দিলেন! ধ্বসে গেল আমাকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নের প্রাসাদ!কি সহজ এই ধ্বসে যাওয়া! কী পলকা স্বপ্ন নিয়ে ছিল তাঁর বাস!এমন তো নয় যে আমি কাউকে বলেছি রুদ্রর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক আছে বা রুদ্রকে আমি বিয়ে করেছি বা আমি তোমাদের আর পরোয়া করি না!যদি বলতাম, বুঝতাম, তিনি হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে যা করার করছেন। বাবার আচরণ আমাকে ক্ষুব্ধ করে। মনে হতে থাকে এ জগতে রুদ্র ছাড়া আপন কেউ নেই আমার।

রুদ্র আসে ময়মনসিংহে। শহরে রিক্সার হুড ফেলে দুজন ঘুরি। যে দেখে দেখুক। বাবার কাছে খবর যায় যদি, যাক, আমার আর ভয় কিসের! রুদ্রর দাবি আমাকে তার সঙ্গে হোটেলে থাকতে হবে রাতে। ময়মনসিংহ শহরের ঘিঞ্জি এলাকায়, ছোটবাজারে, শান্তনীড় নামের হোটেলে একটি ঘর ভাড়া করে সে। অন্ধকার সিঁড়ি পার হতে ভয় ভয় লাগে। চারতলায় একটি ছোট্ট স্যাঁতসেঁতে ঘরে, একজনের একটি চৌকি কেবল ধরে, ঢুকে আমি নিঃশ্বাসের জন্য একটু শুদ্ধ হাওয়া খুঁজি, পাই না। হাওয়া ভারি হয়ে আছে, হাওয়ায় পেচ্ছাবের গন্ধ, কফ থুতুর গন্ধ। ঘরে কোনও জানালাও নেই যে খুলে দেব। বিছানার চাদরে বালিশে এমনকি এক চিলতে পেচ্ছাবপায়খানাটির সর্বত্র মনে হয় ছড়িয়ে আছে সিফিলিসের জীবাণু, শরীর বেয়ে বিচ্ছুর মত হেঁটে উঠবে কোথাও যদি স্পর্শ করি। গা ঘিন ঘিন করে। *বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে দিতে বল। বালিশ পাল্টে দিতে বল। আমার ঘেন্না লাগছে, অন্য কোনও ভাল হোটেলে চল।* না রুদ্র কিছুই করবে না। আমাকে টেনে সে বিছানায় নেয়। টেনে আমার জামা খুলে নেয়, টেনে আমার পাজামা। আমার ওপর নিজে সে ন্যাংটো হয়ে চড়ে বসে। আমার মন বিছানার নোংরা চাদরে, নোংরা বালিশে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা আমার শরীর নিয়ে রুদ্র আনন্দ করে। আনন্দ শেষে সে সিগারেট ধরায়। গুমোট ঘরটির নানা গন্ধের মধ্যে যোগ হয় সিগারেটের গন্ধ। পেটের নাড়ি বেয়ে বমি উঠে আসে গলায়। মাথা ঘোরে। রুদ্র বলে, *কাল ঢাকা চল।*

আমার ওয়ার্ড এন্ডিং পরীক্ষা আর দুদিন পর।

বাদ দাও ওয়ার্ড এন্ডিং। ও না দিলে কিছু হবে না।

কিছু যে হবে সে আমি জানি। জেনেও বাড়ি গিয়ে নিজের দুটো বাড়তি জামা একটি ব্যাগে নিয়ে বেরোই দুপুরের বাস ধরতে, মা পেছন থেকে বলেন, *কই যাস?* ঢাকা যাই। *ঢাকা কার কাছে যাস?* প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে আমি বোবা কালা আমি এগোতে

থাকি। পেছনে বেড়া ডিঙোনোর আমার জন্য মার উদ্বেগ, পেছনে আমার *না গেলেই নয় ক্লাস।* পেছনে আমার *না দিলেই নয় ওয়ার্ড এন্ডিং।* ঢাকা পৌঁছে রুদ্রর দুটো ঘরে শুয়ে থাকা বসে থাকা, তার নতুন কবিতা পড়া, জীবনে কখনও রান্না-না-করা হাতে রান্না করা, রিক্সার হুড ফেলে বিকেলে হাওয়া খেতে বাইরে যাওয়া, সন্ধেয় অসীম সাহার ইত্যাদি প্রিন্টার্সে বসে নির্মলেন্দু গুণ,মহাদেব সাহার সঙ্গে রাজনীতি,সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে গল্প করে রাতে ঘরে ফেরা। রাতে শরীর নিয়ে খেলা করে রুদ্র। শরীরের গভীরে যেতে যেতে বলে, *যেন পাথরকুচির ওপর দিয়ে যাচ্ছি। এত পাথরকুচি!এত পাথরকুচি!*আরও গভীরে আরও গহনে অন্ধকারে পাথরকুচির ওপর ছুটতে ছুটতে ক্লান্তিতে নুয়ে বলে, *উফ তোমার দাঁত এত ধারালো, এমন কামড় দিয়ে ধরো, কিছুতেই ছুটতে পারি না।*

ভোর হলেই আমি ছটফট করি ময়মনসিংহে ফিরতে। *এত উতলা হওয়ার কি আছে, আর দুটো দিন থাকো।* দুদিন থাকা হয়। দুদিন পর রুদ্ররও দিন ফুরিয়ে আসে ঢাকার। তাকে ফিরতে হবে মোংলায়।

কিছু টাকা লাগবে আমার?

যে টাকা পাঠিয়েছিলাম ফুরিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

কি করে ফুরোলে?

হিসেব রাখিনি।

এত বেহিসেবি হলে চলবে কেন?

মাথাটি আপনাতেই নত হয়ে আসে আমার। বাবার সামনে টাকার জন্য হাত পাততে গিয়ে ঠিক যেভাবে নত হয় মাথা, সেভাবেই নত হয়ে আসে। চোখদুটো নত। বাবার সামনে চোখও এমন নত থাকে।

কত দরকার এখন? কত দিলে চলবে?

আমি নখ খুঁটি। হাতের নখ। পায়ের নখ।

তিনশ হলে চলবে?

চলবে।

টাকাটি হাতে নিই, হাতে নিতে যদিও খুব লজ্জা হয়। নিজেকে একটি উপদ্রব মনে হতে থাকে। দাঁড়াবার শক্তি নেই, মেরুদন্ডের জোড় নেই, একটি পরগাছার মত নিজেকে মনে হয়। আমার লজ্জা যায় না। কারও কাছ থেকে যদি না নিতে হত টাকা, যদি নিজে উপার্জন করতে পারতাম! যদি শরমের এই নত মাথাটি আমি একটু তুলতে পারতাম!

ময়মনসিংহে ফিরে এলে মা বলেন, *ঢাকায় কার কাছে ছিলি, কামালের বাসায়? তর বড়মামার বাসায়? ঝুনুর বাসায়?*

না।

তাইলে কার বাসায়?

আমি কথা বলি না।

মা বলেন, *তুই যে কোন পথে যাইতাছস! তর কপালে যে কি আছে!আল্লাহ খোদা বিশ্বাস করস না। যা ইচ্ছা তাই করতাছস। যেই বেডা তরে ফুসলাইয়া বাড়ির বাইর করতাছে, তারে নিয়া কি তুই সুখী হইবি? এখনও বাদ দে। এখনও সময় আছে। বাবা মা ভাই বোন সবার কথা ভাব একটু। কত ডাক্তার ছেলে তরে বিয়া করতে চায়। কাউরে পাত্তা দেস নাই। এখন কারে নিয়া ঘুরস, তুইই জানস। জীবনটারে নষ্ট করিস না। তর*

বাপের কাছে ক, ক যে তুই ভালা হইয়া চলবি। বাপের কথা শুইনা চলবি। তর বাপে তর সব খরচ দিব। এখনও সময় আছে ক।

মাকে পাশ কাটিয়ে আলনা থেকে এপ্রোনটি হাতে নিয়ে চলে যাই হাসপাতালে।

এখন থেকে বেহিসেবি হলে চলবে না। সোনার গয়নার মত টাকা পয়সা গোসলখানায়, জানালায়, টেবিলে, বিছানায় ফেলে রাখা চলবে না।জমা খরচের খাতা করে দুদিন রিক্সাভাড়া- ১২টাকা, বাদাম- ১টাকা, চা- ৩ টাকা, চিরুনি- ১ টাকা, কলম- ২টাকা, কাগজ- ৫ টাকা.. লেখার পর আর লেখা হয় না, হিসেবের খাতাটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রায় বিকেলেই, রোদের তাপ কমে এলে,পড়ার টেবিল থেকে উঠে ইয়াসমিনকে বলি, *চল, বাইরে থেইকা ঘুইরা আসি।* ইয়াসমিন বাইরে যাওয়ার নাম শুনে লাফিয়ে ওঠে। মা বলতে থাকেন, *ও নিজে নষ্ট হইছে, এহন ইয়াসমিনডারেও নষ্ট করব।*

পঞ্চম বর্ষে দিনরাত্তির একটি জিনিসই করতে হয়, সেটি লেখাপড়া। সেটি থেকে আমারও নিস্তার পাওয়া হয় না। হাসপাতালে দিনে তো আছেই, রাতেও ক্লাস থাকে। অধ্যাপক দিনে পড়ান, রাতে পড়ান। কেবল অধ্যাপকই নন, ওপরের ক্লাসে যারা সবে ডাক্তার হয়েছেন, তাঁরাও পড়াতে আসেন। রাজিব আহমেদও পড়াতে আসেন মেডিসিন বিভাগে। রাজিব আহমেদ এবারও প্রথম হয়েছেন,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে, সবগুলোর মধ্যে শেষ বর্ষের পরীক্ষায় প্রথম। ধন্দে পড়ি, এত জ্ঞান তিনি তাঁর ছোট্ট মাথাটিতে ধারণ করেন কি করে! আমার টেবিল জুড়ে রাজিবের সার্জারি মেডিসিন গাইনির খাতা। ছাপলে সাহেবদের লেখা বইএর চেয়ে ভাল বই হবে, আমার বিশ্বাস। রাজিবের করুণাধন্যা আমি, অকাতরে যা আমাকেই দিয়েছেন তাঁর রত্নরাজি। অথচ এই আমার দিকেও বড় একটা চোখ তুলে তাকান না তিনি। ডাক্তারি বিদ্যা ছাড়া অন্য কিছুতে তার কোনও ঝোঁক আছে বলে মনে হয় না। তিনি রোগীর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রোগ এবং রোগ নির্ণয় এবং রোগের চিকিৎসায় দীক্ষা দিয়ে যান। রাত্তিরে ক্লাস শেষে আমাকে ফিরতে হয় বাড়িতে। একা ফিরতে ভয় হয়। অন্ধকারকে ভীষণ ভয় আমার। প্রায়ই ক্লাসের বন্ধুদের অনুরোধ করি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে। যেদিন অমন কেউ থাকে না যাকে বলা যায়, তখন শহরে বাড়ি যে ছেলের, যে ছেলে শহরের দিকে যাচ্ছে, তাকে বলি আমার রিক্সার পেছনে যেন তার রিক্সা যায়, বাড়ি অবদি না গেলেও অন্ধকার পথটুকু অন্তত। অন্ধকারের কি শেষ আছে! পেছনের রিক্সা আমাকে অনেকটা পার করে দিলেও থোকা থোকা কিছু কালো একা পার হয়ে যাওয়ার জন্য রয়ে যায়। বিদ্যাময়ী ইশকুলের সামনে ডান দিকের যে গলিতে আমাকে ঢুকতে হয় বাড়ির পথে, অন্ধকার ভুতের মত পড়ে থাকে ও গলিতে--বুক ঢিপঢিপ করে, রিক্সাঅলাকে জোরে চালাতে বলি, যেন এই পথটি দ্রুত পার হয়--মনে হতে থাকে এই বুঝি এক পাল ছেলে আমাকে রিক্সা থেকে নামিয়ে কাছের কোনো ঝোপের আড়ালে নিয়ে ধর্ষণ করবে, ধর্ষণের পর বুকে ছুরি বসাবে, রিক্সাঅলাটিই হয়ত অন্ধকারে রিক্সা থামিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে যাবে কোথাও। দিনে যে কিছু ঘটে না তা নয়, এতকাল যা ঘটেছে, ঘটেছে দিনে। রিক্সায় বসা আমার দিকে কেউ শখ করে থুতু ছুঁড়ে দিল, পানের পিক ছুঁড়ে দিল, হা হা হাসল, খু খু কাশল। ঢিল ছুঁড়ল, ঢিল গেল কানের পাশ দিয়ে, ঢিল লাগল বুকে, মাথায়, হা হা হাসল, খু খু কাশল, দাঁত বেরোলো বত্রিশটি, খুশির দাঁত। রিক্সায় বসা আমার বাহুতে জ্বলন্ত সিগারেট নিবিয়ে মজা করল কেউ, কেউ ওড়না টেনে নিল, কেউ খোঁচা দিল, কেউ ধাক্কা, কেউ পথ আটকালো, কেউ বুক টিপে ধরল, হা হা হাসল, খু খু কাশল। তারপরও মনে হয়, দিনের চেয়েও রাত আরও ভয়ংকর, রাতে

আরও ভয়ংকর কিছু ঘটতে পারে। রাত আমাকে অন্ধকার কুয়োয় জন্মের মত ডুবিয়ে দিতে পারে। বাড়ি পৌঁছে আমি নিঃশ্বাস ফেলি। প্রতিবারই বাড়ি ফিরে আসা প্রতিবারই একটি বেঁচে যাওয়া দিন। গায়নোকলজি বিভাগের রাতে ডিউটি থাকে, সারারাত। রাত আটটা থেকে সকাল আটটা অবদি। রাত আটটার ডিউটিতে আমি সন্ধে ছটায় গিয়ে বসে থাকি, অন্ধকার নামার আগে আমি চলে যাই হাসপাতালে, সময়ের পোঁছলে কোনো অসুবিধে নেই, সময়ের আগে চলে আসাই অসুবিধে। এই রাত্তিরের ক্লাস-ডিউটি আমাকে অন্ধকারের ভয় দিয়েছে বটে, কিন্তু একটি চমৎকার জিনিস দেখিয়েছে, ছায়াবাণী থেকে অজন্তা সিনেমাঘরের মাঝখানের রাস্তার কিনারে বসে কুপি জ্বেলে গ্রাম থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা চাল ডাল সবজি চিড়ে মুড়ি ইত্যাদি বিক্রি করছে। দৃশ্যটি আমাকে আলোড়িত করে, মাকে বলি ঘটনা, মা বলেন, *ওদের মতও যদি হইতে পারতাম, তাইলে বাঁচতাম।* আমার মনে হয় মা হয়ত ঠিক বলেন। ফুটপাতের ওই মেয়েদের যে দৃঢ়তা এবং সাহস দেখেছি তা আমি লক্ষ করি মার নেই, আমারই বা আছে কি? নারী আমাকে উদ্বুদ্ধ করে, উদ্বুদ্ধ করে কলম হাতে নিতে, দুটো শাদা কাগজ নিতে, লিখতে। আমি না লিখে পারি না।

বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মেয়ে মানুষেরা আজ বেসাতি সাজায়, দেহ নয়, রূপ নয়, সমুখে তাদের পণ্য ধুলায় বিছানো, কুমড়া পটল লাউ পুঁই আর ডাঁটা শাক ক্ষেতের বেগুন, কে যেন সুদূর থেকে করুণ বেসুরো বাঁশি নিয়ত বাজায়। কারো বউ, কারো বোন,কারো বা জননী তারা, তোমরা তো জানো, ঘোমটা ফেলেছে তারা, খসিয়েছে পান থেকে সংস্কারের চুন। অভাব নেমেছে দেশে, অসুরের শক্তি দেহে বেজায় বেহায়া, বিশাল হাঙর মুখ, ছিঁড়ে খায় মাটি থেকে শস্যের শিকড়, অপয়া অভাব ঘরে শুষে খায় প্রিয় খুব ভাতের সুঘ্রাণ, মারমুখো জানোয়ার দুহাতে খাবলে নেয় প্রশান্তির ছায়া, রাত থেকে নিদ্রা কেড়ে আগামীর স্বপ্ন ভেঙে পুড়িয়েছে ঘর, ভিটেমাটি সব গেছে, পোড়া দেহে শুধু কাঁদে বিকলাঙ্গ প্রাণ। অন্ধকার জীবনের দরোজায় কড়া নাড়ে আলোকিত ক্ষিদে, বিকট হাত পা মেলে বেলাজ বেঢপ ক্ষিদে নৃত্য করে খুব, গতর খাটিয়ে খেয়ে অভাগীরা তীর ছোঁড়ে ক্ষিদের শরীরে, রঙচঙ মুখে মেখে তেরঙা শাড়িতে নয়, বড় সাদাসিধে, শহরের ফুটপাতে সাহসে দাঁড়লো এসে পুণ্যবতী রূপ, সুলভে শরীর নয়, গর্বিত নারীরা বেচে দুধ কলা চিড়ে।

নারীর জীবন আমাকে *আয় আয়* বলে ডাকে। নারী আমাকে ভাবাতে থাকে। নারীর দুঃখ বেদনা আমি অনুভব করতে থাকি। নিজে যে কষ্ট পেয়েছি জীবনে, সে তো নারীর কষ্টই। কেবল আমার কি! মনে হয় এ কষ্ট আরও হাজার নারীর।

কোমল কুমারী নারী শরমে আনত মুখ বিবাহের দিন, অজানা সুখের ভয়ে নীলাভ শরীর কাঁপে কি জানি কি হয়। সানাইয়ের সুর শেষ, রাত বাড়ে, বধূটির কণ্ঠ হয় ক্ষীণ, পুরুষ প্রথম এসে নিশব্দ নির্জন ঘরে কি কথা যে কয়! দেবতা নামক স্বামী লাগিয়ে দোরের খিল বক্র চোখে দেখে, লোভনীয় মাংসময় অনাঘ্রাতা বালিকার সলজ্জ শরীর। বহুদেহ বহুবার উন্মোচিত করেছে সে নিষিদ্ধ পল্লীর, অভ্যস্ত হাতের কালি নারীর কপাল জুড়ে ভাগ্যখানি লেখে। অবুঝ কিশোরী মেয়ে, স্বপ্ন সাধ ভাঙে তার, দুঃখে বাঁধে বুক, এরকমই বুঝি হয়, পৃথিবীর এরকমই নিয়ম কানুন। পিশাচি উল্লাস করে নিষ্পেষিত দেহমনে বাসনার খুন, পরম সোহাগে বধূ উপহার নিল অঙ্গে নিষিদ্ধ অসুখ। বছর পেরোলে নারী বিকলাঙ্গ শিশু এক করলো প্রসব, জটিল রোগের বিষ, আগুন জ্বালিয়ে দেহে স্বাগত জানায়! সিফিলিস রোগ নাম, রক্তের প্রপাত বেয়ে বসত বানায়, পেলব শুভ্রতা ছেঁড়ে, বিষাক্ত নখরে ছেঁড়ে হাড় মাংস সব। রাত্রির হিংস্রতা এসে জীবনের সূর্য

খেয়ে নেভায় সকাল, দুরারোগ্য কালো পাপ অকালে নারীকে শুষে কেড়ে নেয় আয়ু। অবশ হাত পা মেলে পড়ে থাকে বোবা কালা জর্জরিত স্নায়ু, আছর করেছে জীনে--এমন কথাই লোকে জানে চিরকাল।

আমাকে নারীতে পায়। আমাকে বেদনায় পায়।

মেয়েটির বাপ নেই, জমিজমা কিছু নেই, কোমল বয়স, গ্রামজুড়ে কথা ওঠে, মায়ে তাকে খুঁটি দেবে পুরোনো ঘরের। কেউ তো নেয়না মেয়ে, বাঁশির বাদকও শুনি যৌতুকের বশ, কে তবে কোথায় আছে? ভীমরতি-বুড়ো পরে পোশাক বরের। বুড়োর হাঁপানি রোগ, চারটে সতিন ঘরে ঠ্যাং মেলে শোয়, আকুল নয়নে মেয়ে চারপাশে খোঁজে শুধু বাঁচার আশ্রয়, কোথায় বাসর ঘর, ভেঙে চুরে স্বপ্ন সব ছত্রখান হয়, নিয়তির কাছে হেরে এইভাবে হল তার যৌবনের ক্ষয়।

মা সে মা হোক, মা তো নারীই, মার কষ্টগুলো এই প্রথম আমি স্পর্শ করি।

অনেক বলেছে নারী, তাবিজ কবজ করে ফেরাতে চেয়েছে, তবু তো ফেরে না স্বামী, একেতে মেটেনা শখ, বিচিত্র স্বভাব। কোথায় মোহিনী মায়া কি জানি কেমন করে কি সুখ পেয়েছে, একেতে মেটে না শখ, বিপুল আমোদে নাচে বিলাসি নবাব। একাকিনী ঘরে নারী চোখের জলের নদী বহায়ে ভীষণ, মাজারে পয়সা ঢালে পীরের মুরিদ হয় দুনিয়া বিমুখ, বুকের ভেতরে তার কষ্টের পাহাড় জমে, ছেঁড়াখোঁড়া মন, বানানো বিশ্বাস নিয়ে বিকৃত স্নায়ুরা চায় দেখানিয়া সুখ। পীরকে হাদিয়া দিয়ে, মাজারে সেজদা দিয়ে উদাসীন নারী, একালে সুখের ঘর কপালে জোটেনি বলে পরকাল খোঁজে, খোদা ও নামাজে ডুবে দিতে চায় জীবনের হাহাকার পাড়ি, বিস্বাদ জীবনে নারী অলৌকিক স্বপ্ন নিয়ে চক্ষু দুটি বোজে।

একদিন শেষ-বিকেলে সাফিনাজের সঙ্গে রিক্সা করে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, গাঙ্গিনার পাড় থেকে ডানদিকে রিক্সা মোড় নিতেই ও চাপা স্বরে বলে উঠল,ওই যে দেখ *প্রস্টিটিউট* যায়। *বল কি!* আমি প্রতিবাদ করেছি। *এ তো সাধারণ একটি মেয়ে।* সাফিনাজ হেসেছিল শুনে। আমি এদের প্রায়ই দেখি রাস্তায়, কোনওদিন মনে হয়নি, এরা পতিতা। দরিদ্র মেয়ে, গায়ে সস্তা শাড়ি, মুখে হয়ত শখ করে আলতার রং লাগিয়েছে। এরকম শখ তো যে কোনও মেয়েরই হয়। রাস্তায় দেখা *বেশ্যা* নামের মেয়েটির প্রতি আমার কোনো ঘৃণা হয়নি। বরং ওর জন্য আশ্চর্য রকম মমতা জন্ম নেয় আমার।

তিনকূলে কেউ নেই, ডাঙর হয়েই মেয়ে টের পেয়ে যায়, অভাবের হিংস্র হাত জীবন কামড়ে ধরে ছিঁড়েখুঁড়ে খায়। যুবতী শরীর দেখে গৃহিণরা সাধ করে ডাকে না বিপদ, বেসুমার ক্ষিদে পেটে, নিয়তি দেখিয়ে দেয় নারীকে বিপথ। দুয়ারে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে বেকার নারী তবু বেঁচে থাকে, স্টেশন কাচারি পেলে গুটিসুটি শুয়ে পড়ে মানুষের ফাঁকে। এইসব লক্ষ্য করে ধড়িবাজ পুরুষেরা চোখ টিপে হাসে, দেখাতে ভাতের লোভ আঁধার নিভৃতে তারা ফন্দি এঁটে আসে। তিনকূলে কেউ নেই, কোথাও কিছুই নেই, স্বপ্ন শুধু ভাত, শরমের মাথা খেয়ে এভাবেই নারী ধরে দালালের হাত।

প্রতিদিনই নারী আমাকে ভাবায়। কোনও নারীকেই আমার সুখী বলে মনে হয় না। এমন কি কি যে মেয়ে নাচছে, গাইছে, চমৎকার পোশাক পরছে।

কাখের কলস ফেলে শোভন রমনী হয় ক্যাবারে ডান্সার, বাঁকানো দেহের ভাঁজে অশ্লীল ইশারা থাকে উন্মত্ত নারীর, ফুরিয়েছে চাল ঘরে, ভাবছে দেহের ভাড়া এ মাসে বাড়াবে, নেশাখোর পুরুষেরা চোখের ভাষায় ডাকে নিকটে আসার। যাত্রার উদ্বাহু নৃত্য

ছেড়ে নগ্নপ্রায় নারী লাখপতি ঘাটে, এখন বাজার ভাল, যতটুকু পারা যায় করবে সম্বল। সকলে হাতিয়ে নেয় সুবিধা সম্ভোগ যত মুখোশের নিচে, নারীর মুখোশ নেই, লোকে তাকে পাপ বলে পৃথিবীর হাটে। রূপালী পর্দার লোভ পুষছে যতনে খুব মগ্ন নিরন্তর, ধাপে ধাপে উর্ধে ওঠে, আসলে পাতালে নামে প্রগাঢ় বিষাদ, শিল্পের সুনাম ভেঙে পতিত জমিনে গড়ে সুরম্য নরক, কালো হাত দূরে থাকে, নিয়ন্ত্রণ তার কাছে, ভাঙে সব ঘর। কাখের কলস ভাঙে, নারীকে দেখিয়ে দেয় আঁধারের পথ, কালো হাত আছে এক, লোমশ নৃশংস হাত কলকাঠি নাড়ে, বিপুল ধ্বংসের ধ্বস তৃতীয় বিশ্বের কাঁধে ভাঙছে ক্রমশ, ভাঙছে স্বপ্নের ঘর, সুবর্ণ কঙ্কণ আর সোনালিমা নথ।

অথবা

বাপের ক্যান্সার রোগ, মরণ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফিরিয়ে নিয়েছে চোখ, গুটিয়ে রেখেছে হাত পরম স্বজন, রোজগারি ছেলে নেই, কিচিমিচি ভাইবোন দুবেলা উপোস, চাকরির খোঁজে নারী মধ্যাহ্নের পথে রাখে কোমল চরণ। এত বড় রাজধানী, আপিস দালানগুলো আকাশকে ছোঁয়, নগরের মাটি চষে প্রয়োজনে নারী কোনও পেল না ফসল। কোথাও ভরসা দিলে বিনিময়ে সরাসরি পেতে চায় দেহ, দ্বিপদী জীবনের ভিড়, কোথাও মানুষ নেই, সকলে অচল। শরীরের ঘ্রাণ পেলে শেয়াল শকুনগুলো নখর বসায়, উপোসের আয়ু বাড়ে, অভাবের বানে ভাসে সুফলা সংসার। খড়কুটো আঁকড়িয়ে জীবন বাঁচালো নারী উজানের জলে, দাঁড়াবার মাটি নেই, তুমুল তুফানে নদী ভাঙে দুই পার।

গলায় রুমাল বেঁধে শহরতলির ছেলে ভোলায় নারীকে, ঝোপের আড়ালে নারী প্রেম শিখে পার করে নিদ্রাহীন রাত, ধ্বংসের আগুন দেখে ভালোবেসে গলে যায় মোমের মতন, প্রেমিকের হাত ধরে অবুঝ কিশোরী মেয়ে ফেলে যায় জাত। ছলাকলা পৃথিবীর কিছুই জানে না নারী, অবাক দুচোখ! সুদূরে পালিয়ে দেখে ছেলের মুখোশ খুলে বিকট আদল, কোথাও স্বজন নেই, আটকা পড়েছে এক সুচতুর ফাঁদে, প্রেমান্ধ যুবতী মেয়ে শেখেনি চিনতে হয় কি করে আসল। আঁধার গলিতে ছেলে চড়াদামে বিক্রি করে রূপসী শরীর, সমাজের উঁচুমাথা তাবৎ বিজ্ঞেরা দেয় কপালের দোষ, শরীরের মাংস নিয়ে রাতভর হাট বসে, দরদাম চলে, আমাদের বোন ওরা, টাকার বদলে দেয় খানিকটা তোষ। আমার দেশের নারী গলিত শবের মত নর্দমায় ভাসে, ভয়াল রাতের গ্রাস আকাঙ্ক্ষা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে রাখে বিষ, সজোরে হাত পা বেঁধে সেই বিষ কে ঢেলেছে এইসব মুখে? মরণের জ্বালা এরা পোহাতে জীবনভর পৃথিবীতে আসে?

আরও নারীর মুখ চোখে ভাসে আমার, আরও নারী আমাকে কাঁদাতে থাকে।

কোলের বাচ্চাটা কাঁদে, পুঁজ ও পাঁচড়া ভরা ঘিনঘিনে দেহ, বুকে তার দুধ নেই, বেকার রমণী চায় ঘরে ঘরে স্নেহ, শ্রমের জীবন চায়, বিনিময়ে ভাত চায় রাতে, সন্তানের শিক্ষা চায়, চিকিৎসার নিশ্চয়তা পেতে চায় হাতে। এ হাতে কে দেবে চাবি, ওই চাবি কোন ঘরে, কে রাখে লুকিয়ে? অসুখে অভাবে ভুগে সন্তানেরা ফি বছর মরছে শুকিয়ে। মাস মাস স্বামী জোটে, গোখরা সাপের মত ফণা তুলে চায়, সোমথ শরীরে তারা সন্তানের বিষ ঢেলে গোপনে পালায়। ওই চাবি কোন ঘরে? পেতে চায় নারী খুব সিন্দুকের স্বাদ, আসলে একাকী নয়, দল বেঁধে যেতে হয় ভাঙতে প্রাসাদ।

ইচ্ছে হয় প্রতিদিন এমন করে নারীর কষ্টগুলো লিখি, প্রতিদিন লিখি। কিন্তু জটিল চিকিৎসাশাস্ত্র উড়িয়ে নিতে থাকে সমস্ত সময়। কলেজ থেকে ক্লাস করে বিকেলে বাড়ি ফিরে খেয়ে বিশ্রাম নিতে নিতেই আবার সময় হাসপাতালে যাওয়ার। প্রতিদিন নারী নিয়ে

মগ্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। এ তো টেবিলে বসে বই পড়া নয় আর, যে, বই থেকে মাঝে মাঝে চোখ সরিয়ে অন্য কিছুতে দিতে পারি। দৌড়োতে হয় হাসপাতালে। দিনেও যেমন, রাতেও তেমন। রোগী টিপে পরীক্ষা করতে হয়, এভাবেই পড়া। বইপড়া বিদ্যেয় ডাক্তার হওয়া যায় না, রোগী পড়তে হয়। মেডিসিনে যেমন রাজিব আমাদের বাড়তি ক্লাস নেন, গাইনি বিভাগে নেন হীরা, হীরা দীর্ঘদিন থেকে আছেন এই স্ত্রীরোগ আর প্রসুতিবিদ্যা বিভাগে, নিজে তিনি বড় কোনও ডিগ্রি নেননি, কিন্তু গাইনি বিদ্যায় তিনি এক নম্বর, কাটা ছেঁড়ায় তাঁর মত দক্ষ অনেক অধ্যাপকও নন। হীরা রোগিও পান প্রচুর। অনেকে বলে স্বয়ং জোবায়েদ হোসেনের চেয়ে হীরার *প্র্যাকটিস* ভাল। তা হয়ত বাড়িয়ে বলে, কিন্তু কলেজের *সহযোগি অধ্যাপক সহকারি অধ্যাপক রেজিস্টার ক্লিনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট*এর চেয়ে হীরার ভাল কামাই এ নিয়ে সন্দেহ নেই কারও। মেডিসিনে না হয় প্রভাকর পুরকায়স্থ আছেন, বাঘ নন তিনি যাই হন। জোবায়েদ হোসেনকে দেখে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খায়, এমন ভয়ঙ্কর। সার্জারির এনায়েত কবির যেমন। কোনো ধমক লাগানো বা দাঁত খিঁচিয়ে কিছু বলার দরকার হয় না, এ দুজনের উপস্থিতিই যথেষ্ট ছাত্রছাত্রীদের হাড় ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্য।জোবায়েদ হোসেন ছফুট লম্বা, চোখে চশমা, ঢিলেঢালা শার্ট প্যান্ট পরনে, লম্বা একটি এপ্রোন, খুলনার উচ্চারণে কথা বলেন, যখন ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড ঘোরেন, পেছনে একগাদা ডাক্তার আর ছাত্রছাত্রী, যেন ভগবান হাঁটছেন, পেছনে পয়গম্বরবৃন্দ (ডাক্তার), শাগরেদবৃন্দ (ছাত্র-ছাত্রী)। কিন্তু নিজেকে যখন হাঁটতে হল জোবায়েদ হোসেনের, মনে হয়নি আমি তাঁর শাগরেদ,যেন বিচারের অপেক্ষায় থাকা আসামি। বিচারের সময় সামনে, পরীক্ষা সামনে। কি কারণে আমি জানি না, আমাকে নজরে রাখেন তিনি। অধ্যাপকদের *নজর* দু প্রকার, এক খারাপ, দুই ভাল। *নজরে* পড়ার পর ঠিক বুঝে পাই না, এ ঠিক কোন ধরনের নজর। কখন কোন ক্লাসে দেরি করে এসেছি, প্রসবকক্ষে কতগুলো প্রসব ঘটিয়েছি এসব তাঁর মুখস্ত একরকম। আচমকা স্ত্রীরোগসম্পর্কিত জটিল কোনও প্রশ্ন করে বসেন যে কোনো জায়গায়, ওয়ার্ডে, করিডোরে, অপারেশন থিয়েটারে, প্রসবকক্ষে। আমাকে তটস্থ থাকতে হয়, ক্লাস শেষ হলে জোবায়েদ হোসেন যে পথে যান তার আশপাশ দিয়েও আমি হাঁটি না। দূর থেকে তাঁকে দেখলে দ্রুত আমার গতি এবং গন্তব্য দুইই পরিবর্তন করি তাঁর মুখোমুখি না হওয়ার জন্য। মুখোমুখি হওয়ার একটি বিপদ আছে, অবশ্য না হওয়ারও বিপদ আছে। মুখোমুখি হলে তিনি আচমকা প্রশ্ন করতে পারেন, যার উত্তর, আমি নিশ্চিত নই আমার বিদ্যের ঝুড়িতে আছে। আর না হওয়ার বিপদটি হচ্ছে তিনি কোনো একদিন বলে বসতে পারেন এ মুখ তো সচারচর দেখা যায় না হাসপাতালে, তার মানে পড়াশোনায় ফাঁকি দিচ্ছ। মুখ চিহ্নিত হওয়ার ভাল দিক যতই থাক, আমি এড়িয়ে চলি তাঁর ছায়া। অন্য ছাত্রছাত্রীরা দূর থেকে তাঁকে দেখলে শ্লথ পায়ে এপ্রোনটি টেনে টুনে এমনকি কোনো বই খুলে সে বইয়ের দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে এগোয়, আর জোবায়েদ হোসেন কাছাকাছি হলে একটি সালাম ঠুকে দেয়। এটি করার কারণটি হচ্ছে ছাত্র বা ছাত্রীটি যে ক্লাসে কেবল নয় করিডোরেও পড়ছে এবং আদব কায়দাও ভাল জানে সে ব্যাপারটি জোবায়েদ হোসেনের মস্তিস্কের স্মরণ-কোষে ঢুকিয়ে দেওয়া, পরীক্ষার সময় এই স্মরণ কোষে কোনওরকম টোকা যদি পড়ে। ভাল পড়াশোনা করলেই যে ডাক্তারি পাশ করা যায় তা নয়। শিক্ষকদের করুণা না জুটলে সব গেল। এক্সটারনালদের কবল থেকে বাঁচার জন্য ইন্টারনালদের ওপর ভরসা করতেই হয়, ইন্টারনালদের শ্যেন নজরে পড়লে এক্সটারনাল আর ইন্টারনাল এই দুকবলে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

বাবা এ কলেজের অধ্যাপক বলে যে এনায়েত কবির আর জোবায়েদ হোসেনের মত হিংস্র বাঘের *কবল* থেকে রক্ষা পাবো, তা মনে করার কোনও কারণ নেই। এ কথা বাবাও বলে দিয়েছেন। যত ছাত্র ছাত্রী মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বেরোতে গিয়েও বেরোতে পারে না, কারণ এই শেষ পরীক্ষাতেই দূর্ঘটনাটি ঘটে। আমার সঙ্গেই ক্লাস করছে আমার চেয়ে দুবছর তিনবছর এমনকি পাঁচ ছ বছর আগে আটকে যাওয়া ছাত্র ছাত্রীরা। ওদের মলিন মুখ দেখে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবি, এরকমই কি হতে যাচ্ছি আমি!সুতরাং আমাকে বাবার উপদেশে আর জোবায়েদ হোসেনের ভয়ে মনোযোগী হতে হয় তা নয়, নিজের জন্যই হতে হয়, এক ক্লাসে দুদুবার পড়ে থাকলে নিজের জীবনের যে সমস্যা, তার সমাধান তো হবেই না বরং আরো জট পাকাবে, যত দ্রুত ঝামেলা শেষ করে রুদ্রর সঙ্গে সংসার করা যায়, রুদ্রর এলোমেলো জীবনকে পরিপাটি করা যায়!সংসার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, যে সংসার তাকে স্থিরতা দেবে বলে সে বিশ্বাস করে, প্রতিজ্ঞা করেছে যে ভুলটি সে করেছে এমন ভুল ভবিষ্যতে হবে না আর, আশায় আশায় থেকে বছরগুলি এই তো ফুরিয়ে আসছে, রুদ্র পরিকল্পনা করে ফেলেছে পাকাপাকি ভাবে সে ঢাকায় চলে আসবে, ঢাকায় ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করবে। রুদ্রর এই উদ্যোগ আমার জ্বলতে থাকা পুড়তে থাকা স্বপ্নের বাড়িঘরে ফোঁটা ফোঁটা জলের মত ঝরে।

প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের প্রসবকক্ষে বিরামহীন আসছে বিভিন্ন বয়সের প্রসূতি, কেউ প্রথম সন্তান, কেউ দ্বিতীয়, এমনকি সপ্তম সন্তানও জন্ম দিতে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে প্রসুতিরা।একটি নিম্নগামি চাপের উপদেশ দিই তাদের। যে চাপের ফলে জলের থলি নেমে আসবে নিচের দিকে, থলি ফুটো করে দিলে পৃথিবীর পথে যাত্রা করবে একটি শিশু। এই যাত্রা যেন শুভযাত্রা হয়, শিশুর হৃদপিণ্ডের ধ্বনিতে যেন কোনও কিন্তু না থাকে, সেদিকে চোখ কান খোলা রাখি। পথ প্রশস্ত করে দিই শিশুর যাত্রায় যেন বিঘ্ন না হয়। কিন্তু যখনই, সে প্রথম হোক, দ্বিতীয় হোক তৃতীয় হোক, আগমন ঘটে কোনও শিশুর, যদি সে মেয়ে-শিশু হয়, আর্তনাদ করে ওঠে শিশুর মা। কক্ষের বাইরে অপেক্ষারত আত্মীয়দের কাছে কন্যাসন্তান জন্মের খবর দেওয়ামাত্র মুখগুলো চোখের সামনে বিষাদে আচ্ছন্ন হয়। মেয়ে জন্ম যে কি রকম অনাকাংখিত, তা আমার প্রতিদিন দেখা হতে থাকে। সাতটি পুত্রসন্তান জন্ম দেবার পর কেউ হয়ত একটি কন্যাসন্তান আকাঙক্ষা করে, তাও হাতে গোনা কজন মাত্রই করে। কন্যা নয়, কন্যা নয় পুত্র চাই পুত্র চাই, এই প্রবল প্রখর আকাঙক্ষা নিয়ে প্রসূতির আত্মীয়রা ভিড় করে প্রসুতিকক্ষের বাইরে। কন্যাজন্মদানের পর আমি একুশ বছর বয়সী এক তরুণীর আর্তনাদ থামাতে বলেছিলাম, *নিজে মেয়ে হয়ে আপনি একটি মেয়ের জন্ম চাইছেন না, ছি!*

তরুণী অস্ফুট স্বরে বলল, *আমারে যে তালাক দিবে, তালাক দিলে আমি কই যাবো!*

তালাক দিবে কেন? একটা সুস্থ সুন্দর বাচ্চা জন্ম দিছেন আপনি। আপনার খুশি হওয়ার কথা। মিষ্টি খাওয়ান সবাইরে।

মেয়ে জন্ম দিছি আপা। আমি তো অপয়া!

ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে তরুণী। প্রসবকক্ষের দেয়ালে দেয়ালে ধ্বনিত হতে থাকে, আমি তো অপয়া, আমি তো অপয়া। কানে হাত চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাই আমি।

ডাক্তারদের, হতে যাওয়ার ডাক্তারদের, নার্সদের জন্য খাঁচা ভরে মিষ্টি আসে

প্রসবকক্ষের বাইরে। সে মিষ্টি পুত্রজন্মের আনন্দে। আমি অপেক্ষা করে থাকি কন্যা জন্মের কারণে কোনও একটি দম্পতির সন্তুষ্টি দেখার। আমার দেখা হয় না।

মেয়ে হইছে, তাতে কি হইছে। মেয়েরাই তো ভাল। মেয়েরা বাপ মায়ের দেখাশোনা করে। আপনার মেয়েরে লেখাপড়া করাইবেন, ইশকুল কলেজে পড়াইবেন, আমার মত ডাক্তার হবে আপনার মেয়ে। দুঃখ করবেন না। বলে বলে যতবারই আমি কাঁদতে বারণ করি দুঃখিতা নারীদের, ততই তারা কাঁদে, প্রাণ ভরে কাঁদে প্রসব কক্ষের ভেতর। জরায়ুর ফুল ঝরে যায়, অন্তরে বিঁধে থাকে সহস্র কাঁটা। কেবল পুত্রসন্তান জন্ম দিলেই প্রসব যন্ত্রণা ম্লান হয়ে প্রশান্তির হাসি ফোটে মুখে, প্রসবকক্ষে হাসি ফোটে, প্রসবকক্ষের বাইরে ফোটে। প্রসব যন্ত্রণার চেয়েও বড় এক যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আমাকে প্রতিদিন প্রসবকক্ষ থেকে বেরোতে হয়। সমাজের বিকট কুৎসিত রূপটি পরিষ্কার হতে থাকে চেতনায়। কে আমি কি আমি কেন আমি এই প্রশ্নগুলো আমি তসবিহর গোটা নাড়ার মত নাড়তে থাকি। অনাকাঙ্খিত কোনও কন্যা সন্তান, কন্যাসন্তান জন্ম দিয়ে আর্তনাদ করা প্রসবকক্ষের কোনও দুঃখিতা এবং এই আমার মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাই না।

সমাজের নিয়মগুলো ছিঁড়ে ফেলার জন্য যখন আমার হাতদুটো নিশপিশ করছে, লিলির গালে একটি শক্ত চড় কষাই কেন আমি একবার নয় চার চার বার ডাকার পরও ও কাছে আসেনি, কেন জানতে চায়নি আমার কি প্রয়োজন। চড় খেয়ে থতমত খাওয়া লিলিকে ধাক্কা দিয়ে দরজার বাইরে ঠেলে বলি, *যা এক্ষুনি চা নিয়া আয়।* লিলি, দশ বছর বয়সের মেয়েটি নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে যায় রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনের স্তূপ নিয়ে কলতলার দিকে যেতে থাকা তার মায়ের কাছে বলতে যে আমি চা চাচ্ছি। লিলির মা স্তূপ নামিয়ে রেখে চায়ের পানি বসায় চুলোয়। লিলি ধীরে হেঁটে, যেন ছলকে না যায়, ধোঁয়া ওঠা চা এর কাপটি রেখে যায় টেবিলে। একটি মলিন হাফপ্যান্ট পরনে লিলির, খালি গা, পায়ের হাঁটু অবদি ধুলো, নাকে একটি দুপয়সা দামে কেনা একটি টিনের নাকফুল। আমি যখন চা খেতে খেতে কন্যাজন্ম নিয়ে একটি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি, মনোযোগ ছিন্ন করতে এ সময় কেউ ঘরে ঢুকুক আমি চাইনি। কিন্তু মা কেবল ঢোকেন না, তিক্ত স্বরে বলেন, *ডাক্তার হইতাছস বইলা কি মানুষরে মানুষ জ্ঞান করস না নাকি? এত দেমাগ তর?*

কেন কি হইছে? আমি বিরক্ত কণ্ঠে বলি।

এই বাচ্চা মেয়েডারে যে মারলি, এইভাবে মারা কি ঠিক হইছে তর? মেয়েডার গাল লাল হইয়া রইছে।

আমি লিলি লিলি কইয়া অনেকক্ষণ ডাক দিছি। আইল না কেন?

আইল না হয়ত শুনে নাই। হয়ত দূরে ছিল। তাই বইলা মারবি? একটা গরিব বাচ্চা। বাপ নাই। মা মানুষের বাড়িত কাম কইরা খায়। ছেড়িডা ফুটফরমাইস করে, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া করে। করে যে এইডাই তো বেশি। তার মায়ে তো দিন রাইত খাটতাছে। গরিব মাইনসেরে মারিস না। আল্লাহরে অখুশি করিস না। এইসবের শাস্তি তো আল্লাহ দিবেন। ধর্ম বিশ্বাস করস না। আল্লাহ মানস না। তর কপালে যে কি আছে!

মা সরে যান। আবার মিনিট দুই পর এসে টেবিলে ছড়ানো কাগজ থেকে নারী বিষয়ে লেখা কবিতাগুলো আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, *এই যে মেয়েদের নিয়া কবিতা লেখস, অথচ মেয়েদের গায়ে হাত তুলস! কি লাভ এইসব লেইখা তাইলে!*

আমার হাতে শাদা কাগজ, কাগজে কাটাকুটি করা কবিতার দুটি লাইন। আমার চোখ দুটি লাইনে। আমার মন অন্যত্র।

আবার একদিন পীর বাড়ি

পীরবাড়ি যাওয়া হয় আমার একদিন। এবার মার সঙ্গে নয়। তিনজন বান্ধবীর সঙ্গে। হোস্টেলে মেয়েরা একটি মিলাদের আয়োজন করার ইচ্ছে করেছে। যদিও উদ্ভট শখ এটি, ডাক্তারি পড়া মেয়েদের *আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা* গাওয়ার সময়ও নেই বেশি, আর এটি গাওয়ার কারণ খুঁজেও তারা পাবে না কিছুই, তবু। উদ্ভট হলেও যেহেতু শখটি হয়েছে একজন মৌলবির দরকার তাদের। মৌলবি খুঁজছে মেয়েরা, এদিক ওদিক খুঁজে ব্যর্থ হয়ে শেষে আমাকে ধরলো, যেহেতু শহরের মেয়ে আমি, চেনা জানা থাকতে পারে কেউ। আমি কথা দিই মৌলবি যোগাড় করে দেব, আবেগে আবেগে আবার এও বলে ফেলি, দেব তো দেব মেয়ে-মৌলবি দেব একখানা। মেয়েদের হোস্টেলে মেয়ে-মৌলবি এসে মিলাদ পড়িয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি হতে পারে। তবে আমি যেহেতু আল্লাহ রসুলে মিলাদে মসজিদে বিশ্বাসী নই, আমি মিলাদের মিষ্টি খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করব না। ওই *আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা সাইয়েদেনায়* শরিক হওয়ার কোনও রুচি নেই আমার। ঠিক আছে, তাই সই। আমার সঙ্গে রওনা হয় সাফিনাজ, হালিদা আর পারুল। চারজন দুটি রিক্সা নিয়ে নওমহলের পীরবাড়ি পৌঁছই। বহু বছর পর পীরবাড়ি আসা আমার। ছোটবেলায় যেমন গা ছমছম করত এ বাড়ি ঢুকতে, এই বড়বেলাতেও সেই গা ছমছমটি যায়নি। যেন এ পৃথিবী নয়, পৃথিবীর বাইরে কোনও এক জগতে ঢুকছি। এই জগতের সবাই আমাদের দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টিগুলো অতিক্রম করে অন্দরমহলে ঢুকি, খুঁজি ফজলিখালাকে। ফজলিখালা আমাকে দেখে, লক্ষ করি, খুব অবাক হননি, যেন কোনও একদিন এবাড়িতে আমার আসারই কথা ছিল। ফজলিখালাকে, যেহেতু তিনি আমার খালা, যেহেতু এ বাড়ির সবাই সবকিছু বেজায় অদ্ভুতুড়ে হলেও তিনি পুরোটা নন, বলি যে আমাদের একটি মেয়ে-মৌলবি দরকার, আজ বিকেলেই। মেয়েদের হোস্টেলে মিলাদ পড়িয়ে আসবে। এই আহবানে ফজলিখালার মুখে হাসি ফোটার কথা, কারণ গোটা শহরে এই একটি জায়গাতেই, এই পীরবাড়িতে, মেয়ে-মৌলবি পয়দা করা হয়, আর এই মেয়ে-মৌলবির চাহিদা আছে বাজারে, কেউ কেউ এসে মেয়ে-মৌলবি পাওয়ার জন্য তদবির করে অথবা করতে পারে। ফজলিখালার অ-বিস্মিত অ-খুশী মুখটির সামনে দাঁড়িয়ে তাড়া দিই, এক্ষুনি কোনও একটি মেয়েকে যেন আমাদের হাতে দেওয়া হয়, আমাদের সময় নেই বেশি। যে কোনও একটি মেয়ে, হুমায়রা বা সুফায়রা বা যে কেউ। আমার এই প্রস্তাব শুনেও অবাক হন না ফজলিখালা, কিন্তু হাসেন। সম্ভবত তাঁর দুটো কন্যার নাম উল্লেখের কারণে এই হাসিটি। ফজলিখালার মুখটি আগের মতই সুন্দর। হাসিটি সেই আগের মতই নির্মল। সেই হাসিটি যখনও মিলিয়ে যায়নি, হুমায়রা এসে উপস্থিত। আঁটসাঁট জামাটি থেকে হুমায়রার পেটের থাক থাক চর্বি প্রায় ফেটে বেরোতে

চাইছে।বড় ওড়নায় ঢেকে রেখেছে মাথা। হুমায়রার ওড়না ঢাকা মাথাটি সামনে পেছনে নড়ে যখন আমরা বলি একজন মেয়ে-মৌলবি দরকার আমাদের। এই হুমায়রা, যে নিজের প্রেমিক প্রবর ফুপাতো ভাইকে মেদেনিপুর থেকে আনিয়ে হলেও নিজের বিয়ে ঘটিয়েছে, যখন পীরবাড়ির সব যুবতি মেয়েরা আল্লাহর পথে নিজেদের উৎসর্গ করে নিজেদের বিয়ে থা সংসার সন্তান ইত্যাদি জলাঞ্জলি দিয়েছিল যেহেতু পীর নিজে ঘোষণা করেছিলেন এই শেষ জমানায় বিয়ে করার কোনও মানে হয়না। কিন্তু এই হুমায়রা, পীরের নাতনি হয়ে, পীরের ঘোষণার অবাধ্য হয়েছে প্রথম, অবাধ্য হয়েছে ঠিক বিয়ের বয়সে এসে। ওদিকে ঘোষণা পালন করতে গিয়ে হুমায়রার চেয়ে বয়সে বড় যুবতীকুল আইবুড়ি রয়ে গেছে। এই হুমায়রা, যার বিয়ের কারণে পীরের কাছে আসা শেষ জমানায় বিয়ে না করার জন্য আল্লাহর নির্দেশটি এক রাতেই পাল্টে যায়, পাল্টে গিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ বলেছেন শেষ জমানায় সঙ্গী বেছে নাও খুব তাড়াতাড়ি, বান্দারা শেষ জমানায় বিয়ে করলে আল্লাহতায়ালা বড় খুশী হবেন। আল্লাহতায়ালা বড় ঘন ঘন সিদ্ধান্ত পাল্টান। এই পীরবাড়ির সদস্যদের সুবিধে অসুবিধে অনুযায়ী সিদ্ধান্তগুলো নেন তিনি। হুমায়রা আমাদের আকাঙক্ষাটি শুনে *ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি, যা চাইছ তা পাবে* বলে আমাদের অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে অন্দরমহলের অন্দরে চলে গেল। ফজলিখালাও অদৃশ্য। সম্ভবত হুমায়রা নিজে বোরখা পরে আসছে আমাদের সঙ্গে যেতে। কিন্তু ওভাবে প্রায় পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর নিজে তো সে বোরখা পরে এলই না আমাদের সঙ্গে হোস্টেলে যেতে, বরং আমাদের নিয়ে স্বয়ং পীর আমিরুল্লাহর ঘরে ঢুকল। পীর আমিরুল্লাহ শাদা আলখাল্লায় শাদা টুপিতে বসেছিলেন বিছানায়। তাঁর মেহেদি লাগানো দাড়ি নড়ছিল যখন তিনি আমাদের দেখে মাথা নাড়ছিলেন *আসুন আসুন* ভঙ্গিতে। হুমায়রা দাঁড়িয়ে রইল পাশে। পীর ছাড়াও পীরের কন্যা জোহরা ছিল ঘরে, আর কিছু আইবুড়ি। আমাদের এ ঘরে ঢোকানোর কারণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অনুমান করি, মেয়ে-মৌলবি পেতে হলে কেবল ফজলিখালা আর হুমায়রার অনুমতি যথেষ্ট নয়, আমাকে স্বয়ং পীর আমিরুল্লাহর কাছে আবেদন পেশ করতে হবে আমাকে, তাঁর অনুমতি মিললেই আমাদের কাজ হাসিল হবে। কিন্তু ঘরে ঢোকার পর পীর আমিরুল্লাহ কিছু জানতে চাইলেন না আমরা কেন এসেছি, কি কারণ। আদৌ তিনি আমাদের এ বাড়িতে আগমনের উদ্দেশ্য জানেন কি না আমার সন্দেহ হয়। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে, আর কাউকে না হলেও, আমাদের, আমাকে সাফিনাজকে, হালিদা আর পারুলকে হতবাক করে বলেন, *তারপর বুঝলেন কি না আল্লাহর পথে আসা খুব সহজ কথা নয়, দুনিয়াদারির মোহ ত্যাগ যারা করতে পেরেছে, তাদের জন্য আল্লাহতায়ালা আখেরাতে সর্বোচ্চ সম্মানের আয়োজন করেছেন।* ঘরের অন্যান্যদের মুখ থেকে *আহ আহ* শব্দ ওঠে। সর্বোচ্চ সম্মানের জন্য তৃষ্ণা সেই আহ শব্দে। দুনিয়াদারির লেখাপড়া, দুনিয়াদারির সাময়িক সংসার, মায়ার জাল ছিঁড়ে যারা বেরিয়ে আসে তাদের জন্য কি ধরণের সম্মান অপেক্ষা করছে পরকালে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন এবং দুনিয়াদারিতে ডুবে থাকলে আল্লাহতায়ালা কি ধরনের শাস্তি লিখে রেখেছেন তারও ভয়াবহ বিবরণ দিতে তিনি ভোলেন না। বর্ণনা দীর্ঘ। বিবরণ অতিদীর্ঘ।সাফিনাজ, হালিদা আর পারুল বার বার আমার দিকে কুঞ্চিত চোখে তাকাচ্ছে, বুঝে পাচ্ছে না কি ঘটছে এখানে, ফিসফিস করছে, *চল চল। দেরি হয়ে গেল।* আমিও ঠিক বুঝে পাচ্ছি না কেন আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে আল্লাহতায়ালার শাস্তি এবং পুরস্কারের আদ্যোপান্ত জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে। হুমায়রাকে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করি যে আমাদের সময় নেই সময় খরচ করার। মেয়ে-মৌলবির জন্য এসেছি আমরা, এসব

শুনতে নয়। আমার ইশারার দিকে ফিরে তাকায় না হুমায়রা। বড় বিব্রত বোধ করি বান্ধবীদের সামনে। মেয়ে-মৌলবি যোগাড় করে দেবার লোভ দেখিয়ে এদের এই বাড়িতে নিয়ে এসে এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আটকে পড়েছি। পীর আমিরুল্লাহ আমাদের দিকে আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকান, বাকি সময় তিনি মেঝে নয়ত সিলিংএর দিকে, উঠোনের গাছগাছালি নয়ত আইবুড়িদের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন আল্লাহতায়ালার গুণাগুণ। যেন কোনও মানুষের মুখ থেকে নয়, রবোটের মুখ থেকে বেরোচ্ছে সব। কোরান হাদিসের প্রতিটি শব্দ আমিরুল্লাহ মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, অন্তঃস্থ করে ফেলেছেন, পরীক্ষা সামনে এলে পরীক্ষার্থীরা যেমন মুখস্থ করে সিলেবাসের বইগুলো। শব্দগুলো আমিরুল্লাহর মুখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে আগুনের ফুলকির মত, গায়ে এসে লাগছে ফুলকি। হঠাৎ মনে হয়, লোকটি আমিরুল্লাহ নন, লোকটি স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। এই ঘরটি ঘর নয়, এটি হাশরের মাঠ, এখানে চারজন পাপীর বিচার করছেন আল্লাহতায়ালা। বিরতিহীন বয়ানে পীর আমিরুল্লাহর মুখে ফেনা উঠে এলে হুমায়রা একটি ক্যাসেট চালিয়ে দেয়। ক্যাসেটে আমিরুল্লাহর কণ্ঠে কোরান হাদিসের কথা। ঠিক একই কথা যা তিনি বর্ণনা করেছেন মুখে। একই কথা একই ভাষায় একই সুরে। আমি এরমধ্যে অনেকবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েছি। অনেকবার বলেছি আমি যাই। হুমায়রা চাপা কণ্ঠে ধমক দিয়েছে, *আল্লাহর কথা শুনলে এত ধৈর্যহারা হও কেন? অসীম ধৈর্য নিয়ে শুনতে হয় আল্লাহতায়ালার কথা। আল্লাহর পথে এসেছো। এখন মন থেকে শয়তান ঝেড়ে ফেলতে হবে। শয়তানই আল্লাহ থেকে মন ফেরায় অন্যদিকে।* এ কথায় স্পষ্ট হয় সে কি অনুমান করছে। সারা বাড়ির চোখ আমাদের দিকে, চোখগুলো জানে যে আমরা *দুনিয়াদারি* ফেলে *আল্লাহর পথে* চলে এসেছি, না এলেও এ বাড়িতে ঢুকেছি বলে আল্লাহর পথে নেওয়ার জন্য আমাদের মস্তিষ্ক ধোয়া হচ্ছে পুণ্যজলে। ঘন্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, এক ঘন্টা পেরেলো, দু ঘন্টাও। দেখছি সাফিনাজ আর হালিদার মুখে বিস্ময়, বিরক্তি আর বিষম বিষাদ। আমার গা ছমছম করে, ভুতের ভয়ে এককালে যেমন করত। মনে হতে থাকে এ বাড়ির কোনও মানুষই সত্যিকার মানুষ নয়। এই ভূতুড়ে বাড়িটি থেকে পালাবার পথ খুঁজতে থাকি। কিন্তু যতক্ষণ আমিরুল্লাহর কোরান হাদিসের ব্যাখ্যা শেষ না হচ্ছে ক্যাসেটে, আমাকে উঠতে দেবে না হুমায়রা। অদৃশ্য শেকলে আমরা বাঁধা। এভাবে দিন ফুরিয়ে যাবে, রাতও, টের পাই। এক ক্যাসেট ফুরিয়ে গেলে আরেক ক্যাসেট চালানো হচ্ছে। আল্লাহতায়ালার এই অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কানাগলি থেকে বেরোবার সবকটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্ষিধেয় আমাদের পেট জ্বলছে। বিকেল পার হয়ে যাচ্ছে, হোস্টেলে মিলাদের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে আছে অনেকক্ষণ। শ্বাস দ্রুত হচ্ছে। এবার যান্ত্রিক বয়ানের মাঝখানে হঠাৎ উঠে দরজার দিকে পা বাড়াই, ভূতের রাজ্য থেকে যত শিগগির সম্ভব পালানোই যে মঙ্গল তা আমি যেমন জানি, আমার গতিময় পাদুটেও জানে। উঠোনের অনেকগুলো চোখ আমাকে হাঁ করে দেখতে দেখতে ফিসফিস করছে, *হাসিমা আপার মেয়ে আল্লাহর পথে এসেছে। দুনিয়াদারির লেখাপড়া আর করতে চায় না, এখন থেকে নিয়মিত কোরান হাদিস শুনতে এখানে আসবে।* শুনছি বিচিত্র উচ্চারণে বাক্যগুলো, *কত সুমতি হয়েছে মেয়েদের। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, দুনিয়াদারি ছেড়ে দিয়ে যারাই আসে, কাউকে হুজুর ফিরিয়ে দেন না।* হুমায়রার আদেশ উপদেশ উপেক্ষা করে দৌড়ে ঘর থেকে বেরোই। পেছনে হুমায়রার চিৎকার, *আল্লাহর পথে আসছে, অথচ ঘাড়ের ওপর শয়তান বসে আছে। সব ফাঁকিবাজি।* উঠোনে ফজলিখালা সামনে পড়েন, তিনি তাজ্জব, *চলে যাস কেন?*

আমি তো মিলাদ পড়াইতে পারে এমন একজন মেয়েরে নিতে আইছিলাম, তা পাওয়া যাবে নাকি যাবে না তা বইলা দিলেই ত হয়!

কোনও উত্তর নেই। যেন মেয়ে-মৌলবি দিয়ে মিলাদ পড়াতে চাইছি কলেজের হোস্টেলে, এই বাক্যটি ফজলিখালা প্রথম শুনলেন, আগে শোনেননি, শুনলেও মাথায় ঢোকেনি, অথবা ঢুকলেও এ বাড়িতে আমাদের আসার সত্যিকার উদ্দেশ্য মেয়ে-মৌলবির,তা মনে করেননি। অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়ি। বাঘের খাঁচায় ঢুকে বাঘের দুধ আশা করার বোকামো হাড়ে হাড়ে টের পাই।

জঙ্গল সাফ করে যে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে ভাড়া দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পথে আসা লোকদের, সেগুলোর একটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন রুনু খালা। ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা রুনুখালাকে দেখে প্রথম চিনতে পারিনি। তিনি এখন শাড়ি ছেড়ে এ বাড়ির মেয়েদের মত জামা পাজামা পরেন। বড় একটি ওড়না মাথা বুক ঢেকে রাখে রুনুখালার। পায়ে নূপুর পরে গান গেয়ে নেচে বেড়ানো,বিএ পাশ করা,প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা সেই রুনুখালা ই যে পীরবাড়ির ভেতরে এক শরীর শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই রুনুখালা আমার বিশ্বাস হতে চায় না। এই রুনুখালাকে মনে হয় সারাজীবন কাটিয়েছেন অন্ধকার আল্লাহর গলিতেই, তাঁর কোনও অতীত ছিল না ঝলমলে। রাসু খালু ময়মনসিংহ পৌরসভায় হিশাব রক্ষকের চাকরি করতেন, চোখা প্যান্ট চোখা পাম্পশুর সেই রাসূ খালুর বিরুদ্ধে টাকা পয়সার গরমিল করা, প্রচুর টাকা হাওয়া করে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয় আপিস থেকে, রাসু খালুর চাকরি চলে যায়। চাকরি যাওয়ার পর তিনি স্ত্রী কন্যা নিয়ে আল্লাহর পথে চলে এসেছেন। এখন চাকরি খোঁজেন, পান না। এখন বেগুনবাড়ি থেকে নিজের ভাগের জমি থেকে ধান চাল বিক্রির টাকা এনে শহরে *আল্লাহর পথে* বাস করেন। পাঁচ বেলা নামাজ পরেন। কপালে বড় একটি কালো দাগ, নামাজ পড়তে পড়তে মেঝেয় কপাল ঠুকতে ঠুকতে কালো এই দাগটি পড়েছে কপালে। মলি নামের যে মেয়ে আছে রুনুখালার, তার মলি নাম পাল্টে মতিয়া রাখা হয়েছে এই পীর বাড়িতে। নাম পাল্টানোর নিয়মটি বড় পুরোনো নিয়ম এ বাড়ির। মার ঈদুল ওয়ারা নাম ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে হামিমা রহমান করা হয়েছে, মা হামিমা নামেই পরিচিত এই পীরবাড়িতে। রুনু খালার ফ্রক পরা ছোট্ট সুন্দর মেয়েটি এখন শরীরের আগাগোড়া আবৃত করে। ইশকুলে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা মলিকে এখন পীরবাড়ির মাদ্রাসায় কোরান পড়তে দেওয়া হয়েছে। রুনুখালার একটি ছেলেও ছিল, ছেলেটির পেট ফুলে ঢোল হয়ে একদিন মারা গেল। কোনও পীরের ফুঁ কাজে লাগেনি, দুনিয়াদারির কোনও ডাক্তারের ওষুধও নয়। রুনুখালা তাঁর ছোট্ট টিনের ঘরটিতে আমাকে যখন টেনে নিয়ে বলেন *কিছু খাইবা? একটু সেমাই খাও! কইরা দিই!* না বলি। বড় মায়া হয় রুনুখালার জন্য। পেছনে ফজলিখালার শ্বশুরবাড়িটির দিকে তাকাই। বাড়ির সামনের পুকুরটি বুজে ফেলা হয়েছে। লিচু গাছটিও আর নেই। জঙ্গল নেই, ভূত পেত্নীর ভয় নেই, কিন্তু তারপরও মনে হয় আগের চেয়ে আরও ভূতুড়ে হয়েছে বাড়িটি। হুমায়রা পীরের ডান হাত এখন। সুফায়রা পীরের এক মুরিদকে বিয়ে করে সংসারি হয়েছে। মুবাশ্বেরা তো নেই ই। মুবাশ্বেরার ছোট বোন আতিয়া বসন্ত হয়ে একদিন টুপ করে মরে গেছে। আতিয়া দেখতে খুব সুন্দর ছিল। দুদিনের জন্য মা পাঁচ বছরের আতিয়াকে অবকাশে এনেছিলেন। ওই দুদিনে ওকে টুইস্ট নেচে *মাই নেইম ইজ এটিয়া গিলবার্ট* বলতে শিখিয়েছিলেন দাদা। আতিয়ার মস্তিষ্ক থেকে শয়তানি বিদেয় করা হয়েছে এ বাড়িতে ফেরত এনে। আতিয়ার ছোট আরও অনেকগুলো বোন আছে, আমি ওদের নাম কেবল শুনেছি মার কাছে, মুখ চিনি না। এত কাছের

আত্মীয় হওয়ার পরও আমাদের কোনও যোগাযোগ হয় না একটি কারণেই, আমরা *দুনিয়াদারির* লোক, আর তারা *আল্লাহর পথের লোক*৷ আমার মায়া হয় এ বাড়ির সবার জন্য। আল্লাহর পথে বড় বিভ্রম, বড় ফাঁকি। ফাঁকি দিয়ে আমাদের সবাইকে সারা দুপুর বসিয়ে রাখা হয়েছে। ফাঁকি দিয়ে আল্লাহ রসুলের বাণী শোনানো হয়েছে। আমাদের কথা দেওয়া হয়েছে মেয়ে-মৌলবি দেওয়া হবে, সেই কথা রাখা হয়নি। আল্লাহর এই পথটি বড় মিথ্যেয় ভরা। মেয়ে-মৌলবি তো আমাদের পাওয়া হয়নিই, বরং অযথা সময় নষ্ট হয়েছে। প্রথমেই যদি বলে দেওয়া হত মেয়ে-মৌলবি পাওয়া যাবে না, আমরা ফিরে যেতে পারতাম কিন্তু আমাদের আশা দিয়ে বসিয়ে মাথায় মস্তিষ্ক ধোয়ার জল ঢালা হয়েছে। আর কার জানিনা, আমার মস্তিস্কের ব্যাপারে আমি অন্তত এইটুকু জানি,এটি এখন আর কোনও জলে নষ্ট হবে না। সাফিনাজ হালিদা আর পারুল বুঝে পায় না এই অদ্ভুত জগতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি। ওদের সামনে লজ্জা হয় আমার। এই শহরের এই অদ্ভুত পীরবাড়িটির এই অদ্ভুত জগত সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না ওদের।

ঘটনাটি মার কাছে বলি। মা বলেন, *মিলাদ পড়াইতে পারে এমন মহিলা খুঁজনের জন্য ওই বাড়িতে গেলি কেন? ওরা তো কেউ ওই এরিয়ার বাইরে যায় না। বাইরে গিয়া মিলাদ পড়ায় না কোনওদিন। যা করে, সব এরিয়ার ভিতরে করে।* তা ঠিক, ওদের সঙ্গে ওই পীরবাড়ির এলাকার বাইরের কোনও মসজিদ মাদ্রাসার সঙ্গেও সম্পর্ক নেই। ওদের সঙ্গে ওই পীরবাড়ির বাইরের কোনও আল্লাহরসুল মানা কোনও মানুষেরও সম্পর্ক নেই। নানা নিজে একজন হাজি মানুষ, সুদূর মক্কা গিয়ে হজ্ব করে এসেছেন, হযরে আসওয়াদে চুমু খেয়ে এসেছেন, মদিনায় হজুরের রওজা শরিফ জিয়ারত করে এসেছেন, জীবনে কোনও রোজা তিনি বাদ দেননি, কোনও নামাজ কাজা করেননি, প্রতিদিন ভোরবেলা উঠে কোরান পড়েন--সেই নানাও পীরবাড়িতে কোনও সম্মান পান না। কারণ পীর আমিরুল্লাহর মুরিদ না হলে কাউকেই গ্রাহ্য করা হয় না ও বাড়িতে, কাউকেই পীরবাড়ির কেউ মনে করে না যে সত্যিকার ঈমানদার। নানা কোনওদিন ওই পীরবাড়িকে পরোয়া করেননি। নিজের ধর্ম নিজে পালন করে গেছেন। পীরবাড়িতে মার যাওয়া নিয়েও তিনি বলেছেন, *আল্লাহরে নিজের ঘরে বইয়া ডাকো,আল্লাহ শুনবেন। দৌড়াদৌড়ি করার দরকার নাই।*

মেয়ে-মৌলবি আনতে যাওয়া চারজন ডাক্তার হতে যাওয়া মেয়েকে আল্লাহর পথে যাওয়ার দীক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার কোনও খবর রাষ্ট্র হয় না, তবে ওই *এরিয়ায়* অন্তত এমন বলার সুযোগ হয়েছে যে আজকাল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার সবার চোখ খুলছে, দুনিয়াদারিতে মেতে থেকে যে আখেরাতে কোন ফল পাওয়া যাবে না, তা তারা বুঝে গেছে বলে আল্লাহর পথে আসার চেষ্টা করছে। ওসব ছেদো কথা আমি কানে দিই না। তবে পীরবাড়ির যে কথাটি শুনে আঁতকে উঠি তা হল পীর আমিরুল্লাহ একটি বিয়ে করেছেন। নিজের চেয়ে চল্লিশ বছর বয়সের ছোট এক মেয়েকে। আইবুড়িদের মধ্য থেকে একজনকে।

কি মা, তার না বউ আছে। আরেকটা বিয়া করল কেন? ঠোঁটে বাঁকা হাসি আমার।

মা ইতস্তত করেন উত্তর দিতে, থেমে থেমে বলেন,--*মাওই সাবের বয়স হইয়া গেছে। এখন আর তালই সাবের যত্ন করতে পারেন না তাই।*

তার যত্ন করার লাইগা বাড়ি ভর্তি মানুষ। বিয়া কইরা নিতে হয় নাকি যত্ন করতে হইলে?

তালই সাবরে এখন ধইরা ধইরা পেশাবপায়খানায় নিতে হয়। রাইতেও যাইতে হয় ঘরের বাইরে। এই সব পরিষ্কারের জন্য একজন তো লাগে!

কেন, কাজের লোকের ত অভাব নাই ওই বাড়িতে, তারাই তো করতে পারে। আর তার নাতি নাতনিতে বাড়ি ভরা। তারা করতে পারে।

তাদের কাজ আছে না?

কী কও এইসব! পীরের কাজই ত তাদের আসল কাজ। পীরের কাজ করলেই ত আল্লাহর কাজ করা হয়।

রাতের বেলায় ত ঘুমায় ওরা!

সারা রাত কি তোমার হুজুর পেশাবপায়খানা করে নাকি?

বাজে কথা কইস না।

এক ঘরেই তো থাকে তারা দুইজন। এক বিছানায় তো শোয়, তাই না? খালি গু মুত ফালায় নতুন বউ তাতো না।

মা অপ্রস্তুত। আমার বিশ্বাস মা নিজেও হয়ত পীরের শেষ বয়সে এই বিয়ে করার ব্যাপারটির কোনও কারণ খুঁজে পাননি। কারণ না পেলেও পীরের পক্ষ নেওয়া মার একরকম দায়িত্ব।

এত চুক্ষা চুক্ষা কথা কইস না আল্লাহর ওলি সম্পর্কে। গুনাহ হইব। মা বলেন।

গুনাহ গুনাহ গুনাহ। এই গুনাহ শব্দটি আমি বহুকাল শুনে আসছি। গুনাহ শব্দটিকে একসময় খুব ভয় হত, শব্দটির ওপর পরে রাগ হয়েছে, এখন ভয় রাগ কিছুই হয় না।

গুনাহ হোক। গুনাহ হইলে তো ভালই। গুনাহ হইলে দোযখে যাব। দোযখে গেলে তো তোমার প্রিয় দিলীপ কুমার মধুবালা, তোমার উত্তম কুমার সুচিত্রা সেনরে দেখতে পাবো। তোমার ছবি বিশ্বাস পাহাড়ি সান্যালকে দেখতে পাবো। আর তুমি যে বেহেসতে যাইবা, দেখবা তো সব কাঠমোল্লাদেরে। চাইরটা বিয়া করা শয়তান বদমাশ মোল্লাদেরে দেখবা। মানুষরে কষ্ট দিছে, হিংসামি করছে, কুটনামি করছে, মানুষরে খুন করছে। একশ একটা ধর্ষণ করছে, বউদেরে জ্বালাইছে, পিটাইছে, কিন্তু সারাদিন আল্লাহ আল্লাহ জপছে বইলা বেহেসত পাইছে। কি সুখটা পাইবা তুমি শয়তানগুলার সাথে থাকতে! তারচে গুনাহ কইরা দোযখের খাতায় নাম লেখাও। আইনস্টাইনের মত পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানী পাইবা, নেলসন ম্যান্ডেলারে পাইবা, পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানী, বড় বড় গায়ক, নায়ক সবার সান্নিধ্য পাইবা। আর বেহেসতে গিয়া তো দেখবা বাবা বাহাত্তরটা হুরির সাথে লীলা করতাছে। আর তুমি পাইছ এক বাবারেই, যে তোমার দিকে সারাজীবন ফিইরা তাকায় নাই। এক রাজিয়া বেগমের সাথে বাবার সম্পর্ক তুমি সহ্য করতে পারো না, বেহেসতে ওই বাহাত্তরটার সাথে বাবার সম্পর্ক সহ্য করবা কেমনে? কোন সুখ পাওয়ার আশায় বেহেসতে যাইতে চাও? কিসের জন্য নামাজ রোজা কর?

মা অসহায় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকেন আমার দিকে। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাঁর দুচোখে আতঙ্ক।

তুই কি আল্লাহরে একটু ডরাস না? ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন মা।

আমি হেসে উঠি। হাসতে হাসতে বলি,-- *আল্লাহ কি ভাল কাজটা করছে যে আল্লাহরে ডরাইয়াম? মেয়েদের স্থান পুরুষের স্থানের চেয়ে নিচে, এইটা আল্লাহর নিজের কথা। যেহেতু পুরুষ টাকা কামাই করে, তাই পুরুষের অধীনে থাকতে হবে মেয়েদের। আজকে যদি মেয়েরা টাকা কামাই করে, তাইলে মেয়েদের অধীনে পুরুষদের থাকার কথা তো আল্লাহ কয় নাই!*

কি কইতাছস এইগুলা নাসরিন? তর ত ঈমান নষ্ট হইয়া গেছে!! মার বিস্ফারিত চোখ।

বিস্ফারিত চোখের সামনেই বিস্ফোরণ ঘটে আমার, ভেতর থেকে শ্লেষ কণ্ঠে,ঘৃণা কণ্ঠে আমি বলে যেতে থাকি

আমি বুঝি না তুমি মেয়ে হইয়া কি কইরা মেয়েদের প্রতি এত অপমান মাইনা নেও। পুরুষেরা কোরান হাদিস মাইনা চলতে পারে, তাদেরে মর্যাদা দেওয়া হইছে। মেয়ে হইয়া কি করে মানো? মেয়ে হইয়া কি কইরা মানো যে তুমি পুরুষের চেয়ে নিম্নমানের। তোমার স্বামীর তোমারে পিটানোর অধিকার আছে। তোমার বাপের সম্পত্তি তোমার ভাই যা পাবে, তা তোমার পাওয়ার অধিকার নাই। কি কইরা মানো যে পুরুষেরা তালাক কইলে মেয়েদের তালাক হইয়া যাবে। আর তোমার তালাক কওয়ার অধিকার নাই। কি কইরা মানো যে তুমি বাহাত্তরটা সঙ্গী পাইবা না বেহেসতে, তোমার স্বামী পাইব শুধু। যেহেতু সে পুরুষ!কোর্টে সাক্ষী দিতে যাও, তোমার একার সাক্ষীতে হবে না, দুইজন মেয়ে সাক্ষী লাগবে। অথচ পুরুষ সাক্ষী হইছে দুইজন পুরুষ লাগে না, একজন হইলেই চলে। ইহজগতেও পুরুষের জাত সুখে থাকবে, পরকালেও। তোমার জন্য, আমার জন্য, মেয়েদের জন্য এই জগতেও আল্লাহ ভোগান্তি রাখছে, ওই জগতেও। এই হইল তোমার আল্লাহর বিচার। এই আল্লাহরে নমো নমো করো কি বুইঝা?

মা আমাকে থামান ফুঁপিয়ে কেঁদে। দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, *যা কইছ কইছ আর কইও না। এখন যাও অযু কইরা আসো, আল্লাহর কাছে তওবা করো।*

তওবা করবো কেন? আমি তো কোনও ভুল করি নাই।

মা নিশ্চিত আমি দোযখের আগুনে পুড়ে মরব। আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে আর দেখেন না মা, দেখেন গনগনে আগুনে আমি জ্বলছি পুড়ছি। পুঁজ আর পচা রক্ত পান করছি। সাপ বিচ্ছু কামড়াচ্ছে আমার সারা শরীর। মাথার একহাত ওপরে সূর্য নেমে এসেছে। ফুটন্ত পানিতে আমাকে চোবানো হচ্ছে। এই হৃদয় বিদীর্ণ করা দৃশ্যটি কল্পনা করে মা আতঙ্কে কেবল ফুঁপিয়ে নয়, হাঁউমাউ করে আড়াই বছরের বাচ্চার মত কেঁদে ওঠেন।

পরীক্ষার আগে আগে বাবা যেচে কথা বললেন এসে। *ঠাইস্যা লেখাপড়া কর। আর উপায় নাই।*

আর উপায় নাই সে আমিও জানি। কবিতাকে ছুট্টি দিয়ে দিয়েছি সেই কবে, এখন রোগ আর রোগী নিয়ে দিন কাটে, কেবল দিন নয়, রাতও। হাসপাতাল আর বাড়ি, বাড়ি আর হাসপাতাল, এই করে দিনের বেশির ভাগ যাচ্ছে, আর রাতও যাচ্ছে না ঘুমিয়ে। মা গরম দুধ এনে সামনে রাখছেন, দুধ পড়ে থেকে নষ্ট হতে থাকে, মা বলেন, *দুধটা খাইয়া লও মা, খাইলে মাথায় পড়া ঢুকব।* যখন মাথা ঘামাতে থাকি লেখাপড়া নিয়ে, মা বেড়ালের মত পা টিপে টিপে এসে, যেন কোনও শব্দে আমার মনোযোগ নষ্ট হয়, মাথায় ঠাণ্ডা তেল দিয়ে যান, ফিসফিস করে বলেন, *মাথাটা ঠাণ্ডা থাকব।*

এত রোগ বালাই নিয়ে পড়ে থেকে মনে হয়, পৃথিবীতে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে, কেবল আমিই তার খবর জানি না। মাঝে মাঝে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়ি, উঠোনের খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙি। অবকাশ যেভাবে চলে, চলছে। উত্থান পতনে। ভাল মন্দে। সুখে অসুখে। সুহৃদ হাঁটতে শিখেছে, দৌড়োতে, কথা বলতে। বাড়ির সবাইকে ভালবাসতে শিখেছে, অবশ্য একটি জিনিস তাকে শিখিয়ে দেওয়া হলেও শেখেনি সে হল তার বাবা মাকে আপন ভাবতে। তাদের কোলে কাখে যেতে। তারা ঢাকা নিয়ে যেতে চাইলে ঢাকা যেতে। আরেকটি ছেলে শুভ, দাদার চেয়েও বেশি সে হাসিনার ছেলে। দেখতে হাসিনার মতই কাঠি। দিনে ছবেলা খেয়েও কাঠি। এই দুই কাঠির গায়ে মাংস বাড়াতে বাবা থলে ভরে মাছ মাংস কেনেন। দুই কাঠির পাতে বেশির ভাগ মাছ মাংস চলে যায়। তবু কাঠিরা কাঠিই থেকে যায়। মা বলেন, *আসলে শরীরের গঠনই ওদের ওইরকম।* বাবার চাপে হাসিনার বিএড করা হয়েছে। এখন সে বিএবিএড, যে কোনও সময় যে কোনও ইশকুলে একটি মাস্টারির চাকরি পেয়ে যেতে পারে। বাবার চাপ তাপ ভাপ ইয়াসমিনের ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষা দেওয়াতে পারেনি। শেষ অবদি আনন্দমোহনেই উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হয়েছে।

বোটানি পইড়া কি হইবি রে?

বোটানিস্ট হইয়াম। ইয়াসমিনের খেয়ালি উত্তর।

ওই আর কি, মালি হইবি। হা হা।

ইয়াসমিন মালি না হলেও অনেকটা মালির মতই হয়ে গেল। বাড়ির গাছগুলো দিব্যি বাড়ছে, কিন্তু ওদের পাতা দেখে দেখে বলছে, এই গাছের এই রোগ, ওই গাছের ওই রোগ।

রোগ সারানোর ওষুধ কি? এন্টিবায়োটিক গুইলা খাওয়াবি নাকি?

ইয়াসমিনকে অপদস্থ করায় বাবার চেয়ে আমি কম যাই না। অপদস্থ ও কতটুকু হয় তা বোঝা যায় না, কারণ বোটানিতে ভর্তি হওয়ার প্রথম কিছুদিন ওর যে উদ্দীপনার দীপটি ছিল, তা ধীরে ধীরে নিভতে শুরু করেছে। প্রতিদিন কচুরিপানার মত বান্ধবী বাড়ছে ওর, বান্ধবীদের বাড়িতে যাওয়া আসা হচ্ছে। পাড়াতেও ওর জনপ্রিয়তা বেশ। ভাইফোঁটায়, বিয়েতে, জন্মদিনে, বারো মাসের তেরো পুজোয় ওর নেমন্তন্ন থাকে। আমার কোনও নেমন্তন্ন থাকে না পাড়ায়।

ওরা আমারে ডাকে না কেনরে?

তুমি মানুষের সাথে মিশতে পারো না, তাই ডাকে না। সোজা উত্তর।

আমার সীমানা ইয়াসমিনের সীমানার চেয়ে অনেক ছোট। সুহৃদের জন্মদিনে ছোটদা ঢাকার পূর্বাণী হোটেল থেকে বারো পাউন্ডের একটি কেক এনে উৎসবের আয়োজন করলেন। আমার ক্লাসের ছেলেমেয়ে এসেছিল

ছ জন, ইয়াসমিনের নিজস্ব জগত থেকে এল আঠারো জন। ইয়াসমিনকে অনেকটা বাঘের মত মনে হয়, তর্জন গর্জন বেশ, *আঠারো ঘা* দিয়ে দিতে পারে ইচ্ছে করলেই।

হাসিনা সেই আগের মত এখনও *সুহৃদের কেন এটা আছে, শুভর কেন এটা নেই, সুহৃদ কেন আদর বেশি পাচ্ছে, শুভ কেন কম পাচ্ছে*--এসব নিয়ে চিনচিন জিনজিন ঝিনঝিন করে। ঈদে বাড়ির সবার হাতে যার যার কাপড় চোপড় কেনার জন্য বাবা টাকা দিলেন। শুভ সুহৃদের জন্য সমান অঙ্কের টাকা। আমার আর ইয়াসমিনের জন্য সমান। গীতা আর হাসিনার জন্য সমান। দাদা ছোটদার জন্য সমান। লিলি লিলির মা নার্গিস আর ঝর্ণার জন্য সমান। মার জন্য কিছু নয়। মাকে ছোটদা দেবেন, যেহেতু মা ছোটদার ছেলেকে লালন পালন করছেন। অনেকটা পারিশ্রমিক দেওয়ার মত বছরে একটি বা দুটি সুতি শাড়ি। ঈদে আমার আগের মত উৎসব করা হয় না। ঈদে এমন কি আমি নতুন জামাও পরি না। ঈদের এই গরু জবাই, নতুন জামা কাপড়, পোলাও মাংস জর্দা সেমাই, আমার কাছে বড় অর্থহীন লাগে। একটি জিনিসই ভাল লাগে, বালতি ভরে মাংস নিয়ে বাইরে বসে কালো ফটকে ভিড় করা শত শত ভিখিরিদের থালায় টোনায় হাতে মাংস দিতে। ভেতরের বারান্দায় বসে মাংস কাটা আর ভাগ করায় দাদার উৎসাহ সব চেয়ে বেশি। তিনি সারাদিন ধরে তাই করেন। নিজেদের জন্য, ধনী প্রতিবেশিদের জন্য, আত্মীয় স্বজনদের জন্য ভাল ভাল মাংস রেখে রগতেলহাড়সর্বস্ব মাংসগুলো দেওয়া হয় ভিখিরিদের। ভিখিরিদের কাছে মন্দ বলে কিছু নেই। তারা যা পায় *শুকুরআলহামদুলিল্লাহ* বলে লুফে নেয়।

রোজা আসে, রোজা যায়। রোজায় বিশ্বাস করি না বলে রোজা রাখি না। সন্ধেবেলায় ইফতার খেতে ভাল লাগে, খাই। অবশ্য সাইরেন পড়ার জন্য অপেক্ষা আমার সয় না। পিঁয়াজি বেগুনি ছোলাভাজা সাজিয়ে রাখা হয় টেবিলে, খেতে স্বাদ জিনিসগুলোর। আমি ফেলে রাখি না। বাবা, আমার খুব অবাক লাগে, পীরবাড়িতে কাফের হিসেবে পরিচিত হলেও, নামাজ না পড়লেও, কোরান হাদিস ইত্যাদিতে কোনও আগ্রহ না দেখালেও পুরো মাস রোজা রাখেন। রোজা রাখার কারণ সম্পর্কে বাবাকে কখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমার বিশ্বাস বাবা রোজা রাখেন দশজনের একজন হতে। তাঁর বয়সী সবাই যখন রোজা রাখেন, তিনিও রাখেন। রাখলে প্রশ্নহীন নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে যাপন করতে পারেন বলে রাখেন। দাদাও রোজা রাখেন, যদিও ঈদের নামাজ ছাড়া আর কোনও নামাজ তিনি

পরেন না, বাবার মত। ছোটদা ঈদের নামাজে যান, কিন্তু সারা বছর নামাজের নাম নেই, রোজার নাম নেই। হাসিনা আল্লাহ বিশ্বাস করলেও, নামাজ রোজায় বিশ্বাস করলেও রোজা রাখে না, রাখে না কারণ তার *কাঠিতৃ* এখনও ঘোচেনি। রোজা রাখলে, তার ভয়, হাড়ের ওপর যে চামড়াটি আছে, সেটিও ঝুরঝুর করে ঝরে যাবে। এরশাদ সরকার দেশে একটি নতুন নিয়ম চালু করেছেন, রোজার সময় দিনেরবেলা খাবার দোকানগুলো বন্ধ থাকবে। এ কি আশ্চর্য, সবাই কি রোজা রাখে নাকি! কত মুটে মজুর কুলি, দুপুরবেলা না খেলে কাজই করতে পারবে না, তারা ক্ষিধে পেলে কি করবে? হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদের কথাও তো ভাবতে হবে! নাস্তিকদের কথাও। দেশ তো কেবল মুসলমানের নয়। মুসলমান যারা আছে, সবাই তো রোজা রাখে না। খাবার দোকান বন্ধ থাকলে চলবে কেন! আমি অবশ্য প্রতিবাদ হিসেবে রোজার সময় মুখে একটি চুইংগাম রাখি। সারাদিন চিবোতে থাকি চুইংগামটি। কলেজ ক্যান্টিনে ঘন ঘন চা পান করে আসি। কলেজের ক্যান্টিনটি কলেজের ভেতর হওয়ায় পুলিশ এসে হানা দেয় না, রক্ষে। এরশাদের এই নিয়মে জামাতে ইসলামির লোকেরা বেজায় খুশি, কিন্তু কেউ কেউ যারা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, আপত্তি করছেন। কারও আপত্তি শোনার লোক নন এরশাদ। তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান যে করেই হোক। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত ভীরুতা দেখালে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁকে বাহবা দেবে এরকম বিশ্বাস নিয়ে তিনি দেশ চালাচ্ছেন। এরশাদকে কখনও আমার ধার্মিক লোক বলে মনে হয় না। মুখে গাম্ভীর্য এনে তিনি যতই ধর্মের কথা বলুন, যতই তিনি সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম নামে নতুন একটি জিনিস আমদানি করুন এবং সেই রাষ্ট্রধর্মকে ইসলাম বলে ঘোষণা করে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সর্বনাশ করুন, আমার মনে হয় লোকটি দেশের মানুষকে ফাঁকি দিচ্ছেন, বোকা বানাতে চাইছেন। লোকটি নিরক্ষর অশিক্ষিত ধর্মভীরু মানুষের ভোট চাইছেন, আর কোনও উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে মেতে থাকলে যে আমার চলবে না, তা বাবা আমাকে বলেন। পরীক্ষা যখন গায়ে জোরে ধাক্কা দিল, রাত তিনটেয়, চারটেয় আমাকে ঠেলে তোলেন, পড়তে। আমি হুড়মুড়িয়ে বিছানা ছেড়ে পড়ার টেবিলে বসি, মা ওই রাতে উঠে ফ্লাস্কে চা বানিয়ে রেখে যান টেবিলে। আমার লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেলে বাবা শশব্যস্ত হয়ে মৌখিকে অন্য মেডিকেল থেকে পরীক্ষক কারা আসছেন, বাবার চেনা কিনা, বাবার ছাত্র কিনা, বাবার সহপাঠী কি না, খোঁজ নেন। খোঁজ নিয়ে তিনি পেয়ে যান যে কেউ কেউ তাঁর ছাত্র ছিলেন কোনও এক কালে। তাঁদেরই বাবা কাঁচুমাচু মুখ নিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলে আসেন আমার মেয়েটা পরীক্ষা দিচ্ছে এবার, *একটু দেখবেন।* একটু দেখবেন, এর মানে এই যে মেয়েটাকে ইচ্ছে করে কম নম্বর দেবেন না। আসলে কেউ কাউকে পাশ করিয়ে দিতে পারেন না। পারেন না, কারণ একজনের হাতে দায়িত্ব থাকে না পাশ করাবার। *দেখবেন* এর অনুরোধটি হল, ইচ্ছে করে যেন ফেল করাবেন না। ইন্টারনাল পরীক্ষকরা সবাই যে আমার ওপর খুশি তা নয়। সালাম না দেওয়ার কারণে আমাকে বেশির ভাগ অধ্যাপকই *বেয়াদব* বলে জানেন। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা চলে। দীর্ঘদিন ধরে বাবা দুশ্চিন্তায় থাকেন। দীর্ঘদিন ধরে পাশ করব না এই আশংকা নিয়ে দুরুদুরু বক্ষে শুষ্ক হয়ে ওঠা গলদেশ নিয়ে ভয়ে ঘন ঘন তেষ্টা পাওয়া পেচ্ছাব পাওয়া আমি পরীক্ষা দিই মৌখিক। মৌখিক পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে মনে হয় না। মনে হয় যেন পুলসেরাত পার হচ্ছি। সরু একটি সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটছি। একটু কাত হলাম কি ধপাশ। ধপাশ একেবারে সাপ বিচ্ছু আর দাউ দাউ আগুনের মধ্যে। ভাল ছাত্র রাজিব

আহমেদের চিকিৎসাজ্ঞানে টইটম্বুর খাতা পড়ে পরীক্ষা দিয়ে হয়ত লিখিত পরীক্ষায় ভাল করা যায় কিন্তু মৌখিকের দুশ্চিন্তায় আমার মুখের ভাষা হারিয়ে যেতে থাকে। মাথা থেকে কর্পূরের মত উড়ে যেতে থাকে যা জানি তাও। এই করে পরীক্ষা হয়। ওয়ার্ডের ভেতর সারি সারি রোগীর মাঝখানে বিশাল টেবিল পেতে অধ্যাপকরা বসে থাকেন। অধ্যাপকদের অধ্যাপক মনে হয় না, যেন এক একজন আজরাইল। গলা যে কার কাটা যাচ্ছে, কারও বোঝার উপায় নেই। পরীক্ষা শেষ হয়, কিন্তু জানা হয় না, আমার মুণ্ডুটি আছে কি না এখনও ধড়ে।

পরীক্ষার পর ঢাকা যাওয়ার জন্য উতলা হই। কিন্তু রুদ্র ঢাকায় নেই। মিঠেখালি থেকে ফেরেনি। ময়মনসিংহে বসে রুদ্রর ঢাকা ফেরার অপেক্ষা করতে থাকি। অপেক্ষা জিনিসটি বড় অশান্তির। অশান্তির হলেও বইখাতা নিয়ে আপাতত আর বসতে হচ্ছে না, এই এক স্বস্তি আমার। হাসিনা বি এড পাশ করার পর এমএডএ ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন বাবা। শুভকে মার দায়িত্বে রেখে প্রতিদিন কড়া রঙের শাড়ি পরে মুখে নানারকম রং লাগিয়ে কলেজে যায় সে। মার হাতে এখন দুজনের লালন পালনের ভার। এক হাতে শুভকে সামলাচ্ছেন, আরেক হাতে সুহৃদকে। হাসিনা কলেজ থেকে ফিরেই প্রথম দেখে শুভর যত্নে কোনও ত্রুটি হয়েছে কি না। না, মা কোনও ত্রুটি রাখেন না, রাখেন না এই কারণে যে শুভর যত্নের ত্রুটি হলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধাবে হাসিনা। বাড়িটিকে কলহমুক্ত রাখতে মা ত্রুটির ত্রিসীমানা মাড়ান না। সুহৃদ আর শুভ দুজনকেই গোসল করিয়ে দুজনের গায়ে পাউডার মেখে জামা পরিয়ে দুজনকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন মা, হাসিনা এসেই শুভকে ছোঁ মেরে নিয়ে বলল, *ইস ছেলেটা ঘাইমা গেছে। ফ্যানের নিচে তো সুহৃদরে শোয়ানো হইছে, শুভরে ফ্যানের থেইকা দূরে শোয়ানো হইল কেন?* ঘরের সিলিংএ একটি মাত্র পাখা। পাখার তলে শুভও ছিল, সুহৃদও ছিল। কিন্তু সুহৃদ নাকি পাখার কাছাকাছি ছিল বেশি। মা বলেন, *এইগুলা কি কও ! শুভ গড়াইয়া কিনারে গেছে।* মা পছন্দ করেন না ছেলের বউএর চিৎকার চেঁচামেচি। কারণ যে কোনও চেঁচামেচিতে দাদা এসে উপস্থিত হন, এবং হাসিনা যদি অসঙ্গত বা অযৌক্তিক কোনও কথা বলে, দাদা তা নতমস্তকে মেনে নেন। দাদা রায় দিয়ে দিলেন, মা ইচ্ছে করেই শুভকে কষ্ট দেওয়ার জন্য পাখার ঠিক তলে রাখেননি। মা চোখের জল গোপনে মোছেন। গোপনে মুছেই সুহৃদের চেয়ে চতুর্গুণ যত্ন করেন শুভর। গোসল করিয়ে যখন চুল আঁচড়ে দেন, সিঁথিটিও লক্ষ রাখেন যেন একেবারে সোজা হয়। কারণ একবার সিঁথিটি এক চুল পরিমাণ বাঁকা ছিল বলে হাসিনা বলেছে, *সুহৃদের সিঁথি তো বেঁকে নাই, শুভরটা বেঁকল কেন?* এসব প্রশ্নের উত্তর মার কাছে নেই। নেই বলে মার সারা শরীরে ভয়। সারা মনে ভয়। এমএড ক্লাস করে গোড়তোলা জুতোর ঠক ঠক শব্দ তুলে বাড়ি ঢোকে হাসিনা। এসেই গলা ছেড়ে ঝর্ণাকে ডাকে, ঝর্ণা দৌড়ে যায় কাছে। হাসিনা খবর নেয় বাড়ির সব ঠিকঠাক আছে কি না। বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে ঝর্ণা তার জানা এবং অজানা দু খবরই বেশ অনেকটা সময় নিয়েই দেয়। শুভর কাপড় চোপড় ধোয়া, শুভর বোতলবাটি ধোওয়া, শুভর বিছানা গোছানো, খেলনা গোছানো ইত্যাদি সারা হয়ে গেলে ঝর্ণা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকে। হাসিনার কড়া নির্দেশ শুভর কাজ ছাড়া বাড়ির অন্য কাজে হাত না দেওয়ার। অন্য কাজে হাত দিতে হয় লিলির মার, লিলির, ওদের দিয়েও যখন কুলোয় না, নার্গিসের। এই অন্য কাজের মধ্যে হাসিনার কাপড় ধুয়ে দেওয়া,ইস্ত্রি করে দেওয়া, তাকে রেঁধে বেড়ে খাওয়ানো, তার এঁটো বাসন পত্র ধোয়া সবই আছে। লিলি আর লিলির মা দুদিনের জন্য

গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল, তখন নার্গিসকে সুহৃদের কাজ ফেলে বাড়ির রান্না বান্না,কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা ইত্যাদি কাজ করতে হয়েছে। ঝর্ণা বারান্দায় বসে থেকেছে।

ঝর্না শুভ কই?

শুভ খেলে।

শুভ খেলে কেন? শুভর তো এখন ঘুমানির কথা! মা ঘুম পাড়ায় নাই কেন শুভরে?

দুপুর দেড়টার জায়গায় পৌনে দুটো হয়ে গেছে, শুভ ঘুমোয়নি। কি ব্যাপার? শুভর তো দেড়টার সময় ঘুমোনোর কথা। ঘড়ি দেখে ঠিক বারোটায় দুধ খাবে, একটায় মুরগির সুপ খাবে, একটা দশে ভাত মাছ সবজি খাবে, খেয়ে দেড়টায় ঘুমোবে। শুভকে দুধ সুপ ভাত সবই খাওয়ানো হয়েছে কিন্তু না ঘুমিয়ে ছেলে খেলতে শুরু করেছে।

হাসিনার কর্কশ কণ্ঠ, *এইরকম অবস্থা হইলে তো আমার কলেজে যাওয়া হবে না। বাসায় বইসা বাচ্চা পালতে হবে।*

হাসিনা পরদিন কলেজে যায় না।

কি শুভর মা, কলেজে যাইবা না?

নাহ! আজকে শরীরটা ভাল লাগতাছে না বলে সারাদিন শুয়ে থেকে শুভকে বিকেলে মার কোল থেকে তুলে নিয়ে নিজের ঘরে দুঃখী মুখ করে বসে থাকে হাসিনা।

বাবা বাড়ি ফিরেই আজকাল বৌমা বৌমা বলে হাসিনাকে ডাকেন, প্রতিদিনই তিনি খবর নেন ক্লাস কেমন হচ্ছে, পড়াশোনা সে ঠিক ঠিক করছে কি না।

হাসিনা এবার মুখ মলিন করে বলল, *যাইতে পারি নাই কলেজে।*

মানে? যাইতে পারো না ই মানে? কেন যাইতে পারো নাই? উত্তেজনায় বাবা চশমা খুলে ফেললেন।

শুভরে দেখতে হয়, তাই। ঝর্না তো আর শুভরে গোসল করাইতে খাওয়াইতে পারে না।

শুভর দাদি আছে না এইসব করার জন্য?

হাসিনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। *না,মা তো সময় পান না। মার তো সুহৃদরে দেখতে হয়।*

যাও বেডিরে ডাকো।

কোন বেডিরে? লিলির মারে?

বাবা খেঁকিয়ে ওঠেন, *লিলির মারে ডাকবা কেন? মাথায় বুদ্ধি সুদ্ধি নাই নাকি? নোমানের মারে ডাকো।*

হাসিনা মাকে ডেকে আনে। ঠোঁটে চিকন হাসি তার।

বাবা দাঁতে দাঁত ঘঁষে মাকে বলেন, *ছেলের মা যায় কলেজে,ছেলেরে তুমি রাখবা না তো রাখবে কে?*

আমি তো রাখিই, শান্ত গলা মার, *আমার গোসল করানি খাওয়ানি যদি শুভর মার না পছন্দ হয়, তাইলে আমি কি করতাম?*

তুমি কি করতা মানে?

মানুষ রাইখা লন শুভরে পালনের লাইগা।। আমি দুই বাচ্চা আর কুলাইতে পারতাছি না।

দাদি থাকতে ছেলে কাজের মানুষের কাছে বড় হইব?

কামালরে খবর দেন। সুহৃদরে নিয়া যাক। আমার নিজের অসুখ। নিজের একটু বিশ্রাম নাই, ঘুম নাই। এত পারতাছি না।

দেখ দেখ কথার ছিরি দেখ। বাবা হাসিনার দিকে চেয়ে মাকে ইঙ্গিত করেন বাঁকা চোখে, বাঁকা ঠোঁটে।

চিকন হাসিটি দীর্ঘদীর্ঘদিন একটি নতুন বিচ্ছুর মত সেঁটে থাকে হাসিনার ঠোঁটে।

সুহৃদকে ছোটদার কাছে দিয়ে দেওয়াও হয় না। শুভর জন্য আলাদা *কাজের বেটি* রাখাও হয় না। মা ই একা লালন পালন করতে থাকেন দুই নাতি। বালতি ভর্তি কাপড় ফেলে রাখে হাসিনা। লিলির মার তা ধুতে ধুতে বেলা যেতে থাকে, মাকে দৌড়ে রান্নাঘরে যেতে হয়। মাকে রাঁধতে হয় বাড়ির সবার জন্য। মা পারেন না লিলির মাকে হাসিনার কাপড় ধোয়া থেকে তুলে আনতে। আমার মনে হতে থাকে, মা হাসিনাকে ভয় পাচ্ছেন। বাবাকেও মা সম্ভবত এত ভয় পান না। মার ভয় দাদাকে নিয়ে, দাদা যদি আবার বাড়ি ছেড়ে চলে যান, দাদা যদি হাসিনার মন খারাপ দেখলে অখুশি হন। দাদা যদি মাকে আর মা বলে না ডাকেন! মার রক্ত যাওয়া শরীরটি দুর্বল হতে থাকে। অথচ এই দুর্বলতা নিয়েই মা ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন সংসারকাজে। বাবার কাছে বিনিয়ে বিনিয়ে বলেন, *আমার ত রক্ত নাই শইলে আর। আমার তো কিছু ভাল খাইতে হইব। এক পোয়া কইরা দুধ, দুইটা কলা, দুইটা ডিম আমার লাইগা কি দিবেন?* বাবা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মার স্পর্ধা দেখেন। মা যত না মার দাবিতে তার চেয়ে বেশি শুভকে রাখার দাবি নিয়ে বলেন, *কি রে নোমান, তর বাপে তো কিছু দেয় না, তুই কি আমার লাইগা একটু দুধ কলার ব্যবস্থা করতে পারবি? আমার ত শইল ভাইঙ্গা যাইতাছে।*

দাদা হাসতে হাসতে জিভ কেটে বলেন, *কি যে কন মা। আপনার শইল কই ভাঙতাছে! বরং খুব বেশি মোটা হইয়া যাইতাছেন। ডায়েট কন্ট্রোল করেন। খাওয়া কমাইয়া দেন।*

পাইলসের কি কোনও ওষুধ তর দোকানে আছে?

নাহ। পাইলসের কোনও ওষুধ নাই।

ওষুধ নেই। সাফ কথা। দাদা এখন বাবার ওষুধ ব্যবসার কর্তা। রমরমা ব্যবসা তার। চমৎকার সাজিয়ে নিয়েছেন দোকান। হাসপাতালে ওষুধের যোগান দেন। বড় বড় ক্লিনিকেও দেন। ওদিকে বাবা নিজের চেম্বারটির পরিসরও বড় করেছেন। এক্সরে মেশিন বসিয়েছেন। মাইক্রোসকোপ কিনে প্যাথলজি বসিয়েছেন। জুরিসপ্রুডেন্স বিভাগের অধ্যাপক আবদুল্লাহকে বাবা তাঁর প্যাথলজিতে অবসরে বসতে বলেছেন, বাড়তি আয়ের লোভে আবদুল্লাহ আসেন এখানে। বাবার চেম্বারে কোনও কারণে গেলে রোগীর ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকতে হয়। গ্রামের দরিদ্র রোগীর ভিড়ই বেশি। কেউ পেট ব্যথা নিয়ে এলেও দেখি বাবা বুকের এক্সরে করতে দিচ্ছেন। মল মুত্র পরীক্ষা করতে দিচ্ছেন। কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে থাকা এক বুড়ো এল ধোবাউড়া থেকে, বাবা এক্সরে করে বলে দিলেন *যক্ষা।* বুড়োকে জিজ্ঞেস করি, *কবে থেইকা রক্ত যায়?* কোটরাগতে চোখ ক্লান্তিতে নুয়ে আসে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, *আইজ দেড় বছর।*

যখন রক্ত যাওয়া আরম্ভ হইল তখন আসলেন না কেন?

আমু যে টেকা কই বইন? ধার কর্জ কইরা আইলাম শহরে।

আপনাদের গ্রামে ডাক্তার নাই?

না।

গ্রামে গঞ্জে ডাক্তার থাকলেও লোক চলে আসে বাবার কাছে, ভাল ডাক্তার হিসেবে বাবার খুব নাম। শহরের পুরোনো লোকেরা এখনও অসুখে বিসুখে বাবাকে ডাকেন।

বাবার নির্দিষ্ট কোনও ফি নেই, যে যা দেয়, তিনি তাই নেন। কেউ পাঁচ টাকা দিয়ে বিদেয় হয়, কেউ দু টাকা। বাবা কেবল একটি অনুরোধই করেন রোগীদের, যেন পাশের আরোগ্য বিতান নামের ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনে নিয়ে যায়। মলমুত্রথুতুকফ পরীক্ষা করিয়ে এক্সরে করিয়ে অনেকের টাকা থাকে না ওষুধ কেনার। ফিরে যায়। এরকম ফিরে যেতে থাকা যক্ষা রোগিটিকে থামিয়ে আমি আরোগ্য বিতানে নিয়ে দাদাকে বলি ওষুধ মাগনা দিতে। দাদা তাচ্ছিল্য করেন, *পাগল হইছস?* নিজের পকেটের টাকা বের করে দিই, দাদা সে টাকা গুনে নিয়ে ওষুধ দেন। আজকাল তিনি টাকা গুনতে পছন্দ করেন খুব। অবসর হলেই তিনি ড্রয়ারে সাজিয়ে রাখা টাকাগুলো পুনরায় গোনেন, টাকাগুলোর একদিকে ধানের শিষ, আরেক দিকে মসজিদ, সব টাকার ধানের শিষকে ধানের শিষের দিকে রাখেন, মসজিদকে মসজিদের দিকে। এই টাকা থেকে সংসারের কোনও খরচ হয় না। যা খরচ হয় তা হাসিনার শখ মেটাতে, তার শাড়ি গয়নায়,তার মেকআপে, চেকআপে। ইয়াসমিন মাঝে মাঝে আরোগ্যবিতানে নামে রিক্সাভাড়ার দুটো টাকা নিতে, দাদা ড্রয়ারে তালা দিয়ে চাবি পকেটে রেখে দুহাত দুগালে রেখে উদাস বসে থাকেন, ইয়াসমিনকে বলে দেন, *বিক্রি টিক্রি নাই, এহনও বউনিই করি নাই।*

যক্ষা রোগিটি ওষুধ পেয়ে কৃতজ্ঞতায় মিইয়ে যায়। রাতে আর সে ধোবাউড়া ফিরবে না, থেকে যাবে জুবলিঘাটের *চিৎকাত* হোটেলে। হোটেলে লম্বা টানা বিছানা পাতা, ভাড়া বেশি নয়,চিৎ হয়ে শুলে আটআনা, কাত হয়ে শুলে চারআনা। হোটেলগুলোয় লোকের গিজগিজ ভিড়, গ্রাম থেকে শহরে ডাক্তার দেখাতে,মামলা করতে আসা লোকেরা খুব দূরের যাত্রী হলে দিন ফুরোলে আর নদী পার হয় না, ঘাটের হোটেলে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে নৌকো ধরে।

মার পাইলসের চিকিৎসা হয় না। মার ইদানিং ধারণা জন্মেছে, মার রোগটি পাইলস নামক কোনও সাধারণ রোগ নয়, দুরারোগ্য কোনও রোগ এটি। মার সংশয় নিয়ে মা থাকেন, কারও সময় নেই রোগশোক নিয়ে *ফালতু* কথা শোনার। আমার আর্তচিৎকার *ফালতু* হওয়ার আগে, নিজেই ব্যবস্থা নিই। এনাল ফিশারের যন্ত্রণা যখন আমাকে ধরল, বেদনানিরোধক *নিউপারকেইনল* মলম ব্যবহার করেও সে যন্ত্রণা যখন কমেনি, হাসপাতালের সব চেনা ডাক্তারদের সামনে গোপনাঙ্গ প্রদর্শন যখন আমার পক্ষে অসম্ভব, অচেনা ডাক্তারের চিকিৎসা পেতে আমি ঢাকা যাই। বড় সার্জন দেখিয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন ছোটদা। কেবিন পাওয়া শক্ত, কেবিন পাওয়ার জন্য মন্ত্রি আমানুল্লাহ চৌধুরিকে ধরতে হয়েছে। দুদিন পর অপারেশন। ভর্তি হব হব, তখনই রুদ্র মোংলা থেকে ফিরে আমার চিঠি পেয়ে জেনে যে আমি এখন ঢাকায়, ছোঁ মেরে নয়াপল্টন থেকে তুলে নিয়ে গেল। ছোঁএর সময় ছোটদা বাড়ি ছিলেন না। গীতা হাঁ হয়ে ছিল। তার এক ডাক্তার-মামাতো ভাই ঢাকা মেডিকেলে চাকরি করছে, রুদ্র আমাকে সেই *পঞ্চাশ লালবাগে* নিয়ে গেল ডাক্তার ভাইটিকে বলতে আমার অপারেশনের সময় যেন থাকে সে। বৈঠকঘরের সোফায় তখন চুল এলিয়ে বসা ছিল নেলি। নেলিকে ওই প্রথম আমি দেখি। রুদ্রকে দেখি চোখ বারবার নেলির এলিয়ে পড়া চুলের দিকে যাচ্ছে, নেলির আলুথালু শাড়ির দিকে যাচ্ছে। দুজন গল্প করে, পুরোনো দিনের গল্প। হাসে। একটি পত্রিকা হাতে নিয়ে মুখ ডুবিয়ে রাখি, যেন কিছু দেখছি না, কিছুই আমার চোখে পড়ছে না, কথা বলতে বলতে তোমাদের দুজনের চোখে স্মৃতি যে কাঁপছে তা আমি দেখছি না, সেই সব উতল প্রেমের স্মৃতি, সেই সব চুম্বন, গোলাপের গন্ধে শরীরে শরীর ডুবিয়ে মাছ মাছ খেলা--

দেখছি না, তোমাদের যে পরস্পরকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে খুব, আবার ইচ্ছে করছে জগতের সকল কিছু সকল সম্পর্ক তুচ্ছ করে আগের মত প্রেমের অথৈ জলে ঝাঁপ দিতে, চুম্বনে চুম্বনে প্রতি লোমকূপকে আবার আগের মত জাগাতে, আবার আগের মত স্বপ্নের কথা বলতে বলতে খুব খুব গভীরে চলে যেতে শরীরের--দেখছি না। আমার চোখ পত্রিকাটির অক্ষরে, তোমরা নিশ্চিন্তে যে কথা বলতে ইচ্ছে করো, বলো। সেই সব স্বপ্নের কথা, সেই সেইসব ভীষণ আবেগের কথা, যে আবেগ নিয়ে তুমি নেলির বিয়ে ভেঙে দিতে গিয়েছিলে রুদ্র। আমি মন দিয়েছি অক্ষরে, আমি শুনছি না। অক্ষরগুলোয় তাকিয়ে থাকি, অক্ষরগুলো বৃষ্টিতে ভিজছে। ভেজা অক্ষরগুলো আমার দিকে চেয়ে থাকে, ভেজা অক্ষরগুলোর মায়া হতে থাকে আমার জন্য।

হাসপাতালে অপারেশন টেবিলে আমাকে অজ্ঞান করা। আমি যখন ঘুমিয়ে যেতে থাকি, কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে আমার নাম ঠিকানা, বলতে চেয়েও আমি বলতে পারছি না, কোত্থেকে এক পাখি এসে আমাকে ডানায় করে আকাশে উড়িয়ে নিতে থাকে, আমি মেঘের মত উড়তে থাকি, আমার ভাল লাগতে থাকে। ভীষণ ভাল লাগতে থাকে। জ্ঞান ফিরলে দেখি অন্য এক বিছানায় শুয়ে আছি। পাশে ছোটদা, গীতা, ঝুনুখালা। গীতা আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ছোটদা ঝুনুখালা জিজ্ঞেস করেন, ব্যথা লাগতাছে? ব্যথা আছে কি বুঝতে পারি না, থাকলেও প্রিয় এই মুখগুলো ব্যথা কমিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ সবাইকে অপ্রস্তুত করে ঘরে রুদ্র ঢোকে। ছোটদা বেরিয়ে যান। কে এই রুদ্র, কি সম্পর্ক তার সঙ্গে আমার, এ কাউকে বলিনি। সকলে বুঝে নেয়। বেরিয়ে যাওয়া ছোটদাও বুঝে নেন। দুদিন থাকতে হয় হাসপাতালে, এই দুদিন গীতা আমার জন্য তিনবেলা খাবার আনে। বসে থেকে গল্প করে। গরম জলের গামলায় বসিয়ে রাখে। হাসপাতাল ত্যাগের দিন একদিকে ছোটদা, আরেকদিকে রুদ্র। ছোটদা বললেন, *চল বাসায় চল।*

আমি মাথা নাড়ি, *না।*

না মানে?

নিরুত্তর আমি। ছোটদা আমাকে হাত ধরে টানেন, *বাসায় যাইবি না ত কই যাইবি তুই?* ছোটদার হাতটি আমি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিই। নিরুত্তাপ শান্ত চোখ রাখি তাঁর কষ্টভাঙা চোখে। চোখের কোণে জল উপচে ওঠে তাঁর,আড়াল করে দাঁতে ঠোঁট চাপেন। আমি রুদ্রর সঙ্গে বেরিয়ে যাই। নিরুত্তর।

মুহম্মদপুরের বাড়িতে ফিরে একটি দুর্ভাবনার সঙ্গে আমি বসে থাকি চুপচাপ। রুদ্রর মামাতো ভাইটি যদি না জেনে থাকে আমাদের বিয়ে হয়েছে! রুদ্র বলে, *তুমি তো কাউকে জানাতে চাও না বিয়ের কথা।* অজ্ঞান করার পর আমার গোপনাঙ্গ নিশ্চয়ই আর গোপন থাকেনি কোনও ডাক্তারের কাছে, আর গোপন না থাকা মানে জেনে যাওয়া যে আমি কুমারী নই! অন্তত তাকে জানাও যে আমরা বিয়ে করেছি। তা না হলে ভেবে বসবে আমার বুঝি বিয়ের আগেই কুমারীত্ব গেছে ছি ছি। আমি মুখ নত রাখি লজ্জায়। আমার লাজ রাঙা মুখটি রুদ্রর খুব পছন্দ। মুখটি দুহাতে নিজের দিকে ফিরিয়ে সে চুমু খায়। কথা দেয়, কালই সে জানাবে তার ভাইকে বিয়ের কথা। সে রাতটি যখন গভীর হয়ে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়, ঘুমে অচেতন করে রাখে, রুদ্রর বন্ধু মিনার দরজা ধাক্কিয়ে আমাদের ভাঙা ঘরে তুফান তোলে। সুন্দরী বউ কবিতাকে নিয়ে মিনার এসেছে ঘুমোতে, সারা শহরে ঘুমোনোর কোনও জায়গা পায়নি বলে। শোবার ঘরটি ছেড়ে দিই ওদের জন্য, রুদ্র আর আমি শুই শীতল পাটি বিছিয়ে অন্য ঘরে। ভোরবেলা দেখি রুদ্র নেই আমার পাশে। সে ঘুমোচ্ছে বিছানায় মিনার আর কবিতার সঙ্গে। কি হয়েছে? ঘটনা কি! তুমি এখানে

কখন এসেছো? রুদ্রর সরল উত্তর, শীতল পাটিতে তার ঘুম আসছিল না। বুদ্ধি করে মিনারের পাশে শুয়েছে, কবিতার পাশে যদি মিনার আবিষ্কার করত তাকে, তবে নিশ্চয়ই বন্ধুটির কাণ্ডে অট্টহাসি হেসে সকালে বিদেয় হত না সস্ত্রীক। সেদিন সকালেই আমি রুদ্রর ড্রয়ারে চিঠি লেখার কাগজ খুঁজতে গিয়ে বিয়ের দলিলটি দেখি। দলিলে লেখা উকিলের সামনে বসে আমি নাকি এ দলিলে সই করেছি। আশ্চর্য এতে তো মিথ্যে কথা লেখা! বলতেই রুদ্র আমার হাত থেকে দলিলটি কেড়ে নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দেয়। শুয়ে বসে ঘর গুছিয়ে বাইরে খেয়ে আড্ডা দিয়ে কবিতায় সঙ্গমে দুদিন কাটার পর আমার মন কেমন করতে থাকে অবকাশের সবার জন্য। মার জন্য, ইয়াসমিনের জন্য, সুহৃদের জন্য, মিনুর জন্য। কি রকম আছে ওরা! আমার কথা মা নিশ্চয়ই প্রতিদিন বলছেন, বাবা প্রতিদিন, ইয়াসমিন প্রতিদিন, সুহৃদও বলছে *দোলফুপু এখনো আসে না কেন?* সুহৃদকে শিখিয়েছি আমাকে দোলফুপু ডাকতে। একদিন ওকে দোলনায় দোলাতে দোলাতে *দে দোল দে দোল ফুপু দে দোল দে দোল* বলতেই বলতেই। মন পড়ে থাকে অবকাশে। আমার এলোমেলো আবার খুব গোছানো জীবনে। মিনুর জন্যও কষ্ট হতে থাকে, নিশ্চয়ই সে ঘরে বারান্দায় ক্ষিধে পেটে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে খুঁজছে, রাতে তার খুব খালি খালি লাগছে বোধহয়! ঢাকাকে আমার আপন শহর মনে হয় না। ঢাকায় কদিনের জন্য বেড়াতে আসা যায়। পাকাপাকি থাকার জন্য এ শহরটিকে আজও আমি মনে নিতে পারি না। ময়মনসিংহে ফিরে যেতে চাইলে রুদ্র আর একটি দিন থাকতে অনুরোধ করে। সেই একটি দিনের একটি বিকেলে আমাকে নিয়ে মগবাজার যায়, কাজির আপিসে। রুদ্রর দুটো বন্ধুও যায়। কাজির কাছে কাবিন হবে, দুই বন্ধু সাক্ষী। *সারপ্রাইজ!*

তা আমাকে আগে জানালে আমি কি আপত্তি করতাম রুদ্র?

কাবিন কত টাকার হবে?

টাকার অংক কি দিতেই হবে?

হ্যাঁ দিতেই হবে।

শূন্য দেওয়া যায় না?

না।

তাহলে এক টাকা।

ধুর এক টাকা কি করে হয়!

যত ইচ্ছে তত দাও, এসবের কোনও মানে হয় না, তুমি কি ভাবছ আমাদের কোনওদিন তালাক হবে, আর হলে আমি কোনও টাকা দাবি করব?

আমি হেসে উঠি। সশব্দে নিঃশব্দে।

কাবিনের কি দরকার রুদ্র?

দরকার আছে।

কি দরকার?

এসব অর্থহীন জিনিস। দুজন মানুষকে একসঙ্গে বাস করাতে পারে কোনও কাবিননামা? নাকি ভালবাসা? আমি ভালবাসায় বিশ্বাসী, কাবিনে নয়। রুদ্র ভালবাসায় কতটা জানি না, তবে সে কাবিনে বিশ্বাসী, সে কাবিন করে। পরদিন ময়মনসিংহে ফিরে যাই। অপারেশন হয়েছে শুনে মা আমার যত্ন করেন, গরম জল গামলায় ঢেলে জলে ডেটল মিশিয়ে আমাকে বসিয়ে দেন দিনে চারবার। মাকে আমার পুরোনো নিউপারকেইনল মলমটি দিই। এনাল ফিশারের যন্ত্রণা কমার মলম। মা মলম পেয়ে ভাবেন, এটিই তাঁর রক্ত যাওয়া বন্ধ করবে। রক্ত যাওয়া বন্ধ হয় না মার। ভাবেন, কোনও

একদিন নিশ্চয়ই বন্ধ হবে। মার আবদারের এক পোয়া দুধ, দুটো কলা আর দুটো ডিমও পাওয়া হয় না। মা সম্ভবত আশা করেন, তাঁর মেয়েটি ডাক্তার হচ্ছে, উপার্জন করবে, সেই মেয়েই তাঁর চিকিৎসা করবে, সেই মেয়েই দুধ কলা কিনে দেবে। সেই মেয়ের ডাক্তারি পাশ হয়। সেই মেয়ের ইন্টারনিশীপ শুরু হয়। সেই মেয়ের হাতে টাকা আসে। টাকা পেয়ে আর যা কিছুই হয় তার মার দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের আবদারের দুধ ডিম কেনা হয় না। ভাগীরথীর মা আসে, দুই বাচ্চার জন্য দুধ দিয়ে যায়। বারান্দায় বসে দুবাচ্চার দুধ মেপে দিয়ে জিজ্ঞেস করে প্রায়ই, *ও মাসি, আরও এক পোয়া দুধ রাখবেন বলিয়েছিলেন না!* মা বড় শ্বাস ফেলে বলেন, *না ভাগীর মা, দুধ খাওয়ার কপাল আমার নাই।*

বিছানায় দু পা বিছিয়ে সেই পায়ের ওপর শুইয়ে মা হাঁটু ভেঙে ভেঙে দোল দিয়ে ঘুম পাড়ান সুহৃদকে,ছড়া বলতে বলতে। জানালায় উদাস তাকিয়ে ছিলেন মা, সুহৃদ ঘুমিয়ে গেছে পায়ে, তখনও ওকে পা থেকে আলতো করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছেন না.. চোখের নিচে কালি পড়েছে,চোখদুটো ফোলা, জানালা থেকে চোখ সরিয়ে বলেন,*নোমানের বউ আমারে বেডি কইয়া ডাকে।*

কেমনে জানো?

পাকঘরে গিয়া শুনি লিলির মারে কইতাছে, ওই বেডি আমার ছেলেডারে দুই চোক্ষে দেখতে পারে না।

ও।

সাহস পাইছে তর বাপের কাছ থেইকা। তর বাপ ত সবার সামনেই বেডি কয়।

জানালায় আবার উদাস তাকিয়ে মা বলেন, *শাশুড়ি আমি, আমারে গ্রাহ্যই করে না।*

সুহৃদের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেক সুন্দর বাচ্চা দেখেছি। সুহৃদের মত কেউ নয়। ঘুমিয়ে থাকলে মনে হয় না কি ভীষণ দুরন্ত ছেলে সে। প্রতিদিন খাট থেকে টেবিল থেকে সিঁড়ি থেকে ধুপ ধাপ পড়ে যাচ্ছে বাতাসের আগে ছুটতে যেয়ে। ভ্রুক্ষেপ নেই কোনও। শুভ একটি পা কোথাও দিলে আগে দেখে নেয় কোথায় দিচ্ছে, সাবধানী ছেলে, কোনও লম্ফ ঝম্ফ নেই। শুভর শরীরে কোনও চিহ্ন নেই কাটা দাগের। সুহৃদের আজ হাঁটু ছিলে যায় তো কাল কনুইএ কালশিটে দাগ পড়ে থাকে। সারা শরীরে তার দস্যিপনার চিহ্ন। সুহৃদ আধো আধো কথা বলে। শুভ কথা বলতে শেখা অবদি কোনওদিন কোনও আধো কথা বলেনি। সবসময় স্পষ্ট। খাওয়ার ব্যাপারে শুভর কোনও না নেই। সুহৃদের সবসময়ই না। মার ভোগান্তি বাড়ে। ছেলে যত বড় হচ্ছে, তত তাকে বাগে আনা মুশকিল হয়ে পড়ছে। দৌড়ে ছাদে চলে গেল। পেছনে পেছনে দৌড়োতে হয় মার, যদি আবার ছাদ থেকে লাফ দেয় নিজেকে *সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান* মনে করে! ফটক খোলা পেলে রাস্তায় চলে গেল, দৌড়ে ধরে আনতে হয়। মার যত না খাটনি, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা। ছোটদা অবকাশে এসে গন্ধ টের পান হাওয়ায়, গন্ধটি হাসিনার অসন্তুষ্টির। হাসিনার দৃঢ় বিশ্বাস, শুভর চেয়ে সুহৃদকে ভাল বেশি বাসা হচ্ছে। মা ছোটদাকে বলেছেন, *সুহৃদের জন্য কিছু আনলে শুভর জন্যও নিয়া আসিস।* হাসিনাকে তুষ্ট করতে বিদেশ থেকে আনা বাচ্চার জামা কাপড় খেলনা শুভর জন্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দিলেও হাসিনা জানে যে শুভর যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে সুহৃদের। সুহৃদের জন্য ছোটদা তিন চাকার একটি সাইকেল এনেছেন। এটি ঘরে বারান্দায় মাঠে উঠোনে চালায় সে ঝড়ের বেগে চালায়। মা সুহৃদকে খানিক পর পর উঠিয়ে শুভকে দেন চালাতে, শুভ *তো তোমার ভাই, ওরে চালাইতে দেও।* সুহৃদের প্যারামবুলেটরটিও শুভকে

দিয়ে দিয়েছিলেন মা। সুহৃদের ছ মাসের ছোট শুভ। প্যারামবুলেটর থেকে সুহৃদের নামা হয়েছে, শুভর ওঠা হয়েছে। কিন্তু হাসিনা দাদাকে বলেছে *শুভর জন্য নতুন কিনে নিয়া আসো।*

ময়মনসিংহে পাওয়া যায় না এইসব।

না পাওয়া যাক। ঢাকা যাও, ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে আসো।

কি কও মুমু! ঢাকা যাব এইটা কিনার জন্য?

হ, এইটা কিনার জন্য তোমারে ঢাকা যাইতে হইব। আর যদি ঢাকায় না পাও তাইলে লন্ডন গিয়া হইলেও কিন্যা নিয়া আসতে হইব।

সুহৃদ সাইকেল পাওয়ার পর শুভকে ঠিক এরকম সাইকেল কিনে দেওয়ার জন্য হাসিনা দাদাকে আবার ধরল। দাদা সারা শহর খুঁজে একটি তিন চাকার সাইকেল কিনে নিয়ে বাড়ি এলে হাসিনা সাইকেলটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, *রাস্তা থেইকা টুকাইয়া আনছ নাকি?*

এর চেয়ে ভাল সাইকেল আর নাই বাজারে। পারলে গিয়া দেইখা আসো।

মা বলেন, *সুহৃদের সাইকেলটা নাকি কামাল সিঙ্গাপুর থেইকা আনছে। এইরম সাইকেল তো দেশেই পাওয়া যাবে না।*

সমস্যার সমাধান সুহৃদই করে। সে নতুন আনা সাইকেলটির ওপর আকর্ষণে নতুন সাইকেলটি চালাতে থাকে। শুভ চালায় সিঙ্গাপুরি। হাসিনার দেখে খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু খুশি হয় না। তার মুখে হাসি মোটেও ফুটতে চায় না। হাসি ফোটানোর জন্য মা পরিশ্রম করেন। মা তাকে ছোটদার আনা আপেল আঙুল কমলালেবু দিতে থাকেন। মাছ মাংস রান্না হলে হাসিনাকে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে ভাল টুকরোগুলো দেওয়া হয়। হাতে টাকা পয়সা এলে হাসিনা আর শুভর জন্য বাজার থেকে কিছু না কিছু উপহার কিনে নিয়ে আসেন। হাসিনার হাসি নেই তবু। দাদাকে তিনি অহর্নিশি বলতে থাকেন, *কি নড়ো না কেন! মরার মত শুইয়া থাকলেই হবে? ফকিরের মত টিনের ঘরে আর কতদিন পইড়া থাকবা। আলদা বাসা নেও। আমার ছেলেরে তোমার এই গুষ্ঠি থেকে দূরে সরাইতে হবে।*

সুহৃদ সংসারের কোনও কুটকচাল বোঝে না, শুভর জন্য সুহৃদের মমতা অনেক। শুভকে পারলে সে তার নিজের যা কিছু সম্পদ সব দিয়ে দেয়। কিল চড় আঁচড় এগুলো সুহৃদের শরীরে বসাতে শুভ সবচেয়ে বেশি পারদর্শী। একবার ধাক্কা দিয়ে সুহৃদকে ফেলে দিয়েছিল খাটের রেলিং থেকে, মাথায় চোট পেয়ে সুহৃদ পুরো চব্বিশঘন্টা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। মা পাগল মত হয়ে গিয়েছিলেন। মার ভয় কখন না আবার কি দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তিনি ছোটদাকে বলেছেন, *এই পরিবেশে সুহৃদরে মানুষ করা যাবে না। তুই ওরে ঢাকায় নিয়া যা।* ছোটদা মার এই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মুখ শুকনো করে বলেন, *হ নিয়া যাইতে হইব। ঢাকায় নিয়া ইশকুলে ভর্তি করাইতে হবে।* সুহৃদকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হলও এরপর। মা গেলেন সঙ্গে। দু সপ্তাহ পর মা ফিরে এসে সুহৃদের জন্য চোখের জল ফেলতে থাকেন। কেবল চোখের জলই নয়। হাঁউমাউ কান্না। কেঁদে কেটে নিজেই তিনি উন্মাদিনীর মত ঢাকা চলে যান, সুহৃদকে ফের অবকাশে ফেরত আনেন। সুহৃদ মহাসুখে অবকাশে দিন যাপন করতে থাকে। ওকে নিয়ে প্রায় বিকেলেই বেড়াতে বেরোই। রিক্সা করে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো। কখনও কখনও বান্ধবীদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া। ওর আবদারের খেলনা কিনে দেওয়া। আজ চাবিঅলা গাড়ি কিনে দিলাম তো কাল চাবিঅলা উড়োজাহাজ লাগবে। নিজের জন্যও রেডিমেড টু পিস থ্রি পিস কিনি। দুটো জামা, একটি ধোব, আরেকটি পরব, বাবার এই নিয়ম ভেঙে আমার জামা পাজামার

সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় দশাধিক। শখ করে নীল জিনসের কাপড় কিনে দরজি দিয়ে একটি প্যান্টও বানাই। এবার দরজিকে বলি, *সামনের দিকে বোতাম বা চেইন দিবেন, কিনারে না। লুপ দিবেন। যদি বেল্ট পরতে ইচ্ছে হয়, পরব।* রেডিমেড ছাড়া কখনও যদি কাপড় কিনে জামা বানাই, দরজির ফিতে নিজের হাতে নিয়ে বুকের মাপ দিই। ইয়াসমিনকে বলে দিই, *এখন থেইকা নিজে মাপ দিবি।* ইয়াসমিনকে বলা হয় না কেন ওর নিজের এ কাজটি করা দরকার, কেন দরজির নয়। সম্ভবত ও বুঝে নেয়। হাসপাতাল থেকে ফিরেই ওর সঙ্গ চাই আমার। জগতের সকল কথাই হয় ওর সঙ্গে, কেবল শরীরের কোনও গোপন কিছু নিয়ে কোনও কথা নয়। আমরা দুজন যেন আজও শিশু। আমরা হাসি আনন্দ করি, কবিতা পড়ি গান গাই। ঘুরে বেড়াই। যেদিন জিনস প্যান্ট পরেছি, বাবা দেখে বলেন, *এইডা কি পরছস। এক্ষুনিখোল। খুইলা পায়জামা পর।* আমি বলি, *জিনস প্যান্ট সবাই পরে। মেয়েরাও পরে।*

না মেয়েরা পরে না। এইসব ছেলেদের পোশাক।

বাবার প্রতিবাদ করি না আমি, সরে আসি সামনে থেকে। কিন্তু জিনস খুলে রাখি না, পরে থাকি। পরদিনও পরি। আমার কাপড় চোপড় ইয়াসমিনের গায়ে আঁটে। সে নিজেও আমার জামা কাপড় অবলীলায় ব্যবহার করতে থাকে। আমি না করি না। বাবা ইয়াসমিনকেও জিনস পরতে দেখে দাঁত খিচোন, *কি হইছে এইগুলা? বড়টার শয়তানি তো ছোটটারেও ধরছে। যেইদিন ধরব আমি, সেইদিন কিন্তু পিটাইয়া হাড্ডি গুড়া কইরা দিয়াম।* হাড্ডি গুঁড়ো হোক, ইয়াসমিনকে বলি *খুলবি না।* খুলবি না বলি, কারণ আমি কোনও যুক্তি দেখি না জিনস পরা মেয়েদের জন্য অনুচিত হওয়ার। এটি পরলে আমি যে ছেলে বনে যাবো, তা তো নয়। এর ভেতরে যে শরীর, সে তো ঠিকই থাকছে। সেটি ঠিক রাখার জন্যই যদি বাবার আদেশ হয়ে থাকে। ইয়াসমিনকে ছোট বাজারের সুর তরঙ্গ থেকে একটি পুরোনো হারমোনিয়াম কিনে দিই। গানের মাস্টারও রেখে দিই। একটিই শর্ত আমার, ও যেন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। ঈশান চক্রবর্তী রোডের একটি দেয়াল ফুঁড়ে বটগাছের চারা ওঠা পুরোনো বাড়িতে ময়মনসিংহ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ওতে ভর্তি করিয়ে দিই ওকে। গেল, কিন্তু সাতদিনের মাথায় বলে দিল ওর ভাল লাগছে না ওখানে। ঠিক আছে ইশকুলে যদি ভাল না লাগে বাড়িতে এসে মাস্টার গান শেখাবে, এই ভেবে সুনীল ধরের কাছে নাকি মিথুন দের কাছে! কার কাছে যাবো! শেষ অব্দি ঠিক হল, বাদল চন্দ্র। সঙ্গীত বিদ্যালয়ের গানের মাস্টার বাদল চন্দ্রর বাড়ি কোথায় খোঁজ নিয়ে জেনে ইয়াসমিনকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করি গান শেখাতে। বাদল চন্দ্র দের ছোট ভাই সমীর চন্দ্র দে ওরফে কটন এককালে ছোটদাকে গিটার শেখাতেন। শহরের এক নম্বর গিটার শিল্পী। বাদল চন্দ্র দে বিয়ে থা করেননি। তাঁর ঘরটিতে তানপুরা হারমোনিয়াম তবলা সেতার বীণা নানা রকম যন্ত্র, ঘরের এককোণে একটি তক্তপোষ। এত অল্পে কি করে যে মানুষের জীবন যাপন চলে!ভোগ বিলাসের চিহ্ন নেই বাড়িটিতে। একটি উঠোন ঘিরে টিনের কতগুলো ছোট ছোট ঘর। পৈতৃক ভিটে। ভাইরা বিভিন্ন ঘরে থাকেন, ছেলেমেয়েও বড় হয়ে গেছে। সকলে সঙ্গীত সাধনায় উৎসর্গ করেছে জীবন। বাদল চন্দ্র আমাদের দুজনকে তক্তপোষে বসিয়ে নিজে একটি মোড়ায় বসে সঙ্গীতের গভীর কথা শোনাতে থাকেন, কতক বুঝি, কতক বুঝি না। তিনি কাউকে শখের গান শেখাতে চান না, এ যদি সত্যিকারের সঙ্গীত সাধনার উদ্দেশ্য হয়, মন প্রাণ উৎসর্গ করা হয় সঙ্গীতে, তবেই তিনি ছাত্রী নেবেন। আমাদের, আমি জানি না কেন, পছন্দ হল বাদল চন্দ্রের। তিনি সপ্তাহে দু দিন ইয়াসমিনকে শেখাতে বাড়ি আসতে লাগলেন। দীর্ঘাঙ্গ ধবল শরীর বাদল

চন্দ্রের। ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি আর ধুতি পরনে। এক হাতে ধুতির কোচা ধরে তিনি ঢোকেন অবকাশে। বৈঠক ঘরে সা রে গা মা পা ধা নি সা চলতে থাকে সারা বিকেল। আমি ট্রেতে করে চা বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকি। বাদল ওস্তাদ আমাকে দেখলে কেবল সঙ্গীত নিয়ে নয়, সাহিত্য নিয়েও গল্প করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি মুখস্ত বলে যেতে থাকেন। কবিতা মুখস্ত করার মাথা আমার নেই, আমি মুগ্ধ শ্রোতার ভূমিকায়। ইয়াসমিনের সা রে গা মা বাদল চন্দ্রের কাছেই প্রথম শেখা নয়। ওর যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স, বাবা ওকে রাজবাড়ি ইশকুলের শিক্ষিকা রোকেয়ার বাড়িতে নিয়ে যেতেন গান শিখতে, ও বাড়িটিও নাচ গানের বাড়ি ছিল। রোকেয়ার মেয়ে পপি নাচত। ছেলে বাকি গান গাইত। রোকেয়ার বোন আয়শা, বোনের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতেন, তিনিও শিক্ষিকা, নিজেও গান গাইতেন, মেয়ে দোলনকেও গান শেখাতেন। ইয়াসমিনকে ও বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, বাড়ি থেকে নিয়ে আসা এসব নিয়ে মা বলতেন, *ইয়াসমিনরে গান শেখানোর উদ্দেশে ত তর বাপে ওই বাড়িতে যায় না, আয়শার সাথে রঙ্গরস করাই আসল উদ্দেশ্য।* ইয়াসমিনকে ও বাড়িতে নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে বসিয়ে দিয়ে অন্য ঘরে কোঁকড়া চুলের টানা টানা চোখের ফর্সা চামড়ার প্রায় গোলাপি ঠোঁটের ভরা বুকের যুবতী আয়শার সঙ্গে বাবা কথা বলতেন। বাবার রাজিয়া বেগমকে দিয়েও সাধ মেটেনি কোনওদিন। খুচরো আরও কিছু প্রেম বাবার এদিক ওদিক থাকতই। ইয়াসমিনের এক বান্ধবীর কৃকলাশ খালার সঙ্গেও, খালাটি উকিল, বাবাকে দেখা গেছে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে। ইয়াসমিন বাদল চন্দ্র দের কাছে সা রে গা মা যখন শিখছে, কলেজের কিছু গানের মেয়ের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের পর খোঁজ দিল যে শহরে আনন্দধ্বনি নামে একটি গানের ইশকুল আছে, ওতে মেয়েরা যাচ্ছে। এই গানের ইশকুলটি ছুটির দিনে মহাকালি ইশকুলে বসে। আনন্দধ্বনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওস্তাদ ওয়াহিদুল হকের ইশকুল। ময়মনসিংহে ওয়াহিদুল হকের শিষ্য তপন বৈদ্য, নীলোৎপল সাধ্য, আর নূরুল আনোয়ার আনন্দধ্বনির ছাত্র ছাত্রীদের গান শেখান। ছাত্র ছাত্রীরা যে কোনও বয়সের। পাঁচও আছে, পঞ্চাশও আছে। একই সঙ্গে বসে তাল দিয়ে গান গাইছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাকে বাঁচিয়ে রাখে একরকম। দাদার সন্ধ্যা ফিরোজা হেমন্ত মান্না দে ডিঙিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতে বুঁদ হয়েছি বেশ অনেকদিন। বিশেষ করে কণিকা আর সুবিনয় রায়ে। মাঝখানে গণসঙ্গীতের ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সরিয়ে রেখে আবার রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এই এক সঙ্গীত, যে সঙ্গীতে মন দিলে জীবন বড় সুন্দর হয়ে ওঠে। জীবনের এমন কোনও অনুভবের কথা নেই, যা না বলা আছে এই সঙ্গীতে। কেবল সুখবোধই নয়, দুঃখবোধও একরকম আনন্দ দেয়। ইয়াসমিনকে আনন্দধ্বনিতে ভর্তি করে দিই। বাদল চন্দ্রের বেতন, আনন্দধ্বনির বেতন মাস মাস দিতে থাকি আমি। আনন্দধ্বনিতে যাওয়া শুরু করার পর নীলোৎপল সাধ্যের নজরে পড়ে ইয়াসমিনকে, কোনও একদিন ও খুব বড় শিল্পী হবে আশায় নীলোৎপল সাধ্য ওকে যত্ন নিয়ে গান শেখাতে শুরু করেন। ইয়াসমিন একদিন তবলার আবদার করায় ভাল দেখে তবলাও কিনে দিই গোলপুকুরপাড়ে প্রমোদ বিহারির তবলার দোকান থেকে। বাদল চন্দ্র দের আগ্রহ ইয়াসমিনকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখাতে। ঘরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চলল, বাইরে রবীন্দ্রসঙ্গীত। চারপাশের মানুষের ক্ষুদ্রতা নিচতা স্বার্থপরতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখে ইয়াসমিনকে নিয়ে একটি চমৎকার জগত তৈরি হয় আমার। ইয়াসমিন যখন আনন্দধ্বনিতে শেখা গান গুলো গাইতে থাকে বাড়িতে, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি ওকে। কোনও মন খারাপ করা বিকেলে, *তোমার কাছে শান্তি চাব না, থাক না আমার দুঃখ ভাবনা..* গানটি আমাকে ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল ঝরাতে থাকে। ইয়াসমিন মাঝে মাঝে

বাড়িতে নীলোৎপলকে নিয়ে আসে, সুদর্শন যুবক নীলোৎপল সাধ্য, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা, পায়ে শান্তিপুরি চপ্পল, ঠোঁটে শান্তি ছড়ানো হাসি। আমার মনে হতে থাকে নীলোৎপল বুঝি মনে মনে ইয়াসমিনকে ভালবাসছে। ভয় হয়। ওর এক বান্ধবীর ভাই ইয়াসমিনের কাছে আসে মাঝে মাঝে তবলা বাজাতে, ইয়াসমিনের দিকে ছেলেটিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। ভয় হয়। কলকাতা থেকে ইয়াসমিনকে গোটা গোটা অক্ষরে চিঠি লিখছে কৌশিক মজুমদার। কে এই কৌশিক মজুমদার? ইয়াসমিন বলে, ওই যে ধ্রুব। মৃত্যুঞ্জয় ইশকুলের সামনে থেকে প্রায় বিকেলে যে হাফপ্যান্ট পরা বড় বড় কাজল কালো চোখের মিষ্টি চেহারার কালো একটি ছেলে এই পাড়ায় বিকেলে হাঁটতে আসত, ওই ধ্রুব। ইয়াসমিনও চিঠি লেখে কৌশিককে। কৌশিক একদিন ওকে আর ইয়াসমিন নামে সম্বোধন করে না, সম্বোধন করে মৌমি বলে। ইয়াসমিন নিজের নাম সেই থেকে মৌমি লিখছে। ভয় হয় আমার। ভীষণ ভয় হয়। কৌশিকের চিঠি এলেই আমি পড়ি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি কোনও প্রেমের ইঙ্গিত আছে কি না। আসলে আগলে রাখি ওকে সকল সর্বনাশ থেকে, কারও প্রেমে যেন সে না পড়ে। কোনও মোহ যেন ওর সততা ও সারল্যকে, ওর সৌন্দর্যকে এতটুকু ম্লান না করে। আমার যা হয়েছে, হয়েছে। ওকে বাঁচাতে চাই সকল কুৎসিত থেকে। যখন ইয়াসমিন কলেজে যাবে বা আনন্দধ্বনিতে যাবে বা বান্ধবীর বাড়ি যাবে বলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজে, চোখে কাজল পরে, ঠোঁটে লিপস্টিক। ধমক লাগাই, *এত সাজস কেন?*

এমনি।

কেউ এমনি এমনি সাজে না। কোনও কারণ থাকে।

কোনও কারণ ছাড়া কি সাজা যায় না?

পিছনে কারণ থাকেই। তুই চাস তর রূপ দিয়া মানুষরে মুগ্ধ করাইতে। ঠিক না?

না ঠিক না। আমার ভাল লাগতাছে সাজতে, তাই সাজতাছি।

তাইলে তুই ঘরে যখন থাকস, তখন এইরকম সাজস না কেন? ঘরের বাইরে বার হওয়ার জন্য তর খয়েরি ঠোঁটটারে লাল করস কেন?

ইয়াসমিন কোনও উত্তর দেয় না। আমি শ্লেষ গলায় বলি, *তুই কি ভাবছস মুখে রং মাখলে তরে সুন্দর লাগে দেখতে? মোটেই না। নিজের যা আছে, তা নিয়া থাকাই সবচেয়ে ভাল। নিজের আসল চেহারা রঙের মুখোশ পইরা নষ্ট করিস না। কৃত্রিমতার আশ্রয় নেওয়ার দরকার কি তর! তর অভাব কিসের? নিশ্চয়ই ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগতাছস!*

ইয়াসমিন আমার যুক্তি মেনে নেয় না, সেজে যায়।একটি শীত শীত ভয় আমাকে বুকে হুল ফোটাতে থাকে।

হাসপাতালে পোস্টমাস্টারের ঠিকানায় রুদ্রর চিঠি আসে, *চিঠি পেয়েই ঢাকা চলে এসো।* মেডিসিন ওয়ার্ডে ডিউটি আমার। ডিউটি থেকে একদিন কেন, এক ঘন্টার জন্যও ছুটি নেই। ছুটি নেওয়ার জন্য আমি পরদিন থেকে চেষ্টা করতে থাকি। ছুটি তিনদিন পরও নেওয়া যায় না। ওদিকে বাবাও একটি চিঠি পেয়েছেন। রুদ্রর বাবা শেখ ওয়ালিউল্লাহর চিঠি। কি লিখেছেন তিনি, কিছুই আমার জানা নেই। রুদ্রও এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি। মার কাছে শুনি চিঠির কথা। মাকে হুংকার ছেড়ে ডেকে নিয়ে বাবা চিঠি দেখিয়েছেন, *আমার পথভ্রষ্ট পুত্র শহিদুল্লাহ অবশেষে আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া সঠিক পথে চলিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে। তাহাদের বিবাহকে মানিয়া লইয়া*

তাহাদিগকে সুখে শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন ইত্যাদি। বাবা তাঁর কালো মিশমিশে চুল খামচে ধরে অনেকক্ষণ বসেছিলেন। এর পর বিকেলে রোগী দেখা বাদ দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে রইলেন বিছানায়। চোখ কড়িকাঠে। মা শিয়রের কাছে বসে বাবার মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দেন। বাবা ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, *চুলগুলা জোরে জোরে টাইনা দেও।* জোরে চুল টেনে চুল ছিঁড়ে চলে আসে হাতে, তবু মাথার যন্ত্রণা বাবার মাথাতেই থাকে। ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম আসে না।

কি কইরা বিয়া করল, কখন করল! কেন করল!

আমারে কি কয় কিছু এইসবের! যা ইচ্ছা তাই করে।

এত সাহস কি কইরা হইছে তার?

সাহস না। আসলে সরল সোজা পাইয়া মেয়েটারে পটাইছে। এমন সুন্দর ডাক্তার মেয়ের সামনে দাঁড়ানোর কি যোগ্যতা আছে ছেলের? নিজের সর্বনাশ করল নাসরিন।

বাবা কড়িকাঠে চেয়েই অপলক চোখ রেখে বলে যান, *তার বাপেই তারে কইল পথভ্রষ্ট ছেলে। একবার ভাবো, কতটুকু খারাপ ছেলে হইলে বাপে পথভ্রষ্ট ছেলে কয়। কামাল তো কইছে ছেলে নাকি সিগারেট খায় মদ খায়।*

বাবার মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিজের আগুন-জ্বলা বুকে হাত ঘষেন, চোখ ভিজে ওঠে, চোখের জল গাল বেয়ে বুকে নামে,বুকের আগুন তবু নেভে না, *এই বুকের মধ্যে রাইখা মেয়েটারে পালছি। আপনে বেডিগর পেছনে পেছনে ঘুরছুইন। মেয়েটারে কোলে নিয়া চোক্ষের পানি ফালাইছি। এই বুকটার মধ্যে দিন রাইত পইড়া থাকত। মেয়ে বড় হইছে, ডাক্তার হইছে। কত বড় অনুষ্ঠান কইরা কত আয়োজন কইরা দেইখা শুইনা একটা ভাল ছেলের সাথে বিয়া হইব। সারা শহর জানব যে বিয়া হইতাছে। আর কি ভাবে সে বিয়া করল?কারে করল, কি জানে এই ছেলের সম্পর্কে সে?*

মার চোখের জল ফুরোয় না। বাবার ঘুমও আসে না। আমি অন্য ঘরে ব্যাগে কাপড় গুছিয়ে নিই। ঢাকা যাব।

বাবাকে বা মাকে কিছু না বলে আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কার কাছে যাচ্ছি কবে ফিরব আমি ঢাকা রওনা হই। মেডিসিন বিভাগে ডিউটির কি হবে তাও আর ভাবি না। মা পথ আটকেছিলেন,পাশ কেটে আমি বেরিয়ে যাই। ঢাকা পৌঁছি দুপুরে। বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সা করে তাজমহল রোডের বাড়িটিতে গিয়ে দেখি দরজায় তালা, রুদ্র নেই ঘরে। কিন্তু জানি সে ঢাকায় আছে, অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। দ্বিতীয় দরজা যেটি ভেতর থেকে বন্ধ, আধঘন্টার পরিশ্রমে খানিক ফাঁক করে ফাঁকের ভেতর আড়াআড়ি বসানো খিলটি ওপরের দিকে তুলে দিতেই দরজা খুলে যায়। ভেতরে সব আছে, রুদ্র নেই। টেবিলে পড়ে আছে অপেক্ষার দিনলিপি, *তুমি এখনো আসছো না কেন? আমি অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি। তুমিহীনতা ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। আমার ভাল লাগছে না। কখন এসে পৌঁছবে তুমি!* সারাদিন ঘরে আর বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করি, অপেক্ষার হাঁটাহাঁটি। প্রতিটি মুহর্ত আমার অপেক্ষায় কাটে। বিকেল পার হয়। রুদ্র আসে না। ঘরে বসেই অপেক্ষা করতে হবে, দরজা খোলা রেখে কোথাও তাকে খুঁজতেও যেতে পারি না। অপেক্ষা করতে করতে সন্ধে পেরিয়ে যায়। রাত হয়। রাত সাতটা আটটা নটা দশটা হয়ে যায়, রুদ্র ফেরে না। বাড়িঅলার বাড়ি থেকে আমার জন্য থালায় করে খাবার আসে। রাত বারোটাও যখন বেজে যায়, বাড়িঅলার বউকে বলি, *আমার খুব ভয় লাগছে ঘরে, আপনাদের বাতাসিকে দেবেন আমার ঘরে শুতে?* বউটি ভাল মানুষ। কাজের মেয়ে বাতাসিকে কাঁথা বালিশ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। আমি বিছানায়, বাতাসি মেঝেয় কাঁথা

বিছিয়ে। রাত পার হয়। ঘুম থেকে বাতাসি জাগে, আমার জাগার কোনও দরকার হয় না। জেগেই ছিলাম, মুখে পানি ছিটিয়ে দিন শুরু করি আবার। অপেক্ষার দিন। অপেক্ষার অসহ্য প্রহর। অপেক্ষা আমার কোনও কালেই ভাল লাগে না, মন দিতে চেষ্টা করি কবিতায়, পারি না। অক্ষরে চোখ, মন দরজায়। সারা বিকেল দাঁড়িয়ে থাকি ঝুল বারান্দায়। সারা বিকেল তাজমহল রোডের দিকে আসা প্রতিটি রিক্সায় বসা লোক দেখি, দেখি রুদ্র কি না। রুদ্র যদি একবার জানত আমি এসেছি, ছুটে চলে আসত খুশিতে! কেন সে ভাবছে না যে আমি এসেছি, কেন সে একবারও ভাবতে পারছে না! রুদ্র কোথায় রাত কাটিয়েছে তা আমার সমস্ত কল্পনা দিয়েও আমি অনুমান করতে পারি না। সন্ধে নেমে আসে,রুদ্র ফিরবে এক্ষুনি এই আশায় বসে থাকি। ঘরে ইঁদুর দৌড়োয়, বাইরে লোক হাঁটে, যে কোনও শব্দকেই রুদ্রর বাড়ি ফেরার শব্দ ভেবে ভুল করতে থাকি। যে কোনও রিক্সার টুংটং শব্দকে রুদ্রর রিক্সা ভেবে ভুল করতে থাকি। দিন পার হয়। আবারও রাত আসে। রাত সাড়ে দশটায় বাতাসি কাঁথা বালিশ নিয়ে এঘরে শুয়ে পড়েছে। আমি জেগে থাকি। সাড়ে বারোটায় দরজার শব্দে লাফিয়ে উঠি আনন্দে। হৃদপিণ্ডে উত্তেজনার ঢোল বাজে। দরজা খুলে রুদ্র ঢোকে। বাতাসি কাঁথা বালিশ নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। *এ কে বেরোলো? এ কে?* রুদ্র চেঁচাচ্ছে। এ বাতাসি। বাতাসি কেন? বাতাসি কি চায়? বাতাসি কিছু চায় না। ঘুমোতে এসেছিল। কেন ঘুমোতে এসেছিল? আমি ডেকেছিলাম। কেন? কে ডেকেছিলে? রাতে ভয় লাগে বলে। ভয়? কিসের ভয়? ভয় আবার কিসের? রুদ্র দরজা সশব্দে বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবে সে। কিন্তু আমাকে জড়িয়ে ধরছে না, চুমু খাচ্ছে না। আমি রুদ্রর দিকে এগোতে থাকি, তার নাগালের দিকে যেন সে আমাকে স্পর্শ করতে পারে, যেন আমাকে তার উষ্ণ আলিঙ্গনে বেঁধে হৃদয় শীতল করতে পারে। আমার ঠোঁটজোড়া এগোতে থাকে তার ঠোঁটের নাগালে, যেন দীর্ঘ দিন পর আমার ঠোঁটজোড়া তার ঠোঁটের ভেতর নিয়ে উষ্ণ উষ্ণ লালায় ভিজেয়ে তেঁতুলের মত চুষে রক্তহীন করে দিয়ে সুখ পেতে পারে। আমার মসৃণ কন্ঠদেশ এগোয়, যেন সে দাঁতে ঠোঁটে জিভে চেপে রক্ত জমাট করে আনন্দ পেতে পারে।যেন তার অপেক্ষার কষ্টগুলো শরীর থেকে মন থেকে একটু একটু পলেস্তারা খসার মত খসে যায়। এই আমি রুদ্র। তোমার অপেক্ষার দিন ফুরিয়েছে, আমাকে নাও।কিন্তু আমার মুখোমুখি যে লোকটি ,সে কি সত্যিই রুদ্র! বিশ্রি গন্ধ বেরোচ্ছে মুখ থেকে। কড়া স্পিরিটের গন্ধ।যেন গ্যালন গ্যালন নেল পালিশের রিমোভারে স্নান সেরে এসেছে সে। টলছে সে। টলতে টলতে কিছু বলতে চাইছে। শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে মুখে। আমি থমকে দাঁড়িয়ে থাকি, হৃদপিণ্ডে উত্তেজনার ঢোল আচমকা বন্ধ হয়ে গেছে, একটি আতঙ্ক হিশহিশ করে এগোচ্ছে। সামনে নয়, পেছনে ফেলতে থাকি পা। পা দু পা করে পেছনে। গন্ধ থেকে পেছনে, রক্তচোখ থেকে পেছনে। আমাকে ধরতে রুদ্র হাত বাড়ায়। যেন হাডুডু খেলছে, খপ করে ধরে ফেলে জিতে যেতে চাইছে। দূরে সরতে থাকি আমি। রুদ্রকে মোটেও চেনা কোনও মানুষ মনে হয় না।মাতাল কোনও লোক আমি আমার জীবনে এর আগে কখনও দেখিনি। এই প্রথম। এই প্রথম কোনও মাতাল লোক দেখা, ভয়ে আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপে। আমাকে পেছনে হটতে দেখে জোরে হাসছে সে, হাসিটি বীভৎস। গভীর জঙ্গলে যেন আটকা পড়েছি কোনও হায়েনার হাতে। এমন করে রুদ্রকে আমি হাসতে দেখিনি কখনও। পেছোতে থাকি। হৃদপিণ্ডে ঢিপঢিপ ধিকধিক বাড়ছে। রুদ্রর শব্দ একটির ওপর আরেকটি ঢলে পড়েছে। জড়ানো শব্দে চেঁচাচ্ছে,*কেন তোমার আসতে দেরি হল?* দেরি হল বলে সে অদ্ভুত অচেনা চোখে তাকাচ্ছে, কর্কশ কণ্ঠে কদাকার চিৎকার। এগোচ্ছে আমার দিকে।

আমি পালাবার কথা ভাবি। দৌড়ে গিয়ে বাড়িঅলার বাড়িতে আশ্রয় চাওয়ার কথা ভাবি। দেয়াল ঘেঁষে নিজেকে হাড়ুডুর *খপ* থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে দরজার দিকে যেতে নিলেই রুদ্র আমাকে খামচি দিয়ে ধরে, চুল ধরে হেঁচকা টানে কাছে আনে। সেই উৎকট গন্ধের মধ্যে আমাকে ডুবিয়ে বলে, *কেন দেরি করলে? কেন যেদিন চিঠি পেয়েছ সেদিনই আসনি?* কণ্ঠ কাঁপে যখন বলি, *ছুটি পাইনি। কেন পাওনি?* আবারও চিৎকার। কদাকার। রুদ্রর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পেছনে যেতে যেতে দেয়ালে আটকে থাকি। জানালার কিনারে রাখা থালবাসন তছনছ করে কিছু খোঁজে সে। তোশকের তল, চৌকির তল, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যায় ছুরি, মহররমের মিছিলে যেমন আকাশের দিকে তুলে তলোয়ার নাচায় *হায় হাসান হায় হোসেন* করা ধর্মান্ধগুলো, তেমন করে রুদ্র তার হাতের ছুরিটি নাচায়। ছুরিটি দেখে আমার চোখ বুজে আসে। আমি কান্না আটকে রাখি। শ্বাস আটকে রাখি। সে কি আমাকে খুন করবে এখন! করবে। খুনের নেশায় উদ্বাহু নৃত্য করছে সে। এই তাজমহল রোডের বাড়িটিতে আজ রাতে আমাকে মরে যেতে হচ্ছে। আমার জীবনের এখানেই সমাপ্তি। কেউ জানবে না, আমার বাবা মা ভাই বোন কেউই কোনওদিন জানবে না এই বাড়িটিতে কি করে মরতে হয়েছে আমাকে। কেউ হয়ত জানবেও না যে আমি মৃত। খবরটি ওদের কে দেবে! রুদ্র আমাকে বস্তায় পুরে বুড়িগঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে হয়ত! একবার কেন আমাকে রক্ষা করতে বাড়িঅলার বাড়ি থেকে কেউ আসছে না! রুদ্র আমার বুকে ছুরি তাক করে ধেয়ে আসতে থাকে দেয়ালে আটকে থাকা আমার দিকে। এই মুহূর্তে হাতের কাছের দরজাটি খুলে ঝুল বারান্দা থেকে নিচের রাস্তায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া আমার আর পথ নেই যাওয়ার। আমার সামনে মৃত্যু, পেছনে মৃত্যু। একা অসহায় দাঁড়িয়ে থাকি। আমার কথা বলার, কাঁদার, এমনকি শ্বাস ফেলারও কোনও শক্তি নেই। রুদ্রর হাত থেকে এই ছুরি আমি শক্তি খাটিয়ে নিতে পারব না, অসুরের শক্তি এখন তার দেহে। তার এক হাতে ছুরি আরেক হাতে আমার হাত, হাতটি টেনে সে দ্বিতীয় ঘরটির দরজার মুখে এনে বিছানায় ধাক্কা দিয়ে ফেলল। আবারও একই প্রশ্ন, কেন দেরি হল আমার ঢাকায় আসতে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিই, একই উত্তর দিই, ছুটি পাইনি। আবারও তার এক প্রশ্নই, কেন পাইনি। ফাঁক খুঁজি, তাকে বসিয়ে শান্ত করে শান্ত স্বরে কেন পাইনি ছুটি তার কারণটি বলতে, যেন খুনের ইচ্ছেটি মাতাল-মাথা থেকে দূর হয়। মাতালের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আমি কোনও নিয়ম জানিনা, অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার কোনও পদ্ধতি শিখিনি। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকি ছুরিটির দিকে। শানানো ছুরিটির শরীর থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে চিকচিক আলো। ছুরিটি আমার গলায় নাকি বুকে বসাবে রুদ্র। আমি চোখ বুজি, যেন আমাকে দেখতে না হয় প্রেমিকের হাতে খুন হওয়ার দৃশ্যটি। হঠাৎ ছুরি ফেলে সে পেচ্ছাবখানার দিকে দৌড়োয় রুদ্র। বুকের মধ্যে কোত্থেকে জানিনা প্রাণপাখি উড়ে আসে। চকিতে ছুরিটি নিয়ে দৌড়ে যাই বারান্দায়, রাস্তায় ফেলে দিতে। কিন্তু আমাকে থামায় একটি ভাবনা, যদি ছুরি ফেলে দিয়েছি বলে রেগে গিয়ে আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে! ছুরিটি আমি খাটের তলে একটি চালের কৌটোর ভেতর লুকিয়ে রাখি। ছুরি পেলে আমাকে খুন করবে না, এই শর্ত যদি দেয়, দেব। এই মুহূর্তে কোথায় পালাব আমি। বাড়িঅলার বাড়ি কড়া নাড়লে ও বাড়ির কেউ দরজা খোলার আগে রুদ্র আমাকে ধরে ফেলতে পারে। এই পালানোর শাস্তি তখন মৃত্যুই। তার চেয়ে ঘরে বসে বুঝিয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করি, তার মাথা থেকে মদের বিষ নামাতে চেষ্টা করি। ছলে বলে কৌশলে প্রাণপাখিটিকে বুকের খাঁচায় আটকে রাখতে হবে আমার। মানুষের জীবন একটিই, এ জীবনটি শত চাইলেও আর ফেরত পাবো না। ঘরে

এসে রুদ্র ছুরি খোঁজে। ছুরি কোথায়? আমার ছুরি কোথায়? চিৎকারে বাড়ির পলেস্তারা খসে। চিৎকারে বাড়িঅলার বাড়ির লোকেরা জানে। ওই চিৎকারে আমি হু হু করে কেঁদে বলি, ছুরি নেই। ছুরি চাইছো কেন? আমাকে মেরে ফেলতে চাও? কেন মারবে? কি করেছি আমি। ছুরি আমি ফেলে দিয়েছি! ভেতরে আর কান্না আটকে রাখা সম্ভব হয় না আমার। রুদ্র তার ক্রন্দসী প্রেয়সীর গলা টিপে ধরে। হাতদুটো শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে অন্য ঘরে গিয়ে দরজার ছিটকিনি আটকে দিই। অনেকক্ষণ দরজায় সে লাথি দেয়। খোল খোল বলে তারস্বরে নিঝুম নিথর রাতটির ঘুম ভাঙায়। জাগায়। রাতটিতে লণ্ডভণ্ড করে। একসময় আর কোন শব্দ নেই। দরজার ফুটো দিয়ে দেখি বিছানায় ওভাবেই শার্ট প্যান্ট জুতো পরে শুয়ে আছে রুদ্র। আর কোনও শব্দ নেই। নৈঃশব্দের সঙ্গে আমার চোখের জলের ফিসফিস করে কথা হয়। ভোর হওয়ার জন্য প্রকৃতির কাছে প্রার্থণা করতে থাকি। এই দুঃসহ কালো রাত পার যেন হয়। এত দেরি করে কোনও রাতকে আমি পার হতে দেখিনি এর আগে। ভোরবেলা ব্যাগটি নিয়ে আলগোছে দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে রুদ্রর ওই অপেক্ষার দিনলিপির পাশে লিখে রাখি, *রোদ, দুদিন থেকে অপেক্ষা করেছি তোমার জন্য। তুমি আসোনি। কাল রাতে একটি অচেনা লোক ঘরে এসেছে, লোকটিকে আমি চিনি না। আমি চলে যাচ্ছি। যেখানেই থাকো তুমি, ভাল থেকো। তোমার সকাল।*

এত ভোরে রাস্তায় বেশি যানবাহন থাকে না। দুএকটি রিক্সা মন্থর গতিতে চলছে। একটি মন্থরকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোই। ভোরবেলার প্রথম বাসটি ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের দরজায় পা রাখতেই কনডাকটর জিজ্ঞেস করে সঙ্গে *পুরুষলোক নাই?*

না।

এই লেডিস একটা।লেডিস একটা। কনডাকটর চেঁচিয়ে বলে। কাকে বলে কে জানে। *লেডিস একটা* মানে সতর্ক করে দেওয়া সবাইকে যে আমাকে নিরাপদ একটি জায়গায় বসতে হবে। লেডিসের নিরাপত্তা হল *লেডিস সিটে,* ড্রাইভারের পাশের জায়গাগুলোকে বলা হয় লেডিস সিট। মেয়েরা একা বাসে উঠলে ওখানেই, ওই জায়গায় বসারই নিয়ম। বাসে, লেডিসের সঙ্গে লেডিসকে না বসালে লেডিসের জন্য যাত্রা নিরাপদ হয়না বলে ভাবা হয়। *লেডিস সিট* ভরে যাওয়ার পর যদি বাড়তি লেডিস উদয় হয় তখন তাকে *অলেডিস* সিটে বসিয়ে দ্বিতীয় লেডিসের অপেক্ষা করতে থাকে কনডাকটর যেন প্রথম লেডিসের পাশে দ্বিতীয়টিকে বসিয়ে দিতে পারে। সেদিন লেডিস সিটে জায়গা নেই, অপেক্ষা করেও কোনও দ্বিতীয় লেডিসএর টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি করা? মাঝবয়সী স্বামী স্ত্রী বসে আছে পাশাপাশি, কনডাকটর স্বামীটিকে বলল, *ভাইজান আপনে অন্য সিটে বসেন, আপনের লেডিসের সাথে এই লেডিসরে বসাইয়া দেই।* আমি বললাম, *না থাক, ওদেরে উঠাইয়েন না।* সমস্যা সমাধানের আরও উপায় বাসের কনডাকদের জানা আছে। লেডিসের পাশে বসার জন্য কোনও লেডিস অগত্যা পাওয়া না গেলে বাসে যে পুরুষটি সবচেয়ে বুড়ো বা যে ছেলেটি একেবারে বাচ্চা, দাড়িমোচ ওঠেনি, তার সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া। কোনওভাবেই কোনও যুবকের পাশে নয়।

লেডিস সিট খালি নাই। ছোট কনডাকটর বড়টিকে বলে। বড়টি এরপর খুঁজে পেতে এক বুড়োকে আবিস্কার করে জিজ্ঞেস করে, *চাচা আপনে একলা?*

হ।

যান ওই চাচার সাথে বসেন গিয়া। আমাকে নির্দেশ।

আমি মেয়ে বলে আমার সিট পছন্দ করে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের। কোনও এক *বুড়ো চাচার* পাশে বসিয়ে কনডাকটর ভেবেছে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে সে। কোনও পুরুষ বাসে উঠলে সে তার পছন্দ মত জায়গা বেছে নিয়ে বসে। কিন্তু একা কোনও মেয়ে এলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ না কনডাকটর তার বসার আয়োজন করে। আমাকে নিরাপদ সিটে বসার ব্যবস্থা করে ছোট এবং বড় দু কনডাকটরই স্বস্তি পায়। বাসের জানালায় মাথা রেখে আমি ভাবি, পরপুরুষের পাশে বসা নিরাপদ নয় বলে বাসে এই নিয়ম চালু করা হয়েছে, মেয়েদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ,লোকে জানে যে *আপন পুরুষ!* সবচেয়ে নিরাপদ স্থানটি আপন পুরুষের ঘর! স্বামীর ঘর। কনডাকটরটি যদি জানত, আমার জন্য ওটিই কত *অনিরাপদ!*

অবকাশে ফিরে নিরাপদ বোধ করি। অবকাশের চারদিকে উঁচু দেয়াল, দেয়ালের ওপর ভাঙা কাচ বসানো। তার ওপর আরও উঁচু করে দেওয়া কাঁটাতারের বেড়া। বাইরের জগত থেকে আলাদা করা এই বাড়িটিকে একসময় কারাগার বলে মনে হত আমার। এখন মনে হয় এখানেই থোকা থোকা শান্তি লুকিয়ে আছে। মা আমার দিকে তীক্ষ্ণ একটি দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন যদিও, বুঝি ওই দৃষ্টির আড়ালে ওত পেতে আছে স্নেহ। যত দুর্ঘটনাই আমি ঘটাই না কেন, ওই স্নেহ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। নার্গিসকে দিয়ে মা ভাত পাঠান আমার ঘরে। ভাতের সঙ্গে আমার প্রিয় বেগুন ভাজা, খাসির মাংস। খুব যত্নে বেড়ে দেওয়া। মা কি করে জানেন, এই সকালে আমার পেটে ভাতের ক্ষিধে! মা মানেই কি এই, মা সব বুঝে নেবেন, কোনও কিছু বলার দরকার হবে না! ইয়াসমিন ওর নতুন তোলা একটি গান গাইছে বিছানায় বসে। সুহৃদ একটি প্রজাপতির গা রং করছে জল রংএ, আর বলছে, *প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় পেলে তুমি এমন রঙিন পাখা!* সুমন ইয়াসমিনের গান শুনতে শুনতে বলছে, *ইয়াসমিন আপা তুমি এত সুন্দর গান গাইতে পারো তা আগে জানতাম না।* সুমন হাশেমমামার ছেলে, একটিই ছেলে হাশেমমামার, বাকি সব মেয়ে। গতকাল এ বাড়িতে হাশেমমামা সুমনকে রেখে গেছেন। আকুয়া রেললাইনের ওপর কিছুদিন আগে একটি চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের ছেলেকে সমবয়সী কিছু ছেলে খুন করেছে। খুন করতে কোনও পিস্তল বা বন্দুকের প্রয়োজন হয়নি, একটি ছুরিই যথেষ্ট ছিল। খুনের আসামিদের তালিকায় সুমনের নামটিও আছে। হাশেমমামা মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আওয়ামি লিগের আকুয়া ইয়নিয়ন শাখার সভাপতি হয়েছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা নাম ভাঙিয়ে অনেক সুবিধে লুটেছে। টাকা করেছে অনেকে অনেক রকম উপায়ে। অনেকে মন্ত্রী হয়েছে, বিদেশে রাষ্ট্রদূত হওয়ার চাকরি পেয়েছে। হাশেমমামার কিছুই হয়নি। তিনি এসবের পেছনে দৌড়োননি। জীবিকার জন্য কায়ক্লেশে নতুন বাজারে ভাত মাছ বিক্রি করার ছোট্ট একটি দোকান কিনেছেন। এই করে ঘরের পারুল বউ আর পাঁচটি মেয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে তিনি গাদাগাদি করে থাকছেন সেই খুপড়ি একটি ঘরে। যে ঘরে বিয়ের পর থেকেই থাকছেন। এতগুলো ছেলেমেয়ে হল, ছেলেমেয়ে বড়ও হয়েছে, কিন্তু তিনি আজও সেই ঘরে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সম্পত্তির কোনও মোহ নেই। নিজের লেখাপড়া হয়নি হাশেমমামার, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। মেয়েগুলো পরীক্ষায় ভাল ফল করে, কেবল ছেলে নিয়েই ঝামেলা। পাড়ায় ছেলের বন্ধুবান্ধব বেশি, লেখাপড়ায় মন নেই। বন্ধু হলে শত্রু হয়। কোনও এক শত্রু সুমনের নামটি আসামির তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হাশেমমামা ছেলেকে বংশের বাতি বলে মনে করেন না। ননীটা ছানাটা খাইয়েও একে মানুষ করতে হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। পনোরো ষোল হলেই মেয়েদের এক এক করে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার

কথা কখনও ভাবেন না। মেয়ের চেয়ে ছেলেকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতি নন তিনি। এই সমাজে বাস করে হাশেমমামা সমাজের আর দশটা লোকের মত নন। এই অন্যরকম হাশেমমামার প্রতি আমার বিষম আগ্রহ। খুব ইচ্ছে করে তাঁকে জিজ্ঞেস করি, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। কি করে ভারত চলে গিয়েছিলেন, কি করে ওখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন যুদ্ধের, কি করে মুক্তিযুদ্ধের গ্রুপ-কমান্ডার হয়ে তিনি জঙ্গল পার হয়ে নদী সাঁতার কেটে দেশের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গিয়েছেন! কি করে তিনি পাক সেনাদের দিকে গুলি ছুঁড়েছেন, কটাকে কুপোকাৎ করেছেন কোনওদিন জিজ্ঞেস করা হয় নি। সুমনকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হাশেমমামা হন্যে হয়ে ঘুরছেন। এক আশ্চর্য সততা সম্বল করে হাশেমমামা বাঁচেন। তিনি মিথ্যে মামলা থেকে ছেলেকে রক্ষা করতে পারেন না। কারাগারের মত এই বাড়িটি আপাতত তাঁর ছেলেকে বাঁচাবে বলে পুলিশের হাত থেকে না হলেও পাড়ার শত্রুদের হাত থেকে, হাশেমমামা বাবাকে অনুরোধ করেছেন সুমনকে এ বাড়িতে কদিন রাখার। বাবা রাজি হয়েছেন। কিন্তু ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর সুমন আর ইয়াসমিনকে নিয়ে গান কবিতায় হাসি ঠাট্টায় গল্পেগাছায় খেলায় ধুলায় মেতে থেকে প্রমোদে মন ঢেলে দিয়ে ঠিক দুদিন পর এই আমি রাজি হইনা সুমন অবকাশে আর একটি মুহূর্ত থাকুক। কারণটি হল একটি অসহায় মেয়ের থরথর কাঁপুনি দেখেছি আমি মধ্যরাতে। নার্গিসের দৌড়ে আসার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার। ওর ভয়ার্ত শ্বাসের শব্দে আমি চোখ খুলেছি। আমার দরজায় দাঁড়ানো কাঁথা বালিশ হাতে, কাঁপছে ও। শরীর কাঁপছে। চোখ বিস্ফারিত।

কি হইছে তর?

আমি ঘুমাইতাছিলাম। সুমন ভাইয়া আমারে জাইত্যা ধরছে।

আমি তড়িতে বিছানা থেকে নেমে নার্গিসকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওর গায়ের কাঁপুনি থামাই। ঘরের ভেতর ওকে ঢুকিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিই। নার্গিস সে রাতে আমার ঘরের মেঝেয় কাঁথায় গা মুড়ে কুকুরকুণ্ডুলি হয়ে বলে, *আমি জিগাইছি, আপনে এইখানে আইছেন কেল্লিগা? কইতেই আমার মুখ চাইপা ধরছে। আমারে কয়, তুই রাও করিস না। কেউ জানব না। কেউ বুঝব না। আমি চিল্লাইয়া আপনেদেরে ডাকতে চাইছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেরে ছুটাইয়া আইছি আপা।*

কত হবে বয়স নার্গিসের? তেরো। বাবা গরিব বলে মেয়েকে অন্যের বাড়ি কাজ করতে দিয়েছে। ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত অবদি কাজ করে ঘুমোতে যায়। এই সময়টুকুই নিজের ওর। এই ঘুমোনোর সময়টুকু। অথবা তাও হয়ত নয়, ঘুমোতে ওকে দেওয়া হয় পরদিন তাজা শরীরে বাড়ির সমস্ত কাজ যেন সারতে পারে। নার্গিসের তো ইশকুলে যাওয়ার কথা এ বয়সে। অথচ ও এখনও স্বরে অ স্বরে আ পড়তে জানে না। সুহৃদ যখন বই খুলে স্বরে অ স্বরে আ পড়ে, নার্গিস অভিভূত চোখে তাকিয়ে থাকে। ওরও নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে এমন করে বই খুলে পড়তে। নার্গিসের বাবা অবকাশে মাঝে মাঝে নার্গিসকে দেখতে আসেন। মা তখন নার্গিসকে তড়িঘড়ি ময়লা জামা পাল্টে ধোয়া জামা পরে, হাতে পায়ে তেল মেখে রুক্ষতা আড়াল করে চুল আঁচড়ে ওর বাবার সামনে যেতে বলেন। ওর বাবা যেন দেখে মনে করেন মেয়ে তাঁর সুখে আছে এখানে। ভাতে মাছে গোসলে কাপড়ে তেলে খেলে। দুপুর হলে নার্গিসের বাবাকে বারান্দার ঘরে বসিয়ে ভাতও খাইয়ে দেন মা। খাওয়ার সময় মা দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে বলেন, *আপনের মেয়ে খুব ভাল আছে এইখানে, কোনও চিন্তা কইরেন না।*

খেয়ে দেয়ে নার্গিসের বাবা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, *সবার কথা শুইনা থাইকো মা, তোমারে সবাই কত আদর করে এই বাড়িতে। সবাইরে মাইনা চলবা।*

নার্গিস দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ওর বাবার চলে যাওয়া দেখে, চোখে বানের পানি।

কি রে নার্গিস কানতাছস কেন? যদি কখনও বলি, নার্গিস দ্রুত পানি মুছে হেসে ফেলে।

না আপা, কান্দি না। ঝুল পরিষ্কার করতাছিলাম, চোখে ময়লা পড়ছে।

নার্গিসের এরকমই উত্তর, *না আপা কান্দি না,পিঁয়াজ কাটতাছিলাম, চোখে ঝাঁজ লাগছে।*

সকালে আমি মাকে বলি ঘটনা। মা চুপ হয়ে যান শুনে। হাশেমমামাকে মা খুব পছন্দ করেন। প্রায়ই বলেন, *এই একটা ভাই আমার, বড় ভাল। কাউরে ঠগায় না। কারও ক্ষতি করে না। কাউরে খারাপ কথা কয় না। মানুষের উপকার করে যেইভাবে পারে। মানুষের কত শত্রু থাকে। হাশেমের কোনও শত্রু নাই।*

এ বাড়িতে ভাল ভাইটির ছেলেটিকে আপাতত রেখে ভাল ভাইটিকে সামান্য হলেও দুশ্চিন্তামুক্ত করছেন বলে মার আনন্দ হচ্ছিল। মার আত্মীয়স্বজনকে বাবা কখনও সাদর আমন্ত্রণ জানান না অবকাশে। সুমনকে অবকাশে কদিন থাকতে দিতে রাজি হয়েছেন বাবা, সুমনের জন্য বাবার এমন উদার হৃদয়, হাশেমমামার ব্যক্তিত্বের কারণেই। মার কষ্টের নদীতে সুমনকে আশ্রয় দেওয়ার যে আনন্দ-ডিঙিটি ছিল, তা ডুবিয়ে দিই। সুমনকে জিজ্ঞেস করেন মা, রাতে সে নার্গিসের বিছানায় গিয়েছিল কি না। আকাশ থেকে পড়ে সুমন। গলা ফাটায়, *ছেড়ি মিছা কথা কয়।*

মা শান্ত গলায় বললেন, *না ছেড়ি মিছা কথা কয় নাই।*

মা সেদিনই হাশেমমামাকে ডেকে সুমনকে অবকাশ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ নয়, আদেশ করেন।

হাশেমমামা সুমনকে অবকাশ থেকে *ছেড়ারে জেলে ভইরা থওয়াই ভাল বড়বু* বলে নিয়ে যাওয়ার পরদিন হাসপাতালে পেছনে কৃষ্টপুরে নার্গিসদের বাড়িতে গিয়ে নার্গিসের মায়ের হাতে পাঁচশ টাকা দিয়ে বলে আসি, বিলকিসকে যেন ইশকুলে ভর্তি করায়, কারও বাড়িতে যেন *বান্দিগিরি* করতে না দেয়। ছোট্ট সুন্দর গোল মুখের নাকছাবি পরা বিলকিস উঠোনের ধুলোয় বসে মিছেমিছির রান্নাবাড়ি খেলছিল, ছ বছরের এই বাচ্চাটিকে কৃষ্টপুরের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতেই নার্গিসের মা পেটে ভাতে কাজে দেবেন বলে ঠিক করেছিল।

এক বছরের ইন্টার্নশিপের জন্য ডিউটি ভাগ করা হয়ে গেছে। যে কোনও একটি বিষয়ে *ফিক্সড ডিউটি* করতে হয়। যে বিষয়টিকে আমি প্রধান বলে মনে করি, সেই বিষয়ে। বেশির ভাগ মেয়েরা স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগে ফিক্সড ডিউটিটি নিয়েছে। মেডিসিন সার্জারি এক মাস করে হলেও স্ত্রীরোগে চার মাস। যৌনাঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার বিশেষ পছন্দের ছিল না ছাত্রী থাকাকালীন, কিন্তু এই বিষয়টিকেই আমি প্রধান বিষয়ে হিসেবে নির্বাচন করে ফিক্সড ডিউটি নিই এই বিভাগে। চারমাসে চার মিনিট ফাঁকির কোনও সুযোগ নেই। ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। ডাক্তারি প্রশিক্ষণে অংশ নিতে প্রতি বছর বিদেশের মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা ডাক্তার আসে। এ দেশে চাকরি করতে গেলে এ দেশে ডাক্তারি প্রশিক্ষণ নিতে হয়, নিয়ম এমন। প্রথম দিনই পরিচয় হয় মস্কো থেকে পাশ করে আসা দিবালোক সিংহের সঙ্গে। দিবালোক কমরেড মণি সিংহের ছেলে। সুসং দুর্গাপুরের মণি সিংহ। হাজং বিদ্রোহের মণি সিংহ। দুঃস্থ দরিদ্র মানুষের জন্য পুরো জীবন উৎসর্গ করা মণি সিংহ। সাধারণত বিদেশ থেকে পাশ করে আসা ডাক্তারদের আহামরি কিছু ভাবা হয় না। ভাবা হয় না কারণ তাদের মাথায় বিদ্যে থাকলেও হাতে দক্ষতা কম। বিদেশে এদেশের মত বেওয়ারিশ লাশও পাওয়া যায় না ইচ্ছেমত কেঁটে ছিঁড়ে বিদ্যেটি শেখার। এমন দরিদ্র রোগীর ভিড়ও নেই অন্য দেশে যে নির্ভাবনায় যখন তখন রোগির শরীরে গুঁতোগুঁতি করা যাবে, কোনও রোগী টুঁ শব্দ করবে না। আর অপারেশন থিয়েটারে সার্জনদের সহযোগিতা করার যে সুযোগ চতুর্থ বর্ষ থেকে আমাদের মেলে সেই সুযোগ তারা বিদেশের হাসপাতালে পায় না। খোদ বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে আসা এক মেয়েকে অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন যখন জিজ্ঞেস করলেন, *কি মেয়ে, সিজারিয়ানে এসিস্ট করতে পারবা?* মেয়ে মাথা নাড়ে, পারবে না। কোনওদিন করেনি। হেসে, জোবায়েদ হোসেন দেশি কাউকে ডাকেন। বিদেশিগুলোর *পড়া* বিদ্যে, *দেখা* বিদ্যে, *করা* বিদ্যে নেই। দিবালোক সিংহের পড়া বিদ্যে দেখা বিদ্যে থাকলেও আমি তাকে খাতির করি। প্রসব কক্ষে রোগির কাটা যৌনাঙ্গ কি করে পরতে পরতে সেলাই করতে হবে হাতে ধরে শিখিয়ে দিই তাকে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজটিতে ভাল লেখাপড়া হয়, এ কলেজ থেকেই প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীরা দেশের অন্য যে কোনও কলেজের ছাত্রছাত্রীর চেয়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করে। আমাদের আগের বছরে রাজিব আহমেদ হয়েছিলেন প্রথম। আমাদের বছরে এম-ষোল ব্যাচের প্রতিটি প্রফেশনাল পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে মনসুর খলিল। এ কলেজটি ভাল হলেও এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজে বেশির ভাগ সময় ছাত্র আন্দোলনের কারণে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া কম হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ বিলেতি পরিদর্শকদের *অনুমোদন* পেয়েছে,

এ কলেজ পায়নি। পরিদর্শকবৃন্দ আসার আগে এই কলেজ হাসপাতাল দুটোই ধুয়ে মুছে তকতক করা হয়েছিল, ডাক্তার ছাত্রছাত্রী সবাই ধোয়া কাপড় পরে পরিপাটি হয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলেছিল সেদিন, তারপরও মহামূল্যবান *অনুমোদন* জোটেনি, কারণ পরিদর্শকবৃন্দ একটি নেড়ি কুকুরকে বসে থাকতে দেখেছেন হাসপাতালের বারান্দায়। অনুমোদন পাওয়া মানে এ কলেজ থেকে পাশ করে বিলেতের কলেজে বাড়তি লেখাপড়া করার অনুমতি পাওয়া। অনুমোদন পাওয়া হয়নি বলে আমরা খুব একটা মুষড়ে পড়িনি। মনসুর খলিল তো নয়ই। যে ছেলে বাড়ি আর কলেজ ছাড়া আর কোথাও নড়তে চায় না, তার জন্য বিলেত কোনও স্বপ্ন নয়। মনসুর খলিল দেখতে আস্ত একটি পাহাড়। ওজন দুশ কিলোর মত। খায় আর লেখাপড়া করে। শরীরটির লজ্জায় সে বাইরে কোথাও বেরোয় না, কোনও মেয়ের সঙ্গে কথা বলে না। মাঝে মাঝে আমি যেচে কথা বলি মনসুরের সঙ্গে। অবশ্য বেশির ভাগই মজা করতে। করি সাফিনাজ সঙ্গে থাকলে। আমাদের দেখতে ভাল লাগে কথা বলতে গিয়ে মনসুর খলিলের ফর্সা মুখটি যখন পাকা আমের মত লাল হয়ে ওঠে। হাসপাতাল এলাকাটিতে আমি সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি নিজের পরিচয় নিয়ে। এখানে আমার মধ্যে আর একটি ডাক্তার-ছেলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। আমি যদি মেধায় দক্ষতায় ছেলেটির চেয়ে ভাল হই, এখানে আমি মর্যাদা পাবো ছেলের চেয়ে বেশি। এখানে আমরা নারী পুরুষের যৌনাঙ্গ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করে অভ্যস্ত, ঘেঁটে অভ্যস্ত। যে শব্দ মুখে উচ্চারণ করা এই এলাকার বাইরে মানা সে সব শব্দ উচ্চারণ করতে এই এলাকায় লজ্জা বা দ্বিধার লেশমাত্র কারও জিভে থাকে না। ইন্টার্নি হয়েই হাসপাতালের ডক্টরস ক্যান্টিনে আমি যেতে শুরু করেছি। ডিউটির ফাঁকে ক্ষিধে লাগলে চা সিঙ্গারা খাই। সময় থাকলে আড্ডা আর টেবিল টেনিস দুটোই চলে। এখানে পুরুষ ডাক্তারের গায়ে যদি আমার গা লাগে বা হাতে হাত লাগে তবে আমি *নষ্ট* হয়ে গেছি বলে মনে করা হয় না। আমার *বাইসেপ ব্র্যাকিতে ওর ট্রাইসেপ ব্র্যাকির টাচ* লেগেছে বলেই বলা হয়। এখানে সবচেয়ে বড় পরিচয় আমি একজন ডাক্তার। মাঝে মাঝে ওয়ার্ডের রোগীরা ভুল করে সিস্টার ডাকলে অবশ্য শুধরে দিতে হয়, যে আমি নার্স নই। আর্কিটেকচারে পড়তে না পারার জন্য যে আফসোসটি ছিল আমার, সেটি ডক্টরস ক্যান্টিনের চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়ে যায়। ডাক্তার হয়ে আমি ভুল করিনি, এ বিশ্বাসটি শক্ত হয়ে মনের মাটিতে গেড়ে বসে, যদিও ডাক্তারি পড়তে গিয়ে আমার সাহিত্য চর্চা গোল্লায় গেছে, শখের যে কবিতা, সেও আর লেখা হয় না। কবিতা লিখে নিজের একার আনন্দ হয়, কিন্তু চিকিৎসা করে হাজার মানুষকে আনন্দ দিতে পারি। হাসপাতালে সব ধরনের রোগী আসে, উচ্চবিত্তরা কেবিন ভাড়া করে, মধ্যবিত্তরা সামর্থ হলে করে, দরিদ্র থাকে ওয়ার্ডে। হাসপাতালে ওষুধের অভাব, সব ওষুধ সরকার দেয় না। সেই ওষুধগুলো রোগীদের কিনে আনতে হয় বাইরে থেকে। কিন্তু দরিদ্র রোগীর পক্ষে বাইরে থেকে ওষুধ কেনা সম্ভব নয়। উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত রোগিকে যখন কেনার জন্য ওষুধের নাম লিখে দিই কাগজে, একটির দরকার হলে লিখি পাঁচটি। পাঁচটির দরকার হলে লিখি দশটি। লিখি, কারণ উচ্চবিত্তর জন্য ব্যবহারের পর বাকি যা থাকবে তা দেব দরিদ্র রোগিকে। কোনও রোগিকে জানানো হয় না যে আমরা ডাক্তাররা গোপনে গোপনে এই কাজটি করি, দরিদ্র বাঁচাই। দরিদ্রদের জন্য সন্ধানীতেও দৌড়োই। দরিদ্ররা রক্তের ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে রক্ত কিনতে পারে না, দরিদ্রদের রক্ত লাগলে সন্ধানী থেকে এনে নিই। কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা সন্ধানী নামের এই সংস্থাটি দরিদ্রদের সাহায্য করতেই খুলেছে। একদিন সন্ধানী আপিসে গিয়ে আমি চোখ দান করে আসি। মৃত্যুর পর চোখদুটো যেন কাজে লাগে

কোনও অন্ধের। ওদের বলি, আমি দেহদান করব। মৃত্যুর পর আমার দেহ যেন মেডিকেল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে পাঠানো হয়। সন্ধানীতে দেহদানের কোনও কাগজপত্র নেই যে দান করতে পারি। সম্ভবত বেওয়ারিশ লাশের আধিক্য বলে এই প্রয়োজনটির কথা সদস্যরা উপলব্ধি করে না। আমার এপ্রোনের পকেটে ঝুনঝুন করে প্রচুর অ্যাম্পুল। ধনীর টাকায় কেনা ওষুধ পকেটে জমছে। ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের দিয়ে যাওয়া ওষুধ জমছে। একদিকে জমছে, আরেকদিকে যাচ্ছে, দরিদ্র রোগীর হাতে যাচ্ছে। সব ডাক্তারের পকেটেই দরিদ্রকে সাহায্য করার জন্য কিছু না কিছু ওষুধ থাকে। কেউ কেউ ওষুধ না থাকলে নিজের পকেট থেকে টাকা দেয় ওষুধ কিনে আনতে। এমন উদারতা আর সততার মধ্যে আমার ডাক্তারি চর্চা চলে। কেউ কেউ আবার ওষুধের ভেতর ডুবে থেকে মাঝে মাঝে উদ্ভট সব কাণ্ড করে ফেলে। আমারই ক্লাসের ছেলে রিজওয়ান দেখতে বুদ্ধিতে তুখোড়, রোগির জন্য সরকারি ওষুধের ভাণ্ডার থেকে পেথিডিন নিয়ে নিজে মজা করতে গিয়ে একদিন নিজের শরীরেই পেথিডিন ঢুকিয়ে *মজা* পেয়ে বার বারই পেথিডিন ঢোকাচ্ছে এখন। এ তো আটকে যাওয়া জালে। নেশার জালে। অনেক ডাক্তার আবার নিজেরাই নানা উদ্ভট কাজে নিজেদের আটকাতে চেষ্টা করে। সার্জারি ওয়ার্ডে ডিউটি আমার তখন। মস্তিষ্কের অপারেশন করছেন অধ্যাপক। মাথার খুলি খোলা। খুলি খুলে রেখেই অধ্যাপক হাত ধুয়ে ফেললেন। কেন? নামাজ পরবেন তিনি। কোনও নামাজই তিনি বাদ দেন না। অপারেশন চলাকালীন সময়ে আযান পড়লে রোগিকে পনেরো মিনিট বেশি অজ্ঞান রেখে নামাজ সারেন। ডাক্তার হয়ে কি করে ধর্মে বিশ্বাস করেন, আমি বুঝে পাই না। মস্তিষ্কের মত জটিল জিনিস যে অধ্যাপকের মাথায় এত পরিষ্কার ঢোকে, তাঁর কেন এ জিনিসটি মাথায় ঢোকে না যে ধর্ম একটি যুক্তিহীন ব্যাপার। কি করে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন আল্লাহ নামের একজন বসে আছেন সাত আসমানের ওপর, তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজের হাতে গড়া এই পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবেন একদিন, তারপর শেষ বিচারের দিন সব মানুষকে আবার জীবিত করবেন, সকলেই কুড়ি বছরের বয়সের মত দেখতে হবে, হাশরের মাঠে জিন এবং মানুষের বিচার হবে, তারপর অনন্ত কালের জন্য মানুষেরা বাস করবে বেহেসত অথবা দোযখে, যারা আল্লাহকে মানেনি তারা দোযখে যাবে, যারা মেনেছে তারা বেহেসতে,এরকম উদ্ভট রূপকথা!আসলে রূপকথাগুলোকেও আমার এত অবাস্তব ঠেকে না, যত ঠেকে ধর্মগুলোকে। ব্যাঙ থেকে রাজকুমার বেরোতে পারে, মুরগির ঠ্যাংয়ের ওপর ডাইনির বাড়ি থাকতে পারে, কিন্তু এই জীবনের পরে আরও কোনও জীবন থাকতে পারে না। কিছু কিছু ডাক্তার ওই জটিল অস্ত্রোপচার করতে করতে বিশ্ব-ইস্তেমায় যাওয়ার কথাও বলেন। টঙ্গীতে ইস্তেমা হচ্ছে, মুসল্লিরা যাবে, ওয়াজ মাহফিল শুনবে, বিশাল জমায়েতে নামাজ পড়বে। তিন দিনের ছুটি নিয়ে টুপি পরা ডাক্তাররা যায় ইস্তেমায়। টুপিঅলা ডাক্তারের সংখ্যা অবশ্য হাতে গোনা। কিন্তু তাই বা হবে কেন! কেনই বা একজন ডাক্তার মাথায় টুপি পরবে! আর কেউ ধর্ম বিশ্বাস করলে আমি বলি যে শিক্ষা নেই দীক্ষা নেই, বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাই ধর্ম বিশ্বাস করে। কিন্তু ডাক্তারদের বেলায় আমি কোনও কারণ দেখি না এসব বিশ্বাসের। ইস্তেমা যাত্রী বাবুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, *তুমি কি কারণে আল্লাহ বিশ্বাস কর?*

কি কারণে করব না?

খুব সাধারণ যুক্তির কারণে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তো মাথা ঢের খাটিয়েছো। ধর্মের ব্যাপারে খাটাও না! দুনিয়ার সব কিছু তো যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো, কোরান হাদিসের কথাগুলো কি একবার যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছো?

বাবুল নিজেই বলে সে তা করেনি। সে করতে চায় না। কারণ সে মনে করে যুক্তি এক জিনিস, বিশ্বাস আরেক। দুটোকে সে মেলাতে চায় না। বাবুল, আমার বিশ্বাস, জানে যে ধর্ম সম্পূর্ণ যুক্তিহীন একটি ব্যাপার। সে ভাল জানে যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছদিনে সৃষ্টি হয়নি। জানে যে সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না। জানে যে পাহাড়গুলো আল্লাহ কিলকের মত আটকে রেখেছেন বলে পৃথিবী ডানে বামে হেলে পড়ছে না এই তথ্য মিথ্যে। মিথ্যে যে পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম, দ্বিতীয় মানুষ আদম থেকে সঙ্গিনী হাওয়াকে তৈরি করা হয়েছে, মিথ্যে যে গন্দম ফল খেয়েছে বলে আল্লাহ তাদের শাস্তি দিয়ে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করেছেন। বাবুল জানে বিং ব্যাং এর কথা, জানে যে কোটি কোটি বছর ধরে মহাশূন্যে কোটি কোটি গ্রহ উপগ্রহ, নক্ষত্র ঘুরে চলছে। মানুষ নামক প্রাণীর কি করে উৎপত্তি জানে সে, জানে বিবর্তনের তত্ত্ব। কিন্তু তারপরও সে নামাজ রোজা করছে, ইস্তেমায় যাচ্ছে। এর কারণটি হল, সে লোভী। লোভী বলেই ইহজগতও চায়, পরজগতও চায়। ইহজগতে ডাক্তার হয়ে সমাজে উঁচু স্তরের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, এতে তো সুখ আছেই। আর যদি আল্লাহ বলে কিছু থাকে, পরকাল বলে কিছু থাকে, তবে পাঁচবেলা নামাজ, এক মাস রোজা আর বছরে একবার ইস্তেমায় গিয়ে যদি বেহেসত জোটে, তবে মন্দ কি!

বাবুলের মত ছেলের সঙ্গে তর্কে গিয়ে কোনও লাভ নেই। বাবুল কোনও তর্কে যেতেও চায় না। সে তার বিশ্বাস নিয়ে থাকতে চায়।

আজকাল কোরান হাদিসএর অনেক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে জুৎসুই উত্তর মার মুখে খেলে না। মা যখন কোরান শরিফ সামনে নিয়ে দুলে দুলে পড়েন, সামনে বসি। কোরান পড়তে পড়তে দোযখের আগুনের কথা মনে করে মার মুখটি যখন বিবর্ণ হয়ে থাকে, আমার ওই বসে থেকে মার কোরান পড়া শোনাটিকে আমার সুমতি হয়েছে বলে ধরে নিয়ে মুখের আদি বর্ণ ফিরে আসে মার। মা স্নিগ্ধ হেসে বলেন, *কি, পড়বা কোরান শরিফ?*

আমি হেসে বলি, *আমি তো পড়ছিই। একটা বই আর কতবার পড়তে হয়?*

আমার যে মোটেও সুমতি হয়নি, তা আঁচ করেন মা।

আচ্ছা মা, এই যে ছেলেরা টুপি পরে, কেন পরে?

সুন্নত পালন করে। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়েসসাল্লাম যেই পোশাক পরতেন, সেই পোশাকই পরাটা সুন্নত। দাড়ি রাখাটা সুন্নত।

নবীজিরে অনুকরণ করতে চায় কেন?

বাহ! করবে না কেন। উনি তো শেষ নবী। শ্রেষ্ঠ নবী। আল্লাহর পেয়ারা রসুল।

নবীজির গুণের শেষ নাই, তাই না?

তাঁর মত গুণ আর কারও নাই। তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ।

কোলে একটি বালিশ নিয়ে বালিশে দু কনুইয়ের ভর দিয়ে বসে হেসে উঠি আমি।

তুমিই বল আল্লাহর পেয়ারা রসুলের, শ্রেষ্ঠ নবীর, শ্রেষ্ঠ মানুষের আমাদের নবীজির কি ছয় বছর বয়সের আয়শারে বিয়া করা উচিত হইছিল?

তিনি অনেক মেয়েরে বিয়ে করছেন মেয়েদের দারিদ্র থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। অসহায় মেয়েদের একটা গতি করছেন তিনি।

ছয় বছরের মেয়ে আয়শার কি গতিটা করছেন শুনি? যদি তিনি আয়শার গতি করতে চাইতেন সত্যিকারের, তাইলে তারে ওই বয়সে বিয়া করতেন না, পালক মেয়ে হিসাবে পালতে পারতেন। গরিব মেয়েদের উপকার করতে চাইলে তাদের টাকা পয়সা দিয়া

সাহায্য করতে পারতেন। বিয়া কইরা না। বিয়াই যদি অত দরকার হইতো, নিজের বন্ধু বান্ধব যারা বিবাহিত না, তাদের সাথে বিয়া দিতে পারতেন। নিজের বিয়া করার দরকার কি ছিল, দেশে কি আর পুরুষ মানুষ ছিল না নাকি?

উনারে পছন্দ করছেন মেয়েরা.. তাই উনারে..

পছন্দ করছে? কারও পছন্দের ধার কি উনি ধারছেন নাকি? নিজের ছেলের বউ জয়নব কি উনারে পছন্দ করছিল? নাকি ছেলের বাড়িত গিয়া বউরে দেইখা পাগল হইয়া বিয়া কইরা ফেলছেন! কি কইরা ছেলের বউরে মানুষ বিয়া করে কও তো! বাবা যদি এহন দাদারে বলে, হাসিনারে তালাক দে, আমি ওরে বিয়া করাম। কিরকম হইব? দাদা বাপের আদেশে হাসিনারে তালাক দিল। আর বাবা হাসিনারে বিয়া করল। ছি ছি ছি।

নবীজির নিজের কোনও ছেলে ছিল না। জাইদ পালক ছিল।

পালক থাকুক। পালক হইছে বইলা কি ছেলে না? মানুষ তো ছেলে মেয়ে পালক রাখলে নিজের ছেলে মেয়ের মতই মানুষ করে। ধর তুমি যদি একটা মেয়ে পাইলা টাইলা বড় কর, তারপরে কি বলতে পারবা যে এইডা তোমার মেয়ে না? পারবা ওই পালক মেয়ের স্বামীরে বিয়া করতে? পারবা না তো। ওই ছেলের বউরে বিয়া করার পরই তো আইন পাইল্টা গেল। পালক পুত্র কন্যা সত্যিকার পুত্র কন্যা নহে। সুতরাং তাদেরে উত্তরাধিকার থেইকা বঞ্চিত কর। নিজের স্বার্থের জন্য কেউ এমন নির্মমতা করে?

স্বার্থ না। স্বার্থ না। না বুইঝা কথা কইস না।

স্বার্থ ছিল বইলাই তো ধনী খাদিজারে বিয়া করছিলেন। খাদিজার ধন লইয়া ব্যবসা করলেন। তহন অন্য মেয়ের দিকে নজর দেন নাই। যেই খাদিজা মারা গেল, সমানে বিয়া করতে লাগলেন।একটার পর একটা। কেন? খাদিজা বাইচা থাকতে তো ওই সাহস হয় নাই! স্বার্থ না তো কি? যুদ্ধে শত্রুসম্পত্তি তো দখল করছেনই, শত্রুপক্ষের মেয়েদেরও ভোগ করছেন। করেন নাই? নিজের জন্য সুন্দরীগুলারে রাইখা বাকিগুলা বন্ধুদের বিলাইছেন। কোরানেও তো লেখা আছে, নবীরে ভোগ করতে দাও এই সব মেয়ে!! ছি!! কোনও বিবেকবান মানুষ এই জঘন্য কাজ করে? কোনও সুস্থ লোক চৌদ্দটা বিয়া করে?

চৌদ্দটা না, তেরোটা।

কি পার্থক্য? চৌদ্দটা না কইরা তেরোটা করলে তোমার কাছে ভাল মনে হয়? বাবা দুইটা বিয়া করছে, খবর শুইনা ত তুমি বাবারে অমানুষ বইলা গাল দেও। তোমার নবীজিরে গাল দেও না কেন?

তখনকার সময় আর এখনকার সময় এক না। তখন সমাজের অবস্থা অন্যরকম ছিল।

এহন সমাজের অবস্থা কি রকম? এহন তো চারটা বিয়া করতে পারে পুরুষ মানুষ! বাবা যদি তিনটা বউ আইনা বাড়িত রাখে, তুমি কি করবা? থাকতে পারবা তিন সতিন নিয়া?

মা মুখ বিষ করে কোরান বন্ধ করে রেখে বলেন, *নবীজি কাউরে এক বাড়িতে রাখেন নাই।*

এক বাড়িতে রাখেন নাই, তাতে কি হইছে? এক বাড়ি থেইকা আরেক বাড়িতে তো গেছেন। বিবিদের চাকরানিদেরও ওপর তো লোভ করছেন! তাদেরও তো ভোগ করছেন। কাউরে তো ভোগ করতে বাদ রাখেন নাই!

যা করছেন আল্লাহর হুকুমে করছেন।

আল্লাহ এইরকম জঘন্য হুকুমই বা দিছেন কেন? প্রেরিত পুরুষ! মহানবী! সকলের শ্রদ্ধার মানুষ! তার চরিত্রটা তো আল্লাহ একটু ভাল বানাইতে পারতেন।

নাসরিন, তুই নবীজিরে নিয়া বাজে কথা বলতাছস। তর তো দোযখেও স্থান হইব না। তর যে কি হইব? তর কপালে যে কি আছে!

মার সঙ্গে এরকম কথা হওয়ার পর মা বারান্দায় একলা বসে থাকেন অথবা জানালার দিকে মুখ করে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। আমি অনুমান করি মা ভাবছেন প্রেরিত পুরুষের কথা, কেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষটি কোনও আদর্শ চরিত্রের হলেন না! কেন তিনি সমালোচনার উর্ধে ওঠার মত হলেন না! এধরনের কথা হওয়ার পর মা অনেকক্ষণ পর আমার কাছে এসে আমার বুকে মুখে সুরা পড়ে ফুঁ দেন। নরম গলায় বলেন, *তওবা করো আল্লাহর কাছে। বল যে ভুল হইছে তোমার। ভুল করছ। আল্লাহ ক্ষমা কইরা দিবেন।*

আল্লাহ থাকলে তো ক্ষমা করবেন?

যদি থাকেন! যদি থাকেন! যদি আল্লাহ থাকেন? তাইলে কি করবি? তাইলে কি অবস্থা হইব তর, একবার চিন্তা করছস?

মা যখন খুব মন দিয়ে ফরজ সুন্নত নফল সব রকমের নামাজ পড়তে থাকেন, আর আমি যখন বলি, *কেন যে এইসব পড়! কি লাভ? মরার পর দেখবা আর জীবিত হইতাছ না। ফক্কা। কোনও দোযখও নাই। কোনও বেহেসতও নাই। তহন?*

মা বলেন, *হ যদি দেখি কিছু নাই, তাইলে তো নাইই। আমার সব ইবাদত বৃথা গেল। কিন্তু, যদি থাকে? যদি থাকে সব?*

মা এই *যদির* ওপর আশঙ্কা করে নামাজ রোজা করেন। যদি *শেষ বিচারের দিন* বলে কিছু থাকে, তবে যেন ভাল ফল পান। আমার মনে হয় কেবল মা নন, আরও অনেকে এই *যদি* র কারণেই আল্লাহ রসুল মেনে চলে। মার সঙ্গেও *তর্ক* বেশিদূর এগোয় না।

হাসপাতালের রোগীদের ওপর, যেহেতু রোগিরা আল্লাহর পরই যে মানুষকে বিশ্বাস করে, সে হল ডাক্তার, খানিকটা কঠোর হই। ডাক্তারদের আদেশ উপদেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। করলে কি!বালিশের নিচে মৌলানার ফুঁ দেওয়া গাছের শেকড় রাখে, অসুখ ভাল হলে ডাক্তারের চিকিৎসায় নয়, শেকড়টির কারণে অসুখ ভাল হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। এক রক্তশূন্যতার রোগিকে সন্ধানী থেকে যোগাড় করে চার ব্যাগ রক্ত দিয়ে আর ওষুধ দিয়ে যায়-যায় হৃদপিন্ডকে ভাল করে তোলার পর রোগিকে উঠে বসতে বলি। উঠতে গিয়ে লোকের বালিশ সরে যায়। বালিশের তলে একটি শেকড়।

এইটা কি?

দোয়া পড়া শেকড়।

এইটা কাছে রাখছেন কেন?

রোগি হেসে বলে, *এইটা রাখলে রোগ বালাই দূর হয়, তাই রাখছি।*

কি মনে হয় ডাক্তারের ওষুধে ভাল হইছেন নাকি ওই শেকড়ে?

রোগী বলে, এবারও হেসে, *ওষুধ দিয়া চেষ্টা করছেন ভাল করতে। কিন্তু আল্লায় ভাল করছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ কি বাচাইতে পারে? শেকড়ডাতে আল্লাহর কালাম পইড়া ফুঁ দেওয়া আছে।*

এরপর যে রোগিই আসে, আগে দেখি হাতে পায়ে কোমরে বাঁধা কোনও তাবিজ আছে কি না, কোনও শেকড় আছে কি না। থাকলে ওগুলো নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরে চিকিৎসা শুরু করি। বলে দিই *তাবিজ কবজ কাছে রাখলে চিকিৎসা পাইবেন না। ওইসব যদি রোগ ভাল করে বইলা মনে করেন তাইলে বাড়ি যান। বাড়ি গিয়া শেকড় বালিশের*

নিচে রাইখা শুইয়া থাকেন। তাবিজ কবজ শরীরে বান্ধেন। যত মৌলবি আছে সবার ফুঁ লন। পড়া পানি খান। রোগ কি কইরা ভাল হয় দেখব।

এক এক ওয়ার্ডে এক এক দিন ভর্তির তারিখ থাকে। ওদিন নাগাড়ে রোগী আসতে থাকে। বিছানা ভরে যায়, এমন কি মেঝেও। প্রতিটি রোগীর *হিস্ট্রি* লেখা, প্রতিটি রোগীর মাথা থেকে পা অবদি পরীক্ষা করা, রোগ নির্ণয় করা, প্রতিটি রোগীর জন্য প্রাথমিক ওষুধ লিখে দেওয়া,মরো মরো রোগী এলে নিজে সামলাতে না পারলে বড় ডাক্তারদের খবর দেওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। পুরুষ রোগীর চেয়ে মেয়ে রোগীর সংখ্যা কম হাসপাতালে। মেয়েরা মৃত্যুপথযাত্রী হওয়ার আগে তাদের কেউ হাসপাতালে আনে না। বিষ খেয়ে মরছে কোনও মেয়ে, শরীরের কোথাও ছোট্ট কোনও পলিপ থেকে না-চিকিৎসায় না-চিকিৎসায় ক্যান্সার ঘটিয়ে আসা মেয়ে--প্রতিটি মেয়ের শরীরে রক্তশূন্যতা, পুষ্টিহীনতা। আমি এদের কাছ থেকে, কেবল ডাক্তার যেটুকু জানলেই চলে, তার চেয়ে, অধিক জানতে আগ্রহী। সংসারের সবাইকে ভাল খাইয়ে নিজেরা এঁটো কাঁটা খায়! অসুখ বিসুখ পুষে রাখে শরীরে। মেয়েদের অসুখ হলে সংসার চলে না, তাই। অসুখের কথা জানালেও বাড়ির লোকেরা তেমন গা করে না। অসুখ দেখতে গিয়ে ডাক্তাররা ছোঁবে মেয়েদের, এ জিনিসটিতে বাড়ির পুরুষেরা সায় দেয় না। তাই অসুখ পোষা ছাড়া মেয়েদের আর করার কিছু থাকে না। নিজেরা একা চলে আসবে হাসপাতালে এই সাহস তাদের নেই। বিবাহিত মেয়েরা অসুখ নিয়ে স্বামীর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেলে, সাধারণত বাপের বাড়ি থেকেই তারা আসে হাসপাতালে, বাপের বাড়ির আত্মীয়রা নিয়ে আসে।

কেবল যে আমার ডিউটি থাকে ওয়ার্ডে, তা নয়,অন্য ডাক্তারদেরও থাকে। গুরুতর জখম হওয়া এক রোগীর হিস্ট্রি লিখতে গিয়ে এক ডাক্তার বন্ধু লিখেছে, *শি ওয়াজ বিটেন।* সেটি কেটে দিয়ে নতুন কাগজে হিস্ট্রি লিখে দিই রোগীর ঘটনা বিস্তারিত জেনে।*শি ওয়াজ ব্রুটালি হিট বাই হার হাজবেন্ড। দ্যা ক্রুয়েল ম্যান ইউজড অ্যাক্স এন্ড বাম্বু অন হার বডি। হি ওয়ান্টেড টু কিল হার। হি ইভেন সেইড তালাক টু হার। হার ক্রাইম ওয়াজ দ্যাট হার ফাদার কুডনট পে দাউরি মানি ইন টাইম।* ওষুধের লিষ্টিতে একটি এন্টি ডিপ্রেসেন্ট যোগ করে দিই। ডাক্তার বন্ধুটি আমার হিস্ট্রি লেখা দেখে মন্তব্য করে, *কে মারল কি দিয়ে মারলো কেন মারল সেটা আমাদের জেনে কি দরকার! আমাদের কাজ হল চিকিৎসা করা।* তা ঠিক, এ কথা সব ডাক্তারই বলবে আমি জানি। বাড়তি যে হিস্ট্রিটুকু লিখেছি আমি, লিখে আমার একধরনের তৃপ্তি হয়, মেয়েটিকেও বলেছি, *লেইখা রাখলাম যে আপনের স্বামী আপনের এই অবস্থা করছে।* হাসপাতালে কাগজে মেয়েটির করুণ দশার কথা লিখে মেয়েটির জীবনের কোনও পরিবর্তন হবে না জানি। তবু লিখলে ক্ষতি কি? ডাক্তারদের যে একেবারে কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই তা নয়। অপারেশনের পর রোগীদের ব্যথা কমাতে পেথিডিন দেওয়া হয়। পেথিডিন পেয়ে শরীর এমন ভাল-লাগায় ভুগতে থাকে যে ব্যথা কমে গেলেও রোগীরা কোঁকাতে থাকে পেথিডিন পেতে। রোগির যেন পেথিডিনে আসক্তি না হয়, ডাক্তার *ডি-ডব্লু ইনজেকশন* দিতে নার্সকে ডাকেন। নার্স সিরিঞ্জে *ডিসটিল্ড ওয়াটার* ভরে রোগীর নিতম্বের মাংসে সুঁই ফুঁটিয়ে আসে। রোগিদের কোঁকানো আর থেকে থেকে নার্স বা ডাক্তারকে ডাকা বন্ধ হয়, এভাবেই পেথিডিনের নেশা হওয়া থেকে রোগীদের বাঁচায় ডাক্তার। এ নিশ্চয়ই সামাজিক দায়িত্ব।

ডাক্তার বটে আমি, ওয়ার্ডে দিন রাত পড়ে থেকে রোগীদের চিকিৎসা করছি বটে,

তবে সব রোগের চিকিৎসা করার অধিকার আমার নেই। গাইনিতে কেবল দিনে নয়, রাতেও ডিউটি পড়ে। সপ্তাহে তিন থেকে চার রাত কাটাতে হয় হাসপাতালে। তো এক রাতের ডিউটিতেই দুটো ঘটনায় আমার ওপর সমন জারি হয়। রাত বারোটায় রোগী এল *রিটেইন্ড প্লাসেন্টা* নিয়ে। বাচ্চা হয়েছে দুদিন আগে, জরায়ুর ফুল পড়েনি এখনো। রিটেইন্ড প্লাসেন্টা এলে নিয়ম বড় ক্লিনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট বা রেজিস্ট্রারকে ডাকা। কাউকে না ডেকে আমি নিজে চেষ্টা করি ফুল বের করতে। জরায়ুর বন্ধ মুখ ধীরে ধীরে হাতে খুলতে চেষ্টা করে ঘন্টা খানিক পর সফল হই, ফুল বেরিয়ে আসে। সে রাতেই রাত আড়াইটার দিকে এক রোগী আসে, বাচ্চা বেরোচ্ছে না, পানি ভেঙে গেছে দুপুরে, বাচ্চার মাথা জরায়ুর মুখের কাছে এসে আটকে আছে ঘন্টা কয়েক। ভেতরে বাচ্চার অবস্থা যায় যায় প্রায়। যদি বড় ডাক্তারদের খবর দিতে যাই, ওরা ডক্টরস কোয়ার্টার থেকে হাসপাতাল অবদি আসতে আসতে বাচ্চা বেঁচে থাকবে না বলে আমার আশঙ্কা হয়। নিজেই হাতে *ফরসেপ* নিই। এতকাল অন্যকে দেখেছি ফরসেপ-ব্যবহার করতে, নিজে কখনও ব্যবহার করেনি। আমার সঙ্গে যে ডাক্তারদের ডিউটি ছিল, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আমার *কাণ্ড* দেখেছে। কাণ্ডটি ঘটার সময়ই একজন দৌড়ে গিয়ে *সিএকে কল* দিয়ে এসেছে। সিএ যখন এসেছে, বাচ্চাকে অক্সিজেন দিয়ে স্বাভাবিক শ্বাস নেওয়ানো হয়ে গেছে। আমি তখন সেলাই করছি ফরসেপের জন্য প্রশস্ত করা যোনিদেশ। সকাল আটটায় অধ্যাপক আসেন। তিনি পৌঁছোনোর দুমিনিটের মধ্যেই তাঁকে ঘটনা জানানো হয়। ক্যান্টিন থেকে চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে অধ্যাপকের সঙ্গে *ওয়ার্ড রাউন্ড* দিতে এসেছি, দিয়ে চলে যাবো বাড়িতে, ঘুমোতে। যদিও ডাক্তার হয়ে গেছি, জোবায়েদ হোসেনের সামনে কিন্তু আগের মতই, ছাত্রী। তাঁর পেছন পেছন ওয়ার্ডগুলো ঘুরতে হয় সকাল বেলা, ঘোরার সময় ছাত্রী অবস্থায় বুক কেঁপেছে, ডাক্তার হয়েও কাঁপে। বাঘের সামনে দাঁড়ানো আর জোবায়েদ হোসেনের সামনে দাঁড়ানো এক কথা। অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন রাউন্ড দিতে শুরু করে দিয়েছেন। আমি রাউন্ডে ঢুকতে গেলেই তিনি আমার দিকে এগোন। চশমার তলে বাঘের দৃষ্টি। আমাকে এক্ষুনি ভক্ষণ করার মত কি কাণ্ড ঘটেছে, তা ঠাহর করার আগেই তিনি বললেন, *তুমি রিটেইন্ড প্লাসেন্টা ম্যানুয়েলি রিমুভ করছ?*

হ্যাঁ স্যার।

জোবায়েদ হোসেনের পেছনে থেকে পঁচিশ জোড়া চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সুন্দরবনের মাচায় বসে বাঘের হরিণ খাওয়া দেখতে যেমন উৎসুক চোখ, সে রকম। আবারও জোবায়েদ হোসেনের গলা থেকে হালুম হালুম, *তুমি ফরসেপ ডেলিভারি করেছ?*

হ্যাঁ স্যার।

কেন করেছ?

বাচ্চার অবস্থা খারাপ ছিল।

রিটেইন্ড প্লাসেন্টা ম্যানুয়ালি রিমুভ করছ কেন?

রোগির অবস্থা খারাপ ছিল। তাই..

যদি কোনও এক্সিডেন্ট হত?

রোগি ভাল আছে। একটু আগে দেখে এসেছি। বাচ্চাও ভাল আছে।

রোগি ভাল আছে, এটা কোনও এক্সকিউজ না।

আমাকে বাহান্নোটি চোখের সামনে মাথা নত করতে হয়। সেই সকালেই জোবায়েদ হোসেন বড় একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দেন প্রসুতি কক্ষে, *ইন্টার্নি ডক্টরস আর নট এলাউড টু ডু এনিথিং উইদ ফরসেপ ডেলিভারি এন্ড রিটেইন্ট প্লাসেন্টা।*

সেই জোবায়েদ হোসেনই, পরদিন প্রসুতিকক্ষে এক রোগী এপিসিওটমির জন্য বসে ছিল অপেক্ষায়, ডাক্তার নেই ডাক্তার নেই! কোথায় ডাক্তার! হাতের কাছে একজনকে পাওয়া গেলেই খপ করে ধরে *রোগী পড়ে আছে কেন লেবার রুমে* জিজ্ঞেস করতেই ডাক্তার ইতিউতি তাকিয়ে ঢোক গিলতে গিলতে যখন বলল, *স্যার তসলিমার কথা ছিল এপিসিওটমি করার,* তিনি দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, *তসলিমাকে দোষ দিতে চাও তো! শোনো, ওরই সাহস আছে কিছু করার। কারেজিয়াস মেয়ে। সেই পারবে ডাক্তারি করে খেতে। তোমার মত মূষিক পারবে না।*

ফিক্সড ডিউটিতে ব্যস্ত থাকার সময়ই মা একদিন বলেন, *বাজানের শইলডা বালা না।*

কেন, কি হইছে?

চলতে ফিরতে পারে না। উল্ডা পাল্ডা কথা কয়।

কেন, সেইদিন না জাম্পার লইয়া আইল!

নানা পকেটে করে বা প্যাকেটে করে কিছু না কিছু আনেন,সামান্য হলেও আনেন, যখন আসেন। মেয়ের হাতে একটি বিস্কুট হলেও দিয়ে বলেন, *মা, তুমি খাইও।* একগাদা *লান্ডির জাম্পার* দিয়ে গেছেন, ওগুলো দিয়েই আমাদের অনেকগুলো শীত চলে যাবে। নানা কেন অসুস্থ হবেন! মাত্র দু সপ্তাহ আগে নানিবাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম, তিনি দিব্যি সুস্থ। খাচ্ছেন। পাতে মাছের ঝোল ঢেলে দিতে দিতে নানি বলছেন, *দোকানে তো আয় তেমন হইতাছে না। নানার* দাতা হাতেমতাই *স্বভাব আর যারই পছন্দ হোক, নানির মোটেই পছন্দ নয়।*

আয় লাগব না, যা আছে তাই ভাল। কই একটু নুন দেও ত! শীতল পাটিতে আসন করে বসে ভাত মাখতে মাখতে মাখতে বললেন নানা।

নানি নুনের বয়াম নানার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, *আয় না করলে চলব! পুলাপান খাইব কি!*

পুলাপান কি না খাইয়া থাকে নাকি?

দোকানের বাবুর্চিরা নিজেরা বড় বড় দোকান দিয়া হাজার টাকা ঘরে নিতাছে। আপনের তো পসার কিছু হইল না।

ওরা চুরি করলে আমিও কি চুরি করুম নাকি?

আপনেরে চুরি করতে কইতাছি না। ব্যবসাডায় মন দিতে কইতাছি।

ব্যবসায় যে মন নেই নানার, সে নানি বেশ ভাল জানেন। সেদিনও দোকানে হুট করে ঢুকে দেখলেন রাস্তার তিনটে পাগল চেয়ারে ঠ্যাং তুলে হাপুস-হুপুস খাচ্ছে। নানা পাশে বসে পাগলদের পাতে বড় বড় মাংস তুলে দিচ্ছেন। নানি বললেন, *গাহেকের খবর নাই, পাগল খাওয়াইতাছেন বওয়াইয়া?* নানা ভেংচি কেটে বললেন, *আমার দোকান, আমি যারে ইচ্ছা খাওয়াইয়াম। তোমার কি? যাও যাও বাড়িত যাও।*

দুটো গ্রাস মুখে দিয়েছেন কি দেননি, নানি গেলেন কলতলায়, ঠিক পেছন পেছন তিনি ভাতের থাল হাতে উঠে পুরো পাতের ভাত ঢেলে দিলেন উঠোনে।

কী ব্যাপার ভাত ফালাইছেন কেন? কলতলা থেকে চেঁচিয়ে নানি বলেন।

কুত্তা টুত্তা আছে খাইব নে!

নানির কাছে এ নতুন নয়। প্রায়ই তিনি দেখেন নানা জানলা দিয়ে টুকরো টুকরো করে পাউরুটি ছুঁড়ছেন।

কি ব্যাপার পাউরুটি বাইরে ফেলতাছেন কেন?

নানা বলেন, *পিঁপড়া পুপড়া আছে, খাইব নে।*

পুলাপান পাউরুটি পায় না, আর আপনে পিঁপড়ারে পাউরুটি দেইন!

খায়রুন্নেসা, ওরাও তো আশা করে। নানা মধুর হেসে বলেন।

পকেটের বাতাসাও পুকুর পাড় দিয়ে আসার সময় পুকুরে ছুঁড়ে ফেলেন।

কেন?

মাছ টাছ আছে, খাইব। ওরাও তো আশা করে।

অবকাশেও এরকম ঘটে। মা ভাত বেড়ে দিলেন, বড় রুই মাছের টুকরো পাতে দিয়ে ডাল আনতে গেলেন বাটি করে। এসে দেখেন নানার পাতের মাছ পাতে নেই, পাতে শাদা শুকনো ভাত। রুই মাছ টেবিলের তলায়, বেড়ালে খাচ্ছে।

কি বাজান,মাছ বিলাইয়ে খায় কেন?

নানা হেসে বললেন *দেখি তো তুমার ডাইলডা। কেমন রানছ দেখি।*

ডাইল দিতাছি। কিন্তু মাছ ফালাইয়া দিছেন কেন?

আরে ফালামু কেন? বিলাইয়ের কি পছন্দ অপছন্দ নাই! ওদের কি কাঁটা খাইতে ইচ্ছা করে! মাছ টাছ ওরাও তো আশা করে!

কলতলা থেকে ফিরে এসে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে নানি বললেন, *মানুষের খবর নাই, আছে কুত্তা বিলাই লইয়া। রাস্তার পাগলা খাওয়াইয়া দোকানের বারোডা বাজাইছে। শান্তি আর এ জীবনে হইল না।*

ততক্ষণে নানা নকশি কাঁথার তলে। বিছানায়। ঘুমোচ্ছেন। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর নানা লম্বা ঘুম দেন, ঘুম থেকে উঠে আবার দোকান। নতুন বাজারের মুখে পৌঁছলেই নানার পেছন পেছন ও পাড়ার যত পাগল আর ভিখিরি পিছু নেবে। টাকা পয়সা পাউরুটি বাতাসা বিলিয়ে হাঁটতে থাকবেন তিনি, দোকান অবদি পৌঁছলে পকেটে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন হাত দেবেন ক্যাশবাক্সে, মুঠি ধরে দেবেন দবির পাগলকে। দবির পাগল নানার খুব প্রিয় পাগল। ওই দবির পাগলের জন্যই নানা একবার খালি গায়ে বাড়ি পৌঁছেছিলেন।

কি ব্যাপার, পাঞ্জাবি কই?

দবিরডার পরনের জামা নাই। রাস্তায় আধা ল্যাংড়া খাড়োইয়া রইছে।

তাই বইলা নিজের পরনের পাঞ্জাবি খুইলা দিয়া আইছেন?

না দিলে এই শীতের মধ্যে ও বাঁচব কেমনে!

আর এই শীতের মধ্যে আপনে কেমনে খালি গায়ে রইছেন?

আরে শীত কই তেমন! হাইটা আইছি ত। হাঁটলে শরীর গরম থাকে খায়রুন্নেসা।

নানি আর কথা বাড়ান না। লাভ নেই বলেই বাড়ান না। নানাকে তিনি চার যুগ হল চেনেন। টিনের এই চৌচালা ঘরে সংসার পেতেছিলেন সেই কবে, ছেলে মেয়ে হল, তাদের বিয়ে হল, নাতি নাতনি হল, পুতিও হল, কিন্তু চালা ঘর ঠিক তেমনই আছে, যেমন ছিল। একটি খুঁটিও পাল্টেনি। চোখের সামনে ধাঁ ধাঁ করে এ বাড়ির চাকর বাকররাও বড়লোক হয়ে গেছে, রীতিমত দালান তুলেছে বস্তিতে। নানির অবশ্য দালানের লোভ নেই। কোনওভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাকেই তিনি যথেষ্ট মনে করেন। নানির ভাবনা টুটুমামা আর শরাফ মামাকে নিয়ে। এ দুজন লেখাপড়া ছেড়ে পীরবাড়িতে ভিড়েছিল। সংসার চালানোর কোনও ক্ষমতা না থাকলেও হুট করে বিয়ে করেছেন, কদিন পর পর এখন নানির কাছে হাত পাতেন। শেষ পর্যন্ত দুই ছেলের হাত পাতার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে নানি নিজে গিয়ে আমিরুল্লাহকে ধরেন, *কিছু একটা গতি করুইন বেয়াই সাব, টুটু আর*

শরাফ আল্লাহর পথে আইছিল দুনিয়াদারির লেহাপড়া ছাইড়া। এহন তো চাকরি বাকরি পাওনের যোগাড় নাই। পয়সাকড়ি না থাকলে খাইব কি! আপনে একটা ব্যবস্থা কইরা দেন।

আমিরুল্লাহ পান খাওয়া খয়েরি দাঁতে হেসে বললেন, *ব্যবস্থার মালিক আল্লাহ তায়ালা। আমি তো তাঁর নিরীহ বান্দা। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন, সব ঠিক হবে।*

আল্লাহর উপর আমার ভরসা আছে বেয়াই সাব। কিন্তু ছেলে দুইডা তো বিয়া শাদি কইরা বিপদে পড়ছে। এই দুইজনরে আপনি চাকরির ব্যবস্থা কইরা দেন। আপনি চাইলেই পারেন দিতে।

আমিরুল্লাহ বললেন, *ওই চাকরি ফাকরি দেবার মালিকও তিনি। রিজকের মালিক আল্লাহ। তিনিই চাকরি যোগাবেন।*

নানি নামাজ পড়েন, রোজা করেন, কিন্তু ঘোরতর দুনিয়াদারির মানুষ। তিনি জানেন, জায়নামাজে বসে আল্লাহর কাছে মোনাজাতের হাত তুলে চাকরির জন্য কেঁদে পড়লেও চাকরি হবে না। আমিরুল্লাহর কাছে কাঁদলে বরং কিছ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবু বকরের স্টিলের ইন্ডাস্ট্রির এখন আমিরুল্লাহই হর্তকর্তা, বাছাই করে পীরের ভক্তদের কেবল চাকরি দেওয়া হচ্ছে, ভক্ত ক অক্ষর গোমাংস হলেও সই। তদবিরে কাজ হয়। আমিরুল্লাহ অনেকক্ষণ আল্লাহর ওপর সব ঝামেলা চাপিয়ে দিলেও নাছোড়বান্দা নানিকে তিনি শেষে এই বলে বিদেয় করেন, *ঠিক আছে ওরাও আকবরিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কারখানায় লেগে পড়ুক। কিন্তু শর্ত একটিই, সুন্নত পালন করতে হবে, দাড়ি রাখতে হবে, আর ওই দুনিয়াদারির পোশাক খুলে পাজামা পাঞ্জাবি পরতে হবে, মাথায় টুপি।*

নানি পীর বাড়ি থেকে ফিরে বলেন, *আই এ পর্যন্ত পইরা তো কোনও অফিসে কেরানির চাকরিও পাওয়া যায় না। পোশাক পাল্ডাইয়া, দাড়ি রাইখা যদি কারখানায় কাম কইরা টাকা পয়সা রোজগার করতে পারে, তাইলে তাই করুক।*

টুটু আর শরাফ মামা পোশাক পাল্টে দিব্যি ঢুকে গেলেন কারখানায়। ছটকু পীর বাড়ির পোশাক আশাক বহু আগেই ছেড়েছে। মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে নাসিরাবাদ ইশকুলে কিছুদিন পড়েছিল কিন্তু মেট্রিক পাশ করার আগেই ইশকুল ছেড়ে দিয়ে নানার ভাতের দোকানে বসতে শুরু করেছে। নানা এদিক ওদিক গেলে ছটকু দেখাশোনা করে দোকান। টুটু মামা আর শরাফ মামার বিয়ের পর বিয়ের হিড়িক লাগে নানিবাড়িতে। একদিন শুনি ফেলু মামাও বিয়ে করবেন, পাড়াতেই এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল, বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর পর মেয়ের মা বাবা রাজি হয়ে গেলেন, তিন গজ দূরের শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েকে রিক্সা করে বউ নিয়ে এলেন বাড়িতে। ফেলু মামার বিয়ের পরই ছটকু বলল সেও বিয়ে করবে। জিলা ইশকুলের উল্টোদিকের দোতলা বাড়িতে এক সুন্দরী কিশোরীকে আসা যাওয়ার পথের ধারে দেখতে দেখতে কিছু হাসি এবং কিছু চিরকুট ছুঁড়ে দিয়ে পটানোর চেষ্টা করেছে যথেষ্ট। হাসি বা চিরকুটে কাত না হওয়া কিশোরীটিকে চিঠি লেখার জন্য ছটকু প্রায়ই অবকাশে আসত, আমাকে অথবা ইয়াসমিনকে যাকেই সামনে পেত, বলত, *খুব ভাষা টাষা দিয়া একটা চিঠি লেইখা দে তো!* ছটকুর আবদারে আমরা প্রেমের চিঠি লিখে দিতে থাকি। চিঠি বুকপকেটে পুরে ছটকু বেরিয়ে যেত, পরে সুযোগ বুঝে মেয়ের কাছে পাচার করত। সেসব চিঠি পেয়ে মেয়ে গলে গেল, গলে চৌদ্দ বছর বয়সেই ছটকুর গলায় লটকে গেল। ফকরুল মামার বিয়ে আর সব ভাইদের মত এরকম সহজে ঘটেনি। নিজে তিনি যুবইউনিয়নের নেতা। বড়মামার কাছ থেকে ছোটবেলাতেই কম্যুনিস্ট হওয়ার দীক্ষা পেয়েছিলেন। দলের আর সব নেতাদের

বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল ফকরুল্ল মামার। ওই করে করেই এক নেতার বউএর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক দাঁড়াল। বউটি ফকরুল্ল মামার চেয়ে বয়সে বড় পরন্তু দুই বাচ্চার মা। সম্পর্ক অনেকদূর পৌঁছেছিল। যেদিন নেতাটি হাতে নাতে ধরে ফেলেন দুজনকে, বউকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তালাকের কাগজ পাঠিয়ে দিলেন বউএর বাপের বাড়িতে। ফকরুল্ল মামা সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি বিয়ে করবেন বউটিকে, ওর এই অবস্থার জন্য দায়ি যখন তিনিই। কিন্তু বড়মামা রাজি নন। তিনি ফকরুল্ল মামাকে ছলে বলে কৌশলে ময়মনসিংহে নিয়ে এসে আদেশ এবং উপদেশের রশি দিয়ে বাঁধলেন। সেই রশি ছিঁড়ে ফকরুল্ল মামা বেরিয়ে গেলেন দুদিন পর। ওই দুই বাচ্চার মাকে বিয়ে করে নিজের ঘরে তুললেন। বিয়েতে কোনও আত্মীয় স্বজন যায়নি। ছ ফুট লম্বা, ছিপছিপে গড়ন, সুদর্শন যুবক ফকরুল্ল মামা বিয়ে করছেন *কালো এক ধুমসি বুড়িকে।* আত্মীয় স্বজন যাবে কেন বিয়েতে!

ছটকুর বউও এল বাড়িতে, নানাও অসুখে পড়লেন। কিছুর দিশা পাননা তিনি। নতুন বাজারের রাস্তা ভুলে গেছেন। পথ হারিয়ে ফেলেন। বিছানা ভিজিয়ে ফেলেন পেচ্ছাব করে। পেচ্ছাব পায়খানা কিছুরই খোঁজ রাখতে পারেন না। বিছানাতেই সারেন সব। নিজের হাতে নিজের মল তুলে তুলে জানালা দিয়ে ফেলেন। নানি আঁচলে নাক চেপে বলেন, *গুগুলা ফিইক্যা মারে ক্যা? এইগুলাও কি কুত্তা বিলাইরে বিলাইতাছে না কি?* বাবা একদিন দেখে এলেন নানাকে, ওষুধ লিখে দিয়ে এলেন। ওষুধে কাজ হয় না। কি হয়েছে নানার? বাবা বললেন *ডায়বেটিস।* ডায়বেটিসের ওষুধ কখনও তিনি খাননি। কেবল জানতেন মিষ্টি খাওয়া বারণ। নানা বারণ মানেননি কোনওদিন। আমি নতুন ডাক্তার, নানার গায়ের চামড়া চিমটি দিয়ে তুলে ডিহাইড্রেশন দেখি। শরীরে পানি নেই। মহাসমারোহে স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন, সুঁই ফোটালে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে কেবল বলেছেন, *ইস কি কষ্টটা দিল রে!* যেদিন স্যালাইন দিই, সেদিনই নানা মারা যান। রাতে।

বাবাকে নানার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞেস করলে বললেন, *রেসপিরেটরি ফেইলুর।* শুনে আমার আশঙ্কা হয় স্যালাইন বেশি পড়ার কারণেই ফুসফুসে পানি জমে গেছে, নানা আর শ্বাস নিতে পারেননি।

স্যালাইন দেওয়াটা কি ভুল হইছে?

বাবা মাথা নাড়েন, *ভুল হইছে।* কিন্তু আমার ভুলের জন্য আমার ওপর কোনও রাগ বা নানার মরে যাওয়ার জন্য কোনও দুঃখ বা নানাকে কোনওদিন ডায়বেটিসের ওষুধ না দেওয়ার জন্য বাবার কোনও অনুতাপ হয় না। ছোট্ট একটি *আহা* শব্দও উচ্চারণ করেন না। *স্যালাইন না দিলে কি নানা বেঁচে থাকতেন!* অসম্ভব নির্লিপ্তিতে উত্তর দেন, *না!* আমার তবু মনে হতে থাকে আমার দোষেই নানাকে মরে যেতে হয়েছে। গা নিথর করা একটি আতঙ্ক আমার মনের দখল ছাড়ে না। নিজেকে খুনী মনে হতে থাকে। হাসপাতালে কোনওদিন কোনও রোগীর এ পর্যন্ত কোনও ক্ষতি আমার দ্বারা হয়নি, আর নিজের নানার মৃত্যুর কারণই কি না আমি! আমার সাদাসিধে নানা, আমার ভালমানুষ নানা, সাতেনেইপাঁচেনেই নানা, প্রকাণ্ড একটি হৃদয়ের নানা। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই, ক্ষমা হয় না। স্তব্ধ উদাস বসে থাকি সারাদিন, সারারাত অন্ধকারের দিকে মুখ করে অবিন্যস্ত রাত পার করি। নিজেকে আমি ইচ্ছে করেই ক্ষমা করি না। নিজের ওপর এত রাগ হয় আমার, ইচ্ছে করে না নানিবাড়ি যেতে--নানির আর মামা খালাদের রোরুদ্যমান মুখগুলো দেখতে। মেঝেয় গড়িয়ে *বাজান গো আমার বাজান কই গেল* বলে কেঁদেছেন

মা, মা ই নানার অমন চলে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি কেঁদেছেন। যার চোখে এক ফোঁটা জল ছিল না, তিনি ফজলিখালা। ফজলিখালা জানেন, *আল্লাহর মাল আল্লাহ উঠিয়ে নিয়েছেন, এ নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। কাঁদতে যদি হয়ই, আল্লাহর জন্য কাঁদো, আল্লাহর কাছে ভিক্ষে চাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।* কি কারণে ভিক্ষে, কি অপরাধের জন্য ক্ষমা--তা আমার বোঝা হয় না। ফজলিখালা কি অনেক পাপ করেছেন জীবনে যে প্রতিদিন তাকে ক্ষমা চাইতে হয় আল্লাহর কাছে!

নানারে স্যালাইন দেওয়া উচিত হয় নাই--মার ফুলে থাকা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে আমি আর এই স্বীকারোক্তিটি করতে পারি না। ইয়াসমিনকে আড়ালে ডেকে বলি। নিজেকে বারবার বলি, নিঃশব্দে চেঁচাই। মার দুপুরগুলো বিষণ্নতার রোদে পুড়তে থাকে, দেখি। কেউ আর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি মুখে নিয়ে দুপুরগুলোকে শীতল করতে আসেন না।

অনেকদিন নানির বাড়িতে এরপর আমি যাইনি। মা সেধেছেন যেতে, এ কাজ ও কাজের ছুতোয় এড়িয়ে গেছি। মাঝে মাঝেই বিকেলে ইচ্ছে করে নানি বাড়ি যাওয়ার, ইচ্ছেটিকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখি কড়িকাঠে। কিন্তু মা আমাকে *তর নানি কইছে যাইতে, বার বারই কইতাছে নাসরিনডা তার নানার লাইগা কত কষ্ট করছে, হাসপাতাল থেইকা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া আইছে, স্যালাইন দিছে। চল চল তর নানিরে একটু সান্ত্বনা দিয়া আয়* বলে আমাকে এক দুপুরবেলা ও বাড়িতে নিয়েই যান। নানিবাড়িটি যেরকম অনুমান করেছিলাম, থমথমে, সবাই কাঁদছে, মন খারাপ করে বসে আছে ওরকম মোটেও নয়। নানি রান্না করছেন ইলিশ মাছ। বাড়ির বাচ্চারা হই চই করছে। উঠোনে খেলার ধুম। মামারা ঘরে সেঁধিয়ে আছে নতুন বউ নিয়ে। ঘরগুলো থেকে হা হা হিহি ভেসে আসছে। বাড়িটিতে একটি মানুষ ছিল, এখন নেই, কেউ আর তাঁর না থাকার জন্য কাঁদছে না, কেউ আর নানার না থাকা জুড়ে বসে নেই। বাড়িতে, আমি অনুমান করি, একধরণের স্বস্তি এসেছে। মাথা-পাগল উদাসীন লোকটি নেই। পরের জন্য নিজের যা আছে সব বিলিয়ে দেওয়ার বোকা লোকটি আর নেই।

নানি ভাত বেড়ে দেন পাতে, পাতের কিনারে ইলিশ মাছের টুকরো। *বাজান ইলিশ মাছ বড় পছন্দ করতেন* বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন মা, চোখের জল টুপটুপ পড়তে থাকে ভাতের ওপর। নানি খাচ্ছেন। এক ফোঁটা জল নেই নানির চোখে। নানির সময় নেই পেছনের কারও কথা ভেবে চোখের জল ফেলার। আমার গলায় ফুটে থাকে মাছের কাঁটা। কাঁটাটি গলায় নিয়ে উঠোনে বসে থাকা ক্ষুধার্ত কুকুরটির মুখের সামনে এক থাল ভাত ফেলে দিয়ে কলতলায় গিয়ে আমি হাত ধুয়ে ফেলি।

হাসপাতালে আরও মৃত্যু আমার দেখা হয়। প্রশ্ন করতে থাকি নিজেকে, কি অর্থ এই জীবনের। মৃত্যু আমার চারদিকে উদ্বাহু নৃত্য করে। মৃত্যু আমার কানে তারস্বরে গান শোনাতে থাকে। কি অর্থ এই জীবনের, নিজেকে প্রশ্ন করি। বারবার করি। এত মায়া এত ভালবাসা এত স্বপ্ন নিয়ে এই যে জীবন, যে কোনও মুহূর্তে জীবনটি ফুরিয়ে যাবে। কি লাভ!কি লাভ বেঁচে থেকে! পনেরো বিলিয়ন বছর আগে কিছু একটা ঘটে মহাশূন্যে ছিটকে পড়ল কিছু, সেই ছিটকে পড়া কিছু থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র, নক্ষত্রপুঞ্জের জন্ম, সেইসব নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে শামুকের মত পেঁচানো একটি পুঞ্জে চারশ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী নামের এক গ্রহের জন্ম হল। এই পৃথিবীতে এক সময় প্রাণের জন্ম। এক কোষি থেকে বহুকোষি, ধীরে ধীরে বিবর্তনে বিবর্তনে মানুষ। এই মানুষ নামক প্রাণীও হয়ত ডায়নোসোর যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ছশ আশি লক্ষ বছর আগে, তেমন

একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার আগেই হয়ত যাবে। অথবা যাবে না, বিবর্তনে বিবর্তনে অন্য কিছু। পৃথিবী পৃথিবীর মত থেকে যাবে। সূর্য তারা সূর্য তারার মত। কোনও একদিন আমাদের এই সূর্যটিও তাপ হারাতে হারাতে কালো একটি পিণ্ড-মত হয়ে যাবে। কোনও একদিন এই যে গ্রহনক্ষত্রগুলো প্রসারিত হচ্ছে হচ্ছেই--মহাশূন্যে হয়ত চুপসে যাবে। হয়ত যাবে না। হয়ত অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হতেই থাকবে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই খেলায় মানুষ কি আদৌ সামান্য কোনও ঘটনা? এই বিশাল মহাজগতে ক্ষণজীবী এই মানুষ নামক প্রাণীর জীবন ও জগতের কোনও ভূমিকাই নেই। মহাজগতের কোথাও নিজের এই ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু এক পলকের জন্যও দেখি না। নানার রুহু ফজলিখালা বলেন দেখেছেন উড়ে যেতে। রুহু নাকি উড়ে গিয়েছে আসমানে, আল্লাহর কাছে। এই রুহুগুলো আল্লাহর কাছে জমা থাকবে, আল্লাহ সব রুহুকে আবার মানুষে রূপান্তরিত করবেন। তারপর তো সেই বিচারসভা। আল্লাহ বিচারকের আসনে বসে সমস্ত মানুষের বিচার করবেন। প্রতিটি মানুষের দুই কাঁধে দুই ফেরেসতা বসা, মুনকার আর নাকির, তারা ভাল মন্দের হিশেব লিখে রাখছে। সেই হিশেব দেখে আল্লাহ কাউকে বেহেসতের ঝরনার তলে পাঠাবেন, কাউকে দোযখের আগুনে। জীবন এমনই সরল অঙ্ক তাঁদের কাছে। দুই আর দুইএ চার। ফজলিখালা বিশ্বাস করেন নানার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে আবার। নানা যেহেতু আল্লাহর নাম জপেছেন, রাতে রাতে উঠে জায়নামাজে বসে *আল্লাহ ছাড়া কোনও মাবুদ নাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ* বলে জিকির করেছেন, নিশ্চিত তিনি বেহেসতে যাবেন। আর ফজলিখালা যখন বেহেসতে যাচ্ছেনই, তখন দেখা তো হবেই। ফজলিখালা তাই কারও মৃত্যুতে কোনও দুঃখ পান না। জীবনের অর্থ তাঁর কাছে আছে। মার কাছেও আছে। জীবন হচ্ছে আল্লাহর পরীক্ষা। আল্লাহ জীবন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, কড়া নজর রাখছেন কে কি করছে না করছে, মৃত্যুর পর তিনি সবাইকে কর্মফল দেবেন। সরল অঙ্কে বিশ্বাসী সবকটা মানুষই একধরনের নিশ্চিন্তি বা সন্তুষ্টি নিয়ে থাকে। আমারই কেবল অস্থিরতা, অস্বস্তি। উল্টো বিশ্বাস, মরে যাওয়া মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া, কোনও ফল পাওয়ার নেই, আবার জন্ম নেই, কিছু নেই, সব ফাঁকা। জীবনের কোনও মানে নেই, অর্থ নেই। এই বিশ্বাস আমাকে ভয়াবহ বিষণ্নতা দেয়, জীবনবিমুখ করে। বাবাকে যদি প্রশ্ন করি জীবনের মানে কি, তিনি বলবেন জীবনের মানে হচ্ছে সংগ্রাম। পৃথিবীতে সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। তিনি শৈশব কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যকে ভাগ করে ফেলেন খুব সহজে। প্রথম শিক্ষাজীবন, তারপর কর্মজীবন, তারপর অবসরজীবন। শিক্ষা অর্জনে বা কর্মে কোনও রকম হেরফের হলে তার ফল ভোগ করতে হবে এই জীবনেই। স্বাচ্ছন্দ্য আর সচ্ছলতার মধ্যেই তিনি ভাবেন জীবনের সাফল্য। জীবন অর্থপূর্ণ হয় জীবনের সাফল্যে। কিন্তু জীবন যদি ফুরিয়েই যায় একদিন, জীবন সফল হল বা ব্যর্থ হল, তাতে কি ই বা যায় আসে! ব্যর্থতা আর সাফল্যের সংজ্ঞাও তো ভিন্ন মানুষের কাছে। এক দার্শনিক বলেছেন জীবনের কোনও অর্থ নেই, কিন্তু জীবনকে অর্থ দিতে হবে আমাদের। আমার মনে হয় না কোনও কিছু করেই আসলে আমরা জীবনের কোনও অর্থ দাঁড় করাতে পারি। এ কি নিজেকেই নিজের ফাঁকি দেওয়া নয়! অর্থ তৈরি করছে বলে জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতে যেন পারে। যে লিখতে জানে ভাল তাকে লিখে, যে খেলতে জানে ভাল তাকে খেলে জীবনকে অর্থ দিতে হবে। আসলে কি অর্থ দেওয়া হয় না কি সুখ পাওয়া হয়? নিজের জন্য এক ক্ষণস্থায়ী সুখ। আমার মন বলে অর্থহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করার শক্তি মানুষের নেই। মানুষ বড়জোর যা করতে পারে যতদিন প্রাণ আছে ততদিন কোত্থেকে এসেছি কোথায় যাবো তা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করে

ক্ষণিকের এই জীবনের সুধারসটুকুর শেষ বিন্দুটুকুও পান করতে পারে। কিন্তু পান করেই বা কিছু লাভ হয় কি? আমি যদি পান না করি, তাতে কি? আমি যদি আজ বেঁচে থাকি তাতেই বা আমার কি, আজ মরে গেলেই বা কি! এক ঘোর বিষণ্নতা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে হবে এক বছর, না কম না বেশি। বছর শেষ হলে ঢাকায় পাকাপাকি ভাবে নিজের সংসারে ফিরব এরকমই কথা রুদ্রর সঙ্গে। রুদ্রও মোংলা মিঠেখালির পাট চুকিয়ে ঢাকায় ফিরবে। শুরু হবে সংসার আমাদের। কোনও ছেদ না পড়া সংসার। পাকাপাকির আগেই অবশ্য নানা ছুতোয় আমার ঢাকা যাওয়া হতে থাকে, রুটিনে এক মাস গ্রাম পড়ল তো ঢাকা যাও, পড়ে গিয়ে হাত ভাঙল তো ঢাকা যাও। ডান হাতের কনুইয়ের হাড় ভেঙে টুকরো হয়নি, সামান্য ফেটেছে, ওটুকুর জন্যই হাড়ের ডাক্তার প্লাস্টার লাগিয়ে দিয়ে বললেন, পুরো এক মাস। স্ত্রীরোগ-প্রসুতিবিদ্যা বিভাগে তখনও আমার ডিউটি শেষ হয়নি, অধ্যাপক জোবায়েদ হোসেন, গলার দড়িতে নব্বই ডিগ্রি কোণে ঝুলে থাকা হাত দেখেই বললেন, *ভাঙলা? হুম, ভাল একটা কারণ জুটে গেল ফাঁকি মারার, কি বল?* না, জোবায়েদ হোসেন এটি ঠিক বলেননি। ডিউটিতে ফাঁকি মারার গোপন কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না।

হাত ভাঙা তো গা-গরম হওয়া বা খুসখুসে কাশির মত নয়, রীতিমত বড় একটি ঘটনা, এই ঘটনায় নির্দ্বিধায় প্রশিক্ষণ কামাই করা যায়, বাঘ হয়েও জোবায়েদ হোসেন মেনেছেন, আমি না মানার কে! মা দুদিন মুখে তুলে খাইয়ে দিলেন, গোসল করিয়ে জামা পরিয়ে দিলেন। মাকে ঠেলে সরিয়ে একদিন ঢাকায় রওনা হই। ঢাকা যাওয়ার কোনও ইচ্ছে হত না যদি না রুদ্র ময়মনসিংহে এসে সে রাতের ব্যাপারে স্বীকার করত যে সে রাতে সে মাতাল ছিল, যা করেছে কোনও সুস্থ মস্তিস্কে করে নি। আজকাল ঢাকা যেতে বাড়িতে কোনও কৈফিয়ত দিই না যে সার্টিফিকেট তুলতে হবে বা অপারেশন করাতে হবে বা অন্য কোনও বড় কারণ যে কারণে ঢাকা না গেলেই নয়। দিব্যি ঢাকা যাচ্ছি বলে বেরিয়ে যাই, কোথায় থাকব কার বাড়িতে তাও বলি না, বলি না কারণ বাড়ির সবাই জানে আমি কোথায় কার কাছে যাই। এ নিয়ে কেউ আমার সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসে না। আমার ঢাকা যাওয়ার প্রসঙ্গ এলেই *কলকলে* বাড়িটি হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। ওই নৈঃশব্দ থেকে আমি নিঃশব্দে মিলিয়ে যাই। বাড়ি থেকে রিক্সা নিয়ে বাসস্ট্যান্ড। ঢাকা যাওয়ার বাস, ঘন্টায় ঘন্টায় ছাড়ছে।

রুদ্র আমাকে মুখে তুলে খাইয়ে দেয়, যেহেতু আমার ডান হাতটি অকেজো। গোসলখানায় নিয়ে আমার কাপড় জামা খুলে গায়ে জল ঢেলে সাবান মেখে গোসল করিয়ে দেয়। গোসল করানোর সময় আমার শরীর স্পর্শ করে তার শরীরের ভেতর ফুঁসে উঠতে থাকে আরেকটি শরীর। নরম তোয়ালেয় গা মাথা মুছিয়ে আমাকে ঘরে আনে, শুইয়ে দেয়। উর্ধাঙ্গ অচল হলে কি হবে, নিম্নাঙ্গ তো অচল নয়। রাতে যখন গাছপালা দুলিয়ে মেঘ জমিয়ে ঘরে তুমুল তুফান তোলে রুদ্র, সেই তুফানে চৌকি ভেঙে পড়ে,

তলায় তোশক বালিশ সহ আমি। ভাল হাতটি ভাঙতে ভাঙতেও ভাঙেনা। এর পরের তুফান মেঝের ওপর বয়, মেঝে ভেঙে নিয়ে নিচতলায় না পড়লেও মজবুত দেখে বড় একটি খাট কেনা হয়, যেন কোনও *ঝড় তুফানে* না ভেঙে পড়ে। বড় বিছানায় শুয়ে অভ্যেস আমার। হাত পা ছড়িয়ে শুতে না পারলে ঘুম ভাল হয় না। তার ওপর আবার কোলবালিশের ব্যাপারও আছে। মাথার বালিশকে কোলবালিশ করে আপাতত ঝড় তুফান শেষে নিদ্রা যাই। খাট কিনে তোশক বালিশ কিনে টাকা ফুরিয়ে যায়। টাকা ফুরোলে রুদ্র যা করে, মোংলা রওনা হয়। এবার আমাকে নিয়ে মোংলা যাবে সে। আমি বাধা দিই না। রুদ্রর সঙ্গ আমার প্রার্থিত। সাত সমুদ্দুর তের নদীর ওপারে যেতে হলেও যাব, আর এ তো শ্বশুর বাড়ি!

Ce-SLn¡e

হাত ভাঙা বলে কোনও *লাল কাতান* পরার দায় নেই, একরকম বাঁচি। লম্বা একটি ঢিলে জামা পরে থাকি, পরতে খুলতে সুবিধে। ঢাকা থেকে রেলে করে, লঞ্চে করে, দীর্ঘ পথ পেরিয়ে মোংলায়, রূপসার ঘোলা জলের পাড়ে সেই নিঝুম বাড়িটিতে আবার, দোতলার ঘরটিতে আবার। বাড়িতে অনেকগুলো মানুষ, অথচ মনে হয় কেউ নেই বুঝি, কেউ ছিল না বুঝি! মানুষ খুঁজতে আমাকে ঘরে ঘরে উঁকি দিতে হয়। রুদ্রর মা তাঁর ভারি শরীরটি নিয়ে শুয়ে আছেন পালঙ্কে। বাকি ঘরগুলোয় আছে বাকিরা। বাকিরা যা কিছুই করছে, নিঃশব্দে করছে। পিঠাপিঠি ভাই বোন, অথচ কোনও চড়চিমটি-চুলোচুলো নেই। গোসলের সময় গোসল করছে, খাওয়ার সময় খাচ্ছে, ঘুমের সময় ঘুমোচ্ছে। চাবি দেওয়া যন্ত্রের মত, কাঁটায় কাঁটায় ঘটে যাচ্ছে সব, কিছুই পড়ে থাকছে না, কিছুরই এদিক ওদিক হয়না, এমন নিয়ম, পালনের প্রশ্ন ওঠে না, দেখলেই হাঁসফাঁস লাগে, আমি কোনও রুটিন মেনে চলতে পারি না, ক্ষিধে লাগলে খেয়ে উঠি, গোসল করে পরে খেতে হবে এমন নিয়মের মধ্যে নিজেকে কখনই ফেলতে পারি না, আজ গোসল করি তো কাল করি না, আজ নাস্তা খাই তো কাল খাই না, দুপুরে কোনওদিন ঘুমোই, কোনওদিন ঘুমোই না, রাত নটা বা দশটা বাজলেই আমার ঘুমোতে যেতে হবে এমন কোনও কথা নেই। কখনও আটটায় যাই, কখনও দশটায়, কখনও আবার সারা রাত্তির যাওয়াই হয় না। আমার উপস্থিতি এ বাড়িটির মন্থর ছন্দে একটুকু পরিবর্তন আনে না। অবকাশে যেরকম উৎসব শুরু হয় নতুন কেউ এলে, তার কিছুই ঘটে না এ বাড়িতে। সম্ভাষণও এমন শীতল, যেন মানুষগুলো সকাল বিকাল আমাকে দেখছে, যেন আমি এ বাড়িতে দীর্ঘ দীর্ঘ বছর ধরে বাস করছি। ইচ্ছে করে বাড়িটির মরচে ধরা দরজা ভীষণ ধাক্কা দিয়ে খুলি, মাকড়শার জালগুলো সরাই। মানুষ একটু চিৎকার করুক, গলা ছেড়ে গান গাক, উঠোনের কাদায় হঠাৎ পিছলে পড়ে যাক, কেউ কাউকে ধমক লাগাক, কেউ তর্ক করুক কিছু নিয়ে, কিছু একটা ঘটুক, কেউ কিছু একটা করুক, হো হো করে হাসুক, হাসতে যদি না পারে তবু কিছু একটা করুক, না হয় কাঁদুক। তবু কিছু করুক। আমিই ওদের গায়ের শ্যাওলা সরিয়ে বলি, *চল গল্প করি, চল তাস খেলি।* বিছানায় সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে আসর জমাতে চাই, জমে না। কারও কোনও গল্প নেই। অসম্ভব নিস্পৃহতার আঁচলে ওরা মুখ লুকিয়ে রাখে। ভাঙা হাত, তবু শুয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না, কিছু একটা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রক্তের কণার সঙ্গে মাথা থেকে পা অবদি দৌড়োয়। সারা বাড়িতে কোনও বই নেই যে পড়ব, সময় আমার প্রতি লোমকূপে বাবলা গাছের কাঁটা হয়ে বেঁধে। সময় আমার খুব বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, চাবুকে চাবুকে আমাকে রক্তাক্ত করতে থাকে। প্রতিদিন সকালে বা দুপুরে বেরিয়ে যায় রুদ্র, অসহ্য অপেক্ষার প্রহর কাটাই একা

একা, মধ্যরাতে মাতাল স্বামী ঘরে ফেরে। দিনগুলো এভাবেই পেরোতে থাকে। এভাবেই রাতগুলো। ঘর থেকে বেরোতে গেলেই একটি কিম্ভূতকিমাকার *না* এসে আমাকে অচল করে রাখে। তবুও গোঁ ধরে *যাবই যাবই* বলে এক রাতে বেরোলাম, একটি হোটেলে সে গেল, একটি আড্ডায়, মদের আড্ডায়। বন্দরে ভদ্রলোকদের যাওয়ার জায়গা বলতে এই হোটেলটিই, রুদ্র বলে। গুমোট ঘরের বাইরে এসে আমি ফুসফুস ভরে হাওয়া নিতে চেয়েছিলাম, হাওয়া জোটে, মদগন্ধময়হাওয়াই জোটে।

প্রাণ ফিরে পাই যেদিন বন্দর ত্যাগের আয়োজন হয়, যদিও ঢাকার পথে নয়, যাত্রাটি আরও গভীর গ্রামের পথে, তবু এ বাড়ির শুয়ে বসে থাকা জীবনটি শেষ করার জন্য আমি আকুল হয়ে রওনা হই। গ্রামে নিশ্চয়ই বন্দরের মত শ্রমিকের উৎপাত নেই, রুদ্রর হাত ধরে সেইসব শস্যের সবুজ ক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটতে পারব, যেসব ক্ষেতের কথা বারবার সে লিখেছে কবিতায়। মিঠেখালি গ্রামটি নিশ্চয়ই ছবির মত সুন্দর একটি গ্রাম, যে গ্রামের সৌন্দর্য রুদ্রকে বারবার টেনে আনে এখানে। কোথায় বসে সে কবিতা লেখে, কোন বৃক্ষতলে সে উদাস বসে আমাকে ভাবে, কোন ভরা জ্যোৎস্নার মাঠে সে একা একা দৌড়ে যায়, দুচোখ ভরে দেখব সব। মোংলা থেকে ছইঅলা নৌকোয় মুখ আড়াল করে আরও সব মেয়েমানুষের সঙ্গে খাল পেরিয়ে মিঠেখালি যেতে হয়। গভীর গ্রামের ভেতর চারদিকে ফসলের ক্ষেত, কিছু গোলপাতার ঘর এদিকে ওদিকে, মাঝখানে গাছগাছালি ঘেরা বড় একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে একটি পুকুর, পুকুরে শান বাঁধানো ঘাট। সন্ধে হলেই বাড়ির ঘরে, বারান্দায়, সিঁড়িতে প্রচুর হারিকেন জ্বলে। ঝাড়বাতি থাকলে এটিকে সত্যিকার জমিদার বাড়িই বলা যেত। অবাক হই, এই ঘোর গহীন গ্রামে কে এনেছে ইট পাথর, কে গড়েছে এই বাড়ি! রুদ্রর নানার বাড়ি এটি। নানার দাপট ছিল এলাকায়, তার চেয়ে বেশি দাপট ছিল তার বড়মামার। গ্রামগঞ্জের দাপুটে অনেক লোক একাত্তরে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তিনিও ছিলেন। রুদ্রর মেজমামাও স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন না। এমন পরিবারে মানুষ হয়ে রুদ্র অন্যরকম। নিজে সে নিজের নাম *রুদ্র* রেখেছে। না রাখলে পিতৃদত্ত মুহম্মদ শহিদুল্লাহ নামটি নিয়েই তাকে জীবন কাটাতে হত। কবিতা লেখে স্বাধীনতার পক্ষে, মসনদে রাজাকারের ফিরে আসায় প্রচণ্ড ক্ষোভে সে বলে, *জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরোনো শকুন।* কবিতায় *শকুন* বলে গাল দিলেও রুদ্রর অগাধ শ্রদ্ধা দেখি তার সেই মামাদের জন্য। *গোবরে পদ্মফুল*টির জন্য গৌরব হয় হয় করেও হয় না। গ্রামের বাড়িতে যখন থাকে সে, তার বড়মামার ঘরে থাকে। ঘরে বড় বড় দুটো পালঙ্ক, বড় বড় কাঠের আলমারি, বড় বড় চেয়ার। সবই বড় বড়। জমিদারি গন্ধ বেরোচ্ছে সব কিছু থেকে। বড়মামা বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর বউ আছেন, বউটি একদিকে তার বড়মামি আরেকদিকে বড়ফুপু। রুদ্র কাকু বলে ডাকে তাঁকে। কাকুর কথা সে আমাকে চিঠিতে লিখেছে অনেক। কাকুর নিজের কোনও ছেলেমেয়ে নেই। রুদ্রকেই তিনি নিজের ছেলের মত লালন পালন করেছেন। এখানে জানালার কাছে বড়মামার পুরোনো টেবিলটিতে বসে রুদ্র কবিতা লেখে, বড়মামার পালঙ্কে নরম গদিতে ঘুমোয়। ঘুমোয়, চাকরবাকর আরদালি খানসামা তার আদেশ পালনের অপেক্ষায় থাকে। মাসের পর মাস কাটিয়ে দেয় সে এ বাড়িতেই। এমন জমিদারি আমি যখন ফ্যালফ্যাল করে দেখছি, রুদ্র বলে, *আরও ছিল, এখন তো পড়তির মুখে!* এখন পড়তির মুখে না হয়ে উঠতির মুখে হলে সম্ভবত আনন্দ হত তার! *যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে, আগে অনেক ছিল, আরও ছিল!* সেই আগের *আরোর* জন্য, আগের *অঢেলের* জন্য, *অনেকের* জন্য রুদ্রর গর্ব হচ্ছে টের পাই। ধনসম্পত্তি নিয়ে তার

অহঙ্কার সে চাইলেও গোপন করতে পারে না। কিন্তু দরিদ্রকে শোষণ না করে কেউ কি এত ধনসম্পত্তি করতে পারে? পারে না, মন বলে, পারে না। রুদ্র তো সেই আশিভাগের পক্ষে কবিতা লেখে, যারা তার দোতলার ঘরটিতে কখনও পৌঁছতে পারে না, নিচের সিঁড়ি থেকেই যাদের হটিয়ে দেয় পাইক পেয়াদারা। যারা রোদে পুড়ে পুড়ে ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে, ওইসব বরগাচাষীরা, যাদের শ্রমের ফসল উঠছে এ বাড়ির গোলায়! যাদের আর রুদ্রর মধ্যে অনেক ফারাক। আমি মেলাতে পারি না। সাম্যের জন্য চিৎকার করে কবিতা পড়ে রুদ্র, সাম্য কি সত্যিই সে মন থেকে চায়! ঘরের চার দেয়াল ক্রমশ পা পা করে এগোতে থাকে আমার দিকে। রুদ্রকে বলি, *চল বাইরে বেরোই।*

বাইরে কোথায় যাবে?

গ্রাম দেখতে।

গ্রামে তো দেখার কিছু নেই।

দেখার কিছু থাকবে না কেন?

দেখার কিছু নেই, শুধু ক্ষেত।

ক্ষেতই দেখব।

ক্ষেত দেখে কি করবে? এসব ধানের ক্ষেত দেখার কোনও মানে হয়?

চল দুজন হাঁটি গ্রামের পথে। তুমি তো আমাকে চিঠিতে কতবার লিখেছো, যে, তোমার নাকি ইচ্ছে করে দিগন্ত অবদি সুবজ ধানের ক্ষেত দেখাতে আমাকে? দেখাতে গ্রামের আশ্চর্য সুন্দর রূপ!

খামোকা বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়িতে বসে কাকুর সাথে গল্প কর। বীথি ওরা আছে, ওদের সাথে সময় কাটাও।

সময় তো আমি রুদ্রর সঙ্গে কাটাতে চাই। কথা বলতে বলতে দুপুর গড়িয়ে যাবে, বিকেল গড়িয়ে যাবে, টের পাবো না। রাতের কালো পর্দা এসে আমাদের মুখ ঢেকে দেবে, আমরা যে পরস্পরকে আর দেখতে পাচ্ছি না, টের পাবো না। আমাদের নিঃশ্বাসের কাছাকাছি আমরা থাকব, আমাদের স্পর্শের কাছে থাকব, আমাদের অনুভবের কাছে, টের পাবো না। জীবনের টুকরো টুকরো নিয়ে, টুকরো টুকরো জীবন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, অথবা কোনও কিছু না নিয়ে, মনে যা আসে তাই নিয়ে, সুপুরি গাছের মাথায় এইমাত্র যে পাখিটি এসে বসল, সেই পাখিটি নিয়ে, একটি বালক দৌড়ে এসে পুকুরে ঝাঁপ দিল, সেই বালকটি নিয়ে। কিন্তু আমি চাইলেও রুদ্রর নিস্পৃহতা লক্ষ করি, সে একা একা শুয়ে থাকতে চায় পালঙ্কটিতে। তার বুকের লোমে আঙুলে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে জীবনে কি কি আমার ইচ্ছে করে, কি কি করে না বলব, চায় না সে। আমার হাঁটুর কাছে তার মাথা, তার হাঁটুর কাছে আমার, এভাবেই শুয়েই স্মৃতি থেকে কবিতা পড়ে যাব যে যতটা জানি, চায় না সে। সে চায় সারাদিন আমি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে কাটাই, রাতে শুতে আসি তার বিছানায়। ঢাকার রুদ্র আর মিঠেখালির রুদ্রকে আমি শত চেষ্টা করেও মেলাতে পারি না।

কাকুর সঙ্গে গল্প করতে গেলে তিনি আলমারি খুলে শাড়ি বের করেন আমার জন্য, গয়নার বাক্স খুলে ভারি ভারি গয়না পরিয়ে দেন গায়ে। স্বামীকে সুখী করার জন্য যা যা করতে হয় স্ত্রীদের, তার সবই যেন আমি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাই, কর্তব্যকাজে যেন কখনও অবহেলা না করি। কাকুর উপদেশের সাগরে আমি খড়কুটোর মত ভাসতে থাকি। কাকু না হয় পুরোনো কালের মানুষ, *স্বামীর প্রতি স্ত্রীর* একশ রকম *কর্তব্যের* কথা তিনি

জানেন, কিন্তু নতুন কালের মানুষ বীথির কাছে গিয়ে *স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্তত একটি কর্তব্য* সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে। রূপসী বীথির রূপসী কপাল নিভাঁজ পাওয়ার আশায় বসে থাকি, ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়। বীথি সারাদিনই সংসারের নানারকম সমস্যা নিয়ে এর ওর সঙ্গে কথা বলছে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে বলে *বৌদি বস,* কিন্তু সমস্যার খুব কাছে আমি বসে থাকি, তা সে চায় না। বীথির সমস্যার অন্ত নেই। তার অভিযোগের শেষ নেই। বাবা মা মেজমামা কাকু সবার বিরুদ্ধে তার গণ্ডা গণ্ডা অভিযোগ। মোংলা বন্দরের সংসার তাকে দেখাশোনা করতে হয়, এ সংসারও। মেজ মামার ছেলে মণির সঙ্গে বীথির বিয়ে হয়েছে। সম্পর্কের শেকলে মোংলা আর মিঠেখালির মানুষেরা খুব শক্ত করে বাঁধা, বীথির মেজমামাই বীথির শ্বশুর, সম্পর্কগুলো কি রকম একটির সঙ্গে আরেকটি লেগে আছে শেকলের মত! শেকল নিয়ে রুদ্রর মা মোটেও ভাবেন না, সংসারের কোনও কাজ নিয়েও ভাবেন না অথচ অগুনতি দুর্ভাবনা নিয়ে মিঠেখালির বাড়ি এসেও পালঙ্কে শুয়ে দিন কাটান। তাঁর সেবায় আমি সামান্যও ব্যবহৃত হতে পারি কি না জানতে যখন ঘরে ঢুকি, তিনি কাউকে জলদি করে ডেকে বলেন, *দেখ তো শহিদুল্লাহর বউএর কিছু লাগবে কি না দেখ!*

না, আমার কিছু লাগবে না, আমি এমনি এসেছি। বিব্রত শাশুড়ির সামনে ঘোমটা-মাথার ততোধিক বিব্রত বউটি বলে।

এমনি এসে তাঁর ঘরে কেউ বসে থাকলে তিনি যে বিব্রত হন বেশ বুঝতে পারি। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আমার যে গল্প করার ইচ্ছে, তা বলে তাঁকে আরও বিব্রত করতে ইচ্ছে করে না।

বিকেলে রুদ্র একা বেরোবে বাইরে। তার কাজের অন্ত নেই। *কেন যাচ্ছো, যেও না, প্লিজ, থাকো,* আমার এসব *ছেঁদো অনুরোধ* পুকুরে ঢিলের মত ছুঁড়ে দিয়ে সে মোংলা বন্দরে যায়, ফিরে আসে গভীর রাতে, এক শরীর ঝাঁঝালো গন্ধ নিয়ে।

গন্ধ কেন?

এই একটু মদ খেয়েছি।

কেন খেয়েছো?

খেতে ইচ্ছে করেছে তাই খেয়েছি।

তোমাকে আর কত বলব মদ খেও না! তুমি কি কোনওদিন আমার কথা শুনবে না?

ঘরে কাকু আছেন, অন্য বিছানায়, রুদ্র ভ্রুক্ষেপ করে না, যত রাতই হোক তার শরীর চাই।

তুমি কি কেবল শরীরই বোঝো রুদ্র? মন বোঝো না?

না রুদ্র মন বোঝে না, সে বিশ্বাস করে *শরীরেই বসত করে মনরূপ পাখি। শরীর মেলালে মনের দেখা মেলে।*

রুদ্রর শরীর চাই। প্রতি রাতেই তার চাই, যে করেই হোক, যে পরিবেশেই হোক, চাই। পূর্ণিমায় যখন গ্রাম ভেসে যাচ্ছে, আলোয় আমার মন ভাসছে, রুদ্রকে নিয়ে ছাদে যাই পূর্ণিমা দেখতে। ঝকঝকে চাঁদের তলে শীতল পাটিতে শুয়ে আছি, আলোয় আমার মন নাচছে, তার একটি হাত হাতের মুঠোয় নিয়ে আলোয়-ভেজা শীতে কাঁপি, এভাবেই চল সারারাত চাঁদের আলোয় স্নান করি, চল সারারাত, চল সারারাত এভাবেই। আলোয় আমার মন উড়ছে। রুদ্র আলোয় ভাসতে চায় না, উড়তে চায় না, সে আমার শরীরে ডুবতে চায়। ওই ছাদে *যে কেউ চলে আসতে পারের* বিপদের দুআঙুল দূরে দাঁড়িয়ে

সে শরীর ভোগ করে। বেঘোরে ঘুমোয়। আমি আর চাঁদ জেগে থাকি একা একা, সারারাত একা একা।

ঘরে বসে থাকব আর খাবার চলে আসবে ঘরে, এ খুব আরামের হয়ত, কিন্তু আমার দ্বিধা হয় এ বাড়ির সমস্ত আরাম আয়েশে গা এলিয়ে দিতে। এ আমার শ্বশুর বাড়ি না হোক, শাশুড়ির বাড়ি তো। নিজেকে সংসারের প্রয়োজনে লাগাতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি আমি একটি বাড়তি মানুষ, হুকুম খাটার লোকের অভাব নেই বাড়িতে। জমিদারের বাড়িতে যা হয়। এ বাড়ির বড় বড় জিনিসগুলো আমার বোধগম্য হয় না সহজে। রুদ্র যখন বীথির সঙ্গে জমিজমা ধান চাল সহায় সম্পত্তি ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলে, আমি বেশির ভাগই বুঝি না। রুদ্র পরে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছে, ভীষণ এক জটিল অবস্থার মধ্যে আছে এই জমিদারি। মিঠেখালির জমি থেকে যা আয় হয়, তার মায়ের ভাগ সে নিয়ে যায় এখান থেকে। বহু বছর হল এভাবেই নিচ্ছে সে ভাগটি। ভাগ নিয়ে কিছু সে নিজের জন্য রেখে বাকিটা রেখে যায় বন্দরের সংসার-কাজে। কিন্তু রুদ্র এখন ভাগের ধান বিক্রিতে বিশ্বাসী নয় আর। অনেকদিন থেকে সে তার মাকে বলছে যেন মেজ মামা জমি ভাগের ব্যবস্থা করেন। তার মায়ের ভাগেরটুকু থেকে কিছু বিক্রি করে সে ঢাকায় ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করবে। রুদ্র ঢাকার পঞ্চাশ লালবাগের বাড়িটিতেও তার মায়ের ভাগ দাবি করে, ওটিও ছেড়ে দিতে সে রাজি নয়। বীথি তার দাদাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে সমর্থন জানিয়ে যায়। জমি ভাগ করতে মেজ মামা রাজি হন না। বড়মামার পর এখন মেজই হর্তকর্তা, তিনি না চাইলে ভাগ সম্ভব নয়। জমিজমা বিষয়ক জটিলতা থেকে আমার মন উঠে দৌড়ে যায় শান বাঁধানো পুকুরঘাটে। চল যাই, হাঁসের সাঁতার দেখি বসি। *চল, পুকুরে গোসল করি।* আমার আবদার শুনে বাড়ির সবাই হাসে, রুদ্রও হাসে। যেন আমার বোধ হয়নি বুদ্ধি হয়নি, যেন জীবন কাকে বলে তার কিছুই আমি এখনও জানি না। আমি আমার শিশুসুলভ অপরিপক্বতা দিয়ে কেবল লোক হাসাতে পারি। পুকুরে বাইরের মানুষ গোসল করতে আসে, ও পুকুরে বাড়ির বউএর নাওয়া চলবে না। গোসল করতে হলে বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ভেতরের পুকুরে। ভেতরের ঘোলা পুকুরে আমি পা ডুবিয়ে বসে থাকি।

দোতলার জানালা থেকে আমি তাকিয়ে থাকি পুকুরটির দিকে। পুকুরটিকেও আমার মত খুব একলা মনে হয়। যেন দীর্ঘ দীর্ঘ দিন তারও কোথাও কোনও পুকুরে গোসল সারা হয়নি। গায়ে শ্যাওলা জমে আছে পুকুরের। এই পুকুরটির পানি দিয়েই এ বাড়ির রান্নাবান্না ধোয়া পাকলা অযু গোসল সব হয়। পানি খাওয়াও হয়। বড় বড় মটকিতে বর্ষার সময় বর্ষার জল জমিয়ে রাখার নিয়ম। মটকিগুলো উঠোনেই পড়ে থাকে। সারাবছর মটকির পানিও খাওয়া হয়। ফুরিয়ে গেলে পুকুরের পানি। একদিন পানি খেতে গিয়ে গেলাসের পানিতে দেখি অনেকগুলো কিড়ে কিলবিল করে সাঁতার কাটছে। অন্যরা দিব্যি কিড়েঅলা পানি খেয়ে নিচ্ছে। আমি হা হা করে থামাতে এলে বীথি বলল, *ও কিড়ে কোনও ক্ষতি করে না, ও খাওয়া যায়।* বীথি আমাকে পানির উৎসের কথা বলে, বলে কি করে খাবার পানি সংগ্রহ করে ওরা। আমি থ হয়ে বসে থাকি। দেখে হাসে সবাই। আমাকে খুব অদ্ভুত চিড়িয়া কিছু ভাবে নিশ্চয়ই ওরা। পানিহীন দিন কাটতে থাকে আমার। দিনে যে দুকাপ চা খাওয়া হয়, তা দিয়ে পানির অভাব পুরণ করি শরীরের। রুদ্র মোংলা বন্দর থেকে অনেকগুলো ফানটা কোকোকোলা আনিয়ে দিয়েছে আমার জন্য। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখি পুকুরটিতে লোকেরা সাবান মেখে গোসল করছে। বুঝি না, কি করে এত

নিশ্চিন্তে এই পুকুরের পানিই পান করছে সবাই! এত জমি এত টাকা, অথচ কোনও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা কি কেউ করতে পারে না? রুদ্র বলে, *ব্যবস্থা করার কোনও প্রয়োজন নেই। এই পানি খেয়ে আসছি সেই ছোটবেলা থেকে, কখনও কোনও অসুখ হয়নি।* কাকুর ঘরটিতে বসে আমার অলস অবসর সময় কাটতে থাকে। এ বাড়িতেও বই খুঁজি। হাদিস কোরানের ওপর কিছু বই ছাড়া অন্য কোনও বই নেই, কিছু পঞ্জিকা আছে শুধু। এ ঘরে বসেই পুরোনো পঞ্জিকা খুলে রুদ্র একদিন আমার জন্মতারিখ বের করেছিল। আরবি সালের বারোই রবিউল আওয়াল আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পড়েছে ইংরেজি কোন সালে, আটান্ন থেকে চৌষট্টি পর্যন্ত খুঁজে বের করে জানিয়েছিল বাষট্টি সালে। বাষট্টি সালের পঁচিশে আগস্টে। এই কাকুর ঘরে খামোকা কাজকম্মহীন বসে থাকতে রুদ্রর কোনও অসুবিধে হয় না। দীর্ঘ দীর্ঘ মাস এ ঘরেই বসে থাকে সে। এ ঘরে বসেই কবিতা লেখে, এ ঘরে বসেই ডাকে পাঠানো আমার চিঠি পড়ে, নিজেও লেখে। ঘরে বসে থাকতে থাকতে জীবন স্যাঁতসেঁতে লাগে, রুদ্রকে যখনই বলি, চল ঢাকা ফিরে যাই। রুদ্র এক কথাই বলে টাকার যোগাড় হোক আগে। কি করে টাকার যোগাড় হবে আমার বোঝা হয় না। যেদিন আমরা মিঠেখালি ছাড়ি, তার আগের রাতে রুদ্র মোংলা বন্দর থেকে মদ খেয়ে ফিরেছে। প্রায়-মাতাল রুদ্র একটি কাণ্ড ঘটাতে চায়। আমার বাধা না মেনে সে কাণ্ডটি ঘটায়। তার মেজ মামার আলমারির তালা ভেঙে জমির দলিল বের করে আনে। দলিল হাতে তার। যে দলিলটি পেতে বছরের পর বছর সে অপেক্ষা করেছে। সে এখন দিব্যি কোনওরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তার মার ভাগের জমি বিক্রি করে দিতে পারে যে কারও কাছে। কিন্তু বাড়ির কেউই রুদ্রর এই কাণ্ডটিকে সমর্থন করে না। কাকু, এত যে তার আদরের, তিনিও করেন না, রুদ্রর মা, যাঁর জমি, তিনিও তার পুত্রের এমন অসভ্যতা মেনে নেন না, বীথিও না, যে কি না তার দাদার প্রতি কাজে বাহবা দিয়ে আসছে। রুদ্রর পদক্ষেপটি সম্পূর্ণই বিফলে যায়। মেজমামার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর হাতেই শেষ অবদি তুলে দিতে হয় দলিলটি। চলে যাওয়ার দিন রুদ্র আমাকে ঠেলে পাঠায় মেজমামাকে যেন পা ছুঁয়ে সালাম করি, কদমবুসি করি। রুদ্রর আদেশ আমি নতমুখে পালন করি, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একশ কর্তব্যের এটি একটি।

রুদ্রর অনেক কিছু বিফলে যায়। নটা পাঁচটা চাকরি তার পোষাবে না বলেছিল, তারপরও ঢাকায় সে চাকরির জন্য ধরনা দেয়। চাকরি পাওয়া হয় না। পত্রিকা অফিসগুলোয় ঘোরে, ওখানেও ব্যবস্থা হয় না কিছুর। অন্তত কোনও পত্রিকায় যদি সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে তার একটি চাকরি জুটত। কে দেবে চাকরি! নামি লেখক সৈয়দ শামসুল হকের আলিশান বাড়ি গিয়ে অনুরোধ করে তিনি যদি অন্তত চিত্রনাট্য লেখার কোনও কাজ রুদ্রকে দেন, সৈয়দ হক কথা দেন না। তিনি যে ছদ্মনামে বাংলা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখে পয়সা কামাচ্ছেন, এ কথা অনেকেই জানে। সৈয়দ হকের ছোটভাই এর প্রকাশনী সব্যসাচী থেকে রুদ্রর তৃতীয় কবিতার বই *মানুষের মানচিত্র* বের হয়। এটুকুই। এর বেশি রুদ্রর ভাগ্যে কিছু জোটে না। মানুষের মানচিত্র যেবার বেরোলো বইমেলায়, প্রতিদিন বিকেলে মেলায় গিয়ে সে ঠায় বসে থেকেছে বইয়ের স্টলটিতে। তার বসে থাকার কারণে যদি বিক্রি হয় বই অথবা কেউ যদি বই কিনে বইয়ে সই চায়। মেলা ভাঙা পর্যন্ত রুদ্র বসে থাকে। রুদ্র কেবল কবিতা লিখে আর কবিতার বই ছেপেই শান্ত হয় না। সুযোগ পেলেই নানারকম দলে ভিড়ে যায় । সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে রুদ্র আর তার বন্ধুরা। এরশাদ বিরোধী নানা রকম অনুষ্ঠান করছে

এই জোট। কিন্তু ঢাকায় রুদ্রর দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণে সাংস্কৃতিক জোটে তার বড় দাযিত্বটি অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া হয়। নিজের হারানো পদটি ফিরে পেতে সে হন্যে হয়ে ঘোরে, ফিরে পাওয়া হয় না। রুদ্র জানে যে পাকাপাকি ভাবে ঢাকা না এলে সংসার তো তার করা হবেই না, দেশের সাহিত্যঅঙ্গনে প্রতিভাবান তরুণ কবি হিসেবে তার যে একটি পরিচিতি হয়েছে, সেটিকেও কিছু হিংসুক কবিকুল বিনাশ করতে চেষ্টা করবে।

রুদ্রর জন্য মায়া হয় আমার। আমি বলি, তুমি কবিতা লেখ, আমি সংসার চালাবো। টাকা পয়সা রোজগার নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। প্রথমেই নিজের টাকায় যে জিনিসটি কিনি সে বইয়ের আলমারি। রুদ্রর পুরোনো বাঁশের তাক থেকে তার বইগুলো নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখি। নয়াপল্টনে ছোটদার বাড়ি যেতে আসতে ইস্পাতের দোকানে থেমে কাপড় চোপড় রাখার আলমারি কিনেও তাজমহল রোডের ঘরে তুলি। দুজনের কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখি ওতে। একটু একটু করে সংসারের জিনিস কেনা শুরু করতে হবে, সে রুদ্রও জানে। অবকাশ থেকে আমার কাপড় চোপড় বইপত্র হাজার রকম টুকিটাকি জিনিস ট্রাংকে করে তাজমহল রোডে নিয়ে এসেছি। মন প্রাণ শরীর সব ঢেলে দিই সংসার সাজানোয়। রুদ্রর টাকা উড়তে থাকে মেথরপট্টির মদের আড্ডায়, সাকুরায়। সাকুরায় প্রায় রাতে যায়, ওখানে মদ নিয়ে বসে। বন্ধুদের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলতে বলতে মদ পান করে, ম্যাচবাক্সে আঙুলের টোকা দিয়ে দিয়ে *আমার মনের কোণে বাউরি বাতাস ..* গেয়ে ওঠে মাতাল রুদ্র। প্রায়ই। মধ্যরাতে টলতে থাকা রুদ্রকে নিয়ে রিক্সা করে বাড়ি ফিরি। রুদ্র মদ খাচ্ছে না, মদ রুদ্রকে খাচ্ছে। মদ ছাড়া সন্ধে বা রাত তার কাটে মন মরা। আমি তাকে কেঁদে বোঝাই, ধমকে বোঝাই, রাগ করে, আদর করে বোঝাই যে মদ খাওয়া শরীরের জন্য ভাল নয়। রুদ্র সব বোঝে, আবার কিছুই বোঝে না। মদ যদি না জোটে, কিছু একটার দরকার তার হয়ই, গাঁজা নয়ত চরস। কালো চরস কাগজে মুড়ে রাখে, সেগুলো গুঁড়ো করে সিগারেটের খোলে ঢুকিয়ে খায় সে। রুদ্রকে এসব খাওয়া বন্ধ করার জন্য নিশিদিন অনুরোধ করেও কোনও লাভ নেই। সে তার নেশা করেই যাবে যে করেই হোক। *আমিও মদ খাবো, আমিও গাঁজা চরস খাবো*- যেদিন বলি, সে বাধা দেয় না। বরং পিঠে চাপড় মেরে উৎসাহ দেয়। চরস ভরা সিগারেট এগিয়ে দেয় আমার দিকে, দু টান দিয়ে কেশে নাশ হই। সাকুরায় মদের গেলাস এগিয়ে দেয় বিষম উৎসাহে, গন্ধ শুঁকতেই বিবমিষা আমাকে গ্রাস করে ফেলে বলে এক গেলাস কমলার রসে তিন ফোঁটা ভদকা মিশিয়েও মদে আমার শুরুটা করে দিতে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। গলা ছিঁড়ে যায় ঝাঁঝে, দু চুমুক পান করার পর সে আমাকে বাহবা দেয়, এই তো বেশ হচ্ছে, এভাবে চালিয়ে যাও, হয়ে যাবে। কিন্তু হয় না। রুদ্রর পথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সে একাই তার পথে চলতে থাকে, সঙ্গে কিছু মদারু গাঁজারু বন্ধু। মদের আড্ডায় সঙ্গী হয়ে মাগনা মদ খেতে *বন্ধুরা* সন্ধের পরই ভিড় জমাতে থাকে। রুদ্রর হস্ত উদার হস্ত। পেটে মদ পড়লে পারলে দশ বারোজনকে মাগনা মদ খাওয়াতে রাজি হয়ে যায়। রুদ্রর এই জনমদসেবায় সংসার খরচের টাকা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। টাকা ফুরোনো মানে তার ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়া। এভাবে কি চলে রুদ্র? চলে না সে জানে, কিন্তু আর কোনও উপায় নেই। আমি সংসারের খরচ বহন করতে পারি, কিন্তু তাই বলে রুদ্রর মদের টাকা যোগাতে তো পারি না। আমার প্রশিক্ষণ-ভাতার টাকায় এত তো কুলোবে না। রুদ্র জানে যে কুলোবে না, তাই তাকে মোংলা পাড়ি দিতেই হয়।

যতদিন সে মোংলা বা মিঠেখালিতে পড়ে থাকে, ততদিন আমি ডাক্তারি প্রশিক্ষণে মন নিবেশ করি, না করতে পারলেও অন্তত উপস্থিতিটি রাখি। রুদ্র ঢাকায় ফিরলেই প্রশিক্ষণ

গুল্লি মেরে তার কাছে চলে যাই। রুদ্রই আমার ঠিকানা, তাকে নিয়ে আমার সংসারের স্বপ্ন-চারা লকলক করে বড় হতে থাকে, বৃক্ষ হতে থাকে। রুদ্রর ছোট বোন মেরি এখন ঢাকায়, লালবাগে মেজমামার বাড়িতে থেকে লালমাটিয়া কলেজে আইএ ভর্তি হয়েছে। শুনে রুদ্রকে বলি, *মেরিকে এ বাড়িতে নিয়ে এসো। এখান থেকে কলেজ কাছে হবে। মামার বাড়িতে থাকার চেয়ে ভাইএর বাড়িতে থাকা ভাল। এখানে নিজের বাড়ির মত থাকতে পারবে।* রুদ্র প্রথম রাজি হয় না। এ বাড়িতে কি করে থাকবে মেরি! আরাম আয়েশের ব্যবস্থা নেই, কাজের লোক নেই, আমাদেরও পাকাপাকি থাকা হচ্ছে না এখানে। আমার প্রশিক্ষণ তো খুব শিগগির শেষ হয়ে যাচ্ছে, রুদ্র না থাক, আমি তো থাকতে পারব মাসের বেশির ভাগ সময়ই, হয়ত পাঁচ সাতদিনের জন্য যাবো। এক সন্ধেয় লালবাগ থেকে মেরিকে নিয়ে আসি আমরা। মেরি থাকা শুরু করার পর বাড়িটিকে সত্যিকার বাড়ির মত লাগে। গীতার কাছ থেকে রান্নাবান্না করার জন্য সবুজ নামের এক কিশোরিকে নিয়ে আসি। প্রতিদিন সংসারের টুকিটাকি জিনিস কিনছি। এক ঘোরের মধ্যে বাঁচি। কিন্তু সব ফেলে ময়মনসিংহ যেতেই হয় যেহেতু প্রশিক্ষণ আমার এখনো শেষ হয়নি। ময়মনসিংহ থেকে যখনই ঢাকায় ফিরি, আমার সংসারটিকে অনেকটাই পাল্টে যেতে দেখি। দেখি রুদ্রর আরেক বোন সাফিকে মোংলা থেকে রুদ্র ঢাকা নিয়ে এসেছে। রুদ্রর ভাইবোনগুলো সব দেখতে এক, সবগুলো মুখে তাদের মায়ের মুখ। সাফি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে, বিয়ের জন্য বসে আছে। মোংলার চেয়ে ঢাকায় পাত্র পাওয়া সুবিধে বলে রুদ্র ওকে ঢাকায় এনেছে। বাড়িটি এখন আর কোনও ছন্নছড়া দম্পতির ছন্নছাড়া সংসার বলে মনে হয় না, বাড়িটি নুপূর পরে নাচে, কলবল খরবল করে বাড়িটি কথা কয়। আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে এ ভেবেও যে রুদ্র তার দুবোনের সামনে নিজের মান বাঁচাতে আর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরবে না। ভাল লাগে রুদ্রর সংসারি হওয়া দেখে। কিন্তু, একবারও কি সে আমাকে জানাতে পারত না যে সে সাফিকে ঢাকায় নিয়ে আসছে! আমি একটু একটু করে টের পাই, সংসারের অনেক সিদ্ধান্ত সে একা নিচ্ছে। মেরি আর সাফি শোবার ঘরে থাকছে, বড় বিছানাটিতে। আলমারিতে ওদের কাপড় চোপড়, জিনিসপত্র। আমার কাপড়গুলো এক পাশে এক কোণে সরে যাচ্ছে। আমার জায়গা দিন দিন কমতে কমতে ছোট হয়ে আসছে। আমি আর রুদ্র সামনের পড়ার ঘরটিতে ভেঙে পড়া চৌকির ছোট তোশকটি বিছিয়ে ঘুমোই। কৃচ্ছ্রসাধন করি। অথবা কেষ্ট পেতে চাই। কষ্ট করিলে নাকি কেষ্ট মেলে। সংসারের মধ্যে রুদ্রকে নিয়ে সন্ন্যাসযাপন করেও তাকে আমার সারাক্ষণের জন্য পাওয়া হয় না। তার সময় হয় মোংলা যাওয়ার। আমাকে চুমু খেয়ে, *ভাল থেকো লক্ষ্মী সোনা, ভাল থেকো প্রাণ* ইত্যাদি বলে সাফির হাতে সংসার খরচের টাকা দিয়ে রাতের ট্রেন ধরতে চলে যায়। সংসার নিজের টাকায় সাজিয়েছি, কিন্তু সংসার খরচের টাকা আমার হাতে না দিয়ে বোনের হাতে দেওয়ায় সংসার নিয়ে আমার উত্তেজনায় একটি ছোট্ট ঢিল পড়তে গিয়েও পড়েনি, আমার বিশ্বাস হয় না যে আমার এই সংসার আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

রুদ্র বলেছে, বড় একটি বাড়ি প্রয়োজন, কারণ তার ছোট ভাই আবদুল্লাহকেও ঢাকায় এনে সে ইশকুলে ভর্তি করিয়ে দেবে। প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন দেখে বাড়ি খুঁজতে থাকি। পছন্দ হয় না বেশির ভাগ, পছন্দ হলে ভাড়া বেশি। ভাড়া কম হলে ঘর ছোট, জায়গা কম। খুঁজতে খুঁজতে একদিন ইন্দিরা রোডের রাজাবাজারে একটি বাড়ি পছন্দ হয়। বাড়িভাড়া এক মাসের জমা দিয়ে রুদ্রর ফেরার

অপেক্ষায় বসে থাকি। ফিরে এলে মুহম্মদপুরে তাজমহল রোডের বাড়িটি ছেড়ে দিয়ে জিনিসপত্র ইন্দিরা রোডের নতুন বাড়িতে নিয়ে যাই। দুটো শোবার ঘর, একটি বড় একটি ছোট, বড় একটি বৈঠক ঘর, বড় শোবার ঘরের পাশে একটি টানা বারান্দা। সাফি বড় শোবার ঘরটি পছন্দ করে ওর জন্য, সাফির প্রস্তাবে রুদ্র রাজি হয় না, মেরি আর সাফি দুজনকেই সে বুঝিয়ে বলে বড় ঘরটিতেই তার এবং আমার থাকা উচিত। আমাদের জন্য নতুন একটি খাট কিনে বড় শোবার ঘরে পাতে। নিজের লেখার টেবিলটিও। নতুন একটি আলমারি কেনাও হয় এ ঘরের জন্য, সেটি জানালার কাছে। আবদুল্লাহর জন্য একটি ছোট খাট কিনে বৈঠক ঘরে পেতে দেওয়া হয়। ছোট শোবার ঘরে আগের বড় খাটটি আর আগের ইস্পাতের আলমারিটি মেরি আর সাফির জন্য বসানো হয়। ওদিকে ময়মনসিংহে হাসপাতালে যেতে আসতে পথে যে আসবাবপত্রের দোকান পড়ে, ওখান থেকে খাবার টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি যা বানাতে দিয়েছি, ময়মনসিংহে নিয়ে গিয়ে ট্রাক ভাড়া করে আসবাবের দোকান থেকে সমস্ত আসবাব নিয়ে এমনকি অবকাশ থেকেও একটি পুরোনো চেস্ট অব ড্রয়ার আর একটি শ্বেত পাথরের টেবিল তুলে নিয়ে দুজন ঢাকায় ফিরি। একটি সাজানো গোছানো সুন্দর বাড়ি, একটি সুখের শান্তির সংসার ছাড়া আমার মাথায় আর কিছু নেই। নিপুণ হাতে সংসার সাজাই। সংসারের হাজার রকম জিনিস ঘোরের মধ্যে কিনে নিই, সঞ্চয় যা ছিল সব ঢেলে, স্থির হই সংসারে। প্রশিক্ষণ সমাপ্ত। আর ময়মনসিংহে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এবার তোমার খবর কি রুদ্র! আমি তো তোমার কাছে চলে এসেছি, আমার অনুপস্থিতি তোমাকে যে নিয়ন্ত্রণহীন জীবন দিত, এলোমেলো জীবন দিত, সে জীবন আর দেবে না। এই দেখ, আমার সমস্ত নিয়ে আমি এখানে। তোমার কাছে। রুদ্র কথা দেয়, সেও তার সংসারে পাকাপাকি চলে আসছে, আর যেন তাকে টাকার জন্য ছুটতে না হয় কোথাও। একটি ছোটখাট হলেও ছাপাখানা খুলতে পারে এমন টাকা যে করেই হোক, নিয়ে আসবে মোংলা বা মিঠেখালি থেকে। তার বাবা বা মায়ের কোনও জমি বিক্রি করে। ঢাকায় সে ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করবে। বাবা মার সম্পত্তি থেকে যে ভাগ তার পাওয়ার কথা, সেটি এখনই সে নিয়ে নেবে।

ছাপাখানা। ছাপাখানা। রুদ্র সব পরিকল্পনা করে ফেলে , কোথায় হবে। কেমন হবে। প্রতিদিন তাকে কাছে পাবো, এই সুখে আমি তিরতির করে কাঁপি। আর কোনওদিন তাকে প্রতিমাসের খরচ আনতে দূরে যেতে হবে না। আর কোনওদিন নিঃসঙ্গতার কষ্ট তাকে ছিঁড়ে খাবে না। আমার স্বপ্নের বৃক্ষ ছেয়ে যাচ্ছে ফুলে।

কিন্তু, মোংলা থেকে ফিরে আসে খবর নিয়ে যে তার মেজো মামার কাছ থেকে মায়ের জমি আলাদা করে যে বিক্রি করে ঢাকায় একটি ছাপাখানা দেবে বলেছিল সেটি সম্ভব হচ্ছে না। সুতরাং ঢাকায় পাকাপাকি এখনও বসবাস তার সম্ভব নয়। তবে নিজে সে একটি ব্যবসা শুরু করেছে মোংলায়, চিংড়ির ব্যবসা। ব্যবসাটি দেখাশোনা করার লোক আছে। তার খুব না গেলেও চলবে। বছরে দুবার গিয়ে দেখে এলেই হবে। বেশ তো, এবার মন দিয়ে ঘর সংসার করি চল। এতকাল যে স্বপ্নটি লালন করছি আমরা, দুজন একসঙ্গে থাকব, একজন আরেকজনকে ছেড়ে কখনও দূরে যাবো না। শুরু করার আগে বিয়ের অনুষ্ঠান করে নিই। চল ঘটা করে জানাই সবাইকে যে বিয়ে করেছি। বিয়ে তো সামাজিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই অনুষ্ঠানের জন্য রুদ্র নিজে নিমন্ত্রণ পত্র লেখে।

আমরা জ্বালাবো আলো কৃষ্ণপক্ষ পৃথিবীর তীরে,
জীবনে জীবন ঘসে অপরূপ হৃদয়ের আলো।

কোনও শাদা শাড়ি পরে বিধবা সেজে বিয়ে করব না, লাল বেনারসি চাই, সঙ্গে সোনার গয়না। রুদ্র রাগ করে খরুচে মেয়ের *বেআক্কেলি তালিকা* দেখে। কিন্তু আমার ভাষ্য, বউ যখন সাজব আর সব বাঙালি বউএর মতই সাজব। রুদ্রকে কিনে দিই যা যা পরবে সে বিয়ের অনুষ্ঠানে। রুদ্রর চেয়ে আমার উৎসাহ বেশি। শহরের একটি চিনে রেস্তোরাঁকে উনত্রিশে জানুয়ারি তারিখের রাতের জন্য তৈরি থাকতে বলি। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবাইকে নিমন্ত্রণ করব। যেখুক সবাই আমি ভাল আছি, সুখে আছি। যেহেতু *ভাল থাকা সুখে থাকা* শাড়ি গয়না দিয়েই বিচার করে মানুষ। ঢাকায় ঈদ করে ময়মনসিংহে ফিরে গেলে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, *বিয়া যে করছস, তা তর জামাই কি শাড়ি দিল ঈদে?* আমি কোনও উত্তর দিই নি। না ঈদে কোনও শাড়ি রুদ্র আমার জন্য কেনেনি। আমরা যেহেতু ধর্মে বিশ্বাস করি না, ঈদে বিশ্বাস করি না। শাড়ির প্রশ্ন আসে না। মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ঈদে বিশ্বাস করি না বলে নয়, আমি আমার স্বনির্বাচিত স্বামীর কাছ থেকে শাড়ি গয়না পাচ্ছি না বলে। শাড়ি গয়না সুখ দেয় বলে মা হয়ত বিশ্বাস করেন না, কিন্তু শাড়ি গয়না স্ত্রীকে ভালবাসলেই স্বামীরা উপহার দিতে পারে। মা ভালবাসার সন্ধান করেন, আমার জন্য রুদ্রের। রুদ্রর টাকা কত আছে, সে কোনও উপহার দিতে সক্ষম কি না তা না দেখে একজন ডাক্তার মেয়ের জন্য যে ধরনের স্বামী পাওয়া যায়, সে সব স্বামীর যে যোগ্যতা থাকে দামি শাড়ি গয়না উপহার দেওয়ার তা থেকেই বিচার করা হয় আমি আদৌ যোগ্য স্বামী পেয়েছি কি না। রুদ্রর যোগ্যতা নিয়ে সকলের সন্দেহ আমার মনে হুল ফোটাতে থাকে। সামজিক নিয়ম কানুন অস্বীকার করি বলে ভাবি, কিন্তু সমাজে বাস করে তার সবটুকু হয়ে ওঠে না ডিঙোনো। বিয়ের অনুষ্ঠানে ঝেঁপে বৃষ্টি আসা রাতে লাল বেনারসি শাড়ি পরা সোনার অলংকার পরা লাল টুকটুক বউ চিনে রেস্তোরাঁয় যায়। বউকে ঠিক বউএর মত লাগে না, বউএর মাথায় ঘোমটা নেই। কিন্তু তবু তো বউ। রুদ্রর লেখক বন্ধুরা আসে, আমার দুচারজন ডাক্তার বন্ধু আসে, দুপক্ষের আত্মীয়রাও আসেন, আমার আত্মীয়দের মধ্যে বড়মামা তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে, ছোটদা গীতাকে নিয়ে, ঝুনুখালা তাঁর বরিশালি স্বামী নিয়ে। অনুষ্ঠান বলতে খাওয়া আর গল্প গুজব। ক্যামেরার সামনে মুখে ভুবনমোহিনী হাসি নিয়ে যার সঙ্গে যার যত বিরোধই থাক না কেন, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যাওয়া, ফটো তোলা।

ছোটদার বাড়িতে, ঝুনুখালার বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসি রুদ্রকে নিয়ে। মা ঢাকায় এলে মাকে নিয়ে নিজের সংসার দেখিয়ে আসি। সামাজিকতা শেষ হয়। এবার কি? এবার রুদ্র মোংলা চলে যাবে, চিংড়ির ব্যবসা। বাড়িভাড়া আর সংসার খরচের টাকা বোনের হাতে দিয়ে মোংলা চলে যায় বরাবরের মত। প্রশিক্ষণ ভাতার জমানো টাকা সব অকাতরে ঢেলে বাড়িঘর সাজিয়ে, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবীদের বিয়ের খবর প্রচার করে *ভাল আছি সুখে আছি* বুঝিয়ে, সংসার করছি জানিয়ে, ময়মনসিংহে নিজের যা কিছু জিনিসপত্র ছিল সব নিয়ে এসে, এমন কি নিজের শেকড়টি তুলে নিয়ে ঢাকায় পুঁতে, ভালবাসার মানুষকে নিয়ে একটি সাজানো গোছানো দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন দেখা মেয়ে লক্ষ্য করি নিজের সংসারে নিজে আমি গৌণ একজন মানুষ। রুদ্র কি আমাকে বিশ্বাস করে না যে আমি এই

সংসারের দায়িত্ব নিতে পারব? এরকম তো নয় প্রশিক্ষণের জন্য আমার আবার ময়মনসিংহে দৌড়োতে হবে। ও পাট তো চুকেছেই। তবে কেন এই অবিশ্বাস! কেন এই আস্থাহীনতা! তীব্র অপমানবোধ আমাকে থাবা দিয়ে ধরে। রুদ্রর ভাই বোনগুলো চমৎকার। ওদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই। হাসিখুশি প্রাণচঞ্চল মানুষ। মোংলা বন্দরের বাড়িতে যেমন সবাই ঝিমিয়ে আছে বলে মনে হত এ বাড়িতে তা নয়। আবদুল্লাহ বাইরের গাড়িবারান্দায় ক্রিকেট খেলে, ইশকুলে বন্ধু বান্ধব হয়েছে অনেক। মেরিরও তাই। বন্ধু বান্ধবী বাড়িতে আসছে। হৈ হুল্লোড় হচ্ছে। ওদের সঙ্গে আমিও কদিন হৈ হুল্লোড়ে যোগ দিয়ে নিজেকে পরিবারের একজন ভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু চেষ্টা করলেই যে হয় তা নয়। সংসারে আমার কোনও সিদ্ধান্ত নেই। ভূমিকা নেই। দায়িত্ব নেই। সবুজ চলে গেছে। ময়মনসিংহ থেকে নার্গিসের ছোট বোন বিলকিসকে নিয়ে এসেছিলাম। বিলকিসও চলে গেছে। ওরা মোংলা থেকে কাজের মেয়ে নিয়ে এসেছে। মেয়েটি ঘরদোর গুছিয়ে রাখে, রাঁধে বাড়ে, ওদের খাওয়ায়। কি বাজার হবে, কি দিয়ে কি রান্না হবে সব সিদ্ধান্ত নেয় রুদ্রর বোনেরা। টেবিলে খাবার দেওয়া হলে ডাক পড়ে আমার। খেয়ে চলে আসি নিজের ঘরে। বুঝি এ বাড়িতে আমি অতিথি ছাড়া কিছু নই। রুদ্র নিজে টাকা রোজগারের পথ পেয়ে গেছে। পরিবারের অকর্মণ্য অপদার্থ ছেলেটি হঠাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ সে পরিবারের বড় একটি দায়িত্ব নিয়েছে। বীথি সংসার করছে, সাইফুল মেডিকেলে পড়ছে। বাকি ছ ভাই বোনকে লালন পালন করার দায়িত্ব নিয়েছে রুদ্র। তিনজন এসে গেছে ঢাকায়, বাকি তিনজন আসছে। এই বড় দায়িত্বটি পেয়ে সে উত্তেজিত। রুদ্রর স্বপ্নে আমাকে নিয়ে একান্ত করে একটি সংসার পাতা নেই। ঢাকায় বাস করারও কোনও স্বপ্নটিও নেই আর। ওসব পুরোনো স্বপ্নকে ঠেলে সরিয়ে অন্য স্বপ্ন শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, রুদ্রর স্বপ্নে চিংড়ির ব্যবসা করে প্রচুর টাকার মালিক হওয়া আছে, স্বপ্নের মধ্যে সুষ্ঠু ভাবে তার ছভাইবোনকে বড় করা আছে। রুদ্র বলে যায় দু সপ্তাহ পর ফিরবে, দু মাস চলে গেলেও ফেরার নাম নেই। ওদের সংসারে থেকে ওদের অন্ন ধ্বংস করতে আমার লজ্জা হয়। ছোটদার বাড়ি চলে আসি। গীতার নতুন একটি বাচ্চা হয়েছে। এ বাচ্চাটি হওয়ার সময় ক্লিনিকে ডাঃ টি এ চৌধুরি যখন বাচ্চাটি প্রসব করাচ্ছিলেন, ডাক্তার বলে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ভেতরে যেতে। বাচ্চাটির জন্ম আমার দেখা।ছোটদা নাম দিয়েছেন ঐন্দ্রিলা কামাল। ডাক নামটি আমি দিই, পরমা। পরমাকে লালন পালন করার জন্য গীতা চাকরি ছেড়েছে। ছোটদা আর গীতা দুজনই নতুন বাচ্চা নিয়ে খুশিতে লাফাচ্ছে। সুহৃদকে কাছে রাখার কোনও উৎসাহ নেই, দু বাচ্চাকে দেখাশোনা করার ঝামেলা গীতা নিতে পারবে না বলে ঢাকায় এনেও, কিছুদিন পরই সুহৃদকে যেখানে মানায়, সুহৃদের যাদের জন্য টান, তাদের কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার অলস অবসর কাটতে থাকে ছোটদার বাড়িতে। কখনও কখনও ঝুনু খালার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকি। ঝুনু খালার কাছে শুনি বরিশালি স্বামীটি নাকি বড়মামার কাছে মোটা অংকের টাকা ধার চেয়েছেন। অত টাকা বড় মামার নেই যে ধার দেবেন। ঝুনু খালাকে প্রায়ই নাকি বরিশালিটি বলছেন, *ফকিরের জাতরে বিয়া করে কি ঠকা ঠকেছি!* আমাকে সামনে পেলেই তিনি ঝুনু খালার বয়স বেশি, ঝুনু খালা ছলে বলে কৌশলে বিয়ে করেছেন তাঁকে, তাঁর আরও ভাল পাত্রী জুটতে পারত ইত্যাদি বলেন। ঝুনুখালার বাড়িতেও আমার ভাল লাগে না সময় কাটাতে। আমি ময়মনসিংহে ফিরি। ময়মনসিংহেও আর আগের মত ভাল লাগে না। অতিথি-মত লাগে অবকাশেও। রুদ্র ঢাকায় ফিরে এলেই আমি ও বাড়িতে যাই। রুদ্র সংসারের একজন হয়ে যায়, অতিথি আমি অতিথিই থাকি।

তাকে বলি, বারবার বলি, রাগ করে বলি, আদর করে বলি, বুঝিয়ে বলি, *চিংড়ির ব্যবসা ছেড়ে তুমি ঢাকায় থাকা শুরু কর, ঢাকায় কিছু কর।* কিন্তু ওই ব্যবসা ছেড়ে আসা সম্ভব হবে না তার। অনেক টাকা খাটিয়েছে, লেগে থাকতে হবে। রুদ্র লেগে থাকে ব্যবসায়, আমি লেগে থাকি রুদ্রে।

ফেব্রুয়ারি মাসটি রুদ্র যে করেই হোক ঢাকা থাকে। এ মাসে বই ছাপা, এ মাসে বইমেলা, এ মাসে মঞ্চে মঞ্চে কবিতা পাঠ। জানুয়ারির শেষ দিকে রুদ্র তার স্বৈরাচার নিপাত করতে নিজের হাতে অস্ত্র নেওয়ার তীব্র ইচ্ছে প্রকাশ করা কবিতাগুলো জড়ো করতে থাকে, বই ছাপবে। প্রকাশক খুঁজে লাভ হয়নি। নিজেই ছাপবে সে বই। আমাকেও বলে আমার কবিতা জড়ো করতে। গত কয়েক বছরের লেখা কবিতাগুলো খুঁজে খুঁজে আটত্রিশটি কবিতা জড়ো করি। কবিতাগুলো রুদ্রর কবিতার মতই বেশিরভাগ অন্যায় অত্যাচার বৈষম্যের বিরুদ্ধে, এবং অবশ্যই স্বৈরাচারের বিপক্ষে। দুটো পাণ্ডুলিপি নীলক্ষেতে শ্মশ্রুমণ্ডিত শ্রীমণ্ডিত কবি অসীম সাহার ছাপাখানা ইত্যাদি প্রিন্টার্সে দিয়ে আসি ছাপতে। প্রতিদিন বিকেলে দুজন ইত্যাদিতে গিয়ে প্রুফ দেখে আসি কবিতার। শাদামাটা প্রচ্ছদ তৈরি করে বই দুটো ছেপে বাঁধাই হয়ে বেরিয়ে আসে, রুদ্রর বইএর নাম *ছোবল,* আমারটির নাম *শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা।* এই প্রথম একটি কবিতার বই বের হল আমার। আনন্দধারা নিরবধি বইতে থাকে আমার ভুবনে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বইমেলা শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন দুজন মেলায় যাই। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে বইমেলার প্রবেশদ্বারে ভিড়ের মধ্যে মেয়েদের স্তন ও নিতম্ব মর্দন করার জন্য ওত পেতে থাকা থাবাগুলো থেকে বহু কষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে মেলায় ঢুকি। মঞ্চে মঞ্চে কবিতা পড়ে সারাদিন মেলার ঘাসে, খাবার দোকানে, একাডেমির সিঁড়িতে, বইয়ের স্টলে, কবি লেখকদের সঙ্গে লম্বা লম্বা আড্ডা দিয়ে আমাদের চমৎকার সময় কাটতে থাকে। আড্ডার মূল বিষয় সাহিত্য এবং রাজনীতি। বাংলা একাডেমির মঞ্চে তো বটেই ভাষা আন্দোলনের এই মাসটিতে বিভিন্ন মঞ্চে রুদ্রও কবিতা পড়ে, রুদ্রর সঙ্গে যেহেতু আছি আমি, যেহেতু আমার কবিতা লেখার অভ্যেস আছে, আমাকেও কবিতা পড়তে বলা হয়, পড়ি। মেলার বিভিন্ন স্টলে দুজনের বইগুলো বিক্রির জন্য দেওয়ার পর প্রতিদিনই খবর নিয়ে দেখি রুদ্রর বই বিক্রি হচ্ছে কিছু, আমার কিছুই নয়। মেলা শেষ হলে শিকড়ে বিপুল ক্ষুধার অবিক্রিত বইগুলো বাড়িতে ফেরত আনতে হয়। খাটের নিচে প্যাকেট বন্দি পড়ে থাকে বই। কবিতা যে আমার জন্য নয়, তা বেশ বুঝি। আমার যে এককালে কবিতা লেখার অভ্যেস ছিল, সেঁজুতি নামে পত্রিকা ছেপেছিলাম, সেসব এখন ইতিহাস, কবিতা লিখি না আর, কবিতা লেখা হয় না, পারি না--রুদ্রর বউ হিসেবেই আমি পরিচিত হয়ে উঠি সবখানে। কক্সবাজারে কবিতা পড়তে যাওয়ার আমন্ত্রণ জোটে রুদ্রর। বেশ কজন কবি রওনা হন কক্সবাজারে। রুদ্রর সঙ্গী হয়ে আমি। দুপুরে মহাদেব সাহা সমুদ্রে স্নান করতে নামেন লুঙ্গি পাঞ্জাবি আর কাঁধে গামছা নিয়ে। রুদ্র খালি গা। আমি ক্যাঙ্গারু গেঞ্জি আর জিনস। সূর্যাস্তের সময় সৈকতের বালুতে বসে কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানটি হয়। অনুরোধে ঢেকি গেলার মত কবিতা পড়তে হয় আমাকে ওখানেও।

আলাওল সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে মুহম্মদ নূরুল হুদাকে। কিছু তরুণ কবিকে আমন্ত্রণ জানানো হল। রুদ্রকেও। সে ফরিদপুরেও গেল আমাকে সঙ্গে নিয়ে। দল বেঁধে

গ্রামে গিয়ে কবি জসিমুদ্দিনের বাড়ি দেখে এলাম, *এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে, তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে*র বিখ্যাত ডালিম গাছটিও। রুদ্রর সঙ্গ এবং জীবনের এই প্রচণ্ড গতি ও ছন্দ আমাকে অপার আনন্দে ডুবিয়ে রাখে। জীবন তো আমার আর সাধারণ দশটি বাঙালি বধূর মত হতে পারত। তেল ডাল নুনের হিসেব করে সংসার কাটতে পারত। সমাজের কুসংস্কার আর বিধি নিষেধ অমান্য করেই তো আমরা এতদূর এসেছি। তবে আর অত বেশি সামাজিক হওয়ারই বা স্বপ্ন দেখা কেন! রুদ্রর সঙ্গে আলাদা করে একটি সংসার হল না বলে আমার মনের কোণে লুকিয়ে থাকা একটি আক্ষেপকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি। রুদ্র এখন নিজের সংসারটিকে চাইছে অন্য যে কোনও সংসার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জগত থেকে আলাদা হয়ে, মানুষ থেকে আলাদা হয়ে দুজনে স্বার্থপরের মত কোনও খাঁচা তৈরি করার নাম সংসার নয়। বাইরের মুক্ত জগতে আমরা বাস করব, একটি বৈষম্যহীন সুস্থ সুন্দর সমাজের জন্য আমরা লড়াই করে যাবো, এভাবেই আমরা যাপন করব বিশ্বাসে ও ভালবাসায় আমাদের যৌথ জীবন। পরস্পরের আমরা সহযাত্রী বা সহযোদ্ধা হব। ক্ষুদ্র স্বার্থের লেশমাত্র যেখানে থাকবে না। রুদ্রর ভাইবোনেরা মোংলা বন্দরের স্যাঁতসেঁতে সম্ভাবনাহীন পরিবেশ থেকে ঢাকায় এসে নিজেদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে এক একজন বিশাল ব্যক্তি হয়ে দেশ ও দেশের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করবে। ওদের আমরা আমাদের আদর্শে গড়ে তুলব।

ঢাকায় চন্দনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। স্বামী নিয়ে ও তার স্বামীর বোনের বাড়িতে ছিল ও। যতক্ষণ আমি ও বাড়িতে ছিলাম, চন্দনা আমার সঙ্গে কথা বলেছে গলা চেপে। স্বামীসহ একদিন এসেও ছিল আমাদের বাড়িতে, ইচ্ছে ছিল কোনও রেস্তোরাঁয় খেতে যাবো সবাই মিলে। কিন্তু স্বামী বলল তার সময় নেই। আমার সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছে থাকলেও স্বামীর কারণে চলে যেতে হয়েছে চন্দনাকে। চন্দনার জীবনটি দেখে আমার কষ্ট হয়েছে, এরকম একটি জীবনের স্বপ্ন কি ও দেখেছিল! না দেখলেও এ জীবনটিতেই ও এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। গলা চেপে কথা বলা কুণ্ঠিত জীবনে। চন্দনার, আমার ধারণা হয়, আকাশ দেখারও অবসর জোটে না হয়ত। অথবা দেখতে হলেও স্বামী বা স্বামীর কোনও আত্মীয়ের অনুমতি নিতে হয়।

ফেব্রুয়ারির উৎসব ফুরোলে রুদ্র আমাকে জিজ্ঞেস করে *এই সংসারে তোমার কনট্রিবিউশান কি?* শুনে আমি লজ্জায় বেগুনি রং ধারণ করি। প্রতি মাসে রুদ্র যেমন টাকা ঢালছে সংসারে, আমি কেন ঢালছি না! আমার এই না ঢালার কারণটি খুব সহজ, আমার হাতে কোনও টাকা পয়না নেই ঢালার, সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা করছি, চাকরিটি পেলেই, যেহেতু আমি নারী পুরুষে বৈষম্যহীন জীবনের পক্ষপাতি, আমি যে স্বামীর ওপর অর্থ নৈতিক নির্ভরতা চাই না সে আমি প্রমাণ করতে পারব তার ওপর সংসারের খরচ অর্ধেক যোগাড় করতে পারব। কিন্তু সরকারি চাকরি না হওয়াতক আমি কেন উপার্জন করার চেষ্টা করছি না, না করে নিজের শরীরটিকে একটি মেদবহুল মাংসপিণ্ড তৈরি করছি! রুদ্র বলে, যদিও আমার শরীরে মেদের ছিঁটেফোঁটা নেই বরং পিঠে পড়া লম্বা চুলগুলো গীতার প্রেরণায় ঘাড় অবদি কেটে ফেলে আরও হাড়সর্বস্ব লাগে দেখতে। রুদ্রর উৎসাহে সিদ্ধেশ্বরীতে তার বন্ধু সেলিমের ওষুধের দোকানের ভেতর ডাক্তারের চেম্বারটিকে রোগি দেখার জন্য আমার বসার ব্যবস্থা হয়। শান্তিনগর মোড়ে বি এন মেডিকেল হলে

ডাঃ তসলিমা নাসরিন,
এম বি বি এস, বিএইচ এস আপার,
রোগী দেখার সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা

লেখা একটি সাইনবোর্ডে ঝুলিয়ে দেয় সেলিম। ওখানে বিকেলে প্রজেশ কুমার রায় বসেন। ময়মনসিংহ মেডিকেল থেকেই পাশ করেছেন প্রজেশ, দাদার সহপাঠি ছিলেন ইশকুলে। প্রজেশ পিজি হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে সহকারি অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করেন, বিকেলে রোগী দেখতে বসেন বিএন মেডিকেল হলে। আমি প্রতিদিন হাতে স্টেথোসকোপ আর রক্তচাপ মাপার যন্ত্র নিয়ে ফার্মেসিটিতে যাই। বসে থাকি চুপচাপ। রোগী আসার নাম গন্ধ নেই। রুদ্রকে বলি, *ধুর রোগী আসে না, খামোকা বসে থাকা!* রুদ্র বলে, *উফ এমন বাচ্চাদের মত করো না তো! বসে থাকো, ধীরে ধীরে রোগী পাবে।* দিন যায়, দু একটি রোগী যা মেলে তাতে আমার রিক্সাভাড়ার অর্ধেকও ওঠে না। কোনও একটি ক্লিনিকে চাকরি খুঁজতে থাকি। পত্রিকার পাতা দেখে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো খুঁজতে খুঁজতে ইস্কাটনের একটি ক্লিনিকে চাকরি পেয়ে যাই। ডিউটি রাতে। মাসে দেড়হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ থেকে মাস মাস ভাতাও এই পেতাম। এ টাকায় সংসার চালানো সম্ভব নয় জানি। বাড়ি ভাড়াই বারোশো টাকা। কিন্তু তারপরও নিজে উপার্জন করার আনন্দই আলাদা। এ টাকায় নিজের হাত খরচ হবে, বাড়ির বাজার খরচাও হবে। ক্লিনিকে ঢোকার পর দেখি বাড়তি উপার্জনের ব্যবস্থাও এখানে আছে। আমি যদি অপারেশনে এসিস্ট করি, তবে পাঁচশ থেকে একহাজার টাকা পেতে পারি। যদি রোগীর মেন্সট্রুয়েশন রেগুলাশেন অর্থাৎ এবরশন করি, তবেও পাঁচশ টাকা পাবো। রাতে যদি রোগী আসে সে রোগী দেখা আমার দায়িত্ব। রোগি যে টাকা দেবে ক্লিনিকে, তার থেকেও পারসেনটেজ পাবো। বাহ! বেশ তো। চাকরিটি চমৎকার চলছিল। মালিক ভদ্রলোকটি বেশ আন্তরিক। তিনি আমাকে এবরশান এর কটি রোগী দিয়ে এ কাজে হাত পাকানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু রোগীর ভিড় নেই এমন এক রাতে, দশটার দিকে, মালিক আমাকে দোতলায় তার আপিসরুমে ডেকে পাঠান। খুব জরুরি হলেই সাধারণত মালিক ডেকে পাঠান। কি কারণ ডাকার? না কোনও কারণ নেই, তিনি গল্প করবেন। আমি বলি আমার নিচে যেতে হবে, কারণ যে কোনও সময় রোগি আসতে পারে। *আরে বাদ দেন, রোগী এলে নার্স আপনাকে ডাকবে, চিন্তা করবেন না।* চিন্তা আমি ও নিয়ে করি না, কারণ জানি রোগী এলেই নার্স আমাকে খবর পাঠাবেন। চিন্তা করি মালিকের উদ্দেশ্য নিয়ে। মালিক কি কারণে আমাকে ডেকেছেন এখানে, কোনও জরুরি কথা কি আছে? থাকলে তিনি জরুরি কথাটি না বলে আমাকে বসতে বললেন কেন! বসলে ইন্দিরা রোডের রাজাবাজারে ঠিক কোন গলিতে আমার বাড়ি, তিনি প্রায়ই ওদিকে যান বলে কোনও এক বিকেলে আমার বাড়িতেও যাবেন, বলেন কেন! একজন কবিকে কি কারণে বিয়ে করেছি, কবিকে বিয়ে করে মোটেও বুদ্ধির কাজ করিনি, বলেন কেন! স্বামীকে আমার পাশে একদমই মানায় না, স্বামী নিয়ে আমি আদৌ সুখে আছি কি না ইত্যাদিই বা কেন! আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাঁর এত ভাবনা কেন! আমি নিশ্চিত, এগুলো কোনও জরুরি কথা নয়। কথা বলতে বলতে যে মাঝে মাঝেই চুমুক দিচ্ছেন গেলাসে, না বললেও আমি বুঝি তিনি মদ্যপান করছেন। নিশ্চিন্তে বসে, মালিক যা চাইছেন, সুখ দুঃখের গল্প করা আমার হয় না। আমি তাঁর অবাধ্য হয়ে নিচে নেমে আসি। নিচে নেমে শাদা একটি কাগজে বড় বড় করে লিখি সজ্ঞানে স্বইচ্ছায় চাকরিতে ইস্তফা দিচ্ছি আমি।

ছিয়াশি সালের শেষদিকে ঘটনাটি ঘটে। দেড়মাস পর ফিরবে বলে রুদ্র মোংলায় চিংড়ির ব্যবসা দেখতে গেলে যেহেতু আমার কিছু করার নেই ঢাকায়, ময়মনসিংহে চলে যাই। ময়মনসিংহ থেকে দেড়মাস পর ফিরে দেখি রুদ্র ফেরেনি এখনও। কবে ফিরবে জানতে চাইলে মেরি বলে আরও দুসপ্তাহ দেরি হবে। রুদ্রহীন ঘরটিতে একলা বসে থাকি, ঘরটি খুব খালি খালি লাগে। টেবিলে কবিতার খাতা পড়ে আছে, যেন লিখছিল, এই মাত্র উঠে সে অন্য ঘরে গেছে, এক্ষুনি ফিরে আবার লিখবে কবিতা। আমি চোখ বুজে অন্য ঘর থেকে রুদ্রর ফেরার অপেক্ষা করি মনে মনে। মনে মনে তার একটি হাত রাখি আমার কাঁধে, শুনি একটি খুব চেনা কণ্ঠস্বর, *কখন এলে? সেই কবে থেকে অপেক্ষা করছি তোমার!* কাঁধের হাতটি ক্রমশ নেমে আসছে বুকে, আরেকটি কাঁধেও আরেকটি উষ্ণ হাত, সেই হাতটিও নেমে আসছে। গা শিথিল হয়ে আসছে আমার, আমার গালে তার দাড়ি-গাল ঘসতে ঘসতে বলছে, *সোনা আমার মানিক আমার, বউ আমার, তোকে ছাড়া আমি বাঁচি না রে!* আমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট জোড়া সিক্ত হতে চাইছে, ঠোঁটে তার দীর্ঘ দীর্ঘ উষ্ণ সিক্ত চুম্বন। অদ্ভূত এক শিহরণ আমার গা কাঁপাচ্ছে। মাথাটি এলিয়ে পড়ে টেবিলের খাতায়। অনেকক্ষণ ওভাবেই পাওয়ায় না পাওয়ায় চূর্ণ হই। খাতাটির শেষ পাতায় লিখি, *আমার ভাল লাগছে না, ভাল লাগছে না। কেন আসোনি তুমি। বউ ছেড়ে এত দীর্ঘদিন কি করে থাকো তুমি। বড় একা লাগে আমার। তুমিহীন একটি মুহূর্তও আমার কাছে অসহ্য। আমার আপন কেউ নেই এক তুমি ছাড়া। আমার জীবন কাটে না তুমি ছাড়া। হয় আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও, নয় তুমি আমার কাছে চলে এসো।* গোছানো বিছানাটির দিকে তাকিয়ে থাকি এক শরীর তৃষ্ণা নিয়ে। একটি বেদনার্ত হাত এগিয়ে যায় বিছানার চাদরে রুদ্রর ফেলে যাওয়া স্পর্শ পেতে, বুলোতে থাকে চাদর। ফেলে যাওয়া ঘ্রাণ পেতে বালিশে মুখ চেপে তার ছিঁটেফোঁটা শুঁকতে শুঁকতে বলি, *কবে আসবে তুমি, আমার আর ভাল লাগে না একা থাকতে। তুমি ফিরে এসো প্রাণ। আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার নিতিসুখ ফিরে এসো। আমার সর্বসুখ তুমি ফিরে এসো।* বালিশ ভিজে যায় শব্দহীন কান্নায়। সচকিত হই বাড়ির মানুষদের সম্ভাব্য কৌতূহলের কথা ভেবে, দুহাতে চোখ মুছে, মেরিকে ডেকে, *আমি না হয় দুসপ্তাহ পর ফিরব,* বলে দরজার দিকে এগোতে নিলে ও বলে, *এক্ষুনি যাচ্ছ বৌদি? বসো, চা খেয়ে যাও।* শুষ্ক-হাসি ঠোঁটে, বলি, *না চায়ের তৃষ্ণা নেই।*

রাজাবাজারের মোড় থেকে একটি রিক্সা নিয়ে মহাখালি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যেতে থাকি। রুদ্রহীন ঢাকা শহর আমার কাছে ধু ধু মরুর মত লাগে। মহাখালি থেকে হঠাৎ *ধুত্তরি* বলে রিক্সা ঘুরিয়ে নয়াপল্টনের দিকে যাই। ভাল লাগে না ময়মনসিংহ যেতে।

অবকাশে আমি অনাকাঙ্খিত অতিথি। মা প্রায়ই বলেন, *বাপ মার অমতে বিয়া করছস। খুব সুখে না থাকবি কইছিলি! এখন এত বাপের বাড়ি আসতে হয় কেন?* বাবার চোখের সামনে পড়লে কঠোর দৃষ্টি ছুঁড়ে দেন, মাকে ডেকে বলেন, *ওই ছেড়ি আমার বাসায় আইছে কেন? ওরে বাসা থেইকা ভাগাও। আমার বাসায় আসার ওর কি অধিকার আছে? আমি কি কামাই করি আরেক বেডার বউরে খাওয়ানির জন্য নাকি? ওরে খাওন দিবা না।* নয়াপল্টনে ছোটদার বাড়িতে উদাস বসে রুদ্রকে ভাবি, দিন রাত কি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে বেচারা। নিশ্চয়ই নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছে। নিশ্চয়ই বউটির কথা মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে আসতে চাইছে। পারছে না বলে নিশ্চয়ই তার কষ্ট হচ্ছে খুব। ইচ্ছে করে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিই আঁচলে। আমার এই মগ্নতায় টোকা দিয়ে গীতা বলে, *কি রে, কি ভাবস? তর জামাই কই? তারে লইয়া আইলি না কেন?*

আমার বুঝি একলা আসা মানা? সবসময় জামাই লইয়া আইতে হইব?

কি, রাগারাগি হইছে নাকি!

নাহ! রাগারাগি হইব কেন!

তাই তো মনে হইতাছে। জামাই আছে ঢাকায়?

নাহ।

গীতার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। টুলুর ঠোঁটেও হাসি। এ বাড়িতে গীতার ছোট ভাই টুলু থাকে। কালো-ছেলে মোটা-ছেলে, নাকের-নিচে-শুঁয়োপোকা-মোচ- ছেলে টুলুকে বাংলাদেশ বিমানে চাকরি দিয়ে ঢাকায় এনে ছোটদা নিজের বাড়িতে রাখছেন। বাঁকা হাসিটি নিয়েই টুলু হাঁক দেয় *এক গেলাস জল দে তো নার্গিস।* নার্গিস গেলাসে পানি নিয়ে টুলুর হাতে দেয়। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয় একটি মুহূর্ত। চোখ সরিয়ে নেয় ও। কেন সরালো চোখ ও! ওর চোখে কি একটি তিরতির ভয় কাঁপছিল। পরমার কাজকর্ম করার জন্য অবকাশ থেকে ওকে এনেছে গীতা, পরমার কাজ তো আছেই, বাড়ির আর সব কাজ একাই ও করছে। পরমাকে কোলে নিয়ে বসে ভাবছিলাম নিজের একটি সন্তানের কথা, কোনও একদিন সন্তানের মা হব আমি, রুদ্র নিশ্চয়ই তখন নিজের বাচ্চা রেখে এমন দূরে দূরে পড়ে থাকবে না। ভাবনাটি ছিন্ন করে নার্গিসের উসকোখুসকো চুল, আধোয়া ছেঁড়া মলিন জামা, শুকনো মুখ।

বিকেল ফুরোতে থাকে, খেয়ে ঘুমিয়ে আড়মোড়া ভেঙে পরমাকে আবার কোলে নিয়ে বসেছি সোফায়, নার্গিস বালতির পানিতে ত্যানা ডুবিয়ে জল চিপে ঘর মুছছে। এখনও সে গোসল করেনি, খায়নি। গীতা ভাত খেতে বললে তবে সে খাবে।

কি রে নার্গিস, আছস কেমন?

আপা, ময়মনসিং থেইকা আইছেন কবে? চাপা স্বরে নার্গিস জিজ্ঞেস করে।

আজকেই আইছি।

কবে যাইবেন?

জানিনা। তুই যাইবি ময়মনসিং?

হ।

নার্গিস চকিতে উঠে দাঁড়ায় উত্তেজনায়। গীতা ঘরে ঢুকতেই ও ত্রস্ত উবু হয় ত্যানায়।

কি হইতাছে? গীতা প্রশ্ন চোখে নার্গিসের দিকে তাকায়।

ও তো এখনও খায় নাই! ওর তো খাওয়া দরকার! মিনমিন করি। চেঁচায় গীতা, *সব কাজ শেষ হইলে পরে খাইব।*

আমি নরম স্বরে বলি, *ওর কি কোনও ভাল জামা টামা নাই নাকি? গোসল করে নাই কতদিন কে জানে!*

এ কথা শুনেই গীতা ওর উবু হওয়া শরীরে একটি লাথি কষিয়ে বলে, *বাথরুম মুইছা দেস নাই কেন?* ও গোসলখানার মেঝে মুছে এসেছিল, টুলু গিয়ে ভিজিয়েছে আবার। এ কথা নার্গিস বলে না, বলি আমি। আমার এই নাক গলানোয় সে নার্গিসের চুলের মুঠি ধরে উঠিয়ে খাবার ঘরের মেঝেয় ওকে ফেলে শক্ত শক্ত লাথি মারতে থাকে বুকে মুখে। ঘর থেকে হেলে দুলে বেরিয়ে এসে টুলু বলে, *দে এইডারে আরো দে, ছেড়িডা বড় শয়তান।* আমি দৌড়ে গিয়ে নার্গিসকে গীতার লাথির তল থেকে টেনে সরিয়ে নিই।

গীতা আমার কোল থেকে পরমাকে ছিনিয়ে নিয়ে চেঁচাতে থাকে, *আমার বাড়িতে থাকস, আমার খাস, আবার আমার নামে মানুষের কাছে বিচার দেস? কারও কি ক্ষমতা আছে আমার বিচার করার?*

নার্গিসের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলি, *ও আমার কাছে বিচার দেয় নাই। আমিই কইছি।*

যেই না বলেছি, পরমাকে টুলুর কোলে দিয়ে গীতা নার্গিসকে টেনে নিয়ে জানালার শিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চুলের মুঠি ধরে ওই শিকেই বার বার মাথা ঠোকাতে থাকে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই, চোয়াল শক্ত হয়ে আসে। ইচ্ছে করে এ বাড়ি থেকে এমুহূর্তে নার্গিসকে নিয়ে বেরিয়ে যাই, পারি না। ইচ্ছে করে ঠেলে সরিয়ে দিই গীতাকে, পারি না। এ বাড়ি আমার নয়, গীতার। তার আদেশ নির্দেশ মেনে চলতে হবে নার্গিসকে। জঘন্য দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে আমার আর ইচ্ছে করে না বাড়িটিতে দুদণ্ড থাকার। আমার সকল অক্ষমতা নিয়ে আমি বেরোই।

বাসে ময়মনসিংহ যেতে যেতে দেখি তিনটে ট্রাক রাস্তার কিনারে উল্টে পড়ে আছে। দুটো বাস খাদে। বাসদুটোর পাশে দশ বারোটি মৃতদেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। মনে হয় এ বাসটিও বুঝি খাদে পড়বে। এভাবে আমিও হয়ত আজ মরে পড়ে থাকব রাস্তার পাশে। কেউ জানবে না কি আমার নাম, কোথায় আমার বাড়ি। অজ্ঞাত পরিচয় মেয়েকে কোনও এক গণকবরে শুইয়ে দেওয়া হবে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কেউ জানে না আমি আজ বাসে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে যাচ্ছি। ঢাকা-ময়মনসিংহ বাসের দুর্ঘটনার খবর তারা জানলেও কেউ জানবে না দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যু হয়েছে। ভাবতে ভাবতে হাত ব্যাগ থেকে ছোট একটি কাগজ বের করে নিজের নাম ঠিকানা লিখে কাগজটি ব্যাগে ভরে, নতুন একটি ভাবনার শিকার হই, কি লাভ মৃতদেহের সৎকারে! মরে গেলে কি আর আমি বুঝবো আমার সৎকার মহা আড়ম্বরে করে হচ্ছে কি হচ্ছে না! হলেই বা আমার কি লাভ! গ্রামে পড়ে থাকা আমার লাশটি যদি শেয়াল শকুনে খায়, অথবা যদি সিল্কের কাফনের কাপড়ে আর আতর লোবানের ঘ্রাণে মুড়ে আমাকে ভাল একটি কবরে রাখা হয়, যদি শ্বেত পাথরে বাঁধিয়ে দেওয়া হয় কবর--কি পার্থক্য দুটিতে! মৃত্যুর পর আমার তো বোঝার শক্তি থাকবে না আমাকে কেউ ভালবাসছে কি বাসছে না। তখন যত্ন আত্তি পেলেই কি না পেলেই কি! মা বলেন, কবরে রেখে আসার ঠিক চারদিন পরই নাকি মানুষ ভুলে যায়, যত বড় স্বজন বা বন্ধু হোক সে। ভাবনাটি পাশে বসে থাকে, আমি ব্যাগ থেকে কাগজটি নিয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিই জানালার ওপাশের হাওয়ায়। সন্ধের অন্ধকারের ছেঁড়া কাগজের টুকরো গুলো হারিয়ে যেতে থাকে।

অবকাশ সেই আগের মত আছে। বেঁচে আছে। মা সুহৃদকে পরম আদরে মানুষ

করছেন। নিজের রক্ত-যাওয়া-অসুখটির কোনও চিকিৎসা নেই জানার পর তিনি আর অভিযোগও করেন না এ নিয়ে। এমএড পাশ করার পর বাবার আদেশে শহরের ভাল ইশকুলগুলোয় শিক্ষিকা হওয়ার আবেদন জানিয়ে দরখাস্ত করেছে হাসিনা। মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েটে তৃতীয় বিভাগে পাশ করা হাসিনার পক্ষে বিএড এমএড ডিগ্রি নিয়েও চাকরি জোটেনা ভাল। কিন্তু বাবা লেগে থাকেন নতুন নতুন ইশকুলের খোঁজ করতে। *স্বজন* খুঁজতে থাকেন *প্রীতি* পেতে। ইয়াসমিনের উদ্ভিদবিদ্যায় মন নেই। মন প্রাণীবিদ্যায়। কলেজের নানারকম বান্ধবী-প্রাণী নিয়ে তার সময় কাটে। দাদা আরোগ্য বিতানে ওষুধব্যবসায় যতটুকু মন দেন, তার চেয়ে বেশি দেন চিঠি লেখায়। প্রতি সপ্তাহে বত্রিশ পৃষ্ঠা লম্বা চিঠি লেখেন শীলাকে। প্রেমের চিঠি। ঘরে ফিরে তিনি মুমু মুমু বলে কাছে ডাকেন হাসিনাকে। তার সদারাগ মুখে হাসি ফোটাতে প্রায়ই সোনার গয়না আর দামি শাড়ি কিনে আনেন। হাসিনার মুখে হাসি ফোটানো দুরূহ কাজ।

আমার নাম হাসিনা সস্তা আমার হাসি না প্রতিদিনই বস্তা বস্তা অভিযোগ নিয়ে বসে দাদার সামনে। দাদা দুপুরে ফেরার পর বলে সে, মাকে নাকি সে বলেছিল আলু দিয়ে মুরগির মাংস রাঁধতে, মা পটল দিয়ে রেঁধেছেন। তার যেভাবে ইচ্ছে করে সেভাবে যদি তার খাওয়া দাওয়া না হয়, তবে তার আর স্বামীর সংসার করার ইচ্ছে নেই। এ কথা শুনেই দাদা দৌড়ে ঘরবার হয়ে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাড়ির সবাইকে শুনিয়ে লিলির মাকে ডেকে বলেন, *রাত্রে যদি আলু দিয়া মুরগির মাংস না রান্ধো তাইলে পিটাইয়া তোমার লাশ ফালাইয়া দিয়াম।*

মা শুনে ঘর থেকে বের হয়ে চিল্লিয়ে বলেন, *লিলির মারে কস কেন? আমারে ক। আমি পটল দিয়া মাংস রানছি। রাইন্ধা যে অন্যায় করছি তার শাস্তি দে আমারে। পিটাইয়া লাশ ফালাইয়া রাখ। এইটাই ত বাকি আছে করার।* মার কথার উত্তর না দিয়ে লিলির মার মুখে থাপড় দিয়ে দাদা গলা ছাড়েন, *মুমু যেইভাবে কইব, ঠিক সেইভাবে চলবা। উল্টা পাল্টা কর তো মরবা।* লিলির মা ফুঁপিয়ে বলতে থাকে, *আপনেরা নিজেগোর মধ্যে গোস্বা করেন। আর রাগ ঢালেন আমার উপরে। আমি এই বাড়িত আর কাম করতাম না।* লিলির মার ঘাড় ধরে বেলগাছের দিকে ধাক্কা দিয়ে দাদা বলেন, *যাও গা, এক্ষুনি বাইর হও বাড়ি থেইকা।* লিলির মাকে বাধা দেন মা, বলেন, *সুহৃদের দাদা আসুক, তারে সব কইয়া পরে তুমি বাড়ি থেইকা যাইবা।* মা দাদার উদ্দেশ্যে গলা নামিয়ে বলেন, *আমি যে মা, লেখাপড়া না জানলেও, আইএ বিএ না পাশ করলেও আমি তো তর মা। আমারে ত একটুও মায়ের সম্মান দেস না!* দাদা উঠোন থেকে টিনের ঘরটির বারান্দায় উঠেছেন মাত্র, ভেতর থেকে হাসিনা বলে, *কইতে পারো না, সম্মান আশা করে কেন! আপন দেওরের সাথে লীলা কইরা আবার ছেলের সামনে সম্মান আশা করে!* দাদা সায় দেন হাসিনার কথায়, *উচিত কথা শুনাইয়া দেওয়া দরকার ছিল।* বাবা ফিরলে মা আদ্যোপান্ত বলেন ঘটনা। এও বলেন, *হাসিনা মনে করতাছে আমার ছেড়ারে সে নিজে বিয়াইয়া লইছে।* বাবা দাদাকে ডাকেন, হাসিনাকে ডাকেন। বৈঠকঘরে বসে নিচু গলায় কথা বলেন দুজনের সঙ্গে। মা অন্য ঘরে অপেক্ষা করেন এই আশায় যে বাবা এবার একটি আইন করে দেবেন বাড়িতে যেন মার সঙ্গে রয়ে সয়ে কথা বলে পুত্রবধূ। পুত্রবধূ আজ যদি শাশুড়িকে অসম্মান করে, কাল শ্বশুরকেও করবে। কিন্তু শলা পরামর্শ বিচার যা হয়, তা হল এখন থেকে হাসিনার দায়িত্বে সংসার চলবে। অনেকদিন পর হাসিনার সদারাগ মুখটিকে এক চিলতে হাসি খেলে।

হাসিনার হাতে সংসারের ক্ষমতা যেদিন চলে গেল, ছোটদা ময়মনসিংহে আসেন। সংসারের হস্তান্তর দেখে মাকে বলেন, *ঠিকই হইছে মা, আপনে এখন আর সংসারের ঝামেলায় যাইবেন কেন? বৌদিই সব সামলাক।* কিন্তু ছোটদা একা কেন*? বউরে কি তার বাপের বাড়িত রাইখ্যা আইছ না কি?* না বউ আনেননি ছোটদা। একা এসেছেন। সুহৃদকে দেখতে এসেছেন। সুহৃদকে দেখা যদি মূল উদ্দেশ্য হত, তবে তিনি ছেলের সঙ্গে মাত্র দুমিনিট কাটিয়ে *কি রে বেড়াইতে যাইবি নাকি চল* বলে আমাকে নিয়ে বেরোতে চান? কই যাইবা? চল চল। তরে একটা নতুন জায়গায় নিয়া যাই। নতুন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে ঘুড়ির মত ওড়ে। ছোটদা দিন দিন সুদর্শন হচ্ছেন। শরীরে কোনও মেদ নেই। লম্বা ছিপছিপে। দেখে মনে হয় বয়স কমছে তার। ছোটদাকে এমনই বালক বালক লাগে দেখতে যে যখন তিনি আমাকে ক্যান্টনমেন্টের এক আর্মি অফিসারের বাড়িতে নিয়ে গেলেন সন্ধেয়, অফিসারের সুন্দরী কচি বউটি বলল, *কি কামাল, উনি কি তোমার বড় বোন নাকি?* ছোটদা বাড়িটিতে বেশ স্বচ্ছন্দে পায়চারি করতে করতে বললেন, *কি যে বল, ও আমার আট বছরের ছোট।* ছোটদা গীতার সঙ্গে যে সুরে আর ঢংয়ে কথা বলেন, নীনার সঙ্গেও একইরকম করে বলেন। নীনার চিবুক তুলে ধরে বলেন, *বাহ দারুণ লাগতাছে তো!* আমার নিজের চোখ কান কিছুকে বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হয় না যে আমার সামনের মানুষটি স্ত্রৈণ হিসেবে নাম কামিয়েছেন। *চা টা কিছু খাবা?* নীনা জিজ্ঞেস করে। ছোটদা বলে ওঠেন, *না না কিছু খাব না। তোমারে দেখতে আসলাম সুন্দরী। দেইখা মন জুড়াইল। এখন যাই।* ছোটদার ঠোঁটে অবিকল একই হাসি গীতার সঙ্গে প্রেম করার সময় যে হাসিটি তাঁর ঠোঁটে শোভা পেত। নীনা না না করে ওঠে, *কি বল, বোনরে নিয়া আসছ কিছু খাও।* রান্নাঘরের দিকে যেতে নিলে ছোটদা হাত ধরে টেনে নিয়ে আসেন নীনাকে, প্রায় বুকের কাছে লেপ্টে থাকে ছোটদার সুন্দরীটি। *যাও কই? কিচ্ছু খাবো না, কখন তোমার জামাই আইসা পড়ব, আজকে যাইগা, আরেকদিন আসব নে।* বলে সুন্দরীর গালে আঙুলের আলতো আদর রেখে ছোটদা বেরোন। জিজ্ঞেস করি ছোটদাকে, *কে এই মেয়ে?*

গায়িকা পিলু মমতাজের ছোট বোন।

তা তোমার সাথে পরিচয় কেমনে?

ফ্লাইটে পরিচয়। প্রায়ই বিদেশ যায়।

ও।

মেয়েটা খুব ভাল। আমাকে কিছু গাহেক দিছে। ধান্দার জিনিস বেচি।

বিমানের ক্রুরা দেশে বিক্রি করার জন্য বিদেশ থেকে কিনে আনা তাদের জিনিসপত্রকে বলে *ধান্দার জিনিস।* ওগুলো নিজের ব্যবহারের বলে কাস্টম পার করে লাভে বিক্রি করেন মানুষের কাছে। নির্দিষ্ট কিছু লোক কেনে। *এগুলা কর কেন?* ছোটদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। *আরে ধান্দাই ত আসল। ধান্দাতেই তো পয়সা। বেতন আর কত পাই!* ছোটদা ঠোঁট ওল্টান।

শোন, গীতার কাছে কিন্তু কোনওদিন কইস না এই মেয়ের কথা।

কেন, কি হইব কইলে?

উপায় নাই। আমি কোনও মেয়ের সাথে কথা কইলে গীতা কোনওদিন সহ্য করে নাই। সর্বনাশ হইয়া যাবে জানলে।

ছোটদা সে দিনই চলে যান ঢাকায়। তাঁর ময়মনসিংহে আসার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল গীতাদের পিয়নপাড়ার বাড়িতে টাকা দিয়ে যাওয়া। ওখানে ভাঙা টিনের ঘর ভেঙে দিয়ে এখন দালান তোলা হচ্ছে।

বাবা আগের মত প্রতাপ নিয়েই আছেন। বড়দাদা মারা যাওয়ার পর বড়দাদার নামে যত জমি বাবা কিনেছিলেন, নিজের এবং ভাইদের নামে সমান ভাগ করে দেবেন উদ্দেশ্য নিয়ে যখন গ্রামে গিয়েছেন, তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা রিয়াজউদ্দিন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিরাজউদ্দিনকে সঙ্গী করে বাবার মাথা মুলি বাঁশের আঘাতে ধরাতলে ফেলে ফের যদি গ্রামমুখো হন তবে জীবন নিয়ে আর ফিরতে হবে না হুমকি দিয়ে শহরের আপদকে শহরে বিদেয় করেন। বাবা বাড়ি ফিরে সাতদিন যত না শরীরের তার চেয়ে বেশি মনের অসুখে ভুগতে থাকেন। *সারা জীবন আমি এ কি করলাম হায় হায়* করেন, মা পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন, *ওদের ভালর জন্যই তো করছেন, এখন আর পস্তাইয়া কি হইব!* শরীর সারে বাবার, মনের হাহারবও দূর হয়। জমির নেশা ধাঁ করে ছুটে এসে আবার তাঁকে কামড়ে ধরে। নানির বাড়ির পাশে কড়ইতলা, তার সামনে বিশাল খোলা মাঠ, ছোটবেলায় যে মাঠে আমরা গোল্লাছুট ডাংগুলি চোর চোর ক্রিকেট ইত্যাদি রাজ্যির খেলা খেলতাম, যে পুকুরে পা ডুবিয়ে বসে থাকতাম, বস্তির মেয়েরা গোসল করত কাপড় ধুতো, মাঠের কিনারে বেড়ার যত ঘর ছিল সব কিনে নিয়ে ভেঙে চুরে বুজে সাফ করে পঁচিশটি বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়েছেন বাবা। দেয়াল তুলে দিয়েছেন *রজব আলী কলোনির* চারদিকে। দেয়াল তুলতে গিয়ে নানির বাড়ি থেকে বেরোবার রাস্তা গেছে বন্ধ হয়ে। নানি অনুযোগ করেন। *কি গো নোমানের বাপ, রাস্তা যে বন্ধ কইরা দিলাইন!* বাবা নানিকে কৈফিয়ত দেন না। কেবল আকুয়ায় জমি কিনে তাঁর আশ মেটে না। অবকাশের দেয়াল ঘেঁষা বাড়ির মালিক প্রফুল্ল ভট্টাচার্য মরে যাওয়ার পর যেদিন টুপ করে তাঁর বউটিও মরে গেলেন, একটিই মেয়ে বোম্বে থাকে, সে মেয়ে মায়ের সৎকার করতে আসেনি, ঘর বাড়ি জিনিসপত্র জায়গাজমির দায়িত্ব নিতেও না, বাবা তক্কে তক্কে রইলেন প্রফুল্লর জমিটি সস্তায় কারও কাছ থেকে কিনতে পারেন কি না। বাবার *তক্কে তক্কের মাথায় চাটি মেরে* একদিন পরিমল সাহা প্রফুল্লর বাড়িতে বাস শুরু করলেন। প্রফুল্লর উত্তরাধিকারি জমি নিতে আসেনি, অনাত্মীয় প্রতিবেশি পরিমল সাহা প্রফুল্লর জায়গা দখল করে নিয়ে, বাবার *বাউন্ডারি ওয়ালের* গায়ে গা লাগিয়ে নতুন ঘর তোলার স্পর্ধা দেখিয়েছে। কেন তুলবে ঘর, বাবা পরিমলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিলেন। মা বলেন, *এ তো আর এমন না যে আপনের জায়গার উপরে ঘর তুলছে, আপনের কোনও ক্ষতি করছে! খামাকা মানুষের বিরুদ্ধে লাগেন কেন!* বাবার কটমট করে তাকানো চোখের দিকে তিক্ততা ছুঁড়ে দেন,*ছোটলোকের পয়সা হইলে মানুষরে আর মানুষ জ্ঞান করে না।* মা ঠিক বলেননি, বাবা কিন্তু কিছু মানুষকে নিজের ভাইয়ের ছেলেদের লেখাপড়া করিয়ে মানুষ করেছেন। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে জামাইদের চাকরি যোগাড় করে দিয়েছেন। আমানউদদৌলা গফরগাঁওএ চাকরি করতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন, গফরগাঁও থেকে নেত্রকোনা বদলি হয়ে ওখানেও আরেকটি বিয়ে করেছেন। ভাইদের একাধিক বিয়েতে বাবার কোনও আপত্তি নেই। নেত্রকোনা থেকে ময়মনসিংহে এলে চেম্বারে গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন আমানউদদৌলা, চাকরি বাকরি কেমন চলছে, টাকা পয়সা কেমন রোজগার হচ্ছে এসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন বাবা, কখনও তাঁর বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করেন না। আমানউদদৌলার ছেলেমেয়েদের তিনি লেখাপড়া করার সমস্ত খরচ দিচ্ছেন। প্রতি মাসেই আমানউদদৌলার বড় বউ এসে ছেলেমেয়ের ইশকুল কলেজের বেতন, মাস্টারদের বেতন, বই খাতা কেনার টাকা, বাড়িভাড়া এমনকি খাওয়ার দাওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা নিয়ে যান বাবার কাছ থেকে। বংশ প্রতিপালনে বাবার কোনও না

নেই। হাসিনাকে বিএডএমএড পাশ করিয়ে ইশকুলের শিক্ষিকা বানানোর জন্য বাবার অতি-আবেগ দেখে মা একদিন বলেছিলেন, *ছেলের বউএর লাইগা এত যে করতাছেন, ইয়াসমিনের কলেজে যাওয়ার রিক্সাভাড়াডাও তো ঠিক মত দেন না! মানুষ তো নিজের মেয়ের জন্য করে, মেয়ে বাদ দিয়া ছেলের বউরে লইয়া পড়ছেন কেন?*
বাবা ধমকে থামান মাকে, *ছেলের বউ লেহাপড়া শিইখা নাম করলে কার লাভ? ইশকুল কলেজের মাস্টার হইলে কার লাভ? মাইনষে কি কইব হাসিনা মমতাজ অমুক ইশকুল বা অমুক কলেজে মাস্টারি করে? কইব ডাক্তার রজব আলীর ছেলের বউ মাস্টারি করে। ছেলের বউ আইছে আমার বংশে, মেয়ে ত যাইব গা পরের বংশে।* মার গলায় ধিক্কারের সুর ওঠে, *বংশ বংশ বংশ। বংশ ধুইয়া পানি খাইবাইন? আপনের মেয়ের আপনের প্রতি যে দরদ, সেই দরদ কি ছেলের বউএর কাছ থেইকা পাইবাইন? নিজের নামের কথা এত ভাবেন, নিজের বউরে যে কিছু দেন না, এই সব যদি মানুষে জানে, আপনের নাম কই যাইব?*
মার *প্যাঁচাল* শোনার জন্য বাবা অপেক্ষা করেন না। তিনি চেম্বারে চলে যান রোগী দেখতে। তাঁর অনেক রোগী। আলাদা চেম্বার করার পর থেকে কিছু কিছু বাঁধা মেয়ে-রোগী নিয়ে চেম্বারের দরজা বন্ধ করতে শুরু করেছেন। মা একদিন বাবার পছন্দের গাজরের হালুয়া বানিয়ে বাটিতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন চেম্বারে, বাবা যেন রোগি দেখার ফাঁকে হালুয়াটুকু খান। চেম্বারের বন্ধ দরজায় টোকা দিয়েছেন অনেকক্ষণ। টোকার পর টোকা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাবা যখন টোকার জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে দরজা খুলেছেন, প্যান্টের বোতামও তখনও খোলাই ছিল তাঁর, লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। *ওয়াক থু* বলে বেরিয়ে এসেছেন মা। মার *ওয়াক থুতে* বাবার কিছু যায় আসে না। তিনি বাজার না পাঠালে বাড়িতে সবাইকে উপোস থাকতে হবে, তিনি বাড়ি থেকে বের করে দিলে সবাইকে রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে। তাঁর শক্তির কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মা প্রায়ই বলেন, *মেট্রিকটা পাশ করলে একটা চাকরি করতে পারতাম। চাকরি করলে কবেই যে পারতাম এই বাড়ি থেইকা চইলা যাইতে!* কোনও একটি চাকরি করতে পারলেই মা ভাবেন, মার আর পরোয়া করতে হতো না বাবাকে।

মা জ্বরে সাধারণত কাতর হন না, জ্বর নিয়েই সংসার ধর্ম পালন করেন, কিন্তু জ্বর মাকে একদিন এমনই কাবু করল তিনি বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারালেন। মার জন্য ভাল কোম্পানির *এমক্সিসিলিন* পাঠাতে বলেছি দাদাকে। এখন বাড়ির কারও *ছোটখাট অসুখ বিসুখে* আমিই চিকিৎসা করার উদ্যোগ নিই। আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি বলে দাদা তিনদিন পর দশটি ক্যাপসুল এনে মাকে দেন খেতে। মা ঘড়ি দেখে আট ঘন্টা পর পর ওষুধ খাচ্ছেন। সাতদিন পরও জ্বর সারছে না মার, জ্বর নিয়ে উদাস তাকিয়েছিলেন জানালায়। কপালে হাত দিয়ে দেখি গা পুড়ে যাচ্ছে। কপালে রাখা আমার হাতটি নিজের হাতে নিয়ে মা বললেন, *কাছে বসো মা, তোমারে একটা গোপন কথা বলি।* মা কখনও কোনও গোপন কথা বলার জন্য এত কোমল কণ্ঠে আমাকে পাশে বসতে বলেন না। গোপন কথা তো মার আছেই একটি, বাবার সঙ্গে রাজিয়া বেগমের সম্পর্ক সত্যিকার কি, তা নতুন করে আবিষ্কার করে শোনানো। গোপন কথা শোনার জন্য আমার ভেতরে কোনও কৌতূহলের অঙ্কুরোদগম হয় না। নিস্পৃহ দৃষ্টিটি ঘুরতে থাকে মার মুখে, বালিশে, চাদরে, জানালায়, রঙিন কাচে। মা খুব ধীরে ধীরে বলেন, *তোমার বাবার অত্যাচারে একদিন ভাবলাম আমি যাইগা এই বাড়ি থেইকা। সত্যিই সত্যিই ভাবলাম। কিন্তু কই যাই, কার কাছে যাই! যাই কইলেই তো যাওয়া যায় না। এই যে মাঝে মাঝে রাগ কইরা*

কই জঙ্গলে চইলা যাবো, জঙ্গলে কি আর সত্যি সত্যি চইলা যাওয়া যায়! যায় না। মা থামেন, জানালার ওপারে বুকে মেঘ জমা আকাশটির নীল নীল কষ্টের দিকে তাকিয়ে বলেন, *ছোটবেলায় আমার এক মাস্টার ছিল, বাসায় আইসা আরবি পড়াইত। মাস্টারটা আমারে খুব পছন্দ করত। কয়েক বছর আগে তার খোঁজ নিছিলাম কই আছে সে, কি অবস্থা। শুনলাম সে বিয়া করছিল, বউটা মইরা গেছে। সেই মাস্টাররে একটা চিঠি লিখলাম একদিন। সোজাসুজিই জিগাস করলাম , আমাকে বিয়া করতে সে রাজি আছে কি না। খুব উৎসাহ নিয়া সে আসল আমার সাথে দেখা করতে। পার্কে গিয়া দেখা করলাম। জানে যে আমার বিয়া হইছে এক ডাক্তারের সাথে। ডাক্তারের বিরাট নাম। বড় বাড়ি। আমারে প্রথম কথা জিগাইল, তোমার জমি জমা কিরম আছে? জমিজমা? আমি ত অবাক। জমির কথা জিগাস করে কেন? আমি যা সত্য তাই কইলাম। কইলাম আমার কোনো জমিজমা নাই, টাকা পয়সা নাই। শুইনা সে আর উৎসাহ দেখাইল না।*

তার মানে তোমার জমিজমা থাকলে তোমারে বিয়া করত!

হ।

তুমি মুন্সি বেডারে বিয়া করতে চাইছিলা? নাক সিঁটকে বলি।

তোমার বাপের শয়তানি আর দেখতে ইচ্ছা করে না। তাই রাগ কইরা ওই লোকরে ডাকছিলাম। তোমার বাপরে দেখাইয়া দিতে চাইছিলাম, আমিও চইলা যাইতে পারি। পারলাম না।

তুমি গেলে গা আমাদের কি হইব চিন্তা করছ?

তোমাদের কথা ভাইবাই ত কোথাও যাওয়ার চিন্তা কইরাও পারি না। তোমরা বড় হইয়া গেছ। তারপরও যাইতে পারি না। তোমরা ঘর সংসার করবা, ছেলেমেয়ে হবে। মা গেছে গা আরেক বেডার সাথে এইডা তো ছেলেমেয়ের জন্য কলঙ্ক। বাপে সাত বেডি নিয়া থাকলেও কোনও কলঙ্ক হয় না।

মার মলিন মুখটির দিকে তাকিয়ে থাকি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বলেন, *আত্মহত্যা করলে গুনাহ হয় বইলা আইজও করি নাই। গুনাহ না হইলে কবেই করতাম!*

মার মলিন মুখ থেকে চোখ সরিয়ে দিশি এমক্সিসিলিনের মলিন স্ট্রিপটি নাড়তে নাড়তে চোখ চলে যায় ওষুধের নামে, ওষুধ তৈরির তারিখে, ওষুধ বাতিল হওয়ার তারিখে। বাতিলের তারিখ তিন বছর সাত মাস আগের। দাদা কি ইচ্ছে করেই মাকে এই বাতিল ওষুধ দিয়েছেন? আমার বিশ্বাস হয় না ইচ্ছে করে দিয়েছেন। মাকে বলি না যে এই ওষুধ ওষুধ হিসেবে অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে, এ দিয়ে জ্বর সারবে না। মাকে বলি না কিন্তু দাদাকে গিয়ে বলি, *ডেট এক্সপায়ারড হইয়া গেছে ওষুধের!* ভেবেছিলাম তিনি বলবেন যে তিনি দেখেননি বাতিলের তারিখ, এক্ষুনি তারিখ পার হয়নি এমন ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর নির্লিপ্ত মুখ এবং সে মুখে *এক্সপাইরি ডেট পার হইলে কিচ্ছু হয় না, ওষুধ ঠিক আছে,* বাক্যটি শুনে আমি অনেকক্ষণ বাকশূন্য দাঁড়িয়ে থাকি। একটি হু হু হাওয়া এসে আমার ওপর আছড়ে পড়ে। আকাশের নীল নীল কষ্টগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরে আমাকে ভেজাতে থাকে, ভাবি, ভেজা গা মুছে মার বালিশের পাশ থেকে নষ্ট ওষুধটি নিয়ে গোপনে ফেলে দেব, নতুন ওষুধ কিনে মার বালিশের কাছে ঠিক আগের ওষুধের মতই গোপনে রেখে দেব। মা সুস্থ হয়ে উঠবেন, কোনওদিন জানবেন না তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাঁকে ঠকাতে চেয়েছিলেন। মার জীবনটির কথা ভাবার অবসর আমার কখনও হয়নি। ভাল ছাত্রী হওয়ার পরও মাকে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে মার যখন দশ কি এগারো বছর বয়স। স্বামী সেই বিয়ের পর থেকে অন্য মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্ক

করে যাচ্ছেন। চারটে ছেলেমেয়ের ওপর ভরসা করে সংসারের ঘানি টেনে গেছেন মা। দুটো ছেলে বিয়ে করে পর হয়ে গেছে। নিজের নাতিকে লালন পালন করছেন, এর বিনিময়ে বছরে দুটো শাড়ি পান। বাচ্চা রাখার জন্য দাসি নিযুক্ত করা হলেও শাড়ি দেওয়া হয়। মা কোনও ব্যতিক্রম নন। মার আসলে অভাবে থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। কোনও শাড়ি গয়নার প্রয়োজন নেই মার। কোনও তেল সাবানের প্রয়োজন নেই। ডিম দুধ কলারও প্রয়োজন নেই। মার প্রয়োজন সামান্য একটু ভালবাসা। সেটি পেতে চাতক পাখির মত বসে থাকেন। মার চোখের জলে লকলক করে বড় হচ্ছে একটি পদ্মফুল। দিন একদিন নিশ্চয়ই আসবে, কোনও মেয়ে মহিলা যেদিন আর ভিড়বে না, তখন নিশ্চয়ই স্থির হবেন বাবা। ষাট সত্তর পার হলে, আশি, নব্বই বছরে এসে হয়ত তিনি মার দিকে ফিরবেন। *কিন্তু মা,* মনে মনে বলি, *জীবন ফুরিয়ে গেলে ভালবাসার মানুষকে নিজের করে পেয়ে কি লাভ? ও কি আর ভালবেসে ফেরা! ও নিতান্তই সব হারিয়ে সব ফুরিয়ে কেবল বাকল টুকু নিয়ে আর কিছু করার নেই বলে ফেরা।*

মাকে বলি নার্গিসের ওপর গীতার অকথ্য নির্যাতনের কাহিনীটি। শুনে কোনও মন্তব্য করেন না তিনি। মার নৈঃশব্দ আমাকে ধীরে ধীরে মার পাশ থেকে উঠিয়ে অন্য ঘরে নিতে থাকে। পেছন থেকে তিনি বলেন, *কামাল কি একলা আইছিল সেদিন? নাকি গীতারে ওর বাপের বাড়িত রাইখা সুহৃদরে দেখতে আইছিল?*

জানি না। খেয়ালি উত্তর আমার।

নার্গিসরে বাসায় একলা রাইখা আসা উচিত হয় নাই।

মন্তব্যটি আমাকে থামায়। কেন উচিত হয়নি জিজ্ঞেস করি। মা বলেন, *টুলুটা ভাল না। আমি সুহৃদরে নিয়া কয়দিন ছিলাম না কামালের বাসায়? টুলু ত রাইতে গিয়া নার্গিসরে ধরছিল। গীতারে অনেক কইছি নার্গিসরে আমার সাথে দিয়া দেও। দিল না।*

মার এ কথা শোনার পর আমি বেরিয়ে একটি রিক্সা নিয়ে কৃষ্টপুর নার্গিসদের বাড়ি গিয়ে তার মাকে বলি যেন ঢাকা থেকে তার মেয়েকে নিয়ে আসে, দেরি না করে। সে তার মেয়েকে নিয়ে আসতে প্রস্তুত কিন্তু *গাড়িভাড়া* নেই। কোনওদিন ঢাকায় যায়নি না নার্গিসের বাবা, না মা। কথা দিই কাল আমি টাকা নিয়ে আসব। টাকা হলে বাসে চড়ে বা ট্রেনে চড়ে যেন চলে যায়, দেরি না করে। ঠিকানা লিখে দেব। ঢাকায় নেমে কোনও রিক্সাঅলাকে বললে একেবারে নয়াপল্টনে বাড়ির সামনে থামাবে। ফেরার পথে *চোখে ভাসাতে* থাকি টাকা যোগাড় করার উপায় কি কি আছে সামনে। ভাবনার জালে ঢিল ছোঁড়ে চড়পাড়া মোড়ের একটি জটলা। জটলার মুখগুলো চেনা। শেষ বর্ষে আটকে থাকা সাত আটজন পুরোনো সহপাঠী দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন মুখ সবার। রিক্সা থামিয়ে *কি হয়েছে, র‍্যাগডের উৎসব মনে হচ্ছে!* বলতেই রতিশ দেবনাথ বলল, *রিজওয়ান মারা গেছে।*

আমাদের রিজওয়ান?

হ্যাঁ আমাদের রিজওয়ান।

মারা গেছে মানে?

পেথিডিন নিত। বেশি নেশা করতে গিয়া মাসল রিলাক্সেন্ট নিছিল। চরপাড়া হোটেলের একটা রুম ভাড়া নিয়া থাকত। সকালে হোটেলের মালিক দরজা ভাইঙ্গা ঘরে ঢুইখা দেখে এই অবস্থা। সিরিঞ্জ আর এম্পটি ভায়াল পইরা রইছে। বোঝে নাই যে আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশান না থাকলে মাসল প্যারালাইসিস হইয়া লাংগস কাজ করবে না। আরে ডায়াফ্রাম যদি মুভ না করে, লাংগসের ফাংশান তো হবে না!

বেচারা।

মৃত্যু এত সহজে ঘটে যায়। এই বেঁচে থাকছি, মুত্যুর ভাবনা ছিঁটে ফোঁটা নেই, হঠাৎ মৃত্যু এসে বলল, চল। সময় ব্যয় না করে বাড়ির দিকে যাই। কেউ সুখে মরে, কেউ দুঃখে মরে। সুখে যারা মরে, তাদেরই ভাল। জীবনের কোনও যন্ত্রণাই তাদের পাওয়া হয়নি। রিজওয়ানের হয়ত কোনও যন্ত্রণা পাওয়া হত না। ডাক্তার হয়েছে, তার ওপর আবার পুরুষ মানুষ। কেউ তাকে ঠকাবার ছিল না। কেউ তাকে ধর্ষণ করবারও ছিল না। রিজওয়ানের বাবার অঢেল টাকা, বাবা নিশ্চয়ই পুত্রের সুখের জন্য টাকা ব্যয় করতেও কোনওরকম দ্বিধা করতেন না। বাড়ি ফিরে আমি টাকার কথা ভাবি আবার। মার কাছে টাকা নেই। বাবার কাছে চাওয়ার প্রশ্ন আসে না। তিনি আমাকে পারলে বাড়ি থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেন। দাদা তো বদলে গেছেন, তিনি আমার হাত পাতার দিকে বড় জোর থুতু ছিটোতে পারেন। ইয়াসমিনকে কথা দিয়ে যে চাকরির প্রথম বেতনের টাকা পেলে ওকে আমি নতুন একটি হারমোনিয়াম কিনে দেব, ওর হারমোনিয়ামটি নিয়ে যাই ছোটবাজারে সুর তরঙ্গ দোকানটিতে, যে দোকান থেকে এটি কিনে ছিলাম। *পাঁচশ টাকায় কিনছি, বেচলে কত দিবেন?* সুর তরঙ্গে খাটো ধুতি পরা গোল ফ্রেমের চশমা চোখের বুড়োটি বললেন, দেড়শ দিতে পারি। দরাদরি করে তিনশ টাকা পাওয়া গেল। সেই টাকা নিয়ে কালের জন্য দেরি করিনি আমি। সেদিনই কৃষ্টপুর গিয়ে নার্গিসের মার হাতে টাকা কটি দিয়ে আসি। বারবার করে বলে আসি যেন কাল ভোরেই চলে যায় তারা ঢাকায়, *দেরি না করে।* ঠিকানা লিখে দিয়ে আসি কাগজে। বাড়ি ফিরে এলে মা জিজ্ঞেস করেন, *হারমোনিয়াম কই থইয়া আইছস?*

আমি কোনও উত্তর দিই না।

রুদ্রর চিঠি পাওয়ার পর ঢাকা ছুটি। সকালে ইন্দিরা রোডের বাড়িতে পৌঁছে দেখি সে ঘরে নেই। ঘরে তার ঘ্রাণ আছে, সে নেই। একটু আগেই নাকি বেরিয়েছে। সারাদিন অপেক্ষায় বসে থাকি। রুদ্র ফেরে না। রাত হয়। ফেরে না। অপেক্ষায় রাত জেগে থাকি, যদি গভীর রাত্তিরে হলেও ফেরে,যদি শেষ রাতের দিকেও ফেরে। কোথাও হয়ত আড্ডায় বসে গেছে, কোথাও হয়ত রাজনীতি নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে তুমুল জমে উঠেছে। দীর্ঘ দিন পর ঢাকায় এসে ঢাকার আড্ডা থেকে নিজেকে তুলে আনা কঠিন, এ বুঝি আমি। ভোরের আলো আমার গা স্পর্শ করে। চোখচুলচিবুক স্পর্শ করে। বুক থেকে কিরণ ছড়িয়ে যায় বাকি শরীরে। রুদ্রর স্পর্শ নেই। একা বিছানায় তার মাথার বালিশটিকে বুকে চেপে শুয়ে থাকি। সকাল চলে যায়। রুদ্র আসে দুপুরবেলা। ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে একটু চমকায় সে।

কখন এলে?

আজ নয়, কাল এসেছি।

কাল?

হ্যাঁ কাল।

রাতে বাড়ি ফেরোনি কেন? কোথায় ছিলে?

ছিলাম কোথাও।

কোথাওটি কোথায়?

ছিলাম।

কোথায়?

রুদ্র কোনও উত্তর না দিয়ে তোয়ালে আর লুঙ্গি নিয়ে গোসলখানায় ঢোকে। এত সময় নিয়ে গোসল করতে তাকে এর আগে দেখিনি। গোসল সেরে এসে সুগন্ধি সাবানের ঘ্রাণ নিয়ে শরীরময়,বলে, *খেয়েছো?*

হ্যাঁ, খেয়েছি।

তাহলে বসো তুমি। আমি খেয়ে আসি।

রুদ্র খাবার টেবিলের দিকে চলে যায়। আমি বিছানায় শুয়ে ভাবি, কেন সে বলল না কোথায় ছিল! কেন শুধু *ছিলাম* শব্দের আড়ালে ঢেকে রাখল কোথায় ছিল! ভাবনা আমাকে কোথাও নিয়ে পৌঁছয় না। এত সময় নিয়ে খেতে রুদ্রকে এর আগে আমি দেখিনি। তার স্পর্শ পেতে আমার শরীরের প্রতিটি কণা উন্মুখ হয়ে আছে। ইচ্ছে করে খাবার টেবিলে তার পাশের চেয়ারে বসে দেখি কি করে খাচ্ছে সে। নিশ্চয়ই কাল রাতে খায়নি। তা না হলে আমাকে একটুও স্পর্শ না করে সে কেন এমন চলে গেল খেতে! অভিমান আর আশঙ্কা আমাকে জাপটে ধরে রাখে। রুদ্র খেয়ে ফিরলে পাশে বসতে বলি। তার হাতখানি হাতে নিয়ে বলি, *তুমি মনে হয় এড়িয়ে যাচ্ছো আমাকে।*

নাহ। এড়িয়ে যাবো কেন?

কোথায় ছিলে কাল রাতে বললে না যে!

বললাম তো ছিলাম!

কোথায়? কোনও বন্ধুর বাড়ি?

না।

কোনও আড্ডায়?

না।

তবে?

রুদ্র চুপ করে থাকে, তার মৌনতা ক্রমে অসহ্য হয়ে আমাকে মর্মন্তুদ বেদনায় মন্থর করে। শ্বাস-কষ্ট হতে থাকে। রুদ্র তুমি বলে ফেলো, বলে ফেললে আমার কষ্ট যাবে। কিন্তু সে কি যায়! সে তো আরও বাড়ে। রুদ্র বলে সে নারায়ণ গঞ্জ ছিল। নারায়ণ গঞ্জ কেন, কোনও বন্ধু থাকে ওখানে? না। কেন গিয়েছো তবে? কার সঙ্গে গিয়েছো? একা। কার কাছে? কারও কাছে নয়। কোথায় ছিলে রাতে? টানবাজারে। রুদ্রর ভাষাহীন দুটো চোখ আমার চোখে পড়ে থাকে। হৃদপিণ্ডের ধুকপুক শব্দ শুনি। নারায়ণগঞ্জের টানবাজার দেশের সবচেয়ে বড় পতিতালয়, রুদ্র কি আমাকে বলতে চায় সে গেছে টানবাজার পতিতালয়ে রাত কাটাতে! না রুদ্র তুমি আর যা কিছুই বল, এ কথাটি বোলো না। ওখানে সারারাত তুমি কোনও চায়ের দোকানে, মদের দোকানে অথবা রাস্তায় ফুটপাতে গাছের তলে সারারাত শুয়েছিলে, এরকম কিছু বল। আমার চোখে আকুতি। কিন্তু রুদ্র বলে, টানবাজারে সে রাত কাটিয়েছে এক পতিতার ঘরে। আমার চোখে আকুলতা, পতিতা তো মানুষই রুদ্র, তোমার মায়ের মত, বোনের মত। বল যে তোমার ক্ষিদে পেয়েছে বলে পতিতাটি তোমাকে খেতে দিয়েছে, এত ঘুম পাচ্ছিল নেশা করে যে তুমি খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লে। বল যে সারারাত বেঘোরে ঘুমিয়ে তুমি উঠে এসেছো। বল যে স্পর্শ করনি অন্য কারও শরীর। সেই যে কথা দিয়েছিলে স্পর্শ করবে না, বল যে তুমি তোমার কথা রেখেছো। বল যে কেবল এ *ঠোঁটেই* তুমি কেবল চুমু খাও, অন্য *ঠোঁটে* নয়। বল অন্য কোনও শরীরের জন্য তুমি তৃষ্ণার্ত হও না। রুদ্র আমার চোখের ভাষা পড়তে পারে না, পতিতার সঙ্গে তার যৌনসম্পর্কের কথা বলে । আমার দিকে এক জগত অন্ধকার ছুঁড়ে দিয়ে বলে যায়। আমি স্তব্ধ বসে থাকি। শ্বাসের জন্য কোনও হাওয়া পাই না। সাজানো

ঘরটি দেখি, রুদ্রকে দেখি, আমার সংসার দেখি। ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস অল্প অল্প করে জোড়া দিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম আবার। হায় জীবন! যেন এ সংসার নয়, আস্ত একটি শ্মশান। শ্মশান জুড়ে মৃত মানুষের মত শুয়ে থাকি। আমি পুড়ছি, পুড়ে ছাই হচ্ছি। কিন্তু একটি শক্তি আমি হঠাৎই অর্জন করি নিজের ভেতর। সেই শক্তি আমাকে দাউ দাউ আগুন থেকে টেনে সরায়, আমার অস্তিত্বের অবশিষ্টটুকু বাঁচায়। পতিতার শরীর থেকে আনা রসগন্ধ ধুয়ে ফেলা রুদ্র লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়। দুপুরে খেয়ে খানিকক্ষণ ঘুমোয় সে, এ তার স্বভাব। ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে বাইরে বেরোবে। রাতে পেট ভরে মদ খাবে। রাতে হাতের কাছে আমি থাকলে আমার শরীরে, তা না হলে অন্য যে কোনও নারী-শরীরে উপগত হবে। রুদ্রর প্রতিদিনকার জীবনে কোনও এক বিন্দু এদিক ওদিক হবে না। একরত্তি না। আমার জন্য তার স্বভাবের এতটুকু বদল হবে না। নিজেকে ধিক্কার দিই। সেই ফুলশয্যার রাতেই তো তাকে আমার ত্যাগ করা উচিত ছিল, কি দরকার ছিল এতগুলো বছর এই প্রেম বয়ে বেড়ানো! একবার যে মানুষ বিশ্বাস ভাঙে, সে সবসময়ই ভাঙে। ভাঙাই তার স্বভাব। ভাঙাই তার নেশা।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, *তালাক দিতে হলে কি করতে হয়?*

ভাঙা গলায় বলে রুদ্র, *উকিলের কাছে যেতে হয়, কি কারণ সম্পর্ক ভাঙার, এসব বলতে হয়। নানান ঝামেলা।* লক্ষ করি, আগের বারের মত আমি কাঁদছি না। এক ফোঁটা জল নেই চোখে। স্তব্ধতার ভেতর থেকে একটি পাথুরে কণ্ঠ, *উকিলের বাড়ি কোথায় বল, যাব আমি, আজই। কেবল আমি কেন, তুমিও চল। তুমিতো বেশ ভাল করেই জানো আমাদের এই সম্পর্কটির কোনও অর্থ নেই। সুতরাং এ আমার আর রাগ করে তোমাকে ত্যাগ করা নয়। চল দুজনই কাজটি করি। সম্পর্কটি ছিন্ন করি। আর বিশ্বাস কর, আমার একেবারেই মনে হচ্ছে না যে তুমি অন্য মেয়ের সঙ্গে শুয়েছো বলে আমাদের সম্পর্ক শেষ হওয়া উচিত। সম্পর্কটি শেষ হওয়া উচিত, তুমি আমাকে ভাল বাসো না বলে।*

ভাল তোমাকে আমি বাসি। রুদ্র জোর দিয়ে বলে।

যে ভালবাসায় বিশ্বাস নেই!

বিশ্বাস আমি তোমাকে করি।

তুমি কর আমাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাসের কথা ভেবেছো? আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে? বিশ্বাস না থাকলে কি ভালবাসা যায়!

শিল্পের মানুষদের একটু এরকম হয়ই। শিল্পের মানুষেরা সমাজের সব নিয়ম কানুন মেনে চলে না। তোমার তা বোঝা উচিত। আমি শিল্পের মানুষ জেনেই তো আমাকে বিয়ে করেছো। তবে আর এত প্রশ্ন করো কেন?

সমাজের নিয়ম কানুনের কথা হচ্ছে না। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে জরুরি যে জিনিস, সেই বিশ্বাসের কথা হচ্ছে।

আমি হেসে উঠি। হাসতে হাসতে বলি, *শিল্পের মানুষ হলে সাত খুন মাপ তাই না! শিল্পের মানুষ বলে যা কিছু করার স্বাধীনতা তোমার আছে। শিল্পের মানুষ না হলে বুঝি নেই!আমিও তো কবিতা লিখি, তাই বলে আমিও তাই তাই করতে পারব যা তুমি কর? নাকি আমার সেই স্বাধীনতা নেই যেহেতু আমি ভাল কবিতা লিখি না? যেহেতু তুমি ভাল লেখো, তুমি পারো! নাকি তুমি পুরুষ হয়েছো বলে পারো। আমি মেয়ে বলে আমার সে স্বাধীনতা থাকতে নেই?*

রুদ্র চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ সে চেয়ে থাকে জানালায়, একটি উঁচু দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই সামনে। শাদা চুনকাম করা একটি দেয়াল শুধু। আমি রুদ্রর চোখে চেয়ে

থাকি। অনেককক্ষণ ওভাবেই দেয়ালে চেয়ে থেকে সে বলে, *শেষবারের মত ক্ষমা করতে পারো না?*

গতবারও তো শেষবার বলেছিলে? সত্যিকার শেষবার তোমার কোনওদিন হবে না।

হবে।

সে আগেও বলেছিলে। আসলে কি জানো, এ তোমার স্বভাব। স্বভাব বদলানো এত সহজে সম্ভব নয়।

ঠিক আছে আমাকে আরও সময় দাও। আমি স্বভাব বদলাবো।

কেন বদলাবে? তুমি কি সত্যিই চাও বদলাতে? চাইলে তুমি সেই শুরু থেকেই পারতে বদলাতে। আর বদলানোর প্রয়োজনটাই বা কি? তুমি তো মনে করো না তোমার স্বভাবে কোনও ত্রুটি আছে।

রুদ্র বিছানা ছেড়ে উঠে যায় ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলতে বলতে, *তোমাকে তো কতবার বলেছি,আমার সঙ্গে থাকো সবসময়। বিয়ের পর থেকে কতদিন আমার সঙ্গে থেকেছো বল! তোমার দ্বিধা ভাঙতেই লেগেছে তিন বছর। এভাবে একজন পুরুষ পারে নাকি একা থাকতে?*

আমি তো পেরেছি একা থাকতে।

মেয়েদের জন্য যা সম্ভব, পুরুষের জন্য তা সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়?

যে কারণই হোক, আমি পারিনি। ঢাকা ফিরে তোমাকে বাড়িতে না দেখে আমার খুব রাগ হয়েছিল। তাই বেরিয়ে গিয়ে মদ খেয়েছি। আর মদ খাওয়ার কারণেই ওই ঘটনা ঘটেছে।

মনে হচ্ছে রাগ হলেই তুমি মদ খাও! আর যেন খাও না? তুমি না রাগ হলে মদ খাও না? তুমি কি সুখে থাকলে মদ খাও না?

মদের কথা বাদ দাও। সম্পর্কের শুরু থেকে যে আমার সঙ্গে থাকোনি সেটার কি বলবে?

ভাল করেই জানো ময়মনসিংহে থাকতে হয়েছে মেডিকেলে লেখাপড়া করার জন্য। এখন তো ঢাকায় পাকাপাকি থাকার আমার কোনও অসুবিধে নেই। দৌড়োচ্ছো তো তুমিই।

আমার সঙ্গে শুরু থেকেই থাকা উচিত ছিল তোমার।

তার মানে তুমি কি বলতে চাও আমার ডাক্তারি পড়া ছেড়ে তোমার সঙ্গে থাকা উচিত ছিল? তোমার সুবিধের জন্য। তাই তো? যেন তোমার কোনও স্খলন না হয়! আচ্ছা, আমার যখন চাকরি হবে, সে যে মোংলা বা মিঠেখালিতে হবে, তার তো কোনও কথা নেই। আমাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে, তুমি চিংড়ির ঘের দেখতে যাবে বা ধান বিক্রি করতে যাবে, তোমার সঙ্গে মোংলা মিঠেখালি যেতে হবে কারণ যদি তোমার শরীর উত্তেজিত হয় সেই উত্তেজনা মেটাতে যেন একটি মেয়েমানুষের শরীর তুমি হাতের কাছে পাও?

রুদ্র চুপ করে থাকে। আমি বলি,*যখন তোমাকে ছাড়া থাকি, আমার শরীরের তৃষ্ণা মেটাতে আমি তো অন্য কোনও পুরুষের কাছে যাই না। অন্য কোনও পুরুষের কোনও ভাবনাই তো আমার মাথায় উঁকি দেয় না। আমি তো পারি না, তুমি পারো কি করে! এর কারণ কি জানো? এর কারণ হল, আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই অন্য পুরুষের কাছে যেতে পারি না। আর তুমি আমাকে ভালবাসো না বলেই পারো। খুব সহজ উত্তর।*

সহজ উত্তরটি রুদ্র মানবে না জানি। সে বলবে সে আমাকে ভালবাসে। সে যে অন্য

মেয়েদের সঙ্গে শুয়েছে, সে ভালবেসে নয়। রুদ্রর উত্তরও খুব সহজ। কিন্তু সহজ উত্তরটি না দিয়ে রুদ্র গম্ভীর গলায় বলে, *আমি মুক্ত দাম্পত্যে বিশ্বাস করি। তোমাকে আগেই বলেছি। যে দাম্পত্যে কোনও বন্ধন নেই। যে দাম্পত্য আর সব দাম্পত্য জীবনের মত নয়। যে দাম্পত্য জীবনে আমার কোনও শ্বাসকষ্ট হবে না। আমার মনে হবে না আমি আটকা পড়েছি। যে দাম্পত্য কোনও খাঁচা হয়, বরং মুক্ত আকাশ।*

রুদ্র তার লেখার টেবিলের চেয়ারে বসে বিছানায় পা তুলে দিয়ে বলে,--*হ্যাঁ। তাই তো তোমাকে বলেছি। বলেছি যে কোনও আঁটসাঁট জামা আমাকে পরাতে চেও না।*

তার মানে কি এই যে তুমি যে কোনও মেয়ের সঙ্গে শোয়ার স্বাধীনতা চাও!

তুমি সঙ্গে থাকলে আমি তো সে চাই না।

আমি সঙ্গে না থাকলে তুমি চাও?

চাই না। হয়ে যায়।

হয়ে যায় মানে?

হয়ে যায় মানে হয়ে যায়।

ধর আমারও যদি হয়ে যায়!

তার মানে? চকিতে ভুরু কুঁচকে ওঠে রুদ্রর। পা নেমে যায় বিছানা থেকে। বিছানায় তার মুখোমুখি বসে, কুঁচকে থাকা ভুরুর তলে তার সঙ্কুচিত হয়ে আসা চোখের মণিতে চেয়ে বলি, *মানে হল, তুমি যখন আমার সঙ্গে না থাকো, তখন আমার যদি কোনও পুরুষের সঙ্গে শোয়া হয়ে যায়!*

কি বললে?

বললাম, আমারও যদি কোনও পুরুষের সঙ্গে শোয়া হয়ে যায়, যখন তুমি আমার সঙ্গে না থাকো!

বাজে কথা বলো না। দাঁত চিবিয়ে ধমকে ওঠে রুদ্র, ধমকে দলা দলা ঘেন্না।

বাজে কথা তো নয়। তোমার যেটি করার অধিকার আছে, তা আমার থাকবে না কেন? নরম স্বর আমার।

অধিকারের কথা হচ্ছে না, কাল মাতাল ছিলাম। রুদ্রর স্বরও নরম।

এটা কোনও অজুহাত নয়। মদ খাওয়া তোমার নেশা। তুমি প্রতিরাতেই মাতাল হও।

না, হই না। প্রতিরাতে আমি মদ খাই না।

তবে কি বলতে চাও, যে, যে রাতে তুমি মদ খাবে, মাতাল হবে, সে রাতগুলোয় তোমার মেয়েমানুষ চাই যেমন করে হোক, আমি হলে আমি, না হলে অন্য কেউ!

রুদ্র একটি বই হাতে নিয়ে চোখ ফেলে রাখে বইয়ের পাতায়। যেন এ মুহূর্তে আমার সঙ্গে কথা বলার চেয়ে বইটি পড়া তার জরুরি। বইটি হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলি-- *আমার সঙ্গে কথা বল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বল। বল তোমার কেমন লাগবে আমিও যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে ঘরে ফিরি? ধর আজ রাতে আমি ঘরে ফিরব না। অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে কাল দুপুরে ফিরব।*

রুদ্র চোখ ছোট করে তাকায় আমার দিকে, বইটি টেনে নিয়ে বলে--*প্রতিশোধ নিতে চাও?*

প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছি না, জানতে চাইছি এর নাম কি মুক্ত দাম্পত্য নয়? নাকি মুক্ত দাম্পত্য কেবল নিজের বেলায় চাচ্ছ, আমার বেলায় নয়!

আমি তো বলেছি যে ভুলটি কাল হয়েছে আমার, আর হবে না এমন।

কেন হবে না ভুলটি আর? কারণ আমি পছন্দ করি না বলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু তুমি তো পছন্দ কর। তোমার তো কোনও অসুবিধে নেই একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করতে!

শরীরের সম্পর্কটিকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? এতে তো মনের কোনও সম্পর্ক হচ্ছে না।

ঠিক আছে, আমারও মনের কোনও সম্পর্ক হবে না কারও সঙ্গে। কেবল শরীরের। মানবে?

অনেকক্ষণ ভাবে রুদ্র। এরপর মাথা নাড়ে। তা সে মেনে নেবে না।

আমি হেসে বলি, *আসলে অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। এ আমার রুচিতে বাঁধে। তুমি চাইলেও এ জিনিস আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু তুমি যে বলতে, তুমি নাকি নারী পুরুষের সমতায় বিশ্বাস কর। তা-ই দেখলাম। দেখলাম কেমন বিশ্বাস কর। তুমি আসলে সমতার কথা বলো, বলা একধরণের ফ্যাশন কি না। শিল্পের মানুষ হলে তাই বলতে হয় কি না। অথবা খুব প্রগ্রেসিভ সাজতে হলে এসব না বললে চলে না কি না। তুমি সমতায় বিশ্বাস করো ভাবো, কারণ বউ নিয়ে শহর ঘুরে বেড়াও, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দাও, বউকে ঘরবন্দি করোনি, বউকে ঘরের কাজকর্ম করার জন্য রাখোনি। তাই বোধহয় একধরনের পুলক অনুভব কর ভেবে যে তুমি খুব প্রগতির পক্ষের মানুষ। অবশ্য প্রগতির পক্ষের মানুষ হওয়া খুব সহজ কথা, সমতার কথা বলাও খুব সহজ। কিন্তু নিজের জীবনে চর্চা করতে গেলেই কঠিন। ঠিক না?*

যৌথ সিদ্ধান্তে তালাক ঘটানোর কথা বলি, রুদ্র রাজি হয় না। সাফ সাফ বলে দেয় তালাকের জন্য উকিলের কাছে সে যাবে না। বারবারই সে বলে প্রথম তার অসুখ ধরা পড়ার পর যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কোনওদিন সে অন্য মেয়েমানুষের কাছে যাবে না, তা সে রেখেছে, কেবল সেদিনই টানবাজারে হঠাৎ করে দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে। আমি যেন এবারের মত, এবং এটিই শেষবার, তাকে ক্ষমা করে দিই। আমি যেন তালাকের মত ভয়ঙ্কর বিষয়টির কথা একটুও না ভাবি আর। রুদ্রর কোনও বাক্যই আমাকে স্বস্তি দেয় না। আমার মনে হয় না রুদ্র কেবল সেদিনই গিয়েছে নতুন করে পতিতালয়ে। আমার মন বলে, রুদ্র সেই যে তার কিশোর বয়সে যাওয়া শুরু করেছিল, সে যাওয়া কখনো বন্ধ করেনি। আমাকে সংক্রামিত করার পর অনুতপ্ত অন্ধকার নামে কবিতাই লিখেছে শুধু, সত্যিকার অনুতপ্ত হয়নি। শব্দ রচনা করা আর শব্দকে বিশ্বাস করা এক জিনিস নয়। অস্থিরতা আমাকে কামড়ে খেতে থাকে। এমন কোনও উকিলকে আমি চিনি না যাকে তালাকের কাগজ তৈরি করতে বলব। আমার অবশ্য যাওয়া হয় সেই উকিলের কাছে, যে উকিল আমাদের বিয়ের কাগজ তৈরি করেছিলেন, রুদ্রকে নিয়েই যাওয়া হয়, সে আরও দুদিন পর। বলেছিলাম *তুমি যদি না যাও, তবে একাই যাবো আমি। যে করেই হোক যাবো। যদিও আমি কাগজের কোনও সম্পর্কে বিশ্বাস করি না, ভালবাসি বলেই তোমার কাছে এসেছিলাম, বিয়ের কাগজের কারণে নয়। তালাকের কাগজটিও একটি কাগজ যদিও, কিন্তু এ কাগজটি আমার শরীরকে তোমার দাবি থেকে মুক্ত করবে। অন্তত আইনত।* উকিল অবাক দেখে যে আমরা এসেছি তালাকনামায় সই করতে। ঠা ঠা করে হেসে বললেন *বাড়ি যান, ঝগড়াঝাটি মীমাংসা করে ফেলেন। আপনাদের মত চমৎকার জুটি আর আছে নাকি?* হুইল চেয়ারে বসে থাকা পঙ্গু উকিল তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীটি এসে রুদ্রকে দেখে ট্রেতে করে চা বিস্কুট সেমাই সাজিয়ে নিয়ে এসে দিব্যি সাহিত্যের গল্পে বসে গেলেন। স্ত্রীটি সাহিত্যরস কেবল আস্বাদন করেন না, রীতিমত

সাহিত্য রচনা করেন। নিজে একটি বই লিখছেন। রুদ্র আর আমি ঘন হয়ে পাশাপাশি বসে স্ত্রীটির প্রথম বই লেখার উত্তেজনা এবং আনন্দ দুটোই উপভোগ করি। কে বলবে যে আমি আর রুদ্র পরস্পরকে তালাক দিতে এসেছি! চা বিস্কুট খেয়ে, সাহিত্যের গল্প শেষ করে উঠে আসার আগে উকিলকে বলি, *ঝগড়াঝাটি হয়নি আমাদের। মীমাংসা করার কিছু নেই। কিন্তু সম্পর্কটি চুকিয়ে ফেলা ভাল।*

আরও কিছুদিন সময় নেন। ভাবেন। হুমজিক্যালি কিছু করবেন না।

আমার আর ভাবার কিছু নেই, ভেবেই এসেছি।

উকিল গম্ভীর হয়ে মাস গেলে পর আমাকে আবার যেতে বলেন, কি কারণে আমি তালাক দিতে চাই, তাঁকে সব জানাতে হবে, তিনি যদি মনে করেন, কারণগুলো তালাক ঘটানোর জন্য উপযোগী, তবেই তালাক হবে, নচেৎ নয়। মোটা অংকের একটি টাকার কথাও বললেন নিয়ে যেতে।

যদিও রুদ্র প্রায়ই বলে *শরীর মেলাই চল, শরীরে বসত করে মন রূপ পাখি* কিন্তু এবার জলজ্যান্ত আমাকে হাতের কাছে পেয়েও শরীর সম্পূর্ণ মেলায় না সে। যদিও চুমু খায়, স্তনজোড়া দলে পিষে উতল নদীর স্রোত নামায় শরীরে, আর আমি তীব্র তৃষ্ণায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মত তাকে আঁকড়ে ধরি, তাকে আশ্রয় করি, যেন নিয়ে তীরে ভেড়ায় আমাকে, যেন বাঁচায়, সে নিষ্ঠুরের মত কেড়ে নেয় খড়কুটো, পাশ ফিরে শোয়। তার অঙ্গ শীতল নয়, অথচ পাশ ফিরে শোয়। তার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে আমার প্রতি অঙ্গ, তবু পাশ ফিরে শোয়। কেন? আমার জেগে থাকা শরীরের পাশে সে নিশ্চল পড়ে থাকে। সে কি ঘুমিয়ে থাকে? না সে ঘুমোয় না। বিচ্ছিন্ন হব বলে এ কি তার অভিমান? না তাও নয়। তবে কি? এর পরের রাতে অন্য ঘরে ঘুমোতে যায় রুদ্র। আমি এপাশ ওপাশ করি, হাত পা ছুঁড়ি, শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায়, শরীর ভিজতে থাকে কামে, ঘামে। রুদ্রর স্পর্শ গন্ধ আমার শরীরে বিষম জোয়ার আনে, আমি পারি না নিজেকে অবদমনের ডালাপালায় আবৃত করতে।

কেন দূরে দূরে থাকছো? তোমার কি ইচ্ছে করে না? কী হয়েছে তোমার?

কি হয়েছে সে ঘটনাটিও সে বলে মাঝরাতে। তার আবার অসুখ করেছে।

সে দেখায় তার শিশ্নের গোড়ার লাল গোটা। আমাকে সে কিছুতেই এবার সংক্রামিত করতে চায় না। তার বিশ্বাস সেদিন টানবাজার থেকেই অসুখটি সে বয়ে এনেছে।

পুরুষাঙ্গটি আড়াল করে অসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলি, *না তুমি টানবাজার থেকে আনোনি এটি। এত দ্রুত এই অসুখ ফুটে বেরোবে না। তুমি কি টানবাজারের আগে আর কোনও বাজারে যাওনি?*

কি বলতে চাইছ?

কি বলতে চাইছি সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

রুদ্রর বুঝতে না পারার কোনও কারণ নেই। অনেকক্ষণ বিমূঢ় বসে থেকে সে বলে আগে দুএকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে হঠাৎ হঠাৎ।

কোথায়? বানিশান্তায়?

মাথা নাড়ে ধীরে। বানিশান্তায় ঘটেছে। বানিশান্তায় যে সে নিয়মিতই যায় সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ঢাকায় আমি যখন তার পাশে থাকি, পতিতালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না। কিন্তু ঢাকা ছেড়ে যখনই সে মোংলা বন্দরে যায়, বানিশান্তার লোভ সম্বরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। রুদ্রর কাছে আমি *একটি শরীর* ছাড়া, এক

খণ্ড মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নই। নিজের ওপর ঘৃণা হয় আমার।

তুমি তো বলেছিলে সেই তিরাশির পর আর ঘটেনি কিছু, কেবল সেদিন টানবাজারেই ঘটল!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুদ্র। দীর্ঘশ্বাস আমিও ফেলি।

সেই পরিচয়ের শুরু থেকে আমাকে মিথ্যে বলে আসছ। ঘা না বেরোলে তো এবারও তুমি মুখোশের আড়ালেই থাকতে আর বলতে তুমি সম্পূর্ণ আমার আছ, শুদ্ধ আছ। টানবাজারের ঘটনার কথাও লুকোতে।

রুদ্রর মুখটি খুব করুণ দেখায়। কোনও পতিতাকে আমি কি ঘৃণা করি? নিজেকে প্রশ্ন করি, বারবার করি। উত্তর মেলে, না। রুদ্রকে কি ঘৃণা করি? না। করি না। বরং রুদ্রর জন্য মায়া হয় আমার। পরদিন তাকে শাহবাগে নিয়ে যাই পেনিসিলিন নিতে। সেই একই ওষুধের দোকানের একই কর্মচারি রুদ্রকে ভেতরের ঘরে নিয়ে টেবিলে উপুড় করে শুইয়ে নিতম্বে ইনজেকশনটি দেয়। সুঁইএর যন্ত্রণায় বেশিক্ষণ ভোগে না রুদ্র। দুজন আগের মত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, শাহবাগে, সাকুরায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিই দিয়ে রাত করে ঘরে ফিরি। পরদিন সকালে যখন আমি আমার কাপড় চোপড় সুটকেসে ভরছি, রুদ্র আকাশ থেকে পড়ে।

কি ব্যাপার কোথায় যাচ্ছো?

ময়মনসিংহে।

ময়মনসিংহে কেন?

যাচ্ছি।

কবে ফিরবে?

জানি না।

জানো না কবে ফিরবে?

না।

কবে ফিরবে ঠিক করে বল।

হয়ত ফিরবই না।

তার মানে?

তার কি মানে, তা তাকে বুঝে নিতে বলি। বলি যে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি।

চলে যাচ্ছি মানে?

চলে যাচ্ছি মানে চলে যাচ্ছি। এক মাস পর উকিলের কাছে গিয়ে কাগজ সই করব।

তাহলে এসব করলে কেন? ইনজেকশন দেওয়ালে কেন?

সে তো তোমার জন্য। তোমার ভালর জন্য।

আমার ভালর জন্য যদি ভাবনা কর, তবে আমার সঙ্গে থাকো।

ভাবনা করলেই বুঝি থাকতে হয়!

কেন নয়?

দূরে থেকেও তো তোমার ভাল চাইতে পারি আমি। পারি না?

কি দরকার! দূরেই যদি থাকো, তবে আর আমার কিসে ভাল হবে তা নিয়ে ভাববে কেন!

হেসে বলি, *তাতে কি? এত দীর্ঘদিনের সম্পর্ক, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা হঠাৎ ফুরিয়ে গেছে না কি? সে তো আছেই।*

তবে আর যাচ্ছো কেন! চল নতুন করে শুরু করি সব।

নাহ।

নাহ কেন।

আমি একটা মেয়েমানুষের শরীর, আমি আর কিছু নই, তোমার এই ধারণাটি, তোমার এই বিশ্বাসটি আমি অস্বীকার করতে চাচ্ছি।

কে বলল এটা আমার বিশ্বাস?

নিজেকে জিজ্ঞেস কর। উত্তর পাবে।

সংসারের মায়া ত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে ময়মনসিংহে ফেরার পথে একটি রাত কাটাতে থামি ছোটদার বাড়িতে। ছোটদার বিদেশ ভ্রমণের গল্প শুনে খেয়ে দেয়ে যেই না ঘুমিয়েছি, মুহুর্মুহু দরজা ধাক্কার শব্দে সবাই ঘুম ভেঙে জেগে উঠি মধ্যরাতে। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখি রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে। পাড় মাতাল।

কি হয়েছে, কি চাও?

রুদ্র চিৎকার করে, *বেরিয়ে এসো।*

কেন?

তুমি আমার বিয়ে করা বউ, আমি যা বলছি তাই তোমাকে শুনতে হবে, বেরিয়ে এসো, তা না হলে পুলিশ ডাকব। কোনও শুয়োরের বাচ্চাই আমাকে থামাতে পারবে না।

চলে যাও। চিৎকার করো না।

আমি করবই চিৎকার। তুমি যতক্ষণ না বেরোচ্ছ, চিৎকার করব।

আমি বেরোবো না। চলে যাও তুমি।

কেন বেরোবে না? তোমাকে বেরোতেই হবে। আমি দরজা জানালা সব ভেঙে ফেলব বলে দিচ্ছি। এখনও বেরোও। বাড়ি চল। বেরোও বলছি।

রুদ্রর চিৎকারে পাড়া জাগে। দরজা ক্রমাগত লাথি মেরে ভাঙতে চাইছে সে। ছোটদা আমাকে টেনে সরিয়ে আনেন জানালা থেকে। লজ্জায় আনত মুখটি বুকে চেপে আমাকে জড়িয়ে রাখেন দুবাহুতে, শুইয়ে দেন বিছানায়, পাশে শুয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন, ছোটদার এই আদর পেয়ে আমার ভেতরের জমে থাকা কান্নাগুলো সমস্ত বাধা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে তিনি রুদ্ধ স্বরে বলতে থাকেন, *শক্ত হ, শক্ত হ।* পরদিন সকালে গীতা নিজে গাড়ি চালিয়ে আমাকে দিয়ে আসে কমলাপুর ইশটিশনে। ঝকঝকে লাল রঙের এই টয়োটা করোলাটি গীতার জন্মদিনে উপহার দিয়েছেন ছোটদা।

আমি যে রুদ্রকে ত্যাগ করে এসেছি, অবকাশের কাউকে না বললেও বোঝে সবাই। সুটকেস থেকে আমার কাপড় চোপড় বের করে মা আলনায়, আলমারিতে গুছিয়ে রাখেন। বিছানায় নতুন চাদর বিছিয়ে দেন। এলোমেলো কাগজ সরিয়ে টেবিলটি সাজিয়ে দেন। ফুলদানিতে তাজা একটি গোলাপ এনে রাখেন। দুদিন পর চাকরির কাগজ আসে। নকলা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ পদে আমার চাকরি। কাগজ পাওয়ার পরদিন বাবা আমাকে ট্রেনে করে জামালপুর নিয়ে যান। জামালপুর থেকে বাসে করে শেরপুর, ওখানে সিভিলসার্জনের আপিসে বসে চাকরিতে যোগদানের কাগজে সই করি। সাতদিনের মধ্যে আমাকে নকলার স্বাস্থকেন্দ্রে কাজ শুরু করতে হবে। বাবাই আমাকে আর আমার সুটকেসটিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে শম্ভুগঞ্জ, শম্ভুগঞ্জ থেকে বাসে চড়ে ফুলপুর, ফুলপুর থেকে রিক্সায় করে নকলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দিয়ে আসেন। গ্রামের ভেতর ধান, পাট, কড়াইশুঁটির ক্ষেতের মধ্যিখানে একটি হাসপাতাল। হাসপাতালের কিনারে কয়েকটি শাদা দোতলা বাড়ি, ডাক্তারদের সরকারি আবাস। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বড় ডাক্তার

আবদুল মান্নান। বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকেন সরকারি বাড়িতে। আবদুল মান্নান দাড়িঅলা লম্বা পাঞ্জাবি পরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ডাক্তার। তাঁর বাড়িতে আপাতত আমার থাকার ব্যবস্থা করা হল। বাবা হয়ত তাঁকেই ভেবেছেন সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু সারাদিন হাসপাতালে রোগী দেখে রাতে আমার আশ্রয়ে ফিরতেই আবদুল মান্নানের চোখ নেকড়ের চোখের মত জ্বলে, দেখি। তাঁর থাবা থেকে গা বাঁচাতে আমাকে বেশিদিন সন্ত্রস্ত থাকতে হয়নি, নকলা থেকে বদলি ঘটিয়ে আমাকে ময়মনসিংহ শহরে এনেছেন বাবা। শহরের সদর স্বাস্থ্য আপিসে কাজ বলতে কিছু নেই। আমি কাজ চাই। ব্যস্ততা চাই। কাচারির পাশে লাল দালানে অলস বসে থাকা ডাক্তার নূরুল হককে অনুরোধ করি তিনি যেন আমাকে পাঠিয়ে দেন এমন জায়গায় যেখানে প্রচুর কাজ, যেখানে সকালদুপুরবিকেলরাত কেবল কাজ। যেখানে এতটুকু শ্বাস ফেলার সময় আমি পাবো না।

আমি যখন শহরের সূর্যকান্ত হাসপাতালে বানের জলের সঙ্গে ভেসে আসা কলেরায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করছি, রুদ্র মোংলায় বসে লিখছে

আর একবার তুমি বৃষ্টি দাও, দূরের আকাশ--
তরুণ শস্যের ক্ষেত জ্বলে যাচ্ছে করাল খরায়।
চাষাবাদে অনভিজ্ঞ কৃষকের নেই কোনও সেচ,
কেবল হৃদয় জুড়ে অকৃত্রিম শস্য-ভালবাসা।

একবার মেঘ দাও, ক্ষমা দাও বৃষ্টির ভাষায়,
জীবনের একমুঠো শস্য তুমি বিনাশ করো না।
আমাকে ফলতে দাও নৈরাজ্যের দুষিত দুপুরে,
হতে দাও শস্য ভার-অবনত সোনালি খামার।

ফিরে নাও বিরহের তপ্ত খরা, অনল দূরত্ব
মেঘ দাও, বৃষ্টি দাও জীবনের ব্যথিত শরীরে।
দহনে চৌচির হিয়া, ও আকাশ, মরমিয়া হাত
ছোঁয়াও মেঘের বুকে জল হয়ে ঝরুক আদোর।

লাঙলে হৃদয় চিরে বীজ বুনে ভালবাসা-ধান
একদিন অপেক্ষায় ছিল এক বিরান প্রান্তর,
তুমি তাকে মেঘ দিলে, বৃষ্টি দিলে, দিলে সম্ভাবনা,
ফসলের স্বপ্ন হল খরাজীর্ণ অনাবাদি মাটি--

অনুতপ্ত অন্ধকার হল স্নিগ্ধ সকালের রোদ।

যে মাটি পুড়েছে দীর্ঘ সময়ের স্বপ্নহীন ক্লেদে,
প্লাবনের পরাজয় জমে জমে যে হয়েছে ভূমি--
দিয়েছিলে মেঘ তাকে, বৃষ্টি, জল, সকল আকাশ।

দিয়েছিলে সম্ভাবনা, দিয়েছিলে প্রথম প্রকাশ,

উড়বার স্বপ্ন শুধু দিয়েছিলে, দাও নাই ডানা।
সমস্ত জীবনটারে তুলে এনে দিয়েছিলে হাতে,
দাও নাই অতি তুচ্ছ নিভৃতের একান্ত ঠিকানা।

আমার যা ছিল, সব রুদ্রকেই দিয়েছিলাম আমি। অতি তুচ্ছ নিভৃতের ঠিকানাও। এ সম্ভবত তার সান্ত্বনা যে কিছু একটা তাকে দেওয়ার আমার অভাব ছিল, তাই এমন গোল পাকিয়ে গেছে সবকিছু। কিছু একটা তাকে দিইনি বলেই সম্পর্কটির এই দশা আজ। অথচ কোনও গোপন কিছু ছিল না আমার। নিজের জন্য কিচ্ছু ছিল না। উকিলের কাগজে আমি সই করেছি, দাবি মত টাকাও দিয়ে এসেছি। এরপর আর খোঁজ নিইনি কি ঘটেছে। শুধু এটুকু জানি, রুদ্রর সঙ্গে জীবন যাপন সম্ভব নয় আমার, আবার এও জানি রুদ্রকে আমি ভালবাসি, রুদ্র ছাড়াও জীবন যাপন করা অসম্ভব। যে রকম হুট করে বিয়ের কাগজে সই করেছিলাম, তালাকের কাগজেও তেমন করে করেছি। স্বপ্নহীন ধূসর জীবন নিয়ে বসে থেকে থেকে নিজেকে বারবার বলছি, *যে তোমাকে অপমান করেছে, তার কাছে আর যেও না মেয়ে, আর কষ্ট পেও না। তোমার প্রেমের এতটুকু মূল্য সে দেয়নি। কোনওদিনই সে দেবে না। মুক্ত দাম্পত্যে সে বিশ্বাস করে, যে দাম্পত্যে কোনও প্রতিশ্রুতি থাকে না। সে যে কোনও ঘাটের জল খাওয়া ছেলে, যে করেই হোক সুখের স্রোতে গা ভাসাবে সে, পাড়ে কে একা দাঁড়িয়ে আছে তার অপেক্ষায়, ফিরে তাকাবে না।*

রুদ্রকে ত্যাগ করেছি, কিন্তু তার স্মৃতিগুলোই আমাকে দুবেলা গুছোতে হয়। রুদ্রকে ভুলে থাকতে চাই। কিন্তু নির্জন দুপুরে বাড়ির বারান্দায় বসে উঠোনের খাঁ খাঁ রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে যে মানুষের কথা ভাবি, না ভেবে পারি না, সে রুদ্র। বুক মুচড়ে একটি অসহ্য কষ্ট উঠে আসে চোখে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি যেন রুদ্র নামক দুঃস্বপ্নটি, পেছনে ফেলে আসা আমার কালো অতীতটি আমাকে আর স্পর্শ করতে না পারে। আমি ব্যর্থ হতে থাকি। আমি বুঝি, খুব গোপনে গোপনে বুঝি, রুদ্রর জন্য ভালবাসা আমার আজও ফুরোয়নি। কিন্তু আমিই কি চাই এ ফুরোক!

ফিরে এসো নিশ্চয়তা, ফিরে এসো সর্বগ্রাসী প্রেম।
ব্যথিত স্রোতের তোড়ে ভেসে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ খেয়া,
কোথাও বন্ধন নেই, স্নেহময় শীতলতা নেই,
কোথায় আশ্রয় নেই, ক্ষমা নেই, সুবিপুল ক্ষমা।

সারাদিন অন্ধকার চাষ করে ফিরে আসি ঘরে,
সারারাত বেদনার বীজ বুনি বুকের ভেতর--
তুমি তো আশ্রয় জানি, ফিরে আসবার স্নিগ্ধ নীড়,
মায়ের আঁচল তুমি--ফিরে এসো নিকষিত হেম।
আমাকে ভাঙছে ঋতু, প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ সময়,
মানুষের নৃশংসতা, ক্ষমাহীন চেতনার নোখ।
আমাকে ভাঙছে প্রেম, একই সাথে প্রেমহীনতাও--
না পেয়ে কেঁদেছি যত, পেয়ে বুঝি তারচে অধিক।

আমাকে জবাই করে নৈরাজ্যের নিরাকার চাকু,

অস্থির অশ্বের ক্ষুর অবিশ্বাস আমাকে পোড়ায়।
সভয়ে গুটিয়ে রাখি বিশ্বাসের সুকোমল ডানা,
আশ্বিনের চাঁদ ওঠে, জেনে যায় অবিশ্বাসী নাম।

চারপাশে ফণা তোলে অন্ধ জল--ফিরে এসো তীর,
ফিরে এসো খড়কুটো, ভাসমান কাঠের শরীর।
পরিত্রাণ ফিরে এসো, তুলে নাও আমার সকল,
আমার ব্যর্থতা, পাপ, ভালবাসা, ঘৃণা ও আদোর।
রাতের সুতীব্র স্রোত হু হু করে টেনে নিয়ে যায়,
ফিরে এসো নিশ্চয়তা, ফিরে এসো রোদের সকাল।

কিন্তু কার কাছে ফিরব! সে তো আমাকে দুঃখ দেবে আরও। দুঃখ দেবে জেনেও যখন তাঁর শ্মশান কবিতাটি পড়ি, চোখে জল জমে। আমি ভেঙে পড়ি ভালবাসায়, বেদনায়।

বাড়াই তৃষ্ণার হাত, ফিরে আসে শূন্যতাকে ছুঁয়ে
তুমি নেই, নিষ্প্রদীপ মহড়ায় জ্বলে থাকে একা
পাথরের মত ঠান্ডা একজোড়া মানবিক চোখ,
তৃষ্ণার্ত শরীর জুড়ে জেগে থাকে ব্যথিত রোদন।

নরম আলোর চাঁদ মরে যায় অঘ্রাণের রাতে,
বেঁচে থাকে ভালবাসা, নক্ষত্রের আলোকিত স্মৃতি।
তোমার শূন্যতা ঘিরে দীর্ঘশ্বাস, বেদনার ঘ্রাণ,
তোমার না থাকা জুড়ে জেগে থাকে সহস্র শ্মশান।

জীবন গুছিয়ে নিয়েছি ময়মনসিংহে। অবকাশে নিজের ঘরটি আবার নতুন করে গুছিয়েছি। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। ঘরের মেয়ে তো ঘরেই ছিল, কেবল হঠাৎ হঠাৎ *উধাও* হয়ে যেত। সেই উধাও হওয়ার পাট চুকেছে। পুরোটাই কি চুকেছে! হঠাৎ একদিন এক মন-খারাপ-করা বিকেলে *ঢাকায় এসো, আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্য,* টেলিগ্রামটি পেয়ে উতল হাওয়ায় ভাসি, আমি যে রুদ্রর কেউ নই আর, সব সম্পর্ক যে চুকে বুকে গেছে, ভুলে গিয়ে, দুদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা ছুটি। দরজায় কড়া নাড়ি, রুদ্র দরজা খুলে দেয়। যেন জানতই আমি আসব। কথাহীন নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকি দুজন। একটি উষ্ণ হাত আমাকে আলতো স্পর্শ করে। একটি স্পর্শই বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেয় সমস্ত শরীরে। আমাকে সে গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখে অনেকক্ষণ। কাঁদে। আমার কাঁধে, বুকে ফোঁটা ফোঁটা জল। কণ্ঠের নিচে কষ্ট জমে থাকে, *কেঁদো না,* এই ছোট্ট কথাটি জমা-কষ্টের তলে চাপা পড়ে। চোখের জল মুছিয়ে দিই তার। ঘরটি দেখি, সেই আগের মত সব, যেভাবে ছিল। দুচোখে সংসার দেখি আমার। রুদ্র আমার ঘাড়ে গলায়, আমার চিবুকে বুকে, ঠোঁটে, চোখের পাতায় চুমু খায়, সারা শরীরে আগের মত চুমু। দীর্ঘদিনের না-স্পর্শ শরীর রুদ্রর স্পর্শে তছনছ হয়ে যায়। যেন আগের মত জীবন আমাদের। যেন আগের মত আমরা যৌথজীবনের স্বপ্ন নিয়ে শরীর এবং হৃদয় বিনিময় করছি। পারিনি

ভাবতে রুদ্র আমার কেউ নয়। মিলনে মিথুনে তৃপ্ত রুদ্র আমার চিবুক তুলে হেসে বলেছে, *কি নিজেকে তো খুব শুদ্ধ মানুষ ভাবো তো! এবার? আমি তো তোমার পর পুরুষ, আমার সঙ্গে শুলে যে!*

রুদ্রর দুগালে দুহাত রেখে হেসে উঠি। আঙুলের আদর দিয়ে সারা মুখে, বলি, *তোমাকে ভালবাসি তাই।*

ভালবাসো তাহলে চলে গেলেই বা কেন? আর চলেই যদি গেলে তাহলে এলেই বা কেন?

তুমি ডাকলে যে।

আমি ডাকলেই বা কি? আমার সঙ্গে তো তুমি কোনও সম্পর্ক রাখোনি।

আমি তো এখনও নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

যুদ্ধ কেন?

নিজেকে যেন ভালবাসতে পারি। অন্যকে ভালবাসতে ভালবাসতে এই হয়েছে যে নিজেকেও যে ভালবাসা উচিত, সেটি ভুলে গিয়েছিলাম।

আমার বুকে মাথা রেখে ছোট্ট শিশুর মত শুয়ে থাকে রুদ্র। চুলে আঙুল বুলিয়ে দিই। বলে, *চল উকিলের কাছে আবার। তালাকের কাগজটি তিনি যেন তৈরি না করেন।*

আমি ম্লান হাসি।

সে রাতে কেঁপে জ্বর আসে আমার। পরদিনও জ্বর হু হু করে কেবলই বাড়ে। দুপুরবেলা আমার ওই জ্বর-শরীরের পাশ থেকে রুদ্র উঠে যায় কারও পায়ের আওয়াজ পেয়ে। কে যেন দরজায় কড়া নাড়ে, কে নাড়ে, কে জানে! পাশের ঘরে অতিথির সঙ্গে কথা বলছে রুদ্র। একটু জলের জন্য কাতরাই, রুদ্র নেই। ঘন্টা দুই পর সে ফেরে, খানিকক্ষণের জন্য।

কে এসেছে?

নেলি।

সেই নেলি! রুদ্রর নেলিখালা।

রুদ্র আর নেলির টুকরো টুকরো কথা, হাসি, অট্টহাসি, ফিসফিস, খিলখিল ভেসে আসে শোবার ঘরে। আমি সব নিয়ে জ্বরে ভুগি। মনে হতে থাকে রুদ্র আজও নেলিকে ভালবাসে। কিছু কিছু ভালবাসা আছে, সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও, থেকে যায়। জ্বর আমাকে যত না কাঁপায়, তার চেয়ে বেশি কাঁপায় নিঃসঙ্গতা। আরও ঘন্টা দুই গেলে রুদ্র যখন নেলিকে বিদেয় দিয়ে ফিরে আসে শোবার ঘরে, আমি জ্বর-কণ্ঠে জড়-কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি, *নেলি কি করে জানল এ বাড়ির ঠিকানা?*

আগে এসেছে।

প্রায়ই আসে বুঝি।

প্রায়ই না। মাঝে মাঝে।

ও।

আমার কি সামান্য ঈর্ষা হয়! হয়। প্রলাপের মত শোনায় যখন বলতে থাকি *যে কোনও দূরত্বে গেলে তুমি আর আমার থাকো না, তুমি হও যার তার খেলুড়ে পুরুষ। যার তার পুরুষকে আমি আমার বলি না।*

প্রলাপের মত শোনায় যখন বলতে থাকি, *ফুলশয্যা কাকে বলে আমি জানি। কাকে বলে সারারাত জেগে থাকা বন্দরের ভয়ানক রাত। আমি জানি, আমার হাড় মাংস জানে, জানে বন্দরের সব কটি সাম্পান মাঝি, জানে কার্গোর শ্রমিক, ভোরের লঞ্চ জানে, তুমিও*

কি কিছু কম জানো? ভালবাসা কতটুকু সর্বনাশা হলে সাঁতার না জানা দেহ রূপসার জলে ভেসে ফের ফিরে আসে। দিগন্তের ওইপার থেকে ফের, চতুর্দোলায় দুলে, দ্বিধার আগুনে পুড়ে ফের, নর্দমায় পড়ে থাকা মাতালের অপুষ্ট বাহুতে মুখ রেখে আরেকবার কেঁদে উঠতে ফের ফিরে আসে, বানিশান্তা থেকে তুলে আনা পুঁজ রক্ত চুমুকে চুমুকে নিতে ফিরে আসে ভিনদেশি বেভুল বালিকা। তুমি মদে চুর, তুমি ঘুমে ঘোর, তবু তুমি কিছু কম জানো না, তোমাকে ভেলায় তুলে আমি বেহুলা হয়েছি কতবার কত ক্লান্ত যমুনায়।

যেদিন জ্বর সারে, দুজন বাইরে বেরোই। সেই আগের মত বেরোই। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে কিছু তরুণ কবির সভা বসেছে। সভায় আমাদেরও অংশ নেওয়ার কথা। বসে যাই ঘাসে, সেই আগের মত ঘাসে। এরশাদের এশীয় কবিতা উৎসবের আয়োজনের প্রতিবাদে পাল্টা একটি কবিতা উৎসব তৈরি করার জন্য সভাটি। কিছু তরুণ কবি, আমি, রুদ্র জাতীয় কবিতা পরিষদের প্রথম সভার উপস্থিত সদস্য হিসেবে কাগজে সই করি। এসবে রুদ্র অত্যন্ত উৎসাহী। বহুদিন থেকে স্বৈরাচারি সরকারের বিরুদ্ধে কবিতা লিখছে, এবার একটি মোক্ষম অস্ত্র তার হাতে, এক উৎসব দিয়ে আরেক উৎসব ঠেকানো। গুটিকয় হাতে গোনা সরকারি আর ইসলামপন্থী কবি এরশাদের দলে ভিড়েছে, বাকি সব জাতীয় কবিতা উৎসবে। এরশাদ ওই গুটিকয় নিয়েই নিজের কবিতা উৎসবের নাম দিয়েছেন এশীয় কবিতা উৎসব। এশীয়র আয়োজন বন্ধ ঘরে, জাতীয় খোলা রাস্তায়। এশীয় ঢুকে যায় কুয়োয়, জাতীয় সাঁতার কাটে সমুদ্রে।

জাতীয় কবিতা উৎসব নিয়ে রুদ্রর উৎসাহ যখন চরমে, এদিক ওদিক ছুটোছুটির করতে চায় সে, পারে না। ছুটোছুটি তো দূরের কথা, হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা হয়, আগে দশ গজ হাঁটলে হত, এখন চার গজেই হয়। দিন দিন কমে আসছে দূরত্ব। রুদ্র তবু দমে যায় না, থেমে থেমে হলেও হাঁটে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটির রং বদল হচ্ছে, কালচে হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কালচের ত্বক। যেন আঙুল নয়, গাছের শেকড় এটি। রোগটি নিশ্চিত *বারজারস ডিজিজ।* আঙুলে গ্যাংগ্রিন হয়ে গেলে পা কেটে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। আশংকায় নীল হয়ে থাকি। *সিগারেট বন্ধ কর। তোমার রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। এ হচ্ছে একধরনের পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ। তোমার ইন্টারমিটেন্ট ক্লডিকেশন হচ্ছে। এ তোমার কাফ মাসলে হচ্ছে, ফুটে হচ্ছে। এরপর পা রেস্টে থাকলেও ব্যথা হবে।* রুদ্র বিশ্বাস করে না সিগারেটের জন্য এসব হতে পারে। কত লোক তো সিগারেট খায়, তাদের হয় না! *সবার হয় না, কারও কারও হয়।* আমার উপদেশ বাজে কবিতার কাগজ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়ার মত সে উড়িয়ে দেয়। বড় ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলবে আশায় শান্তিনগর মোড়ে বি এন মেডিকেল হলে ডাক্তার প্রজেশ কুমার রায়ের কাছে রুদ্রকে নিয়ে যাই। যে কথাটি তাকে বারবার বলেছি, ডাক্তার প্রজেশও তাই বলেন, *সিগারেট ছাড়তে হবে। তা না হলে পা কেটে ফেলা ছাড়া উপায় থাকবে না।* ডাক্তার কিছু ওষুধও লিখে দেন। যতদিন ঢাকায় থাকি, রুদ্রকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়াই, গামলার গরম জলে তার পা দুটো ডুবিয়ে রাখি যেন রক্তনালী সামান্য হলেও প্রসারিত হয়। রুদ্রর ঠোঁট থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়ে ফেলে দিই। ভীষণ রাগ করে সে। আমাকে ঠেলে সরিয়ে প্রতি সন্ধেয় সে মদ খেতে চলে যায়, টাকা বেশি থাকলে সাকুরায়, কম থাকলে মেথরপট্টিতে। রাস্তায় সুন্দরী মেয়ে দেখলে রিক্সায় বসে এক চোখ টিপে শিস বাজায়, *খাসা মাল* বলে চেঁচিয়ে ওঠে, হি হি

করে হাসে। আমার সঙ্গে তালাক হয়ে গেছে, আমি আর কোনও বাধা নই রুদ্রর এসব কাজে। অবশ্য ছিলামই বা কবে! ময়মনসিংহে ফেরত যাওয়ার আগে বার বার বলি নিয়মিত ওষুধ খেতে, ডাক্তারের উপদেশ মেনে চলতে, বলি, জীবনের চেয়ে মূল্যবান অন্য কিছু নয়। রুদ্রর প্রেমিকা বা স্ত্রী মনে হয় না নিজেকে, বরং মনে হয় একজন বন্ধু, একজন শুভাকাঙ্খি, একজন ডাক্তার।

রুদ্র মদ সিগারেট গাঁজা চরস আর মেয়েমানুষের নেশায় আগের মতই বুঁদ হয়ে থাকে। আমার তো ছিল রুদ্রর নেশাই, সেটি কাটাতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকি। ওদিকে রুদ্র টলতে টলতে বলছে

তুমি আমার জীবন্ত ক্রাচ, তোমাকে চাই।
যেদিকে যাই, যেদিকে ফিরি,
স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতে,
আমার এখন তোমাকে চাই।

নাহ, কারও জীবন্ত ক্রাচ হওয়ার জন্য জীবন আমার নয়। নিজের জীবনকে অন্যের ক্রাচ হওয়ার জন্য বিসর্জন আমি দিতে পারি না। রুদ্রর জন্য মায়া হয় আমার, কিন্তু তার চেয়ে বেশি মায়া হয় নিজের জন্য।